বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ

শ্রীসুকুমার সেন

ইস্টার্ন পাবলিশার্স
৮-সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

যাঁহার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে
অসাধারণকে প্রত্যক্ষ করিয়া
ধন্য হইয়াছি তাঁহারি স্মরণে

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকে যথাসম্ভব কালানুক্রমিক এবং objective বা বস্তুগতভাবে বর্ণনা করা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে এই বিষয়ে যেসব নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে সেগুলির মূল্য কিছুমাত্র খর্ব না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে সেসকল হয় অসম্পূর্ণ, নয় subjective বা অ-বস্তুগত। দেশের ইতিহাসের যথার্থ ধারণার অভাবও আমার পূর্ববর্তিগণের মূল্যবান্ লেখার অন্যতম ত্রুটি বটে। সত্যকথা বলিতে কি বাঙ্গালা দেশে তথা বাঙ্গালা সাহিত্যে "বৌদ্ধ" "শৈব" "ব্রাহ্মণ্য" "ঐস্লামিক" ইত্যাদি যুগবিভাগ একেবারে কাল্পনিক। একথাও বলিয়া রাখা ভাল যে আমি ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের অনুসরণ করি নাই, কেননা আধুনিকপূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে কেবলই খাড়া-বড়ি-থোড়ের গতানুগতিকতা, ইংরেজী সাহিত্যের উদার প্রসার ও অনুপম ঐশ্বর্যের সঙ্গে তুলনা হইতে পারে না।

বর্তমান গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড, ইহাতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি পৌঁছানো গেল। প্রাচীন ধারার শেষ এইখানেই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের গদ্য লেখকদের কথা অতি সংক্ষেপেই সারিয়াছি। ইহার দুইটি কারণ, প্রথমত সাহিত্য হিসাবে এইসব পাঠ্যপুস্তকের মূল্য যৎকিঞ্চিৎমাত্র, এবং দ্বিতীয়ত মুদ্রিত গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত সহজপ্রাপ্য বলিয়া হস্তলিখিত পুথিতে পর্যবসিত নিবন্ধের মতো বিস্তৃত আলোচনা অত্যাবশ্যক মনে করি নাই। মদীয় বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের গদ্য সাহিত্যের বিস্তৃততর পরিচয় মিলিবে।

অন্যান্য কবিদের তুলনায় বৈষ্ণব পদকর্তাদের আলোচনাও যথাসম্ভব সংক্ষেপে সারিয়াছি। ইহারও দুইটি কারণ, প্রথমত মৎপ্রণীত *A History of Brajabuli Literature* (১৯৩৫) গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আছে, দ্বিতীয়ত অন্যান্য কবিদিগের মতো করিয়া বৈষ্ণব পদকর্তাদের আলোচনা করিতে গেলে বইয়ের আকার দ্বিগুণিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য বৈষ্ণব কবিদের আলোচনায় যথাসম্ভব পুনরুক্তি বর্জন করিয়াছি।

এই গ্রন্থের কিছু অংশ বঙ্গশ্রী ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ধমান সাহিত্যসভায় মাসিক অধিবেশনেও কিছু কিছু অংশ পঠিত হইয়াছিল।...

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহে আমার পূর্ববর্তী মনীষী-দিগের কৃতিত্ব অসাধারণ। ইহাদের কেহ কেহ সুপরিচিত, কাহারো কাহারো নাম ঈষৎ পরিচিত, কিন্তু অধিকাংশের নাম হয়ত এখনকার দিনের পাঠক-সমাজের অজ্ঞাত। ইহারা নমস্য, কেননা যেকালে ইহারা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুসন্ধান-কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তখন তাহাতে ডিগ্রী অথবা জীবিকা কিছুই লাভ হইত না, বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর অপরিসীম অনুরাগই ইহাদিগকে প্রেরণা যোগাইয়াছিল।...

বইটির মুদ্রিত কতক অংশ (৭৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে অভিমত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত পত্রে জানাইয়াছেন তাহা বহুমান্য শিরোভূষণ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা
৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

শ্রীসুকুমার সেন

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ অখণ্ডিতভাবে বাহির করা গেল না। পূর্বার্ধমাত্র প্রকাশিত হইল। ইহাতে ষোড়শ শতাব্দের শেষ পর্যন্ত আলোচনা আছে।

প্রস্তুত সংস্করণ আদ্যোপান্ত পুনর্লিখিত। পরিচ্ছেদের সংখ্যা এবং বিষয় পরিবর্তিত হইয়াছে। বস্তু সবই ঠিক আছে। ইতিমধ্যে যা-কিছু নূতন বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। কোন কোন বিষয় নূতনভাবে আলোচিত হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ের আলোচনা পূর্ণতর করা গিয়াছে।

শ্রীমান্ মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায় মল্লসারুল অনুশাসনের মুদ্রায় অঙ্কিত মূর্তি এবং লক্ষ্মণসেনের আমলের চণ্ডীমূর্তি রেখাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। সেজন্য আমি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে শুদ্ধিপত্রের একটু কাজ সারিয়া নিই। শ্রীমান্ মৃদুলের আঁকা ছবি দেখিবার আগে আমি মুদ্রার মূর্তিটিকে বরুণের ও পিছনের চাকাটিকে বরুণের জাল মনে করিয়াছিলাম। ১৪ পৃষ্ঠায় "পিছনে ছড়ানো জাল।...এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া" অংশটুকু বাদ দিতে হইবে। এখন বোঝা যাইতেছে যে মূর্তিটি অশ্বারোহীর, তাঁহার এক হাতে রাশ অপর হাতে কশা। পিছনের যে চাকা তাহা সূর্যের একচক্র রথের প্রতীক হইতে পারে। ধর্মঠাকুর ও সূর্যদেবতা অভিন্ন। সুতরাং মূর্তিটিকে ধর্মরাজের বলিলে দোষ হয় না। বাঙ্গালা দেশে আঁকা ছবি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে এইটিই সবচেয়ে পুরানো। এদিকে প্রতিমাশিল্পবিদ্ পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

চতুর্থ সংস্করণে অবহট্‌ঠ কবিতার প্রসঙ্গে কিছু নবাবিষ্কৃত বস্তু আলোচিত হইয়াছে। অতিরিক্ত কয়েকটি চিত্রও সংযোজিত হইল।

২৭ এপ্রিল ১৯৬৩

পঞ্চম সংস্করণে উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব দুইটি—মুকুন্দরামের আত্মপরিচয়ের পর্যালোচনা এবং গোধা-লাঞ্ছন চণ্ডীমূর্তির চিত্র। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ হাজরার সৌজন্যে প্রাপ্ত এই অভিনব চণ্ডীমূর্তিটির ফোটোগ্রাফ তুলিয়া দিয়াছেন অধ্যাপক শ্রীমান্ সৌম্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, ডি-ফিল। ইনি আগেকার সংস্করণের ছবিও তুলিয়াছিলেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ **শ্রীসুকুমার সেন**

বিষয়সূচী

সংকেত-সূচী

এ = এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি (নিজস্ব সংগ্রহ)
ক = কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি
গ = এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি (গভর্নমেণ্ট সংগ্রহ)
প = বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পুথি
প-ক-ত = পদকল্পতরু
ব-সা-প = বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ
(ব-) সা-প-প = (বঙ্গীয়) সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা
বা-প্রা-পু-বি = বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ
(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত)
র-সা-প-প = রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা
স = বর্ধমান সাহিত্যসভার সংগ্রহ
HBL = *History of Brajabuli Literature.*

শুদ্ধিপত্র

পৃ ৮৩ ছত্র ১৪ : 'দন্তিব্যূহং' পঠিতব্য।
পৃ ৩২১ পাদটীকা ১ : 'পদাবলী' স্থলে 'পদ্যাবলী' পঠিতব্য।
পৃ ৪৪৫ পাদটীকা ১ : Grouse স্থলে Growse পঠিতব্য।
পৃ ৪৭৫ পাদটীকা ৩ : 'অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ' স্থলে 'তারাপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ' পঠিতব্য।

চিত্রসূচী

ওঁ

Mangpoo P.O.
(Darjeeling dist.)

কল্যাণীয়েষু

কিছুকাল থেকে দৃষ্টি-
ক্ষীণতাবশত ছাপার বা লেখার অক্ষর পড়া
এখন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছে।
তবু তোমার সুকুমার সেনের রচিত বাংলা
সাহিত্যের ইতিহাসের মুদ্রিত যে অংশটুকু
আমার হাতে এসেছে ধীরে ধীরে তা আমি
পড়ে শেষ করেছি। শেষ পর্যন্ত
আমার ঔৎসুক্য জাগরূক ছিল। বাংলা
সাহিত্যের সমগ্র পরিচয়ের এমন পরিপূর্ণ চিত্র
ইতিপূর্বে আমি পড়িনি। গ্রন্থকার
তাঁর বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত পুস্তক
গুলি থেকে যে দীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত করে দিয়েছেন

তাতে করে তাঁর গ্রন্থ এক সঙ্গে ইতিহাসে এবং সঙ্কলনে সম্পূর্ণরূপ হয়েছে। সেই কারণে এই গ্রন্থ ছাত্রদের প্রয়োজন সিদ্ধ করবে এবং সাহিত্যরসসন্ধানীদের পরিতৃপ্তি দেবে। এই গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় বর্ণিত হওয়াতে রচনার মূল্যবৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থকারকে আমার সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাই।

* * *

ইতি ৪।৫।৪০ তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

১

ভাষা লইয়া দেশ। যে দেশের ভাষা বাঙ্গালা তাহাই বাঙ্গালা দেশ। বাঙ্গালা ভাষার যখন উৎপত্তি হয় তখন সে ভাষা আধুনিক বাঙ্গালা দেশের সীমানা ছাপাইয়াও খানিক দূর অবধি বিস্তৃত ছিল। বাঙ্গালা ভাষা যাহা হইতে অব্যবহিতভাবে উৎপন্ন সেই প্রত্ন-বাঙ্গালা-অসমিয়া-উড়িয়া ভাষার ক্ষেত্র আরও বিস্তীর্ণ ছিল। তাহারও আগে যে ভাষা ছিল সেই পূর্বী "অবহট্‌ঠ" বাঙ্গালা-অসমিয়া-উড়িয়ার মতো মৈথিলী-মগহী-ভোজপুরিয়ারও জননী। সে ভাষা সমগ্র পূর্ব-ভারতে—পশ্চিমে কাশী পর্যন্ত—প্রসারিত ছিল।

বাঙ্গালা নামটি মুসলমান অধিকারকালের গোড়ার দিকেই চলিত হইয়াছিল। ফারসী "বঙ্গালহ্" হইতে পোর্তুগীস Bengala ও ইংরেজী Bengal আসিয়াছে। মুসলমান অধিকারের আগে বাঙ্গালা দেশের কোন নির্দিষ্ট নাম ছিল না। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দ হইতে এদেশ সমগ্রভাবে সাধারণত গৌড় অথবা গৌড়-দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইত। তাহার আগে বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল।

খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দে মহাভাষ্য-রচয়িতা পতঞ্জলি পূর্ব-ভারতের তিনটি বিভাগ উল্লেখ করিয়াছিলেন—অঙ্গ, বঙ্গ ও সুহ্ম। অধুনা এখন অঙ্গের বেশি ভাগই বিহারে পড়িয়াছে, অল্প ভাগ—মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম—বাঙ্গালায়। বঙ্গ হইল জলময় অঞ্চলগুলি। সুহ্ম বীরভূমের উত্তরাংশ বাদে বর্ধমান বিভাগ। রঘুর দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে কালিদাস যে তিন অঞ্চলের উল্লেখ করিয়াছেন সে হইল সুহ্ম, বঙ্গ ও কামরূপ। তাঁহার উল্লিখিত কামরূপের মধ্যে উত্তরপূর্ব বাঙ্গালার খানিকটা পড়ে। 'বঙ্গ' (যাহা হইতে 'বঙ্গালহ্' ও 'বাঙ্গালা' আসিয়াছে) ছিল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অনূপ অঞ্চল, এখনকার সুন্দরবন-যশোর-খুলনা-ফরিদপুর-ঢাকা-ময়মনসিংহ। বঙ্গের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল—আধুনিক

[১] এ ভাষাকে "পরবর্তী কালের শৌরসেনী অপভ্রংশ"ও বলা হয়। তবে এ নাম সঙ্গত নয়। "অবহট্‌ঠ" নামটিও সম্পূর্ণ সঙ্গত নয়। অবহট্‌ঠ স্থানে প্রত্ন-নব্য-আর্যভাষা বলা উচিত।

ত্রিপুরা-সিলেট-নোয়াখালি অঞ্চল—'সমতট' নামে পরিচিত থাকিলেও সাধারণত বঙ্গের মধ্যেই ধরা হইত। উত্তর ও উত্তরমধ্য বঙ্গের নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। পুণ্ড্রবর্ধনের সীমানা ছিল গঙ্গার দক্ষিণ তীর। উত্তর তীরস্থ অঞ্চল পরে "বরেন্দ্র" বা "বরেন্দ্রী" নাম পায়। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও পূর্বের সীমানা ছিল গঙ্গা। এ অঞ্চলের পুরানো নাম ছিল সুহ্ম। নবম-দশম শতাব্দ হইতে সুহ্মের বদলে রাঢ় ("রাঢ়া") নাম চলিতে থাকে।[১] রাঢ় আবার দুই বিভিন্ন অংশে বিভক্ত—দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ়। অজয়ের ও দামোদরের উত্তরে উত্তর রাঢ়, অজয়ের পূর্বে ও দামোদরের দুইপাশে, দক্ষিণে ও পূর্বে, দক্ষিণ রাঢ়। (সেকালে দামোদর ত্রিবেণী-কালনার মাঝামাঝি স্থানে গঙ্গায় গিয়া পড়িত।) পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দ হইতে রাঢ় দেশ বলিলে প্রধানত উত্তর রাঢ়ই বুঝাইত। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দে উত্তররাঢ়া এবং দক্ষিণরাঢ়া বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত দুই "মণ্ডল" ছিল। গুপ্ত-রাজাদের শাসনকালে তাঁহাদের অধিকৃত উত্তর মধ্য দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গ দুইটি "ভুক্তি"তে (অর্থাৎ নির্দিষ্ট রাজস্বসংগ্রহ ভূখণ্ড)[২] বিভক্ত ছিল। মোটামুটিভাবে ভাগীরথীর উত্তর ও পূর্ব তীরস্থ প্রদেশ ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে আর দক্ষিণ ও পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ ছিল বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। সেন-রাজাদের আমলে বর্ধমানভুক্তির আয়তন কমিয়া যায় এবং ইহার উত্তরপশ্চিমাংশ লইয়া কঙ্কগ্রাম-ভুক্তি এবং দক্ষিণপশ্চিমাংশ লইয়া দণ্ডভুক্তির সৃষ্টি হয়।[৩]

"বঙ্গ" নামটির অর্থ লইয়া পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, নামটির মূলে ছিল চীন-তিব্বতী-গোষ্ঠীর কোন শব্দ। ইহারা শব্দটির "অং" অংশের সঙ্গে 'গঙ্গা' 'হোয়াংহো' 'ইয়াংসিকিয়াং' ইত্যাদি নদীনামের "অং" অংশের সম্বন্ধ ধরিয়া অনুমান করিয়াছেন যে শব্দটির মৌলিক অর্থ ছিল জলাভূমি। (আড়াইহাজার-তিনহাজার বছর আগে বাঙ্গালা দেশের বেশির ভাগই জলাভূমি ও জঙ্গল ছিল—বিশেষ করিয়া ভাগীরথীর পূর্ব ও পূর্বোত্তর পার।) এ অর্থ অত্যন্ত আনুমানিক নিশ্চয়ই, তবে অসম্ভব নয়। 'বঙ্গ' শব্দ ঋগ্বেদে নাই। ইহা সর্বপ্রথম মিলিতেছে ঐতরেয়-আরণ্যকে (২-১-১-৫)।

---

[১] অনুমান হয় মূলে 'রাঢ়' শব্দটির এক অর্থ ছিল 'রক্তমৃত্তিকার দেশ এবং সেদেশের অধিবাসী'। আর এক অর্থ ছিল 'দুর্ধর্ষ'। এই দুই অর্থই খাটে।

[২] 'ভুক্তি' শব্দটির মূল অর্থ ছিল সামন্ত রাজাকে অথবা প্রাদেশিক গভর্নরকে ("উপরিক") উপজীব্যরূপে দেওয়া ভূভাগ। তাহার পরে অর্থ হইয়াছিল রাজস্ব-বিভাগ (revenue unit, এখনকার ডিভিজন)।

"প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মায়ন্" (অর্থাৎ তিনটি জীব অথবা মানব জাতি বিনষ্ট হইয়াছিল)—এই ঋগ্বেদীয় শ্লোকাংশের ব্যাখ্যারূপে সেখানে বলা হইয়াছে, "যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চের-পাদাঃ", অর্থাৎ 'এই যে তিনটি জীবজাতি নষ্ট হইয়াছিল তাহারা এইসব পাখি—বঙ্গেরা, বগধেরা, চেরপাদেরা (অথবা, এবং ইরপাদেরা)।' এখানে সোজাসুজি মানে হইতে পারে এই যে, তিন (আর্যভাষী?) জাতির মানুষ বন্য বনিয়া গিয়া পাখির মত যাযাবর হইয়াছিল।[১] এ যদি রূপকথা হয় তো বলিবার কিছু নাই। মানুষের পাখি হইয়া উড়িয়া যাওয়া গল্পে অজানা নয়। যদি রূপকের কথা হয় তবে অনুমান করিতে পারি যে এখানে তিন পক্ষিসদৃশ যাযাবর জাতির উল্লেখসূত্রে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে ইহারাও একদা পরিজ্ঞাত (আর্য-ভাষী অথবা অন্-আর্যভাষী) ঘরবাসী মানব সমাজের মধ্যে ছিল। রূপক অর্থ গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতেরা এখানে তিনি অন্-আর্যভাষী ভারতীয় জাতির নাম অনুমান করিয়াছেন—বঙ্গ, বগধ এবং চেরপাদ (বা ইরপাদ)। বঙ্গের বেলায় কোন গোল নাই। আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে, অধিকাংশ দেশনাম জাতি-নাম হইতে আগত। (সেইজন্য সংস্কৃতে দেশনামে সাধারণত বহুবচন হয়। যেমন, "অস্তি মগধেষু চম্পকবতী নামারণ্যানী", "বঙ্গেষু আহববর্তিনঃ" ইত্যাদি।) সুতরাং বঙ্গজাতির অধ্যুষিত অঞ্চল 'বঙ্গ' দেশ। অথবা বঙ্গে—জলময় দেশে—যাহারা পূর্বাপর বাস করিত তাহারা 'বঙ্গ', এবং পরে তাহাদের নিবাসভূমি 'বঙ্গ' দেশ। "বগধ" নামটিকে পরবর্তী কালের "মগধ" নামের পূর্বরূপ বলিয়া নেওয়া হয়। "চের-পাদ"এর (বা "ইরপাদ"এর) কোন সুসঙ্গত ব্যাখ্যা নাই।

'বঙ্গ'-শব্দজাত 'বঙ্গাল' শব্দটি পাইতেছি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দ হইতে। দ্বাদশ শতাব্দের এক অনুশাসনে "বঙ্গাল-বল" (অর্থাৎ বাঙ্গাল রাজার সৈন্য) কর্তৃক নালন্দার একটি বিহার ধ্বংসের উল্লেখ আছে। এই সময়ের এক কবিও "বঙ্গাল" নামে পরিচিত ছিলেন। অনেকে মনে করেন যে 'বঙ্গাল' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ, "-আল" প্রত্যয়যোগে গঠিত। তাহা অসম্ভব নয়। শব্দটি অর্বাচীন নয়। মনে হয় "রাখাল, গোয়াল, ঘোষাল, সাঁওতাল" ইত্যাদির মতো 'বঙ্গাল' শব্দও "পাল"-অন্তক সমাসনিষ্পন্ন শব্দের তদ্ভব রূপ। অর্থাৎ "বঙ্গপাল" (—বঙ্গদেশের

---

[১] ইংরেজী করিয়া বলিলে, ran wild ; নশ্ ধাতুর অর্থ বৈদিক ভাষায় এবং প্রাচীন সংস্কৃতে 'হারাইয়া যাওয়া, লুপ্ত হওয়া, পলাইয়া যাওয়া, ধ্বংস হওয়া'।

বা জলাভূমির রক্ষক, বাসিন্দা) হইতে "বঙ্গাল" উদ্ভূত।[১] উত্তরপ্রদেশে কৌশাম্বীর নিকটে পভোসায় প্রাপ্ত একটি গুহালিপিতে (—লিপিকাল আনুমানিক প্রথম শতাব্দ—) অধিচ্ছত্রার রাজা "বঙ্গপাল" উল্লিখিত আছে। লিপিটি করাইয়াছিলেন বঙ্গপালের পুত্র আষাঢ়সেন। অর্থ যাহাই হউক, "বঙ্গপাল" শব্দ এই প্রথম পাওয়া গেল।[২] সমগ্র বাঙ্গালা দেশ বুঝাইতে "গৌড়বঙ্গাল" শব্দটি 'মানসোল্লাস'এর গজবন-বিভাগে উল্লিখিত আছে।

'পুণ্ড্রবর্ধন'এর পুণ্ড্র জাতির নাম পাওয়া গিয়াছে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৭-১৮) অন্ধ্র-পুলিন্দ-শবর প্রভৃতি ব্রাত্য ও দস্যুভূয়িষ্ঠ জাতির সঙ্গে। 'পুণ্ড্র' নাম হইতেই বাঙ্গালায় আখের নাম "পুঁড়" এবং একজাতের (দেশি) আখের নাম "পুঁড়ি" হইয়াছে। এই সূত্রে আখবাড়ির দেবতাও "পুণ্ড্রাসুর" নাম পাইয়াছিল। খাশ বাঙ্গালা দেশে সবচেয়ে যে পুরানো লেখা পাওয়া গিয়াছে তাহা একটি পাথরের চাকৃতি। তাহাতে যে লিপি আছে তাহার অক্ষর অশোকের লিপির সমসাময়িক (খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দ)। এই লিপিতে "পুণ্ড্রনগর" উল্লিখিত। এই পুণ্ড্রনগরই পরবর্তী কালে 'পুণ্ড্রবর্ধন' নাম পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। অশোকের সময়ে যে এখানে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের কেন্দ্র ছিল তাহার প্রমাণ আছে।[৩]

'সুহ্ম' এই দেশনামের উল্লেখ পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দ) আছে, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রেও আছে। কালিদাস পশ্চিমবঙ্গকে সুহ্ম বলিয়াছেন। অষ্টম-নবম শতাব্দ পর্যন্ত এবং তাহার পরেও পশ্চিমবঙ্গ প্রধানত 'সুহ্ম' নামেই পরিচিত ছিল। দণ্ডী তাঁহার দশকুমারচরিতে তাম্রলিপ্ত (বা দামলিপ্ত) নগরকে সুহ্মের অন্তর্গত বলিয়াছেন।

'রাঢ়' শব্দটি মূলে জাতিবাচক ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু এ অনুমানের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ নাই। (সংস্কৃত সাহিত্যে এবং অনুশাসনে "রাঢ়াঃ" অথবা "রাঢ়েষু" পাই না, পাই স্ত্রীলিঙ্গ একবচন, "রাঢ়া" "রাঢ়ায়াম্"।) খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষের দিকে দক্ষিণরাঢ়ায় ভূরিশ্রেষ্টি গ্রাম নিবাসী ভট্ট শ্রীধর সেকালের একজন প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণমিশ্রের

---

[১] রাঢ়ের মতো বঙ্গালও নিন্দাবাচক শব্দ ছিল। 'বঙ্গাল' মানে 'দুর্ধর্ষ, নিঃস্ব অতএব বেপরোয়া; তুলনীয় জিপ্‌সী ভাষার ওয়েল্‌শ্‌ উপভাষায় 'বেঙ্গালী জুবেল্' মানে অসতী নারী।

[২] এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা ২০; সা-প-প ৩৯ পৃ ১৩৯-৫২। সংস্কৃতে "চারপাল", "দ্বারপাল", "পুস্তপাল" ইত্যাদি শব্দ তুলনীয়।

[৩] কাউয়েল (Cowell) ও নীল (Neil) সম্পাদিত 'দিব্যাবদান' পৃ ৪১৭।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে "রাঢ়াপুরী"র উল্লেখ আছে এবং দক্ষিণরাঢ়ার ব্রাহ্মণদের কৌলীন্যগর্বের ও আচারশুচিতার প্রতি কটাক্ষ আছে।[১] যে কারণেই হোক, পরবর্তী কালে 'রাঢ়' (আধুনিক কালে "রেড়ো") নিন্দায় ব্যবহৃত। এই প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উক্তি স্মরণীয়। তিনি চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধ কালকেতুকে দিয়া বলাইয়াছেন

অতিনীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।

এখানে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে 'রাঢ়' জাতিবাচক নয়।[২]

'গৌড়' নাম পাণিনির সূত্রে (৬-২-১০০) আছে। মনে হয় দেশের নাম। কিন্তু ঠিক বাঙ্গালা দেশের অথবা বাঙ্গালা দেশের অঞ্চল-বিশেষের নাম কিনা বলা যায় না। 'গোণ্ড' এই জাতিবাচক নামের সঙ্গে 'গৌড়' নামের যোগ থাকা সম্ভব। গোঁড়দের দেশ গৌড়। "পঞ্চ গৌড়" কথাটি হইতে মনে হয় উত্তর-ভারতের একাধিক অঞ্চল একদা গৌড় নাম পাইয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দের পূর্বেই বাঙ্গালা দেশের উত্তর অঞ্চল ও তত্রত্য শহর-বিশেষ এই নামে প্রসিদ্ধ হয়। শশাঙ্কের "গৌড়রাজ" খ্যাতি তাহার প্রমাণ। গৌড়দেশের লোক বুঝাইতে রাজশেখর (নবম শতাব্দ) "গৌড়" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সময়েও বাঙ্গালী জাতি বাঙ্গালার বাহিরে "গৌড়িয়া" নামে পরিচিত ছিল। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের গৌড়ী রীতি এবং প্রাকৃত ব্যাকরণের গৌড়ী ভাষা মোটামুটিভাবে বাঙ্গালা দেশকেই নির্দেশ করিতেছে ॥

২

অষ্টাদশ শতাব্দের আগে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ কোন নাম ছিল না। যাঁহারা প্রগাঢ় পণ্ডিত তাঁহারা ছাড়া প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষার নাম কেহ জানিতেন না। সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা দুইটি দেশীয় ভাষার নাম

---

[১] "জ্বলন্নিবাভিমানেন গ্রসন্নিব জগৎত্রয়ীম্।
ভর্ৎসয়ন্নিব বাগ্‌জালৈঃ প্রজ্ঞয়োপহসন্নিব।
তথা তর্কয়ামি নূনময়ং দক্ষিণরাঢ়াপ্রদেশাদাগতো ভবিষ্যতি ॥"
'(লোকটা) যেন অভিমানে জ্বলিতেছে, ত্রিজগৎ যেন গ্রাস করিবে, কথার তোড়ে যেন তিরস্কার করিতেছে, জ্ঞানে বুদ্ধিতে যেন (সকলকে) উপহাস করিতেছে। ইহাতে অনুমান করি, নিশ্চয়ই ও দক্ষিণরাঢ়া প্রদেশ হইতে আসিয়া থাকিবে ॥'

[২] দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য। উড়িয়া ভাষায় "রাঢ়ুনী" মানে নিষ্ঠুর স্ত্রীলোক।

জানিতেন। এক সংস্কৃত,—শাস্ত্রের ও পাণ্ডিত্যের ভাষা; আর,—মাতৃভাষা অর্থাৎ বাঙ্গালা। দ্বিতীয় ভাষাকে তখন উল্লেখ করা হইত "দেশি", "লৌকিক", "প্রাকৃত" (বা "পরাকৃত") ভাষা, অথবা শুধু "ভাষা" বলিয়া। যেমন

শ্রীকর নন্দী (আদি ষোড়শ শতাব্দ)

দেশি ভাষে এহি কথা করিয়া প্রচার
সঞ্চরউ কীর্ত্তি মোর জগৎ-ভিতর।

মাধব আচার্য (মধ্য ষোড়শ শতাব্দ)

ভাগবত সংস্কৃত না বুঝে সর্বজনে
লোক-ভাষা রূপে কহি সেই পরমাণে।

রামচন্দ্র খান (মধ্য ষোড়শ শতাব্দ)

সপ্তদশ পর্ব-কথা সংস্কৃতে বন্ধ
মূর্খ বুঝাইতে কৈল পরাকৃত ছন্দ।

কবিশেখর (আদি সপ্তদশ শতাব্দ)

কহে কবিশেখর করিয়া পুটাঞ্জলি
হাসিয়া না পেলাহ লৌকিক ভাষা বলি।

দৌলৎ কাজী (মধ্য সপ্তদশ শতাব্দ)

দেশি ভাষে কহ তাক পাঞ্চালীর ছন্দ
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয়ে সানন্দ।

ভারতচন্দ্র রায় (মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দ)

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।

পোর্তুগীস লেখকেরা বাঙ্গালার ভাষা বলিয়াছেন "বেঙ্গালা" (Bengala)।[১] "বাঙ্গালী ভাষা" বলিয়াছেন ইংরেজ লেখকেরা। শ্রীরামপুর মিশনে ছাপা (১৮০৩) কৃত্তিবাসের রামায়ণের নামপৃষ্ঠায় আছে "কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল"। জয়নারায়ণ ঘোষাল (১৮১২) "বাঙ্গালা" ও "বাঙ্গালী ভাষা" দুইই লিখিয়াছেন।

বাঙ্গালাতে কাশীদাসী সংক্ষেপে কহিল।

বাঙ্গালা ভাষাতে লীলা করিতে রচন
রঘুনাথ ভট্ট আদি মিলিল সুজন।

---

[১] তুলনীয় 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ'—Bengallate (=বাঙ্গালাতে, অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায়), Bengalli (=বাঙ্গালী, অর্থাৎ বাঙ্গালার অধিবাসী)।

উনবিংশ শতাব্দের গোড়ার দিকে পণ্ডিত লেখকেরা "গৌড়ীয় ভাষা" বলিতেন। রামমোহন রায়ের ব্যাকরণের নাম 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ' (১৮৩৩)। "বঙ্গভাষ" প্রয়োগ হইয়াছে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে।[১] তাহার পরে "বঙ্গভাষা"। "বাঙ্গালী ভাষা" রাজেন্দ্রলাল মিত্রও লিখিতেন। "বাঙ্গালী" ভাষার স্থানে "বাঙ্গালা" ভাষা আস্সুম্প্সাওঁ প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন, বলিয়া মনে হয়। তবে আধুনিক কালে বিদ্যাসাগর "বাঙ্গালা" ভাষাই বরাবর লিখিয়াছেন। রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' নাম হইতে জানা যায় যে ১৮৭২ সালেই 'বাঙ্গালা' একচ্ছত্র হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন, কেন "বাঙ্গালী" ভাষা—যাহা সম্ভবত ইংরেজী Bengali language হইতে উদ্ভূত অথবা প্রতিফলিত—'বাঙ্গালা' হইল। মনে হয়, প্রধান কারণ অর্থদ্বন্দ্ব এড়ানো। অষ্টাদশ শতাব্দের গোড়ার দিকেই দেখিতেছি যে বাঙ্গালা দেশের লোক বুঝাইতে "বাঙ্গালী" শব্দ চলিয়া গিয়াছে।[২] এখন, একই শব্দ জাতি ও ভাষা অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকিলে অসুবিধা হয় অথচ বাঙ্গালা (দেশের) ভাষা—সমাস করিয়া লইলে কোনই অসুবিধা হয় না॥

৩

বাঙ্গালা ভাষার মূল প্রাচীন ভারতীয়-আর্য (অর্থাৎ সংস্কৃত) ভাষা। যতদূর জানা আছে এবং যতটা সঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় তাহাতে বুঝি যে এদেশে আর্যভাষা কম পক্ষে খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতাব্দ হইতে প্রচলিত আছে। এদেশে আর্যভাষা আসিবার আগে কী ভাষা প্রচলিত ছিল তাহা জানা নাই। ঐতিহাসিক কালের গোড়া থেকে এখন অবধি এদেশের অভ্যন্তরভাগে যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা বলা হয় তাহার কোন একটি, দুইটি অথবা সব কয়টি এদেশে বলা হইত,—এমন অনুমান কেহ কেহ করিয়াছেন। বাঙ্গালা-অসমিয়া ভাষাদ্বয়ের উত্তর উত্তরপূর্ব ও পূর্ব প্রত্যন্তে তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা বলা হয়। এই ভাষা-ভাষী লোকেরা একদা আমাদের দেশে—অর্থাৎ পূর্ব ও উত্তর ভারতে—সংস্কৃতিকে যে কিছু পুষ্টি দিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বুদ্ধ শাক্যবংশীয়

---

[১] উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র রচিত 'গোলেবকাঅলি ইতিহাস'এ (১৮৪২) পাই

"পারস্য হইতে এই ইতিহাস সার
ইচ্ছা হৈল বঙ্গভাষে করিতে প্রচার।"

[২] বিষ্ণু পাল, আস্সুম্প্সাওঁ এবং রামানন্দ যতী। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে "বাঙ্গালি" বলিতে বিশেষ ধরণের লাঠিখেলা ও বিশেষ রকমের খ'ড়ো ঘর (Bungalow) বুঝাইত।

ছিলেন, তাঁহার শক্তিশালী শিষ্যদের অনেকে বজ্জি ও লিচ্ছবি-বংশীয় ছিলেন, গুপ্ত-সম্রাটেরা লিচ্ছবি-বংশের দৌহিত্র। শাক্য-বজ্জি-লিচ্ছবি—ইহারা মূলে তিব্বত-চীনীয় ভাষী ছিল। কিন্তু খাশ বাঙ্গালা দেশে যে তিব্বত-চীনীয়-ভাষী ('কিরাত') লোক অনেক আগে বাস করিত তাহার প্রমাণ নাই। প্রমাণ যাহা পাওয়া যায় তাহাতে বুঝি যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে হিমালয়পাদবাসী তিব্বত-চীনীয়-ভাষীরা নামিয়া আসিয়া আর্যভাষা ও সংস্কৃতি স্বীকার করিয়া বাঙ্গালী বনিয়াছিল। যেমন—কোঁচ মেচ রাজবংশী ইত্যাদি। তবে পূর্ববঙ্গের এক-আধটি স্থান-নামে (যেমন, বানিয়াচঙ্গ) তিব্বত চীনীয় ভাষার চিহ্ন থাকায় মনে করিতে পারি পূর্বকালে এসব অঞ্চলে হয়ত তিব্বত-চীনীয় ভাষী কিরাত জাতির পটি বা "পকেট" ছিল।

বাঙ্গালার দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম প্রত্যন্তে সাঁওতাল প্রভৃতি অষ্ট্রিক-ভাষী জাতির বাস। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে আর্য-ভাষীদের আগমনের আগে ইহারাই পশ্চিমবঙ্গে বাস করিত। এ অনুমানের বিরুদ্ধে এইটুকু বলিবার আছে যে, ঐতিহাসিক কালে সমগ্র বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া অষ্ট্রিক-ভাষীদের থাকিবার কোন প্রমাণ নাই।[১] অষ্ট্রিক-ভাষীরা প্রত্যন্তে থাকিয়া আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি যথাসম্ভব অধিগত করিয়া ক্রমশ বাঙ্গালী হইয়াছে। এ ব্যাপার এখনো চলিতেছে। চাষের কাজে আমদানি-করা সাঁওতাল মজুর এদেশে বসতি করিয়া বাঙ্গালা-ভাষী হইতেছে। বাঙ্গালা দেশের বাহিরে আসামে অবশ্য অষ্ট্রিক-ভাষীদের একটি পটি আছে। সে হইল খাসী।

বাঙ্গালা দেশের প্রায় মাঝখানে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার একটি পটি আছে,—রাজমহল পাহাড়ের দুর্গম অংশে কথিত মাল্‌তো-মালপাহাড়ী ভাষা। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা দক্ষিণ ভারতে, দাক্ষিণাত্যে ও মধ্য ভারতেই নিবদ্ধ। এত দূরে সে ভাষার অবস্থান পণ্ডিতেরা প্রাক্-আর্য যুগে বাঙ্গালা দেশে দ্রাবিড়-ভাষীর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এ অনুমানের বিরুদ্ধে প্রবলতর যুক্তি আছে। মাল্‌তো কানাড়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এমনও হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয় যে একদা কানাড়ী-ভাষী কিছু লোক এখানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল এবং তাহারাই মাল্‌তো ভাষার জনক। মিথিলায় বহুকাল ধরিয়া কর্ণাট-রাজবংশের অধিকার ছিল। বাঙ্গালার সেন-

---

[১] বাঙ্গালায় অষ্ট্রিক ভাষার কয়েকটি শব্দ আছে। সেগুলি প্রায় সবই পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষাতেই লভ্য।

রাজারাও আসলে কর্ণাটী। "বল্লাল" নাম তো কানাড়ী ভাষার। সুতরাং কানাড়ী সিপাইদের পক্ষে রাজমহলে বুনো বনিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

দ্রাবিড় ভাষার শব্দ কিছু কিছু বাঙ্গালায় আছে। কিন্তু এগুলি বহিরাগত দ্রাবিড়-ভাষীদের ফোড়ন, না পূর্বপ্রচলিত দ্রাবিড়-ভাষার তলানি, তাহা নির্ণয় করা শক্ত। কয়েকটি দ্রাবিড় শব্দ সরাসরি প্রাকৃত হইতে কিংবা প্রাকৃতের মধ্য দিয়া সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। দক্ষিণপশ্চিম-বঙ্গের সমুদ্রোপকূল অঞ্চলে আগে দ্রাবিড় জাতির বসতি ছিল বলিয়া সন্দেহ হয়। "তাম্রলিপ্ত" বা "দামলিপ্ত" (প্রাকৃতে "দামলিত্ত") এই স্থাননাম এবং "তামলি" এই জাতিনাম "তামিল" বা "দমিল" (দ্রাবিড়) হইতে আগত হইতে পারে। তামলিরা কখনো তাম্বূলের ব্যবসা করে নাই, আর কদাচ তাম্বূলের (অর্থাৎ পানের) চাষ অথবা ব্যবসার কোন উল্লেখ এ জাতির প্রসঙ্গে নাই। যাহারা পানের চাষ করিত তাহারা বারই (বারুই)। পান-বেচাও তাহাদেরই কর্ম। তামলিরা সম্ভবত সমুদ্রযাত্রী বণিক ছিল। এ কাজ তামিলেরা চিরকাল করিয়া আসিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রাম-নামের আর্য-ভাষাসম্মত ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এ-সব নাম এদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী অষ্ট্রিক- ও দ্রাবিড়-ভাষীদের দেওয়া। নামগুলির অষ্ট্রিক- ও দ্রাবিড়-ভাষা সম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া গেলে তবেই এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসা যাইবে।

এখনকার দিনের অনুন্নত বাঙ্গালী জাতিগুলি, সব না হইলেও অধিকাংশ, গোড়ায় অনার্য (অর্থাৎ অনার্য-ভাষী) ছিল, এমন ধারণা পণ্ডিতসম্মত বটে। কিন্তু এ ধারণা সর্বাংশে ইতিহাসসঙ্গত নয়। চণ্ডাল ও ডোম দুই জাতিই বরাবর আর্য-ভাষী ছিল। দ্বাদশ শতাব্দের এক বৌদ্ধপণ্ডিতের উক্তি অনুসারে জানিতেছি যে চণ্ডালেরও উপবীত-সংস্কার ছিল।[১] আর্য-ভাষী ডোমদের কয়েকটি দল দুইহাজার-দেড়হাজার বছর আগে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া ইরানে চলিয়া যায় এবং সেখান হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ইউরোপে পৌঁছে। ইহাদেরই ইংরেজী নাম জিপ্‌সি। ইহারা নিজেদের বলে "রোম" (=পুরুষ), "রোম্‌নী" (=নারী)। শব্দ দুইটি আসলে "ডোম্ব" ও "ডোম্বিনী"। ইহারা নৃত্যগীতপ্রিয়

---

১ "সব্যযজ্ঞোপবীতাদীনাং ধারণাৎ ভক্ষণাৎ নাস্তি ব্রাহ্মণচণ্ডালয়োর্ভেদঃ।" অদ্বয়বজ্রের 'দোহাকোষ-পঞ্জিকা'।

ছিল। ইহাদের আদি নিবাস যে পূর্ব-ভারত তাহা ইহাদের ভাষাবিচারে প্রতিপন্ন হয়॥[১]

৪

সাহিত্য ভাষা-নির্ভর। আগে ভাষা, পরে সাহিত্য। অথবা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য। যে ভাষা আদিম অথবা অনুন্নত তাহাতে সহসা সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। তবে যে ভাষা উন্নত কোন ভাষার রূপান্তর, তাহাতে সাহিত্যসৃষ্টি ভাষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঘটিবার পক্ষে বাধা নাই। বাঙ্গালা এইরকম একটি ভাষা। কথ্য সংস্কৃত হইতে কথ্য প্রাকৃত এবং ক্রমে তাহা হইতে বাঙ্গালার উৎপত্তি।

ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে কথ্য সংস্কৃতের যে রূপ প্রচলিত ছিল তাহা ক্রমে প্রাচ্য প্রাকৃতে রূপান্তরিত হয় খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দের অনেক কাল আগেই। আর্যাবর্তের অন্যত্র প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার তুলনায় প্রাচ্য প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে বেশি বিচ্যুত হইয়াছিল। এই প্রাচ্য প্রাকৃত কালবশে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যায় যে রূপ ধরিয়াছিল তাহাকে বলা যায় প্রাচ্য অপভ্রংশের অর্বাচীন রূপ প্রাচ্য "অবহট্ঠ" (<"অপভ্রষ্ট")। অবহট্ঠ পরে (আনুমানিক ১০০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি) তিনটি আঞ্চলিক আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষায় পরিণত হয়। পশ্চিমে বিহারী, উত্তরপশ্চিমে মৈথিলী এবং পূর্বে বাঙ্গালা-উড়িয়া। বিহারী ভাষা হইতে আধুনিক ভোজপুরী (পশ্চিম বিহারে) ও মগহী (দক্ষিণ বিহারে) উৎপন্ন। বাঙ্গালা ও অসমিয়া অনেক দিন ধরিয়া একই খাতে বহিয়াছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দ হইতে এই দুইটি ভাষা ভিন্ন পথ ধরিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষা জন্মলাভ করিবার আগে এদেশে ভদ্র সাহিত্যের সাধু ভাষা ছিল সংস্কৃত। সংস্কৃত প্রথম হইতেই ছিল উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির ব্যবহার্য ভাষা। ভদ্র ও সাধু সাহিত্যের লেখক ও পাঠক উভয়েই পণ্ডিত। উপরন্তু সংস্কৃত সাহিত্য ছিল ভারতবর্ষের সব প্রদেশের সাহিত্যের সাধারণ মূলধন, যেমন সংস্কৃত ছিল সব ভারতীয় ভাষার অক্ষয় ভাণ্ডাগার। সুতরাং সংস্কৃতে ব্যাপক সাহিত্যসৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই হইয়াছিল।

প্রাকৃতের চর্চা বাঙ্গালা-দেশে যথোপযুক্ত হইত সন্দেহ নাই, যদিও সে রচনার নিদর্শন এখন প্রায় লুপ্ত। প্রাকৃত ভাষায় দুই একটি ভালো ব্যাকরণও

[১] 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (দশম সংস্করণ) পৃ ১৫৯ দ্রষ্টব্য।

এদেশে লেখা হইয়াছিল।[১] বাঙ্গালীর সংস্কৃত-চর্চায় প্রগল্‌ভতা ও প্রাকৃত-চর্চায় নিজস্বতা লক্ষ্য করিয়াই বোধকরি রাজশেখর এই উক্তি করিয়াছিলেন

পঠন্তি সংস্কৃতং সুষ্ঠু কুণ্ঠা প্রাকৃতবাচি চ।
বারাণসীতঃ পূর্বেন যে কেচিন্ মগধাদয়ঃ।
ব্রহ্মন্ বিজ্ঞাপয়ামি ত্বাং স্বাধিকারজিহাসয়া
গৌড়স্ত্যজতু বা গাথামন্যা বাস্তু সরস্বতী।[২]

'বারাণসীর পূর্বে মগধ প্রভৃতি দেশবাসীরা সংস্কৃত সুন্দরভাবে পড়ে কিন্তু প্রাকৃত বাক্যে তাহাদের জিহ্বা আড়ষ্ট।

হে রাজন্ নিজের অধিকারে জলাঞ্জলি দিয়াই বলিতেছি, হয় গৌড়ের লোক গাথা (রচনা) ছাড়িয়া দিন নয় সরস্বতী অন্য রূপ ধারণ করুন।'

বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যরচনা শুরু হইবার সময়ে, এবং তাহার পরেও অনেককাল অবধি (—ষোড়শ শতাব্দ পর্যন্ত—), উচ্চশিক্ষিত অর্থাৎ সংস্কৃত-জানা লেখক প্রধানভাবে সংস্কৃতেই কবিতা নাটক ইত্যাদি লিখিতেন। এইসব রচনায় সমসাময়িক ও পরবর্তী বাঙ্গালা সাহিত্যের বিষয়ের ও ভাবের বেশ কিছু পূর্বাভাস মিলে। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে সেসব রচনার কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কোন কোন সংস্কৃত রচনা—যেমন জয়দেবের কাব্য—সাক্ষাৎভাবে বাঙ্গালা ভাষায় (এবং অন্যান্য কোন আধুনিক আর্য-ভাষায়) পদাবলী-রচনায় উদ্দীপনা এবং মালমশলা জোগাইয়াছিল।

এদেশে প্রাকৃতে (প্রধানত অপভ্রংশ-অবহট্‌টে) লেখা অল্পস্বল্প কবিতা পাওয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালের (বাঙ্গালা) সাহিত্যের সম্পর্কে এসব রচনার মূল্য আছে॥

৫

জৈন-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর এবং বৌদ্ধ-ধর্মের শাস্তা বুদ্ধ দুইজনেই পূর্ব-ভারতের লোক, দুইজনেরই প্রথম ও প্রধান প্রচারভূমি প্রাচ্য দেশ—মগধ, মিথিলা ও অঙ্গ। সুতরাং এই দুই ধর্মের প্রবাহ বাঙ্গালার মাটিতে নামিতে বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু তাহার অনেক আগেই আসিয়াছিল পুরাতন আর্য-ধর্ম, যাহা এদেশে পরে অনেকটা বেদবাহ্য বলিয়াই গণ্য হইত। পূর্ব-ভারতে আর্য সংস্কৃতি প্রথমে এবং প্রধানভাবে গঙ্গা-ভাগীরথীর পথ বাহিয়া আসিয়াছিল।

---

[১] যেমন পুরুষোত্তমদেবের ব্যাকরণ (নেপালে পাওয়া পুথি) ও ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণের শেষ অধ্যায়। [২] কাব্যমীমাংসা ১-৭।

এইজন্য গঙ্গা-ভাগীরথীর দুই পাশেই বাঙ্গালায় আর্য সংস্কৃতির আদি অধিষ্ঠান-ভূমিগুলি অবস্থিত ছিল। অতএব বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রাচীন পীঠস্থানগুলি রাঢ় এবং বরেন্দ্র অঞ্চলে ছিল বলিয়া ধরিতে পারি। দুই অঞ্চলই প্রধানত লালমাটির দেশ।—ইহাও লক্ষণীয়।

ইরান হইতে ভারতবর্ষে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি দুই বা ততোধিক ধারায় আসিয়াছিল। প্রথমে যাহা আসিয়াছিল তাহাকে বলিতে পারি প্রাচীন (বা প্রাক্-বৈদিক) ধারা। পরে যাহা আসিয়াছিল তাহা অর্বাচীন বা বৈদিক ধারা। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে ঋগ্বেদ প্রাচীন ধারার এবং যজুর্বেদ ও ও ব্রাহ্মণ অর্বাচীন ধারার শাস্ত্র। প্রাচীন ধারার যে পুরানো শাখা "সদানীরা" নদী পার হইয়া "বিদেঘ" অর্থাৎ বিদেহ (আদি অর্থ—পর্বত-আড়ালহীন সমভূমি, অর্থাৎ বিহার-বাঙ্গালার গঙ্গা-বিধৌত উপত্যকা) ভূমিতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, সে ধারাকে অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে "আসুর" এবং "ব্রাত্য" বলা হইয়াছে। অসুর অনার্য নয়, দেবতার বড় ভাই, বুদ্ধিতেও সে ছোট নয়। শুধু তাহার বাণী বিকৃত হইয়া পড়ায় অসুর দেবতার কাছে বার বার হার মানিয়া "সদানীরা"-পারে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।[১] এই গল্প শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে। 'ওহে শত্রুগণ!' এই অর্থে "হেঽরয়ঃ" বলিতে গিয়া অসুরেরা "হেলয়ো" বলিয়া ফেলে। এই ভাষা-দুষ্টতা অপরাধে তাহাদের পরাজয় ঘটে। (এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রাচ্য অঞ্চলের প্রাকৃত-সংস্কৃত র-কার সাধারণত ল-কার হইয়াছে। সুতরাং এই অসুরদের আমরা পূর্বদেশে কোণঠাসা "পতিত" আর্য-ভাষীদের পূর্বপুরুষ বলিয়া ধরিতে পারি। ঐতরেয়-আরণ্যকে উল্লিখিত অত্যায়প্রাপ্ত তিন প্রজার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।

প্রাচীন বৈদিক ধারার আর্য-ভাষীরা সমাজরীতির দিক দিয়া দুই দলে বিভক্ত ছিল। প্রথম এবং প্রধান দলকে বলিতে পারি "গ্রাম্য" অর্থাৎ গ্রামবাসী। ইহারা "গ্রাম" লইয়া বাস করিত এবং যে "গ্রাম" গোড়ার দিকে যাযাবর ছিল। গ্রাম বলিতে—এক "কুলপতি" ব্রাহ্মণ গৃহস্থ, তাহার পরিবার, পরিজন, শিষ্য-সেবক, সহকারী, বিবিধ কর্মকর ও দাসদাসী। প্রয়োজন হইলে

[১] সদানীরা শব্দটি নাম নয়, বিশেষণ। মানে যাহার জল বারো মাস প্রবাহিত থাকে। পণ্ডিতেরা নদীটিকে গণ্ডক মনে করিয়া থাকেন। গঙ্গা মনে করিলে দোষ কী? বারাণসীর পর গঙ্গা-পারে যে বিশাল পার্বত্য জাঙ্গল ভূমি বাঙ্গালা দেশের কোল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে সেখানে যে অসুর সভ্যতার শেষ নীড় রচিত হইয়াছিল এমন মনে করিবার কারণ আছে।

গ্রাম লইয়া কুলপতি আর্যেরা একস্থান হইতে অন্যস্থানে উঠিয়া যাইত।[১] কৃষিকার্যের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে গ্রামের যাযাবরত্ব ঘুচিয়া যায়। তখন কুলপতি জমিদার বা জোতদার বনিয়া আধুনিক কালের অর্থে চাষী গৃহস্থ হয়। দ্বিতীয় দল, যাহাদের মর্যাদা গ্রাম্যদের তুলনায় অনেক কম ছিল, তাহাদের নাম ছিল "ব্রাত্য"। পরবর্তী কালে শব্দটির আসল অর্থ লোপ পাওয়ায় নিন্দার্থক অর্থ আসিয়া যায়, এবং তাহা হইতে "ব্রতবাহ্য" অর্থাৎ আর্য-সংস্কৃতিচ্যুত এই মানে দাঁড়াইয়া যায়। আসল মানে হইতেছে—ব্রাতের (অর্থাৎ সমূহের, গণের, কোনরকম দলের) অন্তর্গত। প্রথম দলে সামাজিক ইউনিট গ্রাম। সেখানে একজন কর্তা, আর সকলে তাহার পোষ্য। দ্বিতীয় দলের সামাজিক ইউনিট ব্রাত। সেখানে সকলের সমান অধিকার, তবে এক (বা একাধিক) ব্যক্তি প্রধান বলিয়া স্বীকৃত। ঐতিহাসিক কালে পৌঁছিয়া যেমন দেখি শাক্য বজ্জি লিচ্ছবি,—ইহারা সব যেন এক একটি ব্রাত (অথবা গণ)[২]।

এই রকম ব্রাত্যেরাই বাঙ্গালা দেশে আর্য-সংস্কৃতির প্রথম বাহক ছিল বলিয়া মনে হয়। তাহাদের ধর্মাচারে ও ধর্মচিন্তায় বহিরাগত অনেক কিছু মিশিয়া গিয়াছিল কিন্তু প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতির বীজ নষ্ট হইয়া যায় নাই। পূর্ব-ভারতে এবং অন্যত্র কোথাও কোথাও আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রথমে কী রূপ লইয়াছিল তাহার কিছু পরিচয় অথর্ববেদে আছে। এই ধর্ম পূর্ব-ভারতের (এবং বাঙ্গালা দেশের) নিজস্ব বলা যায়। পরে পশ্চিম হইতে আগত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ঢেউ তাহার উপর বারে বারে বহিয়া গিয়াছে, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের পলিও যথেষ্ট পড়িয়াছে। বাঙ্গালার নিজস্ব ধর্মের অনুষ্ঠানের কথা যথাস্থানে প্রসঙ্গক্রমে বলিব। আপাতত এই বলিলেই যথেষ্ট যে এখনকার বাঙ্গালীর ধর্মমত গুপ্ত-শাসনের সময় হইতে অনেকটাই সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশাসনে গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইতিহাসের পাতায় বাঙ্গালা দেশের পরিচয় গুপ্ত-শাসনের সময় হইতে একটু একটু করিয়া মিলিতেছে। তাহার পূর্বেকার বৃত্তান্ত প্রায় সবটাই আন্দাজের

---

[১] তুলনীয়, "শার্যাতো হ গ্রামেণ চচার"—'শার্যাত গ্রাম লইয়া ঘুরিতেছিলেন' (শতপথ-ব্রাহ্মণ)।

[২] ব্রাতের সঙ্গে গণের পার্থক্য মনে রাখিতে হইবে। গণের নেতা (বা কর্তা) একজন এবং বাকি সব সমান। ব্রাতের সঙ্গে প্রধান তফাৎ হইল এই যে ব্রাতের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বা জাতি হইতে আসিত, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভিন্নতা ছিল। তাহাদের একতা ছিল উদ্দেশ্যে ও ব্রাতপতির শাসনে। এখন যেমন কোন ধর্ম অথবা কর্ম সমাজের সভ্য। গণেরা ছিল সব বিষয়ে এক রকম, যেন ইউনিফর্ম-ধারী সৈন্য।

ব্যাপার। অশোকের সময়ের অক্ষরে লেখা প্রাকৃত লিপিটির পরেই বাঙ্গালা দেশে সবচেয়ে পুরানো প্রাপ্ত লেখা হইতেছে বাঁকুড়ার অনতিদূরে শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহালিপি। এটি সংস্কৃতে রচিত। লিপিকাল আনুমানিক ৪০০ খ্রীস্টাব্দ। গুহাটি বিষ্ণুর নামে উৎসৃষ্ট ছিল সন্দেহ নাই। নির্মাণ করাইয়াছিলেন পুষ্করণার অধিপতি মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মা। বাঙ্গালা দেশে বিষ্ণু-উপাসনার এইই প্রথম ঐতিহাসিক দলিল। পরে অবশ্য অনেক মিলিয়াছে। বরেন্দ্রভূমিতে এবং রাঢ়দেশে জৈনধর্মের বেশ প্রসার ছিল। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত অনুশাসন (৪৭৮ খ্রীস্টাব্দ) হইতে জানা যায় যে ব্রাহ্মণ নাথশর্মা ও তাঁহার স্ত্রী রামী, স্বগ্রাম বটগোহালীতে যে জৈনবিহার ছিল সেখানে, ভগবান্ অর্হংদের উদ্দেশে গন্ধ-ধূপ-পুষ্প-দীপ ইত্যাদি পূজোপচার ও "তলবাট" (অর্থাৎ তৈলবট, বা দক্ষিণা) নিমিত্ত দেড় বিঘা ("কুল্যবাপ") ভূমি দান করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা-বিহারের বৌদ্ধ বিহারগুলি সেকালে (অর্থাৎ গুপ্ত-শাসনের শেষভাগ হইতে) বিদ্যা ও সংস্কৃতি অনুশীলনের সর্বোত্তম কেন্দ্র ছিল। মুসলমান আক্রমণে বিধ্বস্ত হইবার পূর্বে আমরা এই মহাবিহারগুলির উল্লেখ (ও যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ) পাই,—দক্ষিণ বিহারে ওদন্তপুরী ও নালেন্দ্রা, বাঙ্গালা-বিহার সীমান্তে রাজমহলের কাছে বিক্রমশীল (ধর্মপাল-প্রতিষ্ঠিত), বরেন্দ্রীতে সোমপুর, মধ্যবঙ্গে জাগদ্দল, পূর্ববঙ্গে সুবর্ণভূমি, দক্ষিণরাঢ়ে পাণ্ডুভূমি ইত্যাদি। ইহা ছাড়াও অনেক গ্রামে বৌদ্ধ মন্দির (বা বিহার) ছিল। যেমন—রাঢ়ে কন্যারাম রামজাত ও বৈত্রবনা গ্রামে লোকনাথের, তাড়িহা গ্রামে তারা ঠাকুরানীর; বরেন্দ্রীতে হলদী গ্রামে লোকনাথের, রাণা গ্রামে ইচ্ছা ঠাকুরানীর; সমতটে জয়তুঙ্গ ও চম্পিতলা গ্রামে লোকনাথের; চন্দ্রদ্বীপে তারা ঠাকুরানীর; ইত্যাদি।

এদেশে শক্তিপূজা প্রধানত বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরাই বেশি করিয়া চালাইয়াছিলেন। এখনকার দিনের পূজিত প্রসন্নমূর্তি তারা দেবী আসলে বৌদ্ধ তন্ত্রের দেবতা। তারা এখন ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের কালীর সঙ্গে অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য মতের মুখ্য দেবী ছিলেন চণ্ডী। লক্ষ্মণসেনের (দ্বাদশ শতাব্দের শেষে) মহামন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্রের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' গ্রন্থে চণ্ডীপূজা ব্রাহ্মণের নিত্যকৃত্যের মধ্যে ধরা আছে। আর বড় দেবী ছিলেন মনসা। ইহার এবং মঙ্গলচণ্ডীর কথা পরে বলিব। পূজার উদ্দেশ্যে চণ্ডীমূর্তি-প্রতিষ্ঠাও লক্ষ্মণসেনের সময়ে প্রচলিত হয়। লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে নির্মিত একটি চণ্ডীমূর্তি ঢাকায় পাওয়া

গিয়াছে। দেবী চতুর্ভুজ, সিংহবাহন। দুই পাশে দুই সখী, সামনে বসিয়া তিন অনুচর বা ভক্ত। দেবীর দক্ষিণ হস্তে পদ্ম ও জলপাত্র, বামহস্তে কুঠার, বরাভয় মুদ্রা। দুইটি হাতী শুঁড়ে কলসী ধরিয়া দেবীকে অভিষেক করিতেছে। পাদপীঠের নীচে যে লিপি আছে তাহা হইতে জানি যে মূর্তি নির্মাণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন এক রাজকর্মচারী ("অধিকৃত") দামোদর, আর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহার ভাই নারায়ণ।

মুসলমান অধিকারের আগে দেশের রাজশক্তির ধর্মমতের পরিচয় পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণ্য মতের শাস্ত্রশাসনেরও পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু জনসাধারণের ধর্মমতের বা ধর্মাচরণের পরিচয় পাওয়া যায় না। রাজশক্তির ধর্মমত জানিতে পারি তাম্রশাসনের (অর্থাৎ ভূমিদান-পত্রের) প্রারম্ভে (বন্দনা) শ্লোক হইতে। ইহাতে সাধারণত বুদ্ধের (অথবা অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি মহাযানিক বৌদ্ধদেবতার), বিষ্ণুর অথবা শিবের বন্দনা পাই। (তখনও উচ্চসমাজে স্ত্রী-দেবতা পুরুষ-দেবতার উপরে প্রাধান্য পায় নাই, তাই কোথাও স্ত্রী-দেবতার বন্দনা আরম্ভে নাই।) পশ্চিম-বাঙ্গালায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকে বাঙ্গালা দেশের বিশিষ্ট দেবতা ধর্মঠাকুরের স্তুতি আছে বলিয়া মনে করি।[১] শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম কয়েকটি অক্ষর নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

……কনাথঃ যঃ পুংসাং সুকৃতকর্মফলহেতুঃ।
সত্যতপোময়মূর্তির্লোকদ্বয়সাধনো ধর্মঃ॥

বর্ধমান জেলায় গলসী থানার অন্তর্গত মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত, মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের উপরিক (?) মহারাজ বিজয়সেন প্রদত্ত, এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকারী ও সম্পাদক ননীগোপাল মজুমদার লুপ্ত অংশের পাঠ অনুমান করিয়াছিলেন "জয়তি শ্রীলোকনাথঃ" এবং সেই অনুসারে শ্লোকটিকে বুদ্ধের ও ধর্মের বন্দনা বলিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই অনুমানের বিপক্ষে অনেক কিছু বলিবার আছে। প্রথমত, পাঠ সম্পূর্ন কাল্পনিক। স্বচ্ছন্দে "জয়তি ত্রিলোকনাথঃ" পাঠও ধরা যায়। দ্বিতীয়ত, "যিনি পুরুষের পুণ্যকর্মফলের হেতু" এই বিশেষণ বৌদ্ধ দেবতা লোকনাথ-অবলোকিতেশ্বরের পক্ষে খাটে না। তৃতীয়ত, বৌদ্ধ শাস্ত্রে "ধর্ম" কোথাও "সত্যতপোময়-মূর্তি" বলিয়া উল্লিখিত কিনা জানি না, "ইহলোক পরলোকের সাধন" তো নয়ই। চতুর্থত, "সংঘ" কই? বৌদ্ধ

---

[১] এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা ২৩ পৃ ১৫৯।

মতের বন্দনা-শ্লোক হইলে ত্রিরত্নের অন্যতম সংঘ কিছুতেই বাদ পড়িত না।[১] পঞ্চমত, বন্দনাশ্লোকের উপরে তাম্রপট্টের মাথায় যে মুদ্রাটি (seal) আছে তাহাতে যে মূর্তি অঙ্কিত তাহা কিছুতেই লোকনাথ-অবলোকিতেশ্বরের নয়। দ্বিভুজ পুরুষ-মূর্তি, সামনে ঘোড়ার মুখ পিছনে রথের চাকা। হাতের ভঙ্গী ঠিক যেন চাবুক ফেলিতেছে।[২] মুদ্রায় আঁকা এই ছবি হইতে মনে হয় যে শ্লোকটি সূর্যরূপী রাজদেবতা ধর্মের বন্দনা।

কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মার (নিধনপুরে প্রাপ্ত) অনুশাসনে শিবের বন্দনার পরেই ধর্মের বন্দনা আছে। এ ধর্ম স্পষ্টতই পরবর্তী কালের "ধর্ম নিরঞ্জন"।

জয়তি জগদেকবন্ধুর্লোকদ্বিতয়স্য সম্পদো হেতুঃ।
পরহিতমূর্তিরদৃষ্টঃ ফলানুমেয়স্থিতির্ধর্মঃ॥

'জগতের যিনি একমাত্র বন্ধু, ইহলোক-পরলোকের সম্পদের হেতু, যিনি মূর্তিমান্ পরহিত, যিনি দৃষ্টিগোচর নন কিন্তু ফলের দ্বারা যাঁহার অস্তিত্ব জানা যায়, সেই ধর্ম জয়যুক্ত হোক॥'
ধর্মের মর্যাদা এখানে শিবের নীচে—এ ব্যাপার লক্ষণীয়॥

৬

একদা সমগ্র পূর্ব-ভারতে গ্রামের যে ধর্মানুষ্ঠানরীতি ছিল তাহা পরে শুধু বাঙ্গালা দেশে—আরও পরে শুধু পশ্চিম বাঙ্গালাতেই—রহিয়া গিয়াছে। উত্তর প্রদেশে ও বিহারে ঘন ঘন রাষ্ট্র-বিপর্যয়ে পুরানো গ্রাম-রীতি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশ আর্যাবর্তের সদররাস্তা হইতে অনেক দূরে ছিল এবং আগমনিগমের সহজসুবিধা না থাকায় বাঙ্গালার গ্রাম যতদুর সম্ভব নির্বিবাদে পুরানো পন্থায় দিন কাটাইয়া চলিতেছিল। (পূর্ববঙ্গে প্রধানত ভৌগোলিক কারণেই পশ্চিম-বঙ্গের মতো ঘনসন্নিবিষ্ট একতন্ত্র গ্রাম-বন্ধন সর্বত্র সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য সেখানে পুরানো গ্রামজীবনের ধারাবাহিকতা খুব নাই।)

গ্রাম ছিল যতটা সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট—কৃষিতে, শিল্পে, ধর্মানুষ্ঠানে। গ্রামের যিনি অধিদেবতা তাঁহাকেই গ্রামের লোকে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও

[১] তুলনীয় রামপালে ও কেদারপুরে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনের বন্দনা-শ্লোক

"বন্দ্যঃ জিনঃ স ভগবান্ করুণৈকপাত্রং ধর্মোঽপ্যসৌ বিজয়তে জগদেকদীপঃ।
যৎসেবয়া সকল এব মহানুভাবঃ সংসারপারমুপগচ্ছতি ভিক্ষুসংঘঃ॥"

'করুণার একমাত্র আধার ভগবান্ জিন নমস্য। জগতের একমাত্র দীপ ধর্মও বিজয়ী। যাহার সেবায় মহানুভাব ভিক্ষুসংঘ সকলে সংসারের পারে চলিয়া যান॥'

[২] পরিশিষ্টে চিত্র দ্রষ্টব্য।

আধিভৌতিক সকল বিষয়ের চূড়ান্ত অধিকারী বলিয়া পূজা করিত। গ্রামাধিদেবতা সাধারণত দুইটি ছিলেন—পুরুষ দেবতা ও স্ত্রী দেবতা। হয়ত কোন কোন গ্রামে শুধুই পুরুষ অথবা শুধুই স্ত্রী দেবতা থাকিত (যেমন এখনও বর্ধমান বিভাগের অনেক প্রাচীন গ্রামে দেখা যায়।) এমন গ্রামাধিদেবতার উল্লেখ পাইতেছি কনিষ্কের সময়ের একটি প্রস্তর-লিপিতে।[১] লিপিকর্তা গ্রামদেবীর দেউল নির্মাণ করাইয়া দিয়া দেবীকে উৎসর্গ করিয়া গ্রামের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "প্রীয়তাং দেবী গ্রামস্থ"।

এই গ্রামদেবতা-ভাবনায় নিশ্চয়ই অন্-আর্য প্রভাব আছে। কিন্তু সে প্রভাব কোন্ অন্-আর্য জাতির কাছ হইতে কবে এবং কোথায় মিলিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। অনেকে অনেক রকম অনুমান করিয়াছেন, সে সব শুধুই কল্পনা। তবে গ্রামদেবতা-ভাবনায় বৈদিক ধর্মের যোগাযোগ যে একেবারেই ছিল না তাহা বলি কেমন করিয়া। বেদে বাস্তুদেবতার ("বাস্তোস্পতিঃ") মর্যাদা কম নয়। সেই বাস্তুদেবতাই শিব ও লিঙ্গরূপী শিলাস্তম্ভদেবতার সহিত মিশিয়া গিয়া "ত্রৈলোক্যনগরারম্ভ-মূলস্তম্ভ" স্থাণীশ্বরে পরিণত হইয়াছিলেন। ইহার সহিত বাঙ্গালার গ্রামদেবতার সম্পর্ক নির্ণয় কষ্টসাধ্য নয়।

পুরুষ-গ্রামদেবতার প্রতীক শিলাখণ্ড, স্ত্রী-গ্রামদেবতার প্রতীক ঘট (একক অথবা জোড়া)। লম্বা শিলাখণ্ড লিঙ্গদেবতারূপে পরে শিবের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে, লম্বা না হইলে তাহা ধর্মরাজের পাদপীঠ সিংহাসন অথবা তাঁহার পাদুকার ও সিংহাসনের আধার কূর্মরূপে কল্পিত হইয়াছে। জলপূর্ণ ঘট ("বারি") ধর্মঠাকুরের শক্তি কেতকা-মনসা-কামিনী রূপে অথবা শিবের শক্তি চণ্ডী বা বিশালাক্ষী (আসলে বিষাল-আঁখি অর্থাৎ মনসা) রূপে পূজিত হইয়াছে।

কোন কোন গ্রামে রাজশক্তিপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যদেবতার মন্দির ছিল। সেখানকার মাহাত্ম্যও কম ছিল না। প্রাচীন কোন কোন বৌদ্ধ ও জৈন পীঠও অল্পাধিক ভোল বদলাইয়া কালোপযোগী রূপ লইয়াছিল। এগুলি প্রাচীন পীঠস্থান বলিয়া গণ্য হইত।

দেবমন্দির দুই রকমের ছিল, দেউল ও দেহারা। দেউল "দেবকুল", অর্থাৎ দেবতার ও তাঁহার ভক্তসেবকদের আবাসস্থান। দেবকুলে প্রধান মন্দির (নাম

---

[১] প্রস্তরখণ্ডটি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। কোথায় পাওয়া গিয়াছিল জানা নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার সঙ্কলিত *Select Inscriptions* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৪২) পৃ ১৩৪ দ্রষ্টব্য।

"গম্ভীরা") অথবা দেবস্থান ছাড়া ভোগমণ্ডপ নাটমন্দির রসুইশালা অতিথিশালা ইত্যাদি, যেমন "রাজকুল"এ অর্থাৎ রাজবাড়িতে থাকে, তেমনি থাকিত। নিরন্ন অনাথ এখানে আশ্রয় পাইত। (এইজন্য দেবকুলবাসী, "দেউলিয়া" শব্দের আধুনিক অর্থ দেউলে।) দেহারা "দেবগৃহ", অর্থাৎ একটি ঘর, এখন যেমন পুরানো শিবমন্দির দেখা যায়। দেহারা যে পাকাবাড়ি হইতই এমন নয়, খড়ের চালা দেহারা এখনও অনেক গ্রামে আছে।

গ্রামবাসীদের অনুষ্ঠান-উৎসব সবই গ্রাম-দেবতাকে উপলক্ষ্য করিয়া ঘটিত। গ্রাম-দেবতার বার্ষিক পূজায় নৃত্যগীত অভিনয়ের আয়োজন হইত। দেউলের নাটমন্দিরে অথবা দেহারার সামনে আসর করিয়া দেবতার মাহাত্ম্যগান গাওয়া হইত। বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণের সাহিত্যরুচি এইভাবে দেবপূজাকে উপলক্ষ্য করিয়া গ্রাম্য উৎসবের আয়োজনে সঙ্গীতবাদ্যের সহযোগে গড়িয়া উঠিতে থাকে। গ্রাম-দেবতার পূজা ছাড়া আরও অনেক গ্রাম্য উৎসব ছিল। ভাদ্র ও পৌষ এই দুই ফসল-তোলার সময়ে এমনই ঘরে ঘরে আনন্দ-উৎসব লাগিত। এই উৎসবের ক্ষীণ রেশ রহিয়া গিয়াছে এখনকার দিনে পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাদু ও টুসু পরবে এবং বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্বত্র পরিচিত ছেলেমেয়েদের পোষলা বা তোসলা অনুষ্ঠানে। প্রাচীন ইন্দ্রধ্বজোৎসব ভাদুর মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। তোসলা বা পোষলা পরব এদেশের খুব প্রাচীন প্রথা, অশোকের কলিঙ্গ-অনুশাসনে ইহার ইঙ্গিত আছে। অশোক বলিয়াছেন, 'আমার এই নীতি-অনুশাসন যেন প্রজারা তিষ্য নক্ষত্রে (অর্থাৎ পৌষালি উৎসবের সময়) শোনে এবং অন্য সময়েও ইচ্ছামত শুনিতে পায়।'

পুত্রকন্যার বিবাহে তখন আরও বেশি ধুম লাগিয়া যাইত। সেকালের গ্রাম-জীবনে বিবাহ-উৎসব এত বহুমানিত ছিল যে অনেক গ্রামে বছরে বছরে ঘটা করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ গ্রাম-দেবতার মধ্যে বিবাহ-অনুষ্ঠানের মহড়া হইত। এ অনুষ্ঠান এখনো বিলুপ্ত নয়।[১]

বিবাহ-অনুষ্ঠানে মেয়েলি আচারের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল মঙ্গল-গান। ("মঙ্গল" কথাটি বেদে সদ্যোবিবাহিত বধূ ও বিবাহ-অনুষ্ঠানের সম্পর্কেই পাওয়া গিয়াছে। মেয়েলি শুভ অনুষ্ঠান অশোকের অনুশাসনেও "মঙ্গল" বলিয়া

---

[১] বর্ধমান জেলার উত্তরাংশে মাঝিগ্রামে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে শাকম্ভরীর বিবাহ বাৎসরিক অনুষ্ঠান।

উল্লিখিত হইয়াছে।[১]) ঋগ্বেদে যে বিবাহের মন্ত্রটি আছে (১০-৮৫) তাহাতেও পাই যে মেয়েরা গান গাহিয়া কন্যার বসন পাট করিতেছে।

সূর্যায়া ভদ্রমিদ্ বাসো গাথয়ৈতি পরিষ্কৃতম্।

প্রাকৃত সাহিত্যে পৌঁছিয়া দেখিতেছি যে, যে-মেয়েরা বিবাহে গান করিতেছে তাহারা "মঙ্গল-গায়িকা" বলিয়া উল্লিখিত। অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে বিবাহ অনুষ্ঠানে "গাথা"র অর্থাৎ গানের মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে।

তস্মাদ্ বিবাহে গাথা গীয়তে।[২]

ধর্ম-অনুষ্ঠান এবং সামাজিক আচার—এই দুইদিক দিয়াই সেকালের জন-সাধারণের সাহিত্য-সঙ্গীত বোধ বিশিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছিল।

৭

সেকালে উৎসব-উপলক্ষ্যে দুই ধরনের সাহিত্য-সঙ্গীতের আসর বসিত। একটি স্থাবর, অপরটি জঙ্গম। স্থাবর আসর দেব-মন্দিরের সামনে বসিত। অন্যত্র বসিলে দেব-মুর্তি অথবা ঘট-প্রতীক আসরের আগে রাখা হইত। তাহার সামনে গান-নাচ চলিত। দেব-মাহাত্ম্যময় গীতি দীর্ঘ হইলে গেয় বস্তুর পাত্রপাত্রীর "পঞ্চালিকা" অর্থাৎ পুতুল-রূপ (puppet) দেখানো হইত। অর্থাৎ পুতুল-নাচের সঙ্গে চলিত নাট-গান। পুতুলের অভাবে, ছোট আসর হইলে, পট দেখাইয়া গান চলিত। (এ রীতি পশ্চিমবঙ্গে লুপ্তপ্রায় হইলেও এখনো নিশ্চিহ্ন নয়।) এই "পাঞ্চালী" রীতি পরিপুষ্ট হইয়া একটি বিশিষ্ট ফর্ম গ্রহণ করিবার পরে "পুতলো-বাজি" অংশটুকু বাদ পড়িয়া যায়। আর যেখানে পুতুল-বাজি রহিয়া যায় সেখানে গানের অংশ ক্ষীণ হইয়া আসে। "পাঞ্চালী" গানের সঙ্গে পুতুল-বাজির প্রাচীন যোগাযোগ শুধু নামেই পাই না (—সংস্কৃতে "পঞ্চালিকা" বা "পাঞ্চালিকা" মানে কাঠ কাপড় হাতির দাঁত চামড়া ইত্যাদি নির্মিত পুত্তলিকা—), কিছু বিবরণও পাই। আনুমানিক চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দে বাঙ্গালা দেশে সঙ্কলিত "বৃহৎ" ধর্মপুরাণে গঙ্গাধারার সৃষ্টি সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে তাহাতে প্রাচীনকালের পাঞ্চালী নাট-গানের অল্প বর্ণনা আছে।[৩]

জঙ্গম উৎসবকে বলিত "যাত্রা"।[৪] বাৎসরিক পূজা অথবা সাময়িক উৎসব

[১] একাদশ মুখ্য গিরি-অনুশাসন দ্রষ্টব্য।

[২] মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩-৭-৩-৩।

[৩] বিচিত্র-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড) পৃ ২০-২১।

[৪] এ প্রসঙ্গে লেখকের 'নট-নাট্য-নাটক' (১৯৬৬) বইটি পঠিতব্য।

উপলক্ষ্যে দেবতাকে লইয়া ভক্তেরা শোভাযাত্রা করিয়া নাটগীত করিতে করিতে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইত। এখন যেমন রথযাত্রা, স্নানযাত্রা। এমনি ভাবে পুণ্য দিনে নদীস্নানেও লোকে যাইত। দেবতার শোভাযাত্রা হইতে আধুনিক "যাত্রা" কথাটি আসিয়াছে। (দেবোৎসব-যাত্রা উপলক্ষ্যে সেকালে নাটগীত ও নাটক-অভিনয় হইত।) নদীস্নান-যাত্রা হইতে আধুনিক "জাত" ("নদীর জাত") উদ্ভূত।

সেকালে নৃত্য গীত ও অভিনয় সাধারণত একযোগে হইত। এবং ইহার নাম ছিল "নাট" বা "নাটগীত"। নৃত্যাভিনয় দুই রকমের ছিল—"পাত্র-নৃত্য" ও "প্রেরণ-নৃত্য"। পাত্র-নৃত্যে দেব বা মানব ভূমিকার উপযোগী মুখোস ও সাজ পরা হইত, যেমন এখনো দক্ষিণপশ্চিম বাঙ্গালায় ও উড়িষ্যায় "ছো" বা "ছোউ" নাচে দেখা যায়। এ ধরনের নৃত্য ও মূকাভিনয় (বা গীতাভিনয়) অনেক দিনের রীতি। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে এই রকম অভিনয়কে "শৌভিক" বলিয়াছিলেন।[১] ("ছো" "ছোউ" শব্দ "শৌভিক" হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে করি।) পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে এই রীতিকে "কাচ"ও[২] বলা হইয়াছে এবং নাটগীতে কোন পাত্রের বেশ গ্রহণকে বলা হইয়াছে "কাচ কাচা"।

প্রেরণ-নৃত্য স্বাভাবিক বেশে নৃত্য, কোন পাত্রপাত্রীর অভিনয় নয়। মনে হয় কথাটি প্রাচীন পুতুল-নাচানো হইতে আসিয়াছে। পুতুলকে প্রেরণ করিয়া অর্থাৎ সূতা ধরিয়া নাচাইতে হয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে সংস্কৃত নাটকের "সূত্রধার" শব্দটি। সূত্রধার হইতেছে নাটকাভিনয়ের ডিরেক্টর এবং ম্যানেজার। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে, যে সূতা ধরিয়া থাকে। অর্থাৎ যে পুতুল-বাজির পুতুল নাচায়। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে শব্দটি পুতুল-বাজি হইতেই আগত এবং আমাদের দেশে নাটকাভিনয়-রীতির উদ্ভব পুতুল-নাচ হইতে। পুতুল-নাচ ষোড়শ শতাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশে খুব জনপ্রিয় ছিল। পুতুল-বাজিকরের দক্ষতাও বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন।

কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।

---

১ "শুভ্" ধাতু হইতে উৎপন্ন। অর্থ শোভাধারী অর্থাৎ সজ্জা-পরায়ণ।

২ "কাচ" আসিয়াছে "কৃত্য" (অর্থাৎ যাহাতে উপযুক্ত সাজগোজ করিতে হয়)। কখনো কখনো "কাপ"ও ("কল্প" হইতে) বলা হইয়াছে।

সেকালের আর এক রকম "সাহিত্যিক" ব্যাপার ছিল হেঁয়ালি-প্রতিযোগিতা, —অর্বাচীন বৈদিক কালের "ব্রহ্মোদ্য" বা "বাকোবাক্য", ষোড়শ শতাব্দের বাঙ্গালায় "আর্যা-তর্জা," অষ্টাদশ শতাব্দের বাঙ্গালায় "বাদাবাদি তর্জা"। বৈদিক কাল হইতেই হেঁয়ালি-রচনার উৎকর্ষের উপরে কবির মাহাত্ম্য নির্ভর করিত। বেদের কবি ছিলেন অধ্যাত্মজ্ঞানীও। তাই হেঁয়ালি কবিতার মধ্য দিয়া উচ্চ অধ্যাত্মচিন্তার প্রকাশ বৈদিক সাহিত্যে অপরিচিত নয়। উপনিষদের এই পরিচিত প্রারম্ভশ্লোকটি ইহার উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করিতে পারি।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

'উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণিত অভিব্যক্ত। পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।'

সংস্কৃত সাহিত্য আগাগোড়া অধ্যাত্মকথায় ভরা, তবুও সে সাহিত্য শুধু আধ্যাত্মিক সাহিত্য নয়। তাই সেখানে প্রহেলিকা পণ্ডিতের বৈদগ্ধ্যবিলাসে পর্যবসিত। সাহিত্যের ফর্ম হিসাবে সংস্কৃতে প্রহেলিকার কোন স্থান নাই। তবে প্রাকৃত সাহিত্যে প্রহেলিকার দুই ধারা দেখা যায়। এক সংস্কৃতের মতো বাক্‌চাতুরিতে, আর বৈদিকের মতো অধ্যাত্মচিন্তায়। প্রাকৃতের অন্ত্যযুগে, অবহট্‌ঠে, বৌদ্ধ ও জৈন অধ্যাত্মচিন্তকদের রচিত ছড়াও পাওয়া গিয়াছে। এবং সেগুলির সাক্ষাৎ অনুসরণ হইতেই আধুনিক আর্য-ভাষারূপে বাঙ্গালা-রচনার সূত্রপাত।

কোন কোন ধর্ম-অনুষ্ঠানে এবং বিবাহের মতো লৌকিক আচারে বাকোবাক্য ও হেঁয়ালি ঢুকিয়া গিয়াছিল। ইহার ইঙ্গিত আমরা মধ্যকালের বাঙ্গালা সাহিত্যে মাঝে মাঝে পাই।

৮

সমাজ, ধর্ম ও আচার এবং গার্হস্থ্য এই তিন পরিবেশে সব জাতির যেমন বাঙ্গালীরও তেমনি মানসপ্রকৃতি ও সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথম দুই পরিবেশের কথা বলিয়াছি, তৃতীয় পরিবেশের কথা বলিতেছি।

গ্রাম ছিল যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ, বসতবাড়ি ও কৃষিভূমি লইয়া। বিভিন্ন জাতির লোকেরা নিজের নিজের বৃত্তিনিষ্ঠ ছিল। তবে বৃত্তি বলিতে যে সর্বদা এবং সর্বত্র জাতিবৃত্তি তাহা নয়। জাতি অনুসারে বৃত্তিকল্পনা প্রধানত পরে, মুসলমান

আমলে, হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা গ্রামের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের এই প্রাধান্য চিরকাল ছিল না। গুপ্ত-শাসনের সময় হইতেই বাঙ্গালা দেশের গ্রামে গ্রামে পশ্চিমাগত "বেদজ্ঞ" (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-মতাশ্রয়ী) নূতন ব্রাহ্মণের উপনিবেশ শুরু হয়। তাহার আগেও ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মর্যাদা নবাগতদের তুলনায় হীন হইয়া গিয়াছিল। গুপ্ত-শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসনকার্যে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা বাড়িতে থাকে। পাল-রাজারা বৌদ্ধ, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান মন্ত্রীরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীদের মন্ত্রিত্ব বংশানুক্রমে চলিত। এই ভাবে এদেশে প্রায় সব দিক দিয়াই ব্রাহ্মণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণমাত্রেই শাস্ত্রচিন্তক অথবা দেবপূজক ছিলেন না। তবে দেবত্র ও ব্রহ্মত্র অথবা নিজস্ব ভূমি চাষ করিয়াই তাঁহাদের অনেকের সংসার চলিত। অন্য বৃত্তিকেও তাঁহারা উপেক্ষা করেন নাই।

ব্রাহ্মণ যে চিরদিন গ্রামের অগ্রণী ছিলেন না তাহার প্রমাণ পাই গ্রাম-দেবতার পূজার বংশানুক্রমিক অধিকারে। অনেক পুরানো গ্রামে গ্রাম-দেবতার পূজাধিকারী এখনও ব্রাহ্মণেতর জাতি। কোন কোন গ্রামে সে অধিকার পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণের হাতে আসিয়াছে। অনেক গ্রাম-দেবতা আদিতে ব্রাহ্মণ্য-মতের দেবতার মধ্যে পরিগণিত ছিল না। অনেক দেবতার পূজারী ছিলেন প্রাক্-ব্রাহ্মণ্য আর্য, সুতরাং তাঁহারা ব্রাহ্মণের মর্যাদা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। চণ্ডালেরা হয়ত এই রকম ভ্রষ্ট আর্য শ্রেণীর অন্যতম। পুরাণের বিশ্বামিত্রের কাহিনী এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

একদা সমগ্র উত্তরাপথেরও প্রধান খাদ্য ছিল ভাত। তখন মৎস্য-মাংস ব্রাহ্মণদেরও চলিত।[১] উত্তরপ্রদেশের ও বিহারের ব্রাহ্মণেরা এখন মাছ-ভাত-ছাড়া। কিন্তু মৈথিল ও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এ আহার ছাড়ে নাই। গমের আটা খাওয়া কিন্তু মুসলমান অধিকারের পরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মৎস্য-মাংসাহার বর্জনও অনেকটা সেই অনুসারে।

আমিষ আহারে যত না হোক নিরামিষ আহারের পারিপাট্যে ও ভোজনের রুচিতে বাঙ্গালার সংস্কৃতি একটি বিশেষ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ছানার ও ছানার মিষ্টান্নের ব্যবহারেও এই সংস্কৃতির একটি মুখ্য প্রকাশ।

বাঙ্গালাদেশে নগর বলিতে ছিল বড় গ্রাম। এ দেশের মধ্যে পাথর

[১] পতঞ্জলির মহাভাষ্যের কোন কোন উদাহরণ-বাক্য হইতে এই অনুমান করা যায়।

আছে শুধু দুই স্থানে—রাজমহল অঞ্চলে ও বাঁকুড়া-মানভূম অঞ্চলে। এই দুই অঞ্চলে পাথরের মন্দির নির্মিত হইত। রাজারা রাজমহল হইতে পাথর আনাইয়া দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ়ে এবং বরেন্দ্রীতে মন্দির নির্মাণ করাইতেন। আসলে এদেশে পূর্তকর্মে চলন ছিল ইটের। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত মন্দির-ভিত্তি হইতে বাঙ্গালাদেশে পূর্তশিল্পের উন্নতির কিছু নমুনা পাওয়া যায়।[১] অন্যত্রও বিরাট মন্দিরের ভগ্নাংশ মাটি খুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে। সেন-রাজারা বরেন্দ্রীতে ও দক্ষিণ রাঢ়ে পাথরের মন্দির গড়াইয়া দেবতা-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়ার কাছে যে মন্দিরটি ছিল তাহার ভিত্তিময় রামায়ণ-মহাভারত কাহিনীর প্রস্তরচিত্র ছিল। সে চিত্রগুলি এখন ধ্বংস হইয়াছে কিন্তু চিত্রের পরিচায়ক কয়েকটি লিপি রক্ষা পাইয়াছে।[২]

বাঙ্গালা দেশের গৃহস্থের বাসঘরের বিশিষ্ট ছাঁদের নাম হইয়াছিল "বাঙ্গালা"। (ইংরেজীতে ইহা Bungalow হইয়া একটু নূতন অর্থ লাভ করিয়াছে।) সে ঘরের দেওয়াল মাটির (অভাবে ছিটাবেড়ার), এবং বাঁশের কাঠামোয় খড়ের ছাউনি। একদা সমগ্র পূর্বভারতে এই গৃহনির্মাণপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে বাসগৃহের সব চেয়ে পুরানো নিদর্শন রহিয়াছে গয়ার অনতিদূরে বরাবর পাহাড়ে অশোকের নির্মিত কয়েকটি গুহায়। এই গুহায় উৎকীর্ণ দ্বারের ছাঁদ অবিকল বাঙ্গালা দেশের খড়ো ছাউনির মতো।

পাথরের মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ, ইটের মন্দিরের গায়ে পোড়া মাটিতে ছাপা, অথবা ঘরের চালের নীচে কাঠের কাঠামোয় খোদাই করা কিংবা আঁকা ভিত্তিচিত্রে ও চালচিত্রে সেকালের বাঙ্গালা দেশের ভাস্কর্য তক্ষণ ও চিত্রণ শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিবার অনেক আগেই কোন কোন বিশিষ্ট বিষয় এইভাবে প্রথমে শিল্পে প্রকটিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের আগে বাঙ্গালা ভাষায় রামলীলা ও কৃষ্ণলীলা কাহিনীর সন্ধান পাই না। অথচ মন্দিরের অলঙ্করণে তাহা অন্তত নবম শতাব্দ হইতে মিলিতেছে।

মন্দির-চিত্রের মধ্যে এমন একটি পুরানো গল্পের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহা কখনো সাহিত্যের বিষয়ীভূত হয় নাই। পাহাড়পুরের ভূমিসাৎ মন্দিরের একটি ভিত্তিচিত্রে দেখা যায় যে এক উঁচুপাড় কুয়ার ধারে একটি নারী ঘড়া রাখিয়া একটি শিশুর গলায় দড়ি পরাইতেছে। যাঁহারা এই ছবিটির উল্লেখ

---

১ পরিশিষ্টে চিত্র দ্রষ্টব্য।

২ যেমন "সীতাবিবাহঃ," "রামেন রাবণবধঃ" ইত্যাদি।

করিয়াছেন তাঁহারা কেহই ইহার মর্ম বুঝিতে পারেন নাই। আসলে ইহা একটি গল্পের ছবি। সে গল্প উল্লিখিত আছে ষোড়শ-সপ্তদশ (?) শতাব্দে সংকলিত ভাঙ্গা সংস্কৃতে লেখা 'সেকশুভোদয়া' বইটিতে।[১] গল্পটির মর্মকথা সঙ্গীতের মোহকরতা। একদা লক্ষ্মণসেনের সভায় এক সুগায়ক গান ধরিয়াছিল। তখন একটি নারী শিশুপুত্রকে লইয়া রাজসভামণ্ডপের অদূরে কুয়ায় জল লইতে আসিয়াছিল। তখনও রাজসভায় গান হইতেছিল। সে গানের সুর তাহার কানে পশিয়া তাহাকে এমন ভুলাইয়া দেয় যে, সে কলসীভ্রমে শিশুর গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে কুয়ায় নামাইয়া দিয়াছিল।[২]

ভিত্তিচিত্রের অনুকরণে মেয়েদের পরিধেয় ও কাঁচলি সূচিচিত্রাঙ্কিত হইত। ইহার উল্লেখ মধ্যকালের "পাঞ্চালী" কাব্যে নায়িকার কাঁচলি-নির্মাণ প্রসঙ্গে প্রচুর আছে।

মন্দির অভ্যন্তরে রঙ্গীন-চিত্রণের খুব পুরানো নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তবে এখনকার দিনে দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্রে তাহার অনুবৃত্তি রহিয়া গিয়াছে।

[১] শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত ও এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত (১৯৬৩)।
[২] পরিশিষ্ট চিত্র দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংস্কৃতে রচনা

১

বাঙ্গালা দেশে সাহিত্যরচনার প্রাচীনতম নিদর্শন প্রত্নলিপিতে ও ভূমিদানপত্রে লভ্য। প্রাচীনতম লিপি যাহা খাশ বাঙ্গালা দেশে পাওয়া গিয়াছে—বগুড়া জেলায় মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলাচক্রলিপিটি—তাহা প্রাকৃতে লেখা। প্রত্নলিপিবিদেরা বলিয়াছেন লিপি খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দের, অর্থাৎ অশোকের সমসাময়িক। সে সময়ে সাধারণ ব্যবহারে ও রাজকার্যে প্রাকৃতই চলিত। (এ কাজে সংস্কৃতের ব্যবহার খ্রীস্টপর দ্বিতীয় শতাব্দের আগে পাই না।) যখন বিভিন্ন প্রাকৃত পরস্পর অবোধ্য হইয়া পড়ে তখন ক্রমশ প্রাকৃতের স্থান সংস্কৃত গ্রহণ করিতে থাকে, কেন না তখন সংস্কৃত ভারতবর্ষের একমাত্র শিষ্টভাষা বলিয়া সর্বস্বীকৃত।

মহাস্থানগড়ের প্রত্নলিপিটি ছোট। অখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। সেইজন্য পাঠ ও অর্থ সর্বত্র নিঃসংশয় নয়। তবে, "পুডনগল" (= পুণ্ড্রনগর) পাঠে কোন গোল নাই। আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। কেননা ইহাতে এটি যে বাঙ্গালাদেশেরই প্রত্নবস্তু তাহা বুঝিতেছি।

তাহার পরে যে রচনার নিদর্শনটুকু পাইতেছি তাহা আরও সংক্ষিপ্ত এবং প্রায় সাত শতাব্দ পরেকার,—সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক। এটির ভাষা সংস্কৃত। বাঁকুড়ার অনতিদূরে শুশুনিয়া পাহাড়ের বিধ্বস্ত গুহার গায়ে বিষ্ণুচক্রের নীচে ও পাশে এই কথা উৎকীর্ণ আছে

> পুষ্করণাধিপতে র্মহারাজ শ্রীসিজ্ঞবর্মণঃ পুত্রস্ত
> মহারাজশ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ
> চক্রস্বামিনঃ দোসগ্রেণাতিসৃষ্টঃ

পণ্ডিতেরা "দোসগ্রেণ" ভুল পাঠ মনে করিয়া সংশোধন করিয়াছেন "দাসাগ্রেণ"। সেই অনুসারে অর্থ করা হয়,—'পুষ্করণার রাজা মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার কৃতি, চক্রস্বামীর অর্থাৎ বিষ্ণুর দাসমুখ্যের দ্বারা উৎসর্গীকৃত।' শুশুনিয়া পাহাড়ের কয়েক ক্রোশ দূরে উত্তরপূর্বে দামোদর তীরে পোখরনা গ্রাম আছে। ইহাই সিংহবর্মার রাজধানী পুষ্করণা হইতে পারে।[১]

---

১ এই অনুমান প্রথম শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

গুপ্ত-শাসনকালেই বোধ হয় সর্বপ্রথম বাঙ্গালাদেশ একচ্ছত্র শাসনের অধীনে আসে। তাহার আগে অশোকের সময়ে এ দেশ তাঁহার অধিকারে হয়ত ছিল না, থাকিলেও সে অধিকার সার্বভৌম রাজার শিথিল অধিকার। প্রকৃত শাসন দেশের ছোট ছোট রাজার অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্তার হাতে ন্যস্ত ছিল। পরে রাজা বা "উপরিক" থাকিলেও তাঁহাকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নায়কদের ও মুখ্য জানপদগোষ্ঠীর পরামর্শ লইতে হইত।

গুপ্ত-রাজাদের আমলের আট দশখানি ভূমিদানপত্র (তাম্রশাসন) পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে সবচেয়ে পুরানো কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে প্রদত্ত শাসন তিনখানি। তাহার মধ্যে একখানি রাজশাহী জেলায় নাটোর মহকুমায় ধানাইদহ গ্রামে পাওয়া গিয়াছে।[১] এটির লিপিকাল ৪৩২ খ্রীস্টাব্দ। খোদাইকর স্তম্ভেশ্বর দাস। বাকি শাসন দুইটি মিলিয়াছে দিনাজপুর জেলায় দামোদরপুর গ্রামে। লিপিকাল ৪৪৪ ও ৪৪৭ খ্রীস্টাব্দ। পশ্চিম বাঙ্গালায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম শাসনের উল্লেখ আগে করিয়াছি।

এখনকার বাঙ্গালা দেশের বাহিরে আসামে পাইতেছি কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মার শাসন। ভাস্করবর্মা ছিলেন হর্ষবর্ধনের মিত্র। ইহার সহযোগিতায় হর্ষবর্ধন গৌড়রাজ শশাঙ্ককে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন। যিনি ভাস্করবর্মার নিধনপুর-শাসনের খসড়া করিয়াছিলেন তিনি বাণভট্ট হওয়া অসম্ভব নয়। যদি অন্য কোন কবি হন তবে তিনি গদ্য লেখায় বাণভট্টের চেয়ে খাটো ছিলেন না। অনেককাল পূর্ব হইতে বাঙ্গালা দেশে গদ্যপদ্য রচনায় একটি বিশিষ্ট রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাই অলঙ্কারশাস্ত্রে গৌড়ী রীতি নাম পাইয়াছে। গদ্যে গৌড়ী রীতির খাঁটী নিদর্শন পাইলাম ভাস্করবর্মার এই অনুশাসনে। আর্যা ছন্দে ধারাবাহিক শ্লোকরচনার নিদর্শনও ইহাতে পাইতেছি। নিধনপুর-শাসনের শ্লিষ্ট গদ্যাংশের নমুনা দিই।

> স জগদুদয়কল্পনাস্তময়হেতুনা ভগবতা কমলসম্ভবেনাবকীর্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রবিভাগায় নির্ম্মিতো ভুবনপতিরিবোদয়ানুরক্তমণ্ডলো যথাযথমুচিতকরনিকরবিতরণাকুলিতকলিতিমিরসঞ্চয়তয়া-প্রকাশিতার্যধর্ম্মালোকঃ স্বভুজবলতুলিতসকলসামন্তচক্রবিক্রমঃ স্থিতিবিনয়সংস্তবোপচিতভক্তিষু প্রকৃতিষু পরম্পরীণাসু নিকামমুপকল্পিতানেকভোগীনবর্ত্মা সমরবিজিতনরপতিশতবিহিত-বিবিধস্তুতিবচনকুসুমরচিতরুচিরকীর্তিচিত্রাবতংসকঃ শিবিরিব পরোপকারবিশ্রাণনাভিরত-তত্ত্ববৃত্তির্যথাসময়মুদিতগুণবিধিবিভাগসম্বন্ধপটুতয়া সুরগুরুরিবাপরঃ পরৈরহিতপ্রভাবঃ শ্রুতশৌর্যধৈর্যশৌটীর্যসুচরিতৈরলঙ্কৃতাত্মবৃত্তিঃ প্রতিপক্ষসংশ্রয়নিরাকৃতৈরিব বিবর্জিতো দোষৈরচলিতনিরন্তরপ্রণয়রভসাকৃষ্টকামরূপলক্ষ্মীসমালিঙ্গনপ্রকটিতাভিজামিকগুণানুরাগবৃত্তিঃ

কলিযুগপরাক্রমাকলিতবিগ্রহস্য সমুচ্ছ্বাস ইব ভগবতো ধর্মস্য নয়স্যাধিষ্ঠানমাস্পদং গুণানাং নিধিঃ প্রণয়িনাং মুপায়ঃ সন্ত্রস্তানাং শ্রীসম্পদামায়তনং বসুমতীসুতক্রমাধিগতপদসমুৎকর্ষদর্শিত-প্রভাবশক্তির্মহারাজাধিরাজঃ শ্রীভাস্করবর্ম্মদেবঃ কুশলী...[১]

'জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের হেতু ভগবান পদ্মযোনি (ব্রহ্মা) কর্তৃক বিপর্যস্ত বর্ণাশ্রমধর্মের সুষ্ঠু বিভাগের জন্য যিনি নির্মিত, ভুবনপতির (সূর্যের) মতো যাঁহার উদয়কালে (জন্মকালে অথবা অভিষেককালে) চারিদিক উদ্ভাসিত (রাজপক্ষে, আনন্দিত), করসমূহ (রাজপক্ষে, রাজস্ব) যথাযথ বিতরণের (রাজপক্ষে, পরিহারের) দ্বারা যিনি কলিকলুষে অবরুদ্ধ আর্যধর্মের আলোক, প্রকাশ করিয়াছেন, সকল সামন্ত-রাজাদের বিক্রম যিনি নিজভুজবলে পরিমাণ করিয়াছেন, স্থিরত্ব-সংযম-আনুগত্যে যাহাদের ভক্তি উচ্ছ্বসিত এবং বংশানুক্রমিক প্রজাদের যিনি যথেচ্ছ বহুবিধ ভোগের আয়োজন করিয়া দিয়াছেন, সমরে বিজিত শত নরপতির স্তবরাশি ফুলের মত যাঁহার উজ্জ্বলকীর্তিরূপ বিচিত্র কর্ণাভরণ রচনা করিয়াছে, শিবির মত যাঁহার সত্ত্বগুণবৃত্তি পরোপকারে দানে নিরত, যথাকালে প্রকটিত গুণের (অনুযায়ী) বিধিব্যবস্থায় পটুত্বের জন্য যিনি দ্বিতীয় সুরগুরুর (বৃহস্পতির) মতো, যিনি পরের প্রভাবরহিত, যাঁহার স্বভাব বিদ্যা-বীর্য-ধৈর্য শৌর্য-চারিত্র্যে অলঙ্কৃত, শত্রুপক্ষের আশ্রয় লইয়া দোষগণ যাঁহাকে বর্জন করিয়াছে, অবিচল ও নিরন্তর প্রণয়রসাকৃষ্ট কামরূপ-লক্ষ্মীর সমালিঙ্গনে যাঁহার প্রণয়িজনিত গুণানুরাগবৃত্তি প্রকটিত, কলিযুগের পরাক্রমে অনভিভূতশরীর ভগবান ধর্মের যিনি অবতারের মত, রাজনীতির যিনি অধিষ্ঠান, গুণসমূহের যিনি আধার, প্রিয়জনের যিনি নিধি, আর্তদের যিনি আশ্রয়স্থান, শ্রীসম্পদের যিনি ভাণ্ডার, ভৌম বংশের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত উৎকৃষ্ট অধিকারের দ্বারা যিনি প্রভাব ও শক্তি দেখাইয়াছেন, সেই ভাস্করবর্মদেব কুশলযুক্ত...।

২

ভাস্করবর্মার শাসনের কথা ছাড়িয়া দিলে সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ শাসন-রচনার নিদর্শন পাল-রাজাদের সময় হইতে মিলিতেছে। এই সময় হইতেই ভূমিদান-পত্রের আরম্ভে রাজবংশের প্রশস্তি দেওয়া রীতিসিদ্ধ হইল। এই অংশ পুরাপুরি কাব্য। রচয়িতারা রাজ-সভাকবি। তাঁহাদের নাম কদাচিৎ থাকিত। বাঙ্গালা দেশে শিষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাস এই প্রশস্তি হইতে শুরু হইয়াছে বলা যায়।

ধর্মপালের দ্বাত্রিংশ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত, মালদহ জেলায় খালিমপুরে প্রাপ্ত শাসনখানির গোড়াকার শ্লোকগুলি কোন শক্তিশালী কবির রচনা।[২] শাসনে কবির নাম নাই, খোদাইকরের আছে—ভোগটের পৌত্র, সুভটের পুত্র, তাতট। পাল-বংশের রাজ্যপ্রাপ্তির ইতিহাস আমরা এই শাসনেই পাইতেছি।

মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশশিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতনযশোরাশির্দিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাসরজনীজ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া।

---

[১] পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, 'কামরূপশাসনাবলী', পৃ ১৫-১৬।

[২] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত 'গৌড়লেখমালা' দ্রষ্টব্য। শাসনটির আবিষ্কর্তা রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও উমেশচন্দ্র বটব্যাল।

'তাঁহার (বপ্যটের) পুত্র নৃপতিচূড়ামণি শ্রীগোপালকে প্রজাগণ অরাজকতা দূর করিবার জন্ম রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করাইয়াছিলেন।[১] দিগ্‌দিগন্তরে আকীর্ণ ইঁহার শাশ্বত যশোরাশির তুলনা পূর্ণিমারজনীর উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার ধবলতার সহিত কোন রকমে চলিতে পারে।'

পাল-রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। ধর্মপালের পুত্র দেবপালের যে দুইটি শাসন পাওয়া গিয়াছে,[২] তাহাতে প্রথমেই এই বুদ্ধ-বন্দনা আছে

> সিদ্ধার্থস্য পরার্থসুস্থিতমতেঃ সন্মার্গমভ্যস্যতঃ
> সিদ্ধিঃ সিদ্ধিমনুত্তরাং ভগবতস্তস্য প্রজাসু ক্রিয়াৎ।
> যস্ত্রৈধাতুকসত্ত্বসিদ্ধিপদবীরত্যুগ্রবীর্যোদয়াজ্‌
> জিত্বা নির্বৃতিমাসসাদ সুগতঃ সন্ সর্বভূমীশ্বরঃ।

'পরার্থে যাঁহার মতি সুদৃঢ়, সৎমার্গে সাধনার দ্বারা যিনি অত্যুগ্রবীর্যবলে ত্রিভুবনের জীবের জন্ম সিদ্ধির উপায় আবিষ্কার করিয়া সুগত (অর্থাৎ সর্বোত্তম অবস্থা প্রাপ্ত) এবং সর্বপারমিতাভূমির ঈশ্বর হইয়া নির্বৃতি লাভ করিয়াছেন, সেই ভগবান্ সিদ্ধার্থের সিদ্ধি প্রজাগণের শ্রেষ্ঠতম মঙ্গল বিধান করুক।'

নারায়ণপালের সময় হইতে পাল-রাজাদের শাসনে যে প্রথম বন্দনা-শ্লোক পাওয়া যায় তাহাতে বুদ্ধের স্তুতি ও বংশকর্তা গোপালের প্রশস্তি একসঙ্গে আবদ্ধ। এ শ্লোকের ইষ্টদেবতা নির্বৃতিপ্রাপ্ত সিদ্ধার্থ নন, ইনি মহাযান-মতের লোকনাথ এবং যেন যুগলমূর্তি।

> মৈত্রীং কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ
> সম্যক্‌সম্বোধিবিদ্যাসরিদমলজলক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ।
> জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ্য শান্তিং
> স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপালদেবঃ।

'(বুদ্ধ পক্ষে—) কারুণ্য-রত্নে প্রমুদিতহৃদয় যিনি প্রেয়সী মৈত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন,[৩] সম্যক্ সম্বোধিবিদ্যা-নদীর জলে যিনি অজ্ঞানপঙ্ক ক্ষালন করিয়াছেন, যিনি অরি কামকের (মারের) আক্রমণ পরাভূত করিয়া শাশ্বত শান্তি পাইয়া দশবল হইয়াছেন সেই শ্রীমান্ লোকনাথ বিজয়ী।

'(গোপাল পক্ষে—) যাহার হৃদয় করুণাধনে প্রসন্ন, যিনি প্রেয়সীকে ধারণ করিয়া (অর্থাৎ রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়া) (প্রজাগণের) মিত্রতাপ্রাপ্ত, যিনি সম্যক্‌ভাবে বুদ্ধি-বিদ্যার অনুশীলনে জ্ঞানোজ্জ্বল, স্বেচ্ছাচারী শত্রুর আক্রমণ দমন করিয়া যিনি শান্তি স্থায়ী করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান্ নরপতি গোপালদেব বিজয়ী।'

রাজ-শাসনে বিষ্ণু-কৃষ্ণের বন্দনা আসাম-বাঙ্গালার বর্ম-রাজাদের সময় হইতে মিলিতেছে। কামরূপের বনমালবর্মের শাসনে (নবম শতাব্দের মধ্যভাগ)

---

[১] বোধ হয় রাজকন্যার স্বামী হইয়া প্রজাদের (ও সামন্তচক্রের) আনুকূল্যে গোপাল সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

[২] মুঙ্গেরে ও নালন্দায়।

[৩] এখানে করুণা মুদিতা ও মৈত্রী—এই তিন বোধিসত্ত্বগুণের উল্লেখ রহিয়াছে।

কৃষ্ণলীলার উল্লেখ আছে।[১] সমতটের ভোজবর্মের শাসনেও[২] ব্রজলীলার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

সোঽপীহ গোপীশতকেলিকারঃ
কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ।
অর্ঘঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ
প্রাদুর্বভূবোদ্ধৃতভূমিভারঃ।

'সেই গোপীশতকেলিকার, মহাভারতনাট্যের সূত্রধার, (পরমপুরুষ) কৃষ্ণ এখানে ভূমিভারোদ্ধারকারী অংশাবতার রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।'

কামরূপের শাসনগুলিতেও সাহিত্যরসসৃষ্টির বিশেষ প্রয়াস আছে। বনমালবর্মের শাসনে (—দশম শতাব্দের প্রথমার্ধ—) কালিদাসের রঘুবংশের অনুকৃতি স্পষ্ট। বনমালবর্মের সময় হইতে লৌহিত্যসিন্ধু (অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদ) কামরূপের অধিষ্ঠাতা দেব রূপে বন্দিত হইয়াছে।

কামরূপের কয়েকটি শাসনে কবির নাম উল্লিখিত আছে। ধর্মপালের (—দ্বাদশ শতাব্দের প্রথম—) শুভঙ্করপাটক শাসনের রচয়িতা প্রস্থানকলস, পুষ্পভদ্রা শাসনের রচয়িতা অনিরুদ্ধ। এই শাসনের প্রথম সাত শ্লোক রাজার উক্তি। যেমন

হে ভাবিনো নৃপতয়ঃ প্রণয়েন যাচঞাং শ্রীধর্মপালনৃপতেঃ শৃণুতেতি যূয়ম্।
বিদ্যুচ্ছটাচপলরাজ্যমৃষাভিমানস্ত্যাজ্যঃ কদাচিদপি নিত্যসুখো ন ধর্মঃ।

'হে ভাবী নৃপতিগণ, রাজা ধর্মপালের এই প্রার্থনা তোমরা সাদরে শোন। বিদ্যুৎদীপ্তিবৎ চঞ্চল রাজভোগের বৃথা-অভিমান ত্যাগ করিও, কিন্তু শাশ্বত-সুখাবহ ধর্ম কখনো ত্যাগ করিও না।'

শৈব সেন-রাজাদের শাসনগুলিতে যে শ্লোক আছে সেগুলি বেশ ভালো রচনা। যেমন বারাকপুরে প্রাপ্ত বিজয়সেনের শাসনের আরম্ভ শ্লোক।

ক্রৌঞ্চারিদ্বিরদাস্যয়োঃ শিশুতয়া তাতস্য মৌলৌ মিথো
গঙ্গাবারিণি খেলতোঃ শশিকলামালোক্য মধ্যেজটম্।
শৈবালাবলিমধ্যবদ্ধশফরীবুদ্ধ্যা সমাকর্ষতোর্
আক্রন্দস্ফুটকন্দলেন বিহসন্নব্যাজ্জগদ্ ধূর্জটিঃ।

'শিশুচাপল্যে পিতার মস্তকে গঙ্গাবারিতে খেলা করিতে করিতে জটামধ্যে শশিকলাকে শৈবালজালে বদ্ধ শফরী মনে করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে বিবদমান ক্রৌঞ্চারি (কার্ত্তিকেয়) এবং দ্বিরদাস্য (গণেশ) দুই ভাইয়ের অস্ফুট কোলাহল শ্রবণে স্মিতমুখ ধূর্জ্জটি জগৎ রক্ষা করুন।'

কাটোয়ার কাছে সীতাহাটি-নৈহাটিতে প্রাপ্ত বল্লালসেনের শাসনের আরম্ভ শ্লোকটিও ভালো।

সন্ধ্যাতাণ্ডবসন্নিধানবিলসন্নান্দীনিনাদোর্ম্মিভির্
নির্মর্য্যাদরসার্ণবো দিশতু বঃ শ্রেয়োর্দ্ধনারীশ্বরঃ।

---

১ কামরূপশাসনাবলী দ্রষ্টব্য। ২ ঢাকা জেলায় বেলাবো গ্রামে প্রাপ্ত।

> যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহারবলনৈরর্দ্ধে চ ভীমোদ্ভটৈর্
> নাট্যারম্ভরসৈর্জয়ত্যভিনবদ্বৈধানুরোধশ্রমঃ।

'যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গে সুললিত অঙ্গচেষ্টায় এবং অপর অর্দ্ধাঙ্গে ভীমোদ্ভট নাট্যারম্ভ-প্রচেষ্টায় অভিনয়দ্বয়ানুরূপ শ্রম উদ্ভূত হইতেছে, সন্ধ্যাতাণ্ডবোৎসবে উদ্যত নান্দীনিনাদরূপ উর্ম্মিতে উদ্বেলিত রসার্ণব যাঁহার স্বরূপ, সেই অর্দ্ধনারীশ্বর তোমাদের শ্রেয় বিধান করুন।'

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া গোবিন্দপুর তর্পণদীঘি এবং শক্তিপুর গ্রামে প্রাপ্ত শাসনগুলির আরম্ভে দেখা যায়।

> বিদ্যুদ্ যত্র মণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
> বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ।
> ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
> ভূয়াদ্ বঃ স ভবার্ত্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ।

'ফণিপতির মণিদ্যুতি যাহাতে বিদ্যুৎস্বরূপ, বালেন্দু ইন্দ্রধনুস্বরূপ, স্বর্গতরঙ্গিণী বারিস্বরূপ, শ্বেত কপালমালা বলাকাস্বরূপ, যাহা ধ্যানাভ্যাসরূপ সমীরণের দ্বারা প্রেরিত এবং যাহা ভবার্তিতাপধ্বংসকারী —শম্ভুর জটারূপ সেই মেঘ তোমাদের শ্রেয়ঃশস্যের অঙ্কুরোদ্‌গমের হেতু হোক।'

ধান্যোপজীবী বাঙ্গালীর জাতীয় মঙ্গলাচরণ শ্লোক হইবার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ উপযুক্ত॥

৩

কয়েকটি প্রত্নলিপি শাসন-পট্ট নয়, প্রশস্তি-কাব্য। আমাদের দেশে সব চেয়ে পুরানো এমন কাব্য হইতেছে নারায়ণপালের মন্ত্রী ভট্ট গুরব মিশ্রের প্রশস্তি। আটাশ শ্লোকাত্মক এই খণ্ডকাব্যটি গুরব মিশ্র প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে।[১] কুমারপালের মহামন্ত্রী ও মহাবলাধিকৃত (সেনাপতি) বৈদ্যদেব কামরূপ বিজয় করিয়া সেখানে রাজা হইয়াছিলেন। ইহার প্রশস্তি-কাব্য[২] রচনা করিয়াছিলেন মনোরথ। কবি এই আত্মপরিচয় দিয়াছেন

> ইমাং রাজগুরোঃ পুত্রঃ শ্রীমুরারেদ্বিজন্মনঃ।
> পদ্মাগর্ভোদ্‌ভবশ্চক্রে প্রশস্তিং শ্রীমনোরথঃ॥

'রাজগুরু দ্বিজ শ্রীমুরারির পুত্র, পদ্মার গর্ভে উৎপন্ন শ্রীমনোরথ এই প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন।'

হরিবর্মের (—একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দ—) মহামন্ত্রী ভট্ট ভবদেব অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। শৌর্যে মন্ত্রণায় যেমন শাস্ত্রেও তেমনি বিশারদ। ইহার রচিত স্মৃতিগ্রন্থের প্রামাণিকতা সর্বস্বীকৃত। বেদ বেদান্ত মীমাংসা জ্যোতিষ ইত্যাদি শাস্ত্রে ইহার প্রবল পাণ্ডিত্যের উল্লেখ প্রশস্তিকার বন্ধু বাচস্পতি করিয়াছেন।

---

[১] গৌড়লেখমালা দ্রষ্টব্য। [২] কমৌলীতে প্রাপ্ত।

ভবদেবের নিবাস ছিল রাঢ়ে সিদ্ধল গ্রামে। ইনি ভুবনেশ্বরে বিরাট মন্দির ও দীঘি এবং উদ্যান নির্মাণ করাইয়া অনন্তবাসুদেব-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রশস্তিটি সেই মন্দিরের দেওয়ালেই পাওয়া গিয়াছে। তেত্রিশ শ্লোকে গ্রথিত সুচারু কাব্য এই প্রশস্তি। প্রথমে বিষ্ণু-বন্দনা।

গাঢ়োপগূঢ়কমলাকুচকুম্ভপত্রমুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ।
মা লুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি বাগ্‌দেবতোপহসিতোঽস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ।

'কমলাকে গাঢ় আলিঙ্গন করায় তাঁহার কুচকুম্ভপত্রলেখার ছাপ যাহাতে লাগিয়াছে এমন বপুর দ্বারা আলিঙ্গনেচ্ছু হইলে, "অভিনব বনমালা যেন নষ্ট না হয়", এই বলিয়া সরস্বতী যাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন, এমন হরি তোমাদের সম্পদের হেতু হোন।'

তাহার পর সরস্বতীর বন্দনা।

বাল্যাৎ প্রভৃত্যহরহর্যদুপাসিতাসি বাগ্‌দেবতে তদধুনা ফলতু প্রসীদ।
বক্তাস্মি ভট্টভবদেবকুলপ্রশস্তিসূক্তাক্ষরাণি রসনাগ্রমধিশ্রয়েথাঃ।

'হে বাগ্‌দেবী, বাল্যকাল হইতে তুমি প্রত্যহ উপাসিতা হইয়াছ, সেই উপাসনা এখন ফলবতী হোক। তুমি প্রসন্ন হও। ভট্ট ভবদেবের কুলপ্রশস্তি সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিব। তুমি রসনাগ্রে অধিষ্ঠিত হইও।'

চারি শ্লোকে ভবদেবের পাণ্ডিত্য বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন, ইহার "বালবলভীভুজঙ্গ" নাম কে না শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে? তাহার পর ভবদেবের পূর্তকীর্তির বর্ণনা।

রাঢ়ায়ামজলাসু জাঙ্গলপথগ্রামোপকণ্ঠস্থলী-
সীমাসু শ্রমমগ্নপান্থপরিষৎপ্রাণাশয়প্রীণনঃ।
যেনাকারি জলাশয়ঃ পরিসরস্নাতাভিজাতাঙ্গনা-
বক্ত্রাব্জপ্রতিবিম্বমুগ্ধমধুপীশূন্যাব্জিনীকাননঃ।

'রাঢ়দেশে জাঙ্গলপথযুক্ত ও জলহীন গ্রামোপকণ্ঠসীমায় শ্রমার্ত পান্থদের মনপ্রাণের প্রীতিদায়ক জলাশয় ইনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সে জলাশয়ের সুবিস্তৃত বক্ষে প্রতিবিম্বিত স্নানার্থিনী কুলকামিনীর মুখারবিন্দ দেখিয়া মুগ্ধ মধুপগণ পদ্মবন একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে।'

শেষ শ্লোকে কবির আত্মপরিচয়।

তস্যৈব প্রিয়সুহৃদা দ্বিজাগ্রিমেণ শ্রীবাচস্পতি-কবিনা কৃতা প্রশস্তিঃ।
আকল্পং শুচিসুরধামমূর্তিকীর্তেরধ্যাস্তাং জঘনমিব সুবর্ণকাঞ্চী।

'তাঁহার প্রিয়সুহৃদ দ্বিজমুখ্য শ্রীবাচস্পতি কবি কর্তৃক রচিত এই প্রশস্তি পবিত্রদেবমন্দিরস্বরূপিণী কীর্তির জঘনদেশে সোনার কাঞ্চীর মত বিরাজ করুক কল্পান্ত পর্যন্ত।'

সেন-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন বরেন্দ্রভূমিতে ভট্ট ভবদেবের মতো দেব-মন্দির সরোবর ও উদ্যান নির্মাণ করাইয়া প্রদ্যুম্নেশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সশক্তি শিব ও বিষ্ণু মূর্তি এখানে পূজার জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। মন্দিরের চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু মন্দিরে যে প্রশস্তি-শিলাফলক লাগানো ছিল তাহা পাওয়া

গিয়াছে।[১] বিজয়সেনের এই প্রশস্তি একটি খণ্ডকাব্য। ইহার শ্লোক-সংখ্যা ছত্রিশ। কবি মহাসন্ধিবিগ্রহিক উমাপতি-ধর। ইনি ভবদেবের তুলনায় কম অসাধারণ পুরুষ ছিলেন না। বিজয়সেন বল্লালসেন লক্ষ্মণসেন—এই তিন পুরুষের ইনি মহামন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। সেন-বংশের উত্থান (এবং সম্ভবত পতনও) ইহার গোচরে ঘটিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দে যাঁহাদের নাম সমগ্র ভারতবর্ষে কবিরূপে বিখ্যাত হইয়াছিল উমাপতি-ধর তাঁহাদের একজন। জয়দেবের গীতগোবিন্দের উপক্রমে একটি শ্লোকে সমসাময়িক প্রধান কবিদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আছে। তাহাতে উমাপতি-ধর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ইনি কথার পরে কথা গাঁথিতে দক্ষ,—"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ"।

ভবদেব এবং বিজয়সেন দুইজনেই মন্দিরে নৃত্যগীত অভিনয়ের দ্বারা দেবপূজার সর্বাঙ্গীণতার জন্য সুন্দরী নর্তকীর (অর্থাৎ দেবদাসীর) ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা উড়িষ্যায় ও দক্ষিণ ভারতে এখনো চলিত আছে। এ রীতির উৎপত্তি রাজসভায়। লক্ষ্মণসেনের সভায় যে সন্ধ্যাকালে নিয়মমত নাচগান চলিত তাহা তাঁহার পুত্রের শাসনেই ব্যক্ত আছে॥

৪

ভদ্র সাহিত্যে অর্থাৎ সংস্কৃতে কাব্য-নাটকের চর্চা ছিল প্রধানত রাজসভায় ও সামন্ত-সভায়। রাজসভায় সংবর্ধনা পাইলে তবে কবির আভিজাত্য। প্রশস্তি করিবার জন্য রাজসভায় কবি পুষিতেই হইত। রাজমন্ত্রীরাও কবি প্রতিপালন করিতেন। কবিতা শুনিয়া ভালো লাগিলে কবিকে হাতে হাতে বকশিশ দেওয়া হইত অলঙ্কার এবং, অথবা জামা জোড়া। গাড়ী ঘোড়াও দেওয়া হইত, ভূমিসম্পত্তি দান তো ছিলই। উমাপতি-ধরের লেখা এক শ্লোক হইতে জানা যায় যে (বঙ্গাধিপতি শ্রীচন্দ্রের পিতা) হরিকেল-রাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র তাঁহার সভাকবিকে 'চন্দ্রচূড়চরিত' রচনার জন্য প্রচুর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।[২]

রাজপ্রদত্ত ভূষণ অনুসারে কবিরা উপাধি বা ছদ্মনাম গ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছিলেন দ্বাদশ শতাব্দ কিংবা তাহারও পূর্ব হইতে। কঙ্কণ দ্বারা পুরস্কৃত এক কবি "কঙ্কণ" নামে উল্লিখিত আছেন সদুক্তিকর্ণামৃতে। "কঙ্কণ" ও "তাড়ঙ্ক" নাম লইয়া দুই জন সাধক-কবিও চর্যাগীতি রচনা করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দে মৈথিলী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে যে কবি-উপাধিগুলি পাওয়া যায় তাহা এইভাবেই উৎপন্ন। কঙ্কণ পাইলে

[১] দেওপাড়া প্রশস্তি। [২] সদুক্তিকর্ণামৃত ৫-২৯-১ ("নিষ্পন্নে চন্দ্রচূড়চরিতে")।

"কবিকঙ্কণ", শিরোভূষণ ("শেখর") পাইলে "কবিশেখর", কণ্ঠহার পাইলে "কবি-কণ্ঠহার", কুণ্ডল পাইলে "কবিকর্ণপুর"। স্বর্ণরত্ন ভূষার সঙ্গে জামাজোড়া এমন কি "চড়নের ঘোড়া" দেওয়ারও রীতি ছিল এবং এ রীতি ষোড়শ শতাব্দেও লুপ্ত হয় নাই। কবি-পণ্ডিতকে সবচেয়ে বড় খাতির দেখানো হইত কনকস্নানের দ্বারা। পাত্রের চারিদিকে হাতি রাখিয়া তাহার মাথায় রাজার স্বহস্তে সোনার ঘড়ায় জল ঢালিয়া স্নান করানোর নাম "কনকস্নান" বা "কনকাভিষেক"। তাহার পর রাজাভিষেকোচিত দান দেওয়া হইত—হাতি, ঘোড়া, সোনাবাঁধানো চামর, শ্বেত ছত্র, বিভিন্ন রত্নভূষণ ইত্যাদি। (এই রকম আড়ম্বরে দেবমূর্তির প্রতিষ্ঠাও হইত। তুলনীয় ধোয়ীর উক্তি—"দেবরাজ্যা-ভিষিক্তঃ"।) লক্ষ্মণসেন তাঁহার মুখ্য সভাকবি ধোয়ীকে এই ভাবেই সংবর্ধিত করিয়াছিলেন। পবনদূত-কাব্যের শেষে ধোয়ী এই ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে স্নানের উল্লেখ না থাকিলেও তাহা ধরিয়া লইতে হইবে।

> দন্তিব্যূহং কনককলিতং চামরে হেমদণ্ডে
> যো গৌড়েন্দ্রাদলভ কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্তী।
> শ্রীধোয়ীকঃ সকলরসিকপ্রীতিহেতোর্মনস্বী
> কাব্যং সারস্বতমিব মহামন্ত্রমেতজ্ জগাদ ॥

'কবিরাজাদের শ্রেষ্ঠ যিনি গৌড়েশ্বর হইতে হাতির বূহ, সোনাজড়ানো (ছাতা), সোনার বাঁটওয়ালা দুইটি চামর লাভ করিয়াছিলেন, সেই মনস্বী ধোয়ীক সব রসিকজনের প্রীতিহেতু সারস্বত মহামন্ত্ররূপ এই কাব্য ব্যক্ত করিল॥'

এই সঙ্গে কনকস্নানের স্পষ্ট উল্লেখ আছে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের একটি গ্রন্থে। বইটির লেখক গোদাবর মিশ্র ছিলেন উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তমের ও তৎপুত্র প্রতাপরুদ্রের পুরোহিত ও মহামন্ত্রী। ইনি প্রতাপরুদ্রের কাছে এমন দুর্লভ সম্মান পাইয়াছিলেন।[১]

সেকালে রাজসভায় কবি-পণ্ডিতদের খাতির শুধু গুণী বলিয়া ও প্রশস্তি-রচয়িতা বলিয়াই ছিল না, তাঁহারা শাসনকার্যে—এমন কি যুদ্ধ-ব্যাপারেও—রাজাকে উপদেশ অথবা নির্দেশ দিতেন। মুসলমান অধিকার শুরু হইবার চার-পাঁচশত বৎসর পূর্ব হইতেই রাজকার্যে কবি-পণ্ডিতদের এই প্রভাব বাড়িতে থাকে। (কবি-পণ্ডিতেরা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। ব্রাহ্মণ হইলে অধিকন্তু

[১] বইটির নাম 'হরিহরচতুরঙ্গ'। যুদ্ধবিদ্যার গ্রন্থ। গ্রন্থের পুষ্পিকায় আছে,—"ইতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজগজপতিপ্রতাপরুদ্রদেবস্বহস্তধারিতকনককেশরিচতুষ্টয়াবেষ্টিতশাতকুম্ভময়কুম্ভসংভৃত-মেঘাড়ম্বরাভিধানসিতাতপত্রশোভমান···।"

রাজগুরুর সম্মান পাইতেন।) মুসলমান অধিকার শুরু হইবার পর তিন-চারশত বৎসর পর্যন্তও কবি-পণ্ডিতদের ক্ষমতা কমবেশি অপ্রতিহত ছিল। মোগল-শাসনের সময় হইতে এ ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তবে স্বাধীন ও স্বাধীনকল্প প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে অক্ষুণ্ণ থাকে। উত্তর ও উত্তরপূর্ব বাঙ্গালার সীমান্ত রাজ্যগুলিতে—ত্রিপুরায় কামতা-কামরূপে মোরঙ্গে দরঙ্গে ভুলুয়ায়, এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গালায়—মল্লভূমে ও ধলভূমে রাজসভায় কবি-পণ্ডিতদের প্রভাবের ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আচার এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিদ্যা সহজে বিস্তার হইতে পারিয়াছিল॥

৫

বাঙ্গালা ভাষা জন্মিবার অনেককাল পূর্ব হইতেই এদেশে কবি-পণ্ডিতেরা সাহিত্যচর্চা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংস্কৃত রচনা (দেববন্দনা ও রাজপ্রশস্তির কথা বাদ দিলে) তিন রকমের—বড় কাব্য, নাটক এবং প্রকীর্ণ শ্লোক। বড় কাব্য সংস্কৃত মহাকাব্যের ধরণে। এ জাতীয় রচনার সন্ধান বেশি পাওয়া যায় নাই। 'রামচরিত' কাব্যের[১] রচয়িতা অভিনন্দ যদি গৌড়ীয় হন তবে এটি বাঙ্গালী কবির লেখা প্রথম রামচরিত গ্রন্থ। কবির পোষ্টা ছিলেন "পালাম্বুজবনৈকবিরোচন" "শ্রীধর্মপালকুলকৈরবকাননেন্দু" "শ্রীহারবর্ষ" যুবরাজদেব। এই ধর্মপাল বাঙ্গালার হইলে এই যুবরাজদেব সম্ভবত দেবপাল। কিন্তু গুর্জরপ্রতীহারবংশীয় রাজাদের মধ্যেও একজন ধর্মপাল ছিলেন। এবং দেবপালের "হারবর্ষ" বিরুদ ছিল—একথার সমর্থন পাওয়া যায় নাই। সুতরাং রামচরিতের পক্ষে একতরফা রায় দেওয়া যায় না। তবে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত রামচরিত কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য অভিনন্দের রচনায় মিলিতেছে। ইহাতেও দেবীমাহাত্ম্য কীর্তিত। তবে তা রামচন্দ্রের পূজার দ্বারা নয়, হনুমানের মুখে স্তবে।

রামপালের মহামন্ত্রী প্রজাপতি নন্দীর পুত্র, যিনি নিজেকে "কলিকাল-বাল্মীকি" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন, সেই সন্ধ্যাকর নন্দীও একটি 'রাম-চরিত' কাব্য[২] লিখিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতৃভূমি ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনপুর। আর্যা ছন্দে লেখা কাব্যটি আদ্যন্ত শ্লিষ্ট এবং কঠিন রচনা। এক অর্থে রামায়ণ-

[১] গায়কবাড় প্রাচ্যগ্রন্থমালায় প্রকাশিত। ছত্রিশ সর্গ অবধি পাওয়া গিয়াছে। হয়ত এই পর্যন্তই কবির কলম চলিয়াছিল। [২] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত। দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত।

কাহিনী বিবৃত, অপর অর্থে রামপালের কীর্তি ও তাঁহার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় গোপালের ও মদনপালের ইতিহাস।

কবি বৈষ্ণব ছিলেন এবং শিবের পূজা করিতেন তাই প্রথম শ্লোকে কৃষ্ণের ও শিবের বন্দনা।

শ্রীঃ শ্রয়তি যস্য কণ্ঠং কৃষ্ণং তং বিভ্রতঃ ভুজে নাগম্।
দধত: কং দামজটাবলম্বং শশিখণ্ডমণ্ডনং বন্দে।

'লক্ষ্মী যাঁহার কণ্ঠাশ্রিত (অথবা কৃষ্ণ-শোভা যাঁহার কণ্ঠে), যিনি ভুজে কালিয় নাগকে ধরিয়াছেন (অথবা যাঁহার হস্তে ফণি-বলয়), যিনি সুন্দর (বন-) মালাধারী (অথবা যিনি সুন্দর জটাজুটধারী), ও বর্হাপীড় (অথবা শশিকলামণ্ডিত) তাঁহাকে বন্দনা করি।'

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য কাব্য ধোয়ীর 'পবনদূত'। মেঘদূতের অনুকরণে লেখা অজস্র কাব্যের মধ্যে এটি সবচেয়ে পুরানো এবং সবচেয়ে ভালো। ধোয়ী লক্ষ্মণ-সেনের সভায় কবিপ্রধান ছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যে লেখা ছোটবড় অনেক কাব্যের নাম পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন কাব্য হইতে শ্লোকও অন্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। সেকালে কবিদের নাট্যরচনায়ও সমধিক উৎসাহ ছিল।

ভট্ট নারায়ণের 'বেণীসংহার' (অষ্টম শতাব্দ) মহাভারত-কাহিনী অবলম্বনে এবং মুরারি মিশ্রের 'অনর্ঘরাঘব' (একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দ) রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে লেখা। বই দুইটি সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত। সংস্কৃতে প্রচলিত নাটক-নাটিকা-প্রকরণ-প্রহসনের বাহিরে বিবিধ রীতির নাট্য-রচনা সেকালের বাঙ্গালা দেশে (অর্থাৎ পূর্ব ভারতে) অজস্র লেখা হইয়াছিল। সেগুলির একটি তালিকা রহিয়াছে সাগর নন্দীর সঙ্কলিত 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ' নামক নাট্যশাস্ত্রের বইয়ে (পঞ্চদশ শতাব্দের আগে)। এগুলির অধিকাংশেই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ হইতে কাহিনী অবলম্বিত।[১] অপৌরাণিক বিষয়ে লেখা নাট্যরচনাও অনেক ছিল।[২]

কোন কোন নাট্যরচনার বিষয় এবং কৌশল পরবর্তীকালের সাহিত্যে (বাঙ্গালায়) চলিয়া আসিয়াছিল। জয়দেবের প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করিতেছি॥

---

[১] যেমন, 'মারীচবঞ্চিতক', 'কেকয়ীভরত', 'কৃত্যারাবণ', 'বালিবধ', 'কীচকভীম', 'শর্মিষ্ঠাপরিণয়' 'উৎকণ্ঠিতমাধব', 'রেবতীপরিণয়', 'কলিরৈবতক', 'উষাহরণ', 'রাধা', 'সত্যভামা' ইত্যাদি।

[২] যেমন, 'উন্মত্তচন্দ্রগুপ্ত', 'মায়াকাপালিক', 'ক্ষপণককাপালিক', 'মদনিকাকামুক', 'মায়াশকুন্ত' ইত্যাদি।

৬

প্রকীর্ণ শ্লোক—অর্থাৎ চুটকি কবিতা—রচনায় এদেশে সেকালের কবিরা বিস্ময়াবহ প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতিরূপে এমনি কবিতা তো আছেই তাহা ছাড়া দুইটি বড় কবিতাসঙ্কলন গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল ত্রয়োদশ শতাব্দের আগে। তখনো ভারতবর্ষের অন্যত্র সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা সঙ্কলনের কাজে কেহ হাত দেয় নাই। প্রাচীনতর বইটির একটিমাত্র খণ্ডিত পুরানো পুথি নেপালে পাওয়া গিয়াছিল। পুথির প্রাপ্ত অংশে বইটির নাম পাওয়া যায় নাই। স্বর্গীয় এফ. ডবলু. টমাস বইটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নাম দিয়াছিলেন।[১] পরে নূতন ও সম্পূর্ণ পুথিতে নাম মিলিয়াছে—'সুভাষিতরত্নকোশ'।[২] প্রাচীন পুথির লিপি দেখিয়া স্থির হইয়াছে যে পুথিটির লিখন খ্রীষ্টীয় ১২০০ সালের পরে নয়। সুতরাং কবিতাগুলিকে দ্বাদশ অথবা তদূর্ধ্ব শতাব্দের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। সঙ্কলয়িতার নাম টমাস পান নাই। সম্পূর্ণ পুথিতে পাওয়া গিয়াছে —বিদ্যাকর। তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে তিনি সৌগত (অর্থাৎ বুদ্ধোপাসক) ছিলেন। তাহা না হইলে সুগতের বন্দনা করিয়া গ্রন্থকর্ম আরম্ভ করিতেন না। উদ্ধৃত অনেক কবিও বৌদ্ধ ছিলেন। যেমন অপরাজিত রক্ষিত, কুমুদাকর মতি, জিতারি নন্দী, বুদ্ধাকর গুপ্ত, রত্নকীর্তি, শ্রীধর নন্দী, শ্রীপাশ বর্মা, সংঘশ্রী ইত্যাদি। নাম হইতে অনেক কবিকে বাঙ্গালী বলিয়া চেনা যায়। যেমন, মধু শীল, বীর্য মিত্র, শ্রীধর্ম কর, স্মৃতি পাল, বৈদ্য ধন্য, বন্দ্য তথাগত, বিনয় দেব, ভ্রমর দেব, শ্রীহর্ষ দেব, শ্রীরাজ্যপাল, ধরণীধর, লক্ষ্মীধর, সুবর্ণরেখ, জয়ীক, বিত্তোক, বৈদ্যোক, ললিতোক, সিদ্ধোক, সোহ্নোক, হিঙ্গোক ইত্যাদি।[৩]

দ্বিতীয় সঙ্কলন-গ্রন্থটির নাম 'সদুক্তিকর্ণামৃত'।[৪] সঙ্কলন-সমাপ্তির তারিখ খ্রীষ্টীয় ১২০৭ ফেব্রুয়ারি-মার্চ। সঙ্কলনকারী শ্রীধর দাসের পিতা বটু দাস লক্ষ্মণ-সেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও "প্রতিরাজ" (রাজপ্রতিনিধি) ছিলেন। শ্রীধর নিজে

---

[১] এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত (১৯১২)।

[২] ইংগলস্ ও কোশাম্বী সম্পাদিত, হার্ভার্ড ওরিয়েণ্টাল সিরিজ।

[৩] সেকালের বাঙ্গালীর—অর্থাৎ পূর্বভারতীয়ের—আটপৌরে অনেক নামে "-ওক" প্রত্যয় ছিল। এখন ইহা "-ও" হইয়াছে। যেমন হাড়ো, সেধো, ভদো (< ভদ্রোক), চাঁদো ইত্যাদি।

[৪] রামাবতার শর্মা সম্পাদিত ও মোতীলাল বনারসীদাস প্রকাশিত।

ছিলেন "মহামাণ্ডলিক"—অর্থাৎ কোন মণ্ডলের শাসনকর্তা।[১] সদুক্তিকর্ণামৃতের কবিতার অনেক লেখকই বাঙ্গালী। তাহার মধ্যে কয়েকজন আছেন সমসাময়িক রাজা রাজপুত্র রাজামাত্য ও সাধারণ ব্যক্তি। যেমন লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, দিবাকর (যুবরাজ), বাসুদেব সেন, ধোয়ী (কবিরাজ), উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য, গাঙ্গোক (নট), ইত্যাদি। নাম হইতে, বিশেষ করিয়া গাঁই হইতে, আরও কয়েকজনকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারি। যেমন, কমল গুপ্ত, রবি গুপ্ত, যজ্ঞ ঘোষ, চন্দ্র চন্দ্র, তিল চন্দ্র, লডহ চন্দ্র, দিবাকর দত্ত, প্রভাকর দত্ত, কালিদাস নন্দী, ত্রিপুরারি পাল, তৈলবাটীয় গাঙ্গোক, কেশরকোণীয় নাথোক ভবগ্রামীণ বাথোক, করঞ্জ ধনঞ্জয়, শকটীয় শবর, ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন কবি "বঙ্গাল" বলিয়া উল্লিখিত। আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতেও কয়েকজনকে বাঙ্গালী বলিয়া সনাক্ত করা সম্ভব। যেমন সোঙ্কোক, ব্যাস (কবিরাজ), উদয়াদিত্য, বার, নীলাঙ্গ, বেতাল, বিরিঞ্চি, বাচস্পতি ও ধর্ম যোগেশ্বর। সেকালের কবি সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। বৈদ্য কায়স্থ নট কেওট ইত্যাদি জাতির লোকেও কবিতাকর্মে স্বাচ্ছন্দ্য দেখাইয়াছিলেন।

পরবর্তী কালে বাঙ্গালা দেশের (বাঙ্গালা) সাহিত্যে যে প্রবণতা দেখা গিয়াছে তাহার কিছু স্পষ্ট ইঙ্গিত এই প্রকীর্ণ শ্লোকগুলিতে আছে। এই জন্য এবং নিজস্ব মূল্যের জন্য ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলি বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। কিছু পরিচয় দিতেছি।

গোপনে মিলনের কামনায় কৃষ্ণ রাধার গৃহদ্বারে আসিয়াছেন। গোপী তাঁহাকে প্রথমেই আমল না দিয়া উপহাস করিয়া জেরা করিতেছে। তাহাতে কৃষ্ণ পর্যুদস্ত। —এইভাবের পদাবলী ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দে অজ্ঞাত নয়। সুভাষিতরত্নকোশের একটি শ্লোকে ইহার মূল মিলিতেছে।

কোঽয়ং দ্বারি হরিঃ প্রযাহ্যুপবনং শাখামৃগেণাত্র কিং
কৃষ্ণোঽহং দয়িতে বিভেমি সুতরাং কৃষ্ণঃ কথং বানরঃ।
মুগ্ধেঽহং মধুসূদনো ব্রজ লতাং তামেব পুষ্পাসবাং
ইত্থং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া হ্রীণো হরিঃ পাতু বঃ॥

"'দ্বারে ও কে?" "হরি।" "উপবনে যাও, বানরের এখানে প্রয়োজন কি?" "প্রিয়ে, আমি কৃষ্ণ।" "বড় ভয় করিতেছে। বানর কি কালো হয়?" "বোকা মেয়ে, আমি মধুসূদন।" "যাও তবে ফুল ফুটিয়াছে যে লতায়।"—এইভাবে প্রিয়ার দ্বারা বাক্যহারা হইয়া লজ্জিত হরি তোমাদের রক্ষা করুন।'"

রাধার দুর্জয় মানে কৃষ্ণ নির্বিণ্ণ হইয়া রাধার কাছে আসিতেছে না। রাধা

[১] সেন-রাজাদের সময়ে শাসনকার্যের ও রাজস্ব-আদায়ের জন্য দেশ-বিভাগ পর পর এই রকম ছিল—ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বীথী, চতুরক, গ্রাম।

দূতীকে কৃষ্ণের সন্ধানে এখানে ওখানে পাঠাইলেন। কিন্তু তাহাকে কোথাও পাওয়া গেল না।—এ বিবরণও বৈষ্ণব-পদাবলীতে অজ্ঞাত নয়। ঠিক এই বস্তুই পাই সুভাষিতরত্নকোশের আর একটি শ্লোকে।

কৃষ্ণকে কোথাও না পাইয়া সখী-দূতী রাধার কাছে আসিয়া নিবেদন করিতেছে।

ময়ান্বিষ্টো ধূর্তঃ স সখি নিখিলামেব রজনীম্
ইহ স্যাদত্র স্যাদিতি নিপুণমন্যামভিসৃতঃ।
ন দৃষ্টো ভাণ্ডীরে তটভুবি ন গোবর্ধনগিরের্
ন কালিন্দ্যাঃ [কূলে] ন চ নিচুলকুঞ্জে মুররিপুঃ।

'সখী, এখানে থাকিতে পারে ওখানে থাকিতে পারে, অন্য নারীর অভিসারে মিলিতে পারে—এই ভাবিয়া আমি সারা রাত ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সেই ধূর্তকে খুঁজিয়াছি। কিন্তু মুরারিকে কোথাও দেখিতে পাই নাই—ভাণ্ডীর-তলে নয়, গোবর্ধনগিরির তটভূমিতে নয়, কালিন্দীর কূলে নয়, বেতস-কুঞ্জেও নয়।'

সুভাষিতরত্নকোশের আর একটি শ্লোকে গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ভাব অভিব্যক্ত।

[যূয়ং গচ্ছত] ধেনুদুগ্ধকলশানাদায় গোপ্যো গৃহং
দুগ্ধে বস্কয়িণীকুলে পুনরিয়ং রাধা শনৈর্যাস্যতি।
ইত্যন্যব্যপদেশগুপ্তহৃদয়ঃ কুর্বন্ বিবিক্তং ব্রজং
দেবঃ কারণনন্দসূনুরশিবং কৃষ্ণঃ স পুষ্ণাতু বঃ।

' "গাই-দুধের কলস লইয়া গোপী তোমরা ঘর যাও, বকনাগুলি দোহা হইলে রাধা ধীরে সুস্থে যাইবে।" —এই ছলে মনের ভাব গোপন রাখিয়া গাইবাথানকে নির্জন করিলেন যিনি, নন্দপুত্ররূপে অবতীর্ণ সেই কৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল করুন।'

সদুক্তিকর্ণামৃতে সঙ্কলিত উমাপতি ধরের একটি কবিতায় চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবমতের (অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণলীলাচিন্তার) পূর্বাভাস আছে।

রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়া
রুক্মিণ্যাপি প্রবলপুলকোদ্ভেদয়ালিঙ্গিতস্য।
বিশ্বং পায়ান্ মসৃণযমুনাতীরবানীরকুঞ্জে
রাধাকেলিভরপরিমলধ্যানমূর্ছা মুরারেঃ॥

'রত্নচ্ছায়াস্ফুরিত জলধির তীরে দ্বারকার মন্দির মধ্যে প্রবলভাবে পুলকিত রুক্মিণীর আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়াও শ্যামল যমুনাতীরের বেতসকুঞ্জে রাধার সঙ্গে প্রেমক্রীড়ার মহত্ত্ব ও মাধুর্য ধ্যান করিতে করিতে মুরারির যে মূর্ছা তাহা বিশ্বকে পালন করুক।'

সদুক্তিকর্ণামৃতের কোন কোন কবিতায় পল্লীজীবনের শান্ত ছবি এবং দরিদ্র গৃহস্থালির দীন চিত্র আঁকা হইয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যে এ বর্ণনা অভিনব।[১]

[১] প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী পৃ ৫৪-৫৮ দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ মহাপণ্ডিত কবি শরণের এই শ্লোকটির যথাযথতা অদ্ভুত। হাট-যাত্রী মেয়েদের বর্ণনা।

এতাস্তা দিবসান্তভাস্করদৃশো ধাবন্তি পৌরাঙ্গনাঃ
স্কন্ধপ্রস্খলদংশুকাঞ্চলধৃতিব্যাসঙ্গবদ্ধাদরাঃ।
প্রাতর্যাতকৃষীবলাগমভিয়া প্রোৎপ্লুতা বর্ত্মচ্ছিদো
হট্টক্রয্যপদার্থমূল্যকলনব্যগ্রাঙ্গুলিগ্রন্থয়ঃ।

'এই ছুটিতেছে গৃহস্থ মেয়েরা, চোখ (অথবা কান্তি) অরুণবর্ণ; কাঁধ হইতে খসিয়া পড়া বস্ত্রাঞ্চল ঠিক করিয়া দিতে তাহাদের আকুলতা; সকালে কাজে গিয়াছে চাষী-কর্তা—তাহার আগমনের ভয়ে লাফাইয়া লাফাইয়া তাহারা পথ সংক্ষেপ করিতেছে, হাটে কিনিবার জিনিসের দাম আঙুলের গাঁটে গোনায় তাহারা ব্যগ্র।'

সমৃদ্ধ চাষীঘরের ও সম্পন্ন গ্রামের প্রসন্ন বর্ণনা পাই অজ্ঞাতনামা কবির এক শ্লোকে। এ ছবি আমাদের এখনো মন ভুলাইতে সমর্থ।

শালিচ্ছেদসমৃদ্ধহালিকগৃহাঃ সংসৃষ্টনীলোৎপল-
স্নিগ্ধশ্যামযবপ্ররোহনিবিড়ব্যাদীর্ঘসীমোদরাঃ।
মোদন্তে পরিবৃত্তধেনুড়ুহশ্ছাগা পলালৈর্নবৈঃ
সংসক্তধ্বনদিক্ষুযন্ত্রমুখরা গ্রামা গুড়ামোদিনঃ।

'ধানকাটার পরে চাষীর ঘর সমৃদ্ধ। নীলোৎপলের সংযোগে নবপ্ররূঢ় শ্যামল যবাঙ্কুরে খেতের সীমা দীর্ঘায়িত। গাই বলদ ছাগল ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন পোয়াল যথেচ্ছ খাইতেছে। আখমাড়াই-কলের ঘর্ষণ-শব্দে মুখর গ্রাম সব গুড়ের গন্ধে আকুল।'

দারিদ্র্যের অতিরঞ্জিত চিত্রও আছে। যেমন

চলৎকাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণসঞ্চয়ম্।
গণ্ডূপদার্থিমণ্ডূকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম।[১]

'কাঠ খসিয়া পড়িতেছে, দেওয়াল গলিয়া পড়িতেছে, চালের খড় (স্থানে স্থানে) জড় হইয়া গিয়াছে। আমার জীর্ণ ঘর কেঁচোর শিকারী বেঙে আকীর্ণ।'

গৌরী কর্তৃক পতিগৃহস্থালির দুর্দশার বর্ণনা মধ্যকালের বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত। সদুক্তিকর্ণামৃতের কয়েকটি শ্লোকেও শিবের দরিদ্র গৃহস্থালির বর্ণনা আছে। এখানে কিন্তু বক্তা গৌরী নয়, ভৃঙ্গী।

কোন "বঙ্গাল" (অর্থাৎ পূর্ব বা উত্তরবঙ্গ নিবাসী?) কবির একটি শ্লিষ্ট শ্লোকে গঙ্গার মাহাত্ম্য এবং আত্মপ্রশংসা আছে। আমরা শ্লোকটিকে বঙ্গাল-কবির নির্লজ্জ আত্মশ্লাঘা বলিয়া মনে না করিয়া চিরদিনের বঙ্গবাণীর এবং চিরকালের গঙ্গার প্রশস্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারি।

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিমসুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ॥

[১] তুলনীয় মুকুন্দরামের ফুল্লরা-বারমাস্যা।

'ঘনরসময়ী, গভীর, বাঁকে শোভমান (বক্রে ত্রিশোভন), বিবিদের দ্বারা আশ্রিত (অনুশীলিত) গঙ্গায় এবং বঙ্গাল-বাণীতে অবগাহন করিলেই পুণ্য (স্নিগ্ধতা)।'

অমরকোষের সর্বপ্রাচীন টীকাকার সর্বানন্দ বাঙ্গালী ছিলেন,—"বন্দ্যঘটীয়" অর্থাৎ বন্দিঘাটি গাঁইয়ের লোক, এখনকার বাঁড়ুজ্জে বা বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বাদশ শতাব্দের মাঝামাঝি তিনি 'টীকাসর্বস্ব' লিখিয়াছিলেন। সর্বানন্দ আমাদের জানা অজানা অনেক গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি এদেশে লেখা। এরকম বইয়ের উদ্ধৃতি হইতেও সেকালের বাঙ্গালী কবির সংস্কৃত রচনার নমুনা পাই। "সাহিত্যকল্পতরু" শ্রীপোব্যোকের 'বাসনামঞ্জরী' হইতে সর্বানন্দ তাঁহার গ্রন্থে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। পোব্যোকের নামে "শ্রী" থাকায় মনে হইতেছে হয়ত ইনি কবির সমসাময়িক। 'বৃত্তরত্নাকর'এর রচয়িতা কেদার ভট্টের পিতাও (কাশ্যপগোত্রীয়) পব্যেক বা পোব্যোক। এই দুই পোব্যোক এক ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়। কেদার ভট্ট যে বাঙ্গালী ছিলেন তাহার সমর্থনে বৃত্তরত্নাকর হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট খাদ্যের বর্ণনা আছে। কোনও ব্যক্তি তাহার প্রিয়াকে পাড়াগাঁয়ে বাস করাইবার উদ্দেশ্যে আর্থিক সুবিধার কথা কৌশলে বুঝাইতেছে।

তরুণং সর্ষপশাকং নবোদনং পিচ্ছিলানি চ দধীনি।
অল্পব্যয়েন-সুন্দরি গ্রাম্যজনো মিষ্টমশ্নাতি॥

'কচি সরিষা শাক, নূতন চাউলের ভাত, পাতলা দই।—সুন্দরী, গ্রামের লোক অল্প খরচাতেই (এমনি) ভালো খাবার খায়।'

সর্বানন্দ বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন। তাই গ্রন্থারম্ভে গোপাল-কৃষ্ণের বন্দনা

বর্হিণবর্হাপীড়ঃ সুষিরপরো বালবল্লবো গোষ্ঠে।
মেদুরমুদিরশ্যামলরুচিরব্যাদ্ এষ গোবিন্দঃ॥

'উষ্ণীষে শিখিপুচ্ছধারী বেণুবাদনরত স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামলকান্তি গোষ্ঠের বালগোপাল সেই গোবিন্দ (সকলকে) পালন করুন।'

টীকাসর্বস্বে উদ্ধৃত এই শ্লোকটিতে সেকালের পরিহাস-কবিতার নমুনা পাইতেছি।[১] সেই সঙ্গে মঙ্গল-গানের উল্লেখও অনুধাবনযোগ্য।

---

[১] এমন উদ্ভট শ্লোক খ্রীস্টপূর্ব শতাব্দেও খুব পরিচিত ছিল। তখন এ ধরনের শ্লোকের নাম ছিল "ভ্রাজ"। পতঞ্জলি "ভ্রাজাঃ নাম শ্লোকাঃ" বলিয়া এই চমৎকার শ্লোকটি মহাভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"যদুদুম্বরবর্ণানাং ঘটীনাং মণ্ডলং মহৎ।
পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তৎ ক্রতুগতং নয়েৎ॥"

'(শুঁড়ির ঘরে) ডুমুর-রঙ' (মদের) ঘড়ার বিরাট সারি খাইয়া উজাড় করিলে যদি স্বর্গে না যাওয়া যায় তবে কি তা যজ্ঞে (উজাড় করিলে) স্বর্গে লইয়া যাইবে ?'

জরদ্গবঃ কম্বলপাদুকাভ্যাং দ্বারি স্থিতো গায়তি মঙ্গলানি।
তং ব্রাহ্মণী পৃচ্ছতি পুত্রকামা রাজন্ রুমায়াং লশুনস্য কোঽর্ঘঃ।

'জরদ্গাব (বুড়ো ষাঁড় লইয়া ভিখারী) কম্বলের জুতা পরিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া মঙ্গল গাহিতেছে। পুত্রকামা ব্রাহ্মণী (গৃহিণী) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—রাজা মহাশয়, রুমায় (রোমে, আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় অথবা কন্‌স্টাণ্টিনোপলে) রশুনের দর কত?'

৭

গীতিকবিতা—যে কবিতা গান করিবার জন্য লেখা—সংস্কৃত সাহিত্যে ছিল না। সাধারণ গান বলিতে তখন দুই (বড় জোর চার) ছত্রের ছোট শ্লোক। বৈদিক সাহিত্যে ইহার নাম ছিল গাথা। সাহিত্য না থাক লোক-ব্যবহারে গীতি-কবিতার প্রচলন ছিল, এবং যদিও তাহার আকার কেমন ছিল তাহা জানা নাই তবুও অনুমান করিতে পারি গঠনে ভাষণে এবং বিষয়ে এগুলি পরবর্তী কালের গীতিকবিতার পূর্বপুরুষ। এ জিনিসের প্রথম নিদর্শন যাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা কালিদাসের বিক্রমোর্বশীর চতুর্থ অঙ্কের গান কয়টি, অপভ্রংশে রচিত। এগুলিতে অবশ্য কবির স্বাক্ষর ("ভনিতা") পাই না। কিন্তু কালিদাসের কালে ভনিতা দিয়া গান রচনার রীতি যে অজানা ছিল না তাহার প্রমাণ আছে মেঘদূতে।[১] কালিদাসের লেখা[২] অপভ্রংশ গানের একটি উদাহরণ দিই।

চিন্তা দুম্মিঅ-মাণসিআ।
সহঅরি-দংসণ-লালসিআ॥
বিঅসিঅ-কমল-মণোহরএ।
বিহরই হংসি সরোবরএ॥

'সহচরীর দর্শনোৎসুক হংসী চিন্তাভারগ্রস্ত মনে প্রফুল্লকমলযুক্তমনোহর সরোবরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।'

এমনি গান রচনার রীতি অপভ্রংশ হইতে ক্রমে সংস্কৃতেও গৃহীত হইল অন্তত দুইজন কবির দ্বারা। একজন কাশ্মীরের ক্ষেমেন্দ্র, আর একজন পূর্ব-ভারতের জয়দেব। ক্ষেমেন্দ্রের লেখা একটিমাত্র গান পাওয়া গিয়াছে। জয়দেব একটি গোটা গীতিনাট্যই লিখিয়াছিলেন। দুইজনেরই রচনার বিষয় কৃষ্ণের ব্রজপ্রেমলীলা। ইহা হইতে অনুমান করিতে ইচ্ছা হয় যে অপভ্রংশে (এবং সংস্কৃতেও) কৃষ্ণলীলা-গান লোক-ব্যবহারে দীর্ঘকাল হইতে প্রচলিত ছিল।

ক্ষেমেন্দ্র জয়দেবের প্রায় একশত বৎসর আগেকার লোক। ইহার লেখা

---

১ "মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা"।
২ কোন কোন পণ্ডিত গানগুলিকে পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ বলিয়া অযথা সন্দেহ করেন।

ভনিতাহীন গানটি 'দশাবতারচরিত্র' কাব্যে (৮-১৭৩) আছে। কৃষ্ণ মথুরা চলিয়া গেলে ব্রজগোপীরা এই গান গাহিয়াছিল। ছন্দের তরঙ্গ অভূতপূর্ব।

ললিতবিলাসকলাসুখখেলন-
ললনালোভনশোভনযৌবন-
মানিতনবমদনে।
অলিকুল কোকিলকুবলয় কজ্জল-
কালকলিন্দসুতাবিবলজ্জল-
কালিয়কুলদমনে
কেশিকিশোরমহাসুরমারণ-
দারুণ গোকুলদুরিতবিদারণ-
গোবর্ধনধরণে।
কস্য ন নয়নযুগং রতিসজ্জে
মজ্জতি মনসিজতরলতরঙ্গে
বররমণীরমণে॥

'ললিত বিলাসকলায় সুখক্রীড়ায় নারীপ্রিয় শোভন যৌবনের দ্বারা যিনি মান্য নব-মদন স্বরূপ অলিকুল কোকিল কুবলয় কজ্জল কালো যমুনার জলরাশি এবং কালিয়নাগবংশ যিনি জয় করিয়াছেন, অশ্বদানব কেশী (প্রভৃতি) মহা অসুর মারিয়া যিনি গোকুলের দারুণ বিপদ দূর করিয়া গোবর্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, রতিসাজে সজ্জিত, উত্তাল কামসমুদ্র, সেই শ্রেষ্ঠ রমণী-আকাঙ্ক্ষিত (কৃষ্ণে) কাহার নয়ন-যুগল মগ্ন না হয়।'

৮

জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ বড় মৌলিক কবি। সেকালের লৌকিক-সাহিত্যের গীতিকবিতাকে সংস্কৃতে ঢালিয়া সাজিয়া ইনি দেবভাষায় অভিনব কবিতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনি এক হিসাবে বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক আর্য-ভাষার আদিকবিও বটেন। ইঁহারই গীতিকবিতার আদর্শে বাঙ্গালা দেশে মিথিলায় ও অন্যত্র রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী ও অনুরূপ গীতিকবিতার ধারাস্রোত নামিয়াছিল।

জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। কোন তারিখ পাওয়া না গেলেও নানা দিক হইতে এই অনুমানের সমর্থন মিলে। জয়দেব সম্ভবত শেষের দিকে লক্ষ্মণসেনের কবিসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোক হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে জয়দেব কমবেশি দূরদেশ হইতে আসিয়া গৌড়েন্দ্রের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।[১]

জয়দেব বাঙ্গালী ছিলেন—এই মতই সাধারণ্যে স্বীকৃত। তবে উড়িষ্যাতেও

[১] সদুক্তিকর্ণামৃত ৩-১১-৫ দ্রষ্টব্য।

জয়দেবের ঐতিহ্য আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। জয়দেবের কোন কোন গানের ভনিতায় নিজেকে "কেন্দুবিল্বসম্ভব-রোহিণীরমণ" বলিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে তাঁহার অভিজন অথবা নিবাস ছিল কেন্দুবিল্বে। কেন্দুবিল্ব তাঁহার "অভিজন"—অর্থাৎ পূর্বপুরুষের নিবাস—হইলে কিছু বলিবার নাই, কেননা "কেন্দুলি" বলিয়া এখন কোন গাঁই নাই। নিবাস হইলে অন্য কথা। কেন্দুলি গ্রামের অস্তিত্ব বাঙ্গালা দেশে কখনো হয়ত ছিল, এখন লুপ্ত। জয়দেবের মেলা যেখানে বসিয়া থাকে তাহাকে কেঁন্দুলি বলিলেও তাহা কোন গ্রামের মেলা নয়, অজয়ের ধারে বালুতটে পৌষসংক্রান্তি-স্নানের মেলা। নিকটে যে গ্রাম আছে তাহার নামও কেঁন্দুলি নয়। এখানে কেঁন্দুলি গ্রাম ছিল বলিয়া কোন প্রমাণও নাই। শুধু স্নানমেলার নাম "জয়দেব-কেঁন্দুলি" পাই অথবা শুধু "কেঁন্দুলি"। ইহাও অনুধাবনযোগ্য যে এই অঞ্চলে "কেঁন্দুলি" শব্দটি মেলা অর্থে সাধারণ বিশেষ্যরূপে সমধিক প্রচলিত। চৈতন্যের সময়ে জয়দেবের স্মৃতি-সংবলিত এ মেলার কোন উল্লেখ নাই, এবং জয়দেবের জন্মস্থান বা বাসস্থানরূপে কেঁন্দুলির বা অন্য কোন গ্রামের কথাও নাই। নিত্যানন্দের জন্মস্থান এস্থান হইতে খুব বেশি দূরে নয়। সুতরাং চৈতন্যচরিতে কেঁন্দুলির অনুল্লেখ বিস্ময়াবহ। মেলা-স্থানের নিকটে যে মন্দির ও দেবস্থান আছে তাহার ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে।[১] এ দেবস্থান আসলে "অস্থল", অবাঙ্গালী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর মঠ, বর্ধমান-রাজের বন্দিত।

উড়িষ্যায় পুরীর অনতিদূরে প্রাচী নদীর ধারে কেন্দুবিল্ব গ্রাম আছে বলিয়া উড়িষ্যার কোন কোন পণ্ডিত দাবি করেন। এ দাবি কতদূর প্রমাণসহ জানি না, খোঁজখবর লইয়াও গ্রামটির আসল নাম কি এবং সেখানে জয়দেবের ঐতিহ্য কত দিনের তাহা জানিতে পারি নাই। সুতরাং বাঙ্গালা দেশের দাবি বেশি পুরানো বলিয়া আপাতত স্বীকার করিতেই হয়। মনে হইতে পারে যে গীত-গোবিন্দের গাঢ় আদিরস উড়িষ্যার মন্দিরের একধরনের স্থাপত্য শিল্পেরই প্রতি-ফলন, সুতরাং জয়দেব উড়িষ্যা-নিবাসীই হইবেন। এ যুক্তি টেঁকসই নয়। কৃষ্ণের ব্রজলীলায় গাঢ় আদিরস (eroticism) প্রায় গোড়া হইতেই বর্তমান। সুভাষিতরত্নকোশের কোন কোন শ্লোকে তাহার বেশ পরিচয় আছে। বরং উলটা কথাই বলিতেই হয়, জয়দেবের কাব্যে শ্লীলতার গণ্ডী সাবধানে রক্ষিত

---

[১] অষ্টাদশ শতাব্দে রচিত, বনমালী দাসের 'জয়দেবচরিত্র' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত) দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে, অন্তত সংস্কৃত কবিতায় ইহার অপেক্ষাও স্থূলরসাবলেপ মোটেই দুষ্প্রাপ্য নয়। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে তুলনা করিলে জয়দেবের গীত-গোবিন্দকে তো পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদা দিতে হয়।

গীতগোবিন্দের কোন কোন পুথিতে কাব্যের শেষে একটি শ্লোকে কবির আত্মপরিচয় আছে। এ শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার আবশ্যকতা নাই।

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য রামা[১]-দেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু॥

'শ্রীভোজদেবের ঔরসজাত, রামাদেবীর পুত্র শ্রীজয়দেবের (এই) শ্রীগীতগোবিন্দের কাব্যরস পরাশর প্রভৃতি প্রিয় আত্মীয়ের কণ্ঠে থাকুক।'

"বন্ধু" মানে বিবাহসূত্রে লব্ধ আত্মীয়, অর্থাৎ মাতুল-বংশের অথবা শ্বশুর-গোষ্ঠীর লোক। হয়ত পরাশর কবির শ্যালক ছিলেন এবং গীতগোবিন্দপদাবলীর প্রথম ও প্রধান গায়ক। পত্নী পদ্মাবতীর নাম কোন কোন গানের ভনিতায় এবং শ্লোকেও উল্লিখিত হইয়াছে। গীতগোবিন্দ-রচনার পূর্বেই জয়দেবের কবি-খ্যাতি দৃঢ়মূল হইয়াছিল। নতুবা তিনি ভনিতায় নিজেকে "কবিরাজ" বা "কবিনৃপ" বলিতেন না।

গীতগোবিন্দ আসলে গীতিনাট্য। যদিও সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত মহা-কাব্যের পোষাক পরানো আছে তবুও মৌলিক নাট্যরূপটি যে ধরা কঠিন নয় তাহা পরে দেখাইতেছি। গীতগোবিন্দকে কবি "মঙ্গল" বলিয়াছেন,—"মঙ্গলম্ উজ্জ্বলগীতি"। ইহা যে মঙ্গল-গানের মতই দল বাঁধিয়া গাওয়া হইত তাহাও কবির উক্তি হইতে অনুমান করিতে পারি। দশাবতার-বন্দনার পরে মঙ্গলাচরণ গানটির শেষে কবি বলিয়াছেন,

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি॥

'তোমার চরণে আমরা এই প্রণাম করিতেছি, প্রণত (আমাদের) কৃপা কর, কুশল কর। শ্রীজয়দেব কবির এই দীপ্ত গীতময় মঙ্গল (রচনা) (তোমার ও শ্রোতাদের যেন) আনন্দ দেয়।'

এ প্রার্থনা লেখক-কবির নয় গায়ক-কবির। আর কোনো গানের ভনিতায় বহুবচন "বয়ম্" নাই। সুতরাং এখানে "বয়ম্" মানে তাঁহার গীতিনাট্যের গায়ক-দল। মঙ্গল-গানের ও কীর্তন-পদাবলীর আসরে মঙ্গলাচরণ করিয়া মূল পালা আরম্ভের আগে গায়ন-বায়ন সকলে মিলিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া থাকেন। এখানেও তাহাই।

---

[১] পাঠান্তর 'বামা'।

মনে হয় জয়দেবের দলে কবিই অধিকারী ছিলেন, সম্ভবত মূল গায়নও। পরাশর প্রভৃতি আত্মীয় ছিলেন দোহার ও বায়ন। নাচ করিতেন পদ্মাবতী। একটি পদের ভনিতায় জয়দেব নিজেকে "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী" বলিয়াছেন। এ কথার একমাত্র সঙ্গত অর্থ—"যিনি পদ্মাবতীর চরণ-চালকদের অধ্যক্ষ"। "প্রেরণ"-নৃত্যকারীর চরণচালক মানে গায়ন ও বায়ন। আর তাহাদের চক্রবর্তী বলিতে দলের অধিকারী।

পদ্মাবতী যে গীতগোবিন্দের নাচ নাচিতেন সে ইঙ্গিত অন্যত্রও মিলিয়াছে, এবং সে ঐতিহ্য ষোড়শ শতাব্দের পরেকার নয়। ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগে কামতা-কামরূপের (কোচবিহারের) এক রাজসভাকবি রাম-সরস্বতী গীত-গোবিন্দ অবলম্বনে একটি বর্ণনাময় কাব্য লিখিয়াছিলেন। সেই কাব্যে[১] কবি প্রত্যেক গানের ব্যাখ্যার আগে বলিয়াছেন যে জয়দেব গানটি করিতেছেন আর সেই গানের রাগ-তাল ধরিয়া পদ্মাবতী নাচিতেছেন।

কৃষ্ণের গীতক জয়দেবে নিগদতি
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী।

সেকশুভোদয়ায় লক্ষ্মণসেনের সভায় পদ্মাবতীর ও জয়দেবের সঙ্গীতকারক হিসাবে সর্বোৎকর্ষের একটি গল্প আছে।[২]

জয়দেব-পদ্মাবতীকে লইয়া পরবর্তী কালে বিচিত্র কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্রে (অষ্টাদশ শতাব্দ), কৃষ্ণদাসের 'ভক্তমাল'এ ও জগন্নাথদাসের 'ভক্তচরিতামৃত'এ (অষ্টাদশ শতাব্দের উপান্ত) এই কাহিনী দ্রষ্টব্য। আধুনিক কালে সঙ্কলিত একটি গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি বৃহৎ পুরাণ-জাতীয় কাহিনী পাইতেছি। বইটির নাম 'লীলা ও নিত্যভাবে শ্রীজয়দেব-পদ্মাবতী উপাখ্যান' (১৩২১)। লেখক—অধরচাঁদ চক্রবর্তী—বলিয়াছেন যে তাঁহার উপজীব্য সনাতন-রচিত সংস্কৃত 'প্রেমভক্তিকল্পবৃক্ষ'। এ বইয়ের কোন সন্ধান পাই নাই।

গীতগোবিন্দে চব্বিশটি গান আছে। সেগুলিই মূল গীতনাট্য-"প্রবন্ধ"। সংস্কৃত শ্লোকগুলি অধিকাংশ খুব প্রাসঙ্গিক নয়।[৩] পালাটি রাধাবিরহ। কৃষ্ণ রাধাকে এড়াইয়া অন্য গোপীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে জানিয়া রাধার দুর্জয় মান, ভর্ৎসিত ও পরিত্যক্ত কৃষ্ণের নির্বেদ, এবং সখী-দূতীর মধ্যস্থতায় দুইজনের

---

[১] 'গীতগোবিন্দ', কালীরাম দেবশর্মা সংগৃহীত, ১৯২০ সালে প্রকাশিত।

[২] প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ ৪৬-৪৭ দ্রষ্টব্য।

[৩] বিচিত্র সাহিত্য প্রথম খণ্ড পৃ ১৪-১৬ দ্রষ্টব্য।

মিলন—ইহাই গীতগোবিন্দের বস্তু। পাত্রপাত্রী তিনজন—রাধা, কৃষ্ণ ও সখী। তাহার মধ্যে সক্রিয় ভূমিকা শুধু সখীরই। বৃহদ্ধর্মপুরাণে যে রাধাবিরহ গানের বর্ণনা আছে তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে মনে হয় জয়দেবের গীতিনাট্যেও রাধা ও কৃষ্ণ এই দুই ভূমিকা পুতুলের দ্বারা প্রদর্শিত হইত, গান দোহারে গাহিত, আর সখীর ভূমিকা অধিকারী অথবা প্রধান গায়ন গ্রহণ করিত। (এখনকার দিনেও কৃষ্ণযাত্রায় অনেকটা এই রকমই হয়।) গীতগোবিন্দে সখীর গানই সংখ্যায় বেশি, তাহার পরে রাধার। কৃষ্ণের গান তিনটিমাত্র।

আগেই বলিয়াছি, পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-পদাবলীর বিষয় ও গঠনরীতি জয়দেবের গানেরই মতো। জয়দেবের গানের ভাষা সংস্কৃত। এ সংস্কৃত-রীতি আসলে প্রাকৃত (অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ) ভাষার সম্পূর্ণ ছায়াবহ। সংস্কৃতের হ্রস্বদীর্ঘ অক্ষর-পরম্পরা অথবা প্রাকৃতের হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রা-মান বাঙ্গালা ভাষায় যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায় না। সেইজন্য বাঙ্গালা (ও মৈথিলী) ভাষা উদ্ভূত ও প্রচলিত হইবার পরেও জয়দেবের গানের ভাষার ভাঙ্গা পদ্ধতি চলিতে থাকে। এ পদ্ধতির মূলে ছিল অবহট্‌ঠ গান। সুতরাং সেই ভাঙ্গা পদ্ধতিতে অবহট্‌ঠেরই কালোপযোগী পরিবর্তিত রূপ অবলম্বিত। ইহাই মিশ্রভাষা "ব্রজবুলি"র উৎস।

জয়দেবের গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধ্বনিঝঙ্কার ও ছন্দোলালিত্য। কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, জয়দেবের গানগুলি গোড়ায় প্রাকৃতে (অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠে) লেখা হইয়াছিল পরে সংস্কৃতে অনূদিত হয়। ঐ অনুমানের পক্ষে ভারসহ যুক্তি নাই। বরং উল্টা দিকে আছে। গীতগোবিন্দের পদাবলীর ঝঙ্কার প্রাকৃত ভাষায় অমন করিয়া বাজিতে পারিত না। যুক্ত ব্যঞ্জন—যুগ্ম নয়—সংস্কৃতের বাহিরে মিলে না। সুতরাং প্রাকৃতে এমন ধ্বনিতরঙ্গ তোলা সম্ভব হইত না।

ছন্দের প্রসঙ্গে বলিতে গেলে এক বিষয়ে জয়দেব ভারতীয় সাহিত্যে অদ্যাবধি দ্বিতীয়রহিত। তাহা হইতেছে একছত্রের শ্লোক রচনা। মাঝখানে মিল থাকায় একছত্র হইলেও ছন্দ হিসাবে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল॥

জয়দেবের গানের ধুয়াও বড় বিচিত্র। ধুয়ার পদও আছে, ছত্রও আছে। পদ যেমন

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্॥

ছত্র যেমন

জয় জয় দেব হরে॥

অথবা

যামি হে কমিহ শরণমিহ সখীবচনবঞ্চিতা॥

ঘুরিয়া ফিরিয়া এই জিনিসই বহু পরবর্তী কালে কীর্তনগানে তুকে ও আঁখরে পরিণত হইয়াছে।

গীতগোবিন্দে চব্বিশটি সংস্কৃত পদ কতকগুলি অল্পবিস্তর প্রাসঙ্গিক শ্লোকে গ্রথিত হইয়া দ্বাদশসর্গাত্মক কাব্যরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। শ্লোকগুলি সব জয়দেবের রচনা না হওয়াই সম্ভব। তবে জয়দেব নিজে গানগুলিকে কাব্যের কাঠামোয় ধরেন নাই, এমন সিদ্ধান্তের পক্ষেও বিশেষ যুক্তি নাই। মনে করিতে ইচ্ছা হয়, গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি লক্ষ্মণসেনের রচনা, কেননা ইহার রচিত শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে লেখা কৃষ্ণলীলাবিষয়ক একাধিক শ্লোকের শেষ চরণে "রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি" এই পদাংশ দেখা যায়।[১]

সদুক্তিকর্ণামৃতে জয়দেবের উনত্রিশটি নূতন শ্লোক সঙ্কলিত আছে।

ষোড়শ শতাব্দের শেষের দিকে শিখগুরু অর্জুন কর্তৃক সংকলিত 'আদি গ্রন্থ' বা 'গ্রন্থসাহেব'এ জয়দেবের ভনিতায় দুইটি অবহট্ঠ পদ উদ্ধৃত আছে। পদ দুইটির পাঠ এতটা বিকৃত যে অর্থবোধ তো দূরের কথা ভাষানির্ণয়ও দুঃসাধ্য।

জয়দেব নামে আরও দুই তিন জন কবি ছিলেন। ইহারা সংস্কৃতে নাটক অলঙ্কারগ্রন্থ ইত্যাদি লিখিয়াছিলেন॥

---

১ সদুক্তিকর্ণামৃত ১-৫৫-২। কেশবসেনের নামে একটি শ্লোক (১-৫৫-৫) এবং জয়দেবের নামে একটি শ্লোকও (১-৬০-৫) এই সঙ্গে দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
অবহট্‌ঠ কবিতা

১

নবম শতাব্দ হইতে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দের প্রারম্ভ পর্যন্ত পশ্চিমে গুজরাট হইতে পূর্বে বাঙ্গালা অবধি সমগ্র আর্যাবর্তে অপভ্রংশের অর্বাচীন রূপ অবহট্‌ঠ বা 'অপভ্রষ্ট' প্রচলিত ছিল লোক-সাহিত্যের ভাষারূপে, সংস্কৃতের হীন বিকল্প ভাবে। বাঙ্গালা প্রভৃতি নবীন আর্যভাষা দশম শতাব্দ হইতে ধীরে ধীরে প্রাদেশিক রূপ লাভ করিতে থাকিলেও সামনে কোন আদর্শ ছিল না বলিয়া তাহা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে সদ্য সদ্য গৃহীত হয় নাই। তবুও কথ্যভাষায় পদ ও বাক্‌রীতি সমসাময়িক অবহট্‌ঠ রচনার মধ্যে প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং, কালানুক্রম ও বিষয় অনুসরণে নয়, ভাষা ধরিয়া এই সময়ে অর্থাৎ দশম হইতে চতুর্দশ শতাব্দের অবহট্‌ঠ সাহিত্যকে নবীন আর্যভাষার সাহিত্যের উপক্রম-পর্ব বলিয়া গ্রহণ না করিলে ইতিহাস উপেক্ষিত হয়।

বৌদ্ধ-জৈনেরা বরাবরই প্রাকৃতের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের ভিক্ষু-শ্রাবকেরা বেশির ভাগ আসিতেন সাধারণ জনসমাজ হইতে। অপরপক্ষে ব্রাহ্মণ্য লেখকেরা লেখনী ধারণ করিতেন শিষ্ট-সমাজের জন্য। উত্তরাপথের বৌদ্ধেরা একধরনের সংস্কৃত অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে ভাষায় তাঁহারা প্রাকৃত শব্দের যথেচ্ছ প্রয়োগ করিতেন। তাই সংস্কৃত হইলেও সে ভাষা সাধারণের বোধগম্য ছিল। এ ভাষার অর্ধেক সংস্কৃত অর্ধেক প্রাকৃত। এই মিশ্র ভাষাকে বলা হয় "বৌদ্ধ সংস্কৃত"। মনে হয়, মহাভারত ও অপরাপর পুরাণকাহিনী আগে এই রকম জনসাধারণবোধ্য সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্র ভাষায় প্রচলিত ছিল। মহাভারতের অধুনা প্রচলিত পাঠেও পূর্বতন মিশ্র ভাষার চিহ্ন নিঃশেষে লুপ্ত নয়।

বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে কথ্যভাষার (অপভ্রংশের) প্রভাব ছন্দেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। অন্ত্যানুপ্রাস অর্থাৎ মিল অপভ্রংশ কবিতার একটি প্রধান বিশিষ্টতা। মাত্রা (ও অক্ষর)-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি এবং লঘুগুরুক্রমের বিন্যাসের দ্বারা ছন্দের লালিত্য ও বৈচিত্র্য সম্পাদন এই ভাষাতেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। এই ছন্দ-ঐশ্বর্য বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যের কবিদের দৃষ্টিতেই বোধ করি প্রথম ধরা পড়ে। উদাহরণরূপে 'ললিতবিস্তর' হইতে একটি "গাথা" (কবিতা) তুলিয়া

দিতেছি। (ললিতবিস্তর বুদ্ধের জীবনীকাব্য, গদ্যে-পদ্যে রচিত। রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দ। গদ্যাংশ সাধু-সংস্কৃতঘেঁষা, পদ্যাংশ অপভ্রংশঘেঁষা—বিশেষ করিয়া গাথাগুলি।)

পুরি তুম নরবর স্বতু নৃপ যদভু
নরু তব অভিমুখ ইম গিরমবচী।
দদ মম ইম মহি সনগরনিগমাং
ত্যজি তদ প্রমুদিতু ন চ মনু ক্ষুভিতো।[১]

'পূর্বে তুমি, হে নরবর, যখন নৃপসুত হইয়া জন্মিয়াছিলে, এক নর তোমার অভিমুখে বলিয়াছিল, "দাও আমাকে এই রাজ্য নগর ও জনপদ সমেত।" তাহা দান করিয়া প্রমুদিত (হইয়াছিলে তুমি, তোমার) মন ক্ষুব্ধ হয় নাই।'

২

অষ্টম শতাব্দের পূর্ব হইতেই অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ উত্তরাপথে সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী সাধু-ভাষা হইয়া দাঁড়ায়। এই ভাষায় জৈনদের লেখা বই অনেক পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের বৌদ্ধ বজ্রযানিক ও শৈব নাথপন্থী যোগী সিদ্ধাচার্যেরা এই ভাষায় তাঁহাদের শিক্ষাপ্রদ কড়চা-বই ও ছড়াগান কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। ভাষা অবহট্‌ঠ, তবে তাহাতে স্থানীয় উদ্‌গম্যমান নবীন আর্য কথ্যভাষার ছাপ পড়িয়াছে। সুতরাং ভাবের দিক দিয়া যেমন ভাষার দিক দিয়াও তেমনি এই রচনাগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-বহির্ভূত নয়। পূর্ব-ভারতের এই অবহট্‌ঠ-লেখকরা কেহ কেহ নবীন আর্যভাষাতেও গান লিখিয়াছিলেন।

পূর্বভারতের সিদ্ধাচার্যদের এই রচনাশৈলী পরবর্তী কালের মধ্য দিয়া ধারাবাহিত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দের বাউল গানে ইহারই পরিণতি। তখন দেশীয় সাহিত্যের রূপ অপরিণত, ভাষা অস্ফুট, প্রকাশভঙ্গি কুণ্ঠিত। সুতরাং সাহিত্যের পরিচিত ঠাট সিদ্ধাচার্যদের অবহট্‌ঠ দোহায় ও কথ্যভাষায় লেখা পদে নাই। তবে বিষয়গৌরবে এই রচনাগুলি সমসাময়িক অভিজাত সাহিত্যের উপরে উঠিয়াছে। সত্য ও গভীর কথা অতিশয় সহজ ছাঁদে ও সরল ভাবে প্রকাশিত বলিয়া মনে গিয়া লাগে। ইহাই এই অধ্যাত্মরসপুর ছড়া-গানগুলির অসাধারণ উৎকর্ষ। সিদ্ধাচার্যেরা রাজসভার জন্য লেখেন নাই, পণ্ডিতগোষ্ঠীর জন্যও নয়। তাঁহারা মহিমা ও পাণ্ডিত্য দুইই এড়াইয়া চলিতেন। পণ্ডিতদের উপেক্ষা ও ঘৃণা ছিল তাঁহাদের গর্বের বিষয়,—"পাখি ন চাহই মোরি

[১] ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পাণ্ডিআচাএ"।[১] গতানুগতিক ধর্মসংস্কারপাশবদ্ধ যাহারা চোখে আচার-বিচারের ঠুলি আঁটিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেছে তাহাদের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা।

কিং তো দীবেঁ কিং তো ণিবেজ্জেঁ
কিং তো কিজ্জই মন্তহ সেব্বেঁ
কিং তো তিত্থ-তপোবণ জাই
মোক্‌খ কি লব্‌ভই পাণী হ্নাই।[২]

'কি (হইবে) তোর দীপে, কি তোর নৈবেদ্যে? কি তোর করা হবে মন্ত্রের সেবায়? কি (ফল) তোর তীর্থ তপোবনে গিয়া? জলে ডুব দিলে কি মোক্ষলাভ হয়?'

এই সাধক-কবিরা তাঁহাদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি প্রায়ই প্রচলিত কবিকল্পনার রূপক-উৎপ্রেক্ষায় মুড়িয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এসো জপহোমে মণ্ডল-কম্মে
অণুদিন আচ্ছসি কাহিউ ধম্মে।
তো বিণু তরুণি নিরন্তর ণেহেঁ
বোধি কি লব্‌ভই এণ বি দেহেঁ।[২]

'এই জপ হোম মণ্ডল-কর্মরূপ ধর্মে কেন অনুদিন (লিপ্ত) আছিস? তোর নিরন্তর স্নেহ বিনা, হে তরুণী, এই দেহে কি বোধিলাভ হয়?'

সরহের দোহার একটি ভালো নমুনা দিতেছি। রসিক যোগী-কবি পণ্ডিত-ব্যক্তিদের কাছে ক্ষমা চাহিতেছেন, মর্মকথা আরো খুলিয়া বলিতে পারিতেছেন না বলিয়া।

পণ্ডিঅলোঅ খমহ মহু
এথ্‌ণ কিঅই বিঅপ্প্‌।
যো গুরুবঅণেঁ মই সুঅউ
তহি কিং কহমি সুগোপ্প্‌।
কমল-কুলিস বেবি মজ্জ ঠিউ
জো সো সুরঅবিলাস।
কো তহি রমই ণ তিহুঅণে
কস্‌স ণ পূরই আস।[২]

'পণ্ডিতেরা আমাকে ক্ষমা করুন। এখানে বিকল্প চলে না। গুরুবাক্যে যাহা আমি শুনিয়াছি তাহা সুগোপ্য, কি করিয়া বলি।

কমল-কুলিশের মধ্যস্থিত সেই যে সুরতবিলাস, কে তাহাতে না মজে? ত্রিভুবনে কাহার আশা পূর্ণ না হয়?'

মিস্টিক কবিতা হিসাবে এবং পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-ধর্মের রসতত্ত্বের পক্ষে সরহের এই উক্তি গুরুত্বপূর্ণ।

---

[১] অর্থাৎ 'পণ্ডিতাচার্যেরা আমার দিকে ফিরিয়া তাকায়ও না'।

[২] প্রবোধচন্দ্র বাগচী সঙ্কলিত দোহাকোষ দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধ ও শৈব তান্ত্রিক-যোগী সাধক-কবিরা গানে ও ছড়ায় তাঁহাদের সাধন-তত্ত্ব ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে, "সন্ধা-ভাষা"য় বলিয়া গিয়াছেন। সন্ধা-ভাষার শব্দের বাহ্য অর্থ এক, আর ভিতরের অর্থ সম্পূর্ণ অন্য। উদাহরণ-স্বরূপ 'হেবজ্রতন্ত্র' হইতে বরাড়ি রাগে গেয় একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।[১] পদটিতে প্রাচীন বাঙ্গালার ছাপ কিছু আছে। অনুবাদের মধ্যে বন্ধনীতে সন্ধা-শব্দের সাধক-অভিপ্রেত অর্থ দেওয়া গেল।

কোল্লই রে ঠিঅ বোলা মুম্মুনি রে ককোলা
ঘণ কিবিড় হো বাজ্জই করুণে কিঅই ন রোলা।
তহি বল খাজ্জই গাঢ়ে মঅণা পিজ্জই
হলে কালিঞ্জর পণিঅই দুন্দুরু বজ্জিঅই।
চউসম কস্তুরি সিহ্লা কপূ্র লাই
মালই-ইন্ধন সালি ভতহি ভরু খাই।
পেংখণে খেট করন্তে শুদ্ধাশুদ্ধ ণ মুণিঅই
নিরংশুঅ অঙ্গ চড়াই তঁহি জসরাব শুণিঅই
মলয়জ কুন্দুর বাটই ডিণ্ডিম তহি ন বাজিঅই।

'ওরে কোলে (?) স্থিত বোলা (বজ্র)···ওরে কঙ্কোল (পদ্ম); কৃপীট (ডমরু) ঘন বাজে, করুণা রোল করিতেছে না। সেখানে বল (মাংস) খাওয়া হয়, গাঢ়ভাবে মদন (মদ) পান করা হয়। ওলো, কালিঞ্জর (ভব্য লোক) প্রশংসিত হয়, দুর্দ্দির (অভব্য ব্যক্তি) বর্জিত হয়। চতুঃসম (বিষ্ঠা), কস্তূরী (মূত্র), সিহ্লক (স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ আর্তব) ও কপূ্র (শুক্র) নেওয়া হইল। মালতীন্ধন (ব্যঞ্জন) ভাত ভর (-পুর) খাওয়া হইল। প্রেক্ষণে (আগমনে) খেট (গমন) করা হইলে শুদ্ধাশুদ্ধ জানা যায় না, নিরংশুক (অস্থি-আভরণ) অঙ্গে চড়াইলে তখন যশধ্বনি শোনা যায়। মলয়জ (মহামাংস) কুন্দুরু (স্ত্রীন্দ্রিয়যোগে) বাটা হইতেছে, তখন ডিণ্ডিম (অনাহত) বাজিতেছে না।'

৩

বৌদ্ধ সহজপন্থীদের এবং শৈব নাথপন্থিদের অপভ্রংশ ছড়া ও পদ সবই ধর্মবিষয়ক। ইহার বাহিরে অবহট্‌ঠ কবিতা পাওয়া যায় এদিকে ওদিকে,—কোন কোন গ্রন্থে উদ্ধৃতিতে, একটি শিলালেখে ও একটি সংকলনগ্রন্থে। বাঙ্গালা দেশে লেখা সংস্কৃত গ্রন্থে উদ্ধৃত অবহট্‌ঠ কবিতার মধ্যে একটি খুব মূল্যবান্। এ কবিতাটিতে রাধাকৃষ্ণলীলার যে ইঙ্গিত আছে তাহা গীতগোবিন্দ ও বৈষ্ণবপদাবলীর প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ।

রাঈ দোহড়ী পঢ়ণ সুণি হসিউ কণ্হ গোআল।
বৃন্দাবণবণকুঞ্জঘর চলিউ কমণ রসাল।[২]

---

[১] গৃহীত পাঠ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রদত্ত পাঠ ও পাঠান্তর অবলম্বনে নির্ধারিত। বিশ্বভারতী পত্রিকা ৩-২ পৃ ১২৯ দ্রষ্টব্য।

[২] গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী'তে উদ্ধৃত।

'রাধার ছড়া আবৃত্তি শুনিয়া কৃষ্ণ গোপাল হাসিল (এবং) কেমন রসাল পদক্ষেপে বৃন্দাবনের নিবিড় কুঞ্জগৃহে চলিল।'

পাঠের গোলমাল সত্ত্বেও নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির সরসতা একেবারে ফিকা হইয়া যায় নাই। দরিদ্র বলিয়া উপহসিত কোন মূর্খের দম্ভোক্তি।

জড়াসো তড়াসো চারি হত্থো
ঘরহি অগ্গে খেড্ড বুত্তো।
গাই হোহী ঘরিণি বি দোহী
সো কিস বোল্ল অণহি নাহী।[১]

'যেমন তেমন চার হাত। ঘরের আগে খড়ের গাদা। গাই হইবে, গৃহিণীও দুইটি। কেন অমঙ্গল বল—(আমার কিছু) নাই?'

৪

যে শিলালিপিতে অবহট্‌ঠ রচনা পাওয়া গিয়াছে সেটি মালবের (অধুনা মধ্যপ্রদেশের, অন্তর্গত) ধার (প্রাচীন ধারা) হইতে পাওয়া। এখন বোম্বাই প্রিন্‌স অব্ ওয়েল্‌স্ মিউজিয়ামে রক্ষিত।[২] শিলা ভগ্ন হওয়ায় সম্পূর্ণ রচনাটি পাওয়া যায় নাই। লিপি-ছাঁদ হইতে মনে হয় লিপির (এবং রচনার) কাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দ। রচনাটি একটি দীর্ঘ কবিতা। বিষয় বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কন্যা ও দাসী বিক্রয়ের হাটে সমাহৃত তরুণীদের তৌলন রূপ-গুণ বর্ণনা। সম্পূর্ণ কবিতাটি আট ভাষায় (অর্থাৎ বিভিন্ন আঞ্চলিক অবহট্‌ঠ স্টাইলে) রচিত ছিল, প্রাপ্ত অংশে ছয়-সাতটি ধরা পড়ে।[৩]

গোড়ার খানিকটা নাই। প্রাপ্ত অংশ হইতে ব্যাপার অনুমান করা কঠিন নয়। রাজকুলের পরিগ্রহণের জন্য নানাস্থান হইতে রূপসী আনা হইয়াছে। তাহাদের রূপগুণের স্পর্ধা (beauty competition) হইতেছে। রূপের হাটে তরুণীরা নির্বাক প্রতিমার মতো দাঁড়াইয়া আছে। দালালেরা নিজের নিজের দেশের সুন্দরীর বেশ-ভূষায় শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেছে যথাসম্ভব নিজের নিজের ভাষায়। (তবে কবির নিজ ভাষা—অন্য সব ভাষাছাঁদকে আচ্ছাদন করিয়া আছে।)

---

[১] সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণে উদ্ধৃত।

[২] অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ ভয়ানীর 'Prince of Wales Museum Stone Inscription from Dhar' প্রবন্ধ (ভারতীয় বিদ্যা সপ্তদশ খণ্ড তৃতীয় চতুর্থ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

[৩] শেষের এক ছত্র, "রোডেং রাউল-বেল বখা[নী]।" "রোডেং" পদের অর্থ হইতে পারে—(১) রোড কর্তৃক অথবা (২) রোডা (রোলা) রীতিতে। প্রথম অর্থ ঠিক হইলে ইহা কবির নাম। "রাউল-বেল" পাঠ ভ্রান্ত মনে হইতেছে। "রাউল-বেশ" (—অর্থাৎ রাজকুলের শয়ন-মহল—) পাঠ ঠিক হয়।

প্রথমে যে ভাষণ পাই তাহার ভাষাছাঁদ যে "গোল্ল" তাহা পরবর্তী ভাষণে উল্লিখিত। এ ভাষাকে প্রত্ন-দখনীও বলিতে পারি।

আঁখিহি কাজল তরলউ দীজই···
অহরু তম্বোলেঁ মনু-মনু রাতউ···
জালা-কাঁঠী গলই সুহাবই···
রাতউ কঞ্চুআ অতি সুঠু চাংগউ···
বিণু আহরণেঁ জো পায়নহ সোহ···

'আঁখিতে কাজল হালকা করিয়া দেওয়া···
অধর তাম্বুলে একটু একটু রাঙা···
জালকাঁঠি গলায় শোভে···
রাঙা কাঁচুলি অতি সুন্দর চমৎকার···
বিনা আভরণে যে পায়ের শোভা···'

পরবর্তী বক্তা "কানোড়" (<কর্ণাটক) পূর্ববর্তী বক্তাকে "গোল্ল"[১] বলিয়া নিজের দেশের মেয়ের সাজের ও রূপের বড়াই করিতেছে। এ ব্যক্তি দাক্ষিণাত্যের, ইহার ভাষায় মারাঠীর ছাপ আছে। এ ভাষাছাঁদকে প্রত্ন-মারাঠী বলিতে পারি।

বলিঅহি বাধলি অহি জো চাংগিম
তে বানতু কোউ···লাগিঁম।···
[ও]ঠহি আংতু জেঁ বিঅইল-ফুল্লেঁ
আছউ তাউ কি তেহ চেঁ বোল্লেঁ।
কথিহিঁ রীঠে উজল লান্থ···
পাইহিঁ পাহংসিয়া নিরু চাংগা···
[অইসি]···তরুণিমঁ মাংডি
পাতলি কো ভাউঅ ছাংডি।

'চুল বাঁধার যে সৌন্দর্য তাহা বর্ণিতে কে···সমর্থ হয়।···
ওষ্ঠাধর প্রান্ত যেন জুঁই ফুল। তা থাক—তাহার[২] কথায় কী হইবে।···
হাতে আংটি উজ্জ্বল ও সুন্দর···
পায়ে পাশুলি অত্যন্ত চমৎকার···
এমন···সুসজ্জিত তরুণীকে পাইয়া কোন্ ভাবুক ছাড়িয়া দিবে?'···

তাহার পর উঠিল "টেল্লিপুতু" (অর্থাৎ টেল্লদেশের লোক)। ইহার ভাষা-ছাঁদকে প্রত্ন-গুজরাটী-রাজস্থানী বলিতে পারি। ইহার উক্তি প্রায় অক্ষতভাবে পাওয়া গিয়াছে।

---

[১] প্রাকৃত শব্দটি অবজ্ঞাসূচক অর্থে ব্যক্তির প্রতিশব্দ। বাঙ্গালায় "গোলা" বলিতে পারি।
[২] অর্থাৎ উপমা বাড়াইয়া কী লাভ?

এহু কানোডউ কাইসউ ঝাংখই
বেস্থ অম্হাণউ না জউ দেখই ।...
ডহরউ আঁখিহিঁ কা[জলু] দীনউ
জো জানই সো থইনউ বানউ ।...
গলই পুলু কী ভা[বই] কাংঠী
কাস্থ তনী সা হরই ন দি[ট্‌ঠী] ।...
থনহিঁ সো উংচউ কিঅউ রাউল
তরুণা জোবন্ত করই সো বাউল ।
পহিরণ্‌ ফরহরে পর সোহই
রাউল দীসতু সউ জণ্‌ মোহই ।...
জহিঁ ঘরে অইসী উলগঁ পইসই
তং ঘরু রাউল জইসউ দীসই ॥

এই কানোড় কত সব জাঁক করিতেছে, যেহেতু সে আমাদের তরুণী-বেশ[১] দেখে নাই।
বড় বড় চোখে কাজল দেওয়া।—(এ সৌন্দর্য) যে বোঝে সে অল্পই বর্ণিতে পারে।...
গলায় পলা (?)-কাঠি (হার) শোভা পায়; তা কাহার দৃষ্টি না হরণ করে?...
স্তনদ্বয়ের যে রক্তিম উচ্চতা তাহা তরুণের দৃষ্টিতে পড়িলে তাহাকে পাগল করে।...
পরিধানে সূক্ষ্ম (?) বস্ত্র, অত্যন্ত শোভা পায়, রক্তিম, দেখিলে সব জন মোহিত হয়।...
যাহার গৃহে এমন (তরুণী) ভোগের জন্য প্রবেশ করে সে ঘর যেন রাজবাড়ির মতো দেখায়।'

তাহার পর উঠিল "টাক" (টক্ক দেশের লোক)। তাহার ভাষাছাঁদকে "টক্কী" অর্থাৎ প্রত্ন-ডোগরী-পঞ্জাবী বলা যায়। এ অংশও সম্পূর্ণ মিলিয়াছে।

কেহ টেল্লি পুতু তুহঁ ঝাঁখহি...
অড্‌ডা কেহ-পাহু জো বন্ধা
সো ঘর তেহা গোরীঁ লন্ধা।
চন্দ-সরানা টীহা কিয্যই
জেঁ মুহঁ একেণ বি মণ্ডিজ্জই।
অংখিহিঁ কয্যলু [ড]হরা দিত্তা
জো [নি]হালি করি ময়নূমত্তা।...
কংঠি কংটি জলালী সোহই
এহা তেহা সউ জনু মোহই।...
গোরই অংগি বেরংগা কংয্যু
সংঝহি জোম্বহি নং সংগউ হু।
পহিরনু ঘাঘরেহিঁ জো কেরা
কছড়া-বছড়া ডহি পর ইতরা।...
এহী টক্কিণি পইসতি সোহই
সা নিহালি জণ্‌ মলমল চাহই ॥

---

[১] অথবা গণিকানিবাস।

'কে তুই টেল্লিপুত্র ডাক করিতেছিস ?…
আড় করিয়া যাহার কেশ-পাশ বাঁধা হইয়াছে সে সুন্দরীকে যে পায় তাহার ঘরই ঘর।
চাঁদের মতো এমন টিপ পরা হইয়াছে যে একটিতেই মুখ সুশোভিত।
আঁখিতে কাজল অল্প করিয়া লাগানো, যাহা দেখিয়া মদন উন্মত্ত হয়।…
কণ্ঠে জাল-কাঁঠি শোভা পাইতেছে। (তাহা) এ সে সব জনকে মুগ্ধ করে।
গৌর অঙ্গে দুই-রঙা কাঁচলি, যেন যথার্থই সন্ধ্যার ও জ্যোৎস্নার মিলন ঘটিয়াছে।
ঘাঘরার সঙ্গে যে ওড়না পরা হইয়াছে তাহাতে যেন কাঁছাকোঁচা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়।
এমন টক্কদেশের মেয়ে গৃহে আনিলে শোভা পায়। তাহাকে দেখিয়া লোকে ভেলভেল চাহিয়া থাকে।'

টাকের পর উঠিল "গৌড়" (গৌড়দেশের লোক)। ইহার ভাষাছাঁদ প্রত্ন-বাঙ্গালা। এ অংশটুকু আগের অংশগুলির তুলনায় বড়, এবং সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে।

তঁই কী কত হু বেশ রে দীঠে
জেহর তেহর বানসি ধেঠে।…
তেডেন্হু বাধেন্হু কেসঁ জে লড়হিবঁ…
খোম্পহি উপরঁ অম্বেঅল কইসে
রবি জনি রাহুঁ ঘেতলে জইসে।…
রে রে বর্বর দেখু রে তুঁ চাহু
তারি নিলাড়ী সরিসী কাহু।…
কানন্হু পহ্লিলে তাড়র পাত…
সুতের হার রোমাবলি কলিঅউ
জনি গাঙ্গহি জলু জউণহি মিলিঅউ।…
রূউ দেখি তারউ সব জণু খীজই।
ধবল রে কাপড় উঢ়িঅল কইসে
মুহ-শসি জোন্থ পসারেল জইসে।…
অইসী গউড়ি জ রাউলেঁ পইসই
সো জণু লাছিঁ মাংডেউ দীসই।

'তুই…কত বেশ[১] দেখিয়াছিস যে যাহার তাহার বর্ণনা করিতেছিস ধৃষ্টতা করিয়া ?…
বাঁকা করিয়া যে সুন্দর ভাবে কেশ বন্ধন হইয়াছে…
খোঁপার উপরে আমলা[২] কেমন, যেমন রাহুর দ্বারা রবি গ্রস্ত হইয়াছে।…
অরে রে বর্বর, তুই চাহিয়া দেখ। তাহার ললাটের মত কাহার আছে ?…
কানে পরিয়াছে তাড়িপাত…
সরু হার রোমাবলীতে লাগিয়া আছে, যেন গঙ্গা হইতে জল (ধারা) যমুনায় মিলিয়াছে।…
তাহার রূপ দেখিয়া সকলে খেদ করে।
শাদা কাপড় কেমন পরিয়াছে, যেন মুখশশী জ্যোৎস্না বিস্তার করিয়াছে।…
এমন গৌড়-কন্যা যে রাজকুলে প্রবেশ করে সে (রাজকুল) যেন লক্ষ্মী দ্বারা মণ্ডিত দেখায়।'

[১] বেশ্যালয় অথবা বেশভূষা। [২] পুঁটে অথবা খোপার মতো অলঙ্কার।

'গৌড়, একে তুই কোপন তাহার উপর···, তোর সঙ্গে ভয়ে কথা বলিবে কে ?'[১]—এই বলিয়া মালবের লোক উঠিল মালবতরুণীর পক্ষ সমর্থন করিতে। এই অংশ সবচেয়ে বড়, তাহাতে মনে হয় এ, প্রত্ন-মালবী, কবির মাতৃভাষা। তাহার পরের অংশ অধিকাংশ খণ্ডিত। যেটুকু মিলিয়াছে তাহাতে এ অংশের ভাষাকে প্রত্ন-ব্রজভাষাও বলা যায়।

শেষ ছত্র লুপ্ত। তাহার আগের ছত্র এইরূপ

রোড়ে রাউল-বেল বখা[ণী]
আঠই (?) ভাসই জইসী জাণী।

'রোড় রাউল-বেল (বেশ ?) ব্যাখ্যান করিল আট ভাষায় যেমন (তাহার) জানা আছে।'

৫

নীতিবাক্য, বহুদর্শীর উপদেশ, আবহাওয়া ও কৃষি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে ছড়া অবহট্ঠেও প্রচলিত ছিল, এগুলি বরাবর চলিয়া আসিয়াছে কালোচিত ভাষা-পরিবর্তন হইয়া। বাঙ্গালায় এমন ছড়া "ডাকের (বা ডাক পুরুষের) বচন" নাম পাইয়াছে। রাজস্থানীতে মারাঠীতে হিন্দীতে ও অন্যান্য আধুনিক ভাষায় এগুলি "ডঙ্ক-বচন", "ভডলী-পুরাণ" ইত্যাদি নামে প্রচলিত। "ডাক" কথাটি "ডঙ্ক" হইতে আসিয়াছে, অর্থ—মন্ত্রসিদ্ধ গুণী, স্ত্রীলিঙ্গে ডাকিনী। "ভডলী" মানে ভাটের ব্যাপার (<*ভট্টালিকা)।[২]

সাধারণ গণিতশিক্ষার ছড়াগুলি "আর্যা" নামে খ্যাত। আর্যা মানে ছড়া। প্রাকৃত-রচনার যুগে এমন ছড়া আর্যাছন্দে লেখা হইত বলিয়া কি এই নাম ?[৩] গণিতের আর্যায় দৈবাৎ অবহট্ঠের পদ চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। যেমন

কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে॥

'কুড়ায়[৪] কুড়ায় কুড়া লইতে হয়। কাঠায় কুড়ায় কাঠা লইতে হয়।'

ধর্মদাসের 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন' সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বে উল্লিখিত আছে, সুতরাং বইটির রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দের পরে নয়। ইহাতে এমন কয়েকটি প্রহেলিকা বা সমস্যা-শ্লোক আছে যাহাতে প্রশ্ন এবং উত্তর অথবা শুধু উত্তর অবহট্ঠে

---

১ "গৌড় তুহু একু কোপণু অউরু······কো তইঁ সহুঁ ভইঁ বোলই।'

২ মূল সংস্কৃত আনুমানিক 'ভট্টপালিক' হইতেও পারে। 'ভাটিয়ালি' শব্দের মূলও ইহাই।

৩ দণ্ডীর দশকুমারচরিতে (২-২) আর্যা ছন্দে লেখা শ্লোক "আর্যা" নামে উক্ত আছে।

৪ কুড়া মানে বিঘা।

দেওয়া। যেমন নিম্নের প্রশ্নটি। ইহার প্রথমার্ধের ভাষা সংস্কৃত দ্বিতীয়ার্ধের ভাষা অবহট্‌ঠ, উত্তরের ভাষা বাঙ্গালা।

শব্দঃ কঃ স্যাৎ পুরুষবচনং কুণ্ডলৌ কৌ স্মরারেঃ
কামমস্তোধেৰ্হরিরুদহরদ্ বীবধমৃচ্ছতীদম্।

হাণ্ডী কুণ্ডী আনেসি ন বড়া কীস অম্হার এথং
জে পুচ্ছিলা সে পুণু পুরুসা উত্তরং কীস দেঈ।

'কোন শব্দ পুরুষবাচক হইবেই? শিবের কুণ্ডল দুইটি কী?
কাহাকে হরি সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন? বাঁকে যায় কী?[১]
"আমাদের হাঁড়ি কুঁড়ি এই সঙ্গে আনিস নাই কেন, বোকা?"
—যাহাকে এই প্রশ্ন করা হইল সে পুরুষ কিরকম উত্তর দেয়?'

উত্তর—"নাহী কুম্ভার।"[২]

৬

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দের দিকে সঙ্কলিত অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ছন্দোনিবন্ধ 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' গ্রন্থে নানাবিষয়ক অনেকগুলি কবিতা ও গান পাওয়া গিয়াছে। প্রাকৃত-পৈঙ্গলের সঙ্কলন হইয়াছিল বোধ হয় বারাণসী অঞ্চলে। সুতরাং কবিতাগুলি প্রায় সবই পূর্ব ভারতের। বাঙ্গালা দেশে এই বইটির বিশেষ আদর ছিল। কতকগুলি কবিতা যে বাঙ্গালী কবির লেখা তাহা বুঝিতে পারি সেগুলির বিষয় হইতে এবং কতকটা ভাষা হইতেও। অবহট্‌ঠে লেখা হইলেও এগুলিতে বাঙ্গালা ও মৈথিলী প্রভৃতি নবীন আর্য ভাষার ছাপও কিছু আছে। কবিতাগুলি সব একই সময়ে লেখা নয়। যেগুলি সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন সেগুলি চতুর্দশ শতাব্দের পূর্বেকার নয়। ইতিমধ্যে বাঙ্গালা মৈথিলী হিন্দী প্রভৃতি নবীন আর্য ভাষা রীতিমত দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তখনো সেসব ভাষার সাহিত্যমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাই এসময়েও অবহট্‌ঠে কবিতা রচিত হইত। পঞ্চদশ শতাব্দেও হইয়াছে। তাহার নিদর্শন বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'।[৩]

প্রাকৃত-পৈঙ্গলে উদ্ধৃত কোন কোন কবিতার ক্ষীণায়তনে উজ্জ্বল রসসৃষ্টি হইয়াছে। যেমন

সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আএ
চেলু দুলাএ।

---

[১] প্রথমার্ধের এই চার প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে 'না' 'অহী' 'কুম্' 'ভার'। জুড়িয়া দিলে তৃতীয় ছত্রের প্রশ্নের উত্তর হয়। [২] অর্থাৎ '(হাটে) কুমোর নাই'।

[৩] বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে চন্দ্রমোহন ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত (১৯০০-১৯০২)।

'সেই মোর কান্ত (এখন) দূর দিগন্তে। প্রাবৃষ আসিতেছে, কাপড় উড়ানো হইবে।[১]

কয়েকটি কবিতার দৃঢ়পিনদ্ধ ক্ষুদ্র আধারে বিরহিণীর দীর্ঘশ্বাস যেন ঘনীভূত। যেমন

কাঅ হউ দুব্বল তেজ্জি গরাস
খণে খণে জাণিঅ অচ্ছ ণিসাস।
কুহু-রব তার দুরন্ত বসন্ত
ণিদ্দঅ কাম কি ণিদ্দঅ কন্ত॥

'কায় হইল দুর্বল, আহার ত্যক্ত, ক্ষণে ক্ষণে নিঃশ্বাস জানাইতেছে। কুহুরব তীব্র, বসন্তও দুরন্ত। —কাম নির্দয় কি কান্ত নির্দয় (বুঝি না)।'

গজ্জই মেহ কি অম্বর সামর
ফুল্লই ণীব কি বুল্লই ভামর।
এক্কল জীঅ পরাহিণ অম্মহ
কীলউ পাউস কীলউ বম্মহ॥

'মেঘ কি গর্জন করিতেছে? অম্বর কি শ্যামল? নীপ কি ফুটিয়াছে? ভ্রমর কি বুলিতেছে? আমার একলা জীবন পরাধীন।—প্রাবৃষ ক্রীড়া করুক, মন্মথও ক্রীড়া করুক।'

ণবি মঞ্জরি লিজ্জিঅ চূঅই গাচ্ছে
পরিফুল্লিঅ কেসু-লআ বণ আচ্ছে।
জই ইথি দিগন্তর জাইহ কন্তা
কিণু বম্মহ ণথি কি ণথি বসন্তা॥

'নবমঞ্জরী ধরিয়াছে চূত গাছ, কিংশুক লতাবন পরিফুল্লিত হইয়াছে। যদি এতেও, হে কান্ত, দিগন্তর যাও তবে কি মন্মথ নাই, বসন্তও কি নাই।'

তরুণ-তরণি তবই ধরণি পবন বহ খরা
লগ ণহি জল বড় মরু-থল জণ-জীবণ-হরা
দিসই বলই হিঅঅ দুলই হমি একলি বহূ
ঘর ণহি পিঅ সুণহি পহিঅ মণ ঈছই কহূ॥

'তরুণ সূর্য ধরণীকে তপ্ত করিতেছে, পবন খর বহিতেছে। নিকটে নাই জল, (সম্মুখে) জনজীবনহর বড় মরুস্থল। দিগ্‌সীমান্তে (লোক) চলে, (আমার) মন দুলিয়া উঠে। আমি একলা বধূ। ঘরে নাই প্রিয়। শুন হে পথিক, মন কি ইচ্ছা করে।'

ফুল্লিঅ কেসু চন্দ তহ পঅলিঅ মঞ্জরি তেজ্জই চূআ
দক্‌খিণ বাঅ সীঅ ভই পবহই কম্প বিওইণি-হীআ।
কেঅলি-ধূলি সব দিস পসরিঅ পীঅর সব্বউ ভাসে
আই বসন্ত কাই সহি করিহই কন্ত ন থক্কই পাসে॥

---

[১] আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আঁচল বা কোঁচার কাপড় ওড়ানো আগেকার দিনের অল্পবয়সীদের খেলা ছিল। বর্ষার প্রারম্ভে প্রবাসী বাড়ী ফিরিয়া আসে, কান্তও আসিবে, তাই আনন্দ-উচ্ছ্বাস। পূর্ববর্তী সংস্করণে গৃহীত পাঠ 'ঢেউ চলাবে' ঠিক নয়।

'কিংশুক প্রস্ফুটিত, চন্দ্রও প্রবল। চূত মঞ্জরী প্রকাশ করে, দক্ষিণ-বাত শীতল হইয়া প্রবাহিত হয়, বিয়োগিনী-হৃদয় কাঁপে। কেতকীর ধূলি সব দিকে প্রসারিত, সব কিছু পীতবর্ণ। বসন্ত আগত। সখি, কি করি, কান্ত যে পাশে থাকে না।'

নবীন আর্য ভাষার প্রাচীন সাহিত্যে বীররসের কারবার বেশি নাই, এখানে ভক্তি অথবা আদি রসেরই একাধিপত্য। কিন্তু প্রাকৃত-পৈঙ্গলে বীররসাত্মক কবিতা কিছু আছে। এইসব কবিতার অধিকাংশ যে বাঙ্গালী কবির লেখা এমন কথা অবশ্য বলি না, তবে কয়েকটি কবিতায় প্রকারান্তরে বাঙ্গালীর বীরত্বের প্রশংসা আছে। কোন-কোনটিতে কবির ভনিতাও পাওয়া যায়।

কোন্ অজ্ঞাতনামা কবি নীচের কবিতাটি সেনাপতি জজ্জলের নামে গাঁথিয়াছিলেন।

পিন্ধউ দিঢ় সন্নাহ বাহু উপ্পর পক্খর দেই
বন্ধু সমদি রণ ধসউ সামি হম্মীর-বঅণ লেই।
উড্ডল ণহ-পহ ভমউ খগ্গ রিউ-সীসহি ডারউ
পক্খর পক্খর ঠেল্লি পেল্লি পব্বঅ উপ্ফারউ।

হম্মীর-কজ্জু জজ্জল ভণই
কোহাণল মুহ-মুহ জলউ।
সুলতান-সীস করবাল দেই
তেজ্জি কলেঅর দিঅ চলউ॥

'দৃঢ় বর্ম পরুক বাহুর উপর ঢাল দিয়া, আত্মীয় বন্ধুর কাছে বিদায় লইয়া রণে মাতুক প্রভু হম্মীরের বচন লইয়া। নভঃপথে উড়িয়া চলুক, খড়্গ রিপুশীর্ষে পড়ুক, ঢালে ঢালে ঠেলিয়া ফেলিয়া পর্বত উপড়াউক। হম্মীরের কাজে, (কবি-সেনাপতি) জজ্জল বলে, মুহুর্মুহু ক্রোধানল জ্বলুক। সুলতানের শীর্ষে করবাল দিয়া কলেবর ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলা যাউক।'

আরও একটি কবিতায় সেনাপতি জজ্জলের সপ্রশংস উল্লেখ আছে।

ঢোল্ল মারিঅ ঢিল্লি-মহ মুচ্ছিঅ মেচ্ছ-সরীর
পুর জজ্জল মল্লবর চলিঅ বীর হম্বীর।
চলিঅ বীর হম্বীর পাঅ-ভর মেইণি কম্পই
দিগ-মগ-ণহ অন্ধার ধূলি সুরহ রহ ঝম্পই।
দিগ-মগ-ণহ অন্ধার আণু খুরসাণক ওল্লা
দলবলি দমসি বিপক্খ মারঅ ঢিল্লি-মহ ঢোল্লা॥

'ঢোল মারা হইল দিল্লি মাঝে। ম্লেচ্ছশরীর মূর্চ্ছিত হইল। মল্লবর জজ্জলকে অগ্রে করিয়া বীর হম্বীর চলিল। বীর হম্বীর চলিল। মেদিনী কাঁপিতেছে। দিক্ পথ আকাশ সব অন্ধকার। ধূলায় সূর্যের রথ ঝাঁপিতেছে; দিক্ পথ আকাশ সব অন্ধকার। খোরাসানের উল্লা আজ্ঞা দিল,—দলবলে বিপক্ষ দমন কর, দিল্লি মাঝে ঢোল পিটাও। (অথবা—আজ্ঞা দিল দিল্লী মাঝে দড়মসা ও ঢোল পিটাইয়া, 'বিপক্ষ মার'।)'

একটি কবিতার রচয়িতা হরিব্রহ্ম বিবিধ চলিত উপমার সাহায্যে মিথিলার রাজমন্ত্রী চণ্ডেশ্বরের[1] কীর্তি বর্ণনা করিয়া শেষে বলিতেছেন

পিঅ-পাঅ-পসাএ দিট্‌ঠি পুণি
ণিহুঅ হসই জহ তরুণি-জণ।
বরমন্তি চণ্ডেসর কিত্তি তুঅ
তথ দেক্‌খ হরিবম্ভ ভণ।

'প্রিয়ের পায়ে-পড়া দেখিয়া তরুণীজন যখন নিভৃতে হাসে (তখন) তাহাতে, হে বরমন্ত্রী চণ্ডেশ্বর, তোমার কীর্তির (ধবলতা) দেখিয়া হরিব্রহ্ম বলিতেছে।'

কোন এক কাশীশ্বরের রাজমন্ত্রী বিদ্যাধরের রচিত কবিতা

ভঅ ভজ্জিঅ বঙ্গা ভঙ্গু কলিঙ্গা তেলঙ্গা রণ মুক্কি চলে
মরহট্টা ধিট্‌ঠা লগ্‌গিঅ কট্‌ঠা সোরট্‌ঠা ভঅ পাঅ পলে।
চম্পারণ কম্পা পব্বঅ ঝম্পা ওড্ডা ওড্ডি[2] জীব হরে
কাসীসর রাণা কিঅউ পআণা বিজ্জাহর ভণ মন্তিবরে।

'ভয়ে বঙ্গ ভাগিল, কলিঙ্গ ভঙ্গ দিল, তেলেঙ্গা রণ ছাড়িয়া চলিল, ধৃষ্ট মারাঠা কষ্টে পড়িল, সৌরাষ্ট্র ভয়ে পায়ে পড়িল, চম্পারণ কাঁপিয়া পর্বতে লুকাইল। উড়িয়া উড়িয়া (পলাইয়া) জীবন রাখিল।—কাশীশ্বর রাজা অভিযান করিয়াছেন। মন্ত্রিবর বিদ্যাধর কহিতেছে।'

নিম্নে উদ্ধৃত দুইটি কবিতাও বোধ হয় কাশীশ্বরের প্রশস্তি।

ভঞ্জিআ মালবা গঞ্জিআ কাণড়া
জিণ্ণিআ গুজ্জরা লুণ্টিআ কুঞ্জরা।
বঙ্গলা ভঙ্গলা ওড্ডিআ মোড্ডিআ
মেচ্ছআ কম্পিআ কিত্তিআ থপ্পিআ॥

'মালব পরাজিত হইল, কর্ণাট গঞ্জিত হইল, গুর্জর জিত হইল, কুঞ্জর লুণ্ঠিত হইল, বাঙ্গালা ভঙ্গ দিল, উড়িয়া পিষ্ট হইল, ম্লেচ্ছেরা কম্পিত হইল, কীর্তি স্থাপিত হইল।'

রে গোড় থক্কন্তি তে হত্থি-জুহাই।
পল্লট্টি জুজ্‌ঝাহি পাইক্ক-বুহাইঁ॥

'রে গৌড়,[3] তোর হস্তিযূথ থাকে থাকুক। পালটয়া পাইক-ব্যূহের সঙ্গে যোঝ।'

প্রাকৃত-পৈঙ্গলের একটি কবিতায় কৃষ্ণের নৌকাবিলাস-কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে।

অরে রে বাহিহি কাহ্ণু ণাব
ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি।
তুইঁ এথনই সন্তার দেই
জো চাহসি সো লেহি।

---

[1] চতুর্দশ শতাব্দের প্রথমার্ধ।
[2] প্রাপ্ত পাঠ "ওথা ওথী" অর্থহীন।
[3] অর্থাৎ গৌড়রাজ বা গৌড়সেনাপতি।

'ওরে রে কৃষ্ণ, (তুমি) নৌকা বাহিবে। ডগমগ (করা) ছাড়িয়া দাও, (আমাদের) দুর্গতি দিও না। তুমি এখনই খেয়া পার করিয়া দিয়া যাহা চাও তাহা লও।'

কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা যে চতুর্দশ শতাব্দের পূর্বেই দেবতাসমাজে সম্মানের আসন পাইয়াছিলেন তাহার অবান্তর প্রমাণ পাই প্রাকৃত-পৈঙ্গলের একটি আর্যায়। এই আর্যায় কয়েকটি বিশিষ্ট মাত্রাসংস্থানের নামকরণ হইয়াছে বাঙ্গালা দেশে (তথা পূর্ব-ভারতে) পূজিত প্রধান প্রধান দেবীর নাম অনুসারে। এখানে লক্ষ্মী, গৌরী, চুন্দা, মহামায়া প্রভৃতি দেবীর সঙ্গে রাঈ অর্থাৎ রাধিকারও উল্লেখ রহিয়াছে।[১]

নিম্নে উদ্ধৃত কৃষ্ণ-বন্দনা পদের ছন্দোবন্ধ ও রচনারীতি জয়দেবের গানের ধরণে। পদটি প্রাকৃত-পৈঙ্গলের প্রথম পরিচ্ছেদের আশীর্বচন পুষ্পিকা।

জিণি কংস বিণাসিঅ কিত্তি পআসিঅ
মুট্ঠিঅরিট্ঠী বিণাস করে
গিরি হত্থ ধরে।
জমলজ্জুণ ভঞ্জিঅ পঅভর গঞ্জিঅ
কালিঅ-কুল সং- হার করে
জস ভুঅণ ভরে।
চাণুর বিহণ্ডিঅ ণিঅ-কুল মণ্ডিঅ
রাহা-মুহ মহু পাণ করে
জণি ভমরবরে।
সো তুম্হ ণরাঅণ বিপ্প-পরাঅণ
চিত্তহ চিন্তিঅ দেউ বরা
ভব-ভীই-হরা।

'যিনি কংস বিনাশ করিয়া কীর্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, মুষ্টিক অরিষ্ট বিনাশ করিয়াছিলেন, হস্তে গিরি ধরিয়াছিলেন, যমলার্জুন ভঙ্গ করিয়াছিলেন, পদভরে নির্যাতন করিয়া কালিয়কুল সংহার করিয়াছিলেন, যশে ভুবন ভরিয়াছিলেন, চাণূর বিখণ্ডিত করিয়া নিজকুল মণ্ডিত করিয়াছিলেন, রাধা-মুখমধু পান করিয়াছিলেন—যেন ভ্রমরবর, সেই বিপ্রপরায়ন নারায়ণ তোমার চিত্তে চিন্তিত হইয়া ভবভীতিহর বর দান করুন।'

প্রাকৃত-পৈঙ্গলের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আশীর্বচন পুষ্পিকা রাম-বন্দনা কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য।

বপ্পঅ উত্তি সিরে জিণি লিজ্জিঅ
তেজ্জিঅ রজ্জ বণন্ত চলে বিণু
সোঅর সুন্দরি সঙ্গহি লগ্গিঅ
মারু বিরাধ কবন্ধ তহা হণু।

---

১ "লচ্ছী রিদ্ধি বুদ্ধী লজ্জা বিজ্জা কৃখমা অ দেঈ।
গৌরী রাঈ চুণ্ণা ছাআ কান্তী মহামাঈ॥"

মারুই মিল্লিঅ বালি বহিল্লিঅ
রজ্জ সুগীবহ দিজ্জ অকণ্টঅ
বন্ধু সমুদ্দ বিণাসিঅ রাঅণ
সো তুহ রাহব দিজ্জউ ণিব্‌ভঅ ॥

'বিজ্ঞ যিনি বাপের উক্তি শিরে লইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনান্তে চলিয়াছিলেন, সোদর ও সুন্দরী সঙ্গে লইয়াছিলেন; যিনি বিরাধকে মারিয়াছিলেন, কবন্ধকে হত্যা করিয়াছিলেন, মারুতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, বালি বধ করিয়াছিলেন, অকণ্টক রাজ্য সুগ্রীবকে দিয়াছিলেন, সমুদ্র বন্ধন করিয়াছিলেন, রাবণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই রাঘব তোমাদের নির্ভয় দান করুন।'

শিবগৃহিণীর গার্হস্থ্যদুঃখের বর্ণনা প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের একটি বিশিষ্ট বিষয়। সদুক্তিকর্ণামৃতের কয়েকটি শ্লোকে ইহার প্রথম আভাস লক্ষ্য করিয়াছি। প্রাকৃত-পৈঙ্গলের নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় তাহা স্পষ্টতর। নিঃসন্দেহে কবিতাটি বাঙ্গালীর লেখা বলিয়া মনে করি।

বালো কুমারো ছঅ-মুণ্ডধারী
উবাঅহীণা মুই এক্ক-ণারী।
অহংণিসং খাই বিসং ভিখারী
গঈ ভবিত্তী কিল কা হমারী ॥

'পুত্র বালক, উপরন্তু ছয়-মুণ্ডধারী (অর্থাৎ ছয় মুখে খায়), আমি একলা নারী উপায়হীনা, (স্বামী) ভিখারী অহর্নিশ বিষ খায়। আমার কি গতি হইবে।'

কয়েকটি কবিতায় সেকালের সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উজ্জ্বল যথাযথ বর্ণনা আছে। যেমন

পুত্ত পবিত্ত বহুত্ত ধণা ভত্তি কুটুম্বিণি সুদ্ধমণা।
হাক্ক তরাসই ভিচ্চগণা কো কর বব্বর সগ্‌গমণা ॥

'পুত্র পবিত্র (অর্থাৎ সচ্চরিত্র), বহুত ধন, কুটুম্বিনী (অর্থাৎ গৃহিণী) ভক্তিমতী ও শুদ্ধস্বভাব, হাঁকে ত্রাস পায় ভৃত্যগণ। (এমন সংসারসুখ থাকিতে) কোন্ বর্বর স্বর্গে মন করে।'

নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটির কৌতুকরস উপভোগ্য।

সের এক্ক জই পাঅই ঘিত্তা
মণ্ডা বীস পকাইল ণিত্তা।
টঙ্ক এক্ক জই সিন্ধব পাআ
জো হউ রঙ্ক সো হউ রাআ ॥

'এক সের ঘী যদি মিলে যায় তবে নিত্য বিশটা মণ্ডা পাকানো হয়। যদি এক ছটাক সৈন্ধব (লবণ) পাওয়া যায় তবে হোক সে নিঃস্ব তবুও সে রাজা।'

সেকালের কেন সবকালের বাঙ্গালীর রসনারোচন ভোজ্যের তালিকা পাইতেছি এই কবিতায়

ওগগর ভত্তা
রম্ভঅ পত্তা।
গাইক ঘিত্তা
দুগ্ধ সজুত্তা।
মোইণি মচ্ছা
নালিচ গচ্ছা।
দিজ্জই কন্তা
খাই পুনবন্তা॥

'ওগরা ভাত, রম্ভার পাত, গাওয়া ঘী, জুতসই দুধ, ময়না মাছ, নালিতা গাছ (অর্থাৎ পাট শাক)। কান্তা (রাঁধিয়া বাড়িয়া) দেয়, পুণ্যবান্ খাইতে পায়।'

চাণক্যশ্লোকের অনুরূপ নীতি-কবিতাও দুই একটি আছে। যেমন

পাণ্ডব-বংসহি জন্ম ধরী জে
সম্পঅ অজ্জিঅ বিপ্পঅ দী জে।
সোই জুহিট্ঠির সংকট পাআ
দেবঅ লিক্খিঅ কেণ মেটাআ।

'পাণ্ডব-বংশে যিনি জন্ম ধরিলেন, সম্পদ অর্জিয়া জিনি বিপ্রকে দান করিলেন,—সেই যুধিষ্ঠির সঙ্কটে পড়িলেন। দৈবের লিখিত কে খণ্ডন করিতে পারে।'

৭

অবহট্‌ঠে (প্রত্ন-নব্য-আর্য ভাষায়) সাহিত্যিক রচনা সবই গেয় ছিল। সে রচনার বেশির ভাগ গান অথবা সুরে আবৃত্তি করা পদ্য। গদ্য-ছাঁদে গানও রচিত হইত। ইহার নাম 'চিত্রক'। যেমন মানসোল্লাসে উদ্ধৃত দশাবতার-বন্দনা পদটি।[১]

জেনে রসাতলউণু মৎস্যরূপে বেদ আণিয়লে মনু শিবক বাণিয়লে তো সংসারসাগর তারণু মোহংতো রাখো নারায়ণু।…
জে ব্রাহ্মণের কুলে উপজীয়াঁ কাত্তবীর্য্যাজ্জুণের বাহু ফরসেঁ খণ্ডিয়া পরসুরামু দেউ তোম্হা মঙ্গল করউ।…
বুদ্ধরূপেঁ জো দানবসুরাঁ বঞ্চড়নি বেদ দূষণ বোল্লড়ণি মায়া মোহিয়া তো দেউ মাঝি পসাউ করু।…

'যিনি রসাতল হইতে মৎস্যরূপে বেদ আনিয়াছিলেন, মনুর মঙ্গল করিয়াছিলেন সেই সংসার-সাগরতারণ নারায়ণ আমাদের রক্ষা করুন।…
যিনি ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কার্তবীর্যার্জুনের বাহু পরশু দ্বারা ছিন্ন করিয়াছিলেন, (সেই) পরশুরাম দেব তোমাদের মঙ্গল করুন।…
বুদ্ধরূপে যিনি দানব ও অসুরদের বঞ্চনাকর বেদনিন্দা-উক্তি দ্বারা মায়ামোহিত করিয়াছিলেন সেই দেব আমায় অনুগ্রহ করুন।'

---

[১] এই গানের কিছু অংশ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন (সা-প-প ১৩২৯)। সমগ্র গানটি নব্য আর্য, কানাড়ী ও সংস্কৃত মিশ্র ভাষায় লেখা। মানসোল্লাস তৃতীয় খণ্ড পৃ ৩৮-৩৯ দ্রষ্টব্য।

দুইজনের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গানের নাম ছিল 'শুকসারিক'।[১] মানসোল্লাসে একটি মূল্যবান উদাহরণ আছে। সেটি নব্য আর্য ও কানাড়ী মিশ্র ভাষায় লেখা। (তবে পাঠ খুব বিকৃত।) যেমন[২]

গোপকন্যা বলিতেছে

মাএ তোরী নাস···। ছাড়্ ছাড়্ মইঁ জাইব গোবিন্দ সহ খেলন···

'মা তোর···। ছাড় ছাড় আমি গোবিন্দের সহিত খেলিতে যাইব···'

মা বাধা দিয়া কিছু বলিল। তখন কন্যা বলিতেছে,

···বাউলি পি নারায়ণু জগহকারা গোসাঁমী।

'পাগল (তুমি), নারায়ণ জগতের প্রভু।'

৮

প্রত্ন নব্য-আর্য ভাষায় নানাধরণের গীতিরচনার মধ্যে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট ছিল "চর্যা" নামক অধ্যাত্ম গান ও ছড়া। পরবর্তী অধ্যায়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসঙ্গে চর্যা-গীতির বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য। মানসোল্লাসে[৩] চর্যা-প্রবন্ধের সংজ্ঞা ও উদাহরণ এইভাবে আছে

অর্থশ্চাধ্যাত্মিকঃ প্রাসঃ পাদদ্বিতয়শোভনঃ।
উত্তরার্ধে ভবেদেবং চর্যা সা তু নিগদ্যতে ॥

সংসারসাঅর উত্তরে কায়রহিতেঁ চাড়িয়া
কোহ-লোহ-মোহ-বহুকেনা ভরিয়া।
ইন্দিয়-পবণ খর বেগ বহন্তি।
দুক্কিয় লহরী নিমজি (?) ন পাবথি।

ঈদৃক্ পদানি চত্বারি দর্শিতানি ময়াধুনা।
অধ্যাত্মকার্যযুক্তানি চর্যানাম্নি প্রবন্ধকে ॥

'অর্থ অধ্যাত্মঘটিত, দুই চরণে মিল। দ্বিতীয় অর্ধেও তাহাই। ইহাকে বলা হয় চর্যা॥

'সংসার সাগর পার হইবার জন্য চড়া হইয়াছে,
ক্রোধ-লোভ-মোহ দ্বারা প্রভূত ভরা হইয়াছে,
ইন্দ্রিয় পবন খরবেগে বহিতেছে,
দুষ্কৃত লহরী ধ্বংস করিতে পারিতেছে না॥'

এই যে চার পদ আমি এখন দেখাইলাম, (তাহা) অধ্যাত্মকার্যযুক্ত[৪] (দেখা যায়) চর্যা নামক প্রবন্ধে॥'

---

[১] "পদৈঃ প্রশ্নোত্তরৈর্যুক্তঃ স প্রোক্তঃ শুকসারিকঃ॥"

[২] ইহাও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রকাশ করিয় ছিলেন।

[৩] তৃতীয় খণ্ড পৃ ৪৭, ৬৪। পাঠান্তর মিলাইয়া চর্যা পদগুলির এই পাঠ নির্ধারণ করিয়াছি।

[৪] অর্থাৎ সাধনকার্যের উপযুক্ত নট-সজ্জা ও নট-চেষ্টা সমন্বিত?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চর্যাগীতি

১

আমাদের দেশে আর্যভাষার সব স্তরের সাহিত্যের উন্মেষ হইয়াছে ধর্মকে আশ্রয় করিয়া। ধর্মকথা বহন করিয়াই যুগে যুগে নূতন ভাষা সাহিত্যের সভায় আসন পাইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার বেলায়ও ইহার অন্যথা নাই। বাঙ্গালা ভাষা যখন সদ্যোজাত, ইহার রূপ যখন অত্যন্ত অপরিণত, তখন সংস্কৃত ভাষা অবলম্বনে বাঙ্গালী শিষ্ট কবিপণ্ডিতের সাহিত্যচর্চা চলিত। আর যাঁহারা শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজের ধার ধারিতেন না তাঁহারা সংস্কৃত-অশিক্ষিত জনসাধারণের বোধগম্য "ভাষা"তে গল্প-গান-ছড়া রচনা করিতেন। এই সূত্রেই বৌদ্ধ ও শৈব সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা সাহিত্যে প্রথম অনুশীলিত হইয়াছিল। আজ অবধি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সিদ্ধাচার্যদের সাধনতত্ত্ব-জ্ঞাপক ও অধ্যাত্ম-অনুভূতিপরিচায়ক চর্যাগীতিগুলিতেই অচির-উদ্ভূত বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য-নিদর্শন বিদ্যমান। বর্তমান শতাব্দের দ্বিতীয় দশকের আগে চর্যাগীতিকারদের অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল। এগুলি আবিষ্কার করিয়াছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

চর্যাগীতিগুলি তত্ত্ব-সাধনাঘটিত পারিভাষিক শব্দে কণ্টকিত ও লৌকিক অনির্বচনীয় উৎপ্রেক্ষায় আকীর্ণ, কিন্তু গান বলিয়া রসহীন নয়। এই চর্যাগান-গুলির আসল উদ্দিষ্ট গভীর ব্যঞ্জনা। সেই ব্যঞ্জনায় ইহাদের সাধন-সঙ্কেত দ্যোতিত। কিন্তু এই ভিতরের অর্থ আমাদের কাছে একটুও স্পষ্ট নয়, কেননা সে অর্থভাণ্ডারের চাবি আমাদের হাতে নাই। তবুও আভাসে ইঙ্গিতে যতটুকু অনুমান হয় তাহাও খুলিয়া বলা প্রায়ই শোভন ও সঙ্গত নয়। গানগুলি লেখা হইয়াছিল প্রধানত আভ্যন্তর অর্থের জন্যই, কিন্তু বাহিরের পরিচ্ছদ বলিয়া বাহ্য অর্থ একেবারে ফেলিয়া দিবার নহে। সে সময় সাধারণ লোকের মধ্যে গানের যে রীতি চলিত ছিল সেই রীতি যথাযথ অনুসরণ করিয়াছে বলিয়া এগুলি সেকালের সাধারণ সাহিত্যেরও প্রতিনিধি।

সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাবকাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবল মতভেদ আছে। ডকূটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও তাঁহার অনুবর্তীরা বলেন লুইপাদ প্রভৃতি

প্রাচীনতর সিদ্ধাচার্য খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই মত মানিলে স্বীকার করিতে হয় যে সপ্তম-অষ্টম হইতে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দ পর্যন্ত চারি পাঁচশত বৎসর ধরিয়া চর্যাগীতির ভাষায় কোনও পরিবর্তন হয় নাই। চর্যাগানের শৈলীর প্রাচীনত্ব মানিয়া লইলেও বাঙ্গালা ভাষার সেই অবস্থায় এ ব্যাপার সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়দের মতে সিদ্ধাচার্যদের কাল মোটামুটি দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যে পড়ে। ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দুই তিন অথবা ততোধিক শতাব্দ পিছাইয়া লইতে চান। নানা কারণে সুনীতিবাবুর মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। গোরক্ষনাথের ও মৎস্যেন্দ্রনাথের গাথাকে ইতিহাস মনে করিয়া তিব্বতী ও নেপালী ঐতিহ্য ঘাঁটিলে এ মতদ্বৈধের মীমাংসা হইবে না। ঐতিহাসিক প্রমাণে সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাবকালের নিম্নতম সীমা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দ, কেননা ঐ শতাব্দের প্রথম ভাগে রচিত মৈথিল পণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণনরত্নাকরে চৌরাশী সিদ্ধের তালিকায় বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্যদের অনেকেরই নাম রহিয়াছে। ঊর্ধ্বতম-সীমা একাদশ শতাব্দ॥[১]

২

নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার হইতে চর্যাপদাবলীর পুথি আবিষ্কার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশিষ্ট কীর্তি। শুধু বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের নয়, তাবৎ নবীন ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া এই পদগুলি অমূল্য। চর্যাগীতিকোষ পুথিখানি আর তিনটি অপভ্রংশ দোহার পুথির সহিত একত্র শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয় (১৩১৬)। শাস্ত্রী মহাশয় সবগুলি পুথির ভাষাই প্রাচীন বাঙ্গালা মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নয়। শুধু প্রথম পুথি চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের ভাষাই বাঙ্গালা[২], অপরগুলি অপভ্রংশে-অবহট্‌ঠে রচিত। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামটি অশুদ্ধ, শুদ্ধ নাম হইবে 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়'। এটি অবশ্য টীকার বর্ণনা। টীকাকার মুনিদত্তের মতে পদসংগ্রহের নাম 'আশ্চর্যচর্যাচয়'।[৩] আসলে বলা উচিত 'চর্যাকোষ' বা 'চর্যা-

[১] 'চর্যাগীতিপদাবলী' সংস্করণ ১৯৬৬ ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[২] এ পুথির অক্ষরও বাঙ্গালা। লিপিকাল আনুমানিক পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দ।

[৩] "শ্রীলুয়ীচরণাদিসিদ্ধিরচিতেহপ্যাশ্চর্যচর্যাচয়ে"।

গীতিকোষ'। টীকার রচনাকাল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দে বলিয়া বোধ হয়। মূল গীতিগুলি টীকা-রচনার বহুপূর্বে লেখা হইয়াছিল। তাহার একটা প্রমাণ টীকা-কারের সময়ে অনেক পাঠান্তর প্রচলিত ছিল। আর একটা প্রমাণ, টীকাকার সব কথার মানে জানিতেন না।

চর্যাগীতিগুলি প্রাচীন বাঙ্গালায় লেখা হইলেও ইহাতে অবহট্‌ঠের ছাপ ও ছাঁদ কিছু কিছু থাকায়[১] কেহ কেহ এই ভাষাকে বাঙ্গালা বলিয়া নির্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন। কেহ কেহ আবার ইহাকে প্রাচীন হিন্দী, প্রাচীন মৈথিলী, প্রাচীন উড়িয়া অথবা প্রাচীন অসমীয়া—অর্থাৎ বাঙ্গালা ছাড়া অপর কোন আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা—বলিয়া মনে করেন। কিন্তু চর্যাগীতির ভাষা যে প্রধানত এবং মূলত বাঙ্গালা তাহা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সুনিশ্চিত-ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাঁহার *Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থে। হিন্দীর দাবি উঠিতেই পারে না। উড়িয়া বাঙ্গালা ও অসমীয়া এক মূল পূর্বপ্রান্তীয় কথ্যভাষা হইতে উদ্ভূত। সুতরাং বাল্যাবস্থায় তিনটি ভাষার মধ্যে মিল থাকিবেই। কোন কোন বিষয় স্বতন্ত্রভাবে ধরিলে চর্যাগীতির ভাষাকে প্রাচীন উড়িয়া বা প্রাচীন অসমীয়া বলিলেও অন্যায় হয় না॥

৩

চর্যাসংগ্রহটিতে সর্বসমেত একান্নটি গান ছিল। তাহার মধ্যে একটি টীকাকার ব্যাখ্যা করেন নাই বলিয়া অসংখ্যাত এবং পুথিতে অনুদ্ধৃত। আর পুথির মধ্যেকার কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়ায় তিনটি সম্পূর্ণ পদ এবং একটি পদের শেষাংশ অপ্রাপ্ত। অতএব পুথিতে সর্বসমেত সাড়ে-ছেচল্লিশটি গান পাওয়া গিয়াছে। টীকায় আরো চারটি পদের টুকরা পাওয়া যাইতেছে। একটি চর্যাগীতির (২১) ব্যাখ্যায় মীননাথের রচনা বলিয়া এই বাঙ্গালা দোহাটি টীকাকার উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্মকুরঙ্গ-সমাধিকপাট।
কমল বিকশিল কহিহ ণ জমরা
কমল-মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা।

'গুরু কহেন পরমার্থের বর্ত্ম, কর্মরূপ কুরঙ্গের খেদার কপাট। কমল ফুটিলে শামুক কহিবে না; কমলমধু পান করিতে ভ্রমর ভুলে না।'

[১] ষোড়শ শতাব্দের বাঙ্গালা রচনাতেও এমন "অবহট্‌ঠ" পদ ও ছাঁদ কিছু কিছু আছে।

চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ে আমরা সর্বসমেত চব্বিশ জন কবির আংশিক অথবা সম্পূর্ণ রচনা পাইতেছি। অবশ্য সকল স্থলেই যে, যাঁহার ভনিতা তিনিই রচয়িতা এমন অনুমান করা চলে না। কেহ কেহ গুরুর ভনিতা দিয়াছেন। তাহা বুঝি নামের সঙ্গে গৌরবসূচক "পা"এর যোগে। কতকগুলি স্পষ্টতই ছদ্মনাম। যেমন—কুক্কুরী, বীণা, তন্ত্রী, ডোম্বী, তাড়ক, কঙ্কণ, শবর। তাড়ক, কঙ্কণ—অলঙ্কারের নাম। তন্ত্রী (তাঁতী) জাতিনাম হইতে পারে।

লুইপাদ সিদ্ধাচার্যদের আদিগুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। "লুই" শব্দটি "রোহিত" শব্দ হইতে উদ্ভূত মনে করিয়া প্রবোধচন্দ্র বাগচী ইহাকে নাথ-যোগীদের আদি-সিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথ-মীননাথের সঙ্গে অভিন্ন ধরিয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধাচার্যদের কাছে লুইপাদ ও মীননাথ দুইজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন, কেন না চর্যাশ্চর্য-বিনিশ্চয়-টীকাকার মীননাথের দোহা উদ্ধৃত করিয়াছেন "তথা চ পরদর্শনে মীননাথঃ" বলিয়া।

লুইএর দুইটি চর্যাগীতি (১, ২৯) চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। গীতি দুইটির পদসংখ্যা ছন্দ এবং রাগিণী একই। দুইটিতেই দুইবার করিয়া ভনিতা আছে, ধ্রুব (দ্বিতীয়) পদে এবং শেষ পদে। পদ দুইটিতে যোগ-সাধনা এবং পরতত্ত্বস্বরূপ সরল ও আন্তরিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভাবে সাধারণ চর্যাগীতির স্থূলতা ও গ্রাম্যতা নাই। ভাষাও "সন্ধা" অর্থাৎ সাঙ্কেতিক নয়। দ্বিতীয় গানটি উদ্ধৃত করিতেছি।

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই
আইস সংবোহেঁ কো পতিআই।
লুই ভণই বট দুলক্‌খ বিণাণা
তিএ ধাএ বিলসই উহ ন জানা।
জাহের বানচিহ্ন রূব ন জাণী
সো কইসে আগম-বেএঁ বখাণী।
কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা
উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা।
লুই ভণই [মই] ভাইব কীষ
জা লই আচ্ছম তাহের উহ ন দিস॥

'ভাব হয় না, অভাব যায় না,—এরূপ সংবোধে কে প্রত্যয় করে। লুই বলে, মূর্খ, বিজ্ঞান দুর্লক্ষ, ত্রিধাতুতে বিলাস করে, উদ্দেশ ঠাহর হয় না। যাহার বর্ণ-চিহ্ন-রূপ জানা নাই তাহাকে কেমন করিয়া আগমবেদে ব্যাখ্যা করা যায়। কাহাকে কি বলিয়া আমি পাঁতি দিব। জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদের মতো সে সত্য নয় মিথ্যাও নয়। লুই বলে, আমি ভাবি কিসে। যাহা লইয়া আছি তাহার দিশাও পাই না যে।'

কুক্কুরীপাদের তিনটি চর্যাগীতি সংগৃহীত ছিল চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ে (২,২০,৪৮)। পুথির মধ্যেকার কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়ায় শেষ গানটি পাওয়া যায় নাই। কুক্কুরীর নামিত গানগুলি অপরের, সম্ভবত কোন শিষ্যের রচনা। (নিজের লেখা হইলে ভনিতায় নামের সঙ্গে গৌরবদ্যোতক "পা" শব্দ যুক্ত থাকিত না।) প্রাপ্ত পদ দুইটির ভাষা গ্রাম্য এবং ভাব ইতর। মনে হয় যেন নারীর রচনা। কুক্কুরীপাদের রচিত একটি ক্ষুদ্র সাধন-নিবন্ধ ('মহামায়াসাধনোপায়িকা') পাওয়া গিয়াছে। "কুক্কুরী" অবশ্যই ছদ্মনাম। তারনাথের বর্ণনায় এবং তিব্বতীগ্রন্থে ইহার যে পুরানো ছবি আছে তাহাতে দেখা যায় যে ইহার সঙ্গী একটি কুকুর। মনে হয় এ ছবি নাম অবলম্বনে কল্পিত। "কুক্কুটিক" (=কুক্কুট) হইতে "কুক্কুড়ী" তাহা হইতে "কুক্কুরী" হওয়াও সম্ভব। কুঁকড়ো পায়ে করিয়া আঁচড়াইয়া খাবার খোঁটে। যিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া নানাশাস্ত্র ও মত আলোচনা করেন তাঁহার ছদ্ম অথবা ব্যঙ্গ নাম কুক্কুট হওয়া খুবই সম্ভব। যেমন হইয়াছে বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কণাদের নাম। সংস্কৃত উদ্ভট কবিতায় "কুক্কুটপাদ-মিশ্র" নাম করিয়া ব্যঙ্গোক্তি আছে।[১]

শান্তির নামে দুইটি গান পাওয়া গিয়াছে (১৫, ২৬)। অন্যত্র ইহার ভনিতায় তিনটি চতুষ্পদী ও একটি দ্বিপদী কবিতা পাওয়া গিয়াছে।[২] তাহার মধ্যে একটিতে ভুস্কুর উল্লেখ আছে। কবিতাগুলির রচয়িতা যদি চর্যাগীতিকার শান্তি হন তবে তিনি ভুস্কুর শিষ্য। কিন্তু শান্তি বা শান্তিদেব নামে একাধিক বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন। এক শান্তিদেবকে সুনিশ্চিতভাবে বাঙ্গালী বলিয়া জানিতেছি। ত্রিপুরা জেলায় গুনইঘর গ্রামে প্রাপ্ত শৈব মহারাজ বৈন্যগুপ্তের তাম্রপট্টানুশাসনে[৩] "মহাযানিক-শাক্যভিক্ষু-আচার্য" শান্তিদেবের প্রতিষ্ঠিত আর্যাবলোকিতেশ্বর-বিহারে বুদ্ধমূর্তির তিনবেলা পূজার জন্য ভিক্ষুদের জীবন ধারণের জন্য এবং মন্দিরসংস্কার ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ভূমিদানের কথা আছে। দলিলটি লেখা হইয়াছিল ১৮৮ গুপ্তাব্দে (৫০৭)। এই শান্তিদেব 'শিক্ষাসমুচ্চয়'-এর রচয়িতা হইতে পারেন, তিনি চর্যাগানের কবি নহেন। ষষ্ঠ শতাব্দে বাঙ্গালা ভাষার অস্তিত্ব কল্পনাতীত।

দুইটি চর্যাগীতিতে শবরের ভনিতা আছে (২৮, ৫০)। শবর-নাচ সেকালে

---

১ "বেদান্তশাস্ত্রাণি দিনত্রয়ঞ্চ...কুক্কুটপাদমিশ্রঃ ॥"

২ চর্যাগীতিপদাবলী পৃ ২০২।

৩ *Select Inscriptions*, D. C. Sircar, পৃ ৩৩১-৩৩২।

লোকের উপভোগ্য ছিল।[১] তাহাদের প্রেমলীলার রূপকবর্ণনা চর্যাগীতি দুইটিকে সাধারণ গীতিকবিতার মতোই উপভোগ্য করিয়াছে। প্রথমটি এই।

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি-পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি
ণিঅ ঘরণী নামে সহজসুন্দারী।
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।
তিঅ-ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী।
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই।
গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ ণিঅ মণে বাণেঁ
একে শরসন্ধাণেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম ণিবাণেঁ।
উমত সবরো গরুআস রোষে
গিরিবর সিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ॥

'উঁচু উঁচু পর্বত—তথায় বসে শবরী বালিকা. ময়ূরপুচ্ছ-পরিহিত শবরী, গ্রীবায় গুঞ্জার মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল করিও না, তোমার দোহাই। (এ) তোমার নিজ গৃহিণী, নামে সহজসুন্দরী। নানা তরুবর মুকুলিত হইল রে, গগনে লাগিল ডাল। কর্ণে কুণ্ডল বজ্রধারিণী শবরী একেলা এ বন ঢুঁড়িতেছে। ত্রৈধাতুক খাট পাড়িল শবর, শয্যা বিছানো হইল। প্রেমিক শবর, প্রেমিকা নৈরামণি, প্রেমে রাত পোহাইল। হিয়া-তাম্বূলে কর্পূর দিয়া মহাসুখে খাওয়া হইল, শূন্য-নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত পোহাইল। গুরুবাক্য-পুঙ্খ নিজমন-বাণে যোজনা কর। এক শরসন্ধানে বিদ্ধ কর বিদ্ধ কর পরমনির্বাণকে। গুরুরোষে শবর উন্মত্ত। গিরিবরশিখর-সন্ধিতে পশিলে শবর ফিরিবে কিসে।'

চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ে দারিকের একটি চর্যাগীতি আছে (১৪)। অন্যত্র আরও একটি পাওয়া গিয়াছে।[২] কিন্তু পাঠবিকৃতির ফলে সেটির অর্থোদ্ধার সুকঠিন। দারিক ছিলেন লুইয়ের শিষ্য।

বিরুআ (বিরূপ), গুণ্ডরী, চাটিল, কামলি (কম্বলিক), ডোম্বী, মহিণ্ডা (মহীধর), বীণা, আজদেব (আর্যদেব), ঢেণ্ঢণ, ভাদে, তাড়ক (তাটঙ্ক), কঙ্কণ, জয়নন্দী ও ধাম (ধর্ম)—ইঁহাদের একটি করিয়া পদ চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ে সঙ্কলিত হইয়াছে। তন্ত্রী-পাদের একটি চর্যা মূল পুথিতে ছিল। পুথি খণ্ডিত থাকায় সে চর্যাটি পাওয়া যায় নাই। তবে শেষ পদের টীকার অংশ মাত্র আছে।

[১] পাহাড়পুরের মন্দিরের ভিত্তিচিত্রে শবরশবরীর মদোন্মত্ততা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

[২] সা-প-প ২৯ পৃ ৫১-৫২।

লাড়ীডোম্বী-পাদেরও একটি চর্যা ছিল। কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা ছিল না বলিয়া চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ের পুথিতে উদ্ধৃত হয় নাই।

টীকাকার যে চর্যাটি (১৭) বীণা-পাদের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে কোন ভনিতা নাই। তৃতীয় ছত্রের "বীণা" শব্দটি ভনিতা নয়। গানটি আসলে ভনিতাহীন। চর্যাটিতে একতারার বর্ণনা এবং তদ্‌যোগে (শবর-শবরীর ?) নৃত্যগীতের কথা আছে।

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
অণহা দাণ্ডী চাকি কিঅত অবধূতী।
বাজই অলো সহি হেরুঅ-বীণা
সুণ-তান্তি-ধনি বিলসই রুণা।
আলি-কালি বেণি সারি মুণেআ
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ।
জবে করহা করহকলে পিচিউ
বতিস তান্তি-ধনি সএল ব্যাপিউ।
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ-নাটক বিসমা হোই॥

'সূর্য লাউ, চন্দ্রকে লাগানো হইল তাঁত, অনাহত দাণ্ডী, অবধূতী হইল চাকি। ওলো সই, হেরুকের বীণা বাজিতেছে, শূন্যতন্ত্রীর ধ্বনি মূর্ছিত হইতেছে ক্ষীণ স্বরে। অ-বর্গ ও ক-বর্গ দুই সারিকা (স্বরসপ্তক) জানা গেল; গজবরের সমরস সন্ধি গোণা হইল। যখন হাতে করভকল[১] চাপা হইল, তখন বত্রিশ তন্ত্রীর ধ্বনি সকল ব্যাপিল। বাজিল (হেবজ্র) নাচিতেছেন, দেবী (নৈরামণি) গাহিতেছেন। বুদ্ধের নাটগীত বিপরীত[২] বটে।

চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ে সরহের গান আছে চারটি (২২, ৩২, ৩৮, ৩৯)। সরহ অনেকগুলি দোহা লিখিয়াছিলেন অবহট্‌ঠে, সেকথা আগে বলিয়াছি। ইহার সংস্কৃত রচনাও আছে। সরহের নামিত চর্যাগীতিতে ভাষার সরল প্রসন্নতার সঙ্গে ভাবের উদার গভীরতা মিলিত হইয়াছে। উদাহরণরূপে শেষের গানটি উদ্ধৃত করিতেছি।

সুইণা হ অবিদারঅ রে নিঅমন তোহোরেঁ দোসেঁ
গুরুবঅণ-বিহারেঁ রে থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে।
অকট হুঁ-ভব গঅণা
বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহোর বিণানা।
অদভুঅ ভবমোহা রে দিসই পর অপ্পাণা
এ জগ জলবিম্বাকারে সহজেঁ সুণ অপণা।

---

[১] "করভ" শব্দের এখানে অর্থ হইতেছে কনিষ্ঠা হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত হস্তপার্শ্ব, আধুনিক বিহারী ভাষায় "কলই"।

[২] কেননা সাধারণ নাটগীতে পুরুষ গাহিত আর মেয়ে নাচিত।

অমিআ আচ্ছন্তে বিস গিলেসি রে চিঅ-পরবস অপা
ঘরে পারে কা বুঝ্ঝিলে ম রে খাইব মই দুঠা কুণ্ডবাঁ।
সরহ ভণন্তি বর সুণ গোহালী কিমো দুঠা বলন্দে
একেঁলে জগ নাসিঅ রে বিহরহু স্বচ্ছন্দে ॥

'স্বপ্নেও (তুই) অবিদ্যারত, ওরে (আমার) নিজমন, তোর (নিজের) দোষে গুরুবচনবিহারে তুই কি করিয়া পুনরায় থাকিবি। হুঙ্কারোদ্ভব গগন আশ্চর্য। বঙ্গে জায়া লইলি, পরে তোর বিজ্ঞান ভাগিয়া গেল। ভবমোহ অদ্ভুত, ওরে, আত্ম-পর দেখা যায়। এই জগৎ জলবিম্বাকার, সহজে আত্মা হয় শূন্য। অমৃত থাকিতে বিষ গিলিস, ওরে চিত্ত-পরবশ আত্মা। ঘরে পরে কি বুঝিলে, ওরে, আমি খাইব দুষ্ট কুটুম্ব। সরহ বলেন, বরং শূন্য গোহাল, কি হইবে দুষ্ট বলদে। একেলার দ্বারা জগৎ নাশিত হইয়াছে। ওরে, (এখন) স্বচ্ছন্দে বিহার করি।'

সরহ নামে একাধিক বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন।[১] তাঁহাদের একজন প্রাচীনতর সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম। ইহার জীবৎকাল একাদশ শতাব্দের এদিকে নয়। এই সরহের দোহাকোষের একটি পুথি নকল করিয়াছিলেন শাক্যভিক্ষু স্থবির প্রথমগুপ্ত ১১০১ খ্রীস্টাব্দে। এই দোহাকোষ সঙ্কলন করিয়াছিলেন পণ্ডিত শ্রীদিবাকরচন্দ্র। তখনই সরহের অনেক দোহা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

ভুসুকুর লেখা চর্যাগীতি পাইতেছি আটটি। গীতিরচনার সংখ্যাধিক্যে ইনি দ্বিতীয়। দুইটি গীতিতে (৬, ২৩) ভুসুকু মৃগয়ার রূপক আশ্রয় করিয়াছেন। একটির রূপকে নৌসৈন্য অথবা জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠনের ইঙ্গিত রহিয়াছে (৪৯)।

বাজ-ণাব-পাড়ী পঁউআ-খালে বাহিউ
অদয় দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।
আজি ভুসু[কু] বঙ্গালী ভইলী
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী।
ডহি জো পঞ্চপাটণ ইন্দিবিসআ ণঠা
ণ জাণমি চিঅ মোর কহি গই পইঠা।
সোণ রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ
নিঅ পরিবারে মহানেহে থাকিউ।
চউ-কোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস
জীবন্তে মইলে নাহি বিশেষ ॥

'বজ্র-নৌবাহিনী পদ্মার খালে বাহিল। নির্দয়ভাবে ডাকাতে দেশ লুট করিল। আজি ভুসুকু তুই বাঙ্গালী হইলি, নিজ গৃহিণী চণ্ডালদ্বারা অপহৃত হইল। পাঁচখানি শাসনপট্ট যে দগ্ধ হইল, ইন্দ্রের রাজ্য নষ্ট হইল। জানি না মোর চিত্ত কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট হইল। সোনা রূপা মোর কিছুই রহিল না। নিজ পরিবার লইয়া (বা সঙ্গে) আমি মহাপ্রেমে রহিলাম। মোর চারি কোটি ভাণ্ডার লইয়া শেষ করিল। এখন বাঁচিলে মরিলে সমান।'

---

[১] চর্যাগীতিপদাবলী ভূমিকা পৃ ১৯।

কাহ্ন্‌পাদের বারটি চর্যাগীতি সঙ্কলনে আছে। এতগুলি চর্যাগীতি আর কাহারো ভনিতায় পাওয়া যায় নাই। তবে এই চর্যা সব এক কবির রচনা না হওয়াই সম্ভব। সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে একাধিক কাহ্ন্‌পাদ ছিলেন।[১] একটি চর্যায় কবির গুরু জালন্ধরি-পাদের উল্লেখ পাই (৩৬)। মানিকচন্দ্র-ময়নাবতীর গানে দেখি যে জালন্ধরি শৈবতান্ত্রিক যোগী ছিলেন, ইহারই নামান্তর হাড়িপা এবং ইহার শিষ্য কানুপা (=কাহ্ন্‌পাদ)। জালন্ধরি-শিষ্য কাহ্ন্‌র নামান্তর ছিল বিরুআ (অর্থাৎ বিরূপ)। কোন কোন চর্যাগীতি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কাহ্ন্‌পাদ কাপালিক যোগী ছিলেন। এক "পণ্ডিতাচার্য শ্রীকাহ্ন্‌পাদ" ১২০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে জীবিত ছিলেন, কেন না ইহার 'শ্রীহেবজ্রপঞ্জিকা-যোগরত্নমালা' গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল গোবিন্দপালের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে।[২]

কাহ্ন্‌র চর্যাগীতির রচনারীতিতে অস্পষ্টতা নাই। কয়েকটি প্রেমলীলা-রূপক-মণ্ডিত চর্যাকে সেকালের প্রেমের কবিতার নিদর্শন বলিয়া লইতে পারি। এই গানটি (১৮) বিরূপ কাহ্নের রচনা।

> তিনি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ
> হাঁউ সুতেলি মহাসুহলীড়েঁ।
> কইসনি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী
> অন্তে কুলীণজণ মাঝেঁ কাবালী।
> তঁই লো ডোম্বী সঅল বিটলিউ
> কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ।
> কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই
> বিদুজণ-লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলঈ।
> কাহ্নে গাইউ কামচণ্ডালী
> ডোম্বিত আগলি নাহি ছিণালী॥

'তিন ভুবন আমার দ্বারা হেলায় বাহিত হইল। আমি মহাসুখলীলায় (অথবা মহাসুখনীড়ে) শুইলাম। ওলো ডোমনী, তোর ভাবনাপনা কি রকম? এক পাশে কুলীন ব্যক্তি আর মাঝখানে কাবাড়ি! ওলো ডোমনী, তুই সকল নষ্ট করিলি। কাজ নাই কারণ নাই, শশধর টলাইলি। কেহ কেহ তোকে বিরূপ বলে, (অথচ) বিদ্বজ্জনেরা তোর কণ্ঠ ছাড়ে না। কাহ্ন গাহিতেছে কামচণ্ডালী (গীতি)—ডোমনীর আগে (অর্থাৎ বাড়া) ছিনাল নাই।'

আর একটি (৪০) চর্যায় খুব সহজ কথায় গভীর অধ্যাত্মসত্যের ইঙ্গিত আছে।

---

[১] চর্যাগীতিপদাবলী ভূমিকা পৃ ১৫-১৬।

[২] C. Bendall, *Catalogue of Buddhist Manuscripts in the University Library, Cambridge* পৃ ১৮৯-৯০।

জো মণ-গোঅর আলা জালা
আগম পোথী টন্টা মালা।
ভণ কইসে সহজ বোলবা জাঅ
কাঅবাক্‌চিঅ জহু ন সমাঅ।
আলে গুরু উএসই সীস
বাকপথাতীত কাহিব কীস।
জে তই বোলো তেতবি টাল
গুরু বোধ সে সীস কাল।
ভণই কাহ্ন জিণরঅণ কি কইসা
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা॥

'যাহা মনগোচর (তাহার জন্য) তুচ্ছ—আগম, পুথি, টাট (জপ) মালা! বল কিসে সেই সহজ বলা যায়, যাহাতে কায়-বাক্‌-চিত্ত প্রবেশ করিতে পারে না। বৃথাই গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেয়। বাক্‌-পথাতীত কিসে কহা যায়? যাহারা যতই বলে তাহারা ততই ভুল করে। গুরু বোদা শিষ্য কালা। কাহ্ন বলে, জিনরত্ন কেমন, না কালা দ্বারা বোবা সংবোধিত হয় যেমন।'

সরহের মতো এক কাহ্নও অবহট্‌ঠে 'দোহাকোষ' রচনা করিয়াছিলেন। ইহার দোহার ভাষা একটু প্রাকৃতঘেঁষা ও কঠিন॥

৪

কিছুকাল পূর্বে রাহুল সাংকৃত্যায়ন নেপাল-তিব্বতে প্রাপ্ত তালপাতার পুথিতে কয়েকজন নূতন কবির চর্যাগীতি পাইয়াছিলেন।[১] সেই সঙ্গে আমাদের জানা দুই-একটি চর্যাগীতিও পাঠান্তরে মিলিয়াছে। এই নূতন কবিরা যে চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ে উদ্ধৃত কবিদের পরবর্তী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এগুলি প্রাচীন চর্যাগানের নকশ। নেপাল-তিব্বতের বৌদ্ধ মঠে চর্যাগানের ধারাবাহিক চর্চা যে অবিচ্ছিন্ন ছিল তাহার প্রমাণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দিয়াছিলেন। এই পুথিতে আরও কিছু পাইতেছি।

রাহুলজীর আবিষ্কৃত পুথিতে বিনয়শ্রী, সরুঅ ও অবধূ এই তিন নূতন কবির চর্যাগান পাইতেছি। ইহারা যে প্রাচীন চর্যাগীতিকারদের পরবর্তী তাহা প্রাচীন চর্যাগানের রূপ ও রূপকের অনুকরণ হইতে বেশ বোঝা যায়। যেমন

খমণা খমণিএঁ বালা বালী
খমণএঁ খমণ্ডল ভাগ অকালী।
বিরহী খমণী আইসু পমাণেঁ
খুধী পইসই ঘোর মসাণেঁ।
ভণই বিনয়শ্রী খমণি দিঠী
খমণা ছাড়ি ণ খণ বি সংতুঠী॥

[১] বিহার রাষ্ট্রভাষা-পরিষদ্‌ প্রকাশিত 'দোহা-কোশ' (১৯৫৭) দ্রষ্টব্য।

'ক্ষপণক ক্ষপণকী দুইজন বালক বালিকা (অর্থাৎ প্রেমিক প্রেমিকা)। ক্ষপণক লাফ দিয়া খ-মণ্ডল হইতে ভাগিল (অথবা কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিল)। এমন প্রমাণে (বা অপমানে) ক্ষপণকী বিরহিণী হইল এবং ক্ষুধার্ত (হইয়া) মোর মশানে প্রবেশ করিল। বিনয়শ্রী বলে, ক্ষপণকীকে দেখা গিয়াছে, ক্ষপণককে ছাড়িয়া ক্ষণমাত্রও সে সন্তুষ্ট হয় না।'

নিম্নে উদ্ধৃত বিনয়শ্রীর গানে কাহ্নের দুইটি চর্যাগীতির (১০, ১৮) প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

মেহলি চণ্ডালী ঘরবি বাহ্মণ
জগ বিটালন্তি তে দুই লাম্বন।
হল সহি কামঞ্চি[1] অচাভুঅ দিট্‌ঠা
বাহ্মণ মনুস চণ্ডালিএঁ তুট্‌ঠা।
অইসি নিরাজ কমাল ণ দিশই
মাউগ চণ্ডালী বাহ্মণে পইসই।
দেখু চণ্ডালীর বাহ্মণ জার
পাঞ্চ বান্ন ভইল্ল একাকার।
তে দুই নাসন্তি সম-সাঁজোএ
ভণই বিনয়শ্রী সদ্‌গুরু-বোহেঁ॥

'মহিলা (অর্থাৎ গৃহিণী) চণ্ডাল-নারী, গৃহপতি ব্রাহ্মণ। তাহারা দুইজন (পরস্পর) অবলম্বন করিয়া (?) জগৎ অপবিত্র করিতেছে। ওলো সই, কি অতি-অদ্ভুত (ব্যাপার) আমি দেখিলাম। বামুন মানুষ চণ্ডাল-নারীতে প্রীত। এমন নির্লজ্জ কার্যকলাপ (?) দেখা যায় না—বামুনে চণ্ডালীমার্গ প্রবেশ করিতেছে।[2] (লোকে) দেখুক চণ্ডাল নারীর ব্রাহ্মণ উপপতি। পঞ্চ বর্ণ যে একাকার হইল! সমসংযোগে[3] তাহারা দুইজন নাশ পায়। সদ্‌গুরুর উপদেশে বিনয়শ্রী (এই কথা) বলিতেছে।'

নিম্নে উদ্ধৃত গানে বর্ষাকালে নালার জলস্রোতে মাছধরার বর্ণনা আছে। শেষ ছত্র নষ্ট হওয়ায় রচয়িতার নাম জানা গেল না। মনে হয় বিনয়শ্রী।

গিরিবর-সিহরেহি নালা লাম্বএ
তহিঁ সো কেবটিণি নিভর জাগএ।
অরে ভল্লি কেবটিণি জাল বিচারঅ
মাআ মাচ্ছ নিরন্তরেঁ মারঅ।
বতিশ[4] নালা সাব্ব নীরন্ধী
মারঅ মাচ্ছা নীভর বান্ধী।
মাআ মাচ্ছা অ্যাগে মবি ভাক্‌খী
আচ্ছই চউমুহ জালা রাক্‌খী।
অ[স]ইসি কেবটিণি সো পড়িহা[হিঁ]···

'গিরিবর শিখর হইতে নালা নামিয়াছে। সেখানে কেওটনী[5] ঠায় জাগিয়া আছে। ওরে, ভালো কেওটনী জাল হাঁটকাইতেছে এবং নিরন্তর মায়া-মৎস্য মারিতেছে। বত্রিশ নালা সব আটকানো।

[1] আসল পাঠ সম্ভবত "কা মঞ্চি" ছিল।
[2] অর্থাৎ চণ্ডালীকে ভার্যা করিয়াছে।
[3] অর্থাৎ সমতাপ্রাপ্ত হইলে।
[4] পাঠ "ব্বতিশ"।
[5] অর্থাৎ জেলেনী।

(তাহাতে) বাঁধিয়া ভালো করিয়া মায়া-মৎস্য মারিতেছে। মায়া-মৎস্য আগে আমি (?) খাইয়াছি। চার মোহানায় জাল পাতা আছে। অসদৃশ মনে হইতেছে সে কেওটনীকে।...

৫

মুসলমান অভিযানের পরে বাঙ্গালা দেশে চর্যাগীতির ধারা অব্যাহত থাকে নাই। তবে বিলুপ্তও হয় নাই। অধ্যাত্ম-সাধকদের সাহিত্যকর্মে এই বিশিষ্ট ভঙ্গিটি সাধারণ-লোকগোচরের বাহিরে থাকিয়া কোন কোন অধ্যাত্ম-সাধকসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত থাকে। নাথ-পন্থী যোগীরা এই ঐতিহ্যের অধিকারী। তাঁহাদের লেখার মধ্য দিয়া চর্যাগীতির কোন কোন বস্তু সাধারণ সাহিত্যেও অজানিত-ভাবে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। এ কথা মনসার কাহিনী সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। পরবর্তী কালের ভাবুক যোগী ও বৈষ্ণবদের কোন কোন গানে চর্যাগীতির অভ্রান্ত অনুবৃত্তি লক্ষিত হয়। ঢেণ্ঢণ-পাদের নামিত চর্যা-গীতিটির (৩৩) কয়েক ছত্র কালোচিত ভাষা-পরিবর্তন সহ কবীরের ভনিতায় মিলিয়াছে অষ্টাদশ শতাব্দে লেখা একটি বাঙ্গালা পুথিতে। ঢেণ্ঢণের গানে দশ ছত্র, কবীরের গানে আট ছত্র। তাহার মধ্যে চারি ছত্র ভাবে ভাষায় অভিন্ন, এক ছত্র ভাষায় পৃথক্। ঢেণ্ঢণের ও কবীরের পাঠ পাশাপাশি দেখাইতেছি। যে ছত্রের মধ্যে মিল নাই তাহা বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হইল।

(টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।)
বেঙ্গ সংসয় বড্হিল জাঅ
(দুহিল দুধু কি বেণ্টে যামায়।)
বলদ বিআএল গাবিআ বাঁঝে
পিঠা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে।
(জো সো বুধী সোই নিবুধী
জো সো চোর সেই দুষাধী।)
নিতে নিতে বিআলা ষিহেঁ সম জুঝঅ
ঢেণ্ঢণপাএর গীত বিরলে বুঝঅ ॥[১]

(অব কেয়া করে গান গাঁব-কতুয়াল।
শ্ব মাংস পসারি গীধ রাক্ষউয়ালা।
মুষ কী নাও বিলাই কাঁড়ারী)
শোএ মেড়ুক নাগ পহারী।
বলদ বিয়াওএ গাভী ভই বাঞ্ঝা
বাছুরি দুহাওএ দিন তিন সাঞ্ঝা।

নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে জুঝে
কহে কবীর বিরল জনে বুঝে ॥[২]

[১] 'আমার ঘর বস্তিতে অথচ পড়শি নাই। হাঁড়িতে ভাত নাই অথচ নিত্যই প্রেমিক-অতিথি। বেঙ্গের (অথবা বেগে) সংশয় বাড়িয়া যায়। দোয়া দুধ কি বাঁটে ঢোকে? বলদ বিয়াইল, গাই বাঁঝা। কেঁড়ে (-ভরতি) দোয়া হয় তিন সন্ধ্যা। সেই যে বুদ্ধি সে সার্থক বুদ্ধি। সেই যে চোর সেই পুলিশ। নিতি নিতি শিয়াল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ঢেণ্ঢণপাদের গীত অতি অল্প (লোকেই) বোঝে।'

[২] 'এখন কী গান করিতেছে গ্রামের কোটাল। কুকুর মাংসের দোকানদার, শকুনি তাহার রক্ষক। ইন্দুরের নৌকা, (তাহাতে) বিড়াল হাল ধরিয়া। বেঙ শুইয়া আছে, সাপ পাহারা দিতেছে। বলদ বিয়ায়, গাই হইল বাঁঝা। বাছুর দোয়া হয় দিনে তিন সন্ধ্যা। নিতি নিতি শিয়াল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কবীর বলেন, অতি অল্প (লোকেই এ কথা) বোঝে।'

ঢেণ্টণের তৃতীয় ছত্রের পাঠে বিস্তর গোলমাল আছে, সেই জন্য টীকার ও তিব্বতী অনুবাদের মধ্যে মিল নাই। কবীরের গান হইতে মূলের চতুর্থ ছত্রের আসল পাঠ যে কি তাহা অনুমান করিতে পারি,—"বেঙ্গ সে সাপেঁ বহিল জাঅ" ('বেঙ সে সাপের উপর চড়িয়া যাইতেছে'।) এই উৎপ্রেক্ষা প্রকারান্তরে বৈষ্ণব রাগাত্মিক-পদাবলীতেও আছে।[1] (মিস্টিক বৈষ্ণবদের রাগাত্মিক-পদাবলী এবং অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দের বাউল-গান চর্যাগীতিরই কালোপযোগী সংস্করণ।)

চর্যাগীতির প্রহেলিকা-ঠাট এবং অনেক উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা রাগাত্মিক-পদাবলী ছাড়াও বৈষ্ণব-কবিতায় অন্যত্র দুর্লক্ষ্য নয়। চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ের প্রথম চর্যাতেই যে মানবদেহের সঙ্গে গাছের উৎপ্রেক্ষা আছে ঠিক তাহাই ষোড়শ শতাব্দের বৈষ্ণব-কবিতায় পাইতেছি ॥[2]

৬

চর্যাগীতির সঙ্গে পরবর্তী কালের মিস্টিক (রাগাত্মিক) পদাবলীর এক বিষয়ে বেশ পার্থক্য আছে। চর্যাগীতির বাহ্য অর্থের বিষয় সমসাময়িক জীবন হইতে নেওয়া। সে জীবন অত্যন্ত সাধারণ লোকের,—যাহারা তুলা ধোনে, নৌকা চালায়, মদ চোলাই করে, সাঁকো তৈয়ারি করে, পশুপাখি শিকার করে, মাছ ধরে, দই বেচে; যাহাদের মধ্যে নিঃস্ব ব্রাহ্মণ আছে ততোধিক নিঃস্ব ডোমও আছে, গুরু-গোঁসাই আছে শবর-শবরীও আছে। কিন্তু বৈষ্ণব-পদাবলীতে সমসাময়িক অথবা অতীত কোন কালেরই সাধারণ মানবজীবনের সমাজ-সংসারের কোন কথা নাই।

চর্যাগীতি অর্ধ-সাঙ্কেতিক, রাগাত্মিক-পদাবলী পুরাপুরি সাঙ্কেতিক। যেমন, চর্যাগীতিতে নারী-সঙ্গিনী গ্রহণের কথা আছে, কিন্তু তাহার যে বর্ণনা আছে তাহাতে সাধারণ নরনারীর দাম্পত্য বা গার্হস্থ্য সম্পর্কই প্রকটিত। এবং তাহা সময়ে সময়ে এতটা যথাযথ যে গ্রাম্য বলিয়া কুণ্ঠা জাগায়। কাপালিক-যোগী প্রেমিক ডোমনীর প্রেমাসক্ত হইয়া কাপালিক-বৃত্তি হেলায় ত্যাগ করিতেছে (২০)।

---

[1] যেমন, "সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি তবে সে রসিকরাজ।"

[2] চর্যাগীতিপদাবলী দ্রষ্টব্য।

তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চাঙ্গেড়া
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া।
তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী।

ইহার সঙ্গে চণ্ডীদাস-রজকিনীর ব্যাপার তুলনা করিলে দেখি যে সেখানে একেবারে ভাব ভক্তিগদ্গদ, যেন কৃষ্ণ আর স্বাধীনভর্তৃকা রাধা।

শুন রজকিনী রামী
ও দুটি চরণ শীতল বলিয়া
শরণ লইনু আমি॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দ

১

ত্রয়োদশ শতাব্দে বাঙ্গালা দেশে মুসলমান অধিকার শুরু হয়। মুসলমান অভিযানে দেশের আক্রান্ত অংশে বিপর্যয় শুরু হইয়াছিল। সেই বিপর্যয়ের পরিমাণ বাড়িতেই থাকে। অবশেষে ইলিয়াস্-শাহী বংশের স্বাধীন রাজত্ব-প্রতিষ্ঠায় দেশের অবস্থা কিছু ফিরিতে থাকে। চর্যাগীতির কথা বাদ দিলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভও তখন হইতে বলিতে পারি। মুসলমান-আক্রমণের ঠিক আগে দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক অবস্থা কেমন ছিল তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা করিতে পারিলে পরবর্তী কালে অভ্যুদীয়মান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতির স্বরূপ ও গতির দিক নির্ণয় করা সম্ভব।

যতদূর জানা যায় তাহাতে বলিতে পারি যে পূর্ব-ভারতে আর্য-সংস্কৃতি একটু বিশেষ রূপ ধারণ করিয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের অবসানের পর হইতে ধীরে ধীরে মধ্যদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে এবং গুপ্ত রাজাদের সময়ে সংস্কৃত শাস্ত্রবিধির অভিযান প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে বিজয়ী হয়। বাঙ্গালা দেশেও "বেদজ্ঞ" ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি গুপ্ত-অধিকারের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। (তাহার আগেও এদেশে ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু তাঁহারা "বেদজ্ঞ" অর্থাৎ ঋক্-যজুঃ-সামাধ্যায়ী ছিলেন না। এদেশে বৈদিক যজ্ঞকাণ্ড আগে কখনোই আমল পায় নাই। বৈদিক কর্মকাণ্ড উপনিষদে প্রত্যাখ্যাত। উপনিষদ্ পূর্ব-ভারতের বস্তু, যদি বিদেহবাসী জনকের ঐতিহ্য মানিতে হয়। দুইটি প্রধান বেদবাহ্য ধর্ম—বৌদ্ধ ও জৈন মত—পূর্ব-ভারতেই উৎপন্ন ও প্রবৃদ্ধ।) "মধ্যদেশবিনির্গত" বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে আনাইয়া জমিজমা দিয়া স্থিত করানো এদেশের রাজার ও রাজশক্তির পক্ষে মানবৃদ্ধিকারক কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইতে থাকিল। নবাগত ব্রাহ্মণেরা প্রাধান্য লাভ করায় পুরানো (আথর্বণ ?) ব্রাহ্মণ অনেকে বর্ণব্রাহ্মণে পরিণত হইল অথবা ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে মিশিয়া গেল। গ্রামশাসনভোগী ব্রাহ্মণেরা "গাঁই" সৃষ্টি করিয়া ক্রমশ সমাজপতিত্ব অধিকার করিল। রাজকার্যেও ইহাদের ক্ষমতা বাড়িয়া গেল। ইহারাই রাজসভার আশ্রয়ে থাকিয়া সংস্কৃত-শাস্ত্রশাসিত আচার-অনুষ্ঠান-ধর্মবিশ্বাস সমাজের উচ্চতরস্তরে প্রবেশ করাইতে

লাগিল। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণকাহিনী এইভাবে রাজসভার কবিদের দ্বারাই প্রচারিত হইল। জনসাধারণের মধ্যে যে আচার-অনুষ্ঠান এবং দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল তাহা পুরাপুরি সামাজিক ব্যাপার ছিল। গ্রামের দেবদেবীর পূজা সকলের পূজা। আচার-অনুষ্ঠানে সমাজের বা গোষ্ঠীর সকলের অধিকার। (নবাগত ব্রাহ্মণেরা গৃহদেবতা রূপে বিষ্ণু-শিব-চণ্ডীর পূজার পোষকতা করিত।) গ্রামদেবতার অনুষ্ঠানে নাচ-গান বাজনাবাদ্য হইত। সে গান বৈঠকি গান নয়, দেবদেবীর মাহাত্ম্যবিজড়িত আখ্যায়িকাগীতি।

অতএব সাহিত্যের দিক দিয়া আমরা তিনটি ধারা লক্ষ্য করি। প্রথম, অধ্যাত্মসাধকদের অনুশীলিত গান (চর্যাগীতি) ও উপদেশ-কবিতা (দোহা, ছড়া)। দ্বিতীয়, রাজসভাশ্রিত শিক্ষিত কবিদের রচিত পুরাণকাহিনী (কাব্য, নাটক, প্রকীর্ণ কবিতা) ও বৈঠকি গান। তৃতীয়, দেবদেবীর মাহাত্ম্যমূলক গেয় আখ্যায়িকা-কাব্য (পাঞ্চালিকা)॥

২

এদেশে ধর্ম লইয়া কোন মারাত্মক বিবাদ ছিল না,—না রাষ্ট্রে না সমাজে না গ্রামে না গোষ্ঠীতে না পরিবারে। বাড়িতে একজন শিবের উপাসক, আর একজন বুদ্ধের ভাবক, তৃতীয় ব্যক্তি বিষ্ণুপূজক—এমন ব্যাপার অসাধারণ ছিল না। রাজা বৌদ্ধ রানী ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রিত—এমনও ছিল। এই কারণে সেকালের পক্ষে হিন্দু-বৌদ্ধ জৈন-শৈব-বৈষ্ণব—এমন ধর্মবিভাগ-কল্পনা অতিশয় ভ্রান্ত। বহুধা ধর্মের কথা যদি বলিতেই হয় তবে বলিব এদেশে তুর্কী আক্রমণের সময়ে চারটি প্রধান ধর্মমত প্রচলিত ছিল,—(১) দেশীয় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহিত গ্রামদেবদেবী-পূজা (যাহার মধ্যে বৈদিক দেবতা আছেন, পৌরাণিক দেবতা আছেন, প্রাক্-আর্য (?) দেবতা আছেন, নূতন-পরিগৃহীত দেবতাও আছেন); (২) মহাযান বৌদ্ধমতের একটি বিশেষ ও স্থানীয় রূপ; (৩) যোগী-মত (যাহার সহিত শৈব-মতের সংস্রব আছে); এবং (৪) পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যমত (যাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে বিষ্ণু-শিব-চণ্ডী-উপাসনা)। মুসলমান অধিকারের প্রথম দুই-তিন শতাব্দের মধ্যে চার ধারা মিলিয়া-মিশিয়া গিয়া সাহিত্যে প্রবাহিত দুইটি প্রধান ধারায় পরিণত হইল,—পৌরাণিক (অর্থাৎ অর্বাচীন, নবাগত, নবানীত-শাস্ত্রলব্ধ) এবং অ-পৌরাণিক (অর্থাৎ প্রাচীন, দেশীয় ঐতিহ্যাগত)। দেবদেবীদেরও ভেদ প্রায় মিলাইয়া আসিল। তবে মধ্যকালের বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহাদের যে রূপ দেখা দিল তাহাতে শাস্ত্রলব্ধ ও দেশীয় দুই প্রকৃতির মৌলিক ভিন্নতা বিলুপ্ত নয়॥

৩

দ্বাদশ শতাব্দের শেষ প্রান্তে পূর্ব-ভারতে তুর্কী আক্রমণ শুরু হয়। তাহার পর হইতে প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে অনিশ্চয়তার ও অরাজকতার ঝটিকা চলে। দেশের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির যেসব প্রধান কেন্দ্র ছিল সেইগুলি সর্বাগ্রে বিধ্বস্ত হইল, এবং বুদ্ধি-বিদ্যা-কৌশলে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাঁহারা সর্বাগ্রে বিপন্ন হইলেন। প্রত্যন্ত দেশ বলিয়া বাঙ্গালা চিরকাল কেন্দ্রীয় ভারতবর্ষের রাজপথ হইতে দূরে ছিল। সুতরাং উত্তরাপথে তুর্কী অভিযান শুরু হইলেও অনেক দিন পর্যন্ত তাহা পল্লীবাসী নিশ্চিন্ত বাঙ্গালীর শ্রুতিপথে আসে নাই, অথবা ঈষৎ কর্ণগোচর হইলেও ভীতি উৎপাদন করে নাই। ইহার পূর্বে বাঙ্গালা দেশে কোন বিদেশী শক্তির ব্যাপক আক্রমণ হয় নাই। বহু আগে উত্তরাপথে কালে কালে গ্রীক শক হূণ প্রভৃতি বিদেশীর যে অভিযান হইয়া গিয়াছিল তাহারও কোন ঢেউ বাঙ্গালা অবধি পৌঁছায় নাই। এইসব কারণে যখন মুহম্মদ বিন্ বখ্‌ত্যারের অধীনে তুর্কী সওয়ার বাঙ্গালা দেশে অতর্কিতে উৎপাত আরম্ভ করিল তখন রাজশক্তি বা জনসাধারণ তাহার জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। সেইজন্য এই আকস্মিক আঘাতে দেশের চিত্ত যেন একমুহূর্তে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিদেশী আক্রমণকারীকে হটাইয়া দিবার সামর্থ্য যেন অকস্মাৎ লোপ পাইয়াছিল। তদুপরি দণ্ডশক্তিতে বীর্যহীনতা দেখা দিয়াছিল।[১] (সেকশুভোদয়ার কাহিনীতে যদি কিছুও সত্য থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে কোন এক ইসলাম-ধর্মপ্রচারক লক্ষ্মণসেনের সভায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া তুর্কী অভিযানকারীদের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন।) এই কারণে, সংখ্যায় প্রচুর না হইয়াও তুর্কী অভিযানকারীরা বিনা বাধায় উল্কাগতিতে উত্তর মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়া ধ্বংসের ঝড় বহাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

বিদেশী বিভাষী বিধর্মী তুর্কী সৈন্যের বাঙ্গালায় বিজয়-অভিযানে সাফল্যের আরো একটি কারণ আছে। সেটি গুরুতর।

গুপ্ত-শাসনের সময় হইতে মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণদের উপনিবেশ স্থাপনের শুরু। তাহার পর হইতে এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে দুইটি স্তর দেখা দেয়—নবীন

[১] মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী পৃ ১-২ দ্রষ্টব্য।

(অর্থাৎ শিষ্ট) এবং প্রবীণ (অর্থাৎ দেশীয়)।[১] উভয় স্তরের মধ্যে বৈবাহিক মিলন-মিশ্রণ এবং আচারব্যবহার চলিতে থাকিলেও, আভিজাত্যে সমৃদ্ধিতে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতিতে এই দুই স্তরের পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল। মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণেরা যখন প্রথম উপনিবিষ্ট হইতে থাকেন তখন তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। নানা কারণে ক্রমশ তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। নবীন স্তরের ব্রাহ্মণেরা ও তাঁহাদের শিষ্য-ভৃত্যেরা ছিলেন সংস্কৃতাশ্রয়ী, আর প্রবীণ ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণেরা ছিলেন প্রাকৃতাশ্রয়ী এবং কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মমতে নিষ্ঠাহীন। অনেকে জৈন বৌদ্ধ অথবা যোগপন্থী ছিলেন। মনোধর্মের দিক দিয়া নবীনেরা ছিলেন চিন্তাশীল শাস্ত্রাদর্শবাদী যজ্ঞপরায়ণ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও সংযমনিষ্ঠ, আর প্রবীণেরা ছিলেন দৈববাদী ব্রতপরায়ণ কর্মস্পৃহালু ভাববিলাসী সঙ্গীতসাহিত্যরসলিপ্সু ও অধ্যাত্মনিষ্ঠ। দুই স্তরের দেবতা যখন এক হইয়া আসিতেছে তখনও সেই দেবচরিত্রে নবীন-প্রবীণ বিশিষ্ট ভাবধারা দুইটি পাশাপাশি বহিয়া গিয়াছে। শিব যখন শাস্ত্রপন্থী নবীনের দেবতা তখন তিনি যোগিশ্রেষ্ঠ সতীপতি উমাধব, আর যখন তিনি ভাববিলাসী প্রবীণের দেবতা তখন তিনি ভোলানাথ, গঞ্জিকাধুস্তূরসেবী, নীচ পরনারীর লোভে হীনকর্মে রত। কৃষ্ণ যখন প্রথমস্তরের দেবতা তখন তিনি পূতনাবিনাশী গোবর্ধনধারী কংসাসুরমর্দন মহাভারতনাটক-সূত্রধার গোবিন্দ, আর যখন দ্বিতীয় স্তরের দেবতা তখন তিনি গোপীকেলিকার দুর্বিনীত গোপাল। চণ্ডী যখন প্রথম স্তরের দেবতা তখন তিনি চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনী মহিষাসুরমর্দিনী, আর যখন দ্বিতীয় স্তরের দেবতা তখন তিনি বনপশুপালিনী, মুখরা শিব-পত্নী। দ্বিতীয় স্তরের কোন কোন দেবতা কখনই প্রথম স্তরে স্থায়ী প্রমোশন পান নাই। যেমন ইন্দ্র, মনসা।

নবীন-প্রবীণের এই সংস্কৃতিগত, ধর্মবিশ্বাসগত, আচারব্যবহারগত ও ভাব-ধারাগত দুস্তর স্তরভেদ দ্রুতগতি বিলুপ্ত হইয়া একটি অখণ্ড বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিবার অন্তরায় ছিল একটি প্রধান বস্তুর অভাব—বাহিরের আঘাত অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের সংঘাত। যেমন দুই পরমাণু হাইড্রোজেন এবং এক পরমাণু অক্সিজেন মিলিত হইয়া জলকণা হইতে গেলে প্রচণ্ড বিদ্যুৎশক্তির মধ্যস্থতা

[১] পূর্ববর্তী সংস্করণে আমি স্তর দুইটিকে আর্য এবং অনার্য বলিয়াছিলাম। তাহা ঠিক হয় নাই। আর্যভাষীদের আগমনের আগে বাঙ্গালা দেশে অনার্য বলিতে কি বা কাহারা ছিল সে সম্বন্ধে অনুমানও নিরর্থক। বাঙ্গালা দেশে যে আর্যভাষীরা প্রথম আসিয়াছিলেন তাঁহারা সম্ভবত প্রাক্‌বৈদিক আর্য, প্রত্যক্‌বৈদিক আর্যদের ঠেলাতেই ইঁহারা কোণঠেসা হইয়াছিলেন।

চাই, তেমনি দুই সংস্কৃতি ও ভাবধারা মিলিয়া সহজে একটি অখণ্ড সংস্কৃতিতে ও ভাবধারায় পরিণত হইতে গেলে বাহ্য সংঘাতের বা আভ্যন্তর শক্তিস্ফুরণের অপেক্ষা রাখে। বাঙ্গালা দেশের দুই স্তরের মিলনের জন্য তুর্কী-অভিযানের মতো এক আকস্মিক সংঘর্ষের আবশ্যক ছিল। ইহাই বাঙ্গালা দেশে তুর্কী-অভিযানের একটি ভালো ফল। আর একটি ভালো ফল ভাষার উন্নতি। সে কথা পরে বলিতেছি।

মুসলমান-শক্তির মধ্যস্থতায় বাঙ্গালী জাতি নিজস্ব রূপটি লইয়া আরও সংহত হইতে চলিল। এই জমাট বাঙ্গালী জাতির প্রতিভূ শ্রীচৈতন্য। ইঁহার চরিত্রে এবং চারিত্র্যে "গৌড়ীয়া" অর্থাৎ বাঙ্গালী মানুষ তাহার দোষগুণ ভালোমন্দ সকল বৈশিষ্ট্য লইয়া ভারতবর্ষের এক কোণে নিজস্ব স্থানটি করিয়া লইয়াছে। জাতি হিসাবে মূর্ত রূপ ধারণ করিবার পক্ষে বাঙ্গালায় বাহ্য সংঘাত যোগাইয়াছিল তুর্কী অভিযান ও মুসলমান শাসন, আর আভ্যন্তর শক্তি বিচ্ছুরিত করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য॥

৪

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দ অবধি যাঁহাদের হাতে শিষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি নির্ভর করিত, তাঁহারা ছিলেন প্রধানভাবে সংস্কৃতশাস্ত্রশাসিত সংস্কৃতিসম্পন্ন। ব্রাহ্মণ্যপন্থী হোন অথবা বৌদ্ধতান্ত্রিকমতাবলম্বী হোন, তখন যাঁহারা গ্রন্থকর্তা ছিলেন তাঁহারা উচ্চ-স্তরের ব্যক্তি—রাজসভাসদ্ এবং/অথবা সমাজপতি। অনেকে আবার ছিলেন কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মসঙ্ঘের আচার্য বা অধিনায়ক। পরপুষ্ট ইঁহারা মুসলমান-অভিযানে অনেকটাই বিপন্ন হইলেন। পারিলে অন্যদেশে পলাইয়া গেলেন, নতুবা হীন হইয়া লুকাইয়া রহিলেন। সুতরাং তুর্কী অভিযানের পরে বেশ কিছুকাল ধরিয়া সাধু সাহিত্যচর্চার পরিবেশ প্রতিকূল ছিল। দেশ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে ও শাসনে বিভক্ত হইল। পূর্বধারাবাহী রাজপুষ্ট ব্রাহ্মণ কবি-পণ্ডিত অনেকে এখন অনাথ, সমৃদ্ধ বৌদ্ধবিহারগুলি বিধ্বস্ত। এই অবস্থায় বিদেশীর শাসন দেশখণ্ডগুলিকে ধীরে ধীরে অধিকার করিয়া চলিয়াছে। এই অধিকার প্রসার উপদ্রবহীন ছিল না বটে কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিতে খুব একটা আঘাত পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সাহিত্যচর্চা তো দূরের কথা উচ্চশিক্ষার ও জ্ঞানচর্চার সুযোগই থাকিবার কথা নয়। চতুর্দশ শতাব্দের শেষের দিকে শমসুদ্দীন ইলিয়াস্-শাহ বাঙ্গালায় স্বাধীন সুলতান-রাজ্য সংস্থাপিত করিলে পর দেশ অনেকটা সুসংস্থিত হইয়াছিল। এই ইলিয়াস-শাহী বংশের রাজ্যকাল

হইতেই এদেশে জ্ঞানচর্চার ও সাহিত্য-অনুশীলনের পুনরারম্ভ। এই অনুশীলনের সুস্পষ্ট ফল পঞ্চদশ শতাব্দের আগে ফলে নাই। রাজাদের যতটা না হোক রাজানুগৃহীত ধনী ব্যক্তিদের চেষ্টাতেই সাহিত্যের খোলা পথ জাগিয়া উঠিয়াছিল ॥

৫

মুসলমান শাসনের গোড়ার দিকে সমাজে—এখন হইতে হিন্দু-সমাজ বলা উচিত —ঝাঁকুনির ফলে উঁচুনীচু সমান হইবার সুযোগ মিলিল। মহাযান-উপাস্ত অনেক দেবদেবী ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক উপাসনার মধ্যে স্থান পাইল এবং লোপোন্মুখ (তান্ত্রিক) বৌদ্ধ মত ব্রাহ্মণ্য মতের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। শাস্ত্রীয় দেবদেবীর নাম ও প্রকৃতি গ্রামদেবদেবী যথাসম্ভব গ্রহণ করিতে লাগিল। গৃহস্থনারীর ব্রত-উপবাসের ঠাকুর—অন্যত্র অপদেবতা বা উপদেবতা—শাস্ত্রীয় দেবতার মর্যাদান্বেষী হইল। পাষাণ ধাতব অথবা পট প্রতিমায় দেবপূজা প্রথমে বৌদ্ধ তান্ত্রিকমতে শুরু হইয়াছিল, এবং গুপ্তদের সময় হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্মেও চলিত হইয়াছিল। সেন-রাজাদের আমলে বিষ্ণু ও শিবের অস্ত্রীক ও সস্ত্রীক মূর্তি এবং মহিষমর্দিনী বা রাজেশ্বরী চণ্ডী-মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। পাথরের মূর্তি গড়া এদেশে সহজসাধ্য নয় বলিয়া বিষ্ণুর পূজা শলাগ্রাম শিলায় আর শিবের পূজা লিঙ্গমূর্তিতেই চলিতে থাকিল। চণ্ডীপূজা শারদোৎসবে পরিণত হইল। গ্রামদেব ধর্মঠাকুর রূপে এবং গ্রামদেবী মনসা বা বাশুলী রূপে গ্রামের ষোল-আনার ভয়ভক্তির অধিকারী হইয়া রহিলেন। ব্রত রূপে এবং স্থানীয় উৎসব রূপেও মনসার পূজা প্রসারলাভ করিল। বাঙ্গালা দেশে তুর্কী-আক্রমণের আগেই আক্রমণকারী যোদ্ধশক্তি কল্কি-অবতাররূপে গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং অদৃষ্টবাদীর দেশে মুসলমান-শাসনকে দৈববিধান বলিয়া মানিয়া লইতে সঙ্কোচ ও বিলম্ব হয় নাই। ধর্মপূজাবিধানের আলোচনা প্রসঙ্গে উদাহরণ দিব। এই মনোভাব ইংরেজ-অধিকারের গোড়ার দিকেও জাগ্রত ছিল ॥

৬

খ্রীষ্টীয় ১২০০ হইতে ১৪৫০ সালের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন নিদর্শন তো নাই-ই বাঙ্গালা ভাষারও কোন হদিশ পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ পাদ শতাব্দ হইতে বাঙ্গালায় লেখা বই ও গান যাহা পাওয়া যাইতেছে[১] তাহা

[১] পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ পাদে লেখা অন্তত দুইটি বাঙ্গালা গ্রন্থ মিলিয়াছে। কিন্তু এ দুই গ্রন্থের পুথি অনেক পরবর্তী কালের। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দ হইতে পরিচিত বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ বলিলে দোষ হয় না।

হইতে অনুমান হয় যে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়াতেই বাঙ্গালা ভাষা ষোড়শ শতাব্দের পরিচিত রূপ ধারণ করিয়াছিল। ১২০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তী বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে ষোড়শ শতাব্দের বাঙ্গালা ভাষার পার্থক্য খুব বেশি। এই পার্থক্যের প্রধান কারণ দুইটি। একটি হইল কালগত। কালে কালে ভাষার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আড়াই শ বছরে ভাষা অনেকখানি পরিবর্তিত হইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় আর্য ভাষার তুলনায় এই আড়াই শ বছরে বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্তন অত্যন্ত বেশি হইয়াছে। এমন কি উচ্চারণের ঢঙও বদলাইয়াছে। ইহার জন্য দায়ী দ্বিতীয় কারণটি। সে হইল বাঙ্গালা ভাষার উপর ফারসী ভাষার ঘনিষ্ঠ ও ক্রমবর্ধমান প্রভাব। ১৩০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এদেশে মুসলমান শাসন ব্যাপ্ত ও পরিস্থিত হয়। মুসলমান শাসনকর্তারা অনেকেই তুর্কী ছিলেন। তুর্কী হোন বা না হোন তাঁহাদের ব্যবহারের ভাষা ছিল ফারসী। শাসনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া এখন সংস্কৃতের স্থান ধীরে ধীরে ফারসী গ্রহণ করিতে লাগিল। রাজকর্মচারী হিন্দুরা ফারসী ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাহার অপেক্ষাও বড় কথা—দেশী মুসলমানেরা যাঁহারা গোড়ার দিকে সংখ্যায় খুব বেশি ছিলেন না বটে, কিন্তু প্রভাবে অগ্রগণ্য ছিলেন এবং দেশী-বিদেশী উভয় সম্প্রদায়েই যাঁহাদের প্রাধান্য সমধিক ছিল—তাঁহারা ফারসী এবং বাঙ্গালা দুইই ব্যবহার করিতেন। প্রথম দিকে ফারসী বেশি, শেষের দিকে বাঙ্গালা বেশি। দ্বিভাষী দেশী মুসলমান এবং হিন্দু রাজকর্মচারীরা এই দুই দলের ব্যবহারেই বাঙ্গালা ভাষা এই আড়াই শ বছরের শাণে চড়িয়া পঞ্চদশ শতাব্দের মাঝামাঝি—সম্ভবত তাহার বেশ আগেই—আমাদের পরিচিত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। (অনেকটা এমনি করিয়াই উনবিংশ শতাব্দে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেও আধুনিকতম বাঙ্গালা ভাষা রূপ ধারণ করিয়াছে।) এই রূপকে এখন বলা হয় পুরানো বাঙ্গালা অথবা মধ্যকালীন বাঙ্গালা। এ ভাষার শব্দভাণ্ডারে ফারসী শব্দের সংখ্যা গণতিতে খুব বেশি নয় বটে কিন্তু ব্যবহারের পক্ষে ও মর্যাদার হিসাবে বিশেষ মূল্যবান্। শুধু তাই নয় ফারসীর দুই চারটি ইডিয়মও ইতিমধ্যে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে।

ফারসীর প্রভাব তখন গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে নাই এই কারণে যে লেখকেরা সকলেই হিন্দু, সংস্কৃতপাঠী এবং প্রাচীন সাহিত্যের পাঠক। তাই ভাষায় যেমন বিষয়েও তেমনি বিচ্যুতি ঘটিতে পারে নাই। ষোড়শ শতাব্দ হইতে, চৈতন্যের ধর্মের প্রভাবে, সংস্কৃতের প্রভাব পড়িয়াছে এবং বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রবেশ বাড়িয়াছে। কিন্তু ফারসী শব্দ পরিত্যক্ত হয় নাই।

সপ্তদশ শতাব্দের গোড়া হইতে নূতন করিয়া ফারসীর প্রভাব পড়িয়াছিল। এ প্রভাব ক্রমশ গুরুতর হইয়া বাঙ্গালা ভাষাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এদেশে ইংরেজ অধিকার না হইলে আমরা উনবিংশ শতাব্দে বাঙ্গালা ভাষাকে উর্দু ভাষার ভগিনী রূপে পাইতাম॥

৭

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দে রচিত হইয়াছিল বলিয়া নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে, দুই-চারিটি ছড়া এবং এক-আধটি গান ছাড়া এমন কিছু কালের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। বড়গোছের কোন রচনা এ সময়ে লেখা হইয়া থাকিলে তাহার স্মৃতিরেশও বোধ করি থাকিয়া যাইত। তবে পরবর্তী কালের সাহিত্যের গঠন ও প্রকৃতি বিচার করিয়া বলিতে পারি যে এই সময়ে মনসার কাহিনী, ধর্মের কাহিনী, চণ্ডীর কাহিনী ইত্যাদি দেশীয় বস্তু এবং রামায়ণ-কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা-কাহিনী ইত্যাদি পৌরাণিক বস্তু ছোটবড় গানে অথবা পাঁচালীতে বাদ্য ও নৃত্যের যোগে পরিবেশিত হইত গ্রামোৎসবে অথবা দেবপূজা উপলক্ষ্যে দেবমন্দিরে। অধ্যাত্মভাবনা ও ধর্ম-অনুষ্ঠানের সহিত সম্পৃক্ত নয়, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে লোকায়তিক (secular), এমন ছড়া ও গানও যে এই সময়ে চলতি ছিল সে অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত রচনায় প্রাপ্ত এমন কিছু গল্প-কাহিনীও যে চলিয়া আসিয়াছিল তাহারও আভাস পাই। পাহাড়পুরের মন্দির-ভিত্তিতে পঞ্চতন্ত্রের একাধিক গল্পের চিত্র আছে।[১] নবম-দশম-একাদশ শতাব্দে বাঙ্গালা দেশে এইসব গল্প কাহিনীর জনপ্রিয়তা ইহাতে সূচিত।

রামায়ণ-মহাভারত কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা গান রাজসভায় ও সামন্তসভায় (অর্থাৎ সংস্কৃতাবলম্বী শিষ্ট সাহিত্যে) প্রধানভাবে অনুশীলিত ছিল। সমাজের নিম্নস্তরে অর্থাৎ দেশ-ভাষাবলম্বী "লোক"-সাহিত্যে, কৃষ্ণের ব্রজলীলা এবং মনসা চণ্ডী ও ধর্ম দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনী বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। এই অনুমানের সমর্থন মিলে ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে। যুধিষ্ঠির অর্জুন ভীম দ্রৌপদী দশরথ রাম সীতা—ইত্যাদি মহাভারত-রামায়ণ কাহিনীর নামগুলি তৎসম (সংস্কৃত) রূপেই প্রচলিত। কিন্তু কানু বা কানাই (কৃষ্ণ), রাই (রাধিকা),

[১] চিত্র পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

আয়ান (অভিমন্যু), গোই বা গুই (গোপী, গোপিকা),[১] ফুল্লরা, খুল্লনা (ক্ষুদ্র),[২] লহনা (লোভনা), বেহুলা (বিধুরা) ইত্যাদি নামগুলি তদ্ভব রূপেই মিলিতেছে। ইহা হইতে এই অনুমান অপরিহার্য যে শেষের সব কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ও প্রাচীন বাঙ্গালার মধ্য দিয়াই আসিয়াছে। কিন্তু তৎসম নামগুলি সরাসরি সংস্কৃত হইতে গৃহীত॥

৮

লক্ষ্মণসেনের সভায় এক আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন মুসলমান ফকিরের ("সেখ") আগমন হইয়াছিল। অমাত্যবর্গের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও রাজা ফকিরকে খাতির করিতে থাকেন, তাঁহাকে গৌড়ে মসজিদ নির্মাণ করিতে অনুমতি দেন এবং প্রচুর ভূসম্পত্তি অর্পণ করেন।—এই মর্মে, নানারূপ গল্পকথা সংযোগ করিয়া, একখানি বই লেখা হইয়াছিল ষোড়শ শতাব্দের শেষার্ধে অথবা তৎপরে। বই-খানির নাম 'সেকশুভোদয়া'।[৩] ভাষা ভাঙ্গা-সংস্কৃত, অর্থাৎ ব্যাকরণ অগ্রাহ্য করিয়া বাঙ্গালার ছাঁদে সংস্কৃত লিখিলে যেমন হয় তেমনি। মনে হয় বইটি একটি পূর্বতন গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেকশুভোদয়ায় কয়েকটি বাঙ্গালা ছড়া ও গান আছে। সেগুলির ভাবে ও ভাষায় পঞ্চদশ শতাব্দের আগেকার রেশ অনুভূত হয়। কিছু উদাহরণ দিই।

সেখের কথায় রাজা একদিন সৈন্যসামন্ত লইয়া গঙ্গাতীরে গিয়াছিলেন, নিজের ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দিয়া প্রজাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ চাপা দিবার উদ্দেশ্যে। সেই সময়ে এক শুঁড়িবউ ("শৌণ্ডিকবধূ") কলসী লইয়া জল আনিতে যাইতে ছিল। তাহার কানে ছিল সেকালের রীতি অনুযায়ী তালপাতার চাকা-মাকড়ি। রাজা তাহার এক কানের মাকড়ির মধ্য দিয়া শর চালাইয়া দিলেন, মেয়েটি জানিতেও পারিল না। সকলে বলিয়া উঠিল, ধন্য রাজা। অমনি ভাটেরা রাজার প্রশস্তি গাহিয়া উঠিল এই "আর্যা" পড়িয়া

শ্রীমল্লক্ষ্মণ-সেন মহাবীর।
কর্ণরন্ধ্রে ভেজে তীর॥

শুনিয়া পদাতিক সৈন্যের মধ্যে একজন, নাম মদন, আগাইয়া আসিয়া আর একটি আর্যা বলিল।

---

[১] গোয়ীচন্দ্র, গুইরাম ইত্যাদি নামের আদ্য অংশে এই শব্দ রহিয়া গিয়াছে।

[২] প্রাকৃত-পৈঙ্গলের একটি দোহায় (১-৭) "খুল্লনা" শব্দ পাই ছোট মেয়ে অর্থে।

[৩] শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত (হৃষীকেশ সিরিজ সংখ্যা ১১), ১৯২৭। নূতন সংস্করণ এসিয়াটিক সোসাইটি ১৯৬৩

শ্রীলক্ষ্মণ-সেন রাজা কী বড় বীর।
অভ্যাসের কারণে ভেজে তীর।

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুই, কাহার কাছে থাকিস? মদন বলিল, আমি মন্ত্রী উমাপতি ধরের পাইক। রাজা উমাপতি ধরকে ডাকিয়া পাঠাইলে মন্ত্রী বলিল, এখন আমার যাইবার সময় নাই। রাজা হুকুম দিলেন, মন্ত্রীকে কোমরে বাঁধিয়া লইয়া আয়। মন্ত্রী আসিলে রাজা তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া অনুচরদের বলিলেন, বাহিরে লইয়া গিয়া ইহার মাথা কাটিয়া ফেল। মন্ত্রী ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে সেখ বলিলেন

হে মন্ত্রী কেন।

মন্ত্রী ছড়া পূরণ করিয়া উত্তর দিল

যবে যেন।

সেখ আর্যা বলিলেন

রাম রাজা বর্ত্ত ইন্দ্র বর্ষে জল।
যে বৃক্ষ রোয়ে তার অবশ্য ধরে ফল।

মন্ত্রীও আর্যায় জবাব দিল

যে বৃক্ষ রোয়ে তার অবশ্য করিয়ে আশ।
যদি বা শীঘ্র ফলে তবে তু হয় ছয় মাস।[১]

একটি গানে ("ভাটিয়ালী রাগেণ গীয়তে") বৌদ্ধতান্ত্রিক বজ্রগীতির পরিণতি লক্ষ্য করি। দুই ডাকিনী সেখের উপর নজর দেয়। তাহারা ভাদ্র মাসের "ভাজো" (বা ভাদো) ব্রত উপলক্ষ্যে গ্রামের মেয়েদের দলে মিশিয়া গঙ্গায় মালসা শরা ভাসাইয়া যখন গান গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া আসিতেছিল তখন সেখের মন্ত্রশক্তিতে তাহাদের পথ রুদ্ধ হইল। তাহারা দেখিল, তাহাদের সামনে লোহার প্রাচীর আকাশ ছুঁইয়া। তাহারা তখন গানের ছলে সেখকে অনুনয় করিতে লাগিল। গানটিকে ভাদু-গানের সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায়।[২]

হঙ যুবতী পতিয়ে হীন
গঙ্গা সিনাইবাক জাইয়ে দিন।
দৈবনিয়োজিত হৈল আকাজ
বায়ু না ভাঙ্গ ছোট গাছ ॥১॥

---

[১] দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

[২] উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ছাড়ি দেহ কাজু মুঞি জাঙ ঘর
সাগর মধ্যে লোহার গড় । ধ্রু ।
হাত যোড় করিয়া মাঙ্গো দান
বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান।
বড় সে বিপাক আছে উপায়
সাজিয়া গেইলে বাঘে না খায় ॥২॥
পুনঃ পুনঃ পায়ে পড়িয়া মাঙ্গো দান
মধ্যে বহে সুরেশ্বরী গাঙ্গ।
শ্রীখণ্ড চন্দন অঙ্গে শীতল
রাত্রি হৈলে বহে অনল ॥৩॥···

নাম ও ক্রিয়া পদে প্রাচীনত্ব লক্ষণীয় ॥[১]

৯

বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সমসাময়িক অপর নবীন আর্য ভাষার সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির তুলনা করিলে তবে আমাদের সাহিত্যের বিশেষত্বের বিশেষ এই একটা দিক নজরে পড়িবে।

সমগ্র উত্তরাপথে শিষ্ট জীবনের ও সাহিত্যের একটি মাত্র আদর্শ ছিল। সে সংস্কৃত শাস্ত্রের ও সাহিত্যের আদর্শ। অ-শিষ্ট অর্থাৎ লৌকিক সাহিত্যের যে আদর্শ ছিল তাহার সঙ্গে প্রভেদ ছিল বটে কিন্তু সে প্রভেদ গুরুতর কিছু নয়। লৌকিক সাহিত্যের ভাষা অবহট্‌ঠও সমগ্র উত্তরাপথে—গুজরাট হইতে আসাম পর্যন্ত—প্রায়ই একই রূপে অনুশীলিত ছিল। সুতরাং প্রাদেশিক (আর্য) ভাষাগুলি যেমন সেসব ভাষার সাহিত্যেও তেমনি মোটামুটি ভাবে একই দিকে সমান্তরাল ধারায় চলিয়াছিল। তবে প্রাদেশিক পরিবেশ সর্বত্র ঠিক একই রকম ছিল না, লোকায়তিক ঐতিহ্যেও কমবেশি বিভিন্নতা ছিল, আশেপাশের ভাষা-সম্পর্কও পৃথক্ ছিল এবং সব অঞ্চলে প্রত্নমানবের অন্তর্ভূমিও (ethnic substratum) একরকম ছিল না। এই সব কারণে এবং স্থানীয় ভাষার শক্তি ও প্রবণতা অনুসারে প্রাদেশিক সাহিত্য-রীতি ক্রমশ পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সে দূরত্ব এতটা বেশি নয় যে তাহাদের কৌলিক পরিচয় মিলাইয়া গিয়াছে।

গোড়ায় লৌকিক সাহিত্যের মোটামুটি তিনটি ধারা ছিল। প্রথম ধারা গান, দ্বিতীয় ধারা ছড়া, তৃতীয় ধারা গেয় অথবা বাচনীয় আখ্যান। গান ছোট

[১] যেমন, "হঙ" (আমি), "পতিয়ে" (পতিতে), "কাজু" (কার্যহেতু), "মুঞি জাঙ" (আমি যাই), "সিনাইবাক" (স্নান করিবার জন্য), "গেইলে" (গেলে)।

বড় দুই রকমেরই ছিল এবং তাহা মেয়েলি ব্রতে, গ্রাম্য ও গার্হস্থ্য উৎসবে অথবা দেবপূজায়ও গাওয়া হইত। গোড়ার দিকে মেয়েলি ব্রতের গানে সাহিত্যরসের সঞ্চার ছিল না। গ্রাম্য উৎসব হইত নানা উপলক্ষ্যে—ফসল বোনার ও তোলার সময়ে, ঋতু-উৎসবে, গ্রামদেবতার বাৎসরিক পূজা-অনুষ্ঠানে। গার্হস্থ্য উৎসব হইত পুত্রকন্যার জন্মে ও বিবাহে, শান্তিস্বস্ত্যয়নে, শ্রাদ্ধে, গৃহদেবতার নৈমিত্তিক পূজায়। দেবপূজার গান সাধারণ উৎসবের গানের মতোই তবে তাহাতে ভক্তিরসের শাঁস এবং শিক্ষা-উপদেশের বীজ অবশ্যই থাকিত।

মঙ্গলকার্য উপলক্ষ্য বলিয়া গার্হস্থ্য উৎসব "মঙ্গল" নাম পাইয়াছিল। এ নাম অশোকের সময়েও অজানা ছিল না। আরও একটি সর্বজনীন গ্রাম্য উৎসবের উল্লেখ আছে অশোকের ধৌলি ও জৌগড় অনুশাসন দুইটিতে। সে উৎসব এখনও অজ্ঞাত নয় পশ্চিমবঙ্গে—ভাদু ও তুসু (পৌষলা) পরব রূপে। অশোক বলিয়াছেন, 'আমার এই অনুশাসন চারি মাস ধরিয়া তিষ্য নক্ষত্রে সকলে অবশ্য শুনিবে, উপলক্ষ্য হইলে অন্য সময়ে একজনেও শুনিতে পারে।' তিষ্য নক্ষত্রে শোনার মানে, এই নক্ষত্রে নিশ্চয়ই কোন সামাজিক বা সর্বজনীন গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান হইত। তিষ্য নক্ষত্রের নামান্তর পুষ্যা। পৌষ মাস ফসল তোলার কাল। ভাদ্র মাস কার্তিক মাস ও অগ্রহায়ণ মাসও তাই। ভাদ্র মাসের উৎসব ইন্দ্রপূজার সঙ্গে অথবা বাস্তুপূজার সঙ্গে মিলিয়া গিয়া পশ্চিম বর্ধমান অঞ্চলে ভাদু পরব হইয়াছে।[১] কোন কোন অঞ্চলে আবার ইন্দ্রপূজা অগ্রহায়ণ মাসের শস্য-উৎসবের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। এ উৎসব এখন পশ্চিম বাঙ্গালায় অবিবাহিত বালিকাদের ইতু-পূজায় পরিণত। পৌষ মাসের উৎসব মানভূমে তুসু রূপে ভাদু পরবের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে ইহা "পোষলা", "সাঁজো", "সোদো ভাসানো", ইত্যাদি নামে উল্লিখিত

[১] "ইয়ং চ লিপি অনুচাতুংমাসং তিসেন নখতেন সোতবিয়া কামং চ খনসি খনসি অংতলা পি তিসেন একেন পি সোতবিয়া।" (দ্বিতীয় বিশেষ অনুশাসন, ধৌলি।) অর্থাৎ—এই লিপি চাতুর্মাস্য মধ্যে তিষ্য নক্ষত্রে শুনিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে তিষ্য নক্ষত্র ছাড়াও শুনিবে।

[১] "ইয়ং চ লিপী অনুচাতুংমাসং সোতবিয়া তিসেন অংতলা পি চ সোতবিয়া। খনে সতং একেন পি সোতবিয়া।" (ঐ জৌগড়।) অর্থাৎ—এই লিপি চাতুর্মাস্য মধ্যে তিষ্য নক্ষত্রে শুনিতে হইবে। তিষ্য ছাড়াও শুনিবে। বিশেষ উপলক্ষ্যে একজনও শুনিতে পারে।

পূর্ব উল্লিখিত সেথশুভোদয়ার গয়ের "ভাজো" দ্রষ্টব্য।

হইয়া ইতুর মতো অবিবাহিত মেয়েদের ব্রতে কিংবা ছেলেমেয়েদের পৌষলায় (বনভোজনে) আসিয়া ঠেকিয়াছে।

বসন্ত-উৎসবের নাম ছিল "ফল্গু" (বা ফল্গু-উৎসব) অর্থাৎ রঙীন ধূলা খেলা। ইহা হইতে এই উৎসবের বিশিষ্ট নৃত্যগীত-রীতির এবং তথা হইতে সেই গানের নাম হয় অবহট্‌ঠে "ফগ্‌গু", প্রাচীন গুজরাটীতে "ফাগু"। তেমনি রাস-নৃত্যগীত হইতে অবহট্‌ঠে "রাসউ", প্রাচীন গুজরাটী-রাজস্থানী-হিন্দীতে "রাসো, রাসা, রাস"। মেয়েলী নাচগানের নাম "চর্চরী"[১] হইতে অবহট্‌ঠে ও প্রাচীন গুজরাটীতে "চচ্চরী, চাচারী"। বাঙ্গালায় "চাঁচরি" এখন লুপ্ত গ্রাম্য-উৎসবের নামেই রহিয়া গিয়াছে। "জম্ভলিকা"[১] নাচ হইতে আসিয়াছে রাজস্থানী "ঝমাল" গান। বাঙ্গালায় ইহা একদিকে "ধামালী"তে অপরদিকে "ঝুমুর"এ পরিণত। পুতুল-নাচের সঙ্গে নৃত্যগীত-অভিনয় হইলে বলিত "পাঞ্চালিকা"। পরে নামটি বাঙ্গালায় এবং প্রাচীন গুজরাটী-রাজস্থানীতে পুরানো ধরণের আখ্যায়িকা অর্থে প্রযুক্ত হইতে থাকে।

বিশুদ্ধ সাহিত্যিক (যেমন জয়দেবের ধরণে) গীতিকবিতা সাধারণত সংস্কৃত (অথবা প্রাকৃত) নাটকের মধ্যে কিংবা অবহট্‌ঠ ও দেশি আখ্যায়িকার ভিতরে গ্রথিত হইত। ইহার সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন রহিয়াছে চতুর্দশ শতাব্দের প্রথম পাদে রচিত 'পারিজাতহরণ' নাটকে। নাটকটি সংস্কৃতে লেখা। তাহার মধ্যে একুশটি গান আছে প্রাচীন মৈথিলী ভাষায়।[২] কবি উমাপতি উপাধ্যায় মিথিলার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা হরিহরসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। মৈথিলী ও বাঙ্গালা ভাষায়—বিশেষ করিয়া ব্রজবুলিতে—পদাবলী রচনার প্রথম নির্দেশ এইখানেই পাইতেছি।

উমাপতির পদাবলীর একটি উদাহরণ দিই। "নট-রাগে গীতম্"। দূতী আসিয়া কৃষ্ণের কাছে নায়িকার বিরহদশার ছলে রূপ বর্ণনা করিতেছে।

---

[১] বিক্রমোর্বশীর চতুর্থ অঙ্কে অপভ্রংশ গানের সঙ্গে যে নাচের (অথবা অঙ্গভঙ্গির ?) নির্দেশ আছে, তাহার মধ্যে "চর্চরী" ও "জম্ভলিকা" পাইতেছি। এই নাচ ও অঙ্গভঙ্গি পুতুলের। সেকালের অভিনয়ে মানুষ অভিনেতার সঙ্গে পুতুলও রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইত। 'নট নাট্য নাটক' (১৯৬৬) পৃ ৪৮-৫০ দ্রষ্টব্য।

[২] জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়র্সন সম্পাদিত (*Journal of the Bihar and Orissa Research Societ*)।

কি কহব মাধব তনিক বিশেষে
অপনহু তনু ধনি পাব কলেশে।
অপনুক আনন আরসি হেরি
চানক ভরম কোপ কত বেরি।
ভরমহু নিঅ কর উর-পর আনী
পরশ তরশ সরসীরুহ জানী।
চিকুরনিকর নিঅ নয়ন নিহারী
জলধর-ধার জানী হিয় হারী।
আপন বচন পিকরব অনুমানে
হরি হরি তেহ পরিতেজয় পরাণে।
মাধব অবহু করিঅ সমধানে,
সুপুরুখ নিঠুর ন রহয় নিদানে।
সুমতি উমাপতি ভণ পরমাণে
মাহেশরিদেই হিন্দুপতি জানে॥

' "মাধব, তাহার অবস্থা কি বলিব। ধনী আপনার দেহ লইয়া ক্লেশ পাইতেছে। আরসিতে আপন মুখ দেখিয়া চাঁদ মনে করিয়া কতবার রাগ করে। ভ্রমবশে নিজ হাত বুকে তুলিয়া পদ্ম মনে করিয়া সে স্পর্শে ত্রাস পায়। নিজের কেশপাশ চোখে পড়িলে মেঘজাল মনে করিয়া (তাহার) বুক কাঁপিয়া উঠে। আপন বচন কুহুধ্বনি বলিয়া অনুমান করে, (আর) হরি হরি, তখনি যেন প্রাণ বাহির হইতে চায়!—মাধব, এখনই সমাধান করিতে হইবে। সুপুরুষ কখনো শেষ সময় পর্যন্ত নিষ্ঠুর রহিতে পারে না।"

সুমন্ত্রী উমাপতি যথার্থ বলিতেছেন—মাহেশ্বরী দেবীর পতি হিন্দুপতি, (ইহার মর্ম) জানেন।'

সেকালের সাহিত্যরসের আধার বলিয়া গদ্যের কোন মর্যাদা ছিল না, এবং গুজরাটী-রাজস্থানী ছাড়া অন্যত্র কয়েক শতাব্দ ধরিয়া তেমন গদ্যনিদর্শন পাই না বলিলে অন্যায় হয় না। গদ্যের ব্যবহার ছিল চিঠিপত্রে ও দলিলে-ফরমানেই। জৈন সাধুরা উপদেশ দেওয়ার কাজে গদ্যকে লাগাইয়াছিলেন তাই দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দ হইতে প্রাচীন গুজরাটীতে গদ্য রচনা যথেষ্ট পাইতেছি।[১] তাহার মধ্যে ছোট বড় আখ্যানও আছে। অবশ্য গোড়াকার রচনাগুলি অবহট্‌ঠ-সমাকীর্ণ। প্রাচীন গুজরাটী গদ্যরচনার নমুনা হিসাবে একটি ক্ষুদ্র গল্প 'তামলী-তাপস-কথা' উদ্ধৃত করিতেছি। ঘটনা বাঙ্গালা দেশের।

তাম্রলিপ্তী নগরীইঁ তামলি শ্রেষ্ঠি বৈরাগ্যইঁ তাপসী দীক্ষা লিইঁ। নদীনইঁ তটি সাটি বর্ষ-সহস্র তপ করি পারণইঁ ভিক্ষা চিহুঁ ভাগি করইঁ। এক ভাগ মৎস্যাদিক জলচররহইঁ দিইঁ। বীজ ভাগ গোগ্রাস—স্থলচররহইঁ দিইঁ। ত্রীজো ভাগ কাকাদিক খেচররহইঁ দিইঁ। চউথুঁ ভাগ ২১ বার পাণীইঁ ধোঈ পারণউ করইঁ। এবড়ই তপনইঁ ক্লেশিইঁ অল্পকষায় ভণী অনইঁ অনুকম্পা পর ভণী ঈশানেন্দ্র থিও। সম্যক্ত্ব লাধুঁ। ছ জীব দয়া সহিত জউ

[১] শ্রীজিনবিজয়জী সঙ্কলিত 'প্রাচীন গুজরাতী গদ্যসন্দর্ভ' (১৯২৯) দ্রষ্টব্য।

> এবড়উ তপ করত মোক্ষি জ জাওত, জও অল্পকষায় ন হন্ত তও এটলুইঁ ন লহত দুর্গতি জ প্রানত।

'তাম্রলিপ্তি নগরীতে তামলি সওদাগর বৈরাগ্যহেতু তপস্যার দীক্ষা লইলেন। নদীর তীরে ষাট হাজার বছর তপস্যা করিয়া পারণার ভিক্ষা চারিভাগ করিলেন। এক ভাগ মৎস্যাদি জলচরদের দিলেন। দ্বিতীয় ভাগ—গোগ্রাস—স্থলচরদের দিলেন। তৃতীয় ভাগ কাক প্রভৃতি খেচরদের দিলেন। চতুর্থ ভাগ একুশবার জলে ধুইয়া পারণা করিলেন। এতটা তপস্যার ক্লেশ হেতু অল্প কষায়[১] বলিয়া ইঁহার প্রতি ঈশানেন্দ্র অনুকম্পাপরবশ হইলেন। সম্যক্ত্ব পাওয়াইলেন। ছয় জীবের প্রতি দয়াযুক্ত হইয়া যদি এমন তপ করিত তবে মোক্ষই লাভ করিত, যদি অল্পকষায় না হইত তবে ইহাও পাইত না, দুর্গতিই পাইত।'

উড়িয়ায় এবং প্রাচীন মৈথিলীতে গদ্য লিখিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সে ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে, সুতরাং সাহিত্যে তাহা ধারাবাহিক ও ফলবান হইতে পারে নাই। প্রাচীন গুজরাটী গদ্য সম্বন্ধেও কতকটা এই কথা খাটে।

প্রাচীন মৈথিলীর গদ্যগ্রন্থটি পারিজাতহরণের সমসাময়িক। এটিও হরিহরসিংহের এক সভাসদের লেখা। নাম জ্যোতিরীশ্বর, উপাধি কবিশেখরাচার্য। ইহার লেখা সংস্কৃত গ্রন্থও আছে। তাহার মধ্যে একটি রচনা প্রহসন। মৈথিলীতে লেখা গদ্যগ্রন্থটির নাম 'বর্ণ(ন)রত্নাকর'।[২] সেকালের কবি-কথকদের ব্যবহারে লাগে এমন বাছাই করা শব্দ প্রতিশব্দ ও বাঁধা-ধরা বর্ণনা পরিচ্ছেদ বিভাগ করিয়া সাজানো কোষের মতো। ভাষা গদ্য বটে তবে অপরিণতরূপ, যেন হুঁচোট খাওয়া, যেমন সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দের বাঙ্গালা বৈষ্ণব কড়চা বইয়ে। অর্থাৎ এ গদ্য সুসম্বদ্ধ বাক্যপরম্পরায় গড়াইয়া চলে নাই।

উদাহরণ দিই, "অথ বর্ষারাত্রিবর্ণনা"।

> কাজরক ভীতি তৈলে সিচলি অইসনি রাত্রি। পছেবাঁকা বেগে কাজরক মোট ফুজল অইসন মেঘ। নিবিল মাংসল অন্ধকার দেখু। মেঘপুরিত আকাশ ভএ গেল অছ। বিদ্যুল্লতাক তরঙ্গতেঁ পথদিশজ্ঞান হোইতেঁ অছ। লোচনক ব্যাপার নিষ্ফল হোইতেঁ ছ। ঝিকরুযং রাত্রি পাতক শব্দে তরুজ্ঞান দর্দ্দুরক শব্দে জলাশয়জ্ঞান চটকক শব্দে বনজ্ঞান ঝিকরুআক শব্দে পৃথ্বীজ্ঞান মেঘক শব্দে আকাশজ্ঞান মনুষ্যক শব্দে গৃহজ্ঞান অগ্নিক জ্যোতেঁ পুরজ্ঞান চরণক শব্দে পথজ্ঞান বচনক শব্দে পরাপরজ্ঞান বিজ্ঞজনহু দিগভ্রম জং রাত্রি।

'কাজলের দেওয়াল তেলেভেজা—এমন রাত্রি। পশ্চিমা হাওয়ার বেগে মিশির বস্তা খুলিয়াছে—এমন মেঘ। নিবিড় মাংসল (অর্থাৎ জমাট) অন্ধকার দেখা গেল। আকাশ মেঘময় হইয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎ-লতার চমকানিতে পথ ও দিকের জ্ঞান হইতেছে। চোখের ব্যবহার নিষ্ফল

---

১ "কষায়" মানে কর্মফলপ্রসূত মনের বিকার, মোক্ষের প্রতিবন্ধক। "অল্প" এখানে "ক্ষীণ" অর্থে প্রযুক্ত।

২ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ববুয়া মিশ্র সম্পাদিত, দি এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত (১৯৪০)।

হইতেছে। যে রাত্রিতে পাতার শব্দে গাছ বলিয়া জানা যায়, বেঙের ডাকে জলাশয় বলিয়া জানা যায়, চিড়িয়ার ডাকে বন বলিয়া জানা যায়, ঝিঁঝির (অথবা খোলামকুচির) শব্দে ডাঙ্গা বলিয়া জানা যায়, মেঘের ডাকে আকাশ বলিয়া জানা যায়, মানুষের কণ্ঠস্বরে ঘর বলিয়া জানা যায়, আগুনের আলোয় গ্রাম বলিয়া জানা যায়, বচনের ধ্বনিতে ব্যক্তি বলিয়া চেনা যায়,—বিজ্ঞজনেরও দিগ্‌ভ্রম হয় যে রাত্রিতে।

জ্যোতিরীশ্বর যে বৃদ্ধা কুট্টনীর বর্ণনা দিয়াছেন তাহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

বর্ষ সএ তীনি ভিতর বয়স। পাণ্ডুর ভঞ্ৰু। শঙ্খাবদাত কেশ। সঙ্কুলিত ত্বচ। উন্নতি শিরা। নির্মাংস কায়। ভাঙ্গল কপোল। ঝলল দাঁত। বলে জীনল বএস। বএসে জীনল বল। বোল বোলইতেঁ জীহহি ওঠহি লগা রাগী। হস্তক সানে মেলাপক রোআব। মার্কণ্ডেয় সহোদর জেঠি বহিনি অইসনি। লোভক বেটী অইসনি। বুদ্ধিক মাঙুসি অইসনি কুটিলমতি। নারদক সহোদর অইসনি ঘটক। বিষ্ণুমায়া অইসনি সংঘটক। সতীহক সতাভাঁগ কুলবধূহ কুটিলাকর কুটনী দেখু॥

'বছর শ তিনের মধ্যে বয়স। শাদা ভুরু। শাঁখের মত ধবধবে চুল। কোঁচকানো চামড়া। ফুলিয়া উঠা শিরা। মাংসহীন দেহ। ভাঙ্গা গাল। নড়বড়ে দাঁত। বলে জিনিয়াছে বয়স। বয়সে জিনিয়াছে বল। কথা বলিতে জিভে ঠোঁটে লাগালাগি। হাতের ইশারায় মেলায় কাঁদায়। মার্কণ্ডেয়ের সহোদর জ্যেষ্ঠ ভগিনী যেন। লোভের বেটি যেন। বুদ্ধির মাসি—এমনি কুটিলমতি। নারদের সাক্ষাৎ ভগিনী—এমনি ঘটক। বিষ্ণুমায়া—এমনি অসাধ্য সাধক। সতীদেরও সত্যনাশিনী কুলবধূর ভ্রংশকারিণী কুটনী দেখা গেল॥'

কতকটা এমনি কুটনীর ছবি পরে বিদ্যাপতির নাটকে[১] এবং বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে[২] মিলিয়াছে।

উড়িষ্যায় রাজাদের শাসনপট্টে গদ্যের প্রক্ষেপ ও ব্যবহার ত্রয়োদশ শতাব্দ (এমন কি তাহারও আগে) হইতে পাওয়া যাইতেছে। মারাঠীতেও এ ব্যাপার দেখা গিয়াছে। চতুর্দশ শতাব্দের মৈথিলী গদ্যের নমুনা দিয়াছি। এখন বাঙ্গালার অপর সহোদরা উড়িয়ার গদ্যের প্রাচীন নিদর্শন দিতেছি ১২৭১ খ্রীস্টাব্দে প্রদত্ত বীরভানুদেবের অনুশাসন হইতে।[৩] সীমাচলে নৃসিংহ-মন্দিরের ছোট নাটুয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে অংশ ভাগ-বাটোয়ারার দলিল এই শিলালিপিটি।

কলিঙ্গ পরীক্ষ পাত্র শ্রীকোটিনাথ পড়াংকর মাজি সমস্ত বেহরণ বিদ্যমানে শ্রীনরসিংহনাথ দেবংকর সানু সংপ্রদায়র নটুবব্রিত্তিকি কল্লা নিন্নয় শিলা-শাসন।

চিত্তন মোখরি উপাজ্জিচ্ছিন্নব্রিত্তি নটুবাগণ সং[শি]ষ্ট হোঈ। অর্জ্জিলা স্থায়ে এ ব্রিত্তি এহারি বড়্‌ ভায়ি মেডু নটুব ভড়ু[৪] ভ[য়ি]ণী কোড্যাসানি সানু ভয়িণি চিগাসানি এ তিনিকি এ নটু্বা ব্রিত্তি তিনি ভাগ। চিত্তন মোখরি অর্জ্জিলা স্থায়ে এহাকু অধিকভাগে সএনে[৫] করি এহাকু দুই ভাগ।...

---

[১] 'বিদ্যাপতিগোষ্ঠী' (১৯৪৭), পৃ ৪২-৪৩ দ্রষ্টব্য।

[২] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আলোচনায় পরে দ্রষ্টব্য।

[৩] *South Indian Inscriptions*, vol. vi

[৪] "বড়" স্থানে ভ্রান্তপাঠ।

[৫] "সএলে" স্থানে ভ্রান্তপাঠ।

'কলিঙ্গ পড়িছা পাত্র শ্রীকোটিনাথ পণ্ডার মধ্যস্থে সমস্ত ব্যবহরণ বিভমানে শ্রীনরসিংহনাথ দেবের ছোট সম্প্রদায়ের নাটুয়াবৃত্তির অংশ নির্ণয় করা হইল (এই) শিলাশাসনে।

চিত্তন বংশীবাদকরূপে উপার্জন ত্যাগ করিয়া নাটুয়া বৃত্তির সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। উপার্জন অনুসারে এ বৃত্তি ইহারি। বড় ভাই মেডু নাটুয়া বড় বোন কোডাসানি ছোট বোন চিগাসানি এ তিনজনের এ নাটুয়াবৃত্তির তিন ভাগ। বংশীবাদকরূপে উপার্জন করিয়াছে বলিয়া চিত্তনের বেশি অংশ—একত্র করিয়া ইহার (পাঁচভাগের) দুই ভাগ।...'

১০

উত্তরাপথের প্রাচীন প্রাদেশিক সাহিত্যে দীর্ঘ গীতিকবিতায় একটি সাধারণ ঠাট (form) ছিল। সে হইল নায়ক-নায়িকার সাংবৎসরিক অথবা বর্ষাচাতুর্মাসিক বিরহব্যথার (দৈবাৎ মিলনসুখের) বর্ণনা। এমন কবিতা বাঙ্গালা সাহিত্যে গেয় আখ্যায়িকা-কাব্যের মধ্যে অথবা রাধাকৃষ্ণ-কথা হইলে পদাবলীর আকারে পাওয়া যায়। অন্য ভাষায় স্বতন্ত্র গাথা কবিতার (ballad) আকারেই মিলিয়াছে, নিতান্ত লোক-সাহিত্যের মধ্যে। বারমাসের ব্যাপার হইলে নাম "বারমাসিয়া" ("বারমাস্যা", "বারমাসী") হিন্দীতে "বারহমাসা" নামে খ্যাত। চার মাসের ব্যাপার হইলে হিন্দীতে "চউমাসিয়া" (=চাতুর্মাস্যা) নামে। একদা মনে করিয়াছিলাম, বারমাসিয়া গানের মূল উৎস কালিদাসের 'ঋতুসংহার'। ঋতুসংহারে নায়ক-নায়িকার কাছে প্রকৃতির বারমাসের ভোগসম্ভার উপাহৃত হইয়াছে ঋতুপর্যায়ের পরিবেশনে। বারমাসিয়ায় (এবং চউমাসিয়ায়) প্রধানত বিরহব্যথারই ফিরিস্তি। কিন্তু ঋতুসংহারের সঙ্গে প্রকারান্তরে এই মিল থাকিলেও ঋতুসংহার হইতে সোজাসুজি আসে নাই। আসিয়াছে প্রাচীনতর লোকগীতি হইতে। কালিদাসও লোকগীতি হইতেই ঋতুসংহারের কল্পনা পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে করিতে বাধা কি।

তবে কালিদাস একটি চাতুর্মাস্যাও লিখিয়াছিলেন এবং সেটি বিরহবেদনার গীতিকাব্য। মেঘদূত কাব্যটিকে একধরণের চউমাসার প্রাচীনতম নিদর্শন ছাড়া কি বলিব। আর এক হিসাবে কাব্যটিকে "আটমাসা"ও বলিতে পারি, কেননা অনাগত চার মাসের কথা উহ্য রহিয়া গিয়াছে দৌত্য-মিলনের ঔৎসুক্যে।

মাসানন্যান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা...

মেঘদূত সংস্কৃতে বহু-অনুকৃত। প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠেও ইহার অনুকরণ আছে। কিন্তু কোন দেশ-ভাষায় ইহা প্রাচীনকালে অনূদিত হয় নাই। দেশি সাহিত্য যে গোড়ার দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগবিহীন ছিল তাহার এক প্রমাণ পাই এই ব্যাপারে॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ শতাব্দ

১

তুর্কী-আক্রমণের প্রবল ঝাঁকানির পর যথাসম্ভব সুস্থির হইয়া বাঙ্গালা-সংস্কৃতি আবার দিকে দিকে প্রসার লাভের জন্য প্রস্তুত হইল পঞ্চদশ শতাব্দের প্রথম পদক্রমে। মুসলমান-রাজশক্তি তখন স্বাধীন এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনে ও রক্ষণে বাঙ্গালী হিন্দু সবিশেষ তৎপরতা দেখাইতেছে। লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার পুত্রদের সভা কবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের মন্ত্রী-সেনাপতি-সভাসদেরা এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তবে প্রজাবর্গের উপর তাঁহাদের প্রভাব মুছিয়া যায় নাই। তাঁহাদের সম্পত্তিও নিঃশেষে বংশধরদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সেকশুভোদয়ায় যদি আগাগোড়া বানানো কথা না থাকে তবে স্বীকার করিতে হইবে যে লক্ষ্মণসেনের (বা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের) কোন কোন মহাপাত্র তুর্কী সেনার পূর্বদূত মুসলমান পীরের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। ঐতিহাসিকেরা যাহাই বলুন, ভিতর হইতে খানিকটা অনুকূলতা না থাকিলে অত সহজে সেন-রাজ্য বিজিত হইত না। ইলিয়াস্‌শাহী সুলতান-বংশ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর শক্তিশালী ও ক্ষমতালিপ্সু হিন্দু রাজন্যেরা আবার গৌড়ে জমায়েৎ হইয়া অতীত দিনের সংস্কৃতি জাগাইয়া তুলিবার মতো আবহাওয়া সৃষ্টি করিলেন। একজন রাজন্য প্রবল হইয়া কিছু দিনের জন্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের যত না হোক বাহিরের মুসলমানদের চাপে তাঁহাকে শীঘ্রই সিংহাসন ছাড়িতে হইয়াছিল। তিনি পুত্রকে বসাইলেন এবং অধিকার স্থায়ী করিবার জন্য পুত্রকে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। পিতা "গণেশ"-এর প্রেরণাতেই যদু জালালুদ্দীন হইয়াছিলেন। গণেশ-জালালুদ্দীনের কয় বৎসর রাজত্বকাল মধ্যে (১৪১৪-৩১) গৌড় দরবারে হিন্দু পণ্ডিত-মনীষীর প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে প্রতিপত্তি পরবর্তী কালের সুলতানদের শাসনের সময়েও যথাসম্ভব বজায় ছিল। হিন্দুদের মধ্যে যে-সম্প্রদায় রাজ-দরবারে খ্যাতি-প্রতিপত্তি বরাবর সমানভাবে রাখিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন বৈদ্য। মুসলমান সুলতানদের মনে প্রাসাদ ও অন্তঃপুর চক্রান্তের ভীতি বেশ ছিল।

সেইজন্য বিশ্বস্ত বৈদ্য ছাড়া আর কেহ রাজচিকিৎসক নিযুক্ত হইতেন না। এই রাজচিকিৎসকদের কেহ কেহ ছিলেন পাল ও সেন আমলের রাজবৈদ্যদের বংশধর।

ইলিয়াস্‌শাহী বংশের আমল হইতেই বোধ করি সম্রান্ত হিন্দুর (রাজ-কর্মচারীর) "খান" (খাঁ) উপাধি প্রচলিত হইয়াছিল॥

২

বাঙ্গালায় তুর্কী-অধিকার শুরু হইবার পরেও প্রায় এক শ পঁচিশ বছর পর্যন্ত উত্তর-বিহারের অনেকখানি হিন্দু-অধিকারে ছিল। তখনও তীরহুতের সঙ্গে বাঙ্গালার সাংস্কৃতিক ঐক্য শিথিল হয় নাই। মুসলমান-অধিকার শুরু হইলে পর তীরহুত, এবং তীরহুতে মুসলমান-অধিকার বিস্তৃত হইলে পর (চতুর্দশ শতাব্দের দ্বিতীয় পাদ হইতে) নেপাল দেশছাড়া বাঙ্গালী পণ্ডিত-মনীষীর আশ্রয়ভূমি হইয়াছিল। তীরহুত মুসলমান-শাসন সহজে স্বীকার করিয়া লয় নাই। ব্রাহ্মণ জমিদারেরা—যাঁহারা স্বাধীন রাজ্যকালের মহামন্ত্রীদের[১] বংশধর—মাঝে মাঝে মুসলমান উপরওয়ালার বিরুদ্ধচারণ করিয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তীরহুত মুসলমান-শাসনে আসিবার পর হইতে বাঙ্গালার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বিরোধ লাগিয়াছিল। ফীরূজ-শাহ্ তুঘ্‌লক যখন বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন তীরহুতের জমিদার-রাজা ভোগেশ্বর (কামেশ্বরের পুত্র) তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কারণে দিল্লীর সুলতান তাঁহাকে "রায়" উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। শম্‌সুদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ্ পাণ্টা আক্রমণ করিয়া নেপাল পর্যন্ত অভিযান চালাইয়াছিলেন। সেকথা নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের গায়ে শিলাশাসনে উৎকীর্ণ আছে।[২]

পঞ্চদশ শতাব্দের গোড়ায় দিকে মিথিলা (তীরভুক্তি > তীরহুত)

---

[১] তীরভুক্তির শেষ হিন্দু রাজা হরিহরসিংহের রাজ্যভ্রংশকাহিনী অনেকটা লক্ষ্মণসেনের (বা তৎপুত্রের) কাহিনীরই মতো। রাজা পাটে থাকিতে থাকিতেই বংশপরম্পরাগত মহামন্ত্রী চণ্ডেশ্বর সর্বেসর্বা হইয়াছিলেন। (চণ্ডেশ্বরের প্রশস্তি পূর্বে দ্রষ্টব্য।) হরিহরসিংহ যুদ্ধে হারিয়া নেপাল তরাইয়ে পলাইয়া গেলে পর অপুত্রক চণ্ডেশ্বরের পিতৃব্যপুত্র কামেশ্বর দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীনের কাছে ফরমান লইয়া জমিদার-রাজা রূপে তীরহুতে প্রভুত্ব করিতে থাকেন। ইহা হইতে মনে হয় যে পূর্ব হইতেই মুসলমান-শক্তির সহিত কোন কোন রাজ-সদস্যের হয়ত কিছু যোগাযোগ ছিল।

[২] "সুরত্রাণ-সমস্‌দীনো বঙ্গালবহুলৈর্বলৈঃ।
সহাগত্য চ নেপালো ভগ্নো দগ্ধশ্চ সর্বশঃ॥
'সুলতান শমসুদ্দীন প্রচুর বঙ্গাল সৈন্য সহ আসিয়া নেপাল প্রায় সবটা ভগ্ন ও দগ্ধ করিল॥'

জৌনপুরের শর্কী-সুলতানদের আওতায় আসে। শর্কী-সুলতানদের রাজ্য-ভ্রংশের কিছুকাল আগেই ওখানে গৌড়-সুলতানের অধিকার বিস্তৃত হয় এবং গৌড়-তীরহুত বিরোধের অবসান ঘটে। তখন হইতে নূতন করিয়া এবং একটু নিবিড় করিয়া একই সংস্কৃতির দুই সহোদরার পুনর্মিলনের অবকাশ আসিল। এই মিলনের ফলে দুইটি দফায় গৌড় লাভবান হইল,—এক পাণ্ডিত্যচর্চায়—স্মৃতি ও নব্যন্যায়ে, আর সাহিত্যচর্চায় ব্রজবুলি পদাবলীতে ও গানে।

পঞ্চদশ শতাব্দে পূর্ব-ভারতে সাহিত্য-সংস্কৃতির দুই প্রধান শক্তিকেন্দ্র ছিল,—গৌড়ের সুলতানের দরবার এবং তীরহুতের রাজন্য-জমিদারের আসর। গৌড়-সুলতানের দরবারীরা পাণ্ডিত্যের খাতির বেশি করিতেন তাই সেখানে সংস্কৃতেরই চর্চা। তীরহুতের রাজসদস্যেরা সংস্কৃত ও দেশ-ভাষা দুইয়েরই চর্চা করিতেন। তবে তাঁহাদের মন ছিল দেশ-ভাষার ও সঙ্গীতের দিকে। ইহাদের সংস্কৃত-রচনা প্রায় সবই ব্যবহারিক প্রয়োজনে লেখা—স্মৃতি ও পাঠ্যনিবন্ধ অথবা ক্ষুদ্র রাজপ্রশস্তি॥

৩

সেনরাজাদের কৌলিক দেবতা সদাশিব। তবে শেষকালে তাঁহারা বিষ্ণুরও ভক্ত উপাসক হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সভায় কৃষ্ণলীলাকাহিনীর বিশেষ সমাদর ছিল। লক্ষ্মণসেন এবং তাঁহার পুত্র ও অমাত্যেরা কৃষ্ণলীলাবিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।[১] সে কথা আগে বলিয়াছি। তান্ত্রিক মহাযানের যুগনদ্ধ হেরুক-নৈরাত্মা মূর্তির উপাসনার সমান্তরালে অর্ধনারীশ্বরের মূর্তিপূজা যেমন চলিয়া গিয়াছিল[২] তেমনি সেই সঙ্গে সস্ত্রীক বিষ্ণুমূর্তির পূজারও আয়োজন চলিতেছিল বলিয়া মনে হয়।[৩] কিন্তু তুর্কী-আক্রমণ আসিয়া পড়ায় তাহা বোধ করি উদ্যোগেই থামিয়া গিয়াছিল। পরে অবশ্য তাহা রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

গৌড়ে হিন্দু রাজকর্মচারী-মন্ত্রীরা অনেকেই বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের কাছে নূতন করিয়া বৈষ্ণবতার ঢেউ আসিল তীরহুত হইতে। তীরহুতের কবি উমাপতি-বিদ্যাপতির কৃষ্ণলীলা-পদাবলী এবং সেই পদাবলী গানের পদ্ধতি

---

১ সদুক্তিকর্ণামৃত ১.৫৪.৫, ১. ৫৫.২, ১.৬৫.২ দ্রষ্টব্য।

২ বিজয়সেনের প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। (এখনকার-কালের পূজার শিবমূর্তি অর্ধনারীশ্বরের যৌনপ্রতীক।)

৩ সদুক্তিকর্ণামৃত ১.৩৪, ১-৫ দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালা দেশের লুপ্ত সাহিত্যবৃত্তিকে নূতন চেতনায় জাগাইয়া দিল। শুধু সাহিত্যে নয়, অধ্যাত্মভাবনায়ও নূতন সূত্রের নির্দেশ দিল তীরহুত হইতে ভাগবত-পুরাণ আসিয়া। পঞ্চদশ শতাব্দের আগে বাঙ্গালা দেশে ভাগবত-পুরাণ জানা ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। সর্বানন্দ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এবং তিনি টীকাসর্বস্বে বহু পুরাণ-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাহার মধ্যে হরিবংশ আছে বিষ্ণু-পুরাণ আছে কিন্তু ভাগবত-পুরাণ নাই। বৈষ্ণব-শাস্ত্রের এই পরম গ্রন্থখানি তাঁহার সময়ে প্রচলিত থাকিলে তিনি অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দের মহিমান্বিত বৃহস্পতি মিশ্র রায়মুকুট (ইনিও বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন) অমরকোষের টীকা লিখিয়াছিলেন 'পদচন্দ্রিকা' নামে। তাহাতে আরও বেশি গ্রন্থের নাম ও উদ্ধৃতি আছে কিন্তু ভাগবতের নাই। সুতরাং এ অনুমান অপরিহার্য হইতেছে যে পঞ্চদশ শতাব্দের প্রথমার্ধেও বাঙ্গালা দেশে ভাগবত-পুরাণ অজ্ঞাত ছিল। অথচ দেখিতেছি যে গৌড়-সুলতান সংবর্ধিত মালাধর বসু ১৪৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভাগবত অনুবাদ করিতেছেন এবং গৌড়ে রামকেলি গ্রামে সুলতান হোসেন শাহার মহামন্ত্রী সনাতন পঞ্চদশ শতাব্দের শেষের দিকে ভাগবত আলোচনা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই তীরহুতে ভাগবত পৌছিয়াছিল। ৩৪৯ লক্ষ্মণ সংবতে (১৪৬৮) বিদ্যাপতির হাতে নকলকরা ভাগবত-পুরাণের পুথি পাওয়া গিয়াছে।[১] পঞ্চদশ শতাব্দের শেষপাদে বাঙ্গালায় এবং তীরহুতে ভাগবত-পুরাণ সুপ্রতিষ্ঠিত ॥

৪

চৈতন্য যে ভক্তিরসবন্যা আনিয়া দিলেন ষোড়শ শতাব্দের গোড়ায়, তাহার একটু ভূমিকা রচিত হইয়াছিল গৌড়-দরবারে কর্মচারীদের দ্বারা ভাগবতের অনুশীলনে। আর একটু ভূমিকা পাতিয়াছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী। তাঁহার কথা পরে বলিব। জানিনা, প্রথম ভূমিকাটুকুতে মাধবেন্দ্রের প্রভাব কতটা ছিল অথবা ছিল কি না।

পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ দশকে যখন হোসেন শাহা গৌড়-সিংহাসন অধিকার করেন তখন গৌড় শহরের উপকণ্ঠে রামকেলি গ্রাম শিষ্ট-সংস্কৃতির বোধ করি বিশিষ্টতম কেন্দ্র ছিল। সুতরাং রামকেলির কবি-পণ্ডিতদের সংস্কৃত-কাব্য-অনুশীলনের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

১ বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী পৃ ১৭।

করঞ্জগ্রামীণ ব্রাহ্মণ চতুর্ভুজ "ভাগীরথীপরিসরে" "বহুশিষ্টজুষ্টে" "শ্রীরামকেলি নগরে" থাকিয়া "বিধু মনু" শকাব্দে (অর্থাৎ ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে) 'হরিচরিত' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[১] কাব্যটি প্রধানত মাত্রাছন্দে বিরচিত এবং শেষে মিল আছে। হরিচরিত তের সর্গে বিভক্ত। শ্লোক-সংখ্যা প্রায় তের শ। প্রথম শ্লোক এই

সুরসমূহসমীহিতসিদ্ধয়ে
ধরণিধারণগোদ্বিজবৃদ্ধয়ে।
যদুকুলেঽবততার য এষ নঃ
সততমস্তু মুদে মধুসূদনঃ।

'দেবতাদের ইষ্টসিদ্ধির জন্য ভূভারমোচন এবং গো-ব্রাহ্মণের বৃদ্ধির জন্য, যিনি যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই মধুসূদন আমাদের সতত আনন্দের কারণ হোন।'

সনাতন ও রূপ দুই ভাই রামকেলিতে বাস করিতেন। ইহারা হোসেন শাহার অতি বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন। পদবলাৎ ইহাদের নাম ছিল যথাক্রমে সাকর মল্লিক (অর্থাৎ ছোট রাজা, পূর্বকালের "প্রতিরাজ") এবং দবীর-খাশ (অর্থাৎ খাশ-মুন্‌শি, এখনকার কালের প্রাইভেট সেক্রেটারী)। পাণ্ডিত্যে ও বুদ্ধিমত্তায় দুই ভাইই অতিশয় বিশিষ্ট ছিলেন। সনাতন ছিলেন গৌড়ের মনীষীদের গোষ্ঠীপতি। ইহাদের কথা পরে বলিব।

হোসেন শাহার অধীনে কাজ করিবার সময়েই রূপ (তখন তিনি "গোস্বামী" নহেন) কৃষ্ণলীলা বিষয়ে কয়েকটি সংস্কৃত কাব্য ও গীতিকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 'হংসদূত', 'উদ্ধবসন্দেশ' এবং 'গীতাবলী' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংসার ত্যাগ করিবার পরে রূপ আরো কয়েকখানি বই—কাব্য নাটক ও সিদ্ধান্তগ্রন্থ—রচনা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ ধোয়ীর পবনদূতের মতো হোসেন শাহার সভাসদ্ রূপের উদ্ধবসন্দেশও মেঘদূতের অনুকরণে লেখা। রচনা ভালোই। কিছু উদাহরণ দিই।

গোষ্ঠ হইতে কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের সময় হইয়াছে, রাধার মনও চঞ্চল। বুঝিয়া প্রসাধনরত সখী বলিতেছে

---

[১] এই কাব্যের প্রথম পরিচয় দেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Manuscripts belonging to the Darbar Library, Nepal* গ্রন্থে (পৃ ১৩৪)। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পুথির অনুলিপি করাইয়া আনাইয়াছেন। সম্প্রতি শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

বেণুর্নায়ঃ প্রসরতি গবাং ধূমধারা কৃশানোর্
বেণুর্নাসৌ গহনকুহরে কীচকো রোরবীতি।
পশ্যোন্মত্তে রবিরভিযযৌ নাধুনাপি প্রতীচীং
মা চাঞ্চল্যং কলয় কুচয়োঃ পত্রবল্লীং তনোমি।

'যাহা তুমি গোধূলি মনে করিতেছ তাহা অগ্নির ধূমোদ্গার মাত্র, যে শব্দ তুমি কৃষ্ণের বংশীধ্বনি ভাবিতেছ, তাহা বনগহনে সরন্ধ্র বেণুর রব। উন্মত্তে, দেখ এখনও সূর্য পশ্চিমে চলে নাই। অতএব চঞ্চল হইও না, আমি কুচযুগে পত্রবল্লী আঁকিয়া দিই।'

কৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছে। গুরুজনের উপস্থিতির জন্য, রাধা গৃহদ্বারে আসিয়া দিবসান্তে প্রিয়কে একবার দেখিয়া লইবার ভরসা পাইতেছে না। বুঝিয়া মর্মজ্ঞ সখী বলিতেছে

মা মন্দাক্ষং কুরু গুরুজনাদ্ দেহলীং গেহমধ্যাদ্
এহি ক্লান্তা দিবসমখিলং হন্ত বিশ্লেষতোঽসি।
এষ স্মেরো মিলতি মৃদুলে বল্লবীচিত্তহারী
হারী গুঞ্জাবলিভিরলিভিলীঢ়গন্ধো মুকুন্দঃ।

'গুরুজনের উপস্থিতিতে লজ্জা করিও না। সমস্ত দিন কৃষ্ণকে না দেখিয়া ক্লান্ত হইয়া রহিয়াছ, অতএব গৃহমধ্য হইতে বাহির হইয়া দেহলীতে দাঁড়াও। মৃদুলে, ঐ দেখ অলিলীঢ়গন্ধগুঞ্জামাল্যবান্ গোপীচিত্তহারী মুকুন্দ প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।'

অনেকদিন হইল কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া গিয়াছে। অল্পকাল মধ্যে ফিরিবার কথা ছিল। রাধার বিরহকাতরতা দেখিয়া সখী সান্ত্বনা দিতেছে।

কারুণ্যাব্ধৌ ক্ষিপসি জগতীং হা কিমেভির্বিলাপৈর্
ধেহি স্থৈর্যং মনসি যদভূদধ্বগে বদ্ধরাগা।
স্মৃত্বা বাণীমপি যদি নিজাং স ব্রজং নাজিহীতে
ধূর্তোঽস্মাকং ত্রিজগতি ততস্তদ্ধি নির্দোষতাভূৎ।

'আহা, কেন তুমি এইরূপ বিলাপ করিয়া সকলকে কাঁদাইতেছ। পথিককে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলে ভাবিয়া মন স্থির কর। সে ধূর্ত যদি নিজের কথা না রাখিয়া ব্রজে না আসে, তবে ত্রিজগতে আমাদের দোষহীনতাই প্রতিপন্ন হইল।'

জয়দেবের গান অনুসরণ করিয়া রূপ সংস্কৃতে কয়েকটি গান (পদাবলী) রচনা করিয়াছিলেন। এগুলি 'গীতাবলী' নামে সঙ্কলিত। বড়ভাই সনাতন রূপের গুরু ছিলেন। ভনিতায় গুরুরই নাম আছে। সে নামে শ্লেষ আছে,—এক অর্থে গুরুর নাম অপর অর্থে নায়ক ও উপাস্যের নাম। পরবর্তী কালে কোন কোন বৈষ্ণব কবি এমনি সংস্কৃত পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু রূপের রচনার তুলনায় সেগুলি অনেক নিকৃষ্ট। রূপের একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি। জ্যোৎস্না-রাত্রিতে রাধা অভিসার করিবে। সখী তাহার অভিসারোচিত বেশভূষা বর্ণনা করিতেছে।

শ্বসং কুচবল্গিতমৌক্তিকমালা
স্মিতসান্দ্রীকৃতশশিকরজালা।
হরিমভিসর সুন্দরি সিতবেষা
রাকা রজনিরজনি গুরুরেষা।
পরিহিতমাহিষদধিরুচিসিচয়া
বপুরর্পিতঘনচন্দননিচয়া।
কর্ণকরম্বিতকৈরবহাসা
কলিতসনাতনসঙ্গবিলাসা॥

'দ্রুতনিঃশ্বাসে তোমার বক্ষের মুক্তামালা স্পন্দিত হইতেছে। (তুমি) স্মিতহাস্যে জ্যোৎস্নাকে ঘনীভূত করিয়া দিতেছ। সুন্দরী! তুমি ধবল বাস পরিধান করিয়াছ। এখন অবিলম্বে হরির অভিসারে চল, পূর্ণিমার রাত্রি গড়াইয়া গেল। তুমি মাহিষ দধির মত শ্বেত বক্ষোবাস পরিয়াছ, সর্বাঙ্গে গাঢ় চন্দন লেপন করিয়াছ। তোমার কর্ণে শোভা পাইতেছে বিকশিত কুমুদ। তুমি সনাতনের সঙ্গ পাইবার লোভে বিলাস অবলম্বন করিয়াছ।'

রূপ গোস্বামীর রচনাচাতুর্যের নিদর্শন পাওয়া যায় পরিণত লেখনীনিঃসৃত নাটকদ্বয়ে—'বিদগ্ধমাধব'এ (১৫২৪) ও 'ললিতমাধব'এ (১৫২৯)। রূপ গোস্বামীর প্রৌঢ় বৈদগ্ধ্যের ও ভক্তিরসদৃষ্টির ছাপ রহিয়াছে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি'—বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের সর্বাধিক প্রামাণ্য এই বই দুইটিতে।

রূপ 'পদ্যাবলী' নামে সংস্কৃত বৈষ্ণব-কবিতার একটি চয়নিকা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রধানত বাঙ্গালী কবির রচিত ব্রজলীলাবিষয়ক প্রকীর্ণ শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। কয়েকটি শ্লোক সমসাময়িক অথবা অল্পকাল পূর্ববর্তী কবির,—মাধব চক্রবর্তী, জগন্নাথ সেন, জগদানন্দ রায়, সঞ্জয় কবিশেখর, কেশব ভট্টাচার্য, ষষ্ঠীবর দাস, রামচন্দ্র দাস, মুকুন্দ ভট্টাচার্য, কেশব ছত্রী, গোবিন্দ ভট্ট—ইত্যাদির রচনা। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ গৌড়-দরবারের কর্মচারী ছিলেন। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দের বাঙ্গালী কবির রচনার নমুনা হিসাবে কয়েকটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

জগদানন্দ রায়ের এই শ্লোকটি নৌব্যসনী কৃষ্ণের প্রতি পারগামী গোপীদের উক্তি।

জীর্ণা তরিঃ সরিদতীবগভীরনীরা বালা বয়ং সকলমিত্থমনর্থহেতুঃ।
নিস্তারবীজমিদমেব কৃশোদরীণাং যন্মাধব ত্বমসি সম্প্রতি কর্ণধারঃ॥

'তরী জীর্ণ, নদীতে গভীর নীর, আমরা বালিকা—এই সকলই বিপদের কথা। তবে অবলা আমাদের নিস্তারের একটু ক্ষীণ আশা এই যে, মাধব তুমিই এখন কর্ণধার হইয়াছ।'

সর্ববিদ্যাবিনোদের এই শ্লোকে দূতী রাধাকে কৌশলে সঙ্কেত-স্থান জানাইয়া দিতেছে।

পন্থাঃ ক্ষেমময়োঽস্তু তে পরিহর প্রত্যূহসম্ভাবনাম্
এতন্মাত্রমধারি সুন্দরি ময়া নেত্রপ্রণালীপথে।
নীরে নীলসরোজমুজ্জ্বলগুণং তীরে তমালাঙ্কুরঃ
কুঞ্জে কোঽপি কলিন্দশৈলদুহিতুঃ পুংস্কোকিলঃ খেলতি॥

'তোমার পথ মঙ্গলময় হোক। বিঘ্নের লেশমাত্র আশঙ্কা করিও না। সুন্দরী, আমি এইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছি যে, কালিন্দীর নীরে একটি উজ্জ্বলবর্ণ নীলপদ্ম, তীরে একটি বাল তমালতরু, (আর) কুঞ্জে একটি পুংস্কোকিল খেলা করিতেছে।'

নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটি কেশব ভট্টাচার্যের রচনা। রাধা উদ্ধবের দ্বারা মথুরায় কৃষ্ণের কাছে নিবেদন পাঠাইতেছে।

আস্তাং তাবদ্ বচনরচনাভাজনত্বং বিদূরে
দূরে চাস্তাং তব তনুপরীরম্ভসম্ভাবনাপি।
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণতিভিরিদং কিন্তু যাচে বিধেয়া
স্মারং স্মারং স্বজনগণনে কাপি রেখা মমাপি॥

'সাক্ষাতে পরস্পর বাক্যালাপ করিবার অবকাশ দূরে থাক, তোমার তনুস্পর্শ লাভের সম্ভাবনা সুদূর হোক। কেবল বার বার প্রণতি করিয়া তোমার নিকট এইমাত্র যাচ্ঞা করিতেছি,—তুমি স্বজন-গণনার কালে আমার নামেও একটি রেখা টানিও।'

গোবিন্দ ভট্টের এই শ্লোকে রাধার মুখে কৃষ্ণের বেণুধ্বনির মোহিনী শক্তির বর্ণনা।

সত্যং জল্পসি দুঃসহাঃ খলগিরঃ সত্যং কুলং নির্মলং
সত্যং নিষ্করুণোঽপ্যয়ং সহচরঃ সত্যং সুদূরে সরিৎ।
তং সর্বং সখি বিস্মরামি ঝটিতি শ্রোত্রাতিথির্জায়তে
চেদুন্মাদমুকুন্দমঞ্জুমুরলীনিঃস্বানরাগোদ্‌গতিঃ॥

'সখী, তুমি যথার্থই বলিতেছ যে খলবাক্য দুঃসহ। ইহাও সত্য যে আমার কুল নিষ্কলঙ্ক। ইহাও ঠিক এই সহচর নিষ্ঠুর এবং ইহাও যথার্থ যে যমুনাতীর সুদূর। তথাপি সখী, এ সকলই আমি তখনি ভুলিয়া যাই যখন মুকুন্দের মধুর মুরলীনিঃসৃত উদ্দামরাগিণী আমার শ্রবণে প্রবেশ করে।'

গৃহস্থাশ্রমে রামকেলিতে সনাতনের গুরু (বা আচার্য) ছিলেন নরহরি বিশারদের পুত্র, সার্বভৌমের ভাই বিদ্যাবাচস্পতি। ইহাকে সুলতানও বেশ খাতির করিতেন। বিদ্যাবাচস্পতির পৌত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি যে 'ভ্রমরদূত' কাব্য লিখিয়াছিলেন তাহার শেষে এই কথা আছে

যোঽভূদ্ গৌড়ক্ষিতিপতিশিখারত্নঘৃষ্টাঙ্ঘ্রিরেণুর্
বিদ্যাবাচস্পতিরিতি জগদ্‌গীতকীর্তিপ্রপঞ্চঃ।...

'যাঁহার পদরেণু গৌড়নৃপতির মুকুটমণিতে ঘর্ষণ করে, বিদ্যাবাচস্পতি বলিয়া যাঁহার কীর্তিসমূহ জগতে গীত,'...

৫

বাঙ্গালা দেশে ষোড়শ শতাব্দে চৈতন্যের ধর্ম লইয়া দিকে দিকে যে মনস্বান্ বিস্ফার প্রকট হইয়াছিল তাহার বোধন আগের শতাব্দেই শুরু হইয়াছিল, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আশ্রয় করিয়া। ইলিয়াস্‌শাহী স্থলতানদের শক্তি ও প্রতিপত্তি পূর্বভারতের সর্বত্র এমন কি স্থদূর পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত স্বীকৃত হইয়াছিল। শতাব্দের গোড়ার দিকে আরাকানের রাজ্যচ্যুত রাজা সিংহাসন পুনরুদ্ধারের আশায় গৌড়-স্থলতানের আশ্রয়প্রার্থী হইয়া প্রায় বিশ পঁচিশ বছর এখানে কাটাইয়াছিলেন। এখানকার সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ লইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া গিয়া গৌড়-স্থলতানের সহায়তায় সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। আরাকান-রাজসভার সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের রীতিমত যোগাযোগ শুরু হইল সেই হইতে। অবশ্য ইহার আগে চাটিগাঁয়ের সঙ্গে যোগ ছিলই। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দে চাটিগাঁয়ে বাঙ্গালা সংস্কৃতি কতকটা দ্বীপাবদ্ধ ও সঙ্কুচিত হইয়া ছিল। এখন হইতে চাটিগাঁ বাঙ্গালা সংস্কৃতির একটি প্রধান সীমান্ত-ফাঁড়িতে অর্থাৎ আউট-পোস্টে পরিণত হইল। ষোড়শ শতাব্দে চৈতন্যের পাশে যে সকল শক্তিশালী ও সংস্কৃতিমান্ ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই চাটিগাঁয়ের এবং সিলেট প্রভৃতি পূর্ব-দক্ষিণ ও পূর্ব-উত্তর সীমান্ত অঞ্চল হইতে আগত।

শতাব্দের প্রথমার্ধে বাঙ্গালা সংস্কৃতি পূর্বমুখে ধাবিত হইয়াছিল, শতাব্দের শেষার্ধে পশ্চিমের সংস্কৃতিধারা বাঙ্গালার খাতে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। তীর-হুতের কবি বিদ্যাপতির উল্লেখ আগে করিয়াছি। জৌনপুরের শেষ শর্কীবংশীয় স্থলতান হোসেন শাহা দিল্লীর বাদশাহা বহলুল লোদী ও সিকন্দর লোদীর কাছে হার মানিয়া প্রথমে বিহারে (১৪৭৮) পরে বাঙ্গালায় পলাইয়া আসেন। গৌড়-স্থলতান হোসেন শাহা তাঁহাকে সাদরে আশ্রয় দেন। সপরিবার ও সপরিজন হোসেন শাহা শর্কী গঙ্গাতীরে কহলগাঁয়ের কাছে বাসস্থান করিয়া শেষ জীবন এইখানেই কাটাইয়া দেন। শর্কী-স্থলতানের সঙ্গে কবি-গুণীও কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন স্থফী সাধক-কবি কুতবন। ইহার 'মৃগাবতী' কাব্য অবধী সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান রচনার অন্যতম। কুতবনের কাব্য অল্প পরবর্তী কালে কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর বিখ্যাত 'পদ্মাবতী' (বা 'পদুমাবৎ') কাব্যের খানিকটা আদর্শ যোগাইয়াছিল।

মৃগাবতী কাব্য বাঙ্গালা দেশে রচিত হইয়াছিল ৯০৯ হিজরীতে ১৫৬০ শকাব্দে

(অর্থাৎ ১৫০৩ খ্রীস্টাব্দে)[১]। কাব্যের প্রারম্ভে কবি হোসেন শাহার বেশ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার অনুবাদ দিলাম।

'শাহ হুসেন বড় রাজা আছেন। ছত্রসিংহাসন উঁহারই উপযুক্ত। পণ্ডিত বুদ্ধিমান জ্ঞানী (ব্যক্তিরা ইঁহার সভায়) যে পদ্য পড়েন, (তাহার) অর্থ সব (ইঁহার) জানা। ইঁহার যথার্থ আখ্যা ধর্ম-যুধিষ্ঠির। আমার মাথা (গুঁজিবার) ঠাঁই দিয়াছেন,—জীবিত থাকুন রাজা জগতে। দান দেন, (এত) যে গুণিয়া শেষ পাওয়া যায় না। বলি আর কর্ণ নাগাল পায় না। যাঁহার কাছে গন্ধর্ব রায় আছেন, তিনি (সুলতানের) সেবা করেন এবং সব দিক দেখেন।

এই হোসেন শাহাকে হিন্দী-সাহিত্যসেবীরা জোনপুরের হোসেন শাহা শর্কী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অনেক কাল আগেই শর্কী-সুলতান রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন। কুতবনের গ্রন্থ রচনাকালে তিনি তখন গৌড়-সুলতানের আশ্রয়ে আতিথ্য উপভোগ করিতেছেন। কুতবন যে শর্কী-সুলতানের আশ্রিত ছিলেন এবং তাঁহার সহিত বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কুতবন তাঁহার কাব্যের উপক্রমে যে হোসেন শাহার প্রশংসা করিয়াছেন তিনি রাজ্যচ্যুত হোসেন শাহা শর্কী নন, সিংহাসনাধিষ্ঠিত হোসেন শাহা মক্কী। গন্ধর্ব রায় গৌড়-সুলতানের সভাসদ্ ছিলেন। দরবারের প্রসঙ্গে তাঁহার উল্লেখ কুতবন করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ জাগিতে পারে না।

কুতবনের মতো জৌনপুরী কবিদের দ্বারাই বোধ করি লৌকিক প্রণয়কাহিনী কাব্যধারা বাঙ্গালায় নূতন করিয়া আমদানি হইয়াছিল। নূতন করিয়া বলিতেছি এইজন্য যে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের আমল হইতে এরকম কাহিনী পাওয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি—বিদ্যাসুন্দর কাহিনী—ছাড়া আর কোনটি সাহিত্যে গৃহীত হয় নাই। কেন যে হয় নাই তাহার কারণ, পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে দেবতার কথাই সর্বস্ব ছিল। এবং বিদ্যাসুন্দর কাহিনীও দেবতা মাহাত্ম্যখ্যাপক হইয়া তবেই সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। নূতন আনীত কাহিনীগুলি তেমন হইতে পারে নাই। সেইজন্য সে বস্তু হয় রূপকথা রূপে চলিয়া গিয়াছিল নয় মুসলমান কবিদেরই নিজস্ব রহিয়া গিয়াছিল॥

৬

হিন্দু রাজকর্মচারীদের প্রভাবেই বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতানেরা কেহ কেহ কবিপণ্ডিতের পোষকতা রাজকর্তব্যের মধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন। কর্মচারী

[১] প্রথম পরিচয় শ্যামসুন্দর দাস সঙ্কলিত *Report for the Search for Hindi Manuscripts* (1900) পৃ ১৭-১৯ দ্রষ্টব্য। অধ্যাপক শ্রীমাতাপ্রসাদ গুপ্ত সম্পাদিত ও আগরা হইতে প্রকাশিত (১৯৬৮)।

অথবা সভাসদ্ হইলে কবি-পণ্ডিতকে তাঁহারা সাধারণত উপাধি দিতেন। সে-উপাধির শেষের অংশ তুর্কী শব্দ "খান" (খাঁ) অর্থাৎ ঠাকুর বা মহাশয়।[১] যেমন—শুভরাজ-খান, গুণরাজ-খান, যশোরাজ-খান ইত্যাদি। এসব নামের "রাজখান" অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পরে "রায়-খাঁ" পদবীতে পরিণত হইয়াছিল।

সেকালে কবি-পণ্ডিতেরা তাঁহাদের রচনায় রাজার (বা স্থলতানের) নাম করিয়া কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি দিতেন। গীতিকবিতায় এমন ব্যাপার প্রথম লক্ষ্য করা গেল তীরহুতে। উমাপতি উপাধ্যায় তাঁহার গানে রাজার নাম করিয়াছেন সাধারণত "হিন্দুপতি" বলিয়া এবং সেই সঙ্গে রাজমহিষীর নামও দিয়াছেন।[২] শতাধিক বৎসর পরে বিদ্যাপতি ও তাঁহার সমসাময়িকদের গানে এরকমের প্রচুর উদাহরণ পাইতেছি। "শিবসিংহ-লছিমা" ছাড়াও এখানে বহু বহু নাম আছে।

বাঙ্গালায় ও তীরহুতে প্রাপ্ত দুইটি গানে হোসেন শাহার উল্লেখ আছে। একটিতে "নবকবিশেখর" যশোধরের ভনিতা,[৩] অপরটিতে বিদ্যাপতির।[৪] প্রথমটি মৈথিল কবির রচনা বলিয়াই বোধ হয়। তাহা হইলে এ হোসেন শাহা অবশ্যই হোসেন শাহা শর্কী।[৫] দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। ষোড়শ শতাব্দে একজন বাঙ্গালী কবি "বিদ্যাপতি" নাম বা ভনিতা ব্যবহার করিতেন একথা সপ্তদশ শতাব্দের এক বৈষ্ণব লেখক বলিয়া গিয়াছেন। ইহা সত্য হইলেও গৌড়-দরবারের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগের অন্য কোন সূত্র খুঁজিয়া পাই না। গানটির পাঠান্তরে হোসেন শাহার স্থানে "নসীরা শাহ"ও পাওয়া যায়। গান দুইটির ভনিতা

---

[১] "ঠাকুর"ও (প্রাচীনতর সংস্কৃতায়িত রূপ "ঠাকুর") মূলে সম্ভবত তুর্কী শব্দ, অর্থ "প্রভু, স্বামী, কর্তা"। তবে এ শব্দটি মুসলমান-অধিকারের আগেই চলিত হইয়াছিল। তীরহুতে পঞ্চদশ শতাব্দে ইহা ব্রাহ্মণের গৌরবসূচক উপাধি পদবী বা বিশেষণ রূপে পাই। যেমন—বিদ্যাপতি ঠাকুর। বাঙ্গালা দেশে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দে ইহা ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণব-মহান্তের গৌরবসূচক পদবা অথবা বিশেষণরূপেই মিলে। যেমন—নরহরিদাস ঠাকুর (বৈদ্য), ঠাকুর নরোত্তম (কায়স্থ), হরিদাস ঠাকুর (মুসলমান)। "প্রভু" অর্থে অবশ্য বরাবরই চলিত। "ঈশ্বর, দেবতা" অর্থ অষ্টাদশ শতাব্দেই রূঢ় হয়। এখন অর্থ আরও বিকৃত হইয়াছে।

[২] পূর্বে দ্রষ্টব্য।

[৩] লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী' (দরভঙ্গা ১৯৩৪) পৃ ৬৭। ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে "যশোধর" স্থানে "বিদ্যাপতি" পাঠ আছে। সাধনা দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম ভাগ পৃ ১৭১ দ্রষ্টব্য।

[৪] সাধনা ঐ পৃ ১৭২ দ্রষ্টব্য।

[৫] বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী পৃ ৩২ দ্রষ্টব্য।

ভণই জসোধর নব কবিশেখর পুহুবী তেসর কাহাঁ।
সাহ হুসেন ভৃঙ্গ সম নাগর মালতী সেলিক তাহাঁ।
সাহ হুসেন অনুমানে যারে হানল মদন বাণে
চিরঞ্জীবী হউ পঞ্চ-গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভানে।

পাঠান্তরে

নসীরা সাহ যে জানে যারে হানল মদন বাণে
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ-গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভানে॥

"পঞ্চ-গৌড়েশ্বর" কথাটির যদি আক্ষরিক মূল্য দেওয়া যায় তাহা হইলে গানটির উদ্দিষ্ট সুলতান বাঙ্গালার হোসেন শাহা অথবা তাঁহার পুত্র-উত্তরাধিকারী নাসিরুদ্দীন নুসরৎ শাহ।

একটি গানের ভনিতায় উদ্দিষ্ট নসীর শাহা সুলতান বাঙ্গালার নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহা (১৪৪২-৬০) হইবেন, যদি এটি যথার্থই মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচনা হয়।

বিদ্যাপতি ভানি
অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ নসীর মধুপ ভুলে কমলা বাণী॥

বাঙ্গালার সুলতান হোসেন শাহার নাম অসংবিবাদিত ভাবে পাইতেছি যশোরাজ-খানের গানে।[১] ভনিতা

শ্রীযুত হুসন জগতভূষণ সোই ইহ রস-জান।
পঞ্চ-গৌড়েশ্বর ভোগ-পুরন্দর ভণে যশরাজ খান॥

তীরহুতে প্রাপ্ত একটি গানে কংসনারায়ণের ভনিতায় নসিরা শাহ সুলতানের নাম পাইতেছি।[২] ভনিতার শেষছত্রে গোলমাল আছে।

সুমুখি-সমাদ সমাদরেঁ সমদল নসিরা সাহ সুরতানে।
নসিরা ভূপতি সোরমদেই পতি কংসনরায়ণ ভানে॥

কে এই কংসনারায়ণ? ইনি কি তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ?

তীরহুতে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির ভনিতাযুক্ত একটি গানে সুলতান গিয়াসুদ্দীনের নাম আছে।[৩]

বেকতে ও চোরি গুপুত কর কতিথন বিদ্যাপতি কবি ভান।
মহলম জুগপতি চিরেঁ জীবেঁ জীবথু গ্যাসদীন সুরতান॥

মনে হয় এ বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাব্দের মৈথিল কবি নন। এ সুলতান হোসেন শাহার পুত্র এবং তাঁহার বংশের শেষ নৃপতি গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহা (১৫৩৩-৩৮) হওয়াই সম্ভব॥

[১] একটু পরে দ্রষ্টব্য। [২] রাগতরঙ্গিণী পৃ ৯৭। [৩] ঐ পৃ ৫৭।

৭

চতুর্দশ শতাব্দে উমাপতি-উপাধ্যায়ের লেখা সংস্কৃত নাটকের মধ্যে যে গানগুলি আছে তাহার ভাষা এবং পঞ্চদশ শতাব্দে বিদ্যাপতির গানের ভাষা একই। পঞ্চদশ শতাব্দে এই ভাষা ও গানের ঠাট সমগ্র পূর্বভারতে রাজপুষ্ট দেশীয় শিষ্ট-সাহিত্যে গীতিকবিতার আদর্শ যোগাইয়াছিল। ষোড়শ ও পরবর্তী শতাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যে এই ভাষায় ও ঠাটে বিস্তর পদাবলী লেখা হইয়াছিল। আধুনিক কালে বাঙ্গালা দেশে এই ভাষা "ব্রজবুলি" নাম পাইয়াছে। মনে হয় নামটির মূলে ছিল "ব্রজাওলি" (অর্থাৎ ব্রজ-সম্বন্ধীয়)। যেমন, সোনালি (অসমীয়া সোনারলি), রূপালি।

ব্রজবুলির মূলে আছে প্রধানত দুইটি ভাষা। একটি অবহট্‌ঠ, অপরটি মৈথিলী। ব্রজবুলি গানের ছন্দ পুরাপুরি অবহট্‌ঠের, ভাষাতেও অবহট্‌ঠের ছাপ আছে। সে ছাপ পণ্ডিতেরা হিন্দীর বা ব্রজভাষার প্রভাবচিহ্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দের শেষার্ধের আগে হিন্দীতে বা ব্রজভাষাতে এইজাতীয় কোন রচনা পাই না। মাধবেন্দ্র পুরী এবং বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা মথুরা-বৃন্দাবনে যাইবার পরে তবে সুরদাস প্রভৃতি প্রাচীন ব্রজভাষা-কবিদের কবিতাস্ফূর্তি হইয়াছিল। সুতরাং ব্রজবুলিতে হিন্দীর স্পর্শ যদি কিছু লাগিয়াও থাকে তবে তাহা ষোড়শ শতাব্দের শেষপাদের আগে নয়। অথচ তাহার অনেক আগেই তীরহুতে বাঙ্গালায় এবং আসামে যথেষ্ট পরিমাণে বৈষ্ণব কবিতা লেখা হইয়া গিয়াছে।

ব্রজবুলিতে মৈথিলীর ভাগই বেশি। এ মৈথিলী ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দের ভাষা। বিদ্যাপতি এই ভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সময়ের কথ্য ভাষা হুবহু এইরকম ছিল না। তাঁহার সময়ে সমাপিকা ক্রিয়াপদের রূপে গুরুতর পরিবর্তন ঘটিতেছিল। সে পরিবর্তনের পরিচয় পদাবলীর ভাষায় পাই না।

ব্রজবুলি গীতিকবিতার রীতি মিথিলা হইতে পূর্বভারতের সংস্কৃতিমান্ রাজসভাগুলিতে (—পঞ্চদশ শতাব্দে রাজসভাই সংস্কৃতির প্রধান বসতি ছিল—) ছড়াইয়া পড়ে—নেপালে, মোরঙ্গে, বাঙ্গালায়, উড়িষ্যায়, আসামে। প্রত্যেক অঞ্চলে স্থানীয় ভাষার ছাপ কিছু না কিছু পড়িয়াছে।

এইসকল অঞ্চলের মধ্যে উড়িষ্যায় ব্রজবুলি গীতিকবিতা বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। অথচ তীরহুতের বাহিরে সবচেয়ে পুরানো রচনা বলিয়া

নিশ্চিতভাবে জানা গিয়াছে যে গান সেটি এইখানেই রচিত হইয়াছিল। এই গানটি আছে 'পরশুরামবিজয়' নামক একাঙ্ক নাট্যরচনায়।[১] রচয়িতা উড়িষ্যার রাজা গজপতি কপিলেন্দ্র দেব (রাজ্যকাল ১৪৩৫-৬৮)। আসলে ইহা তাঁহার কোন সভাকবির রচনা। উমাপতির নাটকের মতোই, ভাষা সংস্কৃত। গান এই একটি মাত্র, "অমররাগেণ গীয়তে"।

কেবণ মুনিকুমার পরশু দক্ষিণকর
বামেন শোহে ধনুশর না।
কোপেন বোলই বীরত তু সে মো বধিলু তাত
আজ তোর ছেদিবই মাথ না।
শুণ রাজন হো কিএ তোর রাজ্যে ব্রহ্মবধে না ॥১॥
এ তোর চন্দ্রবদন মেঘে কি ঢাঙ্কিলা জহ্ন
তাহা দেখি বিকল মো মন না।
আবর দেখই অরষ্টি রাজ্যে তো রুধির-বৃষ্টি
পুর বেঢ়ি রোদন্তি শৃগাল না।
শুণ রাজন হো কিএ তোর রাজ্যে ব্রহ্মবধে না ॥২॥

ভাষায় উড়িয়ার ছাপ এবং গঠনে ভনিতার অভাব লক্ষণীয়।

বাঙ্গালা দেশে লেখা সবচেয়ে পুরানো ব্রজবুলি রচনা কবেকার তাহা বলা যায় না। তবে রচনাকাল ধরিলে দুইটি গানের দাবি সর্বাগ্রে। একটি পূর্বে উল্লিখিত যশোরাজ-খানের গান। ইনি একটি কৃষ্ণচরিত কাব্য লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এই গানটি ছিল। সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগে এক বৈষ্ণব কবি পীতাম্বর দাস 'রসমঞ্জরী' নামে[২] বৈষ্ণব কবিতার আলঙ্কারিক রসবিচারের বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এই গানটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কবি হোসেন শাহার নাম করিয়াছেন সুতরাং ইহা তাঁহার রাজত্বকাল মধ্যে (১৪৯৩-১৫১৯) অবশ্যই লেখা। কৃষ্ণের গোষ্ঠ হইতে ফিরিবার সময় হইয়াছে, রাধা ব্যস্ত হইয়াছে দেখিবার জন্য। ব্যস্ততা এতটাই যে বেশভূষা সম্পূর্ণ করিবারও সময় নাই। কালিদাস কুমারসম্ভবে ও রঘুবংশে বর দেখিবার জন্য পুরনারীদের ব্যগ্রতা এমনি ভাবেই বর্ণনা করিয়াছিলেন।

এক পয়োধর চন্দন-লেপিত আরে সহজই গোর
হিম-ধরাধর কনক-ভূধর কোরে মিলল জোর।

[১] শ্রীযুক্ত করুণাকর কর সম্পাদিত 'প্রাচী' (দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় চতুর্থ সংখ্যা ১৯৩২)।

[২] প্রথম প্রকাশ সা-প প ৬ (১৩০৬)। পুস্তকাকারে নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত (১৩১২)। কালিদাস নাথ সম্পাদিত 'কীর্তনরত্নাবলী'তেও গানটি আছে।

মাধব তুয়া দরশন কাজে
আধ পসাহন[১] করত সুন্দরী বাহির দেহলী-মাঝে। ধ্রু।
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল রহল বাম
নীল ধবল কমল যুগলে চান্দ পূজল কাম।
শ্রীযুত হুসন জগতভুষণ সোই ইহ রস-জান
পঞ্চ-গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভনে যশরাজ খান॥

দ্বিতীয় গানটি নেপাল হইতে প্রাপ্ত এক বিদ্যাপতি-পদাবলী সংগ্রহে মিলিয়াছে।[২] গানটি ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের সভাকবি, "রাজপণ্ডিত" জ্ঞানের রচনা। অতএব ধন্যমাণিক্যের রাজ্যকালমধ্যে (১৪৯০-১৫২২) লেখা। রাধার দূতী উদাসীন কৃষ্ণকে মানিনী রাধার কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুনয় করিতেছে। মালব রাগে গেয়।

প্রথম তোহর প্রেম গৌরব গৌরব-বাড়লি গেলি
অধিক আদরে লোভে লুবুধলি চুকলি তে রতি-খেড়ি। ধ্রু।
খেমহ এক অপ- রাধ মাধব পলটি হেরহ তাহি
তোহ বিন জঞো অমৃত পিবএ তৈঞো ন জীবএ রাহি।
কালি পরশূ ঈ মধুর যে ছলি আজ সে ভেলি তীতি
আনহু বোলব পুরুষ নির্দয় [সহজে] তেজ পিরীতি।
বৈরিহু কে এক দোষ মরসিঅ রাজ-পণ্ডিত জ্ঞান
বারি-কমলা- কমল-রসিয়া ধন্যমাণিক[৩] জান॥

'তোমার প্রথম প্রেমের গৌরবে (সে) গৌরব-গর্বিত হইয়া গেল। বেশি আদরে লোভ-লুব্ধ হইল তাহাতে রতি খেলা চুকিয়া গেল। মাধব, এক অপরাধ ক্ষমা কর, ফিরিয়া রাধাকে দেখিবে চল। তুমি ছাড়া, যদি অমৃতও পান করে তবুও রাধা বাঁচিবে না। কাল-পরশু পর্যন্ত যে মধুর ছিল আজ সে তিত হইয়া গেল! অন্য লোকে বলিবে পুরুষটা নির্দয়, সহজে প্রেম উপেক্ষা করিল! শত্রুরও একটা দোষ ক্ষমা করিতে হয়। রাজপণ্ডিত জ্ঞান (বলিতেছে), বালিকা-কমলা-কমল-রসিক ধন্য-মাণিক্য (ইহার মর্ম) জানেন।'

আসামে কোন ব্রজবুলি গান ষোড়শ শতাব্দের আগে লেখা হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ নাই। শঙ্করদেব আসামের প্রথম ব্রজবুলি-গানের কবি। তিনি কয়েকটি ভালো নাট্যগীতি লিখিয়াছিলেন—এগুলি গীতিসর্বস্ব বলিলেও হয়। ইহার সম্বন্ধে আলোচনা পরে করিতেছি॥

---

[১] পরিচিত পাঠ 'আধ-পদচারি'। গৃহীত পাঠ শ্রীযুক্ত দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, কর্তৃক সংগৃহীত রসমঞ্জরীর পুথিতে পাইয়াছি। সম্ভবত মূল পাঠ ছিল 'আধ-পসাহনি'।

[২] শ্রীযুক্ত সুভদ্র ঝা সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি-গীতসংগ্রহ' (বনারস ১৯৫৪), Appendix A পৃ ক দ্রষ্টব্য।

[৩] পাঠ 'ধন্য মলিক'।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পৌরাণিক পাঞ্চালীর প্রাচীনতর কবি

১

পুরানো সাহিত্য ত্রিধারায় প্রবাহিত। প্রথম গীতিকবিতা, দ্বিতীয় পৌরাণিক গেয় অথবা পাঠ্য আখ্যায়িকা, তৃতীয় অ-পৌরাণিক গেয় কবিতা-আখ্যায়িকা। শেষ দুই ধারার রচনার রূপ বা ফর্ম প্রায় একই রকম এবং সে ফর্মের নামও এক, "পাঞ্চালী"। দেবতার আখ্যানময় পাঞ্চালী কাব্যের নামে নায়ক-দেবতার নামের পরে "মঙ্গল" কথাটি যুক্ত থাকে (কখনও কখনও "বিজয়", ক্বচিৎ "মঙ্গল" ও "বিজয়" দুইই)। এইজন্য এগুলির এখন নাম দাঁড়াইয়াছে "মঙ্গল" কাব্য। মঙ্গল শব্দটির অর্থ গৃহকল্যাণ। অতএব বোঝা যাইতেছে যে গোড়ার দিকে এই আখ্যায়িকাগুলি গার্হস্থ্য মাঙ্গল্য-কর্মের (অথবা ব্রতের) সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রাচীন কবিরাও তাই অনেকে নিজেদের রচনাকে "ব্রতগীত" বলিয়াছেন। "বিজয়" মানে দেবতার জয়যাত্রা অর্থাৎ জয়কাহিনী। কল্যাণের দিক দিয়া দেখিলে "মঙ্গল", ভক্তির চোখে দেখিলে "বিজয়"। "মঙ্গল" ও "বিজয়" দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর কাব্য মনে করা অত্যন্ত ভুল।

পাঞ্চালী নাম কেন হইল তাহা আগে বলিয়াছি। দেবপূজা-উৎসব উপলক্ষ্যে এসব কাহিনী দীর্ঘদিন ধরিয়া গীত-প্রযুক্ত হইত। কতক অংশ গানের মতো নাচের তালে গাওয়া হইত ("নাচাড়ি")। বাকি অংশ সুরে তালে আবৃত্ত হইত ("পয়ার" বা "শিকলি")। গ্রাম্যদেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে তাঁহাদের মাহাত্ম্য-কাহিনী গীত হইবার সময়ে আসরে একটি অথবা দুইটি ঘট রাখিয়া তাহাতে দেবাধিষ্ঠান কল্পিত হইত। যিনি অধিকারী তিনিই "মূল গায়ন"। তাঁহার হাতে থাকিত চামর, এক (অথবা দুই) পায়ে নূপুর। তাঁহার সহকারীরা "দোহার" বা "পালি"। ইহারা ধুয়া গাহিতেন এবং প্রয়োজন-মতো মৃদঙ্গ ও মন্দিরা বাজাইতেন।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি-উপাখ্যানে গঙ্গায় তরীবক্ষে শিব-পার্বতীর সভায় কালিয়দমন নাটগীতের যে বর্ণনা আছে তাহাতে দেবমাহাত্ম্য নাটগীতের প্রাচীনতম রূপটির আভাস পাওয়া যায়। এই বর্ণনার সহিত বৃহৎ-ধর্মপুরাণে

উল্লিখিত রাধাকৃষ্ণ-লীলাগানের বর্ণনার বেশ মিল আছে। মুকুন্দরামের বর্ণনায় কালিয়দমনে গান গাহিয়াছিলেন নারদ, পাখোয়াজ বাজাইয়াছিলেন গণেশ, নন্দী-ভৃঙ্গী করতাল। কৃষ্ণ সাজিয়াছিল ইন্দ্রের নর্তক মালাধর। আসরে কাঠের কালিয় সাপ রাখা হইয়াছিল। তাহার উপর উঠিয়া মালাধর কৃষ্ণবেশে নৃত্য করিয়াছিল। এই গীত-নাটে সেকালের নৃত্যাভিনয়ের নিদর্শন ও একালের যাত্রার প্রত্ন-নিদর্শন রহিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দের দেবমাহাত্ম্য গানে নাচের অংশ কমিয়া গিয়াছিল, যেটুকু ছিল তা নূপুর-পরা মূল-গায়নের কৃত্য। পাখোয়াজের বদলে মৃদঙ্গ বাজানো হইত। এই পরিবর্তনের মূলে কীর্তনের প্রভাব আছে।

উনবিংশ শতাব্দের মাঝের দিকে "মঙ্গল"-গান যেভাবে গাওয়া হইত তাহার যে বিবরণ হরিশচন্দ্র মিত্র দিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।[১]

> কেবল ৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়া নহে কবিকঙ্কণ ৺মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীকাব্য, রায়গুণাকর ৺ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল এবং দুর্গাপ্রসাদের দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর গায়কদল আজিও অনল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কাব্যের গায়কগণ ৭।৮ জনে সম্প্রদায় বাঁধিয়া গানের ব্যবসায় করিয়া থাকেন। এই ৭।৮ জনের মধ্যে একজন 'মূল গায়েন' বা গায়ক উপাধিক, অবশিষ্ট সকলকে 'দোয়ার' বলে। দোয়ারেরা তান লয় সুর সংশ্লিষ্ট ধূয়া গাইতে থাকেন, মূল গায়ক মূল কাব্যের কবিতা সকল সেই সকলে যোগ করিয়া বলিয়া যান। কখন কখন বা মূল গায়ক কথকতার ধরণে গদ্যে প্রস্তাবের সুসংলগ্নতা করিয়া লইয়া থাকেন। দোয়ারেরা মন্দিরা বা খোল বাজাইয়া তাল দিতে থাকেন। মূল গায়কের হস্তে একটি কৃষ্ণবর্ণ চামর থাকে, তিনি সময়ে সময়ে তাহা সঞ্চালন করিয়া কাব্যের বর্ণিত বিষয়ের ভাবভঙ্গী দর্শাইয়া থাকেন। এই সকল সম্প্রদায় রাঢ় অঞ্চলেই সুলভ। ইহার কারণ এই যে, যে সকল কাব্য-বর্ণিতরূপ কীর্তিত হইয়া থাকে, ঐ সকল কাব্যপ্রণেতৃগণ প্রায়ই রাঢ়দেশজ। সুতরাং রাঢ়াঞ্চলেই এই সকল কাব্যগাথক কবিদিগের কাব্যসকল রচনার পর হইতেই এ পর্যন্ত ধারাবাহিকরূপে সুলভ হইয়া আসিতেছে।

শুধু রাঢ় অঞ্চলেই নয়, একদা সমস্ত বাঙ্গালা দেশে (আসাম সমেত) এই গায়নরীতি প্রচলিত ছিল। আসামে মূল গায়নের নাম হইয়াছিল "ওঝা", দোহারের "পালি"। এই কারণে এই ধরণের গানকে আসামে এখনও "ওঝাপালি" গান বলে।

অষ্টাদশ-শতাব্দে পাঞ্চালী গান যে কীর্তনের দিকে কতটা ঝুঁকিয়াছিল তা রামেশ্বরের 'শিবসঙ্কীর্তন' (১৭১০) হইতে বুঝিতে পারি। শিবের শূল ভাঙ্গিয়া

---

[১] 'কৃত্তিবাসের পরিচয় সংগ্রহ', হরিশচন্দ্র মিত্র সংগৃহীত (ঢাকা, মে ১৮৭০)। নিতান্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকা, লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে রক্ষিত। শ্রীমান্ তারাপদ মুখোপাধ্যায় অনুলিপি করিয়া পাঠাইয়াছেন।

লাঙ্গলের ফাল গড়াইতে হইবে, তাহা না হইলে চাষ হইবে না। শিব শূল দিতে নারাজ। হৈমবতী শিবকে ভুলাইবার জন্য "কৃষ্ণের কীর্তন" গানের আসর পাতিলেন। গণেশ হইল মূল গায়ন, দেবতারা দোহার। নারদ তানপুরা লইয়া যোগ দিলেন। দেবী থাকিতে পারিলেন না, তিনি তাল দিতে দিতে ভাও বাৎলাইতে লাগিলেন। শিব সব ভুলিয়া নাচ জুড়িয়া দিলেন।

কৃপাময়ী কৃষ্ণের কীর্তন দিল জুড়্যা।
দেবগণ দোহার গণেশ গান মূল
নারদ তম্বুর হাতে হৈল অনুকূল।
ভাব করে ভবানী আপনি ধরে তাল
নৃত্য করে কৃত্তিবাস বাজাইয়া গাল।

ঢপ কীর্তনের সূত্রপাত বোধকরি এই রকমে।

২

কৃত্তিবাস ওঝার[১] 'শ্রীরাম-পাঁচালী' বা রামায়ণ-কাব্য লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঞ্চালী কাব্যের ইতিহাস শুরু হইয়াছে এই ধারণা এবং তদনুযায়ী কৃত্তিবাসের সময় নির্ধারণ অনেকগুলি অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে। কৃত্তিবাস (—উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত "কীর্ত্তিবাস" নামেই উল্লিখিত—) যে পুরানো কবি তাহা প্রথম জয়ানন্দের উক্তি হইতে জানিতে পারি। জয়ানন্দ তিন জন প্রাচীন কবির নাম করিয়াছেন—কৃত্তিবাস, গুণরাজ খান ও চণ্ডীদাস। জয়ানন্দ ষোড়শ শতাব্দের শেষার্ধের লোক। সুতরাং এই কবিদের অন্যূন পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ষোড়শ শতাব্দের প্রারম্ভে ফেলিতে হয়। গুণরাজের খবর আমরা জানি। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দের শেষার্ধে জীবিত ছিলেন। এখন ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দের প্রথমে ছিলেন। এই বিশ্বাস আসিয়াছে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর প্রকাশ এবং তদুপলক্ষ্যে পণ্ডিতদের আলোচনা হইতে। কিন্তু আত্মবিবরণীকে প্রামাণিক বলা যায় না, জোর করিয়া বলিলেও কালের অনুমান সিদ্ধ হয় না। কৃত্তিবাসের কাল-বিচারের আগে আত্মবিবরণীর সাক্ষ্য যাচাই করা আবশ্যক।

[১] রামায়ণ গান করিতেন বলিয়াই কি কৃত্তিবাস "ওঝা"? কিন্তু এ অর্থে শব্দটির বাঙ্গালায় ব্যবহার নাই, অসমিয়ায় আছে। তবে কি ইঁহার বংশ মৈথিল ব্রাহ্মণ? ষোড়শ শতাব্দেও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের "ওঝা" পদবী পাই সাধারণত পুরোহিত ও শিক্ষক-পণ্ডিত বুঝাইতে। নিত্যানন্দের পিতা ছিলেন "হাড়াই ওঝা"। ইনি কি মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন?

কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন—অংশত, প্রথম নয় ছত্র মাত্র—নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩০৫ সালে[১] তাঁহার 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'এর প্রথম খণ্ডে। নগেন্দ্রবাবুর কাছে পাইয়া দীনেশচন্দ্র সেন ইহা সমগ্রভাবে উদ্ধৃত করেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'এর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০১)। নগেন্দ্রবাবু আত্ম-বিবরণী পাইয়াছিলেন হারাধন দত্তের কাছে। হারাধনবাবু নাকি এটি ১৪৩২ শকাব্দে (১৫১০) লেখা কোন এক পুথিতে পাইয়াছিলেন! আত্মকাহিনী অংশটুকু টুকিয়া লইবার পরই নাকি এই সুপ্রাচীন পুথিটির তিরোভাব হয়। নগেন্দ্রবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁহার গ্রন্থাগারে এই আত্মবিবরণী একটি ছোট পুথিতে পাইয়া নলিনীকান্ত ভট্টশালী ছাপাইয়া দেন।[২] এই পুথিটি ১২৪০ সালে লেখা আন্ড-কাণ্ডের পুথির অংশ হওয়া সম্ভব। সামান্য একটু-আধটু অদল-বদল ছাড়া দীনেশ বাবুর ও নলিনীবাবুর পাঠ একই। আত্মকাহিনীর ভাষায় ১৪৩২ শকাব্দের চিহ্নমাত্র নাই। সুতরাং এ অনুমান অপরিহার্য হইতেছে যে ১২৪০ সালের তারিখ দেওয়া পুথিটিই হারাধন দত্তের "১৪২৩" শকাব্দের পুথি। প্রথম পাঠে অদল-বদল কে করিয়াছিলেন বলা শক্ত। নগেন্দ্রবাবু অথবা দীনেশ-বাবু অথবা নগেন্দ্রবাবু এবং দীনেশবাবু উভয়েই সম্পাদনচ্ছলে সংশোধন করিয়া থাকিবেন, অথবা "১২৪০" সালের পুথিতেই সংশোধন হইয়া থাকিবে।[৩] (সে কালে পাঠ সংশোধন অন্যায় এবং মূলপাঠ অগ্রাহ্য করা অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত না। একথা নগেন্দ্রবাবু ও দীনেশবাবুর পক্ষ হইয়া বলা উচিত মনে করি।)

আত্মবিবরণীর সত্যাসত্য বিচার করিবার আগে ইহার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। যথাযথ উদ্ধৃত না করিয়া এবং অপ্রয়োজনীয়, অসংলগ্ন ও স্পষ্টত আধুনিক প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিয়া আধুনিক গদ্যে প্রকাশ করিতেছি। পাদটীকায় বর্জিত অংশের এবং অবর্জিত বিশিষ্ট অংশের পাঠ দেওয়া হইল।

---

[১] এই "ভৌতিক" পুথিখানি দেখিবার জন্য যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, নলিনীবাবুও খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত 'মহাকবি কৃত্তিবাস রামায়ণ' আদিকাণ্ড (ঢাকা ১৯৩৬) ভূমিকা পৃ ।৶০ দ্রষ্টব্য।

[২] ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯, পৃ ৫৪৭-৫৬ দ্রষ্টব্য। '২৪' উল্টাইয়া লইলে এবং '৩' শূন্য ভাবিলে ১২৪০ হইতে ১৪২৩ পাওয়া যায়।

[৩] "১৪২৩ শকাব্দের" পুথির জন্য যখন সোরগোল চলিতেছে তখনও পুথিটি নগেন্দ্রবাবুর অধিকারে ছিল, কিন্তু তিনি কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। হারাইয়া গিয়া থাকিলে খুঁজিবারও চেষ্টা করেন নাই। ভাবিবার কথা বটে।

পূর্বেতে ছিলেন বেদানুজ মহারাজা, তাঁহার পাত্র ছিলেন নারসিংহ ওঝা।[১] বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল, সকলে অস্থির। বঙ্গদেশ ছাড়িয়া নারসিংহ গঙ্গাতীরে আসিলেন। গঙ্গাতীরে আসিয়া তিনি বসতি করিবার স্থান খুঁজিতে লাগিলেন। রাত্রি হইলে তিনি গঙ্গাতীরেই শুইয়া পড়িলেন। রাত্রি একদণ্ড থাকিতে ব্রাহ্মমুহূর্তে কুকুরের (কুঁকড়ার ?) ডাকে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।[২] উঠিয়া চারিদিকে তাকাইতেছেন এমন সময় আকাশবাণী শুনিলেন এবং তথাই রহিয়া গেলেন। সেখানে আগে মালি জাতি ছিল, তাহাদের বাস মালক।[৩] সেই গ্রামের নাম ফুলিয়া বলিয়া খ্যাত হইল। ফুলিয়া গ্রাম জগতের রম্য, তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গাস্রোত। ফুলিয়াতে বসতি করিবার পর ওঝার বংশ ধনে ধান্তে পুত্রে পৌত্রে বাড়িতে লাগিল। (নারসিংহের) পুত্র হইল গর্ভেশ্বর, তাহার তিন পুত্র—মুরারি সূর্য ও গোবিন্দ। জ্ঞানে কুলে শীলে ভূষিত মুরারির সাত পুত্র হইল। জ্যেষ্ঠ ভৈরব রাজসভায় খুব খাতির পাইয়াছিল। (মধ্যম) মুরারি মহাপুরুষ বলিয়া জগদ্বিখ্যাত—প্রভাবশালী, ধার্মিক, চরিত্রবান্, বহুগুণময়।[৪]

(মুরারির পুত্রদের মধ্যে) ধীর ও ভাগ্যবান্[৫] ছিলেন বনমালী। তিনি প্রথমে বিবাহ করিয়াছিলেন গাঙ্গুলী ঘরে। কুলে শীলে সম্ভ্রমে ঈশ্বরের প্রসাদে মুরারির সব পুত্রই উন্নতিশীল। (কৃত্তিবাসের) মাতার পাতিব্রত্যের যশ জগতে প্রশংসিত। ছয় সহোদর ভাই হইল, আর এক ভগিনী। কৃত্তিবাস সংসারে আনন্দ লইয়া আসিল। ভাই মৃত্যুঞ্জয় (একাদিক্রমে) ছয়রাত্রি উপবাসের ব্রত করে।[৬] সহোদর শান্তিমাধব সর্বত্র খ্যাতিমান। ভাই শ্রীকর (শ্রীধর) নিত্যই ব্রত উপবাস করে। বলভদ্র, চতুর্ভুজ ও ভাস্কর নামে (আরও) তিন ভাই। সংমায়ের গর্ভে আর এক ভগিনী হইল। মায়ের নাম মালিনী, বাপ বনমালী। ছয় ভাই জন্মিল সংসারে গুণশালী। নিজের জন্মরহস্য পরে বলিতেছি। মুখটি বংশের কথা আরও বলিবার আছে।

(গর্ভেশ্বরের মধ্যমপুত্র) সূর্য পণ্ডিতের ছেলে বিভাকর। সে সর্বজয়ী পণ্ডিত, পিতার মতো। সূর্যের (দ্বিতীয়) পুত্র নিশাপতির বড় প্রভুত্ব। তাহার ঘরে হাজার লোক হাজির। রাজা গৌড়েশ্বর তাহাকে ঘোড়া পুরস্কার দিয়াছিলেন, পাত্রমিত্রেরা "খাসা জোড়া" (অর্থাৎ উত্তম জোড় বস্ত্র) দিয়াছিলেন। গোবিন্দ (-পুত্র) জয়াদিত্য এবং বড়ঠাকুর সুন্দর।[৭] তাহার পুত্র বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা। ভৈরব-পুত্র গজপতি খুব ক্ষমতাশালী, তাঁহার কীর্তি সংসারে

---

[১] অতঃপর আছে "দেশের উপান্ত" ("দেশ যে সমস্ত" ১২৪০ পুথি) ব্রাহ্মণের অধিকার, বঙ্গভোগ ভুঞ্জিলেক সংসারের সার ("বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার" ১২৪০)। "রঙ্গভোগ" হইবে কি ?

[২] "আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি" ("১৪২৩" পুথি); "ব্রাহ্মণের মুখে শুনি কুকুরের ধ্বনি" (১২৪০ পুথি)। "ব্রাহ্মণের মুখে" নিশ্চয়ই হইবে "ব্রাহ্মমুহূর্তে"।

[৩] মালঞ্চ গ্রাম ফুলিয়ার পাশেই।

[৪] পাঠ "শুনে মহাগুণী" হইবে "গুণে মহাগুণী"। অতঃপর আছে "মদন-আলাপে" ("মদরহিত") ওঝা সুন্দর মুরতি, মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্র অবগতি।"

[৫] "১৪২৩ শকাব্দের" পুথির পাঠ "সুশীল ভগবান"।

[৬] চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা জয়ানন্দও তাঁহার বংশ-পরিচয়ের মধ্যেও একজনের দীর্ঘকাল-উপবাসের উল্লেখ করিয়াছেন।

[৭] "বড়ই সুন্দর" স্থানে পাঠ "বসুন্ধর" ("১৪২৩" পুথি)।

বারাণসী পর্যন্ত বিঘোষিত। মুখটি বংশের পদ্ধতি শাস্ত্র-অনুযায়ী। সে (পদ্ধতি) ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিক্ষা করে। কুলে শীলে প্রভুত্বে ব্রহ্মচর্যগুণে মুখটি বংশের যশ জগতে খ্যাত।

পুণ্য (অথবা পূর্ণ) মাঘ মাসে রবিবার শ্রীপঞ্চমী। সেই সময়ের মধ্যে পণ্ডিত কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিলেন।[১] শুভক্ষণে গর্ভ হইতে ভূতলে পড়িলাম। পিতা[২] উত্তম বস্ত্র দিয়া আমাকে কোলে লইলেন। দক্ষিণ যাইতে পিতামহের আনন্দ, তিনি কৃত্তিবাস নাম প্রকাশ করিলেন। এগার শেষ হইলে যখন বার বছরে পা দিলাম তখন উত্তর দেশে পড়িতে গেলাম। বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবারে পাঠের নিমিত্ত[৩] বড়গঙ্গা[৪] পার গেলাম। সেখানে আমি বিদ্যার উদ্ধার করিলাম। যেখানে যেখানে যাই সেখানে বিদ্যার আলোচনা করি।[৫] আমার শরীরে সরস্বতীর অধিষ্ঠান, নানা ছন্দ নানা ভাষা আপনা হইতে বাহির হয়।[৬] বিদ্যাসাঙ্গ করিতে ক্রমেই মন হইল, গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘর যাই। ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি চ্যবনের মতো গুরুর কাছে আমার বিদ্যা সমাপন।[৭] গুরু ব্রহ্মার মতো, বড় তেজস্বী। এমন গুরুর কাছে আমি বিদ্যা উদ্ধার করিতেছি।[৮] গুরুর কাছে বিদায় নেওয়া হইল মঙ্গলবার দিবসে। গুরু আমাকে অশেষ-বিশেষে প্রশংসা করিলেন। রাজপণ্ডিত হইব মনে এই আশা করিয়া রাজা গৌড়েশ্বরের কাছে সাত শ্লোক লিখিয়া দরোয়ানের হাতে পাঠাইয়া দিলাম এবং রাজার হুকুম প্রত্যাশা করিয়া দ্বারে খাড়া রহিলাম।[৯] বেলা যখন সাত ঘড়ি তখন রাজসভা ভঙ্গ হইল।[১০] সোনার সোঁটা-ধারী রাজদূত দৌড়াইয়া আসিয়া ডাকিল,—"কাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত[১১] কৃত্তিবাস? রাজার আদেশ হইয়াছে দেখা করিবে আইস।" নয় দরজা[১২] পার হইয়া রাজার কাছে গেলাম। সোনারূপার ঘর

---

[১] ১২৪০ সালের পুথির পাঠ "জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস"। উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার এই রকম প্রয়োগ চারি পাঁচ শত বছর আগে সম্ভব ছিল না। [২] "পিতামহ" ("১৪২৩" পুথি)।

[৩] পাঠান্তর "বারান্তর উত্তরে গেলাম" (১২৪০ পুথি)। ইহা "বারেন্দ্রর উত্তরে" হইতে পারে।

[৪] বড়গঙ্গা মানে পদ্মা।

[৫] পাঠান্তর "যথা যথা পাইলাম আমি বিদ্যার বিচার" (১২৪০ পুথি)।

[৬] অতঃপর ১২৪০ সালের পুথিতে অতিরিক্ত, "আকাশবাণী হইল সাক্ষাৎ সরস্বতী, তাহার প্রসাদে কণ্ঠে বৈসেন ভারথি।"

[৭] "বিদ্যার প্রসন" (১২৪০ পুথি)। প্রসন=প্রসঙ্গ।

[৮] বিদ্যা অর্জন অর্থে "বিদ্যার উদ্ধার" লক্ষণীয়। এই প্রয়োগের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর রূপকের ইঙ্গিত থাকিতে পারে।

[৯] ১২৪০ সালের পুথিতে আছে, "সাত শ্লোকে ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বর, সিংহসম রাজা আমি করিলাম গোচর। এ উক্তি পরের সঙ্গে খাপ খায় না। এমনি খাপছাড়াও বটে।

[১০] 'সপ্তঘটি বেলা যখন দিয়ানে ("দিয়ালে" "১৪২৩" পুথি) পড়ে কাটি"। চাবি অর্থে "কাটি" গ্রহণ করিয়াছি। নতুবা "দিয়ানে" স্থানে "দগড়ে" পাঠ কল্পনা করিতে হইবে। রাজা কবিকে সভাগৃহে আহ্বান করেন নাই, বিশ্রামস্থানে ডাকিয়াছিলেন। সুতরাং গৃহীত অর্থই গ্রহণীয়।

[১১] "মুখুটি" ("১৪২৩" পুথি)।

[১২] "বৃহন্দ" (১২৪০ পুথি), "দেউড়ি" ("১৪২৩" পুথি)। এখানে নয় দরজার কোন ঐতিহাসিক তাৎপর্য খোঁজা বৃথা। "নবদ্বার পুর" আমাদের প্রাচীনকালাগত কল্পনা।

দেখিয়া বিস্ময় লাগিল।[১] রাজার ডাইনে পাত্র (অর্থাৎ মন্ত্রী বা সভাসদ্) জগদানন্দ।[২] তাহার পিছনে ব্রাহ্মণ সুনন্দ বসিয়া আছে। বাঁয়ে কেদার খাঁ, ডাইনে নারায়ণ। (এই সব) পাত্র ও মিত্র লইয়া রাজা খোশমেজাজে রহিয়াছেন। গন্ধর্ব রায় বসিয়া আছেন যেন গন্ধর্ব অবতার। রাজসভায় পূজিত তিনি, তাঁহার অপার গৌরব। রাজার পাশে তিনজন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে। পাত্রমিত্র লইয়া রাজা পরিহাস করিতেছেন। ডাহিনে কেদার রায়, বামে তরণী[৩], (আশে পাশে) সুন্দর শ্রীবৎস প্রভৃতি ধর্মাধিকরণিক (অর্থাৎ বিচারপতি), রাজার প্রধান পণ্ডিত মুকুন্দ, সুন্দর[৪] মহাপাত্রের পুত্র জগদানন্দ (ইত্যাদি)। রাজার সভাসদ্বর্গ যেন দেবতার অবতার। দেখিয়া আমার মন চমৎকৃত হইল। পাত্রদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা আনন্দে আছেন। অনেক লোক রাজার সমুখে দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকে নৃত্যগীত চলিয়াছে, সব লোক খুশি, রাজবাড়িতে চারিদিকে লোকের আনাগোনা। আঙ্গিনায় রাঙ্গা মাদুর পাতা হইয়াছে, তাহার উপর রেশমের গদি,[৫] মাথার উপরে রেশমের শামিয়ানা। রাজা গৌড়েশ্বর মাঘ মাসে রোদ পোহাইতেছেন।

রাজার সামনে গিয়া আমি দাঁড়াইলাম। রাজা হাত নাড়িয়া কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। রাজা আজ্ঞা করিয়াছেন, (আগাইয়া আইস—এই কথা) পাত্র ডাকিয়া বলিল। আমি দ্রুতগতি রাজার কাছে উপস্থিত হইলাম। রাজার নিকট হইতে চারি হাত দূরে দাঁড়াইয়া আমি সাত শ্লোক পড়িলাম। গৌড়েশ্বর শুনিলেন। আমার শরীরে পাঁচ দেবতা অধিষ্ঠিত। সরস্বতীর অনুগ্রহে আমার মুখে অনর্গল শ্লোক বাহির হইতে লাগিল। সভায় আমি নানা ছন্দে শ্লোক পড়িলাম। শুনিয়া গৌড়েশ্বর (অবাক হইয়া) আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। নানামতে আমি নানা রসাল শ্লোক পড়িলাম। মহারাজা খুশি হইয়া ফুলের মালা দিলেন। কেদার খাঁ আমার মাথায় চন্দনের ছিটা দিলেন, গৌড়েশ্বর রাজা পট্ট উত্তরীয় দিলেন। গৌড়েশ্বর রাজা বলিলেন, কি দান দিব? পাত্র-মিত্র বলিলেন, যাহা বিহিত হয় (করুন)।[৬] পঞ্চ-গৌড় অধিকার করিয়া গৌড়েশ্বর রাজা, সে গৌড়েশ্বরের সংবর্ধনা পাইলেই তবে (যথার্থ) গুণের পূজা হয়। পাত্র-মিত্র (আমাকে) বলিলেন, শুন[৭] ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যাহা ইচ্ছা কর মহারাজার কাছে চাহিয়া লও।[৮] আমি কাহারও কিছু লই না, (দান) পরিহার করি। যেখানে যাই সেখানে গৌরবটুকুই সার (নিই)।[৯] সংসারে যত যত মহাপণ্ডিত আছে আমার কবিত্ব কেহ নিন্দা করিতে

---

[১] "১৪২৩" পুথিতে পাঠান্তর "গেলাম দরবারে, সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসন পরে ।"

[২] "জগতানন্দ" (১২৪০ পুথি)।

[৩] পাঠান্তর "তরুণি"।

[৪] ইহা ব্যক্তিনাম হইতে পারে, মুকুন্দের বিশেষণও হইতে পারে।

[৫] "তুলি" অর্থাৎ তোষক বা গদি (১২৪০ পুথি); "পাছুড়ি" অর্থাৎ চাদর ("১৪২৩" পুথি)।

[৬] ১২৪০ সালের পুথির পাঠান্তর, "পাত্র-মিত্র বলে গোসাঞি করিলে সম্মান"।

[৭] পাঠান্তর "পুন" (১২৪০ পুথি) অর্থহীন।

[৮] পাঠান্তর "যত খুজ তত দিতে পারে মহারাজে" (১২৪০ পুথি)।

[৯] অতঃপর ১২৪০ সালের পুথিতে চারি ছত্র অতিরিক্ত আছে,
"আকৃতি প্রকৃতি আমি যত অস্থিতি, পাটের পাছড়া পাইনু আমি চন্দন ভুসিতি।
ধন আজ্ঞা কৈলে রাজা ধন নাক্ষি লই, যথা যথা যাই আমি গৌরব সে চাহী।"

পারে না। সন্তুষ্ট হইয়া রাজা অভিজ্ঞান পুরস্কার ("সন্তক")[১] দিলেন এবং রামায়ণ রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন।[২] রাজ-অনুগ্রহ পাইয়া রাজবাড়ি হইতে বাহির হইলাম। লোকে অপূর্ব মনে করিয়া আমাকে দেখিবার জন্ম দৌড়াইয়া আসিল। আমাকে চন্দনে ভূষিত দেখিয়া সব লোক আনন্দিত হইল, বলিতে লাগিল, ধন্ম ফুলিয়ার পণ্ডিত।

মুনিদের মধ্যে (যেমন) বাল্মীকি মহামুনি প্রশংসিত পণ্ডিতদের মধ্যে (তেমনি) কৃত্তিবাস গুণী বলিয়া প্রশংসিত। বাপমায়ের আশীর্বাদে গুরুর অভিমতে[৩] রাজার আজ্ঞায় (কৃত্তিবাস) রামায়ণ গান রচনা করিল। সাতকাণ্ড রামায়ণ-কথা দেবতার সৃষ্ট[৪], তাহা সাধারণ লোককে বুঝাইবার জন্ম কৃত্তিবাস (দেশি ভাষায় রচনা) করিল। রঘুবংশের কীর্তি কে বর্ণনা করিতে পারে? কৃত্তিবাস সরস্বতীর বর[৫] পাইয়াই তবে রচনা করিল।

নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে বোঝা যাইবে যে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সিদ্ধান্ত—১২৪০ সালের পুথির পাঠকে বিকৃত করিয়া হারাধনবাবু, নগেন্দ্রবাবু অথবা দীনেশবাবু একত্র অথবা পৃথক্‌ভাবে "১৪২৩ শকাব্দের" পুথির পাঠ তৈয়ারি করিয়াছিলেন—ভ্রান্ত। কয়েক স্থানে শব্দের ও পদের পরিবর্তন হয়ত হইয়াছে। তবে "দিলেন সন্তোক" "রাজাজ্ঞায় রচে গীত" আধুনিক প্রক্ষেপ বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রথম বাঙ্গালা মহাভারত তো একরকম রাজাজ্ঞায়ই কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস লিখিয়াছিলেন। রামায়ণ-মহাভারত বাঙ্গালা দেশে রাজসভাতেই বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল মুসলমান-আমলের পূর্বে, সে কথা আগে বলিয়াছি। মুসলমান আমলের হিন্দুরাজা সে রীতি পুনঃপ্রচলিত করিবেন না কেন? প্রথম বাঙ্গালা রামায়ণ তো এই ভাবে রাজাজ্ঞায় রচিত হওয়াই তো ঐতিহাসিক যুক্তিসঙ্গত। নলিনীবাবু অত্যন্ত একদেশদর্শী (এবং দীনেশবাবুর প্রকাশিত পাঠের সর্বদোষদর্শী) না হইলে ১২৪০ সালের পুথির অত্যন্ত হাস্যজনক অপপাঠ "ব্রাহ্মণের মুখে শুনি কুঃকুরের ধ্বনি" গ্রহণ করিয়া "১৪২৩ শকাব্দের" পুথির পাঠ "আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি" সরাসরি অগ্রাহ্য করিতেন না।

সুতরাং দুইটি পুথির পাঠ কোন কোন অংশে অন্যোন্যনিরপেক্ষ বলিতেই হয়। তবে এ পাঠ দুইটির কোনটিই প্রাচীন নয়। দ্বিতীয়টির মতো প্রথমটিও ঊনবিংশ শতাব্দের কোন পুথিতে লব্ধ বলিয়া মনে করি।

---

[১] অর্থাৎ ভূমি দানপত্র কিংবা আংটি, বালা, তাড়, কুণ্ডল, হার ইত্যাদি অলঙ্কার।

[২] এই ছত্র দুইটি শুধু "১৪২৩" শকাব্দের পুথিতেই আছে, "সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক, রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥' ছত্র দুইটি হারাধন বাবুর নগেন্দ্রনাথ বাবুর অথবা দীনেশবাবুর প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। "সন্তোক" (=সন্তক) পুরানো শব্দ, উড়িয়াতেও আছে।

[৩] "গুরুর কল্যাণ" এবং "বাল্মীকি-প্রসাদে" (১২৪০ সালের পুথি)।

[৪] অর্থাৎ, দেবভাষায় (=সংস্কৃতে) রচিত। [৫] "বাল্মীকি-মুনিবরে" (১২৪০ পুথি)।

আত্মবিবরণীর পাঠ যেমন প্রাচীন নয় তেমনি প্রধানত অকৃত্রিমও (অর্থাৎ কৃত্তিবাসের লেখা) নয়। বর্ণনার মধ্যে অনেক পুনরাবৃত্তি আছে। তাহা ছাড়া মনে রাখিতে হইবে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর আগে (ষোড়শ শতাব্দের শেষার্ধ) দীর্ঘ আত্মকাহিনী কোথাও পাই না। মুকুন্দরামের আগেকার কবিরা আত্মকথা বলিতে শুধু নাম ও পিতৃপরিচয় দিয়া সারিয়াছেন এবং গ্রন্থরচনার জন্য যৎকিঞ্চিৎ কৈফিয়ৎ অথবা দোহাই দিয়াছেন। কৈফিয়ৎ দেশি ভাষায় লেখার জন্য, অথবা মূর্খ হইয়া পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশের জন্য। দোহাই গ্রন্থটিকে সাধারণের গ্রহণ-যোগ্য করিবার জন্য—অর্থাৎ এখনকার প্রশংসাপত্রের মতো—ব্যাসের অথবা দেবতার স্বপ্নাদেশ। মুকুন্দরামের সময় হইতে হইল দেবতার প্রত্যাদেশ—স্বপ্নে ও জাগরণে। সেই সঙ্গে রাজার ও পোষ্টার অনুরোধ তো আছেই। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে যে আত্মগর্বের প্রকাশ আছে তাহা পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্যত্র তো নাইই, সংস্কৃত সাহিত্য যেখানে অতিশয়োক্তির উচ্ছ্বাস কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানরহিত—সেখানেও নাই। এ সব ছত্র কিছুতেই মূল কবি কৃত্তিবাসের রচনা হইতে পারে না, ইহা অবশ্যই গায়নের প্রক্ষেপ। আত্মবিবরণীর গোড়ায় যে বংশ গৌরবগাথা আছে তাহাও নিশ্চয়ই কোন কুলজী-বিশারদ গায়নের সংযোজন। এ অংশ কৃত্তিবাসের রচনা মনে করা ঐতিহাসিক বোধের পরিচায়ক নয়। মুখটি বংশের যে প্রশংসা ইহাতে আছে তাহা ষোড়শ শতাব্দের অথবা পূর্ববর্তী কোন ব্যক্তির রচনা হওয়া সম্ভব নয়। আত্মবিবরণীতে মাঝে মাঝে উত্তম পুরুষের স্থানে প্রথম পুরুষের ব্যবহার আছে। তাহাও অকৃত্রিমত্বের অত্যন্ত বিরোধী। আসল কথা আত্মবিবরণীটি মুখটি বংশের কোন কুলজী-রচনার আধারে গড়া।

এখন রাজসভায় আসা যাক। রাজার সমস্ত সভাসদ হিন্দু, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ। সর্বদা "রাজা গৌড়েশ্বর" কদাপি সুলতান নয়। রাজসভায় আসবাব-পত্র ক্রিয়াকলাপ সমস্তই হিন্দু আমলের। সুতরাং রাজা হিন্দু। কে এই হিন্দু রাজা? নগেন্দ্রবাবু হইতে নলিনীবাবু পর্যন্ত সকলেই ধরিয়া লইয়াছেন যে এই হিন্দুরাজা "গৌড়েশ্বর" পঞ্চদশ শতাব্দের একমাত্র হিন্দু সুলতান "রাজা গণেশ"। নারসিংহের পোষ্টা "বেদানুজ"কে (—নামটির পাঠান্তর নাই এবং অর্থও হয় না—) "রায় দনৌজা" করিয়া হোক না হোক কোনওক্রমে ত্রয়োদশ শতাব্দে পৌঁছিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তাহার পর "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস" লইয়া সবলে বৃষদোহন চলিতে লাগিল। ফলে "তুলি তুহি পীঠা ধরণ ন

জাই”।[১]—যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অনেকগুলি তারিখ বাহির করিয়া ফেলিলেন। তাহা হইতে প্রয়োজন মতো বাছিয়া লওয়া হইল ১৩২০ শকাব্দ (অর্থাৎ ১৩৯৯ খ্রীস্টাব্দ)।[২] ইহাই কৃত্তিবাসের জন্মবৎসর বলিয়া এখন অনেকের বিশ্বাস।

বসন্তরঞ্জন রায় এই তারিখ মানিয়া লইতে পারেন নাই। নলিনীবাবু রাজসভার সদস্যদের উপেক্ষা করিয়াছিলেন। বসন্তবাবু দেখাইলেন এই নামের সভাসদ্ উত্তরবঙ্গের তাহিরপুরের জমিদার রাজা কংসনারায়ণের সভায় এবং হোসেন শাহার দরবারে পাওয়া যায়।[৩] সুতরাং তাঁহার মতে কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর রাজা কংসনারায়ণ। মুশ্‌কিল হইতেছে কংসনারায়ণ সম্বন্ধে তথ্য বিশেষ কিছুই জানা নাই। যতটুকু জানা যায় তাহাতে অসামঞ্জস্য ঘটে না এবং ১৪৩৩ খ্রীস্টাব্দ কৃত্তিবাসের জন্মশক ধরা চলে। নলিনীবাবু কুলজীর দোহাই দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলেন যে কংসনারায়ণ ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগের লোক। বসন্তবাবু নিরুত্তর রহিলেন।

কুলজী ঘাঁটিয়া কৃত্তিবাসের ১৩৯৯ জন্মশকাব্দের সমর্থন চেষ্টা হইয়াছে।

---

[১] অর্থাৎ, কাছিম দুইয়া এত দুধ হইল যে পাত্রে ধরিল না।

[২] কৃত্তিবাসের জন্ম তারিখ-গণনা ব্যাপার বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। বাঙ্গালা পুথিতে অনেক সময় "পুণ্য" ও "পূর্ণ" একই ভাবে লেখা হইয়া থাকে। তাহার ফলে "পুণ্য"কে "পূর্ণ" বলিয়া এবং "পূর্ণ"কে "পুণ্য" বলিয়া নেওয়া যায়। যোগেশবাবু প্রথমে "পূর্ণ মাঘ মাস" পাঠ অবলম্বনে গণনা করিয়াছিলেন। প্রথম ক্ষেপে (১৩১৮) কোন তারিখ উদ্ধার হয় নাই। দ্বিতীয় ক্ষেপে দুইটি তারিখ পাওয়া যায়, ১২৫৯ ও ১৩৫৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৩৩৭-৩৮ ও ১৪৩২-৩৩ খ্রীস্টাব্দ (সা-প-প ২০ পৃ ৩১৫-১৭)। দীনেশবাবুর "রাজা গণেশ" কম্‌প্লেক্‌স ছিল না। তিনি ১৪৩৩ খ্রীস্টাব্দ কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। যদিও এই সময়ে গৌড়ের পাটে কোন হিন্দুরাজার উদ্দেশ নাই।

বছর আঠারো কুড়ি পরে নলিনীকান্ত ভট্টশালী কৃত্তিবাসের গ্রন্থের মূলরূপ উদ্ধার কাজে ব্রতী হইলেন। তিনি দনুজমর্দন-গণেশ সম্বন্ধে যথেষ্ট ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়াছিলেন। আত্মবিবরণী পড়িয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল যে উক্ত গৌড়েশ্বর রাজা গণেশই। তিনি যোগেশবাবুকে অনুরোধ করিলেন আবার গণনা করিয়া দেখিতে। নলিনীবাবু নির্দেশ দিলেন, "দনুজমর্দন (= রাজা গণেশ) ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকে মুদ্রাপ্রচার করিয়াছিলেন। এই দুই বৎসর তাঁহার পূর্ণ প্রতাপের কাল। ইঁহারই সভায় কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন, ধরিতে হইবে। তৎকালে কৃত্তিবাসের বয়স ২০ হইতে ৩০ এর মধ্যে ছিল। অতএব ১৩০৮ হইতে ১৩২০ শকের মধ্যে এক শকে রবিবারে শ্রীপঞ্চমী হইয়া থাকিলে সে শকে কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল।" নলিনীবাবু আরও বলিয়া দিলেন, "পুণ্য মাঘ মাস" হইবে।

"পুণ্য" পাঠ ধরিয়া যোগেশবাবু আবার খড়ি পাতিলেন। যেসব তারিখ পাওয়া গেল তাহা হইতে সহজেই ফরমাস মতো বাছিয়া লওয়া হইল ১৩২০ শকাব্দ (সা-প-প ৪০ পৃ ১৩-১৪)। ঐতিহাসিকের বিবেক শান্ত হইল।

[৩] সা-প-প ৪০, পৃ ১১১-১২।

বাঙ্গালী ঐতিহাসিক পণ্ডিত যাঁহারা পুরানো বাঙ্গালার ইতিহাস লইয়া গবেষণা করেন তাঁহাদের—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া—প্রায় সকলেই নিদানে ভরসা কুলশাস্ত্র। সত্যের সঙ্গে মিথ্যা অনির্বিচারে মিশাইলে তাহা মিথ্যার অপেক্ষাও তুচ্ছ। ঘটকের পাঁজিকে ইতিহাসের কাজে লাগানো মানে মিথ্যার অপেক্ষা-তুচ্ছ যে অ-সাধ্য তাহার দ্বারা আর একটি সাধ্যকে সিদ্ধ প্রতিপন্ন করা। ইহা ন্যায়ের বিচারে বেদের নজির দেওয়ার মতোই বিচারমূঢ়তা।

বসন্তবাবু ঠিকই ধরিয়াছিলেন। আত্মবিবরণীতে উল্লিখিত সদস্যদের অনেককেই—নাম ধরিয়া—হোসেন শাহার সভায় (অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ দশকে গৌড়ে) পাইতেছি। মৈথিল পণ্ডিত বর্ধমান তাঁহার 'দণ্ডবিবেক' গ্রন্থে[১] মঙ্গলাচরণের চতুর্থ শ্লোকে কেদার রায়কে বলিয়াছেন গৌড়েশ্বরের "প্রতিশরীর"। আত্মবিবরণীতে "কেদার রায়" "কেদার খাঁ" দুই নামই আছে। এ দুই নাম এক ব্যক্তির হইতে পারে। এক জগদানন্দ রায়ের সংস্কৃত কবিতা রূপের পদ্যাবলীতে সঙ্কলিত আছে। ইনি আত্মবিবরণীর জগদানন্দ (রায়) হইতে পারেন। নারায়ণ দাস রাজবৈদ্য ছিলেন। ইহার পরে ইহার জ্যেষ্ঠপুত্র, চৈতন্যের ভক্ত, মুকুন্দ দাস সুলতান হোসেন শাহার খাশ চিকিৎসক (রাজবৈদ্য বা "অন্তরঙ্গ") হইয়াছিলেন। হোসেন শাহার রাজসভায় গন্ধর্ব রায়ের প্রতিপত্তি কুতবন তাঁহার মৃগাবতী কাব্যের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন।[২] ধর্মাধিকরণিক সুন্দর কৃত্তিবাসের খুল্লপিতামহ গোবিন্দের পুত্র হইতে পারেন। (সম্ভবত রাজসভায় কৃত্তিবাসের প্রতিপত্তিশালী একাধিক আত্মীয় ছিল।) রাজার প্রধান পণ্ডিত মুকুন্দ যদি মুকুন্দ ভট্টাচার্য হন তবে তাঁহার তিনটি শ্লোক রূপগোস্বামী সংকলিত পদ্যাবলীতে সঙ্কলিত আছে।

রাজসভার বর্ণনার ও সদস্যদের নামের যদি কোন বাস্তব ভিত্তি থাকে তবে ইহা কোন হিন্দু রাজা-জমিদারের, এবং হোসেন শাহার রাজ্যলাভের অনতিদূর কালের। হোসেন খাঁ সৈয়দ সামান্য অবস্থা হইতে সিংহাসনে উঠিয়া হোসেন শাহা হন। তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন সুবুদ্ধি রায় প্রভৃতি। এই সুবুদ্ধি রায় (বা সুবুদ্ধি মিশ্র) "গৌড়ের অধিকারী" (অর্থাৎ গৌড় শহরের কোতোয়াল) ছিলেন। তাঁর অধীনে সামান্য দারোগা ছিলেন হোসেন খাঁ।

---

[১] Gaekwad Oriental Series (দ্বাপঞ্চাশ খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

[২] "রায় জহাঁ লউ গংধ্রপ রহহী"। এই কথা হোসেন শাহার বর্ণনার পরেই আছে (পূর্বে পৃ ১০৫ দ্রষ্টব্য)।

হয়ত সুবুদ্ধি রায়ের নিজস্ব দরবারে (miniature court-এ) কৃত্তিবাস হাজির হইয়াছিলেন। আরও বেশি সম্ভব, কৃত্তিবাস পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের সন্ধিকালে কোন সময়ে উত্তরবঙ্গের কোন রাজা-জমিদারের সংবর্ধনা পাইয়াছিলেন। এই রাজা-জমিদারের সদস্যেরা পূর্বে বা পরে হোসেন শাহার পক্ষভুক্ত হইয়া থাকিবেন। এই অনুমানের সমর্থনে ১২৪০ সালের পুথিতে এবং কৃত্তিবাসের কাব্যের অন্য কোন কোন পুথিতে লব্ধ দুই ছত্র পেশ করিতেছি।

বরিন্দর[১] উত্তরে গেলাম বড় গঙ্গা পার
তথায় করিনু আমি[২] বিদ্যার উদ্ধার।

অর্থাৎ কবি বরেন্দ্রভূমি ছাড়াইয়া আরও উত্তরে গিয়াছিলেন পাঠ পড়িতে।

কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দের শেষপাদে বর্তমান ছিলেন এ অনুমানের সমর্থন অন্যদিকেও পাওয়া যায়। আত্মকাহিনীতে যে বংশ পরিচয় আছে তাহা সত্য হইলে তিনি নারসিংহ হইতে অধস্তন চারিপুরুষ: নারসিংহ—গর্ভেশ্বর—মুরারি—বনমালী—কৃত্তিবাস। জীব গোস্বামী 'বৈষ্ণবতোষণী'র শেষে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানি যে তাঁহার পিতা-পিতৃব্যেরা পদ্মনাভ হইতে তিন পুরুষ: পদ্মনাভ—মুকুন্দ—কুমার—সনাতন-রূপ-বল্লভ। ইহাদের পূর্বপুরুষ কর্ণাটদেশ হইতে (মিথিলা হইয়া?) আসিয়া শিখরভূমিতে (পঞ্চকোট অঞ্চলে) বাস করেন। সেখানে দুই এক পুরুষ বাস করিবার পর এক বংশধর পদ্মনাভ রাজা দনুজমর্দনের আগ্রহ-অভ্যর্থনায় শিখরভূমি ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে চলিয়া আসেন এবং নবহট্টে (সম্ভবত কাটোয়ার উত্তরে আধুনিক সীতাহাটির[৩] কাছে নৈহাটি গ্রামে) বাস করেন।[৪] আত্মবিবরণীর "বেদানুজ" রাজার সঙ্গে যদি দনুজমর্দনকে অভিন্ন মনে করা যায়[৫] তবে একটা সঙ্গতি হয় যে ইনি পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত হইতে অন্তত দুইজন ব্রাহ্মণকে গঙ্গাতীরে বাস করাইয়াছিলেন। দনুজমর্দন=রাজা গণেশ (সাক্ষাৎ রাজত্বকাল অন্তত পক্ষে ১৩৩৯-৪০ শকাব্দ)। কৃত্তিবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ সে সময়ে জীবিত

---

[১] ১২৪০ সালের পুথির পাঠ "বারান্তর" অর্থহীন। অন্যত্র পাঠান্তর "ছোট বরিন্দ ("বারিন্দ্র") বড় বরিন্দ ("বারিন্দ্র") বড় গঙ্গা পার।"

[২] পাঠান্তর "যথা তথা কর্‌্যা বেড়ান ("বেড়ায়")"।

[৩] এই সীতাহাটিতে বল্লালসেনের তাম্রপট্টশাসন পাওয়া গিয়াছে।

[৪] "বিহায় গুণিশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং স্ফুরৎসুরতরঙ্গিণীতটনিবাসপর্যুৎসুকঃ।
ততো দনুজমর্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদক্রমাদ্ উবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী।"

[৫] অপর পক্ষ ইঁহাকে "রায় দনৌজা" মনে করেন।

থাকিলে কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দের শেষের লোক হন। সনাতন-রূপ-অনুপমের[১] পিতামহ পদ্মনাভ নারসিংহের সমসাময়িক। ইহাদের সময় জানা। ইহারা দীর্ঘজীবী এবং বহুসন্তান কনিষ্ঠের বংশধর। সুতরাং কৃত্তিবাসের সঙ্গে ইহাদের প্রায় এক পুরুষের তফাৎ হয়। এখানে অনুমান করিতে ইচ্ছা যায় যে সনাতন-রূপ[২] বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে পর হোসেন শাহার সভার কোন কোন সদস্য গৌড় পরিত্যাগ করিয়া উত্তরে চলিয়া যান। সেখানে কোন রাজা-জমিদারের (কংসনারায়ণের ?) সভায় হয়ত কৃত্তিবাস ইহাদের দেখিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা নিছক অনুমান মাত্র। তবে যেখানে সবই অনুমানের বিষয় এবং সবাই অনুমান করিতেছে, আমিও কিছু করিলাম।

উপরের আলোচনার পরেও আর একটা সংশয়ের কথা তুলিব। গর্ভেশ্বরকে নারসিংহের পুত্র বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু তিনি হয়ত অধস্তন বংশধর। আত্মবিবরণীতে আছে

ধনধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়য় সন্ততি।
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হইল তাহার আলয়

"তাহার আলয়" কথাটির স্পষ্ট এবং একমাত্র অর্থ "তাহার ঘরে" অর্থাৎ "তাহার বংশে"। তাহা হইলে দেখিতেছি "বেদানুজ" রায় দনৌজা হইলেও গর্ভেশ্বর তাঁহার সমসাময়িক না হইতে পারেন।

কৃত্তিবাসের কাব্যের বিভিন্ন পুথিতে ভনিতায় এবং ভূমিকায় কৃত্তিবাসের পরিচয় অল্পস্বল্প পাওয়া যায়। তাহার সঙ্গে আত্মবিবরণীর মিল শুধু বংশের নামে, পিতামহের নামে, পিতার নামে, বাসগ্রামের নামে, সহোদরের উল্লেখে, বড়গঙ্গা পারে বরেন্দ্র ও উত্তর দেশে পড়িতে যাওয়ায়। মায়ের নাম পুথিতে আছে, আত্মবিবরণীতে নাই। আত্মবিবরণীকে বাদ দিলে আমরা কৃত্তিবাস সম্বন্ধে এই তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি।—

গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে মুখটি বংশে মুরারি ওঝার পৌত্র, বনমালীর পুত্র কৃত্তিবাস মানিকীর[৩] গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা ছয় ভাই।[৪]

---

[১] জ্যেষ্ঠ সনাতনের জন্ম আনুমানিক ১৪৭০ খ্রীস্টাব্দে।

[২] হোসেন শাহার বিশিষ্ট মন্ত্রী সনাতন, রূপ, কেশব খাঁ—ইঁহাদের কোন উল্লেখ আত্মবিবরণীতে নাই। ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

[৩] পাঠান্তরে পাওয়া যায়—মানিকা, মানকি, মেনকা।

[৪] ভাইদের সংখ্যায় ও নামে মতভেদ আছে। তবে সব পুথিতে একই কথা—কৃত্তিবাসেরা ছয় ভাই ছিলেন।

বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর
নিত্যানন্দ কৃত্তিবাস ছয় সহোদর।[১]

পাঁচ ভাই ছিলেন পণ্ডিত, কৃত্তিবাস ছিলেন গুণী।

পঞ্চ ভাই পণ্ডিত কৃত্তিবাস গুণশালী
অনেক শাস্ত্র পড়্যা রচে শ্রীরামপাঁচালী।[২]

দুই একটি পুথিতে এই যে ছত্র আছে ইহাতে কৃত্তিবাসের গুরুর নাম-ধাম পাঠবিকৃতির অন্তরালে লুকাইয়া আছে।—

রাড়া মধ্যে বন্দিনু আচার্যচূড়ামনি
যার ঠাঁই কৃত্তিবাস পড়িলা আপনি।[৩]

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ছাড়া আর কোন প্রাচীন গ্রন্থে কৃত্তিবাসের নাম নাই। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দের প্রথম ভাগ কৃত্তিবাসের জীবৎকালের সম্ভাব্য সর্বশেষ সীমা। 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'য় (১৮৭৭) রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন যে কৃত্তিবাস ১৪৬০ শকাব্দে (১৫৩৮) রামায়ণ-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই তারিখ তিনি কোথায় পাইলেন তাহা বলেন নাই। মনে হয় তিনি এখানে রামগতি ন্যায়রত্নকে অনুসরণ করিয়াছেন। ইনি 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' প্রথম খণ্ডে (১৮৭৩) লিখিয়াছিলেন

…অনেকে অনুমান করেন যে, চণ্ডী রচনার ৩০।৪০ বৎসর পূর্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। যদি এ অনুমান স্থির হয়, তবে মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে যে, ১৪৬০ শকে (১৫৩৮ খৃঃ অব্দে) রামায়ণের রচনা হয়। যেহেতু চণ্ডীকাব্যের সময় নিরূপণ কালে সপ্রমাণ করা যাইবে যে, উহা ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খৃঃ অব্দে) রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল॥[৪]

অষ্টাদশ শতাব্দের আগে লেখা কৃত্তিবাসের কাব্যের কোন পুথি পাওয়া যায় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০৮ সংখ্যক পুথি (অধুনা নিখোঁজ) ১৫ মাঘ ১৫০২ শকাব্দে (১৫৮১) লেখা হইয়াছিল বলিয়া পুষ্পিকায় নাকি নির্দেশ ছিল। নানাকারণে এ তারিখ অভ্রান্ত বলিয়া নেওয়া যায় না। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত্তিবাসের উত্তরকাণ্ড[৫] সম্পাদনে যে তিনটি পুথির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এই পুথি একটি। এই পুথি হইতে হীরেন্দ্রবাবু যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহাতে পুথিটিকে খুব প্রাচীন বলা যায় না। বরং তাঁহার প্রথম পুথিখানিতে (১০০৯ মল্লাব্দে=১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে লেখা) প্রাচীনতার ছাপ বেশি আছে বলিয়া মনে হয়। আদি-কাণ্ডের একটি পুথি ১৬২৬ শকাব্দে (১৭০৪)

[১] প ১২ (আদি কাণ্ড)। আত্মবিবরণীর এই অংশে "নামেতে" স্থানে "অনন্ত" পড়িতে হইবে।
[২] প ১২। [৩] ক ১৭১৭ (অযোধ্যা কাণ্ড)। [৪] প্রথম সংস্করণ পৃ ৭৫।
[৫] 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ (উত্তর কাণ্ড)' নামে প্রকাশিত (১৩১০)।

লেখা হইয়াছিল।[১] কৃত্তিবাসের কাব্যের পুথি সবই বিভিন্ন কাণ্ডের, সম্পূর্ণ কাব্যের পুথি অত্যন্ত দুর্লভ। সেই সুদুর্লভের মধ্যে একটি হইতেছে কৃত্তিবাসের কাব্যের—যতদূর জানা আছে—সবচেয়ে পুরানো পুথি। এটি ১৫৭১ শকাব্দে (১৬৪৯) লেখা।[২]

কৃত্তিবাসের কাব্য ছাপা হয় প্রথমে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে। ছাপা ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে শুরু হয় আর ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে শেষ হয়। এই জন্যই কি পাঁচখণ্ডে প্রকাশিত কাব্যটির প্রত্যেক খণ্ডের ইংরেজী নামপত্রে তারিখ আছে ১৮০২ আর বাঙ্গালা নামপত্রে ১৮০৩?[৩] দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় দুই খণ্ডে (১৮৩০-৩৪)। এই সংস্করণটি শ্রীরামপুর মিশনের ভূতপূর্ব পণ্ডিত এবং সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের সুবিখ্যাত অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ না দেখিয়া এবং দ্বিতীয় সংস্করণের উপর নির্ভর করিয়া কৃত্তিবাসের কাব্যের আলোচনাকারীরা (ন্যায়রত্ন হইতে ভট্টশালী পর্যন্ত) শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত সংস্করণের অযথা নিন্দা করিয়াছেন। আসল কথা শ্রীরামপুরের প্রথম সংস্করণের পাঠ প্রামাণ্য এবং ভালো পুথি থেকে নেওয়া। সকলেই ভুলিয়া গিয়াছেন যে কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রায় সাড়ে পনের আনা রকম পুথিই শ্রীরামপুরের ছাপা সংস্করণ হইতে অর্বাচীন।

আর একটি সর্বজনীন বিশ্বাস আছে যে কৃত্তিবাসের কাব্যের পুরানো বটতলা সংস্করণগুলি সবই শ্রীরামপুর সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। এ বিশ্বাস যে কতটা ভ্রান্ত তাহা নিম্নে প্রদত্ত তৌলন পাঠ-উদ্ধৃতি হইতে প্রতিপন্ন হইবে।

শ্রীরামপুর (১২০৩)	বটতলা (১৮৪৫)
রাজভোগ সুগ্রীব রাজা দিনে ২ জ্ঞান রাত্রি দিন রঘুনাথের সীতারে ধেয়ান। সোনার খাটে শোয় সুগ্রীব তাহে নেতের তুলি সীতা লাগি কাঁন্দেন রাম লোটাইয়া ধূলি। বাছের বাছের সুন্দরী সুগ্রীবের অভিলাষ সীতা লাগি কান্দেন রাম বরিষা চারি মাস। কান্দিতে ২ রাম হইল কাতর ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ্মণ দেন প্রবোধ উত্তর।	রাজভোগে সুগ্রীব আছেন কুতূহল বিনা ভোগে রামচন্দ্র শোকেতে বিকল। রাজ আভরণ পরে সুগ্রীব সকল রামের ভূষণ জটা পরণে বাকল। অপূর্ব খাটেতে শয্যা সুগ্রীব শয়ন ধূলাতে রামের শয্যা শোকে অচেতন। পরম সুন্দরী লৈয়া সুগ্রীব বিলাস সীতাকে স্মরিয়া রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস। লক্ষ্মণ বলেন প্রভু মন কর স্থির কেমনে জিনিবে দুষ্ট রাক্ষস শরীর।

[১] ক ৩৬৫২।

[২] নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত আদিকাণ্ড রামায়ণের ভূমিকা পৃ ১৵০-১৶০ দ্রষ্টব্য।

[৩] শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা আরও অনেক গ্রন্থে এইভাবে দুইরকম তারিখ পাওয়া যায়। বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট বা 'ধর্মপুস্তকের অন্তভাগ'এর একটি সংস্করণের নামপত্রে তারিখ আছে বাঙ্গালা হরফে ১৮৩২ এবং ইংরজী হরফে ১৮৩৩।

কৃত্তিবাস গাহিবার জন্য কাব্য লিখিয়াছিলেন, পড়িবার জন্য নহে। "গুণশালী" কথাটির যদি কৃত্তিবাসের বিশেষণরূপে কোন সার্থকতা থাকে তবে বুঝিব তিনি নিজেও রামায়ণ গাহিতেন। রামায়ণ রচনা ও গান বরাবর ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি ছিল ও আছে। কিন্তু এ বৃত্তি শুরু কখন হইতে জানি না। আসল কথা কৃত্তিবাসের রামায়ণ কবে লেখা হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা আপাতত সম্ভব নয়। কৃত্তিবাসের কথা বাদ দিলে বাঙ্গালা সাহিত্যে রামকথা প্রথম পাওয়া যায় মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে (১৪৮০ খ্রীস্টাব্দ)।

কৃত্তিবাসের কাব্যের মূলরূপ খুঁজিবার চেষ্টা হইয়াছে।[১] হীরেন্দ্রনাথ দত্ত করিয়াছেন, নলিনীকান্ত ভট্টশালীও করিয়াছেন। কিন্তু কেহই মূলে পৌছাইতে পারেন নাই। কাব্যের জনপ্রিয়তার এ বড় কঠিন মূল্য। গায়কের পর গায়ক, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, পাঠ বদলাইয়া চলিয়াছেন। সেই অনুসারে পুথিও বদলাইতেছে। সে পুথি সবই অনেক কবি-গায়কের রচনায় স্ফীত। কৃত্তিবাসের প্রাচীন পুথিতেও দ্বিজ মধুকণ্ঠ, প্রসাদ দাস ইত্যাদি অনেকের ভনিতা পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া অদ্ভুত-আচার্য প্রভৃতি পরবর্তী রামায়ণ-কাব্য লেখকের রচনাও ঢুকিয়া গিয়াছে। এমন অবস্থায় বলিতে বাধ্য হইতেছি যে কৃত্তিবাসের কাব্যের যে-সব পুথি আমরা পাইয়াছি তাহাতে ভনিতা ছাড়া আর কিছু খাঁটি (অর্থাৎ মূল রচনা) অব্যাপন্ন রহিয়া যায় নাই। সুতরাং কৃত্তিবাসের কাব্যের প্রশংসা মানে রামকথার প্রশংসা, বাঙ্গালায় রামায়ণ-পাঞ্চালীর প্রশংসা। সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠককে একথা অবশ্য স্মরণে রাখিতে হইবে।

কৃত্তিবাসের কাব্যের মূলের কথা দূরে থাক তেমন প্রাচীন রূপও পাই নাই। হয়ত সে ভালোই হইয়াছে। গায়ন-লিপিকরেরা কৃত্তিবাসের বাণীকে আপন কণ্ঠে বরণ করিয়া লইয়া পুরুষে পুরুষে তাহাতে নবীনতার সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া আসিয়াছেন। জাহ্নবীর প্রবাহের মত সে রামকথা কালের বাঁকে বাঁকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাঙ্গালী মানুষের জীবনে আনন্দসরসতা সেবন করিয়া আসিয়াছে। কৃত্তিবাসের কাব্য যাহাদের হাতে বারে বারে নবকলেবর ধারণ করিয়া ফিরিয়াছে তাহাদের একজনের কথাতেই কবির পরম পুরস্কার।

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সকরুণ বাণী
হিয়া তোলপাড় করে চক্ষে পড়ে পানি।[২]

---

[১] নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত আদিকাণ্ড যাহাকে বলে composite text তাহাই। কিন্তু এ প্রচেষ্টারও মূল্য আছে।

[২] বি ৮০২।

৩

কৃত্তিবাস যদি পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ ভাগের লোক হন তবে তাঁহার সমকালেই আসামে রামকথা প্রথম রচিত হইয়াছিল বলা যায়। এই প্রথম অসমিয়া রামায়ণ-কাব্যের কবি মাধব কন্দলি "বরাহ-রাজা" মহামাণিক্যের সভাসদ ছিলেন এবং কৃত্তিবাসের মতোই (?) রাজাজ্ঞায় শ্রীরাম-পাঞ্চালী লিখিয়াছিলেন। কে যে এই বরাহ-রাজা মহামাণিক্য তাহা নির্ণয় করা যায় নাই। আসামের প্রাচীন রাজারা নারায়ণের বরাহ-অবতারের পৌত্র ভগদত্তের বংশধর বলিয়া গৌরব করিতেন। বরাহ-রাজা বলিলে আসামের অথবা ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী কোন অঞ্চলের রাজা বুঝাইবে। অনেকে বলেন কাছাড়ের রাজবংশের কোন রাজাই এই বরাহ-রাজা। ত্রিপুরার সঙ্গে কাছাড়ের একদা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ত্রিপুরার ধন্যমাণিক্য (রাজত্বকাল ১৪৯০-১৫২২) সাহিত্য-সংস্কৃতির পোষক ছিলেন। তিনি (অথবা তাঁহার পিতা) এই "মহামাণিক্য" হইতে পারেন।

মাধব কন্দলির রামায়ণের সব কাণ্ড পাওয়া যায় নাই।[১] তিনি আদি কাণ্ড হইতে ধারাবাহিকভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, তবে "সাতকাণ্ড রামায়ণ" বলিলেও তিনি যে লঙ্কা-কাণ্ডেই শেষ করিয়াছিলেন তাহা বোঝা কঠিন নয়। লঙ্কা-কাণ্ডের শেষে রামসীতার মিলন করাইয়া ও আত্মপরিচয় দিয়া মাধব কাব্য সমাপন করিয়াছিলেন।

কবিরাজ-কন্দলি যে আমাকে সে বুলিবয়
করিলোহোঁ সর্বজন বোধে
রামায়ণ সুপয়ার শ্রীমহামাণিক্যো যে
বরাহ-রাজার অনুরোধে।
সাতকাণ্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলোঁ
লম্ভা[২] পরিহরি সারোদ্ধৃত
মহামাণিক্যর বোলে কাব্যরস কিছো দিলোঁ
দুগ্ধক মথিলে যেন ঘৃত।

---

[১] অযোধ্যা অরণ্য কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কা কাণ্ডের পুথি পাওয়া গিয়াছে (হেমচন্দ্র গোস্বামী সঙ্কলিত *Descriptive Catalogue of Assamese Manuscripts,* ১৯৩০, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, দ্রষ্টব্য)। অযোধ্যা কাণ্ডের একটি পুথি বেশ পুরানো, ১৫২৬ শকাব্দে (১৬০৪) লেখা। মাধবচন্দ্র বরদলই যে, 'অসমিয়া সাতকাণ্ড রামায়ণ' প্রকাশ করিয়াছিলেন (কলিকাতা ১৮৯৯) তাহার উত্তর-কাণ্ড শঙ্করদেব রচিত। লঙ্কা-কাণ্ড ছাড়া অন্যত্র মাধব কন্দলির ভনিতা প্রায় নাই। বেশ কিছু প্রক্ষেপ আছে বলিয়া বোধ হয়।

[২] 'লঙ্কা' (অর্থাৎ অলঙ্কার বা বাহুল্য) ?

পণ্ডিত লোকর যেবে অসন্তোষ উপজয়
হাতযোরে বোলোঁ। শুদ্ধ বাক
পুস্তক বিচারি যেবে তৈত কথা নপাবাহা
তেবে সভে নিন্দিবা আমাক।...
অগনিত পরীক্ষিয়া সীতাক অযোধ্যা নিয়া
সকুটুম্বে ভৈলা একঠাঁই
মাধব কন্দলি গাইলা শ্রীরামে অযোধ্যা পাইলা
জয় জয় আনন্দ বাধাই।

'যাহাকে মাধব কন্দলি বলা হয় সেই আমি সর্বজন বুঝিবার জন্য বরাহরাজা শ্রীমহামাণিক্যের অনুরোধে উত্তম পয়ার প্রবন্ধে রামায়ণ রচনা করিলাম। সাতকাণ্ড রামায়ণ পদবন্ধে[১] নিবদ্ধ করিলাম, অবান্তর পরিহার করিয়া সার (ইহাতে) উদ্ধৃত হইয়াছে। মহামাণিক্যের কথায় কিছু কাব্যরস দিলাম। দুধ মন্থন করিলে ঘৃত হয় (তেমনি)। (রামকথা সংক্ষেপে সারিয়াছি শুনিয়া) পণ্ডিত ব্যক্তির মনে যদি অসন্তোষ উৎপন্ন হয় তবে, আমি হাত জোড় করিয়া যথার্থবাক্য বলিতেছি, পুস্তক দেখিয়া যদি কোন প্রসঙ্গ না পাও তখন সকলে আমাকে নিন্দা করিও।...

'অগ্নিতে পরীক্ষা করিয়া সীতাকে অযোধ্যায় আনিয়া (রাম) আত্মীয়স্বজনের সহিত একত্র হইলেন। মাধব কন্দলি গাহিলেন, শ্রীরাম অযোধ্যা পৌঁছিলেন, জয় জয় আনন্দ উৎসব (লাগিল)।'

শঙ্করদেব উত্তরকাণ্ড লিখিয়া মাধব কন্দলির কাব্যকে সম্পূর্ণতা দিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান হয় মাধব কন্দলি কম পক্ষে ষোড়শ শতাব্দের প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন॥

৪

কৃত্তিবাস ও মাধব কন্দলির প্রসঙ্গে পূর্বভারতে রাম-উপাসনার কথা আসে। কৃত্তিবাসের নামে যে রচনা আমাদের পরিচিত তা আদ্যন্ত ভক্তিরসপ্লুত, এবং সে ভক্তিরস কতটা মূল কাব্য হইতে উৎসারিত জানি না, তবে ষোড়শ শতাব্দের প্রারম্ভ হইতে এ দেশে ভক্তিরসের যে প্লাবন বহিয়াছিল তাহা কৃত্তিবাসের রামকথাকে পরিষিক্ত করিয়াছে। মাধব কন্দলির কাব্যে যে ভক্তিরস তাহাও রামপূজাসম্মত নয়, বিষ্ণুভক্তিনিঃসৃত। বিষ্ণুর অবতার বলিয়া রাম বহুকাল ধরিয়া বন্দিত। তবে রাম-নামের মন্ত্রবৎ ব্যবহার (—যেমন বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেব, কৃষ্ণ, যাদব—) খুব প্রচলিত ছিল না। ভারতবর্ষে মুসলমান অধিকারের সময় হইতেই দানবদলন রাম-নামের মাহাত্ম্য স্বীকৃত হইয়াছে। রম্ ধাতু (—অর্থ বিরাম বিশ্রাম চিত্তবিনোদন করা, শান্ত হওয়া—) হইতে উৎপন্ন "রাম" নামটি ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম অর্থে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মিষ্টিক সাধকেরা সবিশেষ ব্যবহার করিতে থাকেন। মুসলমান মিষ্টিক সাধকদেরও এই নামে আপত্তি

ছিল না। এ সব ব্যাপার অনেকটা যুগের হাওয়ায় ভাসিয়া আসে। সুতরাং মনে করিতে পারি, পূর্বভারতে রাম-নামের মাহাত্ম্য স্বতই জাগিয়া উঠিয়াছিল। চৈতন্যের আবির্ভাবের আগে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণবদীক্ষা দুই রকমের ছিল—এক কৃষ্ণ-মন্ত্রে আর এক রাম-মন্ত্রে। রাম-মন্ত্রের দীক্ষা উত্তরপূর্ব বঙ্গে ও আসামে বেশি প্রচলিত ছিল। শঙ্করদেব কৃষ্ণ-উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিলেও রামনামের মাহাত্ম্য ওখানে খর্ব হয় নাই।

চৈতন্যের বাল্যসহচর ও প্রধান পরিষদের মধ্যে একজন দীক্ষিত রামনিষ্ঠ ছিলেন। ইনি মুরারি গুপ্ত। চৈতন্য ইহার মন বুঝিবার জন্য কৃষ্ণ ভজিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাতে মুরারি দ্বিধায় পড়িয়া যান—একদিকে তাঁহার রামনিষ্ঠা অপরদিকে সাক্ষাৎ চৈতন্যের আদেশ। মুরারি ঠিক করিলেন, দুই দিক রাখিবার শ্রেষ্ঠ পন্থা আত্মহত্যা। মুরারির সংকল্প জানিতে পারিয়া চৈতন্য তাঁহাকে প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন। মুরারি সিলেট হইতে আসিয়া নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার রামনিষ্ঠা সেই স্থান হইতে লব্ধ হইতে পারে।

সেনরাজাদের আমল হইতে মন্দিরচিত্রে রামকথা বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু রামের (বা রামসীতার) মূর্তিপূজা সেনরাজাদের আমলেও অজ্ঞাত ছিল। অনুমান করি এরকম পূজা (—বাঙ্গালাদেশে খুব কমই দেখা গিয়াছে—) রামায়েৎ সাধুদের দ্বারা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দেই প্রচারিত হইয়াছিল। রামমূর্তির পূজা উত্তরপশ্চিম হইতে আসিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। মোগল আমলে আগরা-অযোধ্যার অনেক ক্ষেত্রী রাজপুত এদেশে যুদ্ধ অথবা ব্যবসা করিতে আসিয়া রহিয়া যায়। ইহাদেরই দানে ও পোষকতায় স্থানে স্থানে যে রামায়েৎ সাধুর "অস্থল" স্থাপিত হয় বিশেষ করিয়া তাঁহারাই রাম-উপাসনা নূতন করিয়া জাগাইয়া তোলেন। এই রকম রামায়েৎ ঘাঁটির মধ্যে সব চেয়ে পুরানো বোধ করি চন্দ্রকোনা—পশ্চিম বাঙ্গালার সুপ্রাচীন শিবপুরী॥

৫

পঞ্চদশ শতাব্দে কৃষ্ণভক্তির নূতন স্রোত বহিয়া আসিল ভাগবত-পুরাণকে উৎস করিয়া। এই স্রোতের মুখ যিনি প্রত্যক্ষত খুলিয়া দিয়াছিলেন তিনিই চৈতন্যের আগমনের পথ তৈয়ারি করিয়াছিলেন। ইনি মাধবেন্দ্র পুরী, অদ্বৈতমতে দীক্ষিত সন্ন্যাসী কিন্তু কৃষ্ণরসে ভরপুর। কোথায় ইহার দেশ জানা

নাই। বাঙ্গালী হইতে পারেন, দক্ষিণের লোকও হইতে পারেন। গোবর্ধনে ইনি গোপালমূর্তি প্রকট করাইয়া সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গোপালের সেবার জন্য চন্দন কাঠ আনিতে তিনি দুইচারি বছর অন্তর দ্রাবিড় দেশে যাইতেন। তাঁহার গতায়াতের পথ ছিল গঙ্গা ধরিয়া রাঢ় পর্যন্ত আসিয়া তাহার পর সোজা দক্ষিণ মুখে রাস্তা ধরিয়া বালেশ্বর-কটক-পুরী হইয়া। মাধবেন্দ্র অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। সে প্রভাব তাহার ভক্তিরসপ্লুতি হইতে। তাঁহার গতায়াতের সূত্রে পঞ্চদশ শতাব্দের শেষের দিকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার কাছে ভক্তিদীক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন অদ্বৈত আচার্য, চৈতন্যের মাতার ও ভ্রাতার গুরু এবং তাঁহার সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ ও প্রভাবশালী সহায়ক। আর একজন, মনে হয়, কুলীনগ্রামের গুণরাজ খান (ইহার সম্বন্ধেও পরে আলোচনা করিতেছি)। অনেকে মনে করেন চৈতন্যের দক্ষিণহস্ত নিত্যানন্দও মাধবেন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। আরও মনে হয় গৌড়-স্থলতানের চাকরি করার সময়ে সনাতন এবং রূপ মাধবেন্দ্রের দর্শন পাইয়াছিলেন, এবং হয়ত মাধবেন্দ্রের দ্বারাই ভাগবত বাঙ্গালা দেশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। ভাগবতিয়া বৈষ্ণব বলিতে যাহা বোঝায় মাধবেন্দ্র পরিপূর্ণ ভাবে তাহাই ছিলেন।

এবংব্রতঃ স প্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়তি উন্মাদবন্ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥[১]

'এই নিষ্ঠা লইয়া তিনি প্রিয়ের নাম কীর্তন করিতে করিতে অনুরাগ ভরে আকুলচিত্ত হইয়া অট্টহাস্য করেন, রোদন করেন, বিলাপ করেন, গান করেন, সংসার-ছাড়া পাগলের মতো নৃত্য করেন।'

মাধবেন্দ্র পুরীর কয়েক জন সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। তাঁহারাও গুরুর ভক্তি-রসমহিমা কমবেশি পাইয়াছিলেন। চৈতন্য দক্ষিণভ্রমণের সময়ে পণ্ঢরপুরে খবর পাইলেন যে মাধবেন্দ্র পুরীর এক শিষ্য শ্রীরঙ্গ পুরী এক ব্রাহ্মণের ঘরে রহিয়াছেন। চৈতন্য দেখা করিতে গেলেন এবং গুরুর গুরুভাই বলিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিতে গিয়া ভক্তিভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীরঙ্গ পুরী বিস্মিত হইয়া চৈতন্যকে সাদরে উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি নিশ্চয়ই আমার গুরুর সম্পর্ক রাখেন।

শ্রীপাদ ধরহ আমার গুরুর সম্বন্ধ
তাঁহা বিনু অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ।[২]

চৈতন্য তখন ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ জানাইলেন।

মাধবেন্দ্র পুরীর মুখ্য এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য ঈশ্বর পুরী চৈতন্যের দীক্ষা-গুরু। গয়ায় ইহার কাছে দীক্ষা লইয়া অবধি চৈতন্যের অধ্যাত্মজীবনের

---

[১] ভাগবত ১১.১-৩৮। [২] চৈতন্যচরিতামৃত ২-৯।

আরম্ভ। মাধবেন্দ্র পুরী শেষ অবস্থায় ঈশ্বর পুরীর পরিচর্যাই গ্রহণ করিতেন।[১] মৃত্যুর প্রাক্‌কালে মাধবেন্দ্র প্রিয়বিরহকাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের রচিত একটি শ্লোক বলিতেছেন শুনিয়া তাঁহার আর এক শিষ্য রামচন্দ্র পুরী তাঁহাকে বলিয়াছিল, "ও সব কি বকিতেছেন, ব্রহ্মস্মরণ করুন, আপনি চিদ্‌ব্রহ্ম হইয়া কাঁদিতেছেন?" শুনিয়া মাধবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, "দূর হ পাপিষ্ঠ। আমি কৃষ্ণ না পাইয়া নিজের দুঃখে মরিতেছি আর এই মূর্খ বেটা আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ দিতে আসিল!"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে সেই শ্লোকটি বলিতে বলিতেই মাধবেন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন—"সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোক সহিতে"। শ্লোকটি এই।

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌।

'ওগো দীনদয়াল স্বামী, ওহে মথুরানাথ, কবে দেখা দিবে? প্রিয়, তোমায় অদর্শনে কাতর হৃদয় যে মথিত হইতেছে! কি করি আমি!'

মাধবেন্দ্র পুরী যে পথে দক্ষিণে গমনাগমন করিতেন সে পথের পাশেই পড়ে কুলীনগ্রাম। কুলীনগ্রামে গুণরাজ খান মাধবেন্দ্রের দর্শনলাভ করিয়া থাকিবেন। চৈতন্যের জন্মের ঠিক আগে পশ্চিম বাঙ্গালায় কুলীনগ্রাম ছিল প্রধান বৈষ্ণব স্থান। "যবন" হরিদাসও কিছুকাল এই স্থানে ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কুলীনগ্রামের প্রশংসায় লিখিয়াছেন

কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়।

৬

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ গুণরাজ খানের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'[২] ('গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল') কাব্যের উল্লেখ পাই জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আর কৃষ্ণদাস

[১] চৈতন্যচরিতামৃত ২-৮।

[২] "সভ্রাত" রাধিকানাথ দত্ত কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত, চৈতন্যাব্দ ৪০১ (১৮৮১)। প্রকাশক 'উপক্রমণিকা'য় বলিয়াছেন যে হারাধন দত্তের সংগৃহীত ১৪০৫ শকাব্দে লেখা পুথি অবলম্বিত হইয়াছে। ভাষায় নবীনত্বের চিহ্ন (যেমন বহুবচনে "-রা", "-দিগ") নাই। বানানে আধুনিক রূপ আছে। অনেক কাল পরে দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে (১৯৪৫), সম্পাদক শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ। কয়েকটি পুথির পাঠান্তর থাকায় এই সংস্করণটি মূল্যবান হইয়াছে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একটি সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৪৪)। ১০১৩ মল্লাব্দে (১৭০৮) লিখিত (ক ৯৫০) একটি মাত্র পুথির পাঠ এই সংস্করণে গৃহীত হইয়াছে।

কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে।[১] কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন যে চৈতন্য নীলাচলে গুণরাজ খানের পুত্র সত্যরাজ খান এবং পৌত্র রামানন্দ বসুকে সংবর্ধিত করিয়াছিলেন কুলীনগ্রামবাসী ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচয়িতা গুণরাজের বংশধর বলিয়া। এই প্রসঙ্গে তিনি কাব্য হইতে একছত্র আবৃত্তিও করিয়াছিলেন। সেটি হইল প্রথম হইতে চতুর্থ ছত্র। (পূর্ববর্তী রচনা হইতে উদ্ধৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যে এই-ই প্রথম।)

নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।

অসংখ্য কৃষ্ণমঙ্গল রচিত হওয়া সত্ত্বেও এই প্রাচীনতম কৃষ্ণলীলাকাব্যটির সমাদর অষ্টাদশ শতাব্দের গোড়া পর্যন্ত অটুট ছিল। পরবর্তী কালের কোন কোন কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের পুথিতে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অংশ পরিগৃহীত হইয়াছে।

গুণরাজ খানের ভনিতায় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত শ্রীরাম-পাঁচালী কাব্য পাওয়া গিয়াছে। ইহার সর্বাপেক্ষা পুরাতন পুথির লিপিকাল ১৬০১ শকাব্দ (১৬৭৯)। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে সংক্ষেপে রামকথা আছে। ইহা তাহারই বিস্তৃত সংস্করণ বলিয়া মনে হয়। স্বতন্ত্র পুথিতে রচনাটির নাম 'ধর্ম-ইতিহাস'।

কাব্যের আদ্যে ও অন্তে কবি নিজের কথা কিছু কিছু বলিয়াছেন। "গুণরাজ খান" তাঁহার উপাধি, আসল নাম মালাধর বসু। "গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান"। এই গৌড়েশ্বর সুলতান রুকনু-দ্-দীন বার্‌বক শাহা (১৪৫৯-১৪৭৪) বলিয়া মনে করি।[২] নিবাস কুলীনগ্রাম (আধুনিক বর্ধমান জেলার পূর্বদক্ষিণ প্রান্তে), বাপের নাম ভগীরথ, মায়ের নাম ইন্দুমতী। "হৃদয়নন্দন" পুত্র সত্যরাজ খান। জাতি কায়স্থ। স্বপ্নে ব্যাসের আদেশ পাইয়া মালাধর কাব্যকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য,

ভাগবত-অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া।
ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি
তে-কারণে ভাগবত গীতছন্দে গাহি।

---

[১] মধ্যলীলা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

[২] সকলেই মনে করিয়া আসিতেছিলেন যে গুণরাজের পোষ্টা সুলতান ছিলেন য়ুসুফ শাহা। য়ুসুফ শাহার রাজ্যারম্ভের এক বছর আগে কবি কাব্যরচনা শুরু করিয়াই ভনিতা দিতেছেন "গুণরাজ খান"।

বারবক শাহার দরবারে আর একজন অনুরূপ উপাধিধারী মহাপাত্রের নাম পাওয়া গিয়াছে। উত্তরবঙ্গের এক বণিক্, নাম কুলধর, গৌড়েশ্বরের কাছে প্রথমে "সত্য খান" ও পরে "শুভরাজ খান" উপাধি পাইয়াছিলেন। কৌতূহলী পাঠক 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী' (পৃ ১৬-১৭) দেখিতে পারেন।

কলিকালে পাপচিত্ত হব সব নর
পাচালীর রসে লোক হইব বিস্তর।
গাহিতে গাহিতে লোক পাইব নিস্তার
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার।

কাব্যরচনা করিতে সাত বৎসর লাগিয়াছিল, ১৩৯৫ হইতে ১৪০২ শকাব্দ (১৪৭৩-৮০)।

তের শ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভণ
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।

এই কালজ্ঞাপক ছত্র দুইটি প্রথম সংস্করণের অবলম্বিত পুথিতে ছিল। এ পুথি এখন অদর্শন এবং আর কোন পুথিতে পাওয়া যায় নাই বলিয়া অনেক পণ্ডিত এই কালনির্দেশ মানেন না। কিন্তু মানিবার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। তাহার মধ্যে একটিই যথেষ্ট। কবির পুত্র সত্যরাজ খান এবং পৌত্র রামানন্দ ১৫১৬-১৭ খ্রীস্টাব্দে চৈতন্যের কৃপালাভ করিয়াছিলেন, তখন সম্ভবত গুণরাজ জীবিত ছিলেন না। কাব্যটি তাহার আগেই বহুল প্রচারিত।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়-পাঞ্চালী বর্ণনাময় গেয় কাব্য। অনেক রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের গোড়ার দিকে প্রধানত ভাগবত অনুসারেই কৃষ্ণলীলা বিবৃত হইয়াছে। শেষের দিকে মাঝে মাঝে হরিবংশ অনুসৃত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন যে তিনি পণ্ডিতের মুখে ভাগবত-পুরাণ শুনিয়া এবং ব্যাসের স্বপ্নাদেশ পাইয়া কবিকর্মে হাত দিয়াছেন।[১] পণ্ডিতের মুখে শোনা শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ-মধ্যে হরিবংশের ও বিষ্ণুপুরাণের বিবরণও কিছু শুনিয়া থাকিবেন। সেইজন্য গুণরাজের কথিত কাহিনী আদ্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে ভাগবতের অনুগামী নয়। খানিকটা ইহার স্বাধীন রচনা। যেখানে মূলকে অনুসরণ করিয়াছেন সেখানে তাঁহাকে বেশ সংক্ষেপে সারিতে হইয়াছে। সেইজন্যও শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে ভাগবতের অনুবাদ বলা সঙ্গত নয়, ভাগবতের অনুসারী বলা উচিত। ভাগবত সহজ বই নয়, পণ্ডিত-রচিত এবং পণ্ডিত-বোধ্য। তাহাকে মালাধর বাঙ্গালা রূপ দিয়াছেন। সেইজন্য সংস্কৃতে যেসব বাঁধাধরা বর্ণনা ও উক্তি এবং অতিভাষণ ও বহুভাষণ আছে তাহা খাপ খাইবে না বলিয়া বাদ দিয়াছেন অথবা বদলাইয়াছেন। একটু উদাহরণ দিই।

---

[১] "ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে, লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে।" পৃ ১। "স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস। তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন"। পৃ ২১৭।

প্রলম্ববধের পর প্রাবৃট্‌বর্ণন আছে ভাগবতে (১০-২০) উনপঞ্চাশ শ্লোকে। এই অধ্যায় গুণরাজ বার ছত্রে সারিয়াছেন। মূল শ্লোক ও গুণরাজের রূপান্তর পাশাপাশি দেখানো গেল।

ভাগবত	শ্রীকৃষ্ণবিজয়
জলস্থলৌকসঃ সর্বে নববারিনিষেবয়া।	জল জন্তু স্থল জন্তু সুন্দর রূপ ধরে
অবিভ্রদ্ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া ॥১৩॥	বৈষ্ণবশরীর যেন সেবিয়া হরিরে।
গিরয়ো বর্ষধারাভির্হন্যমানা ন বিব্যথুঃ।	বরিষার ধারা পাইয়া গিরি স্নিগ্ধ হইল
অভিভূয়মানা ব্যসনৈর্যথাধোক্ষজচেতসঃ ॥১৫॥	হরি সেবি লোক সব চৈতন্য পাইল।
মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ।	দুই দিকে বন বাড়ি পথ আইসা দিল
নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালহতা ইব ॥১৬॥	বেদ না জানিয়া যেন দ্বিজ নষ্ট হইল।
লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ।	মেঘের শবদে যেন বিজুলি আসি যায়
স্থৈর্যং ন চক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিষ্বিব ॥১৭॥	নিধন পুরুষ যেন কামিনী না পায়।
মেঘাগমোৎসবা হৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্ শিখণ্ডিনঃ।	মেঘের সঙ্গেতে যেন ময়ূর নৃত্য করে
গৃহেষু তপ্তা নির্বিণ্ণা যথাচ্যুতসমাগমে ॥১৮॥	বৈষ্ণব জন যেন বিষ্ণু অনুচরে।

'জলস্থলবাসীরা বর্ষার জল পাইয়া তেমন শোভন রূপ ধরিল যেমন হরির সেবায় (ভক্ত জনে পায়)। বর্ষার ধারা-বর্ষণেও পর্বতেরা ব্যথা পাইল না, যেমন বিপদের মধ্যে পড়িয়াও হরিনিষ্ঠচিত্ত লোকে (কষ্ট পায় না)। তৃণাচ্ছন্ন ও অপরিপাটি (হওয়ায়) পথ নিশ্চিহ্ন হইল, যেমন বেদ ব্রাহ্মণের দ্বারা পঠিত না হইয়া কালগ্রস্ত হয়। লোকের বন্ধু মেঘে চঞ্চলপ্রণয়িনী বিদ্যুৎলেখা সব স্থির রহিল না, যেমন গুণী ব্যক্তির প্রতিও কামিনীরা (অনুরাগ অচঞ্চল রাখিতে পারে না)। মেঘোদয়ে উৎসবমত্ত সুখী ময়ূরেরা প্রতিদানে অভিনন্দন জানাইল, যেমন গৃহবাসে তাপিত খিন্ন (ভক্ত) বিষ্ণুর দর্শন পাইলে (হয়)।'

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন পুথিতে রাধা ও গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের দানলীলার ও নৌকাবিলাসের কাহিনী পাওয়া যায়। এ দুই কাহিনী ভাগবতে হরিবংশে অথবা বিষ্ণুপুরাণে নাই, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রথম সংস্করণেও নাই। এ কাহিনী অন্য কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য হইতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করি। কৃষ্ণমঙ্গলের অনেক পুথিতে গুণরাজ খানের কাব্যের অংশ পাওয়া গিয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন পুথিতে মাধবাচার্যের কাব্যের ছত্র মিলিয়াছে। গুণরাজ খানের কাব্যে মুখ্য রস মধুর নয়, কৃষ্ণের বাল্যলীলায় বাৎসল্য রসই প্রধান হইয়া ফুটিয়াছে। সেইজন্য কালিয়দমন কাহিনীতে গোপীদের কোন উল্লেখ নাই। গোপবালকেরা আসিয়া খবর দিলে পর নন্দ যশোদা প্রভৃতি ধাইয়া গেল এবং যশোদা বিলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু ভাগবতে এখানে গোপবালকদের সঙ্গে গোপীদেরও উল্লেখ আছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় গাহিবার জন্য লেখা হইলেও ইহা বর্ণনাময় আখ্যায়িকা-পাঞ্চালী

("পয়ারপ্রবন্ধ")। ইহাতে কাব্যকলানৈপুণ্য প্রকাশের অবকাশ থাকিলেও কোন চেষ্টা নাই। তবুও আন্তরিকতা ও সরল ভক্তিভাব রচনার মধ্যে স্থানে স্থানে ভাবুকতার স্নিগ্ধতা দিয়াছে। কাব্যের উপসংহার হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম।

স্বস্বরূপ ব্রহ্মপদ ভাবিতে না পারি
সকল হৃদয়ে গোসাঞী রন তনু ধরি।
গোসাঞীর তনু চিন্তি পাই ব্রহ্মজ্ঞানে
একান্ত হইয়া প্রভুকে ভাব একমনে।
সবাতে আছয়ে হরি এমন ভাবিহ
আপনা হইতে ভিন্ন কারে না দেখিহ।
নিজ আত্মা পর আত্মা যেই তাঁরে জানে
তার-চিত্তে কভু নাহি ছাড়ে নারায়ণে।
কর্ণধার বিনে যেন নৌকা নাহি যায়
তেমতি প্রভুর মায়া সংসারে ভ্রমায়।
ইহা বুঝি পণ্ডিত ভাই স্থির কর মন
একভাবে চিন্ত প্রভু কমললোচন।

ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার সার কথা এমন সহজ সরল স্পষ্টভাবে দেশি ভাষায় গুণরাজ খানের আগে কেহ বলেন নাই॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নাট্যগীতি-পাঞ্চালী : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১

জয়ানন্দের উল্লিখিত তৃতীয় প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের পদাবলী বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিতভাবে কীর্তন-গানের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে এবং বৈষ্ণব-পদাবলীসংগ্রহে গ্রথিত হইয়াছে। এই খণ্ডিত পদাবলীর কোন কোনটিতে ভাবে ভঙ্গিতে ও ভাষায় অপেক্ষিত প্রাচীনত্বের স্বাদগন্ধ পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের বলিয়া প্রচলিত অনেক ভালো ভালো পুরানো ধরণের গান প্রাচীনতর পুথিতে অপর কবির ভনিতা বহন করে। এই সব কারণে পদাবলীর চণ্ডীদাসকে কৃত্তিবাস-গুণরাজের সঙ্গে সমান ভূমিতে আলোচনা করা যায় না। তাহার জন্য গান নয়, কাব্য চাই।

সে কাব্য পাওয়া গেল ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের দ্বারা বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী এক গ্রামে মল্লরাজগুরু বৈষ্ণবমহান্ত শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র-বংশজাত এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অযত্নরক্ষিত (?) অবস্থায়। গোড়ায় দুইটি আর শেষে অন্তত একটি পাতা নাই।[১] কবির ভনিতা "চণ্ডীদাস", বেশির ভাগ "বড়ু চণ্ডীদাস"। কৃষ্ণের ব্রজলীলা লইয়া ধারাবাহিক রচনা। কিন্তু পুথিতে কাব্যটির কোন নাম পাওয়া গেল না। প্রাচীন বৈষ্ণব লেখকদের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া আবিষ্কর্তা-সম্পাদক বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় নাম দিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।[২] সেই নামেই কাব্যটি পরিচিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইবার আগে চণ্ডীদাসকে লইয়া কোন সন্দেহ ও সমস্যা উঠে নাই। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা ছিল যে পুরীতে চৈতন্য জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গান শুনিতে ভালোবাসিতেন। সুতরাং

---

[১] পুথির বিষয়ে অনেক সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রাচীন পুথি হইলে অমন অক্ষত (গোড়ার ও শেষের পাতা বাদে) ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের গোয়াল ঘরে আবির্ভূত হওয়া বিস্ময়ের ব্যাপার। পুথির মধ্যে ফারসী হরফে মুসলমান নাম-সই আছে। তাহারই বা হেতু কী? শেষের পাতা না থাকা আরও বিস্ময়ের কথা। তাহার পরেও অনেকগুলি শাদা পাতা আছে। সেই শাদা পাতাগুলি রহিয়া গেল কিন্তু পুথির শেষ পাতাখানি রহিল না! এরকম ঘটনা আর কোন দ্বিতীয় পুথিতে দেখি নাই। পুথির শেষে শাদা পাতা থাকার কথা কেহই অনুধাবন করেন নাই।

[২] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ ১৩২৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪২।

চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্ববর্তী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুথি পুরানো ধরণের অক্ষরে লেখা। সুতরাং সেদিক দিয়া প্রাচীনত্বের সমর্থন পাওয়া গেল। কিন্তু কাব্যটির ভাব ও ভাষা অনেক স্থানেই প্রগাঢ় আদিরসাল। এমন কোন গান চৈতন্য আগ্রহ করিয়া শুনিতেন ভাবিতে ভক্ত বৈষ্ণবদের এবং কোন কোন সাহিত্য-সমালোচকের মন সরে নাই। তাঁহারা বলিলেন, চৈতন্য যাঁহার গান শুনিতেন সে চণ্ডীদাস প্রচলিত পদাবলীর কবি, তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা নহেন। ইহাদের পক্ষে কিছু যুক্তিও ছিল। পদাবলীতে প্রায় সর্বত্র "চণ্ডীদাস" ভনিতা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রায় সর্বত্র "বড়ু চণ্ডীদাস"। অতএব চণ্ডীদাস দুই জন ছিলেন। কেহ বলিলেন, দুই জন নয় তিন জন। চণ্ডীদাসের ভনিতায় এমন অনেক খেলো পদাবলী ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[1] যেগুলিকে প্রাচীন পদকর্তা চণ্ডীদাসের রচনা মনে করা দুরূহ।

প্রত্নলিপিবিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও চর্যাপদাবলীর আবিষ্কর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমর্থনে আগাইয়া আসিয়া পদাবলীর চণ্ডীদাসের দাবিতে আঘাত হানিলেন। রাখালদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিতে প্রাচীন অক্ষরের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং নানাকালের প্রত্নলিপির (তাম্রশাসনের ও পুথির অক্ষরের) সঙ্গে মিল খুঁজিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি চতুর্দশ শতাব্দে লেখা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরও কয়েক শতাব্দ পিছাইয়া গেলেন। তিনি ভাবিলেন যে পুথিটি যখন কবির মূল গ্রন্থ নয়, পরবর্তী কালের অনুলিপি, তখন কবি নিশ্চয় আরও অনেক প্রাচীন। জয়দেবের দুই তিনটি গানের অনুবাদ ও প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে চণ্ডীদাস জয়দেবেরও পূর্ববর্তী এবং জয়দেব চণ্ডীদাসের কাছে সেই সেই গান সম্পর্কে ঋণী। বলা বাহুল্য শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মত কখনই গ্রাহ্য হয় নাই এবং পরে তিনিও এই মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রচলিত প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের ও পদাবলীর পাঠ অর্বাচীন পুথিতে পাওয়া যায় বলিয়া ভাষা আধুনিক কালের রূপ পাইয়াছে। সে তুলনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির ভাষা অনেক পুরানো বলিয়া মনে হইল। তাই দেখিয়া শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিদ্ সমর্থনে বলিলেন, এ ভাষা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দের। এ অনুমান এখন বিশ্বাসে পরিণত, অতএব অপরিত্যক্ত। দুই একজন শ্রীকৃষ্ণ-

---

[1] 'অপ্রকাশিত চণ্ডীদাস-পদাবলী', নীলরতন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য পরিষৎ (পত্রিকা) পঞ্চম ভাগ দ্রষ্টব্য। পরে আরও অনেক বাহির হইয়াছে।

কীর্তনের লিপির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। রাখালবাবু তখন পরলোকে। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের মত চাওয়া হইল। তিনি ভালো করিয়া পুথি দেখিয়া বলিলেন যে পুথি চতুর্দশ শতাব্দের না হইতে পারে তবে ষোড়শ শতাব্দের প্রথম পাদের এদিকের নয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেক গানে গ্রাম্যতা আছে। এমন কি সেকালের রুচির আদর্শেও কদর্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে যাঁহারা পদাবলীর চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না তাঁহারা এই গ্রাম্যতাকেই প্রত্যাখানের হেতু করিলেন। অপর পক্ষে, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে প্রাচীন বলিয়া বিশ্বাস করিলেন তাঁহারা সেই গ্রাম্যতাকে প্রাচীনত্বের বড় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহারা বলিলেন, বড়ু চণ্ডীদাসের দানলীলা-নৌকালীলা প্রাচীনতর বলিয়াই অশ্লীল এবং রূপ গোস্বামী-বর্ণিত দানলীলা-নৌকালীলার কাহিনী পরিশুদ্ধ করা বলিয়া তাহা অর্বাচীন। ইহারা বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা মাটির ভাঁড়ে করিয়া দুধদই বেচিতে যায় আর দানকেলীকৌমুদীর রাধা রূপার ডালায় সোনার ভাঁড়ে ঘি লইয়া যান। অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আরো পুরানো। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ভালো করিয়া পড়িলে এ কথা টিকে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই দানখণ্ডে রহিয়াছে, রাধা সোনার ডালায় রূপার ঘড়ায় সূক্ষ্ম বস্ত্রের ঢাকনি দিয়া পশার করিতে যায়।

সোনার চুপড়ী রাধা রূপার ঘড়ী
নেতের আঙ্কল তাত দিআঁ ওহাড়ী।

এখন দেখা যাক পুথি কি সাক্ষ্য দেয়। কৃষ্ণকীর্তন পুথি এক হাতের লেখা নয়, দুইটি ভিন্ন হাতের (আসলে ভিন্ন ঢঙের) লেখা আছে। একটি পুরানো গোটা গোটা অনুশাসন খোদাইয়ের রীতিতে সযত্নে লেখা। আর একটি জড়ানো জড়ানো টানা অর্বাচীন হাতের পত্র-দলিলের ছাঁদে লেখা। অর্বাচীন ছাঁদে লেখা পাতাগুলিকে পরবর্তী কালের যোজনা বলিবার উপায় নাই কেননা কালি এক কাগজও এক, এবং একই অচ্ছিন্ন ভাঁজ-করা পাতায় প্রাচীন অর্বাচীন দুই ছাঁদের লেখাই পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রত্নলিপি-বিশারদদের সাক্ষ্য মানিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে অর্বাচীন ছাঁদের লেখাও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দে চলিত ছিল। তাহা হইলে পুরানো পুথির ও তাম্রপট্টশাসনের অক্ষরের সঙ্গে মিলাইয়া তারিখ নির্ধারণ করিবার অর্থটা কী? প্রত্নলিপিবিশারদেরা আরও ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে বাঙ্গালা পুথির বিচার শুধু হাতের লেখার উপর নির্ভর করিলেই চলিবে না। যাহার উপর লেখা হইয়াছে

সেই কাগজ এবং যাহা দিয়া লেখা হইয়াছে সেই কালিও বিবেচনা করিতে হইবে। রাখালদাস অথবা রাধাগোবিন্দবাবু প্রত্নলিপিবিদ্‌, প্রস্তরফলকে ও তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ অক্ষর পড়িতে অভ্যস্ত। তাই তাঁহারা কাগজ ও কালির কথা ভাবেন নাই। ভাবিলে পুথিটিকে প্রাচীন বলিতে পারিতেন না। কাগজ পাতলা, মাড়ের তৈয়ারি, ঠিক যেন মিলের কাগজ। এরকম কাগজে লেখা পুথি বা দলিল অষ্টাদশ শতাব্দের আগে দেখি নাই, উনবিংশ শতাব্দে যথেষ্ট দেখিয়াছি। পুথিটিকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। কালি হালকা, তাহাতে প্রাচীন পুথির কালির গাঢ়তা ও উজ্জ্বলতার আভাসমাত্র নাই। আমার অভিমত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধের আগে হইতে পারে না।[১] অক্ষরের দিক দিয়াও কোন বাধা নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুরানো ছাঁদের মতো অক্ষর অষ্টাদশ শতাব্দের পুথিতে অনেক দেখিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির প্রাচীনত্বের উপরই কাব্যটির প্রাচীনত্ব নির্ভর করিতেছে (এবং পুথির প্রাচীনত্ব লিপির প্রাচীনত্বের উপর নির্ভর করিতেছে), এই ধারণার বশীভূত হইয়াই আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কালনিরূপণে ভুল করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি প্রাচীন নয় তবে তাই বলিয়া যে সব কিছুই অপ্রাচীন এমন কথাও নয়। ভাষায় প্রাচীনত্বের পরিচয় অগ্রগণ্য। কাব্যটির গঠনে ও বর্ণনায় যে অভিনবত্ব আছে তাহা প্রাচীনত্বের দ্যোতক। পুথি-প্রাচীনত্বে বিশ্বাসীরা মনে করেন যে গ্রাম্যতা দোষের জন্য কাব্যটি শিষ্ট বৈষ্ণবদের রুচিকর হয় নাই তাই ইহার প্রচলন তাঁহারা নিরোধ করিয়াছিলেন এবং কোনওক্রমে বাঁকুড়া জেলার একটেরে কাব্যটির পুথিটি রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। ভাষা-প্রাচীনত্বে বিশ্বাসীরা বলিলেন, প্রাচীন পুথিটি গুপ্ত হইয়া রক্ষা পাইয়াছে, অতএব ইহার ভাষা পরবর্তী কালের পরিবর্তন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আমাদের কাছে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দের বাঙ্গালা ভাষার খাঁটি অর্থাৎ সমসাময়িক নমুনা হাজির করিয়াছে। পুথির অর্বাচীনত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই অভিমতের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবল যুক্তি আছে। সেগুলি উপস্থাপিত করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনেকগুলি আরবী-ফারসী শব্দ আছে।[২] সেগুলি সংখ্যায়

[১] বিচিত্র সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), 'চণ্ডীদাস-সমস্যা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

[২] যেমন "কুত", 'খরমুজা", "খেতি" (আরবী খ'তা), "বাকী", "আদবাহ" (নামধাতু, আরবী আদাব হইতে), "মজুরী" ও "মজুরিআ" (ফারসী মজ্‌দুর), "মিনতি" (আরবী মিন্নৎ) "গুণ" ("খণ্ডী সব দোষ গুণে", ফারসী গুনাহ্‌ হইতে), "বেলাবলী" (রাগিণী), "গুলাল" (পুষ্পবিশেষ) ইত্যাদি।

বেশি নয়। বেশি হইবার কথাও নয়, যেহেতু বিষয় কৃষ্ণের ব্রজলীলা। কিন্তু এমন দুইটি শব্দ আছে (—"মজুরী" ও "মজুরিআ"—) যাহা ফারসী শব্দে বাঙ্গালা প্রত্যয় যোগ করিয়া নূতন গঠিত। এরকম ব্যাপার ঘটিতে পারে তখনই যখন বিদেশীয় ভাষার শব্দটি অত্যন্ত চালু হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতে একটু বেশি সময় লাগে। তাহা ছাড়া এখানে আর একটু লক্ষ্য করিবার আছে। আর কোন পুরানো কৃষ্ণচরিত বা অন্য কাব্যে "মজুর" শব্দটিও পাই নাই। ষোড়শ শতাব্দের শেষ ভাগের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, যাঁহার ব্যবহৃত দেশি ও বিদেশি শব্দভাণ্ডার প্রাচীন কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, তিনিও "মজুরী" বা "মজুরিআ" শব্দ ব্যবহার করেন নাই।[১]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেক পদের শেষ অক্ষরে অল্পপ্রাণ ও হ-কার মিলিয়া মহাপ্রাণে পরিণত হইয়াছে। যেমন লইবেহেঁ > লইভেঁ, তোহ্মাকহো > তোহ্মাখো। এমন অর্বাচীন ধ্বনিসংশ্লেষও প্রাচীনত্বের প্রমাণ বলিয়া বিঘোষিত। এই ব্যাপার আধুনিক কালে বাঁকুড়া-মানভূম-ধলভূম অঞ্চলের ভাষায় লক্ষণীয়, উড়িয়া ভাষাতেও আছে। (উড়িয়ার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় কোন কোন বিষয়ে মিল আছে। অসমিয়ার সঙ্গেও কিছু কিছু আছে।)

মহাপ্রাণ নাসিক্য বর্ণের প্রাচুর্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার প্রাচীনত্বের একটি প্রধান লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু মহাপ্রাণ নাসিক্যের ব্যবহার সর্বত্র প্রাচীন প্রয়োগ অনুযায়ী নয়। প্রায়ই অস্থানে ব্যবহার আছে। যেমন,—সহ্মে (=সমে অথবা সবে)। কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে অল্পপ্রাণ নাসিক্যের সহিত মহাপ্রাণ নাসিক্যের অন্ত্যানুপ্রাস হইয়াছে। এখানে বুঝি যে যাহা লেখায় প্রাচীনত্ব তাহা সর্বত্র উচ্চারণে বজায় ছিল না।[২] অস্থানে নাসিক্য স্বরধ্বনির অযথা প্রাচুর্য প্রাচীনত্বের চিহ্ন মোটেই নয়। (বাঁকুড়া-মানভূম-ধলভূমের ভাষার ইহা একটি প্রধান লক্ষণ।) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিতে মহাপ্রাণ নাসিক্যের প্রয়োগ অনেকটা কৌশলেরই সামিল।

আরো অনেক ছোটখাট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষত্ব আছে যাহা প্রাচীনত্বের দ্যোতক নয় অপিচ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্তের আধুনিক উপভাষার চিহ্নবহ। একটি উদাহরণ দিই। "রহিছে, রহিয়াছে" স্থানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে

---

[১] মুকুন্দরাম এখানে ব্যবহার করিয়াছেন "বেরুনিয়া"। এটিও ফারসী শব্দ হইতে উৎপন্ন। ষোড়শ শতাব্দের রচনায় অন্যত্র পাওয়া যায়। "মজুরি, মজুরিয়া" অর্বাচীন প্রয়োগ, এবং এখনও চলে।

[২] 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ব্যাকরণ' (সা-প-প ৪২ দ্রষ্টব্য)।

"রহিলছে"। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া পদটি মূল্যবান্‌, কিন্তু এমন প্রয়োগ পুরানো বা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। অথচ মানভূম অঞ্চলের উপভাষায় "র'ল্‌ছে, গেল্‌ছে, হ'ল্‌ছে" রীতিমত পাওয়া যায়। প্রাচীনত্বের পক্ষপাতীরা বলিতে চাহেন যে পুরানো বাঙ্গালাতেও এই রকম পদ ছিল, অন্যত্র লুপ্ত হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একটি সুদুর্লভ ফসিলরূপে রহিয়া গিয়াছে। এ কথা সমর্থনযোগ্য নয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মধ্যকালীন বাঙ্গালা ভাষার অবিকৃত প্রাচীন রূপটি যে পরিমাণে আছে ততটা আর কোন পুরানো রচনায় নাই। চর্যাপদাবলীর পরেই বাঙ্গালা ভাষার পুরানো নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহুললভ্য। এ কথা মোটামুটি ঠিক। তবে সত্য করিয়া বলিতে হয় যে আমরা নিশ্চিতভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিতে আবদ্ধ ও জমাট বাঁধা চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের সাহিত্যের ভাষা সম্পূর্ণ পাই নাই।[১] পাইয়াছি মোটামুটি মধ্যকালীন বাঙ্গালা ভাষা—যাহা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোটামুটি অবিকৃত রূপে আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাঠামো অভিনব, বস্তুও কতকটা অভিনব। তাই বলিয়া রচনাটিকে সর্বাংশে প্রাচীন স্বীকার করা যায় না। ইহার মধ্যে জোড়াতালি ও প্রক্ষেপ যথেষ্ট আছে। জোড়াতালি হইতে অনুমান হয় যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থটি যিনি রচনা করিয়াছিলেন তিনি প্রাচীন নাটুয়ার (ও পুতুলবাজিকরের) কৃষ্ণলীলা পালাগান পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দুইএকটি পালার একাধিক পুথি ছিল। সেইগুলি জোড়াতাড়া দিয়া বইটি খাড়া হইয়াছে। (জোড়াতালি যে কোথায় এবং কেমন তা কাহিনীর প্রসঙ্গে দেখানো যাইতেছে।) প্রক্ষেপ যাহা আছে তাহা দুই রকমের। এক যিনি জোড়াতালি দিয়াছিলেন তিনি সর্বত্র জোড় মিলাইতে পারেন নাই। ভালো জোড় না খাওয়াতে বিশ্লিষ্ট অংশ প্রক্ষেপ বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়ত, যিনি জোড়াতালি দিয়াছিলেন, অথবা যাঁহারা পালাগুলি গান করিতেন কিংবা যিনি পুথিটি লিখিয়াছিলেন (—যদি তিনিই জোড়াতালি না দিয়া থাকেন—) তিনি বা তাঁহারা অপরিচিত, অপরিস্ফুট অথবা লুপ্ত শব্দ স্থানে নূতন শব্দ বসাইয়াছিলেন।

---

[১] ইহার একটি বড় প্রমাণ এই যে উনবিংশ শতাব্দে লেখা দুইখানি খাতাতে (বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া হইতে সংগৃহীত) বড়ু চণ্ডীদাসের চৌদ্দটি পদ পাওয়া গিয়াছে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন দ্বিতীয় সংস্করণ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে অনুমান হয় যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পুথির বাহিরে এইসব পদ বা গান অজানা ছিল না।

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার মধ্যে নবীনত্বের চিহ্নগুলি এইখানেই পাওয়া যায়।) দুই একস্থানে লিপিকর, অথবা সংস্কর্তা—কেহ সংস্কার করিয়া থাকিলে—কিংবা যিনি জোড়াতালি দিয়াছিলেন, ইচ্ছা করিয়া গোটা ছত্র কাটিয়া বদল করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্রজবুলি পদ নাই, কিন্তু দুই চারটি বিশিষ্ট ব্রজবুলি শব্দ আছে। সে প্রক্ষেপ দুই রকমের—গায়নের এবং প্রাপ্ত পুথির সংস্কর্তার ও লেখকের। গায়নের প্রক্ষেপের জন্যই উপভাষিক এবং ব্রজবুলি শব্দ ও পদ (যেমন "জাগল", "ভৈল", "পুনমী" ইত্যাদি) পাইতেছি। কয়েকটি শব্দের প্রাচীন ও অর্বাচীন রূপ দুইই আছে (যেমন চুম্ব : চুম, দুইটি : দুটি)। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হইল আধুনিক কালের কথ্য ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণবহ, আধুনিক স্বরসঙ্গতিময়, "এখুনি", "চুরিণী" ইত্যাদি পদ। ছত্র-পরিবর্তনের উদাহরণ বেশি নাই। একটি দিতেছি। তাহাই যথেষ্ট।

রাধাবিরহ পালার একটি গানে কৃষ্ণ বলিতেছে

> সমুচিত নহে রাধা তোহ্মা সঙ্গে কেলি
> মোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী।

'রাধা তোমার সঙ্গে আমার কামক্রীড়া উচিত কাজ নয়। রাধা, আমার প্রতি কুৎসিত আচরণ ছাড়িয়া দাও।'

শেষ ছত্রের স্থানে পুথিতে প্রথমে লেখা হইয়াছিল "কিসক পাতহ রাধা ডোম্বচাণ্ডালী" (অর্থাৎ "রাধা, কি জন্য ডোমচাঁড়ালী ব্যাপার ফাঁদিতেছ?") এই ছত্রটি কাটিয়া দিয়া লেখা হইয়াছে—বোধ করি "ডোম্বচাণ্ডালী" বুঝিতে না পারার জন্য—"মোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী"। অর্থের দিক্ দিয়া এই ছত্রটির কোন সার্থকতা নাই, এমন কি ইডিয়মেও ভুল আছে। অথচ প্রথমে যাহা লেখা হইয়াছিল তাহা প্রথম ছত্রের সঙ্গে অর্থে ও ভাবে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গত। ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা দেবীর বাৎসরিক অনুষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ "ডোমচাঁড়ালী" অর্থাৎ অশ্লীল গান, ছড়া ও কথাকাটাকাটি। ইহা প্রাচীনকালে বাৎসরিক দেবীপূজার অঙ্গ ছিল। এখনও কাজ সারা গোছ হয়।[১] স্মৃতিকারেরা ইহাকেই শবরোৎসব বলিয়াছেন।

"রাগ" শব্দটি এখনকার অর্থে পুরানো বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতাব্দেও ইহা অনুরাগ অর্থে চলিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একবার বিরাগ অর্থে

[১] নবদ্বীপ কলেজের অধ্যাপক ক্ষীরগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে এই খবর পাইয়াছি।

পাইতেছি।[১] আধুনিক কালোচিত স্বরসঙ্গতি ও অ-সঙ্গতি বেশ কয়েকটি শব্দে পাওয়া যায়। যেমন, দৌড়ী : দড়ী ; পৈসী : পসী ; মজি : মজে (= মজ্যা) ; এথনী : এথুনী ; বৈশে : বসে ; বোলাবুলি ; ইত্যাদি। বৃন্দাবন-খণ্ডের উদ্যান-বর্ণনা অংশ প্রায় আগাগোড়া প্রক্ষেপমণ্ডিত। সংস্কর্তা অন্যমনস্ক না হইলে অর্বাচীন ও অনভিজ্ঞ কোন লেখকের "আম্র", "আম", "আঁব" পৃথক্ভাবে বৃক্ষ-তালিকাভুক্ত করিতেন না॥

২

এখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির নাম ও কাল বিচার করিতে হইবে। আগেই বলিয়াছি, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে প্রাচীন কবিরূপে চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে। জয়ানন্দ কৃষ্ণচরিত কাব্যের অথবা পদাবলীর রচয়িতারূপে চণ্ডীদাসকে জয়দেব ও বিদ্যাপতির পরেই নাম করিয়াছেন।

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ।

সনাতন গোস্বামী বিরচিত ভাগবত দশম স্কন্ধের টীকা 'দশমটিপ্পনী'তে (১৪৭৬ শকাব্দ = ১৫৫৪) এবং জীব গোস্বামী বিস্তারিত 'বৈষ্ণবতোষণী'তে (১৫০০, ১৫০২ অথবা ১৫০৪ শকাব্দ) "শ্রীজয়দেবচণ্ডীদাসাদিদর্শিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদিলীলা"র উল্লেখ আছে।[২] জয়দেব দান ও নৌকা বিলাসের ইঙ্গিতও করেন নাই। আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড মুখ্য আখ্যায়িকার অন্যতম। জয়দেব সংস্কৃতে লিখিয়াছেন আর চণ্ডীদাস বাঙ্গালায়। সনাতন-জীব বিদ্যাপতির নাম করেন নাই (—অবশ্য "আদি" বলিয়াছেন—) এবং তাঁহারা দেশি ভাষার রচনা গ্রাহ্য করিয়াছিলেন কিনা ঘোর সন্দেহ। চণ্ডীদাসের লেখা সংস্কৃতে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড ছিল কিনা কে বলিবে?[৩] আরও একটা কথা আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা আদ্যন্ত "বড়ু চণ্ডীদাস" ভনিতা দিয়াছেন। যেখানে

---

[১] "কত না রাগ রাধা আছের মনে না চাহ সমুখ দিঠি" (দানখণ্ড)।

[২] সতীশচন্দ্র রায় এই উল্লেখের দিকে সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই উক্তির আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

[৩] 'প্রেমামৃত' নামে ছোট সংস্কৃত কাব্যখানিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত দান, নৌকা, ভার ও ছত্র খণ্ডের কথা আছে। কাব্যটির রচয়িতার নাম নির্ণয় করা শক্ত। এটি যে সনাতন-জীবের উল্লিখিত চণ্ডীদাসের রচনা নয়—তাহাই বা কে বলিবে। কাব্যটির উদ্ধৃতি রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী' সঙ্কলনে আছে। রূপ নিজেই একটি "ভাণিকা" লিখিয়াছিলেন 'দানকেলীকৌমুদী' নামে।

ছন্দের অনুরোধে "বড়ু" ব্যবহার করা চলে না শুধু সেখানেই "চণ্ডীদাস" ভনিতা আছে। সাতবার পাওয়া গিয়াছে "আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস" অথবা "অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস" এই যুক্ত ভনিতা। সব ভনিতার সঙ্গেই দেবী বাসলীর নাম আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি গানে বাসলীর দোহাই আছে—"বাসলী বন্দী", "বাসলীবরে", "বাসলীগণ", "বাসলীগতি", "বাসলী আয়ী" ইত্যাদি। "বড়ু" [১] এবং "বাসলী"[২] হইতে মনে হয় যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বাসলীর ভক্ত এবং বাসলীর দেউলের সেবাপূজার কোন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত সেবক ছিলেন। "অনন্ত" নাম গায়নের প্রক্ষেপ বলিয়া বোধ হয় না। সংস্কর্তার নাম হইতে পারে। আর যদি কবির নাম হয় তবে "চণ্ডীদাস" কবির ছদ্মনাম। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দের অনেক ধর্মমঙ্গল-রচয়িতাই ওইভাবে নিজের নামের বদলে "ধর্মদাস" ভনিতা ব্যবহার করিয়াছেন। মনে হইতে পারে যে "বড়ু" = "দ্বিজ"। যাঁহারা এমন ভাবেন তাঁহারা বৈষ্ণব-পদাবলীর দ্বিজ চণ্ডীদাসকে বড়ু চণ্ডীদাসের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু "বড়ু" আর "দ্বিজ" সব সময় সমার্থক নয়। উড়িষ্যায় ও আসামে (এবং বাঙ্গালায়ও) "বড়ু" ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্যক্তিকেও বুঝায়। কৃত্তিবাসের কাব্যের প্রাচীনরূপ পাই নাই, তবুও কোন পুথিতে "দ্বিজ" কৃত্তিবাস দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। গুণরাজ খানও কোথায়ও "কায়স্থ" মালাধর ভনিতা দেন নাই। বৈষ্ণব কবিরা নামের আগে জাতিবাচক কোন বিশেষণ ব্যবহার করেন নাই। ষোড়শ শতাব্দের অ-বৈষ্ণব কবিরা ব্রাহ্মণ হইলে "দ্বিজ" ব্যবহার করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দে ইহার ব্যবহার বাড়িয়াছে, খুব সম্ভব বৈষ্ণব লেখকদের জাতিবর্ণহীন "দাস"-এর ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ারূপে। এই সময় হইতে "বৈদ্য"ও পাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভনিতা হইতে তিনটি পৃথক্ অনুমান করা যায়। প্রথম, কবির নাম চণ্ডীদাস এবং ইনি বাসলী দেবীর মন্দিরের সেবক ছিলেন। দ্বিতীয়, কবির নাম অনন্ত এবং ইনি চণ্ডী (বাসলীর সমার্থক) দেবীর ভক্ত ও মন্দির

[১] "বটু" ("বড়্") এবং "বড়্ চণ্ডীদাস" ভনিতায় দুই চারিটি কীর্তন-গান (পদাবলী) পাওয়া গিয়াছে। একটিতে "বাশুলীর বরে"ও আছে।

[২] বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে এবং অন্য পুরানো গ্রন্থে "বাশুলী"ও পাওয়া যায়। "বাসলী" বাশুলীর প্রাচীনতর রূপ বলিয়া সকলে মনে করেন। আসলে কিন্তু "বাশুলী"ই প্রাচীনতর রূপ। বাশুলী > * বাসোলী > বাসলী (বাশলী)। ষোড়শ শতাব্দের সাহিত্যে বাশুলী চামুণ্ডার (বা চণ্ডীর) নামান্তর, এবং কালীর রূপান্তর। ও-কারের অ-কারে পরিবর্তনের উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আরও আছে। আছ < আছু ; কিছ (=কিছো) < কিছু।

সেবক ছিলেন তাই বড়ু চণ্ডীদাস নাম লইয়াছিলেন। তৃতীয় "অনন্ত" ভনিতা প্রক্ষিপ্ত।[১]

প্রশ্ন হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বার বার দেবীর দোহাই দিবার আবশ্যকতা কি ছিল। বৃন্দাবনদাস বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে তাঁহাদের কাব্যের প্রত্যেক অধ্যায়ে বা পরিচ্ছেদের শেষে চৈতন্য-নিত্যানন্দের দোহাই দিয়াছেন তাহার কারণ আছে। তাঁহারা চৈতন্য-নিত্যানন্দের জীবনকাহিনী লিখিতেছেন এবং চৈতন্য-নিত্যানন্দ তাঁহাদের আরাধ্য। কিন্তু বাশুলীর কোন সংস্রব নাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাহিনীতে। এবং বড়ু চণ্ডীদাস যে ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন এমন ইঙ্গিতও কিছুমাত্র নাই। হয় তো তিনি বৈষ্ণবই ছিলেন এবং বাশুলীসেবার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক বংশগত ব্যাপারমাত্র। এখানে এই কথাই মনে হইতেছে যে কবি বোধ হয় বাশুলীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া ("বাসলী বরে") লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, হয়ত বা তাহা বাশুলী-চণ্ডীর বাৎসরিক পূজায় গীত হইবার উদ্দেশ্যেই। রচনায় আদি রসের গাঢ়তা এই অনুমানের সমর্থক।[২] পরবর্তী কালে চণ্ডীদাসকে লইয়া যে সব কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার একটি পদে বোধ করি বাশুলীর আদেশের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু সেখানে বাশুলী চণ্ডীর পরিচারিকা।[৩]

চণ্ডীদাস ও তাঁহার প্রেমপাত্রী রজককন্যার (—নাম নানারকম, তারা, রাম-তারা, রামী—) গল্প সপ্তদশ শতাব্দ হইতে মিলিতেছে। ইহা কি পরিমাণে সত্যাশ্রিত অথবা মোটেই সত্যাশ্রিত কিনা তাহা সম্পূর্ণ অনুমানসাপেক্ষ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। তবে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। এখানে তা থাকিবার কোন কথাই নাই। অধ্যাত্মচিন্তার অথবা যোগধ্যানের রূপক হিসাবে ব্রাহ্মণ বটুর সহিত ডোমনীর সম্পর্কের ইঙ্গিত অথবা চণ্ডালিনীর ব্রাহ্মণ জারের উল্লেখ চর্যাগীতিতে আছে।[৪] (নাথপন্থী যোগীদের পুরানো ছড়ায়ও রজকিনীর রূপক আছে। এখানেও সেই রূপকের অনুবৃত্তি থাকিতে পারে।) ব্রাহ্মণসন্তান এবং পণ্ডিত চণ্ডীদাস নীচজাতীয় প্রণয়পাত্রীর সঙ্গদোষে সমাজচ্যুত হইয়া "বড়ু"তে পরিণত হইতে পারেন। (ইহার অনুরূপ ব্যাপার

---

[১] সা-প-প ৪২ পৃ ৪৬ দ্রষ্টব্য।

[২] পরে দ্রষ্টব্য।

[৩] "নিত্যার আদেশে বাশুলী চলিল সহজ জানাবার তরে।" এখানে বাশুলী হইল চামুণ্ডা, নিত্যা-চণ্ডীর সহচরী। অপরদিকে নিত্যা = নেতা ধোবানী = চণ্ডীদাসের প্রকৃতি (সহজসাধনায় সঙ্গিনী)।

[৪] "দেখু চণ্ডালীর ব্রাহ্মণ জার।"

ঘটিয়াছিল সপ্তদশ শতাব্দে। রূপরাম চক্রবর্তী এক হাড়ি-ঝির প্রণয়াসক্ত হইয়া সংসার ও সমাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইনি 'ধর্মমঙ্গল' রচনা করিয়া দল বাঁধিয়া গান করিতেন। চণ্ডীদাসও হয়ত সেইরকম করিয়া থাকিবেন।) সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দের বৈষ্ণব-লেখকেরা নব-রসিক (—অর্থাৎ নূতন রসের রসিক, নয়জন রসিক নহে—) বলিতে প্রাচীনদের মধ্যে তিন সাধক (বা সিদ্ধ) প্রণয়ী-যুগলকে ধরিয়াছেন—জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস। তিনজনেই কৃষ্ণলীলাগানের প্রৌঢ় গুরু। জয়দেবের প্রকৃতি পদ্মাবতী[১], বিদ্যাপতির প্রকৃতি লখিমা আর চণ্ডীদাসের প্রকৃতি রজকিনী। রাজমহিষী ও রজককন্যা দুইজনেই ইতিহাসের নাগালে ধরা দেয় না। তবে লখিমা বিদ্যাপতির কিছু পদের ভনিতায় উল্লিখিত, রজকিনী কিছু পদে এবং কিংবদন্তীতে॥[২]

চণ্ডীদাস পুতুলবাজির নাটুয়া ছিলেন এবং গৌড়ের নিকটবর্তী কানাই-নাটশাল গ্রামে তাঁহার পুতুল পাটের রঙ্গমঞ্চ ছিল এমন অনুমান অন্যত্র করিয়াছি।[৩] তাহা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য॥

৩

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানগুলিতে কৃষ্ণ-বলরামের অবতারগ্রহণ সূত্র হইতে কৃষ্ণের মথুরাগমন অবধি বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে শুধু রাধার প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণ, নানাছলে উভয়ের মিলন এবং রাধার প্রেমে বিতৃষ্ণ হইয়া কৃষ্ণের বৃন্দাবন পরিত্যাগ—এই ঘটনাগুলিকেই আশ্রয় করিয়া প্রাকৃত প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণ নাটের ঠাটে উপস্থাপিত। শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোন কাহিনীর প্রত্যক্ষ সংযোগ নাই। কোন কোন কাহিনী বিষ্ণুপুরাণের অনুসারী।[৪]

শারদ রাসের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। রাধাকে ভুলাইবার জন্য বৃন্দাবন রচনা (—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবন আরণ্যভূমি নয়, সাজানো বাগান—) সম্পূর্ণ নূতন। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড কাহিনী কোন পুরাণে নাই, তবে তাহা লোক সাহিত্যে পূর্বাপর প্রচলিত, 'হরিবংশ' বলিয়া কথিত লৌকিক ঐতিহ্য

[১] জয়দেব কোথাও পদ্মাবতীকে স্পষ্টভাবে পত্নী বলেন নাই। শুধু "পদ্মাবতীরমণ" হইতে এই অনুমান করা হয়। পদ্মাবতী তাঁহার বিবাহিত ভার্যা নাও হইতে পারেন।

[২] 'চণ্ডীদাস-সমস্যা' (বিচিত্র-সাহিত্য প্রথম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

[৩] নট-নাট্য-নাটক (১৯৬৬) দ্রষ্টব্য।

[৪] ব্রহ্মার স্তুতিতে নারায়ণের ইচ্ছা এবং "কাল ধল দুই কেশ" দেওয়া ব্যাপার বিষ্ণুপুরাণেই আছে।

ইহার মূল।[১] ছত্রখণ্ড ও ভারখণ্ড দানলীলারই পোষক আখ্যান। বংশীখণ্ডও প্রচলিত অপৌরাণিক আখ্যান।[২] হারখণ্ড বাণখণ্ড ইত্যাদিও লৌকিক কাহিনী হইতে নেওয়া বলিয়া বোধ হয়।

দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রধান বর্ণনীয় ঘটনা। এই কাহিনীদ্বয়ের বর্ণনা বৈষ্ণব-মহান্তদের নির্দেশিত কৃষ্ণলীলার সুরের সঙ্গে মিলে না বলিয়াই বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যকে চৈতন্যের পূর্ববর্তী ধরিতে হইবে—এই অভিমত অনেকে পোষণ করেন। গুণরাজ-খানের কাব্যে (—অন্তত কোন কোন প্রাচীন ও অকৃত্রিম পুথিতে—) দানলীলার ও নৌকাবিলাসের বর্ণনা নাই, কেননা ও বইটি ভাগবত অনুসারে লেখা এবং ভাগবতে এ দুটি কাহিনী নাই। কিন্তু চৈতন্যের সমসাময়িক মাধব আচার্যের কৃষ্ণমঙ্গলে আছে এবং পরবর্তী আরও কোন কোন কৃষ্ণলীলা-আখ্যায়িকায় আছে। রূপ গোস্বামীও দানলীলা লইয়া নাট্য রচনা করিয়াছিলেন। (তাহাতে অবশ্য গ্রাম্যত্বের কোন ইঙ্গিত নাই। তবে রূপ গোস্বামীর নির্দেশ সত্ত্বেও এই দুই কাহিনী হইতে আদিরসের চিট একেবারে উঠিয়া যায় নাই।) কৃষ্ণচরিত আখ্যায়িকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শেষ গ্রন্থ জয়নারায়ণ ঘোষালের 'করুণানিধানবিলাস' (১৮২০)। ইহাতে কাহিনী দুইটি আছে এবং তাহা আদিরসনিষ্কাশিত নয়। আসল কথা এই, কৃষ্ণলীলা প্রাচীনকাল হইতেই তিন রসে সিক্ত—বিস্ময়, আদি ও বাৎসল্য। বিস্ময় রসের কাহিনী পূতনাবধ, গোবর্ধনধারণ, কালিয়দমন, কংসবধ ইত্যাদি কৃষ্ণলীলার প্রাচীনতম আখ্যায়িকা। এগুলি গুপ্ত আমলের পূর্ব হইতেই স্থাপত্য-শিল্পের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। তাহার পরে আদিরসের ইঙ্গিত। শুধু আদিরস লইয়া প্রাচীনকালে কোন আখ্যায়িকা গড়িয়া উঠে নাই। পরবর্তীকালে রাস, দান, নৌকা ইত্যাদি কল্পিত হইয়াছে। সেকালের সামাজিক অথবা গার্হস্থ্য উৎসবাদিতে (প্রধানত মেয়েদের মধ্যে) যে আদিরসাত্মক গান গাওয়া হইত বা ছড়া আবৃত্তি করা হইত তাহার নায়ক কৃষ্ণ, নায়িকা অনামিকা গোপী অথবা (পরে) রাধা। জয়দেব এই ধরণের গানকেই ভদ্র সাহিত্যের জাতে তুলিয়াছিলেন। তাহার পর কৃষ্ণকে লইয়া নূতন বৈষ্ণবধর্ম[৩] দানা বাঁধিবার

[১] এই লৌকিক হরিবংশের দোহাই কৃষ্ণদাস, ভবানন্দ প্রভৃতি ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দের কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা কবিরা দিয়াছেন। লৌকিক হরিবংশ কোন বিশিষ্ট গ্রন্থ নয়, কৃষ্ণলীলার গ্রাম্য আখ্যানের কল্পিত মূল বলিয়া মনে করি।

[২] রূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বংশীচৌর্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

[৩] প্রাচীন বৈষ্ণবধর্মের উপাস্য বিষ্ণু, উদ্দেশ্য মুক্তি। নূতন বৈষ্ণবধর্মের উপাস্য কৃষ্ণ, উদ্দেশ্য ভক্তি।

পরেও লোক-ব্যবহারে পূর্বতন আদিরসাত্মক গানের ধারা—অব্যাহতভাবে না হইলেও—চলিয়া আসিয়াছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দের এই ধরণের আদি-রসাত্মক কৃষ্ণলীলা গান "ঢামালি" (বা "ধামালি")[১] নামে প্রসিদ্ধ ছিল। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শব্দটি অশ্লীল রঙ্গরস অর্থে আছে।) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই ঢামালি রীতিরস অনাখ্যায়িক পাঞ্চালী রূপে পাইতেছি। বাৎসল্যরস প্রথমে বিস্ময়রসের সঙ্গে বিজড়িত ছিল। বাৎসল্যরসের কাহিনী প্রধানত বাঙ্গালী ভক্ত পদকর্তাদের সৃষ্টি।

আগেই বলিয়াছি পুরানো পাঞ্চালী কাব্য দুই রকমের—নাটগীতি ও আখ্যায়িকা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটগীতি, এবং গীতগোবিন্দের ধরণে। পাত্র-পাত্রীও তিনজন—কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি (দূতী-সখী), যেন পুতুলনাচের তিনটি পুতুল। গানগুলি প্রায় সবই পাত্রপাত্রীর উক্তি। অন্য গান যে দুইচারিটি আছে তাহা অধিকারী-সূত্রধারের উক্তি। জয়দেবের কাব্যে যেমন গানগুলি শ্লোকের দ্বারা কাহিনীশৃঙ্খলে গাঁথা এবং বারো সর্গে বাঁধা, বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যেও তেমনি গানগুলি ছোট ছোট শ্লোক-মালিকায় সংযুক্ত এবং কয়েকটি খণ্ডে[২] বিভক্ত। পাঞ্চালী কাব্যের এইরকম খণ্ড-বিভাগ লোচনের ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায়। সম্ভবত এই পদ্ধতি পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে নেওয়া॥

৪

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যগীতিকাব্য। কাব্যটির গঠন হইতে মনে হয় আসলে এটি ছিল পাঞ্চালিকা-নাট্য অর্থাৎ পুতুল নাচ। গানগুলির মাথায় রাগ-তাল ছাড়াও অন্য কিছু কিছু নির্দেশ আছে। এ নির্দেশ ঠিক অভিনয়ের নয়, পুতুলনাচের সঙ্গে গীত-অভিনয়রীতির নির্দেশ।[৩] পুতুলনাচগানের মধ্যে শ্লোকগুলি কাহিনীর ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে।

---

[১] "ঢামালি" শব্দটি "ঢেমন, ঢেমনা, ঢেমনী" (অর্থ—ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী, জার বা জারিণী) ইত্যাদি-সম্পৃক্ত। কোনও শব্দের সাদৃশ্যে আদি ঢ-কার ধ-কারে পরিণত হইয়া "ধামালি" হইয়া থাকিবে। অথবা "ধামালি" শব্দটি বাদ্যপদ্ধতি বা গীতপদ্ধতি হইতে আসিয়া থাকিতে পারে। "ধামার" তাল এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রাচীন রাজস্থানীতে একজাতীয় কবিতার নাম "ঢমাল"।

[২] শেষখণ্ড—"রাধাবিরহ"—খণ্ড বলিয়া নির্দিষ্ট হয় নাই। এটির কথা বাদ দিলে খণ্ডসংখ্যা মূলে ছিল নয়টি (জন্ম, তাম্বুল, দান নৌকা বা ঘাটদান, ভার, বৃন্দাবন, যমুনা, বাণ ও বংশী), প্রাপ্ত গ্রন্থে তিনটি অতিরিক্ত (ছত্র, কালিয়দমন, হার)।

[৩] বিচিত্রসাহিত্য প্রথম খণ্ড পৃ ২৫-৩২ দ্রষ্টব্য।

কাব্যটি যে পাত্রপাত্রী লইয়া গীতিনাট্য হিসাবে নয়, পাঞ্চালিকা-নাট্য বলিয়া লেখা হইয়াছিল তাহার অকাট্য প্রমাণ শ্লোকগুলি। এগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতার যদি না হয় তবে নিশ্চয়ই সংস্কর্তার,[১] যিনি চণ্ডীদাসের গীতাবলী নাটপালার সুতায় গাঁথিয়াছিলেন। সেই সুতা এই শ্লোকগুলি। যদৃচ্ছা একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। সাধারণ অভিনয়ের পক্ষে এই শ্লোকের নির্দেশ নিরর্থক কিন্তু পুতুলনাচের নির্দেশ হিসাবে অত্যন্ত সার্থক।

নিধায় কলসং কুক্ষৌ বৃদ্ধয়া সহ রাধিকা।
জগাম যমুনাতীরং কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা॥

'কাঁখে কলসী লইয়া রাধিকা কৃষ্ণান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া বৃদ্ধার সহিত যমুনাতীরে গেল।'

কয়েকটি শ্লোক বহুবার পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। ইহার সঙ্গতিও পুতুলবাজির নাটে।[২]

এখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাব্যকাহিনীর পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। প্রথমে জন্মখণ্ড। প্রথম দুই পাতা পাওয়া যায় নাই। এই দুই পাতায় অন্তত চারটি পদে বন্দনা-অংশ সমাপ্ত হইয়াছিল।

কংসের অত্যাচারে সৃষ্টির বিনাশ হয় দেখিয়া ব্রহ্মা দেবতাদের লইয়া ক্ষীরোদসাগরের তীরে গিয়া হরির স্তব জুড়িলে স্তবে তুষ্ট হইয়া হরি কাল ও সাদা দুইগাছি চুল দিয়া বলিলেন বসুদেবের ঔরসে এবং দেবকীর গর্ভে হলী (অর্থাৎ বলরাম) এবং বনমালী (অর্থাৎ কৃষ্ণ) রূপে অবতীর্ণ হইয়া কংসাসুরের বিনাশ সাধন করিবেন। দেবতারা খুশি হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আর নারদ মুনি কংসের নিকট আসিয়া মনের উল্লাসে সঙের মত অঙ্গভঙ্গি করিয়া কংসকে সাবধান করিয়া দিল। (নারদের অঙ্গভঙ্গির বর্ণনা নাচের পুতুলের পক্ষেই খাটে।)

দেবকীর পরপর ছয় গর্ভ কংস নষ্ট করিল। সপ্তম গর্ভ রোহিণীর উদর আশ্রয় করিল। তাহাতে বলশালী বলভদ্রের জন্ম হইল। অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইল। নিশীথে গোপনে বসুদেব কৃষ্ণকে নন্দের গৃহে রাখিয়া যশোদার নবজাত শিশুকন্যাকে লইয়া আসিল। কংস এই কন্যাকে শিলাপাটে আছাড়িয়া মারিল। কন্যা আকাশবাণী করিল, নন্দের গৃহে যে শিশু বাড়িতেছে সে কংসকে

---

[১] মূল কবির রচনা হওয়াই বেশি সম্ভব। রচনায় চাতুর্যের পরিচয় আছে। পুথির স্থানে স্থানে শ্লোক বাদ পড়িয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়। ইহাও মূলের সঙ্গে পুথির ব্যবধান নির্দেশ করিতেছে।

[২] নট-নাট্য-নাটক দ্রষ্টব্য।

বধ করিবে। তখন কংস গোকুলে কৃষ্ণকে মারিবার জন্য পূতনা যমল-অর্জুন এবং কেশী প্রভৃতি অসুর পাঠাইল। কৃষ্ণ সকলকেই বিনাশ করিয়া গোকুলে বাড়িতে লাগিল। সুন্দর শরীরে পীতবসন ও নানাবিধ অলঙ্কার পরিয়া এবং হাতে বাঁশী লইয়া বালক কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোরু চরাইতে থাকিল।

কৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য দেবতাদের অনুরোধে লক্ষ্মী গোকুলে সাগর-গোয়ালার পত্নী পদ্মার গর্ভে রাধারূপে জন্ম লইল।[১] রাধা দিনে দিনে চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। দৈবের নির্দেশে তাহার বিবাহ হইল নপুংসক আইহনের সহিত। মাতাকে বলিয়া আইহন অচিরোদ্ভিন্নযৌবন পত্নীর তত্ত্বাবধায়করূপে পিসী, রাধার মাতামহীকল্প, বুড়ী বড়ায়িকে রাধার সঙ্গিনী করিয়া দিল। এইখানে প্রথম পালা 'জন্মখণ্ড' শেষ। (পুথির পাতা ৩-৫। মোট গান—একটি খণ্ডিত, আটটি সম্পূর্ণ।)

বড়ায়ির তত্ত্বাবধানে রাধা গোপনারীদের সঙ্গে বনপথ দিয়া মথুরা-নগরীতে দধিদুগ্ধ বেচিতে প্রত্যহ যায়। একদিন সখীদের সঙ্গে স্ফূর্তিতে হাস্যপরিহাস করিতে করিতে বড়ায়িকে পিছু ফেলিয়া রাধা অনেকটা আগাইয়া গেল। খেয়াল হইলে বড়ায়িকে না দেখিয়া তাহার ভয় হইল। মাথায় হাত দিয়া রাধা এক বকুলতলায় বসিয়া পড়িল। বড়ায়ি অন্য পথে রাধাকে খুঁজিতে খুঁজিতে কৃষ্ণকে গোরু চরাইতে দেখিয়া তাহার কাছে নাতনীর খোঁজ চাহিল। কৃষ্ণ বলিল, আমি তো তাহাকে চিনি না। সে কি রকম দেখিতে বল দেখি। বড়ায়ি তখন কৃষ্ণের কাছে অলঙ্কারশাস্ত্রবর্ণিত ভঙ্গিতে রাধার রূপ বর্ণনা করিতে লাগিল।

'তাহার কেশপাশ মধ্যে উজ্জ্বল সিন্দুর-শোভা, যেন সজল জলদের মধ্য দিয়া নবসূর্যোদয়। বিমল বদনে স্বর্ণকমলের কান্তি, দেখিয়া লজ্জায় চাঁদ দুইলক্ষ যোজন দূরে চলিয়া গিয়াছে। ...ললিত অলক-পাঁতির কান্তি দেখিয়া তমালপত্রাঙ্কুর লজ্জায় বনমাঝে রহিয়া গিয়াছে। আলস্যময় লোচন কাজলে মণ্ডিত দেখিয়া নীলোৎপল জলের মধ্যে গিয়া তপস্যা করিতেছে। কণ্ঠদেশ দেখিয়া শঙ্খের মনে লজ্জা হইল, তৎক্ষণাৎ সাগরে গিয়া সে আত্মগোপন করিয়াছে। তাহার অতি মনোহর কুচযুগল দেখিয়া অভিমান বশে পাকা দাড়িম বিদীর্ণ হয়। কটি ক্ষীণ, নিতম্ব বিপুল। (রাধা) ধীরে ধীরে চলে। (তাহার গতি) মত্ত রাজহংসকে হার মানাইয়াছে।'

রাধার রূপের এমন বর্ণনা শুনিয়া কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে পড়িয়া গেল এবং অধৈর্য হইয়া বড়ায়িকে বলিল, একবার রাধার সহিত আমার মিলন ঘটাইয়া

---

[১] এখানে গ্রন্থকর্তা (অথবা গ্রন্থসংস্কর্তা) প্রচলিত পুরাণের অনুসরণ করেন নাই। লক্ষ্মী সাগর-দুহিতা, তাঁহারই নামান্তর পদ্মা। সাগর গোয়ালার নাম কোথাও নাই, আছে বৃষভানু।

দাও।[১] বড়ায়ি বলিল, সে আর বেশি কথা কি? আমার হাতে কিছু ফুল ও পান দাও, আর কি বলিতে হইবে বল।[২] তোমার কথায় আমি প্রাণ দিতে পারি। কিছুতে যাহা জোড় মানে না তাহাও আমি জুড়িতে পারি।

সে কি রাধিকা ভৈল সীতা সতী নারী।

বড়ায়ির হাতে কৃষ্ণ কর্পূরবাসিত তাম্বূল ও চাঁপা নাগেশ্বর ইত্যাদি ফুলের মালা ও সন্দেশ দিয়া রাধাকে প্রণয়নিবেদন পাঠাইল।

শুভতিথি, শুভবার, শুভক্ষণ দেখিয়া বড়ায়ি দেবগণকে বন্দিয়া শ্রীরামচরণে প্রণাম করিয়া উপহার লইয়া বৃন্দাবনে[৩] গিয়া রাধিকার দর্শন পাইল। রাধিকাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া পাশে বসিয়া কৃষ্ণের ভেট দিয়া তাহাকে নিবেদন জানাইল। (এখানে ৯ক-খ জোড়া পাতাখানি নাই। তাহাতে কুপিত রাধার প্রত্যাখানের কথা ছিল।) ভৎর্সিত ও অবমানিত বড়ায়ি ফিরিয়া আসিয়া বিফলতার কথা জানাইলে কৃষ্ণ আরও অনুনয় করিয়া পূর্ববৎ উপায়ন দিয়া তাহাকে আবার পাঠাইল। এবারে রাধা আরও রাগিয়া গিয়া পান-ফুল লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল এবং মাথা বুক চাপড়াইতে লাগিল ("হাণএ সকল গাএ")।[৪]

বড়ায়ি বলিল, এ কি করিলে, ভুবনানন্দন নন্দনন্দন যে তোমার দর্শন প্রত্যাশায় জীবন ধরিয়া আছে। রাধা সদর্পে উত্তর করিল, আমার ঘরের স্বামী রহিয়াছে সর্বাঙ্গে সুন্দর সুলক্ষণদেহ, "নান্দের ঘরের গরু-রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা"? বড়ায়ি বলিল, যে দেব স্মরণে পাপবিমোচন ও সাক্ষাৎ মুক্তি হয় সে দেবের সঙ্গে প্রেম করিলে বিষ্ণুপুরে[৫] স্থিতি হইবে। উত্তরে রাধা বলিল, সে নারীর জীবনে ধিক তাহার স্বামী দহে মজুক যে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করিয়া বিষ্ণুপুরে[৫] গতি পায়।[৬] এখানে বেশ একটু ফাঁক আছে

---

[১] এখানে বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রের প্রভাব থাকিতে পারে,—দৌত্য এবং শ্রবণানুরাগ।

[২] পরে এই সঙ্গে সন্দেশেরও উল্লেখ আছে। মনে হয়, মূলে সন্দেশ থাকিলেও তাহা "বার্তা" অর্থে। প্রাপ্ত পুথিতে "সন্দেশ" আধুনিক অর্থে ("তত্ত্ব করার মিষ্টান্ন") ব্যবহৃত হইয়াছে।

[৩] এখানে "বৃন্দাবন" সংস্কর্তার প্রক্ষেপ। তাহা যদি না হয় তবে সম্পূর্ণ বৃন্দাবন খণ্ডটাই পরবর্তী যোজনা।

[৪] ইহাও পুতুলনাচের উপযোগী ভঙ্গি।

[৫] বিষ্ণুপুর মানে বৈকুণ্ঠ। যোগেশচন্দ্র রায় এখানে মল্লরাজধানীর প্রতি ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহা যুক্তিহীন নয়।

[৬] ইহার পরে রাধার উক্তি যে গানটি আছে তাহা প্রক্ষিপ্ত, অর্থাৎ মূল রচনায় ছিল না। ইহার মর্ম অনুনয়সূচক। পূর্ববর্তী পদের পরবর্তী রাধার উক্তির সহিত একেবারে মিল নাই। এই পদ পরবর্তী পদের—যাহাতে বড়ায়ি কৃষ্ণের কাছে রাধার প্রত্যাখ্যানকে অন্যভাবে বিবৃত করিতেছে—ব্যাখ্যা রূপে রচিত।

কাহিনীতে। বড়ায়ি নিশ্চয়ই রাধাকে কৃষ্ণের গুণ্ডামির ভয় দেখাইয়াছিল। তাই রাধা স্বর ফিরাইয়া বলিল, এখনও তো আমার বয়স হয় নাই। বয়স হইলে তখন কৃষ্ণের সহিত প্রেম করিব।

বড়ায়ি আসিয়া কৃষ্ণকে জানাইল, রাধা বলিতেছে যে সে এখন অপ্রাপ্তযৌবন ও কামকলানভিজ্ঞ। সময় হইলে সে তোমার কথা রাখিবে। কৃষ্ণ বলিল, আমি রাত্রিতে রাধাকে স্বপ্নে দেখিয়া এত ব্যাকুল হইয়াছি যে আমার জ্বর আসিয়াছে। তুমি একবার রাধাদর্শন করাও। আর একবার তুমি রাধার কাছে যাও।

বড়ায়ি রাধার কাছে আসিয়া স্বর বদলাইয়া বলিল, কৃষ্ণ তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়া এতই কাতর হইয়াছে যে তাহার প্রাণসংশয়। দেখিতেছি, তুমি পুরুষ-বধের ভাগী হইবে। শুধু একটি মুখের কথায় যদি হয় তবে তাহা দিয়া কৃষ্ণের জীবন রাখিবে না কেন? শুনিয়া রাধা জ্বলিয়া গেল। বুড়ীকে যারপর নাই ভৎর্সনা করিয়া রাগে এক চড় কসাইয়া দিল। বড়ায়ি চুপসাইয়া ফিরিয়া আসিয়া অপমানের প্রতিশোধ দাবি করিল। কৃষ্ণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া সান্ত্বনা দিলেও বড়ায়ি সন্তুষ্ট হইল না। সে রাধাকে জব্দ করিবার জন্য জেদ ধরিল। কৃষ্ণ বলিল, দান চাহিবার ছলে আমি রাধাকে খুব অপমান ও লাঞ্ছনা করিব, তাহার পর তাহাকে বৃন্দাবনে ধরিয়া লইয়া যাইব, এবং শেষে মদনবাণে হানিয়া মুনিবেশ ধরিয়া উদাসীন রহিব। তখন তুমি তাহার পাশে বসিয়া তাহাকে যথেচ্ছ উপহাস করিও।

দিনের পরে দিন যায়। রাধা মথুরার হাটে গিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে, শাশুড়ীকে কড়ি গুণিয়া দেয়। কৃষ্ণের আর সুযোগ মিলে না। শেষে অধৈর্য হইয়া সে বড়ায়িকে বলিল, কাল আমি পথে মহাদানী[১] সাজিয়া থাকিব। তুমি আজ আইহনের বাড়ি শোও গিয়া। সকাল হইলেই তাড়াতাড়ি রাধাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িও।

এইখানে (৫খ-৮খ, ১০-১৫ পাতায়) দ্বিতীয় পালা 'তাম্বুলখণ্ড' শেষ। গানসংখ্যা—দুইটি অসম্পূর্ণ, চব্বিশটি সম্পূর্ণ।

প্রত্যূষে রাধা বেশভূষা করিয়া সখীগণ সঙ্গে লইয়া দধিদুগ্ধ বেচিতে চলিল। যমুনার ঘাটের মুখে পথ রোধ করিয়া কৃষ্ণ বড়ায়িকে বলিল, এ সব গোপবধূ লইয়া কোথায় চলিয়াছ? (অতঃপর ১৬ক-খ ও ১৭ক দেড়খানি পাতা পাওয়া

---

[১] অর্থ প্রধান শুল্কসংগ্রাহক, এখানে হাটে যাইবার পথে তোলা আদায়কারী।

যায় নাই।)…কৃষ্ণ বলিল, হয় আমার কড়ি দাও, নয় তোমার যৌবন একবার উপভোগ করিতে দাও। রাধা বড়ায়িকে বলিল, একি কথা! আমার বয়স মোটে এগার। আর আর সখীদের ছাড়িয়া শুধু আমাকেই বা ও আটকায় কেন। উহার কথারও তো কোন ঠিক পাইতেছি না, একবার দানের কড়ি চায়, আরবার যা তা কথা বলে।

কৃষ্ণ বলিল, ষোল শত গোপী তোমরা পসরা নামাও, আর ভাঁড়-পিছু ষোল পণ কড়ি দিয়া তবে মথুরা যাও।[১] রাধা বলিল, মথুরার পথে মহাদানী কখনও শুনি নাই। এইরূপ কথা কাটাকাটি হইতে হইতে (—এখানে ১৯ক আধ পাতাটি পাওয়া যায় নাই—) কৃষ্ণ কোপ দেখাইয়া রাধার আঁচল ধরিল। রাধা বড়ায়ির কাছে কাঁদিয়া পড়িল। কৃষ্ণ রাধার নিকট প্রেম প্রার্থনা করিল আর শাসাইল, দেব অসুর রাজা যেই হোক না কেন কৃষ্ণের আশা ভঙ্গ করিতে কেহই সাহস করে না ("দেবাসুর নর ঈশ্বর কাহের না ভাঁগে আশে")। রাধা বড়ায়ির নিকট অনুযোগ করিল, ষোল শ গোপীকে ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণ আমাকে আটকায় কেন?…

চিরকাল জীউ মোর সামী আইহন
অনুপাম-বল বীর মতিএঁ গহন।[২]

কৃষ্ণ-রাধার কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিল। দানের দাবিতে হারিয়া গিয়া কৃষ্ণ রাধার প্রেম প্রার্থনা করিতে থাকিলে রাধা কৃষ্ণকে কংসের এবং ধর্মের ভয় দেখাইল। কৃষ্ণ তখন পুরাণ হইতে নজির দিল যে পরদারে পাপ নাই। রাধা সমুচিত উত্তর দিল। কৃষ্ণ বোলে-চালে রাধার মন ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে বড়ায়িও যখন কৃষ্ণের পক্ষে খোলাখুলিভাবে যোগ দিল তখন রাধা রাগিয়া বলিল, তোমার একি কথা! তোমাকে আমার শাশুড়ী আমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছে, আর তোমার এমন ব্যবহার! এখনো তুমি যদি আমার হিত চাও, তবে কৃষ্ণের কথায় কান দিও না। এস আমরা এক পাশে চুপ করিয়া থাকি।

আবার রাধা-কৃষ্ণের বাগ্‌যুদ্ধ চলিল।[৩] রাধার ক্লান্তি আসিয়াছে। অশ্রুরুদ্ধ-

---

[১] এটি কি অন্য পালার পদ? অন্য পালায় রাধার বয়স বার, এবং সেখানে বড়ায়ি উপস্থিত ছিল না।

[২] এটি বোধ হয় মূল পালার পদ।

[৩] দানখণ্ডে একই কথার বারবার পুনরাবৃত্তি হইতে অনুমান করা যায় এ আখ্যায়িকা খুব জন-প্রিয় ছিল এবং সেই কারণেই প্রক্ষেপ-বিস্তারিত হইয়াছে।

কণ্ঠে সে বড়ায়ির কাছে দুঃখ করিতে লাগিল,—বড়ায়ি নাপিত ডাকিয়া আন। কানঢাকা ছাঁদে বাঁধা খোঁপা মুড়াইয়া ফেলিব। আমি আর বেশভূষা করিব না।

কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী
আপনার মাসেঁ হরিণী জগতের বৈরী। ধ্রু।

আবার কৃষ্ণ-রাধার সংলাপ চলিল। কৃষ্ণ রাধার পসার খাইয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিল। তাহাতে রাধা মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বড়ায়িকে ঘরে গিয়া খবর দিতে বলিল। কৃষ্ণ রাধার আঁচল ধরিল। রাধা কাতর হইয়া বলিতে লাগিল, আমি ছেলেমানুষ, আমাকে ছাড়িয়া দাও। কৃষ্ণ কিছুতেই ছাড়িবে না। আবার রাধা বড়ায়ির কাছে খেদ করিল। তাহার পর বড়ায়ি-রাধার সংলাপ।[১] রাধা এতক্ষণে বড়ায়ির মনের কথা জানিতে পারিয়াছে। তবুও সে মনোভাব গোপন করিয়া বলিল

তোহ্মে যবেঁ বোল বড়ায়ি হেন স্বতন্তরে
আহ্মার নিস্তার তবেঁ নাহিঁক দুতরে।
শুনিলেঁ আইহন মোরে করিব আপোয
তোহ্মে এক ভিতে হৈবেঁ আহ্মা লআঁ দোষ।
এবেঁসি জানিলোঁ তোর ভাল নহে মনে
যবেঁ কাঢ়ায়িলি বাট দুসহ আরণে। ধ্রু।
তোহ্মে বড়ায়ি বোলে-চালে হআঁ যাবি পার
আহ্মোত করিব তথাঁ কোণ পরকার।...
তোঁ হেন বড়ায়ি ছিতে মোর হএ ডরে
এ পুনি তোহ্মার লাজ বুঝহ অন্তরে।

'বড়ায়ি, তুমি যদি এমন উদ্ভট কথা বল তবে এ বিপদে আমার নিস্তার নাই। শুনিলে আইহন আমাকে ত্যাগ করিবে। তোমরা একদিকে হইবে, আমাকে লইয়া দোষ হইবে। এখন জানিলাম তোর মতলব ভাল ছিল না যখন (আজ) দুঃসহ অরণ্যের মধ্যে পথ ধরিলে। তুই বড়ায়ি বোলেচালে পার হইয়া যাইবি, কিন্তু আমি কি উপায় করিব?...তোর মতো দিদিমা থাকিতে আমার ভয় হইতেছে,—এ তো তোমারই লজ্জার কথা, মনে ভাবিয়া দেখ।'

একটু ফাঁক পাইয়া রাধা বনে বনে পলাইল। বড়ায়ি তাহার সঙ্গ ছাড়িল না। কিন্তু কৃষ্ণ আগে গিয়া পথ আটক করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া বড়ায়ি সরিয়া পড়িলে রাধা কাঁদিতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহার চক্ষু মুছাইয়া সান্ত্বনা দিল ও

---

[১] প্রথম পদটি পড়িলে বোঝা যায় যে কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত নাই, বোধ হয় অপর দিনের ব্যাপার। এই পদটি এবং পরের পদগুলি সংযোজন বলিয়া মনে হয়। যিনি সংস্কৃত শ্লোক এখানে বসাইয়াছিলেন (?) তিনি ভুল করিয়া পরের পদটিকে কৃষ্ণের উক্তি মনে করিয়াছিলেন। ভনিতার পয়ারে "মোর" যে বড়ায়ির কথা তাহা পরবর্তী পদে রাধার উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হয়।

আবার প্রেমের আর্জি পেশ করিল। আবার কথা-কাটাকাটি চলিল। অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত রাধা দৈবের নির্বন্ধ মনে করিয়া অনিচ্ছায় কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করিল। কৃষ্ণ রাধার অঙ্গ হইতে সব আভরণ কাড়িয়া লইল।

এইখানে তৃতীয় পালা দানখণ্ড শেষ।[১] এটির গানসংখ্যা সমগ্র কাব্যের পদসংখ্যার চতুর্থাংশেরও বেশি। প্রাপ্ত অংশে একশ সাত সম্পূর্ণ ও ছয়টি অসম্পূর্ণ গান আছে।

বাটপাড়ে রাধার আভরণ কাড়িয়া লওয়ার পর হইতে শাশুড়ী রাধার মথুরা গমন নিষেধ করিয়াছে। এইভাবে অনেক কাল কাটিয়া গেল, গ্রীষ্ম শেষ হইয়া বর্ষা শুরু হইল। দীর্ঘকাল বিরহে কৃষ্ণ ছটফট করিতেছে আবার মিলনের আশায়। দানী সাজিলে আর সুবিধা হইবে না বুঝিয়া কৃষ্ণ বড়ায়ির সহিত পরামর্শ করিয়া নৌকা গড়িয়া যমুনায় খেয়ারি হইয়া রহিল। বড়ায়ি বুঝাইয়া শুঝাইয়া গোপীদের ও রাধাকে লইয়া জলপথে মথুরায় চলিল। যমুনার তীরে গিয়া দেখা গেল একটি মাত্র নৌকা আছে। নৌকা ছোট দেখিয়া রাধার ভয় হইল। খেয়ারিকে বলিল, একে একে গোপীদের পার কর। সকলে পার হইলে রাধা বলিল, এইবার আমাকে ও বড়ায়িকে লইয়া চল। খেয়ারি বলিল, এক সঙ্গে দুইজন চড়িলে হইবে না। সুতরাং বড়ায়ি আগে পার হইল। রাধা নৌকায় চড়িয়া কৃষ্ণকে চিনিতে পারিল, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ চলিল। কৃষ্ণ বলিল, রাধা এখন পার হওয়া কঠিন দেখিতেছি। তুমি যমুনার ও পবনের নামে মানসিক কর। মাঝ নদীতে পড়িয়া নৌকা টলমল করিতে লাগিল। কৃষ্ণ বলিল, রাধা, তোমার পসরা ও অলঙ্কার সব ফেলিয়া দাও, তাহাতে নৌকার বোঝা হালকা হইবে। রাধা তাহাই করিল। কৃষ্ণ নৌকাকে আরো টলমল করাইতে লাগিলে রাধা ভয় পাইয়া কৃষ্ণকে জড়াইয়া ধরিল। নৌকা ডুবিয়া গেল। রাধাকে আলিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণ যমুনার জলে ভাসিতে লাগিল। অবশেষে সাঁতার দিয়া দুইজনে তীরে উঠিলে বড়ায়ি রাধাকে অনুযোগ করিল। রাধা এখন সেয়ানা হইয়াছে। সে বলিল, কৃষ্ণ আমাকে বাঁচাইয়াছে। সে না থাকিলে আজ আমি ডুবিয়া মরিতাম। জীবনে তাহার ঋণ শোধ করিতে পারিব না। কিন্তু বড়ায়ি আমার বড় ভয় হইতেছে। আমার পসার সব জলে গিয়াছে। এখন ঘরে ফিরিব কোন সাহসে? রাধার ক্ষতিতে দুঃখিত হইয়া সখীরা নিজের নিজের পসার হইতে কিছু কিছু দিয়া

---

[১] পুথির পাতা ১৫খ হইতে ৭১খ। মাঝে আড়াইখানি পাতা নাই—১৬, ১৯ক, ৪১।

তাহার পসার সাজাইয়া দিল। তাহার পর সকলে মথুরায় গিয়া পসার বেচিয়া ঘরে ফিরিল।

এইখানে পনের পাতায় (৭১খ-৮৬ক) চতুর্থ পালা নৌকাখণ্ডের[১] সমাপ্তি। গানসংখ্যা ত্রিশ। এই পালাটি অখণ্ডিত মিলিয়াছে।

অতঃপর কিছুদিন রাধার দর্শন নাই। শাশুড়ী দণ্ডে দণ্ডে বধূকে খোঁজে, সুতরাং বড়ায়ি আর রাধাকে ঘরের বাহির করিতে পায় না। তখন কৃষ্ণ নূতন বুদ্ধি করিয়া বড়ায়িকে বলিল, এখন শরৎকাল উপস্থিত। লোকে তড়পথে মথুরায় যাইতেছে। তুমি রাধাকে বল ঐ পথে এখন কৃষ্ণের অধিকার নাই—এই বলিয়া তাহাকে যমুনার ধারে লইয়া চল। বড়ায়ি বলিল, তাহা না হয় করিলাম কিন্তু তুমি কি করিবে তাহা ঠিক করিয়া বল, তবে রাধাকে আনিতে পারি। কৃষ্ণ বলিল, আমি ভারী সাজিয়া পথে থাকিব।

> যমুনার পথে আহ্মে ভার সজাইআঁ
> থাকিব পথের মাঝে মজুরিআ হআঁ।
> রাধিকারে বুলিহ বিবিধ-পরকার
> সে যেহ্ন আহ্মাক বহাএ দধিভার।

বড়ায়ি রাজি হইলে কৃষ্ণ বাঁক সাজাইয়া যমুনার পারে গিয়া বসিয়া রহিল। বড়ায়ি আইহনের গৃহে গিয়া রাধার শাশুড়ীকে কহিল, রাধা গোয়ালার ঘরের মেয়ে হইয়া দুধ দই না বেচিয়া ঘরে বসিয়া থাকে কেন? শুনিয়া শাশুড়ী রাধাকে বলিল, তুমি বড়ায়ির সঙ্গে যাও। "ঘরক থাকিতে চাহ কিসের আশে"? শাশুড়ীর আদেশে রাধা পসার সাজাইয়া লইয়া বড়ায়ি ও সখীগণের সঙ্গে মথুরা চলিল। পথে কোন বাধা নাই। সকলে নির্বিঘ্নে যমুনা পার হইল। শরতের রৌদ্রে ভার বহিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া রাধা বড়ায়িকে বলিল, মুটে না হইলে আর চলিতে পারিতেছি না। বড়ায়ি বলিল, মজুরিয়া বলিয়া হাঁক দাও, মজুরিয়া আসিবে, কিন্তু তাহাকে উচিত মজুরি দিতে হইবে। রাধা মজুরিয়া বলিয়া ডাক দিতেই কৃষ্ণ হাজির। (এইখানে ৮৮খ এই আধখানি পাতা নাই।) কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে যাইতে চাহে, কিন্তু মুটের কাজ করিতে রাজি নহে। রাধা-কৃষ্ণের কথা-কাটাকাটি চলিল। শেষে কৃষ্ণ ভার বহিতে রাজি হইলে রাধা কথা দিল, "মনসুখ ভৈলে" বোল ধরিবোঁ

[১] এই খণ্ডের নামান্তর আছে পালার শেষে "ঘট্টাদানখণ্ড" অর্থাৎ 'ঘাটদান খণ্ড'। পূর্ববর্তী "দানখণ্ড" আসলে "বর্ত্মাদান খণ্ড" অর্থাৎ 'বাটদান খণ্ড'। "ঘাটদান" ও "বাটদান" গানের মধ্যে উল্লিখিত আছে।

তোহ্মার"। বহিবার কালে পসার-দ্রব্য কিছু অপচয় হওয়াতে রাধা কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিল। কৃষ্ণ ক্ষুব্ধ হইয়া ভার নামাইয়া রাখিয়া বলিল, ভার বহিব না। রাধা আমার দান দেউক। (এইখানে ৯৫খ এই আধখানা পাতা নাই।) রাধা বলিল, তুমি আমার যে দ্রব্য নষ্ট করিয়াছ তাহাতেই তোমার দান শোধ গিয়াছে। তাহার পর আবার কৃষ্ণ-রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি। রাধা বলিল, তুমি স্বেচ্ছায় মজুরিয়া হইয়াছ। ভার না বও তো ঘর যাও। এই কথায় কৃষ্ণ সুর ফিরাইয়া ভার বহিতে রাজি হইল। রাধা সুযোগ বুঝিয়া বড়ায়ির পসারও কৃষ্ণের বাঁকে চাপাইয়া দিল। ক্ষোভে অপমানে গজগজ করিতে করিতে কৃষ্ণ কাঁধে বাঁক লইয়া চলিল এবং মথুরার উপকণ্ঠে পৌছিয়া ভার নামাইয়া দিয়া মজুরি চাহিল, "ভার রহিল এবে দেহ আলিঙ্গন"।[১] (অতঃপর ৯৮ক এই আধখানি পাতা নাই।) রাধা বলিল, ভার উঠাও। আমার কথার খেলাপ হইবে না, "আসিতে তোহ্মাকে দিবোঁ কোল"। রাধার আশ্বাসে খুশি হইয়া কৃষ্ণ মথুরার হাটে ভার লইয়া গেল। পসার বেচিয়া রাধা গোকুলে ফিরিবার পথ ধরিল। কৃষ্ণও আশায় আশায় সঙ্গ ছাড়িল না।

এইখানে পঞ্চম পালা 'ভারখণ্ড' সমাপ্ত।[২] ইহাতে সম্পূর্ণ উনত্রিশটি ও অসম্পূর্ণ ছয়টি গান আছে।

মথুরা হইতে ফিরিবার পথে রাধা রোদে ঘামে পরিশ্রান্ত হইয়া এক গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। সখীরা সব আগাইয়া যায় দেখিয়া সে বলিয়া দিল তোমরা আমার শাশুড়ীকে বলিও যে রোদ পড়িলে আমি ঘর যাইব। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সুস্থ হইয়া রাধা তরলনয়নে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া কাছে রহিয়াছে। আর যায় কোথায়। "দেবের দেবরাজ আহ্মে বনমালী" বলিয়া কৃষ্ণ সার্টিফিকেট দাখিল করিল। রাধা বলিল, মজুরি নাও, বাজে কথা ছাড়। কৃষ্ণ তখন আবার দানের কথা তুলিলে কথা-কাটাকাটি চলিল। শেষে রাধা বলিল, "ছত্র ধর কাহ্নাঞিঁ দিব সুরতি"। কৃষ্ণ কিছুতেই ছাড়ে না, "দান বিনি আজি কাহ্ন না জাএ"। বড়ায়িও কৃষ্ণকে রাধার মাথায় ছাতা ধরিতে বলিল। কৃষ্ণ তবুও রাজি নয়। আবার দুইজনে কথা-কাটাকাটি।

---

[১] ইহার পরবর্তী পদটিতে আছে, কৃষ্ণ ভার বহিতেছে দেখিয়া সখীরা ও দেবগণ হাসিতে লাগিল। নারদ আসিয়া রাধাকে ভর্ৎসনা করিল। এই গানটি প্রক্ষিপ্ত কিংবা স্থানভ্রষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে একাধিক পদের মিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়। ইহার পর আধখানি পাতা পাওয়া যায় নাই।

[২] পুথির পাতা ৮৬ক-৮৮ক, ৮৯-৯৩ক, ৯৪-৯৭, ৯৮খ-৯৯খ।

এইখানে এগারখানি পাতা, ১০১ হইতে ১১৪, পাওয়া যায় নাই, তাহাতে ছত্রখণ্ডের শেষ এবং বৃন্দাবনখণ্ডের আদি অংশ ছিল।[১] প্রাপ্ত অংশে গানের সংখ্যা—সম্পূর্ণ আটটি, খণ্ডিত একটি।

কৃষ্ণের কথায় বড়ায়ি আইহনের গৃহে আসিয়া ছল করিয়া রাধার সহিত বিজনে সাক্ষাৎ করিল ও কৃষ্ণের নিবেদন জানাইয়া বলিল, কৃষ্ণ মনোহর বৃন্দাবন উদ্যান পাতিয়াছে, সেখানে চল। রাধার মন কিছু নরম হইয়াছে। সে বলিল শাশুড়ী যাইতে দিবে না। বড়ায়ি বলিল, ব্রতের ফুল তুলিবার ছল করিয়া চল। রাধা বলিল, আইহনের মা ব্রতের ব্যাপার সব ভালোই জানে। ওকথা বলিলে হইবে না। তুমি বরং আমার সখীদের শাশুড়ীর কাছে গিয়া ভর্ৎসনা করিয়া এই কথা বল যে, আইহনের মায়ের জন্য দুধ দই বেচা বন্ধ হইয়াছে, দই বিক্রয় করিতে যাইবার জন্য সে বধূকে ভর্ৎসনা করিয়াছে। গোপবধূদের শাশুড়ীর নিকট গিয়া বড়ায়ি এইরূপ বলাতে তাহারা আইহনের মায়ের উপর রুষ্ট হইয়া বলিল

আপন আপন বহু হাটক পাঠায়িব
তোহ্মার ঘরত অন্ন পানি না খাইব।

একঘরে হইবার ভয়ে রাধার শাশুড়ী বধূকে মথুরার হাটে পাঠাইতে রাজি হইল। পরদিন সকালে বড়ায়ি আসিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিবার উদ্দেশ্যে রাধাকে অভিসার-বেশে সজ্জিত হইতে বলিল।[২] যথাসময়ে সকলে পসার লইয়া মথুরায় চলিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, কৃষ্ণ এখন ভালো ছেলে হইয়াছে। হাটদান বাটদান ঘাটদান ইত্যাদির অধিকার ত্যাগ করিয়া এখন সে বৃন্দাবনেই থাকে। কাহাকেও কটু কথা বলে না। বরং

হাটুয়া লোকের তোষে দিআঁ ফুল-ফলে
আগু বাঢ়ায়িআঁ থোএ যমুনার কূলে।

'হেটো লোকেদের ফল-ফুল দিয়া খুশি করে, তাহাদের যমুনার তীর অবধি আগাইয়া দিয়া আসে।'
কথা বলিলে বলিতে গোপীরা বৃন্দাবনের কাছে পৌঁছিল। বৃন্দাবনে নানারকম ফল-ফুলের গাছ, অপূর্ব শোভা। বড়ায়ির মুখে বৃন্দাবনের প্রশংসা শুনিয়া গোপীদের বৃন্দাবন দেখিবার ইচ্ছা হইল। তাহারা বৃন্দাবনে ঢুকিল। কৃষ্ণ আসিয়া রাধাকে বলিল, তোমার জন্যই এই বৃন্দাবন নির্মাণ করিয়াছি। তুমি মাথার পসরা একধারে নামাইয়া রাখিয়া ফুল পর, ফল খাও, যাহা ইচ্ছা কর।

---

১ "ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড"। খণ্ডের অন্তর্গত খণ্ড! পদ্মপুরাণের অনুকরণে?

২ এই গানটি জয়দেবের "রতিসুখসারে গতমভিসারে" গানের অনুবাদ।

রাধা বলিল, সখীরা সঙ্গে রহিয়াছে। উহারা তোমার আমার হাসি ঠাট্টা দেখিলে শাশুড়ী স্বামীকে লাগাইবে। তুমি ফুল-ফলের লোভ দেখাইয়া ওদের এদিকে ওদিকে সরাইয়া দাও। কৃষ্ণ বলিল, তুমি আমার মনের কথাটি ধরিয়াছ। আজ তোমার সখীদেরও ছাড়িয়া দিব না।

ষোল সহস্র তোর সখিগণ
সব্ধার তোষিব আজ্ঞে মন।

কৃষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া গোপীরা যথেচ্ছ ফুল ফল তুলিতে লাগিল।[১] কৃষ্ণের সঙ্গ পাইয়া গোপীরাও প্রেমে পড়িল। কৃষ্ণ বহুমূর্তি হইয়া তাহাদের পরিতুষ্ট করিল, শেষে বহুমূর্তি সংহরণ করিয়া রাধার কাছে গেল।[২] গোপীরা কৃষ্ণকে না দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। এতক্ষণে কৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া রাধা অভিমানে প্রত্যাখ্যান করিল। কৃষ্ণ অনুনয় করিতে লাগিল।[৩] তাহার পর কৃষ্ণ সুর বদলাইয়া বলিল, আমার বৃন্দাবনের লক্ষ সংখ্যার[৪] গাছপালার ফুল-ফল ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিলে কেন? হয় তাহার দাম দাও নয় দামের বদলে "মোরে দেহ চুম্ব কোল"। কৃষ্ণের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া রাধা প্রথমে বড়ায়িকে লইয়া পড়িল, তাহার পর সখীগণের দোষ দিল। কৃষ্ণ সুযোগ বুঝিয়া আরও অনুযোগ করিতে লাগিল। রাধা নিজের দোষ ক্ষালন করিতে চেষ্টা করিল। কৃষ্ণ তাহা মানিল না। বলিল, স্ত্রীবধে দোষ না থাকিলে তোমাকে মারিয়া যমঘরে পাঠাইতাম। রাধা বিনীতভাবে বলিল, তোমার কথাতেই তো গোপীরা ফুল তুলিয়াছে। এখন আমাকে চুরি-দোষ দিতেছ কেন। দেখ আমার হাতে ফুল-ফল কিছুই নাই, কেবল এই গুটিচার ফুল আছে, এগুলি লইয়া তোমার মন ঠাণ্ডা কর। গোপীরা তোমার ফুল-ফল চুরি করিয়াছে, আমি কি জানি? কৃষ্ণ তখন কবিত্ব করিয়া রাধার সর্বাঙ্গের সহিত বিভিন্ন ফুলের উপমা দিয়া বলিল, তোমার শরীরেই তো আমার সব ফুল দেখিতেছি ("দেখোঁ মো ফুল তোর শরীরে")। রাধা সুর পাল্টাইয়া বলিল

---

[১] পদটিতে "অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস" ভনিতা আছে।

[২] রাসের প্রসঙ্গ এই ভাবে সারা হইয়াছে।

[৩] এই গানটি জয়দেবের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" গানের অনুবাদ। ইহার পরে রাধার উক্তি আর অন্তত একটি গানের অভাব রহিয়াছে। পরবর্তী পদের ভনিতা-পয়ারের "অকারণে বোলে রাধা মোরে আনুখর" এই চরণ হইতেও তাহা বোঝা যায়। অথবা পূর্ববর্তী জয়দেবের অনুবাদ-গানটি প্রক্ষিপ্ত।

[৪] "লক্ষকের বৃন্দাবন"। তুলনীয় মনসামঙ্গলে চাঁদোর "লাখরা" বাগান।

সকল পুরুষ মাঝে তোহ্মে বড় নাগর তোহ্মারে কে দিবেক উত্তর
ছাড়হ অলগ্গাল না কর কচাল এড় যাওঁ মথুরা নগর।
বুঝিল বুঝিল তোহ্মার মতি
সম দেখ সকল যুবতি।
কিবা না করিল আহ্মে তোহ্মার এক বচনে লাজে দিআঁ তিলাঞ্জলি
নিজ পতি না চাহিলেঁা তোহ্মাক উপেখিলেঁা সহিলেঁা সাহু-ননন্দ-গালী।

'সকল পুরুষের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ নাগর। তোমার সঙ্গে কে পারিবে। ঝগড়া ছাড়। বাজে কথা বলিও না। ছাড়, মথুরা নগরে যাই। তোমার মন বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি। সব মেয়েকেই সমান দেখিতেছ। তোমার এক কথায় আমি কী না করিয়াছি। নিজের স্বামীর দিকে চাহি নাই। তোমার তোষণ করিলাম। শাশুড়ী-ননদের গালি সহিলাম।'

কৃষ্ণ নরম হইলে রাধার অভিমান দূরে গেল। সে কৃষ্ণকে অনুযোগ করিয়া বলিল

বিধি কৈল তোর মোর নেহে
একই পরাণ এক দেহে।
সে নেহ তিঅজ নাহিঁ সহে
সে পুনি আহ্মার দোষ নহে।

'তোমার-আমার প্রেম বিধির বিধান। (আমাদের যেন) একই প্রাণ এক দেহে। সে প্রেম তৃতীয় কাহাকেও সয় না, তা তো আমার দোষ নয়।'

অতঃপর রাধা-কৃষ্ণের মিলন হইয়া ষষ্ঠ পালা বৃন্দাবনখণ্ডের সমাপ্তি। প্রথম দিকে খানিকটা নাই। আছে ১১২ হইতে ১২৭ পাতা। প্রাপ্ত অংশে একটি অসম্পূর্ণ ও ত্রিশটি সম্পূর্ণ গান আছে।

গোপীদের ও রাধার চিত্তরঞ্জন করিয়া কৃষ্ণ তাহাদের ছাড়িয়া দিল। তাহার পর জলকেলিতে কৃষ্ণের মন হইল। বৃন্দাবনের মধ্য দিয়া যমুনা নদী প্রবাহিত। তাহাতে এক দহ। সে দহে কালিয় নাগ সপরিবারে থাকিত। তাহার বিষে জল অব্যবহার্য হইয়াছিল। কালিয়-দহের জল বিষমুক্ত করিয়া তাহাতে জলকেলি করিতে কৃষ্ণের মন গেল। দহের এক তীরে কদম গাছ ছিল। তাহাতে চড়িয়া কৃষ্ণ জলে ঝাঁপ দিল। পরে তাহাকে জল হইতে উঠিতে না দেখিয়া রাখাল ছেলেরা কাতর হইয়া পড়িল। এমন সময়ে সেই পথ দিয়া রাধা ও গোপীরা মথুরা যাইতেছিল। রাখাল ছেলেদের ব্যাকুলতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে কৃষ্ণ কালিদহে ঝাঁপ দিয়াছে। শুনিয়া রাধা বিলাপ করিতে লাগিল। সংবাদ পাইয়া নন্দ যশোদা ও বলরাম প্রভৃতি ছুটিয়া আসিল। বলরাম বুঝিল কৃষ্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া কালিয়ের বিষে মোহ পাইয়াছে। কৃষ্ণকে আত্মজ্ঞান দিবার জন্য বলরাম দশাবতার স্তব পড়িল।

তখন বাহু আস্ফালন করিয়া কৃষ্ণ জল হইতে উঠিয়া কালিয়-শিরে নৃত্য আরম্ভ করিল। কালিয়ের প্রাণ যায়-যায় হইল। তাহার পত্নী কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলে সদয় হইয়া কৃষ্ণ তাহাদের অভয় দিল ও দক্ষিণ সাগরে বাস করিতে পাঠাইল। জল হইতে কৃষ্ণকে নির্বিঘ্নে উঠিতে দেখিয়া গোপীরা আনন্দে অধীর হইল। যশোদার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিতে লাগিল। নন্দ-যশোদাকে কৃষ্ণ প্রণাম করিল, অন্য সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া রাধার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া হাত যোড় করিয়া বলিল, আমার কথা মনে রাখিও। তোমরা এই দহের জল খাইতে পাও নাই এই জন্য আমি কালিয় দমন করিলাম। সকলের অনুমতি লইয়া কৃষ্ণ কালিদহে ঘাট বাঁধাইয়া দিল।

এইখানে ১২৭খ-১৩২খ পাতায় সপ্তম পালার প্রথম আখ্যান 'যমুনান্তর্গত-কালিয়দমনখণ্ড' সমাপ্ত।[১] ইহাতে দশটি সম্পূর্ণ গান আছে।

একদিন রাধা সখী সব লইয়া যমুনায় জল আনিতে গিয়াছে। কালিদহের কূলে গিয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া তাহারা অন্য ভাব অবলম্বন করিল। কৃষ্ণের কাছে গিয়া রাধা বলিল, একবার সরিয়া যাও, আমার সখীরা জল লইবে। কৃষ্ণের সঙ্গে যেন কখনো পরিচয় নাই এই ভাবে সে কথা বলিতে লাগিল। রাধার এমন নীরস বাণীতে ভরসা না পাইয়া কৃষ্ণ শেষে অনুযোগের সুর তুলিল।

যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে
তরল করিলেঁ কেহে নয়নযুগলে।
আধ-মুখ ঢাকিলে সরুঅ বসনে
তে কারণে রাধা ধরিতে নারেঁা মনে।
যমুনা নদীর রাধা তুলিতে পানি
কেহে ধীরেঁ ধীরেঁ বুইলে মধুরসবাণী।···
বাতল হয়িলেঁা মো তোহ্মার দোষে।
তোরে করিতেঁ জুআএ মোর পরিতোষে।

'রাধা, কেন তুমি যমুনাতীরে কদম্বতলে আসিয়া নয়নযুগল তরল করিয়াছিলে? কেন তুমি সরু কাপড়ে মুখ ঢাকিয়াছিলে। সেই কারণে আমি মন দমন করিতে পারিতেছি না। রাধা, যমুনার তীরে জল তুলিতে গিয়া কেন ধীর মধুর সম্ভাষণ করিলে?···তোমার দোষে আমি পাগল হইয়াছি। তোমার উচিত আমাকে তুষ্ট করা।'

রাধাও পিঠপিঠ উত্তর দিল।

লাজ-ভয়েঁ ভৈল মোর তরল নয়নে
সম্বরেঁ ঢাকিলেঁা মুখ দেহের বসনে।
যমুনা নদীর আহ্মে তুলিল পানি
এহো দোষ নহে যেন বুয়িলো খর বাণী।···
পাগল হৈলা কাহ্নাঞি নিজ মতিদোষে

[১] মূল পুথিতে কি শুধু যমুনা খণ্ডই ছিল? কালিয়দমন যমুনাখণ্ডেরই প্রথম উপখণ্ড।

'লজ্জায় ভয়ে আমার চক্ষু চঞ্চল হইয়াছিল তাই তাড়াতাড়ি আঁচলে মুখ ঢাকিয়াছিলাম। যমুনার তীরে আমি জল তুলিতে গিয়াছিলাম। এও কি আমার দোষ যে কটু কথা বলি নাই?···নিজের বুদ্ধির দোষে কানাই তুমি পাগল হইয়াছ।'

কৃষ্ণ বড়ায়িকে সাক্ষী মানিল। বড়ায়ি কৃষ্ণের পক্ষ লইলে রাধা কৃষ্ণেরই দোষ দিল। কৃষ্ণ দুঃখ করিয়া বলিল, কিছু অপরাধ করি নাই তবুও ক্রোধ।

তাহার পর রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি। শেষে কৃষ্ণ সকলকে জল লইতে অনুমতি দিলে জল তুলিয়া রাধা কৃষ্ণের কাছে গিয়া চুপি চুপি কিছু শুনিবার জন্য কান পাতিল। কৃষ্ণ অমনি তাহার কপোলে চুম্বন করিল। রাধা চটিয়া গিয়া জোরে জোরে ঘরের দিকে পা বাড়াইলে কৃষ্ণ অনুনয় করিতে করিতে পিছু পিছু চলিল।

ধীরেঁ যাহ গোআলিনী শুন মোর বোল
রহিআঁ রহিআঁ দেহ বিরহের কোল।

'গোয়ালিনী ধীরে চল। আমার কথা শোন। মাঝে মাঝে আলিঙ্গন দিয়া বিরহে সান্ত্বনা দিও।

রাধা বলিল, তোমার কি কিছু বিবেচনা নাই? পথে ভালোমন্দ কত লোক যাইতেছে, তাহারা কী মনে করিবে। ঘরে দুর্জন শাশুড়ী রহিয়াছে। তখন কৃষ্ণ বড়ায়ির কাছে দুঃখ করিতে লাগিল। বড়ায়ি আসিয়া রাধাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, তোমার কি এখনও বুদ্ধিশুদ্ধি হইল না। কাহার পরামর্শে তুমি কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ? তোমার যে-সব সখী দেখিতেছ তাহারা কেহই তোমার হিতকামী নয়। তাহারা নিজের কাজে ব্যস্ত। সকলেই চায়, কৃষ্ণের যেন তোমার উপর বিরাগ জন্মে। সখীগণ সঙ্গে করিয়া যমুনায় গিয়া কৃষ্ণকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে বড়ায়ি রাধাকে উপদেশ দিল। রাধা তাহাই করিল। তখন গ্রীষ্মকাল—"শীতল গম্ভীর জলে রহিতেঁ সুখাএ"।

কৃষ্ণ ও গোপীগণ কালিদহে জলকেলি করিতে নামিল। কৃষ্ণ জলে ডুব দিয়া চুপ করিয়া রহিলে গোপীরা ভাবিল কৃষ্ণ ডুবিয়া গিয়াছে। পরের দিন আসিয়া ভালো করিয়া খুঁজিবে ঠিক করিয়া তাহারা বিলাপ করিতে করিতে গৃহের দিকে মুখ করিলে কৃষ্ণ জল হইতে উঠিয়া সে রাত্রি বৃন্দাবনে কাটাইল। খুব সকালে গোপীরা কৃষ্ণকে খুঁজিতে আসিল। তখন স্নানের সময় নয় বলিয়া সকলে একবস্ত্রে আসিয়াছে। এত ভোরে নিকটে কেহ থাকিবে না মনে করিয়া তাহারা ঘাটে বসন রাখিয়া জলে নামিয়া পড়িল। কৃষ্ণ কদম গাছে বসিয়াছিল। এখন নামিয়া আসিয়া সব বসন লইয়া আবার গাছে উঠিয়া

গেল। শেষে সকলকে ভৎর্সনা করিয়া বস্ত্র ফিরাইয়া দিল, কিন্তু রাধার হার দিল না।[1]

হারের জন্ত রাধা বড়ায়িকে কৃষ্ণের নিকট পাঠাইল। (এইখানে ১৪৫ হইতে, ১৫১ পর্যন্ত এই সাতখানি পাতা পাওয়া যায় নাই।) কৃষ্ণের অত্যাচারের কথা রাধা যশোদাকে জানাইল। যশোদা কৃষ্ণকে তিরস্কার করিলে কৃষ্ণ রাধা ও গোপীদের দোষ দিয়া বলিল, গোপীরাই আমার উপর অত্যচার করে, আমাকে খাটায়।

কেহাে ধরে ঘোড়াচুলে কেহো ধরে হাথে
দধির পসার তুলিআঁ দেঁতি মাথে।
আঅর না জায়িব মা বাছা রাখিবারে
ষোল শত যুবতীএঁ আহ্মারে বল করে।
যমুনার তীরে গোপীজন লআঁ রঙ্গে
কেলি কৈল রাধা পরপুরুষের সঙ্গে।
বুলিতেঁ চাহিলোঁ আমি রাধার দোষে
আগেঁ আসি দোষে রাধা মোরে সেই রোষে।···
গরু রাখিবাক বুলেঁ। যমুনার কূলে
মামী মামী বুলিতেঁ আধিকেঁ বল করে।

'কেউ ধরে ঝুটি কেউ ধরে হাত, আর আমার মাথায় পসার তুলিয়া দেয়। মা, আর আমি বাছুর রাখিতে যাইব না। ষোল শ জোয়ান মেয়ে আমার উপর জোর খাটায়। গোপীদের লইয়া রাধা যমুনার তীরে পরপুরুষের সঙ্গে রঙ্গরস ও স্ফূর্তি করিল। আমি ঘরে আসিয়া বলিয়া দিতে চাহিয়াছিলাম। সেই রাগে রাধা আসিয়া আগে ভাগে আমাকে দুষিয়াছে।···গোরু তাড়াইবার জন্ত যমুনার কূলে ঘুরিয়া বেড়াই। মামী মামী বলিতে গেলে রাধা বেশি করিয়া মারে।'

বড়ায়ি আসিয়া রাধাকে প্রবোধ দিয়া গৃহে লইয়া গেল। সে আইহনকে বলিল, আজ বহু ভাগ্যে রাধাকে লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিয়াছি। দামাল বলদে রাধাকে তাড়া করায় সে কাঁটা বনে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। তাই উহার আলুথালু বেশ আর ফিরিতে বিলম্ব। আইহন বড়ায়ির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

এইখানে আড়াই পাতায় (১৪৪খ, ১৫২-১৫৩) যমুনাখণ্ড (বা হারখণ্ড)[2] শেষ হইল। তিনটি সম্পূর্ণ ও দুইটি অসম্পূর্ণ গান।

---

[1] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায়ের মতে এখানে যমুনাখণ্ড শেষ। কিন্তু পুথিতে এখানে যমুনাখণ্ড বলিয়া কোন নির্দেশ নাই। পরে আছে "যমুনান্তর্গত হারখণ্ড"। তুলনীয় "ভার-খণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড"। আসলে ইহা যমুনাখণ্ডের দ্বিতীয় আখ্যান, অর্থাৎ বস্ত্রহরণ উপখণ্ড। এখানে সম্পূর্ণ গানসংখ্যা বাইশ। বস্ত্রহরণ কাহিনীর এ উপস্থাপন অভিনব এবং অপ্রাচীন।

[2] পালার গোড়ায় আছে 'যমুনাখণ্ড' আর শেষে আছে 'হারখণ্ড'। আসলে যমুনাখণ্ডের তৃতীয় আখ্যান, হার-উপখণ্ড।

যশোদার কাছে কৃষ্ণের দুষ্টামি ফাঁস করিয়া দেওয়াতে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া বড়ায়িকে বলিল, রাধাকে মারিয়া ফেলিতাম, কেবল তোমার খাতিরেই ছাড়িয়া দিয়াছি। আজ হইতে তাহার আশা ত্যাগ করিলাম। বড়ায়ি বলিল, রাধা বড় দুষ্ট। তাহাকে মদনবাণে বিদ্ধ কর, তবেই সে জব্দ হইবে। বড়ায়ির যুক্তিতে কৃষ্ণ সুবেশ ধারণ করিয়া পুষ্পময় ধনুর্বাণ লইয়া কদমতলায় বসিয়া রহিল। বড়ায়ি গিয়া রাধাকে হাটে যাইতে বলিলে বড়ায়ির সঙ্গে রাধা মথুরা চলিল। বৃন্দাবনে পৌছিলে বড়ায়ি কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া কাছে গিয়া বলিল, রাধাকে আনিয়াছি। বড়ায়ির দ্বারা কৃষ্ণ রাধাকে ক্ষমা চাহিতে বলিয়া পাঠাইল। রাধা বলিল, ক্ষমা কিসের? কৃষ্ণ ধনুর্বাণ লইয়া আসুক, তাহাতে আমি একটুও ভয় করি না। তাহার পর কৃষ্ণ-রাধার উক্তিপ্রত্যুক্তি। কৃষ্ণকে মদনবাণ মারিতে উদ্যত দেখিয়া রাধা মিনতি করিল। কৃষ্ণ উত্তর দিল। রাধা বড়ায়িকে অনুনয় করিয়া বলিল, এবারটি আমায় প্রাণে বাঁচাও। আমি লক্ষ মূল্যের আংটি পুরস্কার দিব। না শুনিয়া কৃষ্ণ বাণ মারিল, রাধা মূর্চ্ছা গেল। বড়ায়ি বলিল, কেন এ কাজ করিলে? আমি তো তোমাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম। কৃষ্ণের ভয় হইল। বড়ায়ি কৃষ্ণকে স্ত্রীবধপাতক এবং কংস এই দুই ভয় দেখাইতে লাগিল। তাহাতে কৃষ্ণ আরো ভয় পাইল। বড়ায়ি কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া বাঁধিয়া রাখিল। কৃষ্ণ বলিল, যথেষ্ট অপমান হইয়াছে। রাধাকে বাঁচাইয়া দিতেছি, এখন আমার বন্ধন ঘুচাও যেন দেবতারা না দেখে। বড়ায়ি কৃষ্ণের বন্ধন খুলিয়া দিল ও রাধাকে শীঘ্র উজ্জীবিত করিতে বলিল। কৃষ্ণ মূর্চ্ছাপন্ন রাধাকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল[১]

মাএর আগে কৈলি আহ্মার খাঁখার
সব মরষিল রাধা জিঅ একবার।…
বারেক সুন্দরী রাধা শুন মোর বোল
মিনতি করিআঁ বোলোঁ গাঅখানি তোল।
ছাড়িলেঁ। মো মাহাদাণ তেজিলেঁ। মো বাটে
উঠ দধি বিচ নিআঁ মথুরার হাটে।

'মায়ের কাছে আমার নিন্দা করিয়াছিলে, সে সব ক্ষমা করিলাম, তুমি একবার বাঁচিয়া উঠ।…সুন্দরী রাধা, একবার আমার কথা রাখ। মিনতি করিয়া বলিতেছি একবার গাখানি তোল। দানের কড়ি ছাড়িয়া দিলাম, পথেও আর কিছু করিব না। তুমি উঠ, দই লইয়া মথুরার হাটে বেচ গিয়া।'

কৃষ্ণ রাধার অঙ্গ স্পর্শ করিলে চেতনা ফিরিয়া আসিল। তালপাতার পাখায়

---

[১] চারটি গানে।

বাতাস করিয়া কৃষ্ণ রাধাকে যমুনার নির্মল জল পান করাইল। তাহার পর তাহার মনটি কাড়িয়া লইয়া বৃন্দাবনে গিয়া লুকাইয়া রহিল। রাধা বড়ায়িকে লইয়া বৃন্দাবন ঢুঁড়িয়া অনেক কষ্টে কৃষ্ণের সন্ধান পাইল। রাধা-কৃষ্ণের মিলন হইল। বড়ায়ি রাধাকে গৃহে লইয়া গেল।

এইখানে সাড়ে পনর পাতায় (১৫৩খ হইতে ১৬৮খ) অষ্টম পালা 'বাণখণ্ড' সমাপ্ত। এইখণ্ডে সাতাশটি সম্পূর্ণ গান আছে।

রাধা ও তাহার সখীরা যমুনার ঘাটে স্নান করিতে যায়, আর কৃষ্ণ নিকটে থাকিয়া নানা বাদ্য বাজাইতে থাকে। রাধা তাহাতে কান দেয় না। তখন কৃষ্ণ এক অপূর্ব বাঁশি গড়িল। তাহাতে সোনা-হীরার কাজ।

হরিষেঁ পুরিআঁ কাহ্নাঞি তাহাত ওঁকার
বাঁশীর শবদেঁ পারে জগ মোহিবার।

'তাহাতে হর্ষভরে ওঙ্কার ধ্বনি তুলিয়া কৃষ্ণ সেই বাঁশীর শব্দে জগৎ ভুলাইতে পারে।'

বাঁশির ধ্বনি শুনিয়া রাধা ব্যাকুল হইয়া বড়ায়িকে বলিতে লাগিল

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে।...
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা
দাসী আঁহ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে।
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী।...
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন-আভিলাসে

'বড়ায়ি, কে সে বাঁশী বাজায় কালিন্দী নদীর কূলে? কে সে বাঁশী বাজায়, বড়ায়ি এ গোকুলে গোষ্ঠে?...কে সে বাঁশী বাজায় বড়ায়ি? সে কোন্ জন? দাসী হইয়া নিজেকে তাহার পায়ে উৎসর্গ করিব। কে সে বাঁশী বাজায়, বড়ায়ি, মনের আনন্দে? বড়ায়ি, তাহার পায়ে আমি কোন্ দোষ করিলাম? আমার চোখের জল অঝোরে ঝরিতেছে। বড়ায়ি, বাঁশীর শব্দে আমি যে প্রাণ হারাইলাম।...পাখি নই যে তাহার ঠাঁই উড়িয়া পড়িয়া যাই। পৃথিবী দ্বিধা হোক, ঢুকিয়া লুকাই আমি! ওগো বড়ায়ি, (যখন) বন পোড়ে জগৎ-জন জানিতে পারে। আমার মন কুম্ভকারের পোয়ানের মতো পুড়িতেছে। কৃষ্ণের তৃষ্ণায় আমার হৃদয় শুখায় যে।'

অস্থির হইয়া রাধা বড়ায়িকে বলিল, কৃষ্ণকে আনিয়া আমার আশা পূর্ণ কর।

বড়ায়ি বলিল, আমি বুড়ো মানুষ, কি করিয়া ঘড়িয়ালকুম্ভীরপূর্ণ যমুনায় পার হইব। বাঘভালুকপূর্ণ ভয়ঙ্কর বৃন্দাবনেই বা তাহাকে খুঁজিয়া পাই কোথায়। রাধা করুণভাবে জেদ করিতে লাগিলে বড়ায়ি বলিল, আগে যাহা হইয়াছে চুকিয়া গিয়াছে, আবার পাপ করিতে চাও কেন। রাধা তবুও ব্যাকুলতা করিতে লাগিল। অবশেষে বড়ায়ি সম্মত হইল। এমন সময় কৃষ্ণ বৃন্দাবন-মধ্য হইতে বংশীধ্বনি করিল।[১] শুনিয়া রাধা পুলকিত হইয়া বড়ায়িকে আবার জেদ করিতে লাগিল। বড়ায়ি বলিল, কৃষ্ণ কোথায় আছে জানি না, কত ঘুরিব। বুড়ো মানুষকে তোমার দয়া নাই কেন। রাধা বলিল

প্রাণ আকুল ভৈল বাঁশীর নাদে
এবেঁ আসিআঁ কাহ্নাঞি দরশন না দে।[২]
আহ্মা উপেখিআঁ গেলা নান্দের নন্দন
তাহাত মজিল চিত না জাএ ধরণ।...
বড়ার বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝী
কাহ্ন বিণি মোর রূপযৌবনে কী।...
মন্দ পবন বহে কালিনী নই তীরে
কাহ্নাঞি সোঁঅরী মোর চিত নহে থিরে।

'বাঁশীর নাদে প্রাণ আকুল হইল। এখনও আসিয়া কানাই দর্শন দেয় না যে। নন্দের নন্দন আমাকে উপেক্ষা করিয়া গেল। আমার চিত্ত তাহাতে মজিয়াছে, আর রাখা যায় না।...আমি বড়লোকের বউ, বড়লোকের মেয়ে। কানু বিনা আমার রূপযৌবনে কী হইবে?...কালিন্দী নদীতীরে মৃদু বায়ু বহিতেছে, কানাইকে মনে করিয়া আমার মন স্থির রয় না।'

বড়ায়ি বলিল, আগে নানাভাবে কৃষ্ণের অপমান করিয়াছ, আর "এখন বোলহ রাধা আহ্মার মরণ"। রাধা বলিল, বাঁশির নাদে আমার গৃহকর্ম চুলায় যাইতেছে। তাহাকে না পাইলে আমার প্রাণ তো বাঁচে না। বড়ায়ি উপহাস করিতে লাগিল। রাধা বলিল, কাঁখে কলসী লইয়া যমুনার ধারে এই তো কত খুঁজিলাম, কিন্তু কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম না। কৃষ্ণকে পাইবার কোন শুভলক্ষণও দেখিতেছি না।[৩] বড়ায়ি বলিল, অনেক তো খোঁজা হইল। সন্ধ্যা নামিয়াছে, বাড়ি যাই চল। বিরহে বিকল হইয়া কৃষ্ণ আপনিই তোমার কাছে ধরা দিবে। দুইজনে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

রাত্রিতে কৃষ্ণ আচম্বিতে বংশীধ্বনি করিল। তখন রাধার স্বামী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

---

[১] এই গানের আগে বোধ হয় মূলে একাধিক পদ ছিল। তাহা না হইলে বড়ায়ির উক্তির ("কিসক মরিতে চাহ তোহ্মে") মানে হয় না। [২] পাঠ "নঁাদে"।

[৩] ইহার পূর্বেও কিছু পদ ছিল কি?

উত্তরলী হয়িলী রাহী বাঁশীর নাদে
বিরহেঁ বিকলী হআঁ গোআলিনী কান্দে।
শ্রীরঘুনন্দন[১] গোবিন্দ হে
আনাথী নারীক সঙ্গে নে।

'বাঁশীর নাদে রাধা উতরোল হইল। বিরহে বিকল হইয়া গোয়ালিনী কাঁদিতে লাগিল (এই বলিয়া) হে শ্রীরঘুনন্দন গোবিন্দ, অনাথ নারীকে সঙ্গে নাও।'

রাধা নাহ-দুয়ারে গেল, কিন্তু কোথায় কৃষ্ণ। সমস্ত রাত্রি উদ্বেগে কাটাইয়া সকালে রাধা বিরহভরে মূর্চ্ছা গেল। বড়ায়ি আসিয়া মুখে জল দিয়া চেতন করাইয়া যুক্তি দিল, চল যমুনার তীরে গিয়া কৃষ্ণের বাঁশি সরাইয়া ফেলি। আমি নিদালি মন্ত্রে তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া দিব, তুমি তাহার বাঁশি চুরি করিয়া ঘরে চলিয়া আসিবে। রাধা তাহাই করিল। কৃষ্ণ বাঁশি হারাইয়া কাতর হইয়া বিলাপ করিতে থাকে। রাধা বলে, তুমি গোপীদের অপমান করিয়াছ, তাই বোধ হয় তাহারা তোমার বাঁশি চুরি করিয়াছে। এখন ষোল শ গোপীর কাছে হাত জোড় কর, বাঁশি পাইতেও পার। কৃষ্ণ বুঝিল, রাধাই চোর। দুইজনের তর্কাতর্কি চলে। রাধা কিছুতেই অপরাধ স্বীকার করে না। শেষে বড়ায়িও রাধার ষোল শত সঙ্গিনীর কাছে হাতজোড় করিতে কৃষ্ণকে উপদেশ দিল। কৃষ্ণ বলিল, তাহাতে যদি বাঁশি না দেয় তবে লোকের উপহাসই পাইব। বড়ায়ি রাধার নিকট আসিয়া বাঁশির শোকে কৃষ্ণের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বাঁশি ফিরাইয়া দিতে বলিল। রাধা তখন কৃষ্ণকে বলিল, তোমার কথার ঠিক নাই। তুমি যদি বড়ায়ির নিকট সত্য কর কদাচ আমার কথার অন্যথা করিবে না, তবে বাঁশির সন্ধান পাইবে। কৃষ্ণ বড়ায়ির নিকট শপথ করিলে রাধা বাঁশি ফেরত দিল। বাঁশি পাইয়া কৃষ্ণ খুশি হইয়া গেল। একটু পরে বড়ায়ি রাধাকে লইয়া ঘরে ফিরিল।

এইখানে (১৬৮খ-১৮৯খ পাতায়) নবম পালা 'বংশীখণ্ড' সমাপ্ত। গানসংখ্যা একচল্লিশ।

কয়েক মাস কাটে। রাধা কৃষ্ণের দেখা আর পায় না। চৈত্র মাস আসিল। বড়ায়ির কাছে রাধা বিলাপ করে,—সখীর কথায় সজলনলিনীদলে শুইলাম। কিন্তু দেখি যে সে আগুনের চেয়েও গরম। কৃষ্ণ আমাকে ডালি ভরিয়া ফুল-পান পাঠাইয়াছিল, আমি তাহা হাতেও ছুঁই নাই, উপরন্তু তোমাকে চড় মারিয়াছিলাম। বোধ হয় তাহাতেই কৃষ্ণ বিরূপ হইয়াছে। আমি গঙ্গাসাগরে গিয়া গায়ের মাংস কাটিয়া মকর-ভোজ দিব। তাহাতে পরজন্মে আর কৃষ্ণের

[১] সম্পাদকের পরিবর্তিত পাঠ "শ্রীনন্দনন্দন"।

সহিত বিচ্ছেদ হইবে না। যেমন করিয়া পার, বড়ায়ি, কৃষ্ণকে আনিয়া দাও।[১] রাধার অনুনয় শুনিয়া বড়ায়ি বলিল, ফুল-পান ফেলিয়া দিয়া অপমান করিয়াছিলে, এখন চুপ করিয়া থাক। রাধা খেদ করিতে লাগিল

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ অসার
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ য়ে সিষের সিন্দুর
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর।…
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর
যোগিনীরূপ ধরি লইবোঁ দেশান্তর।
যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে।…
মাথে শম্ভু সম খোঁপা শিসতে সিন্দুর
এহা দেখি কেহ্নে কাহ্ন গেলান্ত বিদুর।

'এ ধন-যৌবন, বড়ায়ি সবই অসার। গজমুক্তার হার আমি ছিঁড়িয়া ফেলিব। কপালের সিঁদুর মুছিয়া ফেলিব। হাতের বালা আমি শঙ্খচূর্ণ করিব।…মাথা মুড়াইয়া ফেলিব, সাগরে যাইব। যোগিনীর বেশ ধরিয়া দেশত্যাগ করিব। কর্মফলে যদি কানু না মিলে তবে আমি হাতে তুলিয়া বিষ খাইব।—মাথার উপরে (আমার) শিবের মতো[২] খোঁপা, কপালে সিঁদুর, ইহা দেখিয়াও কানু দূরদেশে চলিয়া গেল!'

বড়ায়ি বলিল, কৃষ্ণ অনেক মনস্তাপ পাইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছে, আর আসিবে বলিয়া মনে হয় না। আমি কোথায় বা খুঁজি।[৩] রাধা বড়ায়িকে শত পল সোনা (খরচ বা ঘুষ) দিয়া বলিল, কৃষ্ণকে তুমি এই সকল স্থানে খুঁজিও— সুবলের ঘর, যশোদার কোল, যমুনার কূল, গোকুলের গোচারণ-ভূমি, যমুনার ঘাট, বৃন্দাবন, গোপগণ-স্থান, সঙ্কেত-স্থান, গোপীগণের নিকট, ভাগীরথীকূল, সাগর গোপের ঘর, শেষে সর্বজনস্থানে। তাহাতে বড়ায়ি বলিল, আমি অতিবড় বুড়ী, চলিতে পারি না। তুমি চণ্ডীর পূজা মানসিক করিয়া[৪] নিজেই খোঁজ কর। নাগাল পাইলে তাহার পায়ে ধরিও, সে সদয় হইবে। চল তুমি আমার সঙ্গে মথুরাপুরীতে, সেখানে হরি মিলিবে। আর তাহার সঙ্গ ছাড়িও না।[৫]

---

[১] ইহার পরের গানটিও রাধার উক্তি। পদাবলীসংগ্রহে সেটি রূপান্তরিতভাবে পাওয়া গিয়াছে।

[২] অর্থাৎ শিবলিঙ্গের আকার।

[৩] এই গানে "আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস" ভনিতা আছে।

[৪] "চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ"। খুল্লনা মঙ্গলচণ্ডীকে পূজা মানিয়া হারানো ছাগল পাইয়াছিল। চণ্ডী হারানো-পাওয়ার দেবতা।

[৫] ভনিতা, "অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে"।

রাধা দই-দুধ বেচার নাম করিয়া মথুরায় কৃষ্ণ-অন্বেষণে যাইতে চাহিল। তাহার মনে অনুতাপ জাগিতেছে,—"না মরিলোঁ কাহ্নাঞির তাম্বুলে"। বড়ায়ি বলিল, চল বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে খুঁজি।[১] রাধা বিলাপ করে।

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ বড়ায়ি না মানিলোঁ লঘুগুরু জনে
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে আন লআঁ বঞে বৃন্দাবনে।
বড়ায়ি গো কত দুঃখ কহি কাঁহিণী
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল মোঞ নারী বড় আভাগানী।

'যে কানুর জন্য আমি অন্যকে চাহি নাই, লঘুগুরু মানি নাই, সে কানু, মনে হইতেছে, আমাকে ক্রোধে উপেক্ষা করিয়া অন্যকে লইয়া বৃন্দাবনে কাল কাটাইতেছে। বড়ায়ি গো, দুঃখকাহিনী কত কহিব। দহ বলিয়া ঝাঁপ দিলাম, আমার ভাগ্যে তা শুখাইয়া গেল। আমি বড় অভাগিনী নারী।'

বড়ায়ি বৃন্দাবন যাইতে সম্মত হইল। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিয়া রাধা তবুও খেদ করে। বড়ায়ি বলিল, চল কদমতলায় দেখি গিয়া। রাধা লাসবেশ করিয়া কদমতলায় কিশলয়শয্যা পাতিয়া কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় রহিল।

তরুদল চালএ পবনে
কাহ্ন আইসে হেন তাক মানে।[২]

কৃষ্ণ আর আসে না দেখিয়া রাধা খেদ করে।[৩] বড়ায়ি বলে, কৃষ্ণ সকালে বাঁশি বাজাইয়া বনের ভিতর গিয়াছে, চল দেখি গিয়া। বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া তাহারা কৃষ্ণকে গোরু চরাইতে দেখিল। দেখিয়া রাধা মূর্চ্ছা গেল। বড়ায়ি মুখে জল দিয়া চৈতন্য করাইল। রাধা কৃষ্ণের নিকট অতীত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল।

বিরহে বিকল গোসাঞি তোহ্মে বনমালী
যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে আতিশয় বালী।
পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দুতী
সেহো দোষ খণ্ড মোর মদনমুরুতী।...
বারেঁ বারেঁ তোক যত বুয়িলোঁ আহঙ্কারে
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব দামোদরে।...
আর দুখ দিলোঁ তোক বহায়িলোঁ ভার
সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আহ্মার।
না শুনিলোঁ তোর বোল লআঁ জাইতে পাণী
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব চক্রপাণি।
আনাথী নারীক কত থাকে আভিমান
আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্ন রাখহ পরাণ।

---

১ স্পষ্টতই ইহা অন্য পালার পদ।
২ এটুকু গীতগোবিন্দের অনুবাদ—"পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্॥"
৩ পাঁচ গানে।

'প্রভু বনমালী, তুমি বিরহে বিকল হইয়াছিলে, যখন আমি অতিশয় বালিকা ছিলাম, তোমার পান-ফুল লই নাই, তোমার দূতীকে মারিয়াছিলাম। হে মদনমূর্তি, সে সব আমার দোষ ক্ষমা কর। বারে বারে অহঙ্কারে তোমাকে যত (কটু কথা) বলিয়াছি সেও আমার দোষ, ক্ষমা কর, হে দেব দামোদর। আর তোমাকে ভার বহাইয়া যত দুঃখ দিলাম, জগন্নাথ, সে আমার দোষ, ক্ষমা কর। জল লইয়া যাইবার কালে তোমার কথা শুনি নাই, হে দেব চক্রপাণি, সেও আমার দোষ, ক্ষমা কর। অনাথ নারীর প্রতি আর কত অভিমান থাকিবে? কানু, আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর।'[১]

কৃষ্ণ উত্তর করিল, তুমি ভার বহাইয়া আমাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা দিয়াছ। তোমা হইতে আমার মন ফিরাইয়াছি। তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও। রাধা নিজের অতীত নির্বুদ্ধিতার জন্য দুঃখ করিতে থাকিলে কৃষ্ণ সাধু সাজিয়া বলিল

নিকট না আইস লোক বুলিব আবোল
দূর থাকি বোল রাধা সুণ মোর বোল।
এবেসি জানিল ভৈল কলি-আবতার
সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার।...
দূতা দিঞাঁ পাঠায়িলো গলায় গজমুতী
তবে নাম পাড়ায়িলেঁ আহ্মে আবালি সতী।
এবে কেহ্নে গাআলিনী পোড়ে তোর মন
পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহুলী যৌবন।[২]

'নিকটে আসিও না, লোক অকথা কুকথা বলিবে। দূর হইতে বল রাধা, আমার কথা শোন। এখন সে জানিলাম যে কলি অবতীর্ণ হইয়াছে। সব লোক থাকিতে ভাগিনাকে উপপতি করিতে চাও! ...দূতী দিয়া গলার গজমোতি হার পাঠাইয়াছিলাম। তখন নাম পাড়িয়াছিলে, "আমি আবাল্য সতী"। এখন, গোয়ালিনী, তোমার মন পোড়ে কেন? নবযৌবন পুটলি বাঁধিয়া রাখিয়া দাও।'

রাধা বলিল, আমার কুটুম্ব-সহোদর কেহই নাই, তুমিই একমাত্র গতি। আমার প্রতি কায়মনে প্রসন্ন হও। কৃষ্ণ যোগমার্গের দোহাই দিল।

অহোনিশি যোগ ধেআই
মন পবন গগনে রহাই।
মূলকমলে কয়িলে মধুপান
এবে পাইঞাঁ আহ্মে ব্রহ্মগেআন।...
ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধি
মন পবন তাত কৈল বন্দী।
দশমী দুয়ারে দিলেঁ। কপাট
এবে চড়িলেঁ। মো সে যোগবাট।[৩]

---

[১] এই গানে বংশীচৌর্যাপরাধের অনুল্লেখ লক্ষণীয়।

[২] গীতটি মূল্যবান্। ইহাতে যে গজমোতি পাঠানোর ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহা পূর্বে পাওয়া যায় নাই। দশম চরণের পাঠান্তর থাকায় গীতটি প্রাচীনতর প্রতিপন্ন হইতেছে (?)।

[৩] যোগসাধনার এই বর্ণনা যথাযথ। মন পবন = চঞ্চল চিত্ত ও প্রাণবায়ু। ভনিতায় "বড়ু" ছন্দের পক্ষে অতিরিক্ত। তাম্বূলখণ্ডে "রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে" দ্রষ্টব্য।

'অহর্নিশি যোগ ধ্যান করি, মন পবন গগনে রাখি। মূল কমলে মধু পান করা হইয়াছে, এখন আমি ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছি।...ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নায় যুক্ত (করিয়া) তাহাতে মন বন্দী করা হইল। দশম দ্বারে কপাট দিলাম। এখন যোগমার্গে চড়িয়াছি।'

রাধা মিনতি করিতে লাগিলে কৃষ্ণ বলিল, আমি হরি নারায়ণ মুকুন্দ মুরারি, যুগে যুগে নানা অবতার-লীলা করিয়াছি। পরদার কি আমি করিতে পারি? তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। রাধা বলিল

তোহ্মে জবে যোগী হৈলা সকল তেজিঞাঁ
থাকিব যোগিণী হঞা তোহাঁক সেবিঞাঁ।
না জাইবোঁ ঘর আর তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ
বড় দুঃখ পাইলোঁ তোর বিরহে পুড়িঞাঁ।

'তুমি যদি সকল ত্যাগ করিয়া যোগী হইলে, আমি তোমার সেবার জন্য যোগিনী হইয়া থাকিব। তোমাকে ছাড়িয়া আর ঘর যাইব না। বিরহে পুড়িয়া আমি বড় দুঃখ পাইয়াছি।'

কৃষ্ণ ভারবহনের কথা উল্লেখ করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলে রাধা কাতরোক্তি করিল। তাহার পর কৃষ্ণ নৌকাখণ্ড-বাণখণ্ড-দানখণ্ডের ব্যাপার উল্লেখ করিয়া রাধার দোষ দিলে রাধা বিরহের অসহায় অবস্থা জানাইল। পুনরায় কৃষ্ণ ভারবহনের উল্লেখ করিল। রাধা ফুল-তাম্বুল অগ্রাহ্য করার জন্য আবার ক্ষোভ প্রকাশ করিল। কৃষ্ণ বলিল, কেন বৃথা সাধিতেছ। আমি ব্রহ্মচিন্তায় কায় নির্মল করিয়াছি। তোমাকে দেখিয়া আর আমার মন ভুলিতেছে না। রাধা বলিল, আমি তো তোমার বিরহে মৃত। মরাকে মারিয়া তোমার কী মহাসিদ্ধি লাভ হইবে? তোমার স্নেহে আমি নিজেকে বড় মনে করিয়াছি, তাহাতে তোমার এত রোষ হইবে জানি নাই। এখন আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম, "যে ফল করিবে মোর কর অবিচারে"।[১] কেন আর মামী মামী বলিয়া কষ্ট দিতেছ? বিরহের জ্বালায় মরিতেছি, আড়নয়নে চাহিয়া আমাকে জীয়াও। কৃষ্ণ তখনও ফুল-তাম্বুল উপেক্ষার ক্ষোভ ভুলিতে পারিতেছে না। তবে শেষে কতকটা নরম হইয়া বলিল, বড়ায়ি যদি আদেশ করে তবে আমি তোমার সঙ্গে মিলিতে পারি। এই বলিয়া কৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিল।

কৃষ্ণের সন্ধানে যাইতে রাধা বড়ায়িকে মিনতি করে। বড়ায়ি ফুল-তাম্বূলের কথা উল্লেখ করিয়া রাধার দোষ দিয়া নিজের অক্ষমতা জানায়। তখন নিতান্ত শিশু ছিলাম, এই বলিয়া রাধা দোষ স্বীকার করিয়া বড়ায়িকে কৃষ্ণের সন্ধানে যাইতে ব্যগ্রতা করিলে বড়ায়ি ইতস্তত করিতে লাগিল। বলিল, কোথায়

---

[১] ইহার পরে একটি গান ছিল বলিয়া অনুমান করি।

খোঁজ করিব বল। রাধা বলিল, তুমিই ভালো জান।[১] তখন দুইজনে বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণের খোঁজ করিতে লাগিল। না পাইয়া রাধা ক্রন্দন জুড়িল। এমন সময় সেখানে নারদ মুনি আসিয়া দর্শন দিল। রাধার অনুরোধে মুনি বসিয়া ধ্যানযোগে জানিয়া বলিয়া দিল, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে কদমতলায় কুসুমশয্যায় রহিয়াছে। সেখানে গেলে দেখা পাইবে। রাধা কদমতলার কাছে গিয়া দূর হইতে কৃষ্ণের দেখা পাইয়া আনন্দভরে মূর্চ্ছা গেল। বড়ায়ি মুখে জল দিয়া চেতন করাইলে রাধা তাহাকে দিয়া কৃষ্ণের নিকট নিবেদন জানাইল। বড়ায়ি কৃষ্ণের কাছে গিয়া রাধার বিরহের দশা বর্ণনা করিল।[২] বড়ায়ি বলিল, ঘরে থাকিয়াও রাধার বনবাস।

ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে
নিশাসে বাঢ়ে বিরহদারুণদহনে।
বনের হরিণী যেন তরাসিনী মনে
দশ দিশি দেখে রাধা চকিতনয়নে।

'ঘর তাহার বন হইল, সখীগণ জালের মতো (ঘিরিয়া আছে)। নিশ্বাসে দারুণ বিরহাগ্নি বাড়িয়া উঠে। বনের হরিণীর মতো রাধা ত্রস্তচিত্তে চকিতনেত্রে দশদিক দেখে।'

বড়ায়ি কৃষ্ণের মাথায় হাত বুলাইয়া হাতে ধরিয়া অনুনয় করিল। কৃষ্ণ মনে মনে খুশি হইয়া বলিল, বেশ, রাধা বেশভূষা করিয়া আসিয়া মধুরসবাণী বলুক। বড়ায়ি ফিরিয়া আসিয়া রাধাকে সাজাইয়া গুছাইয়া কৃষ্ণের কাছে পাঠাইয়া দিল। রাধা-কৃষ্ণের নিবিড় মিলন হইল। রাধা বলিল

উরুখাণী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ।
শ্রম বড় পায়িল আহ্মে হুতি জাওঁ নিন্দ।

কৃষ্ণ কিশলয়ের শয্যা পাতিয়া দিলে রাধা তাহার কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কৃষ্ণ বড়ায়িকে বলিল, তোমার কথা রাখিলাম। এখন বিদায় দাও। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। তাড়াতাড়ি ঘরে যাও। তোমার হাত ধরিয়া আমি বিশেষ অনুরোধ করিতেছি, তুমি রাধাকে যত্নে রাখিও। আমি মথুরা চলিলাম। এই বলিয়া কৃষ্ণ ধীরে ধীরে রাধার শিয়র হইতে উরু সরাইয়া লইয়া মথুরা চলিয়া গেল।

---

[১] এখানে শ্লোকের সঙ্গে গানের অসঙ্গতি আছে। শ্লোকে আছে "সখীগণমুবাচেদং" আর গানে আছে "বড়ায়িক তবেঁ বুইল রাধা"।

[২] গানটি জয়দেবের "স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্" পদের অনুবাদ। পরবর্তী গীতের প্রথম চার ছত্রও জয়দেবের "নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমিব" পদের অনুবাদ।

রাধা জাগিয়া উঠিয়া দেখে কৃষ্ণ নাই। তখন বড়ায়িকে সম্বোধন করিয়া বিলাপ করিতে থাকে, যদি আমি জানিতাম যে কৃষ্ণ আমাকে এড়িয়া পলাইবে "তবে কেহ্নে কাল-ঘুম যাইবোঁ"। তোমার পায়ে ধরি আর একবার শ্রীমধুসূদনকে আনিয়া দাও। বড়ায়ি বলিল, কৃষ্ণ এই তো ছিল কোথায় গেল। তুমি এইখানে থাক, আমি খুঁজিয়া দেখি।[১] রাধা বলিল, কৃষ্ণ আসিবে স্বপ্ন দেখিলাম, কিন্তু সারারাত কাটিয়া গেল, কৃষ্ণ তো আসিল না। সে অন্য নারীর সঙ্গসুখ ভোগ করিতেছে। তুমি আবার খোঁজ গিয়া। বড়ায়ি বলিল, আমি খুঁজিতে চলিলাম, তাহাকে কি বলিব বল। যে যে স্থানে কৃষ্ণ থাকিতে পারে তাহার সন্ধান রাধা বড়ায়িকে বলিয়া দিল। বড়ায়ি সেই সেই স্থান খুঁজিয়া কৃষ্ণকে না পাইয়া অনেকক্ষণ পরে রাধার কাছে ফিরিয়া আসিল। রাধা খেদ করিতে লাগিল। বড়ায়ি বলিল, অনেকক্ষণ হইল বনের ভিতর আসিয়াছি, চল ঘরে যাই। নহিলে লোকে জানিয়া ফেলিবে। অগত্যা রাধা ঘরে ফিরিল।

দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, কৃষ্ণের দেখা নাই। বড়ায়ির কাছে রাধার বিলাপেরও অন্ত নাই। হৃদয় কপাট উঘাড়িয়া রাধা তাহার বিরহবেদনা প্রকাশ করে।

ফুটিল কদম ফুল ভরে নোআইল ডাল
এভোঁ গোকুলক নাইল বালগোপাল।
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ
নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ। ১।
শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল। ধ্রু।
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিসের সিন্দুর
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচূর।
কাহ্ন বিণী সব খন পোড়এ পরাণী
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী। ২।
পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে
কোণ দোষেঁ বিধি মোক দিল এত দুখে।
আহোনিশি কাহ্নাঞির গুণ সোঁঅরিআঁ
বজরে গঢ়িল বুক না জাএ ফুটিআঁ। ৩।

---

[১] অতঃপর অন্তত একটি গীত (বড়ায়ির উক্তি) বাদ পড়িয়াছে। সেটি ছিল এই দুইটি শ্লোকের মধ্যে,

"একাকিনী পরিভ্রম্য বনং শ্রমভরা [-তুরা]। রাধে সংপ্রতি সীদামি ন লব্ধ্বা মধুসূদনম্।
বচনেন তবানেন বৃদ্ধে ব্যাকুলমানসা। জাতাস্মি জগদালোক্য শূন্যমেতদ্ বচঃ শৃণু।"

জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ।
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ। ৪ ॥

'ফোটা কদমফুল-ভরে ডাল নুইয়া পড়িল, এখনো বালগোপাল গোকুলে আসিল না। বুকের কাপড় আর কত ঢাকিয়া রাখি। কৃষ্ণের হৃদয় দয়াহীন, (যাইবার সময়) বলিয়া গেল না। শৈশবের প্রেম বড়ায়ি, কে সে বিগড়াইয়া দিল? প্রাণনাথ কৃষ্ণ আমার এখনো ঘরে আসিল না। বড়ায়ি, কপালের সিঁদুর আমি মুছিয়া ফেলিব। হাতের বালা আমি শাঁখের গুঁড়া করিব। কৃষ্ণ বিনা প্রাণ সবখন পুড়িতেছে, বিষমাখা তীরের আঘাতে যেমন হরিণী। পুণ্যবতী গোয়ালিনীরা সব সুখে আছে। কোন্ দোষে বিধি আমাকেই এত দুঃখ দিল? অহনিশি কানাইয়ের গুণ স্মরণ করিয়াও বজ্রে গড়া বুক ফাটিয়া যায় না। জ্যৈষ্ঠ মাস গেল আষাঢ় প্রবেশ করিল, শ্যামল মেঘে দক্ষিণ দিক ছাইয়া গেল। নিষ্ঠুর সে নন্দ-নন্দন এখনো আসিল না।—বড়ু চণ্ডীদাস গাহিল, যাহার গতি বাশুলী।'

অতঃপর একটি গান ছিল। সে গানে রাধা বড়ায়িকে কৃষ্ণের অন্বেষণে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল। তাহার উত্তরে বড়ায়ির যে গীত ছিল তাহাও পুঁথিতে নাই, তবে গান দুইটির মধ্যবর্তী শ্লোকগ্রন্থিটি রহিয়া গিয়াছে।

চতুরে চতুরো মাসান্ রাধে মুদিরমেদুরান্।
গময় ত্বং গতৌ শক্তিরত্র মে নাস্তি কাচন ॥

'বুদ্ধিমতী তুমি রাধা, বর্ষণশীতল চারিমাস কাটাইয়া দাও। এখন গতায়াত করিতে আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই।'

উত্তরে রাধা তাহার চৌমাসিয়া বিরহের গীত গাহিল।

আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজয়ে
মদন-কদনে মোর নয়ন ঝুরএ ॥
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথা
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞি বসে যথাঁ। ১।
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাস
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস। ধ্রু।
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।
কত না সহিব রে কুসুমশরজালা
হেনকালে বড়ায়ি কাহ্ন সনে কর মেলা। ২।
ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকারে
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে।
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক। ৩।
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী
মেঘ বহিআঁ গেলে ফুটিবেক কাশী।
তবে কাহ্ন বিণী হইব নিফল জীবন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ। ৪ ॥

'আষাঢ় মাসে নব মেঘ গর্জন করে। মদনের দাপে আমার অশ্রু ঝরে। বড়ায়ি, পাখির জন্ম পাই নাই, তাহা হইলে সেখানে উড়িয়া যাইতাম যেখানে আমার প্রাণনাথ কানাই রহিয়াছে। ওগো চারিমাস বর্ষা আমি কাটাই কেমন করিয়া। এ ভরা যৌবনে কানু আমাকে নিরাশ করিল। শ্রাবণ মাসে মেঘের ঘন বর্ষণ। শয্যায় একলা শুইয়া আমার ঘুম আসে না। ওগো মদনের বাণ বর্ষণ আর কত সহিব। এমন সময়ে, বড়ায়ি, কানুর সঙ্গে আমার মিলন করাও। ভাদ্র মাসে দিনরাত্রি অন্ধকার। ময়ূর, ভেক, ডাকপাখি কোলাহল করে। সে সময়েও যদি কানাইয়ের মুখ না দেখিতে পাই, ভাবিতে ভাবিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। আশ্বিন মাসের শেষে বর্ষা নিবৃত্ত হয়। মেঘ কাটিয়া গেলে কাশ ফুটিবে। তখন কানু বিনা জীবন নিষ্ফল হইবে।—বড়ু চণ্ডীদাস গাহিল, বাশুলীর অনুগত ভক্ত।'

আবার রাধা বড়ায়িকে অনুনয় করিল কৃষ্ণ-অন্বেষণে যাইতে। বড়ায়ি সান্ত্বনা দিলেও সে মানে না। রাধা তাহাকে আংটি বখশিশ দিতে চায়। বড়ায়ি বলে, কৃষ্ণ তোমাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছে। রাধা বলে, তোমারই যুক্তিতে আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় ছাড়িয়া প্রাণেশ্বর মথুরায় গিয়াছে। তোমার পায়ে ধরি, কৃষ্ণকে একবার আনিয়া দাও। নহিলে তোমাকে দোষ দিয়া আত্মহত্যা করিব। বড়ায়ি মথুরা যাইতে রাজি হইল। বলিল

জাইবোঁ মথুরা নগর মোর আগে সত্য কর
আর কভোঁ না ঝঙ্কায়িবী মোরে
বারে বারে দুঃখ পাইলোঁ ভাগে পরাণে না মরিলোঁ
সরূপ কহিলোঁ তোক্ষারে।

'আমি মথুরা নগর যাইতে পারি যদি তুমি আমার কাছে অঙ্গীকার কর আর কখনও আমাকে উত্যক্ত করিবে না। বার বার (তোমার জন্য) দুঃখ পাইয়াছি। ভাগ্যবলে প্রাণে মরি নাই। তোমাকে খাঁটি কথা বলিয়া দিলাম।'

রাধা মাথায় হাত দিয়া শপথ করিল, তোমাকে আর দুঃখ দিব না।

যে আছে মোর কপালে ফলিবেক সেসি কালে
তার থান জাহ একবার।

বড়ায়ি বলিল, মথুরা চলিলাম। যদি সেখানে কৃষ্ণের লাগ পাই তো আনিবার জন্য যত্ন করিব।

বড়ায়ির মথুরা গমন, তথা কৃষ্ণের দেখা পাওয়া ও তাহাকে গোকুলে আসিবার জন্য নির্বন্ধ গীতে ব্যক্ত হয় নাই, তাহা এই দুইটি শ্লোকে বলা হইয়াছে। (সম্ভবত মূলে এখানে অন্তত একটি গীত ছিল—বড়ায়ির।)

মথুরানগরীং গত্বা জরতী মধুসূদনম্।
জগাদ বিরহে মগ্না রাধা তে শরণং গতা॥
ইতি শ্রোত্রশয়ং কৃত্বা জগাদ জরতীং হরিঃ।
রাধিকামন্যুনিঃশেষং নাগরঃ পরমাক্ষরম্॥

'বড়ায়ি মথুরানগরে গিয়া কৃষ্ণকে বলিল, বিরহে নিমগ্ন রাধা তোমার শরণ লইয়াছে। ইহা কর্ণগোচর করিয়া নাগর (কৃষ্ণ) রাধিকার প্রতি বিরাগ চুকাইয়া দিয়া জরতীকে পরমবাণী বলিয়া দিল।'

("রাধিকামন্যানিঃশেষং পরমাক্ষরং"—ইহার সহিত পরবর্তী পদের সুর মিলে না। সেগুলিতে রাধার প্রতি কৃষ্ণের গভীর বিতৃষ্ণারই প্রকাশ। তাহা হইলে কি এখানে মূলের পদ কিছু নষ্ট হইয়াছে ?)

কৃষ্ণ বলিল, রাধার কাছে যাইতে ভয় হয়। সে যাহা করিয়াছে তাহা তো তুমি জান। আর বেশি বলিয়া কাজ নাই। আমি তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, ঘর যাও। বড়ায়ি বলিল, কানাই তোমার চরিত্র বুঝিতেছি না। "যাচিতেঁ উপেখহ তোহ্মে সে আমৃত"। আর কখনো রাধা তোমাকে কটু কথা বলিবে না। সে তোমার বিরহে বিকল, এখন তাহাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত নয়। আমার কথা শুনিয়া এখন যদি তাহার কাছে না আস পরে নিশ্চয়ই তোমাকে বিরহদুঃখ পাইতে হইবে। একদা তাহার জন্য ভাত খাও নাই, এখন শর্করা খাইতে কেন অনুরোধের অপেক্ষা করিতেছ ? উত্তম জনের প্রেম সোনার ঘড়ার মত, ভাঙ্গিলেও জোড়া দিতে পারা যায়। যে অধম লোক সে অন্তরে কপট, তাহার প্রেম মাটির ঘটের মতো। আমি তো আর পারি না।

রাধিকা থাকিলী বসি আপনার ঘরে
তোহ্মে থাকিলা আসি মথুরা নগরে।
আসি জাই করী মোর আকুল পরাণ…

কৃষ্ণ বলিল, আর জেদ করিও না। তাহার নাম শুনিয়া আর গোকুলে যাইতে মন সরে না। তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও, রাধিকার জন্য আর টানাটানি করিও না। কাটা ঘায়ে লেবুর রস আর কত দিবে ? তুমি তো জান রাধা আমাকে কত মন্দ বলিয়াছে। আমি ধন জন বসতি সব ত্যজিতে পারি, দুঃসহ বচনতাপ সহি না।

মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস।

ইহার পর (২২৬খ) পুথি খণ্ডিত। মনে হয় এই "রাধা-বিরহ" পালায় আর বেশি পদ ছিল না॥

৬

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানগুলি শ্লোকের সূত্রে গাঁথা। প্রাপ্ত শ্লোকের সংখ্যা ১৬১, তাহার মধ্যে পুনরাবৃত্ত ২৮, সুতরাং মোটসংখ্যা ১৩৩। পূর্বাপর গানের শিকলের মত শ্লোকগুলি যেন সূত্রধারের উক্তি। (এমনি শ্লোক শঙ্করদেবের নাটপালাতেও পাই।) শ্লোক-রচয়িতাকে স্বতন্ত্র কবি মনে করিবার পক্ষে বিশেষ

কোন যুক্তি নাই। রাধাবিরহের কোথাও কোথাও গানদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষিত শ্লোক নাই, কচিৎ শ্লোকের সঙ্গে পরবর্তী গানের সঙ্গতি নাই, কখনো কখনো শ্লোকের পরে অপেক্ষিত গান নাই। শ্লোকে আছে "সখীগণমুবাচেদং", গানে পাই "বড়ায়িক তবেঁ বুইল"। নীচের শ্লোকটি লিখিয়া আবার কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং ইহার পোষক কোন গানও নাই।

নাহং মনসি রাধায়া বর্ত্তে জরতি সাম্প্রতং।
মিথ্যাবচনজাতেন বঞ্চনং কুরুষে বৃথা।

'জরতী, আমি এখন রাধার মনে স্থানচ্যুত। বৃথা মিথ্যা কথা বাড়াইয়া আমাকে ঠকাইতেছ।'

এইসব অনুধাবন করিলে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মূলের কোন কোন গান নাই এবং ইহার কোন কোন গান মূলে ছিল না। মূলের অনেক শ্লোকও নাই। আসলে, মনে হয়, সংস্কৃত শ্লোকগুলি স্বতন্ত্র পুথির। তবে বিষয়বস্তু একই। যিনি জোড়াতালি দিয়াছেন তিনি সর্বদা শ্লোকের সঙ্গে গান মিলাইতে পারেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বস্তুতে ভাগবত-কাহিনীর সঙ্গে বিভেদ পাই গোবর্ধন-ধারণের মতো মুখ্য লীলার ও অন্য অদ্ভুতবিক্রমের অনুল্লেখে, রাসলীলার কথা সংক্ষেপে সারায়, বস্ত্রহরণের ভূমিকার পরিবর্তনে, এবং দান-নৌকা-ভার-ছত্র-হার-বাণ-বংশী ইত্যাদি "খণ্ড" লীলার উল্লেখে। অদ্ভুতবিক্রম লীলাগুলির মধ্যে আদিরসের স্পর্শ নাই, তাই বাদ গিয়াছে। রাসলীলায় যে আদিরস তাহা স্পষ্ট এরোটিক নয়, তাই বৃন্দাবনখণ্ডের মধ্যে যেমন-তেমন করিয়া সারা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম অংশ এরোটিক কাব্য। এ অংশের রস অলঙ্কারশাস্ত্রের আদিরস নয়, কামশাস্ত্রের আদিরস। বড়ায়ি পরিপূর্ণ কুট্টনী। কামশাস্ত্রের পারদারিক অধিকরণের সঙ্গে মিলাইয়া লইলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তাম্বুলখণ্ডের তাৎপর্য বোঝা যাইবে। কৃষ্ণ চায় রাধাকে—সব গোপীকে নয়।[১] তাই বস্ত্র-হরণ রাধাকে কেন্দ্র করিয়াই পরিকল্পিত। অপিচ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বস্ত্রহরণ আর কালিয়দমন সমাহৃত হইয়াছে, আদিরসের কিছু রঙ রাখিবার জন্য। কালিয়দমন বাদ দেওয়া যায় না। যদিও ইহা আদিরসবর্জিত অদ্ভুতবিক্রম লীলা তবুও জনসমাজে নাটে গীতে কালিয়দমন তখন অত্যন্ত পরিচিত কাহিনী।

দান- ও নৌকাখণ্ডের কাহিনী ষোড়শ শতাব্দের আগেও প্রচলিত ছিল।

---

[১] ইহা হইতে অনুমান করিতে দোষ নাই যে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি রচিত হইবার সময়ে রাধার গৌরব বৈষ্ণবমতানুযায়ী পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রাকৃতপৈঙ্গলে নৌকালীলার কবিতা আছে। রূপ গোস্বামীর পদাবলীতে দানলীলা সম্পর্কিত কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে। এ কাহিনী দুইটি মুখ্যত এরোটিক। এইখানে পূর্বে উদ্ধৃত বৈষ্ণবতোষণীর চণ্ডীদাস ও দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের উল্লেখ পরীক্ষা করিয়া দেখি। ভাগবতে অনুল্লিখিত আরো যে লীলা আছে তাহা জানাইবার জন্য টীকাকার (সনাতন বা জীব) বলিয়াছেন,—"শ্রীজয়দেব-চণ্ডীদাসাদিদর্শিতদানখণ্ডনৌকাখণ্ডাদিলীলাপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ"। এখানে সোজা-সুজি মানে হয়—'জয়দেব চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবির বর্ণিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ড ইত্যাদি লীলার প্রকার বুঝিতে হইবে'। কিন্তু জয়দেব তো দানখণ্ড নৌকাখণ্ড লিখেন নাই, এবং তাঁহার কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের যে বিরহ-মিলনের কথা আছে তাহাও তো ভাগবতে নাই। মোট কথা ভাগবতে রাধার সহিত রহঃক্রীড়ার কোনই উল্লেখ নাই। শুধু রাসনৃত্যে মণ্ডলী ছাড়িয়া একজন গোপীকে লইয়া একান্তে যাওয়া—এইটুকু মাত্র আছে; সুতরাং যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যায় এখানে "দর্শিত" শব্দের সঙ্গে কর্মধারয় সমাস বলা চলে না, দ্বন্দ্ব সমাস বলিতে হইবে, এবং অর্থ হইবে—'জয়দেব-চণ্ডীদাস প্রভৃতি (এবং নাটপালায় ও পুতুলবাজিতে) প্রদর্শিত[১] দানখণ্ড নৌকাখণ্ড ইত্যাদি লীলাপ্রকার জানিতে হইবে'। এই অর্থই সঙ্গততর, দুইকারণে। প্রথমত সনাতন ও জীব অত্যন্ত বিবেচক লেখক, যা তা করিয়া সমাস-পদ নিশ্চয়ই প্রয়োগ করিবেন না। দ্বিতীয়ত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড এরোটিক কাহিনী। এ কাহিনী আদিরসাত্মক বলিয়াই জনপ্রিয়। সেইজন্য এ কাহিনী—বাঙ্গালায় হোক, অবহট্‌ঠে হোক, সংস্কৃতে হোক—সাধারণত (নিতান্ত ক্ষুদ্র না হইলে) নামহীন রচনা হইতে বাধ্য। সুতরাং আগে পিছে "জয়দেব" ও "আদি"খোসা ছাড়িয়া দিয়া শুধু মাঝখানের শাঁস চণ্ডীদাসের উপর দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের রচনার দায়িত্ব অর্পণ কোনও দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

'গোপালচরিত' বা 'রাধাপ্রেমামৃত' নামে একটি ছোট সঙ্কলিত কাব্য আছে, সংস্কৃতে লেখা।[২] তাহাতে কতকটা বর্ণনার ও কতকটা সংলাপের ভঙ্গিতে কয়েকটি পুরানো শ্লোকে গাঁথা দান-নৌকা-ভারখণ্ডের বিবরণ আছে। এখানে

[১] নট-নাট্য-নাটক দ্রষ্টব্য।

[২] মোহিনীমোহন লাহিড়ী বিদ্যালঙ্কার বিরচিত 'শ্রীরাধাপ্রেমামৃতং' নামে প্রকাশিত (বহরমপুর ১৯০৭, দ্বি-স ১৯২৮)। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ইহার একটি পুথি আছে (নম্বর ১১৮৪ এক)। রচয়িতা গোপাল ভট্ট।

ক্রম শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিপরীত, অর্থাৎ ভার-নৌকা-দান এইভাবে আছে। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিষয়ের সঙ্গে যথাসম্ভব মিল আছে। কাব্যটির কিছু পরিচয় দেওয়া উচিত। দুইটি বন্দনা শ্লোক। প্রথম শ্লোক ভাগবত হইতে নেওয়া, দ্বিতীয় সনাতনের 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃত' হইতে। সুতরাং সঙ্কলনের গ্রন্থনকাল ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগের আগে নয়।

প্রথম আখ্যান "বস্ত্রাপহরণখণ্ড" অথবা "বসনচৌর্যকেলিবর্ণনম্"। ভাগবতেও ইহা গোপীক্রীড়ার প্রথম কাহিনী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভার-ছত্রখণ্ডের পরে। ভাগবতে বস্ত্রহরণ গোপীদের মাসব্যাপী কাত্যায়নী-ব্রতের সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। সে ব্রতপ্রসঙ্গ গোপালচরিতে নাই। শুধু আছে, গোপীরা যমুনায় জল তুলিতে যাইত ও জলে যথেচ্ছ খেলা করিত। দ্বিতীয় আখ্যান "ভারখণ্ড"। রাধার কথায় কৃষ্ণ তাহার দধি-দুগ্ধের ভার বহিয়া মথুরা চলিয়াছে। যমুনার ধারে আসিয়া কৃষ্ণ শ্রান্ত হইয়া পড়িল। তখন রাধার সঙ্গে কথাবার্তা চলিল। শেষে কৃষ্ণ হাতে হাতে পারিশ্রমিক চুকাইয়া লইল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা কৃষ্ণকে মজুরি না দিয়া ঠকাইয়াছিল। তৃতীয় আখ্যান "নৌকাখণ্ড" বা "পারখণ্ডকেলি-বর্ণনম্"। রাধার ভার ফেলিয়া দিয়া কৃষ্ণ চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ যমুনার ঘাটে জীর্ণ তরী লইয়া খেয়ারি হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। (এই আখ্যানের তিনটি শ্লোক পদ্যাবলী হইতে নেওয়া।) রাধা চাপিলে একটু দূর গিয়াই নৌকা টলমল করিতে লাগিল। নৌকায় জল উঠিতে থাকিলে রাধাকে সিঁচিতে হইল। কৃষ্ণ বলিল, তোমার আঁচল ছিঁড়িয়া লইয়া ছিদ্র বন্ধ কর। কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। কৃষ্ণের কথায় রাধা দুগ্ধ-দধি ভার, গায়ের ভারি ভারি অলঙ্কার সবই ফেলিয়া দিল।

> বাচা তবৈব যদুনন্দন গব্যভারো
> হারোঽপি বারিণি ময়া সহসা বিকীর্ণঃ।
> দূরীকৃতং চ কুচয়োরনয়োর্দুকূলং
> কূলং কলিন্দদুহিতুর্ন তথাপ্যদূরম্॥[১]

'যদুনন্দন, তোমার কথায় গব্যভার এবং হার আমি অবিচারে জলে ফেলিয়া দিয়াছি। বুকের আঁচলও দূর করিয়াছি। তবুও তো কালিন্দীর কূল নিকট হইতেছে না!'

একটু পরে যমুনা-মধ্যে রম্য পুলিনপ্রদেশ পাওয়া গেল। সেখানে বিশ্রাম করিয়া

[১] পদ্যাবলীর ২৭৫ সংখ্যক শ্লোক। তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নৌকাখণ্ডের এই পদ,—"আতি বড় গরুঅ তোহ্মার পয়োভার"।

মথুরার ঘাটে পার হইয়া রাধা দুধ দই বেচিতে গেল। চতুর্থ আখ্যান "দানখণ্ড"। অন্য দিনের ঘটনা। বর্ণনা বিশেষত্বহীন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছত্রখণ্ড স্বতন্ত্র আখ্যান নয় ভারখণ্ডেরই অন্তর্গত এবং সেই আখ্যানেরই একটু বিস্তার। এটুকু অন্যত্র মিলে নাই। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দের রাই-রাজা আখ্যানের সঙ্গে যোগ থাকা সম্ভব। হারখণ্ডও স্বতন্ত্র আখ্যান নয়, যমুনাখণ্ডেরই বিস্তার। মনে হয় "ভার"খণ্ডের ধ্বনিসাম্য-পথেই "হার" খণ্ডের উৎপত্তি। বাণখণ্ডের কল্পনা আসিয়াছে স্মরশরজরাতুরতা হইতে। কল্পনায় ছেলেমির পরিচয় আছে। এখানেও মনে হয় ধ্বনিসাম্য—"দান"খণ্ডের।

বংশীখণ্ড আর রাধাবিরহ এই দুইটি আখ্যান বা পালা এরোটিক নয়। এখানে আছে অলঙ্কারশাস্ত্রের, সাহিত্যের আদিরস। পদাবলীর মধ্য দিয়া পরিচিত যে চণ্ডীদাস তাঁহার সুর এই অংশেই শোনা যায়। বংশীচৌর্যের শ্লোক পদ্যাবলীতে আছে।[১] রূপের বিদগ্ধমাধবেও উল্লিখিত।[২] রাধাবিরহ নাট্য-গীতিতে ও গানে পূর্বাপর সুপরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এমন কোন আখ্যান নাই (ছত্রধারণ ও হার-অপহরণ[৩] ছাড়া) যাহা সূত্রাকারে পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ শতাব্দের বৈষ্ণব-গ্রন্থে অনুল্লিখিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবনখণ্ডের আখ্যান অকিঞ্চিৎকর হইলেও নূতন নয়। গোপীদের লইয়া কৃষ্ণের বৃন্দাবনভ্রমণের উল্লেখ ভাগবতে আছে। ফুল-চুরির ইঙ্গিত বৃন্দাবনক্রীড়া নৌখেলা বংশীচৌর্য বস্ত্রহরণ দানলীলা ("ঘট্ট") ইত্যাদির সঙ্গে রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গারভেদ প্রকরণে তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

অতএব বস্তুর দিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনন্যতা নাই। তবে মৌলিকতা আছে—আদিরসের ভিয়ানে ও লৌকিকতার ছাঁচে। এ দুইটির গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও তাহাতে কাব্যের অতিপ্রাচীনত্ব সিদ্ধ হয় না। রাধাকে কৃষ্ণের পাশে রানী করিয়া বসানো রূপ গোস্বামীর কীর্তি। রাই-রাজারও সেইখানে সূত্রপাত। ছত্রখণ্ডে ইহারই আভাস থাকিতে পারে॥

---

[১] শ্লোকসংখ্যা ২৫৩। [২] চতুর্থ অঙ্ক শ্লোকসংখ্যা ৩৪।

[৩] কবিকর্ণপুরের অলঙ্কারকৌস্তুভের একটি শ্লোকে কৃষ্ণের বাঁশী-চুরির সঙ্গে হার-চুরির কথাও আছে (১০-৮৯)। রূপের ললিতমাধব নাটকে কৃষ্ণের (রাধার নয়) হার-চুরির উল্লেখ পাই (৯-৪৯)।

৭

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি আধুনিক হোক বা না হোক, তাহাতে প্রক্ষেপ যেমন এবং যতটাই থাক বা না থাক, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। আখ্যান-পরিকল্পনায়, চরিত্র-চিত্রণে, ভাবে এবং ভাষায় ইহাতে একটি সুগঠিত নাট্য-গীতিকাব্যের সৌষম্য ও সংহতি ঘটিয়াছে। "চণ্ডীদাস" নামের অথবা "বড়ু চণ্ডীদাস" উপাধির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশিত এই পাঞ্চালিকা গীতিনাট্যটি যিনি রচনা করিয়াছিলেন তিনি বড় কবি, এবং অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত মহাকাব্য-লক্ষণের কোনটিই ইহাতে না থাকিলেও সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের মানদণ্ডে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মহা-কাব্য। ইহাতে তিনটি মাত্র ভূমিকা—কৃষ্ণ, বড়ায়ি, রাধা। তিনটিই নিজ নিজ চারিত্র্যে উজ্জল হইয়াছে। তাহার মধ্যে রাধাচরিত্রের বিকাশে ও পরিণতিতে কবি যে দক্ষতা ও চাতুর্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত। তাম্বূলখণ্ডে যে "চন্দ্রাবলী-রাহী"র সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হইল, সে সংসারানভিজ্ঞ রূঢ় সত্যভাষিণী, অল্পবয়সী, অশিক্ষিত গোপবালিকা। কিন্তু ঘটনা-কৌশলে মূঢ় বালিকাচিত্তে কামের ও প্রেমের উন্মেষ ও জাগরণ দেখাইয়া কবি যখন পাঠককে শেষ পালায় লইয়া আসিলেন, তখন দেখি সেই গোপকন্যা কখন যে শাশ্বতরসিক-চিত্তবলভীর প্রৌঢ়পারাবতী[১] শ্রীরাধায় পরিণত হইয়াছে তাহা জানিতেও পারি নাই।

বড়ায়ির চরিত্র পূর্বতন কুট্টনী ভূমিকার ছায়াবহ। জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণরত্নাকরে কুট্টনীর যে বর্ণনা আছে তাহাতে বড়ায়িরই প্রতিচ্ছবি পাই। তবুও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ায়ি শেষ পর্যন্ত কুট্টনীই রহিয়া যায় নাই। গোড়ায় সে কৃষ্ণের দূতী কিন্তু পরিণামে সে রাধারই বড় মা, রাধার জন্য "আসি যাই করি মোর আকুল পরাণ"—তাহার অন্তরের কথা।

অনেক দিন হইল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি কাব্যটির প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই।[২] এই অবহেলা একেবারে নির্হেতু নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সাধারণ পাঠকের প্রবেশে বাধা আছে। বানান অপ্রচলিত, ভাষা প্রাচীন, কিছু দুর্বোধ। তবে আনুনাসিকের খোঁচা

---

১ "ত্বং মচ্চেতোভবনবড়ভীপ্রৌঢ়পারাবতীং তাং
রাধামন্তঃক্লমকবলিতাং সম্ভ্রমেণাজিহীথাঃ।" উদ্ধবসন্দেশ ১১৬॥

২ পরীক্ষোত্তিতীর্ষুদের ও তাহাদের সাহায্যকারীদের কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

এড়াইয়া, মহাপ্রাণ ধ্বনির কণ্টক মাড়াইয়া, অপরিচিত শব্দের ঝোপঝাড় ডিঙ্গাইয়া একবার যিনি এই কাব্যকুঞ্জে প্রবেশ করিবেন তিনি শেষ পর্যন্ত ঠকিবেন না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ বেশির ভাগ পয়ার, আর এই পয়ারের ধ্বনিপ্রবাহ ছাড়া-ছাড়া। ত্রিপদী সুষম নয়। (ইহাতে অনেকে প্রাচীনত্বের পরিচয় পান।) অন্যথা ছন্দে নূতনত্ব নাই। তবে নূতনত্ব আছে পয়ারের চার ছত্র লইয়া "চউপঈ"-জাতীয় স্তবক গঠনে। এ রীতি সম্ভবত সংস্কৃতের অনুকরণে॥

৮

চৈতন্যের সমসাময়িক, অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দের প্রথমার্ধের দিকে জীবিত এক বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের সন্ধান মিলিয়াছে। ইনি "শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দমধুব্রত-শ্রীচণ্ডীদাস" 'ভাবচন্দ্রিকা' নামে একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন।[১] তাহাতে রাগমার্গ অবধি ভক্তিতত্ত্ব এবং মাধুর্যলীলার উৎকর্ষনিরূপণ আছে। কাব্যের আরম্ভ,

বন্দে বৃন্দাবনাসীনমিন্দিরানন্দমন্দিরম্।
উপেন্দ্রং সান্দ্রকারুণ্যং সানন্দং নন্দনন্দনম্॥

'বৃন্দাবনে অধিষ্ঠিত, লক্ষ্মীর আনন্দমন্দির স্বরূপ, করুণাঘন, সানন্দ, নন্দনন্দন উপেন্দ্রকে বন্দনা করি।'

এক "কবিরাজ" চণ্ডীদাস গীতগোবিন্দের টীকা লিখিয়াছিলেন। বলিতে পারি না ইনিই সেই মহাকবি চণ্ডীদাস কি না যিনি লক্ষ্মণভট্ট প্রভৃতি সুহৃদ্‌বর্গের অনুরোধে 'দীপিকা' নামে কাব্যপ্রকাশের ধ্বনিপ্রকরণের টীকা লিখিয়াছিলেন।[২] তবে দীপিকাকার চণ্ডীদাসও যে ভক্তিপথের পথিক ছিলেন তাহা জানা যায় টীকার পুষ্পিকা শ্লোক হইতে,

সায়ং সূর্যাত্মজায়াঃ পুলিনপরিসরে বালকৈরাবৃতঃ সন্
ধাবন্ ধাবন্ [বয়স্যৈঃ] কৃতবিবিধরবো গোসমূহং বিচিন্বন্।
স্বৈরং গোপাঙ্গনাভিঃ কৃতবিবিধবনক্রীড়নো দৈত্যবংশ-
ধ্বংসী বংশীবিলাসী ব্রজকুলতিলকঃ পাতু বো গোপবেশঃ॥

'সন্ধ্যায় যমুনার বিপুল পুলিনে গোপবালকবেষ্টিত হইয়া [বয়স্যদের সঙ্গে] দৌড়াইতে দৌড়াইতে গোরু খুঁজিতে খুঁজিতে যিনি বিবিধ রব করিয়াছেন, যিনি গোপাঙ্গনাদের সহিত বনে ইচ্ছামত বিবিধ লীলা করিয়াছেন, যিনি দৈত্যবংশ ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি বংশীবিলাসী, যিনি ব্রজকুলতিলক, সেই গোপবেশী (হরি) তোমাদের রক্ষা করুন।'

---

[১] রাজেন্দ্রলাল মিত্র সঙ্কলিত *Notices of Sanskrit Manuscripts*, পুথিসংখ্যা ২১-৩১।

[২] ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি পুথিসংখ্যা ৪৯১।

কোনও "কবীন্দ্র" চণ্ডীদাসেরই এক বংশধর নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন 'গণমার্তণ্ড' নামে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের গণপাঠের বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন।[১] নৃসিংহের পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার উত্তরে কেতুগ্রামে।[২] বইটির গোড়ায় নৃসিংহ বংশকর্তা চণ্ডীদাসের প্রশস্তি করিয়াছেন।

ধীরশ্রীলনৃসিংহজে মুখকুলে জাতঃ কবীনাং রবির্
বিদ্যানামনুকম্পয়া বিতরণে মহ্যাং সুপর্ণক্রমঃ।
নানাশাস্ত্রবিচারচারুচতুরোঽলঙ্কারটীকাকৃতির্
ভট্টাচার্যশিরোমণির্বিজয়তে শ্রীচণ্ডিদাসাভিধঃ॥

'মুখুটি কুলে ধীর শ্রীনৃসিংহের বংশে জাত, কবিদের মধ্যে সূর্যস্বরূপ, অনুকম্পায় এবং বিদ্যাবিতরণে যিনি পৃথিবীতে কল্পবৃক্ষস্বরূপ, নানাশাস্ত্রের বিচারে যিনি উৎকৃষ্ট ও চতুর, যিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের টীকা করিয়াছেন, সেই শ্রীচণ্ডীদাস নামক ভট্টাচার্য-শিরোমণির জয় হোক।'

গণমার্তণ্ডের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে নৃসিংহ একে একে পূর্বপুরুষগণের নাম করিয়াছেন। তাহা হইতে এই বংশক্রম পাওয়া যায়ঃ চণ্ডীদাস > গোপীনাথ (মধ্যম পুত্র) > মাধব > নয়ন > কুমুদ > শ্রীহরি > শ্যামদাস বিদ্যাবাগীশ > গোপাল সার্বভৌম > কুশল তর্কভূষণ > নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন। চণ্ডীদাস হইতে নৃসিংহ দশম পুরুষ। নৃসিংহের জীবৎকাল যদি অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ধরা যায় তাহা হইলে চণ্ডীদাসের জীবৎকাল ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগে পড়িবে।

নৃসিংহ পিতাকে বলিয়াছেন "চণ্ডিদাসকুলাব্জার্ক"। আর নিজেকে পুনঃপুন বলিয়াছেন "চণ্ডিদাসকুলোৎপন্ন" "চণ্ডিদাসকুলোদ্ভব" ইত্যাদি। সুতরাং চণ্ডীদাসের খ্যাতি নৃসিংহের কাল পর্যন্ত একটানা চলিয়া আসিয়াছিল। এ খ্যাতি শুধু পাণ্ডিত্যের বা কুলগর্বের বলিয়া বোধ হয় না, ইহা পাণ্ডিত্যের ও কবিত্বের বলিয়াই মনে করি। ইনি প্রাচীন পদাবলীর ও মূল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি চণ্ডীদাস হইতে পারেন। কালের দিক দিয়া অসুবিধা নাই। স্থানের দিক দিয়া সুবিধাই হয়। নান্নুর হইতে চামুণ্ডার (বাশুলীর) পীঠস্থান কেতুগ্রাম ও ক্ষীরগ্রাম খুব বেশি দূরে নয়। ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যার বার্ষিক পূজা-উৎসবে এখনও "ডোমচাঁড়ালি" হয়।[৩]

চণ্ডীদাসের বাসস্থান সম্বন্ধে দুইটি পৃথক্ জনশ্রুতি আছে। দুইটিরই প্রাচীনত্ব

---

[১] ঐ পুথি ১১৭৮। লিপিকাল ১৭২৮ শকাব্দ (১৮০৬-০৭)।

[২] শিলং লেডি কীন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবীদাস ভট্টাচার্য এম্-এ, আমার অনুরোধে খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলেন (১৯৩৯) যে কেতুগ্রামে নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন ছিলেন প্রায় দেড়শত বৎসর আগে। এখন তাঁহার ভিটা আছে তবে বংশ নাই।

[৩] পূর্বে পৃ ১৪২ দ্রষ্টব্য।

সমকালীন, অর্থাৎ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দ। একমতে চণ্ডীদাসের নিবাস অধুনাতন বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুরে, অন্যমতে বাঁকুড়ার অল্পদূরে ছাতনায়। প্রথম মতের সমর্থন পাই বৈষ্ণব সহজিয়াদের রচনায়, দ্বিতীয় মতের সমর্থন ছাতনায় বাশুলীতে।[১] চণ্ডীদাসের প্রণয়িনী ও সাধকসঙ্গিনী, তারা বা রামতারা বা রামীর উল্লেখও নান্নুরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।[২] নান্নুর ও ছাতনার জনশ্রুতির ঐক্য করিয়া এবং চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে প্রচলিত মতামত একত্র করিয়া আধুনিক কালেও একটি বই লেখা হইয়াছে।[৩]

চৈতন্যের জীবনীঘটিত একটি পদ পাইয়াছি দ্বিজ-চণ্ডীদাসের ভনিতায়। চণ্ডীদাস-নামিত আর কোন পদে চৈতন্যের উল্লেখ পাই নাই। পদটি পাইয়াছি কৃষ্ণদাসের অদ্বৈতকড়চাসূত্রের একটি পুথিতে।[৪] মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে অদ্বৈত-আচার্যের দীক্ষাগ্রহণ-প্রসঙ্গে পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে,—"এইসূত্রে পদ গাইলেন দ্বিজ চণ্ডীদাস"।

পুরী মাধবেন্দ্র দেখি আচার্য হইল সুখী বসিবারে দিলেন আসন
পাদ্য-অর্ঘ দিয়া দান বহুবিধ কৈলা মান প্রণামিঞা বসিল তখন।
কৃতাঞ্জলি কহে বাণী মহামন্ত্র হও[৫] তুমি শুনি পুরী কর্ণে দিলা হাথ
তুমি হও মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র দিতে মোর ভয় দেবদেব জগতের নাথ।
আচার্য কহেন বাণী হও[৬] তুমি মহাজ্ঞানী বিষ্ণুভক্তি তোমাকে প্রকাশ
দেখিয়া গৌতমীতন্ত্র দেহ তো যুগলমন্ত্র সেই মন্ত্রে আমার বিশ্বাস
পূর্বে তারক নাম সেই মোর মহাজ্ঞান তাহে কিছু......
....সিদ্ধ নর আগমেতে জানিহ নিশ্চয়।
জন্মিবেন আপনি হরি শ্রীচৈতন্য নাম ধরি সঙ্গে লইয়া পারিষদগণ
পরম দুর্লভ ভাবে এই মন্ত্র সভে পাবে কহ দেখি কিসেরি কারণ।
কৈলে পূর্ণ-অবতার বীজ সিদ্ধ নহে কার এই হেতু নামমন্ত্র সার
আর না করিব ভেদ ভক্তগণের অবিচ্ছেদ কলিযুগে নামের প্রচার।
আসিবেন আপনি নাথ [পারিষদগণ সাথ] নাম প্রেম করিতে স্থাপনে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস সে চরণে মোর আশ সব ছাড়ি পশিল শরণে ॥

অর্বাচীন চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য ॥

[১] ছাতনায় বাশুলীর প্রাচীন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন স্থানীয় জমিদার হামির "উত্তররায়", ১৪৭৬ শকাব্দের অর্থাৎ ১৫৫৪ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি ('চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গ', শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা, ১৩৬৬, পৃ ২৩-২৪ দ্রষ্টব্য)। ছাতনায় যে ক্ষুদ্র 'বাসলীমাহাত্ম্য' পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে চণ্ডীদাসের পরিচয় আছে। লেখক পদ্মলোচন শর্মা "১৩৮৭" শকাব্দে বইটি লিখিয়াছিলেন, অথচ হামির উত্তররায়ের বন্দনা আছে (ঐ পৃ ৪১)! বইটি জাল। ছাতনা বাঁকুড়ার সন্নিকটে।

[২] বিচিত্রসাহিত্য প্রথমখণ্ডে 'চণ্ডীদাস-সমস্যা' দ্রষ্টব্য।

[৩] যোগেশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ও প্রবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত (১৩৩১) 'চণ্ডীদাস-চরিত'।

[৪] গ ৫৪১৩ (৪ ক-খ)। [৫] "দেও" হইবে। [৬] পাঠ "হয়"।

নবম পরিচ্ছেদ

মনসার ব্রতগীত-পাঞ্চালী

১

যে পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুরানো দীর্ঘ রচনাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলিকে প্রাচীনত্ব ও মৌলিকতা দুই হিসাবে তিন থাকে ভাগ করা যায়। এক থাকে হইল সর্বভারতীয় মহাকাব্য কাহিনী দুইটি—রাম-কথা ও পাণ্ডব-কথা। এ দুই কাহিনী বাংলা দেশে সংস্কৃত মহাকাব্য দুইটির অনুশীলনের বেশ কিছুকাল পরে জনগণের চিত্তভূমিতে অধিরূঢ় হইয়াছিল। গুপ্ত-শাসনের পূর্বে এদেশে যে রাম-কথা প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণ নাই। মহাভারতের আমদানি হয় আরও পরে পাল-শাসনের কালে। দুইয়েরই প্রচার হইয়াছিল পণ্ডিতদের দ্বারা এবং রামায়ণ সম্ভবত এবং মহাভারত নিশ্চয়ই রাজসভার ছায়ামণ্ডপে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দের মধ্যে রাম-কথা বাঙ্গালা দেশে লোকসাহিত্যে (অর্থাৎ গল্পে ছড়ায়) ছড়াইয়া পড়ে। মহাভারত ষোড়শ শতাব্দের আগে বহুপ্রচারিত হয় নাই।

দ্বিতীয় থাকে তিনটি লৌকিক দেবী-দেবকাহিনী—মনসা-কথা, চণ্ডী-কথা ও ধর্ম-কথা। মনসা-কথা ছিল সর্বাধিক প্রচারিত জনগণের মধ্যে, চণ্ডী-কথা প্রচলিত ছিল একটু উচ্চস্তরের মধ্যে, ধর্ম-কথা আবদ্ধ ছিল বিশেষ স্তরের মধ্যে।

মহাকাব্য-কাহিনী ও লৌকিক-দেবীদেব-কাহিনীর মাঝামাঝি তৃতীয় থাক—কৃষ্ণলীলা-কাহিনী। এ কাহিনী বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্বাধিক পুরাতন এবং ইহা আসিয়াছে অংশত প্রাচীন পুরাণ-কাহিনী হইতে এবং অংশত চির-প্রচলিত লৌকিক গল্প-গাথা হইতে।

দ্বিতীয় থাকের রচনাগুলি ব্রতগীত-পাঞ্চালী ॥

২

গ্রাম-দেবদেবীর মাহাত্ম্যখ্যাপন উপলক্ষ্যে প্রাচীন কাহিনী ও রূপকথা একত্রিত হইয়া যে গেয় আখ্যায়িকা কাব্যগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকেই ব্রতগীত-পাঞ্চালী বলিতেছি। তিন দেবতাকে লইয়া এই কাব্যগুলি লেখা হইয়াছিল। মনসাকে লইয়া মনসামঙ্গল, চণ্ডীকে লইয়া চণ্ডীমঙ্গল, আর ধর্মকে লইয়া ধর্ম-

মঙ্গল। কাব্যগুলি যথাক্রমে পঞ্চদশ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দ হইতে সর্বপ্রথম মিলিতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে যে পৌরাণিক পাঞ্চালী কাব্যের পরিচয় দিয়াছি তাহার সঙ্গে এই পাঞ্চালীগুলির গঠন-পার্থক্য সামান্যই। কেবল লেজামুড়ায় কিছু অতিরিক্ত আছে। এগুলিতে শেষ পালার পূর্ব পালার গুরুত্ব সমধিক, কাহিনীর ক্লাইম্যাক্স্ সেইখানেই। এই পালাটির গান সারারাত ধরিয়া চলিত তাই সাধারণ নাম "জাগরণ" (কোথাও কোথাও "রয়ানী" অর্থাৎ রজনী)। আনুষ্ঠানিকভাবে হইলে মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল আট দিন ধরিয়া গাওয়া হইত। শেষ দিনের পালার শেষ অংশে সমগ্র কাহিনীর অনুবাদ (—সংস্কৃত অর্থে, আধুনিক অর্থে নয়—) থাকিত। সেই সংক্ষিপ্তসারের নাম "অষ্টমঙ্গলা"। মুড়ায় থাকিত, সংস্কৃত পুরাণে যেমন, সৃষ্টিপত্তন-কাহিনী। তবে এ কাহিনী সংস্কৃত পুরাণের অনুসারে নয়। বাঙ্গালা দেশের জনগণের মধ্যে যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য চলিয়া আসিয়াছিল সেই ঐতিহ্যে এই নূতনধরণের সৃষ্টিকাহিনী পাই। এ কাহিনী পুরাণে নাই, কিন্তু ইহার আভাস বেদে আছে। এই সৃষ্টিকাহিনী লইয়া মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল-ধর্মমঙ্গলের আরম্ভ।

গানের পদ্ধতিতে পৌরাণিক পাঞ্চালীর সঙ্গে ব্রতগীত-পাঞ্চালীর খানিকটা তফাৎ আছে। ব্রতগীত-পাঞ্চালী আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। অর্থাৎ গ্রাম-দেবদেবীর বাৎসরিক ও নৈমিত্তিক পূজা-উৎসব অথবা—চণ্ডীমঙ্গল হইলে—দুর্গাপূজা-উৎসব উপলক্ষ্যে দেবতার মন্দিরে অথবা পূজা-উৎসব ক্ষেত্রে কয়েক দিন ধরিয়া গান করা হইত। মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গলের গান আট দিন ধরিয়া, ধর্মমঙ্গলের গান বারো দিন ধরিয়া। গানের আসরে দেবতার ঘট স্থাপিত হইত। সেই ঘটে দেবতার অধিষ্ঠান—গান শুনিবার জন্য—কল্পনা করা হইত। উদ্দিষ্ট দেবতাকে আহ্বান করিবার পর অন্য দেবতাদেরও সভায় শ্রোতারূপে স্বাগত করিয়া বন্দনা করা হইত। গানের গোড়ায় এই বন্দনা পালা ব্রতগীত-পাঞ্চালী গানের এক বিশিষ্ট অঙ্গ। মূল রচনায় দেবতা-বন্দনা এবং সেই সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় ও গ্রন্থরচনাহেতু নির্দেশ প্রায়ই সংক্ষেপে সারা হইত, কিন্তু গায়নেরা সাধারণত নিজেদের সংগৃহীত দীর্ঘ বন্দনা পালা জুড়িয়া দিতেন। তাহাতে অতিরিক্ত থাকিত দিগ্‌বন্দনা অর্থাৎ আশেপাশের এবং চতুর্দিকের প্রখ্যাত দেবতাকে এবং পিতা-মাতা গুরু-পীর ইত্যাদি নরদেবতাকে প্রণতি। আর থাকিত অপদেবতার ভর এড়াইবার জন্য দেবতার দোহাই।

ব্রতগীত-পাঞ্চালী গানের আসর যেন দেবসভা,—এইরূপ কল্পনা হইতেই গানের আরম্ভে দেবতাদের অধিষ্ঠান এবং গানের শেষে তাঁহাদের স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন গাহিতে হইত। প্রত্যেক দিনই এইরূপ রীতি। ধর্মমঙ্গলের আসরে গায়নের বন্দনা এইরকম ছিল,[১]

উর ধর্ম আসরে আসিয়া শুন গীত আপনার নিজ গুণে করিবে মোহিত।
ছন্দবন্ধ তাল-মান কিছুই না জানি আমি উপলক্ষ্য গীত গাইবে আপনি।
আপনি সঞ্চাবে সভা গীত আর নাটে বার দিয়া আপনি বসিবে ধবল খাটে।…
বন্দনা বন্দিতে ভাই যে দেব এড়ায় একশত প্রণাম আমার সেই দেবের পায়।
ডাকিনী যোগিনী বন্দো নিরঞ্জনের পা বিনি অপরাধে যে গায়েনে করে ঘা।
তুমি মোর ভগিনী আমি তোর ভাই তাঁদের চরণ বন্দি আমি গীত গাই।…

মনসামঙ্গলের আসরে বন্দনার উদাহরণ,[২]

ধবল পাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন ধবল খাটে বন্দ্যা গাইব ধর্ম নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা হর হরি যেবা সির্জন করিল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম হইল।
নাটনাটেশ্বরী বন্দো সর্বমঙ্গলা নপুরের ধ্বনি যার বাজএ রসালা।
তালে ভর কর মা চামরে লেহ বাও সর্গ হইতে নামো মাগো গায়েনের গাও।
দিন হইলে থাক মাতা ই কাগ বাহনে রাত্রি হৈলে নাম্বো মাতা গায়েন স্মরণে।…
শরণ লইনু মাতা রাখ রাঙ্গা পায় মায়ের কোলেতে যেন বালক খেলায়।
খনেক তেজহ মাতা অভিরথ কোল আমার কণ্ঠেতে বসি করহ কল্লোল।…
ভক্তিভাবে বন্দো মুই শ্রীগুরু-চরণ পাসরন পদ মোর হউক স্মরণ।
আদ্য গুরু বন্দো মাতা-পিতার চরণ যাহার প্রসাদে হৈল আমার জনম।
দীক্ষা শিক্ষা গুরু বন্দো করিয়া প্রণতি যাহা হৈতে জ্ঞান মোর হইল সুমতি।
ঘটেতে আসিয়া মাতা করহ আদেশ দোহাই ধর্মের যদি যাও অন্ত দেশ।…
ভরসা না পাঞা মাতা দিলাম দোহাই অপরাধ ক্ষমা কর পদ্মাবতী আই।…
জালুআর জালে যে ছাকিঞা তোলে পানি সেই মত করিবে মাতা পদের গাঁথনি।
মালির মালঞ্চ বিকসিত পঞ্চফুল অক্ষরে অক্ষরে পদ কর সমতুল।
আমি যন্ত্র হই মাতা তুমি যন্ত্রধারী যেমত বোলাবে তুমি সেইমত তরি।
উঠ গো মনসা মা আসরে কর ভর সুদৃষ্টি করিঞা চাহ গাএন উপর।

২

মনসামঙ্গল পঞ্চদশ শতাব্দেই পরিণত এবং পরিপূর্ণ কাব্যরূপ ধারণ করিয়াছিল। তাহার পরিচয় বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে পাই। বিপ্রদাসের কাব্যটি লেখা হইয়াছিল পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ দশকে।

বাস্তুদেবতা, আরোগ্যের দেবতা অথবা সম্পদের দেবতা বলিয়া বিভিন্ন নামে

[১] পশ্চিমবঙ্গের পুথি। রূপরামের কাব্য। [২] উত্তরবঙ্গের পুথি। "তন্ত্র" বিভূতির কাব্য।

মনসার পূজা বরাবর চলিয়া আসিয়াছিল। এখন ইনি বিশেষ করিয়া সাপের দেবতা, তবে নিজে সাপ নন। আরোগ্য-পুষ্টির রূপকাশ্রিত দেবভাবনা বলিয়া নদীদেবতার মহিমা বেদের সময় হইতে গীত। ইনি মুখ্যত সরস্বতী। ইহারই নামান্তর ইলা, পুষ্টি, শ্রী। ইনিই গৌরী যিনি জল কাটিয়া একপদী দ্বিপদী চতুষ্পদী অষ্টাপদী নবপদী সৃষ্টি করিয়াছিলেন।[১] ইনিই বাক্ যিনি নারীরূপে গন্ধর্বদের ছলিয়া দেবতাদের সোম আনিয়া দিয়াছিলেন।[২] তাহাই অমৃত। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের প্রারম্ভে দেবীর এই যে প্রসন্ন রূপ তাহা কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে গোড়া হইতেই ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এখানে মনসা চণ্ডীর প্রতিদ্বন্দ্বী, শিবভক্তের বিদ্বেষিণী।

ঋগ্‌বেদের আর একটি রূপকভাবনাও পরে দেবীত্বে মূর্তি পাইয়াছিল। সে রুদ্রের ক্রোধ, "মনা"। পৌরাণিক সাহিত্যে ইনি চণ্ডী (এবং দুর্গমের দেবতা দুর্গা) হইয়াছেন। তাহার পূর্বে ইনি সরস্বতী-শ্রীর সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। "মনসা" নামে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। নামটির মৌলিক অর্থ মনস্বিনী, "মনা"র সহিত অভিন্ন। পৌরাণিক যুগের আগেই সরস্বতী-শ্রীর সঙ্গে বাস্তু-নাগদেবতার পূজা মিশিয়া গিয়াছিল। তখন হইতে মনসা নিজে নাগ না হইয়াও সর্পরাজ্ঞী।[৩] সরস্বতী-শ্রী দুই পৃথক্ দেবতায় (মনসা ও লক্ষ্মী) পরিণত হইবার আগেই নাগ-পূজার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়া গিয়াছে। পরে যখন ভাগাভাগি হইল তখন মনসার ভাগে পড়িল সর্প-নাগ আর লক্ষ্মীর ভাগে পড়িল হস্তী-নাগ। কিন্তু এই ভাগাভাগি মুসলমান-আমলের আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ পাকাপাকি হয় নাই। (হাতি-চড়া মনসার প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।) মনসা-লক্ষ্মীর মৌলিক একতার অনেক প্রমাণ আছে। দুই জনেরই নামান্তর কমলা ও পদ্মা। পদ্মদলে মনসার উৎপত্তি, কমলার আসন পদ্মে। (আগেই বলিয়াছি একদা চণ্ডী-মনসা (শ্রী) একই দেবতা ছিলেন। পরেও তাহার স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে চণ্ডীর কমলে-কামিনী মূর্তিতে।[৪] এই মূর্তিতে পদ্ম আছে, হাতি আছে, বিলাসিনী নারী আছে, ক্রোধও আছে।) লক্ষ্মীর উৎপত্তি সাগরে, মনসার উৎপত্তি হ্রদে। (কমলে-কামিনীও হ্রদমধ্যাসীনা।)

---

[১] ঋগ্‌বেদ ১. ১৬. ৪১। পূর্ব পৃষ্ঠার উদ্ধৃতির শেষ অংশ দ্রষ্টব্য।

[২] কপিষ্ঠলকঠ-সংহিতা ৩৭. ২; মৈত্রায়ণী-সংহিতা ৩. ৭. ৩।

[৩] বেদে বাস্তুদেবী, পৃথিবী।

[৪] চণ্ডীর সর্পায়ুধও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য।

অর্বাচীন পৌরাণিক সাহিত্যে দুইটি যে ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত দেবতা পাই শ্রী-সরস্বতী ও ষষ্ঠী, তাহার মধ্যে প্রথমটিতে প্রাচীনত্বের লক্ষণ অনেকটাই আছে। এবং সে লক্ষণে মনসার মৌলিক বিশেষত্ব অস্পষ্ট নয়। সরস্বতী অবিবাহিত (মতান্তরে তিনি বিষ্ণুপত্নী), মনসাও স্বাধীন নারী (জরৎকারুর সহিত তাহার বিবাহ দেবসমাজে মুখরক্ষা মাত্র)। সরস্বতীকে স্রষ্টা (ব্রহ্মা) কামনা করিয়াছিলেন।[১] মনসাকে পিতা (শিব) কামনা করিয়াছিলেন। সরস্বতী বিদ্যাদেবী, মনসা প্রথমে বাক্ পরে মূর্তিমতী বিষবিদ্যা।[২] সরস্বতী গীতবাদ্যের দেবী, মনসা গীতবাদ্যপ্রিয়—গান বাজনা নাচ না হইলে ("ঝল্লমল্ল") তাঁহার পূজা হয় না, এবং গীতনৃত্য করিয়াই বেহুলা তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়াছিল। শ্রী ও ষষ্ঠীর যোগাযোগ দুইদিকে। প্রথমত শ্রী-সরস্বতীর (এবং মনসার) বিশিষ্ট পূজাতিথি পঞ্চমী, ষষ্ঠীর ষষ্ঠী। কিন্তু ষষ্ঠী তিথি মনসার প্রসঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চমীতে মনসাপূজা করিয়া পরের দিন ষষ্ঠীতে অরন্ধন করিতে হয় অর্থাৎ বাসি রান্না খাইতে হয়। ষষ্ঠী শিশুপালিকা দেবী, শিশুক্রোড় মনসারও মূর্তি অনেক পাওয়া গিয়াছে। মনসা-কাহিনীর সূত্রপাত বৈদিক যুগে, কিন্তু পূর্ব-ভারতে বৈদিক যুগ শেষ হওয়ার আগেই তিনি বাস্তুদেবতায় ও গ্রামদেবীতে পরিণত হইয়াছিলেন। তাহার পর ধাপে ধাপে তাঁহার "অবনতি" হইয়া আধুনিক সময়ে ভদ্র দেবসমাজ-বহিষ্কৃত নারীপূজিত দেবী রূপেই তিনি প্রধানত রহিয়া গিয়াছেন। গ্রামদেবীরূপে তাঁহার নাম ("বিষাইল-আখি") এবং ধাম পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডী ("বিশালাক্ষী") আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। অনেক রকম প্রাচীন মিথ্ মিলিয়া মিশিয়া মনসার কাহিনী গঠিত। সে আলোচনার আগে মনসা-কাহিনীর পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

মনসামঙ্গল গান মনসা-পূজার অঙ্গ রূপে পরিগণিত ছিল। চৈতন্য-ভাগবতে বৃন্দাবনদাসের উক্তি মানিলে পঞ্চদশ শতাব্দের শেষের দিকে এদেশে মনসা-পূজার ব্যাপকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, চৈতন্যের আবির্ভাবের সময় দেশে জনসাধারণের মধ্যে বিষ্ণু-পূজার ও বিষ্ণু-ভক্তির আড়ম্বর ছিল না। তখন লোকে বিবিধ উপচার সংযোগে বাশুলী ও "যক্ষ" পূজা করিত। অনেকে ঘটা করিয়া বিষহরির (মনসার) পূজা করিত

---

১ বৈদিক সাহিত্যে ইহার প্রমাণ আছে। ঋগ্‌বেদ ৭. ৩৩. ১১।

২ এলোরার গুহাচিত্র দ্রষ্টব্য। ইহাতে পুথিও আছে।

এবং সেই উপলক্ষ্যে মাটির পুতুল গড়াইত। (এ রীতি এখনও বর্ধমান জেলার উত্তরপূর্ব অঞ্চলে "জগৎ-গৌরী" অর্থাৎ মনসা-পূজা উপলক্ষ্যে চলে।)

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন…
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া নানা ধন।

'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী'[১] যথার্থই বিদ্যাপতির রচনা হইলে বুঝিব যে মিথিলাতেও বাঙ্গালাদেশের মতোই সাড়ম্বরে নাটগীতে মনসা-পূজা পঞ্চদশ শতাব্দে খুব চলিত ("পূজয়েদ্ গীতনর্তনৈঃ")॥

৩

অনেক কবিই মনসামঙ্গল লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন সময়ের লোক। কাল-অনুসারে কাহিনীর রূপান্তর ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। তবে স্থান হিসাবে কাহিনীর অল্পস্বল্প বিভিন্নতা গ্রাহ্য করিতে হয়। বিপ্রদাস মনসামঙ্গলের[২] সবচেয়ে পুরানো কবি। তাঁহার কাব্য অখণ্ডিত ও অচ্ছিন্ন রূপে পাওয়া গিয়াছে। মনসার সম্পূর্ণ কাহিনী একমাত্র বিপ্রদাসের কাব্যেই লভ্য। এই জন্য বিপ্রদাসকে অনুসরণ করিয়া মনসাকাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি। এই প্রসঙ্গে কবি ও কাব্যের পরিচয়ও দেওয়া যাইতেছে।

গণেশ, ধর্ম ও নারায়ণ ইত্যাদি দেবতার বন্দনার পর সর্বাঙ্গে সর্পালঙ্কার-ভূষিত মনসার রাজবেশ ও সভার বর্ণনা।

নাগ-অভরণে দেবী হইলা প্রচণ্ড
কালি-নাগিনী তার শিরে ধরে দণ্ড।
দুই ভিতে নাগদল ধরিল যোগান
বাসুকি পঠেন কাছে শাস্ত্রপুরাণ।
অনন্ত তক্ষক নৃত্য করেন আপনি
শঙ্খ মহাশঙ্খ করেন জয়ধ্বনি।

তাহার পর মনসার বিভিন্ন নাম ও সে নামের উৎপত্তি নির্দেশ করিয়া বিপ্রদাস সংক্ষেপে আত্মপরিচয়, গ্রন্থোৎপত্তিহেতু ও রচনাকাল দিয়াছেন।

[১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি। শ্রীযুক্ত গণেশচরণ বসুর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (*New Indian Antiquary* vol. VII no. 3-4)।

[২] এই কাব্যের দুইটি খণ্ডিত পুথি পাইয়া কবির প্রথম পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৯৭)। অষ্টাদশ শতাব্দের তিনটি পুথি অবলম্বনে সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিপ্রদাসের মনসাবিজয় নামে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক *Bibliotheca Indica* গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৫৩)।

পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। পূর্বাপর নিবাসভূমি নাহুড্যা বটগ্রাম।[১] তাঁহারা চার ভাই। সামবেদীয় ব্রাহ্মণ, বাৎস্য গোত্র, পিপিলাই গাঁই। বৈশাখ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে নিদ্রিত কবির শিয়রে বসিয়া পদ্মা পাঞ্চালী রচনা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সেই আজ্ঞা বলে বিপ্রদাস মনসাবিজয়[২] লিখিতেছেন। কবিবর্গ গুরুজন ও পণ্ডিতগণের কাছে ক্ষমা চাহিয়া বিপ্রদাস "রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র-অনুসার"। ১৪১৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে এই কাব্য লেখা হইল। তখন হোসেন-শাহা গৌড়ের রাজা।

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ
নৃপতি হোসেন-শাহা গৌড়ের প্রধান।
হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত
শুনিয়া দ্রবিত লোক পরম পিরীত।

অতঃপর কাব্য-কাহিনীর অনুবাদ (অর্থাৎ সংক্ষেপসার) দিয়া কবি কাব্য-বস্তুতে হাত দিতেছেন।

সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গলগীত
বিস্তারে কহিব সপ্তনিশি।

দুই-চার ছত্রে সৃষ্টিকথা।—দেবতারা জন্মিল। অসুরেরা জন্মিল, তাহারা শিবের উপাসক হইল।

চণ্ডীরূপা হইলা ক্রোধে দেব নারায়ণ
মায়াযুদ্ধে দুষ্ট দৈত্য কৈলা নিবারণ।

দৈত্যবধে আনন্দিত হইয়া দেবগণ দৈত্যসূয় ("দৈত্যসুই") মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিল। যজ্ঞে রন্ধনের জন্য দেবতারা গঙ্গাকে ঠিক করিল। গঙ্গা থাকে স্বামী শান্তনুর কাছে তাহার আশ্রমে। শিব গঙ্গাকে আনিতে গেলেন। শান্তনু গঙ্গাকে যাইতে অনুমতি দিল এই শর্তে যে, যজ্ঞশালায় রাত কাটানো চলিবে না। শিব কথা দিয়া গঙ্গাকে লইয়া আসিলেন। কাজে-কর্মে দেরি হওয়াতে গঙ্গা আর সে রাত্রিতে আশ্রমে ফিরিতে পারিল না। সকালে শিব গঙ্গাকে লইয়া শান্তনুর কাছে গেলে মুনি পত্নীকে গৃহে স্থান দিল না। অগত্যা

---

[১] পাঠান্তরে "বাদুড্যা"। নাহুড্যা (বা বাদুড্যা) বটগ্রামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুথিপ্রাপ্তির স্থান বিবেচনা করিলে ইহা চব্বিশপরগণা জেলার উত্তর বা উত্তরপূর্ব অংশে ছিল বলিয়া অনুমান করিতে হয়।

[২] ভনিতায় 'মনসাবিজয়' ও 'মনসামঙ্গল' দুই নামই আছে, তবে 'মনসাবিজয়' বেশিবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সেইজন্য ইহাই বিপ্রদাসের কাব্যের নাম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আসলে "বিজয়" ও "মঙ্গল" একই।

শিব নিজের ঘরেই গঙ্গাকে ঠাঁই দিলেন। শিব তখন ধর্মের দেখা পাইবার জন্য বল্লুকার তীরে বারো বছর ধরিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। সে তপস্যা কালিদাস-বর্ণিত উমার তপস্যার মতোই কঠিন।

ধর্ম প্রসন্ন হইয়া শিবকে দেখা দিতে চলিলেন,

ধবল ছত্র ধরি শিরে দণ্ড কমণ্ডলু করে
উলূকে করিয়া আরোহণ।

গৃহদ্বারে আসিয়া ধর্ম শিবকে ডাক দিলেন। শিব বাড়িতে ছিলেন না। মধুর বাণী শুনিয়া গঙ্গা বাহিরে আসিয়া ধর্মকে চকিতের জন্য দেখিতে পাইল। গঙ্গাকে দেখিয়াই ধর্ম অদৃশ্য হইয়া রথে ভর করিলেন। কেবল তাহার মুখের উপর ধর্মের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, তাই গঙ্গা ধবলমুখী হইয়া গেল। গঙ্গার স্তবে খুশি হইয়া ধর্ম অন্তরীক্ষে থাকিয়া আপনার পরিচয় দিয়া বলিলেন, শিবকে বলিও আমি তাহাকে দেখা দিতে আসিয়াছিলাম। শিবের হইয়া গঙ্গা অনুনয় করিতে লাগিল।

তোমায় দেখিতে হর অনেক সাধনা
বল্লুকায় দুঃখ পায় ক্লেশযাতনা।
দ্বাদশ বৎসর হর বড় পায় দুখ
তোমা না দেখিয়া হর না ধরিবে বুক।
অস্থিচর্মসার মাত্র হৈল দেবরায়
বার এক দেখা দেহ হইয়া সদয়।

ধর্ম বলিলেন

তোমারে দেখিলে হব সেই দেখা মোরে
শিরে জটা মেলি যেন লয়ে তোমা শিরে।
তবে যদি অতি খেদ করে দেবরায়
কালিদহে কমল তুলিতে যেন যায়।

ধর্ম অন্তর্হিত হইলেন। শিব আসিলে কি বলিব এই কথা ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গা "বসিল ধবল খাটে হৈয়া শ্বেতকায়"। শিব আসিয়া গঙ্গাকে ধবলকায় দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গঙ্গা সব কথা বলিল।

গঙ্গার বদনে বাণী শুনি শূলপাণি
হস্ত পদ আছাড়িয়া পড়িলা ধরণী।

এদিকে দেবতারা খবর পাইয়াছে, "গঙ্গারে পরমব্রহ্ম দিলা দরশন"। গঙ্গাকে বন্দনা করিতে তাহারা ছুটিয়া আসিল। ব্রহ্মা চারমুখে গঙ্গার স্তব করিতে লাগিল। শিব দেখিয়া শুনিয়া সম্ভ্রমে পুলকে ভক্তিভাবে গঙ্গাকে মাথায় তুলিয়া

লইলেন। (গঙ্গা শিবের অঙ্গে স্থান পাওয়ায় তাঁহার ঘরে নূতন গৃহিণী আসিল গৌরী-চণ্ডী। তবে কাব্যে একথার উল্লেখ নাই। তবে পরের গীতেই গৌরীকে পাই শিব-গৃহিণীরূপে। ইহার আগে কাহিনীতে গৌরীর নামও নাই। গঙ্গার ধবলত্ব সম্পর্কে বিপ্রদাস-বর্ণিত এই মাহাত্ম্য-আখ্যান আর কোথাও দেখি নাই।)

ধর্মের আদেশ অনুসারে শিব এখন প্রত্যহ কালিদহে পদ্মফুল তুলিতে যান। তখন তিনি যোগী-বেশ ধরেন। গৌরীর কৌতূহল হইল, এ বেশ ধরিয়া কোথায় যান দেখিতে হইবে। শিবের কাছে অনুমতি চাহিতে তিনি বলিলেন, কালিদহে সাপের মেলা। তাহাদের বিষে গাছপালা সব পুড়িয়া গিয়াছে। ভয়ে দেবাসুর কেহ ঘেঁষে না। তুমি কি করিয়া যাইবে। দেবী মনে মনে হাসিয়া মুখে বলিল, যাও আমি যাইব না।

কালিদহে যাইতে পথে জোকা নদী পড়ে। সেদিন দেবী আগে ভাগে গিয়া যুবতী ডোমনী সাজিয়া খেয়া-নৌকা লইয়া ঘাটে রহিল। নৌকায় চড়িয়া ডোমনীর রূপে শিব ভুলিয়া গেলেন। দেবী তাঁহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা দিয়া মনোরঞ্জন করিল[১] এবং শেষে আত্মপরিচয় দিল। শিব দারুণ লজ্জায় পড়িলেন এবং প্রতিশোধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে ইঁদুর হইয়া দেবীর কাঁচলি কাটিয়া দিলেন এবং বৃদ্ধ রিপুকর্মকারী ("কুশলী") সাজিয়া দরজায় হাঁক পাড়িলেন। ইতিমধ্যে কাঁচলির অবস্থা দেবীর নজরে পড়িয়াছে। সখী কুশলীকে ডাকিয়া আনিলে দেবী বলিল, কাঁচলি সারাইয়া দাও, তোমাকে খুশি করিব ("করিব সম্মান")। কুশলী বলিল, সত্য কর। দেবী সত্য করিল। সত্য রাখিতে গিয়া দেবীকে ডোমনীগিরির শোধ দিতে হইল। (এই কুশলী-কাঁচলি আখ্যান বিপ্রদাসের কাব্য ছাড়া অন্যত্র পাই নাই।)

একদিন কালিদহে ফুল তুলিবার সময় শিব অকস্মাৎ মদনপীড়া অনুভব করিলেন। তাঁহার বিন্দুপাত হইল। সেই বিন্দু পড়িল "বিচিত্র পদ্মপাতে"। তা এক কাকের নজরে পড়ায় সে ছোঁ মারিল কিন্তু শিবের উগ্র বীর্য উদরস্থ করিতে পারিল না, যেখানে ছিল সেইখানেই উগরাইয়া রাখিল। পদ্মপত্রে বিন্দু

[১] আদিতে এখানে গঙ্গাই ডোমনী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ডোমনীরূপিণী গঙ্গার গর্ভে শিবের দুই পুত্র হইয়াছিল, ডাঙ্গর ও মহানন্দ (ওরফে ডেউর ও ডাক)। ডাঙ্গর (ডাঙ্গরশাক্তি, ডেউর) পাটনীদের দেবতা, মহানন্দ (=মহানাদ, ডাক) হড়কা-বন্যা।

টলমল করিতে করিতে জলে পড়িল এবং পাতাল ভেদ করিয়া বাসুকির মাতা নির্মাণির[১] মাথায় পড়িল। ক্ষীরের মত দ্রব্যটি লইয়া নির্মাণি একটি পুতুল গড়িয়া তাহাতে জীবন্যাস করিয়া পুত্রের কাছে আনিয়া দিল। বাসুকি মেয়েটিকে নাগেদের বিষভাণ্ডারের অধিকারিণী করিয়া দিয়া কালিদহে রাখিয়া গেল। কালিদহে পদ্মা যথেচ্ছ বিহার করিতে লাগিল।[২]

পরদিন সকালে শিব আসিয়া দেখেন কালিদহে পদ্মবন বিধ্বস্ত। নাগেদের কাজ মনে করিয়া তিনি গরুড়কে স্মরণ করিলেন। গরুড় আসিয়া টপাটপ সাপ গিলিতে লাগিল। কালনাগিনী গিয়া মনসাকে খবর দিল, "গরুড় তোমার সর্ব সর্প বধ করে"। মনসা কালিদহ হইতে উঠিয়া আসিয়া শিবের সামনে দাঁড়াইলে "দেখিয়া লোভিত হর চাহে কাম-চীতে"। শিবের দৃষ্টিতে ভয় পাইয়া মনসা নিজের পরিচয় দিয়া কহিল, "আমি যে তোমার সুতা তুমি মোর পিতা"। শিব ধ্যানযোগে কন্যার কথা যাচাইয়া লইলেন এবং এই মানস-কর্মের জন্য মনসা নাম দিয়া তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানে দীক্ষিত করিলেন।

ধ্যান করি মহাদেব নিশ্চয় জানিল
ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া নাম মনসা থুইল।

শিবের আদেশে গরুড় মনসার নাগ উগরিয়া দিল। শিব ফুল তুলিয়া ঘরে যাইবেন, মনসাও জেদ ধরিল সঙ্গে বাপের বাড়ি যাইবে। চণ্ডীর ভয়ে শিব রাজি হন না। শেষে মনসাকে ফুলের সাজির মধ্যে লুকাইয়া লইয়া গেলেন। তবে চণ্ডীর চোখ বেশিক্ষণ এড়ানো গেল না। মনসাকে সাজি হইতে বাহির করিয়া প্রহার লাগাইলে মনসা কাতরভাবে আত্মপরিচয় দিল। চণ্ডী বিশ্বাস করিল না। চণ্ডীর কুৎসিত অভিযোগে মনসা ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিল, "আপন প্রকৃতি যেন দেখিস আমায়"। আর যায় কোথায়, কুশের বাণ দিয়া চণ্ডী তাহার এক চোখ কানা করিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ মনসার অপর চোখ হইতে বিষ ছুটিয়া চণ্ডীকে পাড়িয়া ফেলিল। কার্তিক-গণেশ কাঁদিতে কাঁদিতে শিবকে ডাকিয়া আনিল। শিবও কাঁদন জুড়িলেন। বাপের সন্তোষের জন্য মনসা চণ্ডীকে জীয়াইয়া দিল।

---

[১] নির্মাণি=বৈদিক ত্বষ্টা (দেব-তক্ষণশিল্পী), বাঙ্গালা আখ্যায়িকায় স্বাভাবিকভাবেই বাসুকির মা হইয়াছেন। ক্ষীর দিয়া মাটি দিয়া পুতুল গড়া এদেশে মেয়েদেরই কাজ। মূলে বোধ হয় পাঞ্চালিকা-নির্মাণের কথা ছিল। ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাসে নাগ-উপাসনার সঙ্গে পাঞ্চাল দেশের (এবং তত্রত্য তক্ষণ শিল্পের) বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

[২] মনসা-পদ্মার জন্ম কমলে, বিহারও কালিদহে কমলবনে। সুতরাং তিনিই কালিদহে কমলে-কামিনী।

চেতন পাইয়াই চণ্ডী মনসার ঝুঁটি ধরিল। শিব বুঝিলেন কন্যাকে একদণ্ড ঘরে রাখা চলিবে না। তখনি মনসাকে অন্যত্র রাখিয়া আসিতে চলিলেন। যাইবার সময় চণ্ডীকে নিজের পঞ্চরত্ন নিদর্শন দিয়া মনসা বলিল, বাবার যদি কখনো বিপদ-আপদ হয় তবে আমাকে অবশ্য খবর দিও।

পিতাপুত্রী ঘুরিতে ঘুরিতে সিজুয়া[1] পর্বতে গিয়া পৌঁছাইল। পাহাড়ের উপরে সিজ গাছ দেখিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত মনসা তলার ছায়ায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এই সুযোগে শিব কন্যাকে ফেলিয়া পলাইলেন। যাইবার আগে একবার নিদ্রিত কন্যার দিকে চাহিলেন, তাঁহার চোখের এক ফোঁটা জল পড়িল। সেই জল মানবী মূর্তি ধারণ করিল। তাহার নাম হইল নেতা।[2] শিব তাহাকে মহাজ্ঞানে দীক্ষিত করিয়া বলিলেন, "পদ্মার সহিত থাক অনুচরী হৈয়া"। একটু আসিয়া শিবের ভাবনা হইল, বনের মধ্যে মেয়ে দুইটিকে অসহায় রাখিয়া যাওয়া অনুচিত। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার কপাল ঘামিয়া উঠিল। ললাটের ঘাম হইতে ধামাই উৎপন্ন হইল।[3] তাহাকে শিব মেয়ে দুইটির কাছে তাহাদের ভাই এবং রক্ষক করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। এইখানে বিপ্রদাসের কাব্যে প্রথম পালা সাঙ্গ।

বিশ্বকর্মা সিজুয়া পর্বতে মনসার পুরী ও রাজপাট গড়িয়া দিলে তাড়াতাড়ি সেখানে প্রজা বসাইবার উদ্দেশ্যে "পাষণ্ডির দেশে বিশাই নিয়োজিল বান"। বানভাসি প্রজারা দলে দলে আসিয়া মনসার রাজ্যে বসতি করিল। মনসা প্রত্যহ লাসবেশ করিয়া নেতার সঙ্গে প্রজাদের ঘরদ্বার দেখিয়া সরোবর-কূলে আসিয়া জলকেলি করিতে নামিত। ইতিমধ্যে একদিন গন্ধর্বকন্যা বীণালতা ব্রহ্মার কাছ দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা কামশরাহত হওয়ায় তাহার বীর্যস্খলন হইল। তাহা হইতে প্রথমে সাত শত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বালখিল্য ঋষিকুমার জন্মিল এবং অবশেষে দুই কুমার উৎপন্ন হইল,—"দেবকায়

---

[1] "সিজুয়া"র এখানে দুইটি ব্যঞ্জনা। এক সিদ্ধদের আবাস, দুই সিজগাছ-যুক্ত। কাহিনীতে দ্বিতীয় ব্যঞ্জনাই প্রধান।

[2] এখানে নামটির ব্যুৎপত্তি ধরা হইয়াছে চক্ষু অর্থে "নেত্র" হইতে। বস্ত্র অর্থে "নেত্র" হইতেও আসিতে পারে, কেন না ইনি দেবতাদের ধোবানী রূপেও কল্পিত,এবং এই অর্থে ইহা মনসার নামান্তর "কানি"র সহিত অভিন্ন। মনসাবিজয়ের ভূমিকা (পৃ xxxiii, xxxv) দ্রষ্টব্য। মনসা যেমন পদ্মারূপে চণ্ডীর এক যোগিনী হইয়াছে নেতোও তেমনি নিত্যা নামে আর এক যোগিনী হইয়াছে।

[3] এই ধামাই মনসার রক্ষী, দূত এবং বাহন।

সপ্তমুখ পুচ্ছ পদভাগে"।[১] ব্রহ্মা তাহাদের দীক্ষা দিয়া ও বেদ পড়াইয়া সিজুয়ায় পাঠাইয়া দিল। তাহারা মনসার সভায় পুরোহিত-পণ্ডিত হইল। যে স্থানে ব্রহ্মবীর্য স্খলিত হইয়াছিল সেখানে জল ঢালিলে এক ভীমকায় ব্যাঘ্র জন্মিল। সে ক্ষীরোদসাগরের তীরে বাস করিল। কিছুকাল পরে ব্রহ্মার বীর্যে দেবগাভী কপিলার গর্ভে[২] মহাতেজা মনুরথের জন্ম হইল। একদিন কপিলা চোরা গাইয়ের দলে মিশিয়া এক ব্রাহ্মণের বাড়ি ফসল খাইতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া দিল। পরে কপিলার মাহাত্ম্য বুঝিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে ছাড়িয়া দিল। ঘরে ফিরিবার সময় গাভী সেই বাঘের কবলে পড়িল। উপবাসী বৎসকে দুধ খাওয়াইয়া ফিরিয়া আসিবে এই সত্য করায় বাঘ তাহাকে ছাড়িয়া দিল। ইতিমধ্যে তৃষ্ণার্ত মনুরথ ক্ষীরোদসাগর শুষিয়া পান করিয়া ফেলিয়াছে। মাকে দেখিয়া সে দেরির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সব কথা জানিতে পারিল। তখনি সে বাঘ মারিতে ছুটিল এবং নিদারুণ যুদ্ধের পর বাঘকে মারিয়া ফেলিল। বাঘের ভয় দূর হওয়ায় মুনিরা হৃষ্টচিত্তে ক্ষীরোদতীরে গেল। গিয়া দেখে সমুদ্র শুষ্ক। দেবঋষির দুর্গতি ঘুচাইবার জন্য কপিলা দুগ্ধধারায় ক্ষীরসাগর ভরাইয়া দিল।[৩]

একদিন এক টিয়াপাখি ব্রহ্মার জন্য তেঁতুল আনিতে গিয়া দুর্বাসার শাপ কুড়াইল, তাহার ঠোঁটের তেঁতুল ক্ষীরসাগরে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুধ জমিয়া ক্ষীরোদ ভরাট হইয়া গেল। ইতিমধ্যে দুর্বাসার শাপে ইন্দ্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়াছে এবং লক্ষ্মী সাগরে নির্বাসিত। এদিকে জল না পাইয়া দেবসংসার অচল। শ্রীহীন দেবসমাজও অচল।

দেবত্ব নাহিক পাপপুণ্যের বিচার
দিবারাত্রি নাহি সব হৈল একাকার।

দেবতারা মিলিয়া ঠিক করিল জমাট ক্ষীরোদ মথিতে হইবে। সংস্কৃত পুরাণে যেমন মনসা-কাহিনীতেও তেমনিভাবে মন্থনের বর্ণনা। বিশেষ হইতেছে, মনসা-কাহিনীতে দেবাসুরের সহযোগিতার অভাব এবং দেবতাদের আলাদা আলাদা দুই দফা মন্থন। প্রথমবারে লক্ষ্মী চন্দ্র ইত্যাদি একে একে

[১] ঋগ্‌বেদে বৃহস্পতির বর্ণনা তুলনীয়। মনসাবিজয়ে টিপ্পনী (পৃ ২৯৭) দ্রষ্টব্য।

[২] বিপ্রদাসের কাব্যে আছে ব্রহ্মার বীর্য প্রথমে চণ্ডীর গর্ভে যায়। সে গর্ভ চণ্ডী জলে ফেলিয়া দেয়। কপিলা সেই জল খাইয়া গর্ভবতী হয়।

[৩] "ক্ষীরোদ" নামের ব্যুৎপত্তি হইতে এই আখ্যানের উৎপত্তি। দুধ জমিয়া দই, তাহা মথিয়া ঘি। পরের আখ্যানটি যাহা সংস্কৃত পুরাণে পাওয়া যায় তাহা এই সূত্রেই কল্পিত হইয়াছিল।

উঠিয়াছিল। শেষে উঠিল বিষ্ণুতেজোধারী ধন্বন্তরি জয়নেত ও সিদ্ধিঝুলি লইয়া, কমণ্ডলুতে অমৃত ভরিয়া। দেবতাদের কাছে ধন্বন্তরি অমরত্ব চাহিল। তাহার বদলে দেবতারা তাহার জীবন-মরণের রহস্য জানাইয়া তাহাকে দিগ্‌বিজয়ী গুণী করিয়া দিল।

জয়নেত সিদ্ধিঝুলি যদি হরে বিষহরি
উদয়কাল খায় বক্ষঃস্থলে
আপনি ত বিষহরি যদি মহাভার মারি
তবে মৃত্যু হয় ধরাতলে।
আছে এক প্রতিকার শুনহ বিশেষ তার
ঔষধের শুনহ কারণ;
শালি-বিশালি গাছে গন্ধমাদনে আছে
তাহা দিলে রহেত জীবন।
ক্ষীরোদনদীর ফেনা যা মুখে দিবেন আস্থা
তব সম ওঝা নাহি ক্ষিতি
শুনি হৃষ্ট ধন্বন্তরি দেবগণে নমস্করি
ভ্রমে ওঝা হরষিতমতি।
দিগ্‌ বিজয় করি সদা বুলে ধন্বন্তরি
পরাজয় নহে কোন স্থানে
পদ্মাপদপঙ্কজে পুটচাটু করি ভুজে
দ্বিজ বিপ্রদাস রস গানে।[১]

বিষ্ণু মোহিনী কন্যা সাজিয়া দেবতাদের অমৃত বাঁটিয়া দিলেন, অসুরেরা ভাগ না পাইয়া অভিমানে চলিয়া গেল। শিব বলিলেন, আমি ভাগ লইব না। আবার মন্থন করা হোক, যাহা উঠিবে আমি লইব। ব্রহ্মা শিবকে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি অবুঝ রহিলেন। দ্বিতীয় পালা এইখানেই শেষ।

অসুরদের ডাকিয়া শিব বলিলেন, যাহা উঠিয়াছিল সবই দেবতারা লইয়াছে। শুধু তোমরা আর আমি বাদ পড়িয়াছি। এস আমরা মন্থন করি।

এখনে যতেক পাব ক্ষীরোদ-মথনে
প্রচুর করিয়া তোমা করাব ভোজনে।

আবার মন্থন চলিল। এবারে উঠিল মহাবিষ। এ বিষ ধ্বংস না করিলে সৃষ্টি নষ্ট হইবে। দেবতারা শিবকে দোষ দিতে লাগিল। সত্য রাখিবার জন্য শিবকে বিষ পান করিতেই হইল। বিষ পান করিবামাত্র তিনি মৃতবৎ ঢলিয়া পড়িলেন। দেবসমাজে হাহাকার পড়িল। শুনিয়া চণ্ডী ছুটিয়া আসিল। সে

---

[১] মনসামঙ্গলের প্রধান আখ্যায়িকায় ধন্বন্তরির ভূমিকা তুচ্ছ নয়। ভাগবতে ধন্বন্তরি বিষ্ণুর এক অবতার। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে তিনি কাশীর রাজা দিবোদাস।

অনুমৃতা ("সতী") হইবার উদ্যোগ করিতেছে তখন মনসার বিদায়বাণী ও অভিজ্ঞান তাহার মনে পড়িল। দেবতারা নারদের হাতে অভিজ্ঞান দিয়া মনসাকে আনিতে পাঠাইল। নারদের আগমন প্রতীক্ষায় মনসা রাজৈশ্বর্য সংহরণ করিয়া দীনবেশে বসিয়া রহিল।

পত্রের ছাউনি গৃহ আঙ্গিনা জঞ্জাল
তথি বসি রহে পদ্মা পরি বাঘছাল।[১]

বাপের অবস্থা শুনিয়া মনসা কাঁদিতে লাগিল। বলিল, এমন দীনবেশে দেবপুরে যাইতে পারি না। সৎমা ঠাকুরাণী যদি একটি ভালো কাপড় আনেন তবে তাহা পরিয়া বাবাকে বাঁচাইতে যাইতে পারি। শুনিয়া চণ্ডী একটি পাঁচহাতি কাচা ধুতি লইয়া মনসার কাছে আসিয়া দেখে, সে রাজরানী সাজিয়া বসিয়া আছে। চণ্ডীর সঙ্গে দেবপুরে আসিয়া মনসা সকলকে দেখাইল,—"যত্নে এই বস্ত্র মোরে দান কৈল সতা"। দেবতারা বলিল, যা হইবার হইয়া গিয়াছে। এখন

মন-দুঃখ ঘুচায়্যা জীয়াও তব পিতা
সভে মিলি সুসম্মান করিব সর্বথা।

পিতাকে বাঁচাইবার জন্য মনসা "মন্ত্রজাত" পড়িতে লাগিল।

কেন ত্রিভুবননাথ আপনা বিসর
মন-পবনেতে জীব পরিচয় কর।
চিন্ত শূন্য ব্রহ্ম সেই অচিন্ত্য অমল
নহে ছোট বড় দৃঢ় নির্মল কেবল।
অহনিশ খসে রস কিছু নাহি টুটে
কোমল নবনী হেন বজ্র নাহি ফুটে।
দশমী দুয়ারে বাপু খসাও কপাট[২]
আসুক পরমহংস চরুক নিবাট।
পুনরপি নিবর্তিয়া যাউক স্বস্থান[৩]
যথায় কমলে হংস করে মধুপান।

বিষ উগারিয়া ফেলিয়া শিব সুস্থ হইয়া উঠিলেন। একটুমাত্র গলায় লাগিয়া রহিল। সেইহেতু তাঁহার নাম হইল নীলকণ্ঠ। উদ্গীর্ণ বিষ মনসা নাগগণকে যথাভাগ বাঁটিয়া দিল।[৪] এখন হইতে মনসা দেবসমাজে সম্মানের স্থান পাইল।

---

[১] মনসার এই ভেক বৌদ্ধতন্ত্রে শবরকুমারী জাঙ্গুলী মহাবিদ্যার বর্ণনা স্মরণ করায়। শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সাধনমালা' (সাধন ১১৭, ১২০) দ্রষ্টব্য।

[২] তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের উক্তি "দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট"।

[৩] এইভাবে পরমহংসের কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদের শ্লোকে আছে ("স্বপ্নে ন শারীরম্…")।

[৪] এখানে অমৃত (সোম) ও বিষ কাল্টের দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। দেবতারা সোমভোগী, অসুর নাগেরা বিষভোগী।

অতঃপর মনসার বিবাহ। খুঁজিয়া-পাতিয়া পাওয়া গেল জরৎকারু মুনিকে। (এ আখ্যানের এক রূপান্তর সংস্কৃতে পুরাণে আছে।[১]) মুনির তিনকুলে কেহ নাই। ফুলশয্যার রাত্রিতে চণ্ডীর কুমন্ত্রণা বুঝিতে না পারিয়া তাহার অনুরোধে মনসা নাগাভরণ পরিয়া স্বামিসম্ভাষণে গিয়াছিল। ব্যাপার দেখিয়া রাত্রিতেই স্বামী ভাগিল।[২] মনসার সাপের ভয়ে জরুৎকারু সমুদ্রে গিয়া শাঁখের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।[৩] সকালে শিব কন্যার অবস্থা দেখিয়া জামাতার অন্বেষণে সমুদ্রতীরে গেলেন এবং কোড়া পাখি হইয়া ডাক দিতেই শাঁখ জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল। ছোঁ মারিয়া শাঁখ ডাঙ্গায় তুলিয়া জামাইকে বাহির করিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। দুই-একদিন থাকিয়া জরৎকারু বানপ্রস্থে চলিয়া গেল। পত্নীকে সান্ত্বনা দিল, তোমার গর্ভে সুসন্তান জন্মিবে। সেই সন্তান আস্তীক। নেতোর বিবাহ হইয়াছিল বশিষ্ঠ মুনির সঙ্গে। বশিষ্ঠও পত্নীকে পুত্রলাভের বর দিয়া তপস্যায় চলিয়া গিয়াছিল। নেতোর পুত্রের কোন উল্লেখ নাই। বিপ্রদাস নেতোর সম্বন্ধে এইটুকু বলিয়াছেন

বশিষ্ঠ মুনিবর নেতোরে দিল বর দুই মুনি গেলা তপস্থানে
মনসা নেতোবতী হইল গর্ভবতী বিদিত লোক-পরমাণে।

(মনসা-নেতো যে মূলে এক দেবতা ছিল ইহাতে কি তাহারই এক ইঙ্গিত?) বাসুকির কাছে লেখাপড়া শিখিয়া আস্তীক শেষে মায়ের কাছে সিজুয়ায় আসিয়া রহিল। এইখানে তৃতীয় পালা সমাপ্ত।

তাহার পর পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, জনমেজয়ের সর্পসত্র ও আস্তীক কর্তৃক সর্পসত্র নিবারণ—এই পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। আস্তীক জয়ী হইয়া সিজুয়ায় ফিরিয়া আসিল। ইহার পর আস্তীক আর মনসামঙ্গলে দেখা দেয় নাই। মনসাকাহিনীর পৌরাণিক পর্বও এইখানে চুকিয়া গেল।

এইবার মূল আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকার পরিচয়। চম্পক (চাঁপাই) নগরে চাঁদো সম্পত্তিশালী ব্যক্তি, রাজার মতো থাকে। জাতি গন্ধবণিক, পেশা বাণিজ্য। শিবের মহাভক্ত। শিব তাহাকে পুত্রবৎ জ্ঞান করিয়া মহাজ্ঞানে

[১] মহাভারতে (১. ৩৮. ১২; ১. ৪৫-৪৮) মনসার নামও জরৎকারু।

[২] মহাভারতে জরৎকারু মুনি ব্যক্তি। সংসারবাস ভালো লাগে নাই বলিয়াই তিনি বিষহরিকে পুত্রলাভের বর দিয়া তপস্যায় চলিয়া গিয়াছিলেন।

[৩] শাঁখ বিষঘ্নতার প্রতীক। মনসার প্রতিদ্বন্দী ধন্বন্তরির পুরা নাম শঙ্খ-ধন্বন্তরি।

দীক্ষিত করিয়াছেন এবং জয়-নেত[১] আর সিদ্ধি-জটা[২] দিয়া তাহাকে অজর-অমর করিয়াছেন।

মহাতেজা চাঁদো রাজা হৈল শিববরে
সংসারে অবন্ধ্যাসিদ্ধি চাঁদো নরেশ্বরে।

চণ্ডী আসিয়া চাঁদোকে কুবুদ্ধি দিল, নূতন দেবতা পদ্মাকে কখনো যেন পূজা করিও না। "দেবপুর মাঝে তার বড় অপমান", তাই সে সিজুয়া পর্বতে আস্তানা করিয়াছে। মূল আখ্যায়িকার বীজটুকু এইভাবে উপ্ত হইল। তাহার পর পূর্ব প্রসঙ্গের অনুবৃত্তি চলিল।

মনসা দেবসমাজে স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু দেবপুরে ঠাঁই পায় নাই। সে অধিকার লাভ করিতে হইলে মানুষের সাহায্য চাই। মানুষের ভক্তি পাইলেই দেবত্বে পূর্ণ অভিষেক হয়। মনসার মনে এখন সেই চিন্তা উপস্থিত। সে নেতোকে বলিল

যতেক অমরগণ দিক্‌পাল মুনিজন
পৃথিবী সভার অধিকার
আমি দেবী বিষহরি এ তিন ভুবন ভরি
সবে পূজা নাহিক আমার।

নেতো খড়ি পাতিয়া গুণিয়া বলিল, একজনের পূজা পাইলেই তোমার চলিবে। চম্পকনগরে চাঁদো[৩] রাজা আছে। সে মহাজ্ঞানের অধিকারী, সিদ্ধবিদ্যা জানে, কাহাকেও সে ডরে না।

পূজে সর্ব দেবতায় তোমা নিন্দা করে রায়
হরগৌরী দম্ভের কারণ
বুঝাইয়া সেই রাজা মর্তপুরে লহ পূজা
দ্বিজ বিপ্রদাস সুরচন॥

একদিন মনসা নেতোকে লইয়া রথে চড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিল

---

[১] প্রাচীন যক্ষ বা কুবের মূর্তিতে (—ইঁহারা ছিলেন ধনাধিকারী অতিমর্ত্য জীব—) গায়ে উড়ানি লক্ষণীয়।

[২] আসলে (এবং মতান্তরে) "সিদ্ধি ঝুলি"। প্রাচীন যক্ষমূর্তির হাতে টাকার থলি আছে। তাহাই বাঙ্গালা আখ্যায়িকায় সিদ্ধিঝুলি হইয়াছে। "সিদ্ধিজটা" হইয়াছে সিদ্ধি-ভাঙ হইতে। মনে হয় চাঁদো-মনসার বিবাদের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক সোম ও ভঙ্গা (বিষ) কাল্টের দ্বন্দ্ব ছিল। (মনসাবিজয়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।) ইহাতে সিদ্ধ মুনি-ঋষির জটার কল্পনাও মিশিয়া থাকিতে পারে। অথবা জটা কি শিখার রূপান্তর?

[৩] চাঁদো নামটি পুরানো চন্দ্রক > চন্দ্রোক হইতে আসিয়াছে। চন্দ্র সোমের প্রতিশব্দ। কোন কোন মনসামঙ্গলে "চন্দ্রধর"ও পাওয়া যায়। ক্বচিৎ "চন্দ্রপতি"।

একদল রাখাল ছেলে অসংখ্য গোরু লইয়া মাঠে আনন্দে চরাইতেছে। ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে নেতো বলিল, ইহারা দস্তবোড় মুনিকে মদ বলিয়া কুশমূলের রস ঘটি ভরিয়া পান করাইয়াছিল,[১] সেই পুণ্যে সুখী হইয়াছে। তুমি এক কাজ কর, প্রথমে এই রাখালদের পূজা নাও। "শিশু বলি না করিহ হেলা"। নেতোর কথায় মনসা ডাইনী বুড়ী সাজিয়া কাঁধে চুপড়ি হাতে বাঁকা লাঠি লইয়া ছেলেদের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

অতিবৃদ্ধরূপা মুখে দশন গলিত
বচন না আইসে তাহে লোচন ঘূর্ণিত।
শাল-গাছ হেন দীর্ঘ মূর্তি ভয়ঙ্কর
চাহিতে মাথার পাগ পড়য়ে সত্বর।
প্রচুর ধবল কেশ নারে সম্বরিতে
খোম ধুতি পরিধান সদাই কম্পিতে।
মহাপদ্ম-উরগে করেতে ধরি নড়ি
বিচিত্র[২] লইল কাঁখে রঙ্গন-চুপড়ি।

মনসা বলিল, কাল একাদশী গিয়াছে। একটু দুধ দাও পারনা করি। ছেলেরা ডাইনী মনে করিয়া তাহাকে মারধর করিয়া তাড়াইয়া দিল। বেলা তিন প্রহরের সময় জল খাইতে গিয়া গোরু সব পাঁকে আটক পড়িয়া গেল। মনসা এখন আবির্ভূত হইয়া হাসিতে লাগিল। রাখালেরা তাহার মায়া বুঝিয়া তাহাকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। মনসার আদেশে তাহারা দুষ্ট বাঁঝা গাই দুহিয়া চুপড়িতে ভরিয়া দুধ আনিয়া দিল। সে দুধ দেবী "আনন্দে করিল পান হৈয়া অধোমুখ"।[৩] খুশি হইয়া মনসা তাহাদের এইভাবে পূজা করিতে উপদেশ দিল

জ্যৈষ্ঠ মাস তথি শুক্লা দশমী তিথি করি নানা উপহার
নৈবিদ্য প্রচুর মিষ্টান্ন বিস্তর দিব্য দশ ফল আর।
কদলী কর্কটী নারিকেল ফুটী পনস রসাল অতি
গুবাক খাজুর আনিবা সত্বর আম্র জাম তাল তথি।

---

[১] এখানে হয়ত সুরা (বিষ) কাল্টের ইঙ্গিত রহিয়াছে। অথবা আখের রস খাওয়াইয়াছিল।

[২] এখানে "বিচিত্র" চুপড়ি। আগে পদ্মার জন্মবিবরণে "বিচিত্র" পদ্মপাত পাইয়াছি। পরে বেহুলার তৈয়ারি "বিচিত্র" ব্যজনীও পাইব। বিদ্যাপতির ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণীতে মনসার পূজা উপলক্ষ্যে যে বিচিত্রার উল্লেখ আছে তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মনসার জন্ম নির্মাণির হাতে, তাহার এক নাম জরৎকারু (=বৃদ্ধশিল্পী)। প্রাগৈতিহাসিক (পাঞ্চাল) তক্ষণশিল্পীরা নাগ-উপাসক ছিল। ইহাও এখানে স্মরণীয়।

[৩] এখানে মনসার সর্পরূপের ইঙ্গিত। চুপড়িতে দুধ ভরা অসম্ভব কাজ।

পূগ পর্ণ দিয়া প্রচুর করিয়া সুগন্ধি কুসুম গন্ধে
ধূপ দীপ জালি মন কুতূহলী নানা বাদ্য সুপ্রবন্ধে ।
আনি স্বর্ণবারি জলপূর্ণ করি সিজ-শাখা তথি পর
স্নান ধ্যান করি দেবী বিষহরি পূজহ ভক্তি আচার ।
শুন মন দিয়া আমি তথা গিয়া ঘটে হব অধিষ্ঠান
মনের বাঞ্ছিত করিব পূর্ণিত ধন পুত্র আদি মান ।

মনসার "বারি"[১] পূজা করিয়া রাখালেরা সব চাষী ধনী হইল। তাহাদের গ্রাম রাখালগাছি নামে প্রসিদ্ধ হইল।

কিছুদিন পরে সেখানকার সমৃদ্ধিশালী "তুড়ুক" (অর্থাৎ মুসলমান) চাষী-জমিদার দুই ভাই হাসন-হুসেনের সঙ্গে বিরোধ বাধিল। একদিন তাহাদের এক কৃষাণ, নাম গোরা মিঞা, চাষ করিতে যাইবার পথে দেখিল রাখালেরা মনসার পূজা করিতেছে। তাহার লোক নিকটে গেলে তাহারা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। সে আসিয়া নালিশ করায় গোরা মিঞা গিয়া মনসার ঘট ভাঙ্গিয়া দিল। তখন মনসার সাপ তাহাকে দংশন করিল। এই সূত্রে মনসার সহিত তুড়ুকদের বিরোধ জমিয়া উঠিল। নাগ দংশনে সব তুড়ুক এবং হুসেন কাবু হইয়া গেলে হাসন একলা পড়িল। এইখানে চতুর্থ পালা সাঙ্গ।

হাসনের স্ত্রী প্রথম হইতেই স্বামীকে মনসার সঙ্গে বাদ সাধিতে নিষেধ করিয়াছিল। সেই কথা এখন তাহার মনে পড়িল। সে চুপি চুপি বাড়ি ফিরিয়া আসিল কিন্তু মনসার মায়ায় তাহার স্ত্রী চাঁপা বিবি তাহাকে "ভূল" মনে করিয়া গায়ে আগুন ফেলিয়া দিল। হাসন চীৎকার করিয়া উঠিলে বিবি তাহার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিল। স্বামীর দুরবস্থা দেখিয়া বিবির মনে মৃত পরিজনদের শোক জাগিয়া উঠিল।

চাঁপা বিবি করয়ে করুণা
প্রাণের অধিক মোর সাত বাঁদী ছিল ঘর
বিপাকে মরিল সর্বজনা।
কালাফুলি বাঁদী মৈল হেড়া[২] ধুইবারে ছিল
ছালন চাকিবে আর কে[৩]
বুলবুলি ছোট বাঁদী তা লাগি বিকল কাঁদি
জবাব কহিত ভালো সে…

[১] অর্থাৎ জলপূর্ণ ঘট। ইহাই মনসা-চণ্ডী-লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রভৃতি দেবীদের পূজাকাণ্ডে আসল প্রতীক।

[২] অর্থাৎ মাংস। [৩] ছালন মানে ব্যঞ্জন। বুলবুলি ছিল "চাকনবিবি"।

ছলছলি বাঁদী কই   বেশ বানাইত সেই
সদাই থাকিত মোর সনে
জাফরি মরিয়া গেল   পান যোগাইত ভালো
নিবারিতে নারি আর মনে।

তুড়ুক-পাড়াতে ঘরে ঘরে এইরূপ বিলাপ। মনসার বিরাগ শুধু তুড়ুক-পাড়ায় পুরুষ মানুষের উপরই নয়, পুরুষ প্রাণীর উপরেও। (বাঁদীরা মনসার ঘট পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল বলিয়া তাহাদের দুর্দশা।)

মুরগ দেখিয়া পথে   অবিচারে খায় মাথে
বিষ-জ্বালে মরে কত শত
মুরগি করিয়া কোলে   মাকুড়ি কান্দিয়া বোলে
আজিকালি বএদা[1] পাড়িত।

ভৃত্যেরা—যাহারা মনসার বিরুদ্ধে লাগে নাই—তাহারা সাপের কামড় খায় নাই। তাহাদের খুব অসুবিধা হইল না।

মিঞা যদি ফৌত হইল   গোলামেরে খোশ পাইল
বিবি লৈয়া পলাইতে চায়।

হাসানের দুরবস্থা দেখিয়া অবশেষে মনসার দয়া হইল, দেবী আবির্ভূত হইয়া হাসনকে পূজা দিতে বলিল। হাসন স্বীকৃত হইলে দেবী সকলকে বাঁচাইয়া দিল। কৃতজ্ঞ হাসন "গুণবন্ত শিল্পকার" আনাইয়া মনসার পাষাণ-মন্দির তুলিয়া দিল। মন্দিরের দেওয়ালে বিচিত্র কারুকার্য।

বিচিত্র দেয়াল গাঁথে   নানা চিত্র করে তাথে
নানাবর্ণে মুরতি আপার
যেন দেখি মূর্তিমন্ত   অতিশয় বলবন্ত
ঠাক্রি ঠাক্রি বিকৃত আকার।

দেউল নির্মিত হইলে পূজা চালাইবার জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইল। তুড়ুক-আখ্যান বা হাসন-হুসেন পালা এইখানেই শেষ।

চাঁদোর রাজধানীতে জালু ও মালু দুই ভাই জেলে থাকে।[2] চাঁদোর মাছের দরকার। তাহারা গুঙ্গড়ি[3] নদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছে। মনসার মায়ায় তাহারা মাছের সঙ্গে মনসার ঘট দুইটি উঠাইল। মনসার আদেশে

---

[1] অর্থাৎ ডিম।

[2] নাম দুইটির সঙ্গে জালিয়া-মালিয়ার কোন সম্পর্ক নাই। 'মহাবস্তু' প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে নটনর্তক ইত্যাদির সঙ্গে ঝল্লমল্ল উল্লিখিত আছে। নৃত্য গীত ও বাদ্য মনসা (ও চণ্ডী) পূজার অঙ্গ। বাঙ্গালায় শব্দ দুইটি পরে জাতি ও ব্যক্তি নামে পরিণত (মনসাবিজয় পৃ ৩০২ দ্রষ্টব্য)।

[3] মনসাবিজয়ে "গুঙ্গড়ি", অন্যত্র "গাঙ্গুড়" < * গঙ্গটিকা। কোন কোন কাব্যে "চাঁপাই"।

তাহারা সেই দুইটি ঘট ঘরে লইয়া গেল। তাহাদের মা বাজনাবাদ্য করিয়া সেই ঘট পূজা করিতে থাকিল। মনসার কৃপায় জালু-মালুর অবস্থা ফিরিয়া গেল। চাঁদোর পত্নী সনকা একদিন ছয় পুত্রবধূ লইয়া নদীতে যাইবার সময়ে জালু-মালুদের বাড়িতে পূজার বাজনা শুনিল। সেখানে গিয়া তাহাদের মায়ের কাছে মনসা-পূজার কথা জানিয়া তাহাদের ঘট দুইটি বাড়ীতে লইয়া গিয়া পূজা করিতে লাগিল। একদিন বধূদের লইয়া সে মনসার পূজা করিতেছে ও মঙ্গলগীত গাহিতেছে এমন সময় চাঁদোর খাস চাকর নেড়া গিয়া মনিবকে খবর দিল। চাঁদো আসিয়া দেখিয়া রাগে জলিয়া গেল আর মনসার ঘটে হেঁতালের[1] বাড়ি মারিল। জালু-মালুর মা সেখানে উপস্থিত ছিল। সে ঘট দুইটি ফিরাইয়া লইয়া গেল। চাঁদোর বিক্রম দেখিয়া মনসা ভাবনায় পড়িল। চাঁদের অত্যন্ত প্রিয় স্থান তাহার নাথরা[2] বন। নেতো পরামর্শ দিল, তুমি নাগদের দিয়া সেই সুরম্য উদ্যান ধ্বংস কর। মনসা তাই করাইল। কিন্তু চাঁদো আসিয়া

মহাজ্ঞান জপে মনে জয়নেত আচ্ছাদনে
নিমিষে নাথরা জীয়াইল
দম্ভময় অহঙ্কারে গালি পাড়ে মনসারে
দেখি পদ্মা ত্রাসযুক্ত হৈল।

নেতো পরামর্শ দিল, তুমি যদি মানুষের সঙ্গে মানুষ হইয়া মিশিয়া চাঁদোর শক্তি অপহরণ করিয়া লও তবেই তাহার যথেষ্ট ক্ষতি করিতে পারিবে।

সুন্দরী তরুণীর বেশ ধরিয়া মনসা সনকার কাছে গিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভগিনী মেনকা বলিয়া পরিচয় দিল। সেকালে মেয়েরা বাপের বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পাইত না। সনকা বহুকাল যায় নাই। তাই ছদ্মবেশিনীর এই আত্ম-পরিচয়ে সে কোন সন্দেহ করিল না।

জাতি গন্ধবণিক মহেশ দত্ত পিতা
মেনকা আমার নাম মহেশ্বরী মাতা।
সনকা চাঁদোর রানী আমার ভগিনী
পলাইল প্রভু মোরে রাখি একাকিনী।

---

[1] হেঁতাল গাছের সঙ্গে আসলে কোন সম্পর্ক নাই। শব্দটি আসিয়াছে "হেমতাল" (=সোনার তালগাছ) হইতে। হৈম-তালধ্বজ নাগ-কাল্‌টের প্রতীক, যেমন গরুড়ধ্বজ নাগবিরোধী কাল্‌টের। কৃষ্ণ-কাহিনীর মধ্যে এই দুই বিরোধী কাল্‌টের মিলন হইয়াছে। বলরাম (=নাগাধিপতি অনন্ত) তালধ্বজ, কৃষ্ণ (=নাগদময়িতা) গরুড়ধ্বজ (মনসাবিজয় পৃ xii-xiii, ৩০৩ দ্রষ্টব্য)।

[2] "নাথরা" বা "লাথরা"র সহিত তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের "লক্ষকের বৃন্দাবন মোর ফুলবাড়ী"। "তত্র" বিভূতির কাব্যে "লক্ষের বাগান" শিবের দান।

কি কর্ম করিব এবে যাইব কোথায়ে
সনকা বহিনী বাড়ী কোন রূপে পায়ে।

স্বামিপরিত্যক্ত ভগিনীকে সনকা আনন্দে ঘরে স্থান দিল। চাঁদো মেয়েটিকে দেখিয়া প্রেমে পড়িল এবং তাহার প্রেমবিহ্বলতার সুযোগ লইয়া মনসা তাহার মহাজ্ঞান জানিয়া লইল[১] এবং সিদ্ধিজটা ও জয়নেত-আঁচল ছিনিয়া লইয়া অন্তর্ধান করিল। এখন প্রথমেই তাহার নাথরা বন উজাড় হইল। এইখানে পঞ্চম অর্থাৎ নাথরা পালা সমাপ্ত।[২]

মহাজ্ঞানবিরহিত চাঁদো নাথরা জীয়াইতে পারিল না। মন্ত্রীর পরামর্শে সে শঙ্খ-ধন্বন্তরি ওঝাকে যত্ন করিয়া আনিতে পরামর্শ দিল। ওঝা থাকে ধবল পর্বতে হিমা নদীর তীরে। ওঝা আসিয়া নাথরা জীয়াইয়া দিল। তখন আর যাহাতে ওঝা চাঁদোকে সাহায্য করিতে না পারে সেইজন্য মনসা ওঝাকে সরাইয়া দিতে চেষ্টা করিল। (এইখানে শঙ্খরাজের সহিত বিবাদ এবং শঙ্খরাজকে জিতিয়া তাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সে-রাজ্য লাভ করিবার কাহিনী আছে। শঙ্খরাজকে জিনিয়া ধন্বন্তরি শঙ্খ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিল।[৩]) কাজ বড় সহজ নয়।

কি কব প্রতাপ যত নাগ দেখে তৃণবত
গণ্ডুষ করিয়া পীয়ে বিষ
ছয়-মাসের মৃত পায় নিমিখে জীয়াইয়া দেয়
তিলেক না করে বিমরিষ।
নাগের ঝাঁপানে[৪] চড়ে শিরে জয়-নেত উড়ে
বাদ-খাড়ু[৫] করেতে ভূষণ
মহাবুদ্ধি বিচক্ষণ নিরবধি হৃষ্টমন
শত শিষ্য সহিত সাজন।

ওঝার প্রতাপ দেখিয়া মনসা চিন্তিত হইয়া নেতোর কাছে পরামর্শ চাহিল। ওঝাকে ছলিতে নেতো উপদেশ দিল। তখন মনসা মালিনী সাজিয়া বিষাক্ত

---

[১] দীক্ষামন্ত্র অপরের কাছে ব্যক্ত করিলে তাহা ফলহীন হইয়া যায়।

[২] এইখানে ভনিতায় শ্রীমন্ত রায়ের নাম আছে। প্রক্ষিপ্ত না হইলে ইনি কবির পোষ্টা হইবেন। "সানন্দে শ্রীমন্ত রাএ পদ্মা দেহ বর। দ্বিজ বিপ্রদাস কহে মনসা (পাঠান্তর 'তাহার') কিঙ্কর।"

[৩] ধন্বন্তরির শঙ্খ নাম (বা উপাধি) এবং তাহার প্রধান শিষ্য ধনা ও মনার নাম প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নাগ-নাম। শঙ্খ হইতে সেঁকো (বিষ)। ধনা—ধনঞ্জয়, মনা—মণিনাগ।

[৪] ঝাঁপান (< যাপ্যযান) মানে পালকি। নাগের ঝাঁপান অর্থাৎ নাগ (হস্তী) বাহিত, অথবা নাগ লাঞ্ছনযুক্ত পালকি। আধুনিক কালে ঝাঁপানের মূল অর্থ হারাইয়া গিয়াছে এবং বাঁশের মাচায় পরিণত হইয়াছে। লাফ-ঝাঁপের সঙ্গে সম্পর্ক নাই।

[৫] প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিনিয়া পুরস্কার রূপে পাওয়া বালা।

পুষ্প লইয়া ওঝা-শিষ্যদের ধ্বংস করিতে চলিল। মালিনীর বিষ-পুষ্প লুটিয়া ওঝার উদ্ধত শত শিষ্য প্রাণ হারাইল। ওঝা তাহাদের পুনর্জীবিত করিলে মনসা হার মানিয়া ফিরিয়া আসিল। তখন নেতো পরামর্শ দিল

গোয়ালিনী রূপ ধর নামেতে কমলা
শঙ্খের রমণী সঙ্গে পাতহ সহেলা।
খুড়ি রূপ হৈয়া আমি লইব পসারে
মহাজ্ঞান হরি শঙ্খে বধহ প্রকারে।

সেইমত কাজ হইল। ওঝার পত্নী কমলা ছদ্ম-গোয়ালিনী কমলার সঙ্গে সই পাতাইল। কমলার অনুরোধে মনসা তাহার বাড়ীতে গিয়া সে রাত্রি কাটাইল এবং কমলাকে ফুসলাইয়া তাহাকে দিয়া ওঝার জীবনমরণ-রহস্য জানিয়া লইল। মনসার চক্রান্তে ওঝা মরিল। মনসার ছলনা বুঝিতে পারিয়া আগেই ওঝা তাহার দুই উপযুক্ত শিষ্যকে নিজের পুনর্জীবনের এবং চাঁদোর রক্ষার জন্য যে উপায় করিতে বলিয়াছিল—তাহার দেহ টুকরা টুকরা করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে পুতিয়া রাখিতে—তাহাও মনসা ব্যর্থ করিয়া দিল। ছদ্মবেশিনী মনসার কথায় ওঝার মৃতদেহ জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। মনসা তাহা পাতালে লুকাইয়া রাখিল। এইখানে ষষ্ঠ অর্থাৎ ধন্বন্তরি পালা সমাপ্ত।

ধন্বন্তরি মরিলে মনসা নেতোর কাছে আসিয়া ইতিকর্তব্যতা জিজ্ঞাসা করিলে নেতো বলিল, চাঁদোর অন্তপুরে চন্দন গাছ আছে, তাহার তলায় চাঁদো শিবপূজা করে। তুমি বিষদৃষ্টি দিয়া সেই গাছ ভস্ম করিয়া দাও গিয়া। মনসা তাহাই করিল। চাঁদো দেশে দেশে "সুবর্ণ চেঙ্গড়া" ফিরাইয়া ঘোষণা দিল, যে গাছ জীয়াইয়া দিতে পারিবে তাহাকে রাজসম্মান দিব। ধনা-মনা শুনিয়া আসিয়া চাঁদোর গাছ জীয়াইয়া দিল। মনসার সহিত বাদ না করিতে তাহাদের মা অনেক নিষেধ করিয়াছিল। মায়ের নিষেধ তাহারা মানে নাই।

এবারেও মনসা সুন্দরী গোয়ালিনী সাজিয়া মায়ের সখী রূপে তাহাদের ছলিতে আসিল। চাঁদোর সভা হইতে দুই ভাই যখন ঘরে ফিরিতেছে তাহাদের পথে ধুলার মধ্যে মনসা তাহার সবচেয়ে ছোট সাপ বিঘতিয়াকে[১] লুকাইয়া রাখিয়া দিল। তাহারা মাড়াইতেই সাপ ধর্ম সাক্ষী করিয়া কামড় দিয়া সরিয়া পড়িল। দুই ভাই মরিল। মনসা গিয়া সখীকে বলিল, আমি বাবার কাছে কিছু বিদ্যা শিখিয়াছি। তাহার পরীক্ষা করিতে পারি। তুমি সত্য

১ অর্থাৎ আকারে বিঘত পরিমাণ।

কর, যদি তোমার ছেলে বাঁচে তবে আমি লইয়া যাইব। শোকাকুল মাতা তৎক্ষণাৎ সত্য করিল। তখন মনসা পদ্মাসন করিয়া বসিয়া নিরস্করতত্ত্বদৃষ্টিতে ধনা-মনার দিকে চাহিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল। মন্ত্র পড়িয়া মনসা নাগ-বাচা শিক্ষা জপ করিতে লাগিল, অমনি বিষতিয়া হাজির হইয়া ঘা-মুখে সব বিষ তুলিয়া লইল। দুই ভাই উঠিয়া বসিল। মনসা সইয়ের কাছে বিদায় চাহিলে মা ছেলে ছাড়িতে চাহিল না। শেষে বলিল, ছোটটিকে রাখিয়া যাও। ইতিমধ্যে চাঁদো ধনা-মনার কথা শুনিয়া দেখিতে আসিতেছে, জানিয়া মনসা আর কথাটি না বলিয়া ধনা-মনাকে হাতে ধরিয়া রথে তুলিল। চাঁদো আসিয়া কাহাকেও পাইল না। তাহার পর

সিজুয়া শিখরে পদ্মা ধনা-মনা লইয়া
দুই ভাই রাখিলেন সেবক করিয়া।

এইখানে সপ্তম অর্থাৎ ধনা-মনা পালা সাঙ্গ।

এইবার চাঁদোর বিরুদ্ধে মনসার ব্যক্তিগত সংগ্রাম শুরু হইল। কালিনাগিনী গিয়া চাঁদোর রন্ধনশালায় বাসি ভাতে বিষ ঢালিয়া দিয়া আসিল। চাঁদোর ছয় ছেলে অন্যদিন সকালে পাঠশালে পড়িয়া আসিয়া তবে খায়, আজ মনসার কুবুদ্ধিতে পড়িতে যাইবার আগেই খাইতে চাহিল। তাহারা মায়ের কাছে আসিয়া বলিল, "অন্ন খায়্যা যাব মোরা পড়িবার তরে"। সনকা বড় বউকে ভাত বাড়িয়া দিতে বলিল। বউ স্নান করিয়া আসিয়া ভাত বাড়িয়া দিল। ভাতের রঙ কালো দেখিয়া ছেলেরা মাকে জিজ্ঞাসা করিল ভাত কালো কেন?

কুবুদ্ধি সনকা রামা বুঝায় পুত্রেরে
হস্ত পাখালিল বধূ থালের উপরে।
সেই জল অন্নে দিল হইয়া বিসরন
না কর বিস্ময় পুত্র করহ ভোজন।

ভাত না দেখিয়াই এক ভাই বলিল

পরীক্ষিয়া এই অন্ন করিব ভোজন।

অপর ভাইয়েরা বলিল, মায়ের কথা কখনো অবিশ্বাস করি নাই। আজও করিব না। যাহা থাকে অদৃষ্টে ভাত খাইব। বড় ভাই সর্বানন্দ বলিল

ভদ্রাভদ্র হউক সবার এক গতি।
একেকালে সভে অন্ন করিব ভোজন

এক এক গ্রাস অন্ন মুখে দিবামাত্র সকলে মরণে ঢলিয়া পড়িল। মৃতদেহ অগ্নিসংস্কার না করিয়া মাজসে (মঞ্জুষায়) ভরিয়া গুঙ্গড়ির জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল।

কিছুদিন পরে মনসা শিবের বেশ ধরিয়া স্বপ্নে দেখা দিয়া চাঁদোকে বলিল, নৌকা সাজাইয়া অনুপাম-পাটনে বাণিজ্যযাত্রা কর, সেখানে আমি আবার তোমাকে মহাজ্ঞান শিখাইব। সকালে উঠিয়া চাঁদো নৌকা সাজাইতে আজ্ঞা দিলে পাত্রমিত্র বলিল, তুমি এখন রাজা। রাজা হইয়া বাণিজ্যযাত্রা করে কোথাও শুনি নাই। সনকাও নিষেধ করিল। চাঁদো কাহারও কথা শুনিল না।

মনসা ইন্দ্রকে ধরিয়া তাহার সভাসদ্ নর্তকদম্পতী অনিরুদ্ধ-উষাকে নরলোকে জন্ম লইতে পাঠাইল।[১] চাঁদো যখন বাণিজ্যে গিয়াছে তখন সনকার জঠরে অনিরুদ্ধের জন্ম হইল, তাহাদের সপ্তম পুত্র লখিন্দর[২] রূপে। কিছুকাল পরে উজানী শহরে সাধু-বণিকের ঘরে বহু পুত্রের পরে একমাত্র কন্যা বেহুলা[৩] রূপে উষা জন্ম লইল। সপ্ত তরী সাজাইয়া চাঁদো যখন বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইতেছে তখন সনকা পাঁচ মাস গর্ভবতী। এইখানে অষ্টম অর্থাৎ উষা-অনিরুদ্ধ পালা সমাপ্ত।

চাঁপাই নগরের ঘাট ছাড়িয়া চাঁদোর ডিঙ্গা গুঙ্গড়ি বাহিয়া অজয়ে পড়িল, অজয় বাহিয়া গঙ্গায় পড়িল। কাটোয়ায় আসিয়া ইন্দ্রঘাটে ইন্দ্রের পূজা করিয়া নদিয়া, আঁবুয়া, ফুলিয়া, হাতিকান্দা, গুপ্তিপালা, সিঙ্গারপুর বাহিয়া ত্রিবেণীতে পৌছিল। ত্রিবেণীতে চাঁদো তীর্থকার্য করিয়া সপ্তগ্রাম নগর পর্যটন করিল। সেখানে

ছত্রিশ আশ্রমে লোক নাহি কোন দুঃখ শোক
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর।
বৈসে যত দ্বিজগণ সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ
তেজময় যেন দিবাকর,
সর্বতত্ত্ব জানে মর্মে বিশারদ গুরুধর্মে
কুলগুরু দেবের সোসর।.......
নিবসে যবন যত তাহা বা কহিব কত
মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম
ছৈয়দ মোল্লা কাজি কেতাব কোরাণে রাজি
দুই ওক্ত করে তছলিম।
মসিদ মোকাম ঘরে ছেলাম নমাজ করে
ফয়তা করয়ে পিত্য-লোকে

[১] ব্রতকথা-পাঞ্চালী কাব্যের নায়কনায়িকারা দেবসভা হইতে এইভাবে নরলোকে অবতীর্ণ হয়। এই অবতারত্ব এক হিসেবে সংস্কৃত পুরাণ-কাব্যের সহিত বাঙ্গালার নিজস্ব পুরাণ-কাব্যের সংযোগ করিয়াছে।

[২] নামটি "লক্ষ্মীন্দ্র", "লক্ষ্মীন্দর" অথবা "লক্ষেন্দ্র" হইতে আসিতে পারে। চাঁদোর নাম কোন কোন বইয়ে "চন্দ্রধর" অথবা "চন্দ্রপতি" পাওয়া যায়।

[৩] নামটি "বিহ্বলা" অথবা *বি-ফুলা হইতে আসিতে পারে। "বিপুলা" হইতে নয়।

সপ্তগ্রামে দুই তিন দিন থাকিয়া ডিঙ্গা ছাড়া হইলে নদীর দুইপারে নানা স্থান বাহিয়া চান্দো চলিল—কুমারহট্ট, হুগলি, ভাটপাড়া, বোরো, কাঁকীনাডা, মূলাজোড়, গাড়লিয়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, চাপদানি, ইছাপুর, বাঁকিবাজার, দিগঙ্গ, নিমাইতীর্থ, চানক, বুড়নিয়ার দেশ, আকনা মাহেশ, খড়দহ,[১] রিসিড়া, সুখচর, কোননগর, কোতরঙ, কামারহাটী, আঁড়িয়াদহ, ঘুসুড়ি, চিত্রপুর কলিকাতা, বেতড়। বেতড়ে বেতাই-চণ্ডীর পূজা করিয়া চলিল—ধনও, কালীঘাট। সেখানে কালিকার পূজা করিয়া চলিল—চূড়াঘাট, ধনস্থান, বারুইপুর। এখানে নদীতে কালিদহ। কূলে মনসার বিচিত্র ও বিরাট মন্দির। চাঁদোর ডিঙ্গা আসিয়া পড়িবার আগেই মনসা তাহার নাগসেনা সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে চাঁদোর ভয়ভক্তি আকর্ষণ করিতে। কর্ণধার চাঁদোকে বলিল, "এই কালিদহে মনসার অধিকার," এখানে মনসার পূজা দিতে হইবে। চাঁদো রাজী তো হইলই না উপরন্তু মনসার দেউল আক্রমণ করিল। তাহার হেমতাল দণ্ড দেখিয়া নাগেরা সব ভয়ে ভাগিয়া গেল। তখন চাঁদো নিশ্চিন্তমনে কালিদহের জলে প্রবেশ করিয়া কলার বাড়লি চাপিয়া কূলে উঠিল। আর

মনসার ঘটে মারে হেতালের বাড়ি
ভাঙ্গিয়া পদ্মার ঘট যায় গড়াগড়ি।
কুবুদ্ধিয়া চাঁদো রাজা ভাঙ্গিল দেহারা
মন্দিরের যত ধনে ডিঙ্গা কৈল ভরা।

মনসার দেউল লুটিয়া চাঁদো মহানন্দে ডিঙ্গা ছাড়িল।

নানা বাদ্য বাজনে পাইকে গায় শাড়ি
বুহিত্র মেলিয়া ঝাট চাঁদো যায় ধাড়ি।

হুলিয়ার গাঙ বাহিয়া ডিঙ্গা ছত্রভোগে পৌছিল। সেখানে তীর্থকার্য করিয়া বদরিকাকুণ্ড হইতে পানীয় জল তুলিয়া লইল এবং পরে হাতিয়াগড় হইয়া চৌমুহানিতে পৌছিল। সেখানে সঙ্কেতমাধবের পূজা দিয়া ও তীর্থকার্য শ্রাদ্ধ আদি করিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিল। সমুদ্রে কত রকমের অদ্ভুত কাণ্ড। বড় বড় পাখি আসিয়া নৌকার উপরের লোক ছোঁ মারিয়া লয় ও টপটপ গিলিয়া ফেলে।

[১] এই বর্ণনা অনেকটাই প্রক্ষিপ্ত। খড়দহের প্রসঙ্গে আছে "খড়দহে শ্রীপাটে করিয়া দণ্ডবত।" নিত্যানন্দ এখানে আনুমানিক ১৫৩৫ সালের দিকে বাস করিয়াছিলেন, তাহার আগে নয়। সুতরাং অন্যথা অখ্যাত এই স্থানটি ১৪৯৫ সালে "শ্রীপাট" অর্থাৎ বৈষ্ণবমহান্তের বাস হেতু তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কলিকাতার নামও প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করি। (বিপ্রদাসের কাব্যের সব চেয়ে পুরানো পুথি অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথমার্ধের আগেকার নয়।) নদিয়ার প্রসঙ্গে চৈতন্যের নাম নাই—ইহা লক্ষণীয়।

কিরাতের দেশের পাশ দিয়া যাইবার সময় সকলে ভয়ে ভয়ে থাকে, কেন না "জীয়ন্ত মানুষ ধরি তারা সভে খায়"। অশ্বমুখ, গজমুখ, একঠেঙ্গে মানুষের দেশের ধার দিয়া ডিঙ্গা চলিয়াছে। তাহার পর পড়িল বড় বড় কাঁকড়ার দহ, হাঙ্গা দহ, জোঁকের দহ, সাপের দহ, কড়ির দহ, শাঁখের দহ। কড়ির দহে ও শাঁখের দহে চাঁদো প্রচুর পরিমাণে কড়ি ও শাঁখ তুলিয়া লইল। অবশেষে সপ্ত ডিঙ্গা উদ্দিষ্ট অনুপাম-পাটনে পৌঁছিল। সুন্দর ও ধনী দেশ। রাজসভায় গিয়া চাঁদো আত্মপরিচয় দিল। বন্ধু বলিয়া রাজা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিল। রাজার কাছে চাঁদো তাহার আগমন-পথের বিবরণ দিল। (এই বিবরণপ্রক্ষেপ-বিবর্জিত বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করিলাম।)

প্রথমে বাহিনু যান	রামেশ্বর ধর্মথান	অভয়া বিজয়া সুরেশ্বরী।
উজবনি-বক্র বাহি	শিবানদী শাখাই	ওধামপুর বাই ইন্দ্রেশ্বর।
বাহিনু নদিয়া দিয়া	আঁবুয়া ফুলিয়া বায়া	ত্রিবেণী প্রবেশে মধুকর।
নানা গাঁ বাহিয়া আসি	কালিদহে পরবেশি	তথা কানি[১] পাতে অবতার।
আনিলেক নাগগণ	ত্রাস পায় সর্বজন	শুন মিতা বিক্রম আমার।
হেতালের বাড়ি ধরি	ডাকিনু বিক্রম করি	নাগগণ পলায় সঘন
ভাঙ্গিয়া মণ্ডপ-ঘর	ভরী দিনু মধুকর	সাগরে দিলাম দরশন।...

রাজা চাঁদোর থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিল। চাঁদো কয়েকদিন থাকিয়া দোলায় চড়িয়া সহরবাজার দেখিয়া রাজার সহিত সওদা করিল। সওদায় চাঁদোই জিতিল—ঝুনা নারিকেলের বদলে শঙ্খ, হলুদের বদলে সোনা, খুঞা ধুতির বদলে পাট ভোট, পাঁড় কুমড়ার বদলে কাঁচের পাত্র ইত্যাদি। এইসব দ্রব্য সাত ডিঙ্গায় ভরিয়া চাঁদো দেশে প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। এইখানে নবম অর্থাৎ বাণিজ্য পালা সমাপ্ত।

---

[১] কানি নামটির ব্যুৎপত্তি-বিচার মনসাবিজয়ের ভূমিকায় (পৃ xxxiii) দ্রষ্টব্য। "কাণ" এবং "কর্ণী (কর্ণিকা)" এই দুইটি শব্দই ইহার মূলে। রাজপুতনায় চারণদের দেবী করণী ইনিই। করণীদেবীকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপেও কল্পনা করা হইয়াছে। তখন তিনি মারবাড়ের সুবাপ গ্রামের মেহা চারণের সপ্তম কন্যা। দেখিতে কুৎসিত। মেয়েটিকে মেহা করণীদেবীর অবতার মনে করিত। সাপের কামড়ে মেহার মৃত্যু হইলে করণী বাপকে বাঁচাইয়া দেয়। বেশি বয়সে করণীর বিবাহ হয়। কিন্তু কোন সন্তানাদি হয় নাই। (এই কাহিনী হইতে করণীকে মনসা বলিয়া চেনা কঠিন নয়। বাপ মেহা—মহাদেব।) করণীদেবীর অনেক কাহিনী পুরানো রাজস্থানী গাথায় বর্ণিত আছে। একটি কাহিনী অনুসারে করণীদেবীর সহায়তাই পুগলের রায় সেখো রাজ্যলাভ করিয়াছিল। করণীদেবীর কাছে সেখো অমরত্ব চাহিলে দেবী বলিয়াছিল, দুইটি বিষয়ে সাবধান থাকিলে তুমি অমর রহিবে। এক, পূর্বদিনের রাঁধা বাসি ভাত খাইবে না। দুই, বকায়ন গাছের তলায় বসিবে না। সর্ত দুইটি না মানিয়া সেখো শেষে মারা যায়। বাসি ভাত খাইয়া বিপদে পড়ার দৃষ্টান্ত মনসাবিজয় কাহিনীতে উপরে পাইয়াছি।

চাঁদো পাটনে গিয়াছে ইতিমধ্যে লখিন্দরের জন্ম হইল। যথাকালে বি বিধ জাতকর্ম অনুষ্ঠিত হইল। লখাই বাড়িতে লাগিল। পড়িবার বয়স হইলে পড়াইবার জন্ম সনকা ব্রাহ্মণপণ্ডিত সোমাইকে ডাকিয়া আনিল। শুভক্ষণে লখাইয়ের হাতেখড়ি দেওয়া হইল। বর্ণপরিচয়ের পর "ফলা" অর্থাৎ যুক্তবর্ণের শিক্ষা হইল। তাহার পর অষ্ট শব্দ ও অষ্ট ধাতু পড়িল।[১] ঘরে এই পর্যন্ত পড়িয়া তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা শুরু হইল।

অষ্ট ধাতু অষ্ট শব্দ পড়িল সত্বরে
সোমাই পণ্ডিত দ্বিজ শুভদিন করে।
পড়িশাল[২] লইলেক বালা লখিন্দর
প্রথমে পড়ায় সূত্র[৩] সুখে দ্বিজবর।
তারপর ব্যাকরণ পড়ে রাজসুতে
ভট্টি রঘু সাহিত্য পড়িল হরষিতে।
অলঙ্কার কুমার পড়িল অভিধান
জ্যোতিষ নাটক কাব্য পড়িল বিধান[৪]।
অষ্টাদশ পুরাণ পড়িয়া অনিবার।
হইল পণ্ডিত বড় রাজার কুমার।

পড়াশোনা শেষ হইলে পাত্রমিত্রেরা সনকার সম্মতি লইয়া লখিন্দরকে শূন্য রাজপাটে অভিষেক করিল।

মনসা দেখিল এদিকে লখিন্দর রাজা হইয়াছে, ওদিকে চাঁদো অনুপাম-পাটনে দিব্য সুখে আছে। তখন নেতোর পরামর্শ চাওয়া হইল। নেতোর কথায় মনসা সনকার রূপ ধরিয়া চাঁদোকে স্বপ্নে দেখা দিল। স্বপ্ন দেখিয়া চাঁদোর মন চঞ্চল হইল। রাজাকে বলিয়া সে সত্বর দেশের দিকে যাত্রা করিল।

ফিরিবার পথে কালিদহে মনসা হনুমানের সাহায্যে ঝড়বাতাস উঠাইয়া সাত ডিঙ্গা ডুবাইয়া দিল। চাঁদো জলে ভাসিতে লাগিল।

ধনজন সঙ্গে ডিঙ্গা লইল বিষহরি
গচ্ছিত করিয়া রাখে বরুণের পুরী।

চাঁদো জলে হাবুডুবু খাইতেছে দেখিয়া মনসা বালিশে নিজের নাম লিখিয়া তাহার কাছে পাঠাইয়া দিল। মনসার নাম দেখিয়া চাঁদো তাহা ঠেলিয়া ফেলিয়া

[১] সেকালে বর্ণপরিচয় হইয়া গেলেই আটটি প্রধান শব্দের (নাম ও সর্বনাম) ও আটটি প্রধান ধাতুর রূপ মুখস্থ করিতে হইত। ইহাকে বলিত "অষ্টশব্দী"। অষ্টশব্দীর অনেক পুথি পাওয়া গিয়াছে।

[২] পাঠশালা অর্থাৎ রিডিং হল। [৩] ব্যাকরণের সূত্র আবৃত্তি।

[৪] অর্থাৎ স্মৃতি।

দিল। পরে সে অনেক কষ্টে তীরে উঠিল। তাহার পর মনসার ছলনায় তাহার নানা দুর্গতি। কালিদহে ডিঙ্গা ডুবিয়াছিল। চাঁদো তীরে উঠিয়াছিল বারুইপুরে, সেখানে পেটের দায়ে কাঠ বেচিয়াছিল। চৌতলে কলার খোসা খাইয়া প্রাণ রাখিয়াছিল এবং ব্যাধদের কাছে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিল। কালীঘাটে পড়িয়াছিল দস্যুর কবলে। দিগঙ্গ নগরে অগ্নিদাহ। হুগলিতে বামুনের গোরুর রাখাল। ত্রিবেণীতে আসিয়া চাঁদো পাঁচ দরবেশের হাতে পড়িল।

দরবেশ মেলি চাঁদো ধরিল সত্বর
ভালো হৈল আইল হিন্দু আমার নগর।
মাথায় তইকা দিয়া আও মোর সনে
এক ঠাঁই মাগিয়া বেড়াব ছয় জনে
কেহ দুষ্ট ভাত লৈয়া যাচয়ে রাজায়
আর দরবেশ মাতোয়ালা হৈয়া চায়
চামড়ার বাড়ি মারে চাঁদোর মাথায়।

কোনও ক্রমে তাহাদের হাত এড়াইয়া চাঁদো পলাইয়া মিতা চন্দ্রকেতুর দেশে পৌঁছিল। সেখানে আদর যত্ন পাইয়া সুস্থ হইল। কিন্তু চন্দ্রকেতু মনসার পূজা করে শুনিয়া থাকিতে চাহিল না, অবিলম্বে বাড়ির দিকে চলিতে ব্যগ্র হইল। চন্দ্রকেতু তাহাকে রাত্রিটা থাকিয়া যাইতে বলিল। এইখানে দশম অর্থাৎ ডিঙ্গাডুবি পালা শেষ।

সকালে চাঁদো দেশের দিকে চলিল। চন্দ্রকেতু সঙ্গে লোকজন হাতি ঘোড়া পালকি দিতে চাহিল। চাঁদো কিছুই লইল না। মনসা কুবুদ্ধি দিয়া তাহাকে ভাগাইল। সে ভাবিল

আমি চাঁদো রাজা হই বিদিত সংসারে
পরের বিভূতি লইয়া না যাব দেশেরে।

মিতার দেওয়া বসনভূষণ ছাড়িয়া সে যে-বেশে আসিয়াছিল সেই "উন্মত্ত পাগল বেশে করিল গমন"। এ বেশে চাঁপাই নগরে দিনের বেলায় দেখা দেওয়া চলে না। সন্ধ্যার অন্ধকারে লোকে তাহাকে দেখিয়া "ভুল[২] (=অগ্নিমুখ ভূত) মনে করিয়া ঘরে কপাট দিল। চাঁদো ভাবিল, সনকা ছাড়া আমাকে তো কেহই চিনিবে না, "ভুল" বলিয়া মারিয়া ফেলিবে। সনকাও প্রথমে "ভুল" মনে করিয়াছিল। কিন্তু চাঁদো কাতরস্বরে এই আত্মপরিচয় দেওয়াতে,

ভুল নহি হই আমি চাঁদো দণ্ডধর
সুবর্ণবাঁধান দন্ত দরশন কর।

এবং নিদর্শন দেখাইতে সনকা বিশ্বাস করিল। স্নানাহার করিয়া চাঁদো শয়নঘরে গেল। তখন লখিন্দর আসিয়া প্রণাম করিল। সনকা পিতাপুত্রের পরিচয় করাইয়া দিল।

তাহার পর লখিন্দরের বিবাহের উদ্যোগ। নানাস্থানে কন্যার কথা শুনিয়া অবশেষে উজানি নগরের সাধুর কন্যা বেহুলাকে পছন্দ হইল। চাঁদো কন্যা দেখিতে গেল। সেইদিন সকালে বেহুলা পুকুরে নামিয়া সখীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করিতেছে এমন সময় মনসা বৃদ্ধব্রাহ্মণীর বেশে ঘাটে আসিয়া বসিল।

খণ্ড খণ্ড বসন বদনে দন্ত বোড়া·
খঞ্জগমনী দেবী দুই পদ খোড়া।
সঘন নিমগ্ন আখি মন্দদৃষ্টি চায়
গভীর আকার শির শোভে সর্ব গায়।
মহাপদ্ম উরগে ধরিয়া করে নড়ি
খোম ধুতি পরি কাখে তাঁতিয়া[১] চুপড়ি।

বেহুলা জলে ঝাঁপাইতেছিল। তাহার পায়ের একফোঁটা জল মনসার গায়ে লাগিল। অমনি দেবী শাপ দিল, "বিভা রাতে খাইবা ভাতার"।

চাঁদো মেয়ে দেখিতে আসিয়া বেহুলাকে পছন্দ করিল। সাধু চাঁদোকে ভোজনের অনুরোধ করিলে চাঁদো বলিল, পাটনে গিয়া আমার শরীরে নোনা লাগিয়াছে, সেইজন্য আমাকে কিছু লোহার কলাই-সিদ্ধ খাইতে হয়। সাধু পত্নী সুমিত্রার কাছে বলিল। সুমিত্রা চিন্তায় পড়িল, "এমন অদ্ভুত কর্ম না শুনি কখন"। সে লজ্জায় অপমানে কাঁদিতে লাগিল। বেহুলা আসিয়া শুনিয়া বলিল, কাঁদিও না, আমি লোহার কলাই সিজাইয়া দিতেছি। মনসাকে স্মরণ করিয়া বেহুলা কাঁচা হাঁড়িতে কাঁচা শরা চাপা দিয়া উনানে সাত নাদা লোহার কলাই সিদ্ধ করিয়া দিল। চাঁদো খুশি হইয়া লগ্নপত্র করিল। কিন্তু "বিবা-রাত্রে পুত্রের নাগের আছে ডর" বলিয়া সনকা বিবাহ বন্ধ করিতে বলিল। চাঁদো বলিল,

নর হইয়া সিদ্ধ করে লোহার কলাই
তাহা হৈতে তরিবেক কুমার লখাই।···

---

[১] তাঁতিদের ব্যবহৃত। মনসার তাঁতিনী-রূপের উল্লেখ কেতকদাসের মনসামঙ্গলে আত্মপরিচয় অংশে আছে। তক্ষণের মত তাঁতও নির্মাণশিল্প। ডোমিনীরূপে বেহুলার চুপড়ি কুলা বিয়নি ইত্যাদি বিক্রয় পরে দ্রষ্টব্য।

চিন্তা না করিহ কহি তোমার অগ্রেতে
বান্ধিব লোহার ঘর সাতালি[১] পর্বতে।
পুত্রবধূ থোব লৈয়া তাহার ভিতরে
তবেত কানির নাগ কি করিতে পারে।

এইখানে একাদশ অর্থাৎ চাঁদোর প্রত্যাগমন ও বেহুলার সম্বন্ধ পালা সাঙ্গ।

সাতালি পর্বতে লোহার ঘর গড়ানো হইল। মনসার ভয়ে কামিলা সূতার মত ক্ষীণ একটু ছিদ্র রাখিয়া দিল। তাহার পর বিবাহ। বিপ্রদাসের কাব্যে ইহা বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। বরযাত্রাপথে এবং বিবাহকর্মস্থলে মনসা বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারে নাই। লখিন্দর কোন দোষ করে নাই তাই দংশন করা গেল না। জাঁকজমকে বিবাহ হইয়া গেল। লখাইকে দেখিয়া উজানীর নারীরা মুগ্ধ।

বৃদ্ধ ভাবিনী যত লখাই দেখিয়া হত মৃতবৎ যৌবনের শোকে
যখন যৌবন ছিল হেন বর না মিলিল সর্বক্ষণ বঞ্চিতু কৌতুকে।

সকালে দম্পতির বিদায়। শীঘ্র বাহির হইয়া পড়িবার জন্য সোমাই পণ্ডিত তাড়া দিতে লাগিল।

নড়ো নড়ো করি ডাকে সোমাই পণ্ডিত
যাত্রার উদ্‌যোগে বাদ্য মঙ্গল বিহিত।

বরকন্যা চাঁদোর ঘরে আসিল। রাত্রিতে লৌহ-মন্দিরে ঢুকিয়া বেহুলা স্বামীকে বলিল, আজ রাত্রিতে ঘুমাইও না, তোমার সর্পভয় আছে। কিন্তু দৈবের লিখন অন্যথা করিবে কে। লখিন্দরের ক্ষুধা পাইল। বেহুলাকে তখনি ভাত রাঁধিয়া দিতে হইবে। কাপড় ছিঁড়িয়া তাহাতে ঘি ঢালিয়া আগুন জ্বালা হইল আর মঙ্গল হাঁড়িতে চাল ছিল তাহাতে নারিকেলের জল দিয়া ভাত রাঁধা হইল।[২] ভাত খাইয়া লখাই ঘুমাইয়া পড়িল। তখন সূত্রপথে আসিয়া কালনাগিনী তাহাকে দংশন করিল।[৩] বেহুলার ক্রন্দনে সকলে ছুটিয়া আসিল। শোকাকুল সনকা চাঁদোকে দোষ দিতে লাগিল, তুমি মনসাকে মানিলে এমন হইত না। বেহুলা শ্বশুরকে বলিল, আপনি ব্যবস্থা করিয়া দিন, আমি স্বামীর মৃতদেহ মনসার

---

[১] সপ্ততাল উচ্চ অথবা সপ্ততাল যুক্ত। হেতালের মত সাতালিও নাগ-কাল্টের সিম্বল। নাগরক্ষিত সপ্ততাল ভেদ রামায়ণে আছে। দক্ষিণ ভারতে মন্দির-চিত্রেও দেখিয়াছি। সিদ্ধার্থ "সপ্ততালা অয়স্ময়ী বরাহপ্রতিমা যন্ত্রযুক্তা" লক্ষ্যভেদ করিয়াছিলেন ('ললিতবিস্তর' দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

[২] এই অগ্নিকার্যই মনসার কাছে অপরাধ হইল।

[৩] চাঁদো পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছিল কিন্তু মনসা ঝড়জল করায় প্রহরীরা শেষ পর্যন্ত পাহারা দিতে পারে নাই।

কাছে লইয়া গিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া আনি। চাঁদো মালাকার ডাকিয়া রামকলার মাজস[১] গড়িতে বলিল। লখিন্দরের মৃতদেহ লইয়া বেহুলা মাজসে উঠিল। মাজস গুঙ্গড়ির জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল।

মাজস ভাসিলে মনসা কাকরূপে উড়িয়া আসিয়া বসিল।[২] বেহুলার কথায় কাক তাহার আংটি নিদর্শন লইয়া গিয়া মায়ের কাছে খবর দিল। ছয় ভাই নদীর তীরে ছুটিয়া আসিল। বেহুলা নিজের দুঃখ জানাইয়া আবার ভাসিয়া চলিল। কিছুদূর গিয়া বাঁক ফিরিলে ঘাটোয়াল ধনা-পুনা মাজস আটক করিল। বেহুলা সকাতরে নিজের পরিচয় দিলে ধনা-পুনা তাহাকে খাতির করিয়া ছাড়িয়া দিল। তাহার পর সে আটক পড়িল বড়শিওয়ালা ("বড়স্ব") গোদার[৩] বাঁকে। তাহার পরিচয় পাইয়াও গোদা লোভ ছাড়ে না। বলে, তুমি জান না লখাই আমার ভাগিনা হয়, "আইসহ আমার পুরী করিব পালন।" অনেক কষ্টে তাহার হাত এড়াইয়া পড়িল গিয়া জুয়ার অর্থাৎ দ্যূতকারের বাঁকে। তাহাকে কিছু দ্রব্য দিয়া বেহুলা উদ্ধার পাইল। তাহার পর বড়িসিয়ার অর্থাৎ বড়শিওয়ালার বাঁকে ঠেকিল।[৪] বেহুলা তাহাকে প্রথমে শাপ দিল, পরে রোগ সারাইয়া দিলে তবে তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইল। তাহার পরে মৃত মাংসের গন্ধে গৃধ্র-শকুনের আক্রমণ। বেহুলা তাহাদের তাড়াইতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে মনসা মহাকায় শ্যেন হইয়া আসিয়া রক্ষা করিল! তাহার পরে মাজস বাঘের বাঁকে গিয়া ঠেকিল। এখানেও মনসা অন্তরীক্ষে থাকিয়া ব্যাঘ্রভীতি দূর করিল। তাহার পর চানকে আসিয়া গাঙ্গে পড়িল। সে বুড়নিয়ার অর্থাৎ ডুবারি ডাকাতের দেশ। তাহারা কপট সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া বদমাইসি করে।

ললাটে উজ্জল ফোঁটা কান্ধে শোভা যোগপাটা
পদ্মবীজে জাপ্যমালা করে
মিছা মন্ত্র জপ করে গলায় রুদ্রাক্ষ ধরে
নিশি হইলে দুষ্টবৃত্তি করে।

---

[১] মঞ্জুষা অর্থাৎ বাক্সর মত ভেলা।

[২] কাক "দূতো নির্ঋত্যাঃ" (ঋগ্বেদ ১০, ১৬৫ দ্রষ্টব্য)। "তন্ত্র" বিভূতির মনসামঙ্গলে মনসাকে কাক-বাহন বলা হইয়াছে।

[৩] মূলে অবশ্য ছিল গোধা (গোসাপ, কুমীর)।

[৪] বিপ্রদাসের পুথিতে বড়িসিয়া দুইবার উল্লিখিত হইয়াও এক ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছে। গোধার মূল অর্থ হারাইয়া যাওয়ায় "গোদা" হইয়াছে, সুতরাং তাহার পায়ে গোদ। পর পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বেহুলাকে কবলে পাইয়া তাহাদের মহা আনন্দ। বেহুলা মনসাকে স্মরণ করিল। মনসা বুড়নিয়াদের অন্ধ করিয়া দিল।[১] তাহাদের হাত এড়াইয়া মাজস আগাইয়া চলিল। চৌমুহানিতে পড়িয়া বেহুলার চিন্তা হইল, কোন মুখ ধরিব। অগত্যা সেইখানেই এক ধারে ভেলা রাখিল। মনসা তখন তাহার সাহায্যের জন্য নেতোকে পাঠাইয়া দিল। ধোবানী হইয়া নেতো ঘাটে কাপড় কাচিতে আসিল। ভেলা হইতে বেহুলা দেখিল, ধোবানী কোলের ছেলেকে মারিয়া ফেলিয়া নির্ঝঞ্ঝাটে কাপড় কাচিয়া তাহার পর ছেলেকে জীয়াইয়া বাড়ি চলিয়াছে। অমনি গিয়া বেহুলা তাহার পায়ে পড়িল। বলিল,

মৃতপতি লইয়া ভাসি মনসা উদ্দেশ্যে আসি
এই তো চৌমুখে পরবেশ
কোন পথ দিয়া যাব কোথায় মনসা পাব
তুমি মোরে বলহ উদ্দেশ।

নেতো বলিল, আমার সঙ্গে এস। নেতোর সঙ্গে বেহুলা সিজুয়া গিরিতে দেবপুরে চলিয়া গেল। (বিপ্রদাসের বর্ণনা হইতে মনে হয় সিজুয়া গিরি সিদ্ধদের স্থান।) বেহুলা সেখানে দেবকন্যাদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া নর্তকীর বেশ ধরিল। পূর্বজন্মের সংস্কার, তাই সহজেই তাহার সব আয়োজন জুটিয়া গেল।

আপনি মৃদঙ্গ বাহে গীত গাহে রঙ্গে
সুতাল সুছন্দে নৃত্য করে অঙ্গভঙ্গে।
ক্ষেণেক রহিয়া রামা করয়ে বিশ্রাম
পুন ছন্দ-বিছন্দে নাচয়ে অনুপাম।
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে বন্দি বিষহরি
কামেতে পীড়িত হৈয়া বলে ত্রিপুরারি॥

শিবের গর্হিত প্রস্তাবে বেহুলা ক্ষুব্ধ হইয়া আত্মপরিচয় দিল, "মনসার বরদাসী তোমার নাতিনি"। শিব তখন হাসিয়া নারদকে দিয়া মনসাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

মনসা আসিয়া লখিন্দরের মৃত্যুসম্বন্ধে নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করিলে বেহুলা কালিনাগিনীর কাটা লেজটুকু দেখাইল। তখন মনসা চাঁদোর সম্পর্কে নিজের বারমাসিয়া দুঃখের ফিরিস্তি দিল। বেহুলা হাত জোড় করিয়া বলিল, আমার

[১] মনসার কাহিনী যে বহুপ্রাচীন মাল মশলা লইয়া গাঁথা হইয়াছিল তাহার একটি বড় প্রমাণ পাইতেছি এখানে—গুঙ্গড়ির বাঁকে বাঁকে বেহুলার ভীতির বিবরণে। এমনি শত্রুর উল্লেখ আছে অথর্ব বেদের একটি সূক্তে (৪. ৩)—ব্যাঘ্র, পুরুষ, বৃক, তস্কর, অঘায়ু, দত্বতী রজ্জু, গোধা, যাতুধান।" সেখানে "দত্বতী রজ্জু" এখানে বড়িশিয়া। সেখানে "যাতুধান" এখানে বুড়নিয়া।

স্বামীকে জীয়াইয়া দাও, শ্বশুরকে দিয়া তোমার পূজা করাইব। দেবতারাও সকলে বেহুলার পক্ষ সমর্থন করিল। তখন মনসা লখিন্দরের মৃতদেহ আনিতে বলিল। মাংস গলিয়া গিয়াছে, বেহুলা হাড়গুলি সংগ্রহ করিয়া আনিল। হাড়-গুলি সাজাইয়া মনসা নাগ-বাচা বিষ্যার মন্ত্র পড়িতে লাগিল। হাড় জোড়া লাগিল, মাংস গজাইল, রক্ত চলাচল হইল। তখন কালনাগিনী আসিয়া বিষ তুলিয়া লইল। তখন

মন্ত্র পড়ি চাপড় মারিল তার পিঠে
ত্রস্ত হইয়া লখিন্দর আস্তে বেস্তে উঠে।

লখিন্দরের মতো তাহার ছয় সহোদরকেও মনসা জীয়াইল। এইখানে দ্বাদশ পালা "জাগরণ" সমাপ্ত।

লখিন্দরকে বেহুলা তাহার মৃত্যু ও পুনর্জীবনের সব কথা বলিল। সকলে দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিলে বেহুলার অনুরোধে মনসা কালিদহ হইতে সাত ডিঙ্গা উদ্ধার করিয়া দিল। ফিরিবার পথে যে যে স্থানে বেহুলা বিপদে পড়িয়াছিল সেই সেই স্থানে লখাই যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে করিতে চলিল। বুড়নিয়াদের লখাই কাটিয়া ফেলিল অথবা শূলে দিল। বাঘের বাঁকে বাঘকে মারিয়া বাঘডাঙ্গা নগর বসাইল। শকুনির বাঁকে শকুনি-নগর স্থাপিত হইল। ধনা-পুলার বাঁকে পৌছিয়া তাহাদের ধন দিয়া চৌহাটা নগর পত্তন করা হইল। চাঁপাই নগরের কাছে পৌছিলে বেহুলা লখিন্দরকে বলিল, একটি অনুরোধ আছে।

প্রসন্ন রূপেতে যদি দেহ ত মেলানি
ছলিব ডুমুনি রূপে তোমার জননী।

তুমি আমাকে চুপড়ি ও বিয়নি[1] বুনিয়া দাও। লখাই বলিল, দেখিও যেন লোকের কাছে লজ্জায় না পড়ি।

বেহুলা ডোমনী সাজিয়া অন্ত:পুরদ্বারে হাজির হইয়া হাঁক দিল, "কে লইবে চুপড়ি বিয়নি"। ঝাউয়া দাসী দৌড়িয়া গিয়া ছলছল চোখে সনকাকে খবর দিল, বাহিরে এক ডোমনী আসিয়াছে, ঠিক বেহুলার মতো দেখিতে। সনকা আসিয়া দেখিল। দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিল।

অনিমিখ দুই আখি ডুমুনি নেহালি
লিখিয়াছে পটে যেন চিত্রের পুতলি।

[1] = ব্যজনী, পাখা। ইহাই "বিচিত্রা"। উত্তরপূর্ব বঙ্গে অনেক স্থানে বিচিত্রায় (—মনসামূর্তি আঁকা বেতের পাখায়—) মনসার পূজা হয়।

হা হা পুত্র বধূ বহি অন্য নাহি মনে
চিন্তিতে গণিতে অস্থি বিঁধিলেক ঘুণে।
কহ লো ডুমুনি মোরে করিয়া নিশ্চয়
বেহুলার হেন দেখি দেহ পরিচয়।
প্রাণ স্থির নহে মোর তোমারে দেখিয়া
কোন বাঁকে পুত্র মোর দিলে ভাসাইয়া।

বেহুলা বলিল, রানীমা, ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিতেছে। সনকা এক বধূকে বলিল, শীঘ্র ভাত বাড়িয়া আন। শুনিয়া স্নান করিয়া আসিতেছি বলিয়া নমস্কার করিয়া বেহুলা চলিয়া গেল।

বাজনা বাজাইতে বাজাইতে ডিঙ্গা সব আসিয়া চাঁদোর খাশ বন্দর রামেশ্বর ঘাটে লাগিল। কর্ণধার দুর্লভকে দলপতি করিয়া সকলে যুক্তি করিল, যদি রাজা চাঁদো মনসার পূজা মানে তবেই তাহাকে ডিঙ্গার দ্রব্য সব দেওয়া হইবে। এই যুক্তি করিয়া মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে লইয়া পদ্মার নিশান আগে ধরিয়া দুর্লভ নৃত্যগীত করিতে করিতে চাঁদোর বাড়ির দিকে চলিল। খবর পাইয়া চাঁদো সোমাই পণ্ডিতকে পাঠাইল খবর লইতে। সোমাই বহুকাল-মৃত দুর্লভকে দেখিয়া ত্রাস পাইয়া "ধর্ম ধর্ম" ডাক ছাড়িল। দুর্লভ বেহুলার কৃতিত্ব বর্ণনা করিয়া শেষে বলিল,

যদি বা না পূজে রাজা মনসাচরণ
নেউটিয়া যাব সভে পদ্মার সদন।

সোমাই হাতে ধরিয়া দুর্লভকে রাজার কাছে লইয়া গেল। ছেলেদের ও বেহুলাকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে লইয়া যাইতে সকলে রামেশ্বর ঘাটে আসিল। সবাই চাঁদোকে মনসার পূজা করিতে বলিতেছে, চাঁদোর মনও নরম হইয়াছে তবুও জেদের রেশটুকু যাইতেছে না। সে বলিল, তোমরা তো সকলে নিজের স্বার্থের অপেক্ষায় বলিতেছ।

না বুঝিয়া সর্বলোক বলে অনুচিত
দক্ষিণার লোভে বলে সোমাই পণ্ডিত।
পুত্রশোকে সনকা বলয়ে অনুরোধে
নেড়া ঝাউয়া দাসী বলে সনকার বুদ্ধে।
ছয় বধূ বলে ছয় স্বামীর হাব্যাসে
গাবর চাকর বলে সেই অভিলাষে।

বেহুলা নির্বন্ধ করিলে চাঁদো বলিল, তুমি পতিব্রতা সতী। তোমার কথায় আমি মনসাকে পূজিতে পারি, যদি প্রত্যক্ষ দেখি যে তোমার মহিমায় সাত

ডিঙ্গা ঘাট হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া আমার বাড়ির দরজায় আসিয়া লাগিয়াছে।[১] বেহুলা মনসাকে স্মরণ করিল। মনসা শেষ নাগকে স্মরণ করিল। শেষ নাগ সাত নাগকে হুকুম করিল। তখন

সাত ডিঙ্গা পৃষ্ঠে করি চলিল সাত নাগ
এড়িল চাঁদোর দ্বারে সাত ভাগে ভাগ।

মনসাকে পূজা করিতে আর কোনই আপত্তি রহিল না। চাঁদোর পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া মনসা মোহনরূপে দেখা দিল।

নানারত্ন অলঙ্কার পরি অঙ্গরাগে
কুঙ্কুম কস্তুরী গন্ধ ধায় দশ দিগে।
বিচিত্র অম্বর পরি হৃদয়-কাঁচুলি
কটাক্ষে মোহন কাম মনসা কুমারী।
অজাগর সর্পে পদ্ম-কৃতাসন করি
ফণী কাল বেকাল যুগল হস্তে ধরি
দুই ঘট শিরে দুই পদাঙ্গুলি দিয়া
নৃপতিরে দেখা দিল ঈষৎ হাসিয়া।

পূজা লইয়া যাইবার কালে মনসা শাপমুক্ত বেহুলা-লখিন্দরকে রথে তুলিয়া লইল। রথে যাইতে যাইতে উজানি শহর নজরে পড়িতে বেহুলা মনসাকে নিবেদন করিল

ক্ষেণেক বিলম্ব কর এই মোর বাপঘর
দেখি যদি দেহ গো মেলানি
প্রভুর সংহতি যাব পরিচয় নাহি দিব
অবিলম্বে আসিব এখনি।

মনসা রথ থামাইল। লখাই-বেহুলা যোগী-যোগিনীর বেশ ধরিল।

লাউয়া লাঠি থাল ঝুলি দোয়াদশ করে
শ্রবণেতে কুণ্ডল বিভূতি কলেবরে।
আগে চলে লখাই বেহুলা পাছে যায়
উজানি নগরে গিয়া পরবেশ হয়।

সাধুর বাড়ির কাছে গিয়া শৃঙ্গনাদ করিল। তাহাদের দেখিয়া সুমিত্রা কাতর হইয়া বলিল

সুবর্ণের থাল ভরি অন্ন দিব নিত্য
থাকহ হেথায় দুহে হইয়া হরষিত।
ঝি জামাই ছিল মোর সর্পাঘাতে মৈল
তোমা দুহা দেখি সেই শোক উপজিল।

বেহুলা তখন আত্মপরিচয় দিয়া সব কথা বলিল। তাহারা মমতা ছাড়িয়া

---

১ তুলনীয় ঋগ্‌বেদ ১. ১১৬. ৩ গ ("নৌভিরাত্মন্বতীভিঃ")। দ্রষ্টব্য মনসাবিজয় পৃ ৩০৯।

বিদায় লইয়া ফিরিলে রথ ইন্দ্রের ভুবনে চলিয়া গেল। মর্ত্যবাসের পাপ ক্ষালনের জন্য অনিরুদ্ধ-উষাকে পরীক্ষা দিতে হইল। প্রথমে

প্রবীণ পাথর বান্ধি দুহার কাঁকালে
মেলিল বাঁধিয়া দুহে অগাধ সলিলে।

তাহার পর দুইজনকে বাঁধিয়া আগুনে ফেলা হইল। মনসার কৃপায় দুই পরীক্ষাতেই তাহারা উত্তীর্ণ হইল এবং ইন্দ্রের সভায় পূর্বস্থান অধিকার করিল। তাহার পর ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে মনসা তাহার কাহিনীর "অনুবাদ" দিল। এখানে ত্রয়োদশ পালা ("অষ্টমঙ্গলা") সমাপ্ত। মনসাবিজয় শেষ ॥

৪

মনসার কাহিনী সম্পূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে বিপ্রদাসের কাব্যেই মিলে। অন্য মনসামঙ্গল কাব্যে হয় কোন কোন আখ্যান মোটেই নাই, নয় কোন কোন আখ্যান অপেক্ষাকৃত স্বল্প অথবা বৃহৎ আয়তন লইয়াছে। বিপ্রদাস ছাড়া সব কবি—যাঁহাদের রচনা পুরা মিলিয়াছে—বেহুলা-লখিন্দরের আখ্যানেই পূর্ণ মনোযোগ দিয়াছেন। তাই তাঁহাদের রচনায় পূর্ব আখ্যানগুলি অনাদৃত এবং সেগুলির যোগসূত্র অতীব ক্ষীণ। অন্য সকলে বেহুলাকে দিয়া দেবতাদের কাপড় কাচাইয়াছেন এবং দেবসভায় বেহুলাকে বাইজী-নাচ নাচাইয়া ছাড়িয়াছেন। বিপ্রদাস তাহা করেন নাই। তাঁহার রচনায় বেহুলা নেতোর অনুসরণ করিয়া স্বর্গে মনসার লাগ পাইয়াছে। বেহুলা এখানে নাচনী নয়, সে বিদ্যাধরী —স্বস্থানে ফিরিয়া নিজের প্রতিবেশে আসিয়া স্বভাবতই নৃত্যপর হইয়াছে। শিবের নাচ দেখা তাঁহার স্বভাবসুলভ (—মনসামঙ্গলে—) তরুণীস্পৃহা মাত্র।

বিপ্রদাসের কাব্যের ভূমিকাগুলি, দেব হোক বা মানুষ হোক, স্বভাব-সঙ্গতভাবে চিত্রিত হইয়াছে। স্বভাবসঙ্গত বলিতে বুঝি যে, কবির পরিচিত সমাজের সংসারের ও পারিপার্শ্বিকের অনুযায়ী। বাঙ্গালীর চোখে সংসারই বড়, সমাজ নয়। বাঙ্গালীর সমাজ সংসারকে ঘিরিয়া, তাই বাঙ্গালী কবির মনোযোগ বিশেষভাবে ঘরোয়া ব্যাপারে পড়িয়াছে। এইজন্য পুরানো কাব্যে সর্বত্র ঘরের কথাই উচ্চকণ্ঠে এবং ঘরের কর্ত্রীগণ মুখ্যপাত্র। বিপ্রদাসের কাব্যেও তাই নারীচরিত্রগুলি সাধারণত উজ্জ্বলতর—অবশ্য চাঁদোর কথা বাদ দিলে। সমগ্র পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে চাঁদোর মত পুরুষ চরিত্র আর একটি নাই। যে-দেবতার কাছে সে মাথা বিকাইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্যদেবতার কাছে নতি স্বীকার করিতে সে প্রস্তুত নয় ॥

গের আখ্যায়িকা রূপে মনসামঙ্গলের পূর্ণ বিকাশ বিপ্রদাসের রচনায় পাইতেছি। ইহার পরে বিস্তর মনসামঙ্গল লেখা হইয়াছে কিন্তু তাহাতে আধার ও আধেয়ের দিক দিয়া নূতন কিছুই নাই—শুধু অল্পস্বল্প কাহিনীর সংযোজন অথবা পরিবর্ধন ও পরিবর্জন ছাড়া। কালবাহিত হইয়া যে-সব লৌকিক দেব ও মনুষ্য-কাহিনী মিলিয়া মিশিয়া মনসামঙ্গলে বিন্যস্ত হইয়াছিল সেগুলি কতকালের তাহা বলা দুঃসাধ্য। তবে এই পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল সুনির্দিষ্ট রূপ পাইবার অনেক আগেই মনসার কাহিনী গঠিত হইয়াছিল। ধর্মমঙ্গলের ঐতিহ্য আর মনসামঙ্গলের ঐতিহ্য এক মূল হইতেই উদ্ভূত। সে মূল হইতে নাথ-পন্থীদের ঐতিহ্যও অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ্য-মতে তিন যুগের তিন প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্য বা জ্ঞানভাণ্ডার। সত্য যুগে বেদ, ত্রেতা যুগে রামায়ণ আর দ্বাপর যুগে মহাভারত। নাথ-পন্থের ঐতিহ্যের যে পূর্বাভাস পাই তাহাতে ত্রেতা-দ্বাপরের সাহিত্য যথাক্রমে রামায়ণ-মহাভারত বটে কিন্তু সত্য যুগে বিষধরী-গন্ধর্বের কাহিনী।

সত্য যুগ মধে যুগ এক রচিলা
বিষধর এক নিপায়া
গ্যান-বিহূণাঁ গন গন্ধ্রপ অবধূ
সবহি ডসি ডসি খায়া।
ত্রেতা যুগ মধে যুগ দুই রচিলা
রাম রামাইণ কিহূঁা
নর বন্দর লড়ি লড়ি মূয়ে
তিন ভি গ্যান ন চিহূঁা।
দ্বাপর যুগ মধে যুগ তিনি রচিলা
বহু ডম্বর মহাভার[১]
কৈরৌ পাণ্ডৌ লড়ি লড়ি মূয়ে
নারদ কিয়া সংহার।
কলি যুগ মধে যুগ চারি রচিলা
চুকিলা চার বিচারা।
ঘরি ঘরি দন্দী ঘরি ঘরি বাদী
ঘরি ঘরি কথনহারাঁ।[২]

'সত্যযুগ মধ্যে প্রথম যুগ রচিত হইল। এক বিষধরী নিষ্পন্ন হইল। হে অবধূত, জ্ঞানহীন দেখিয়া সব গন্ধর্বকে সে দংশন করিয়া খাইল। ত্রেতা যুগ মধ্যে দ্বিতীয় যুগ রচিত হইল,—রাম রামায়ণ

১. প্রাপ্ত পাঠ "বহু ভার"। ২ পীতাম্বর দত্ত বড়থোয়াল সম্পাদিত 'গোরখবাণী' পৃ ১২৩।

করিলেন। নর ও বানর লড়িয়া লড়িয়া মরিল। তিনিও জ্ঞান চিনিলেন না। দ্বাপর যুগ মধ্যে তৃতীয় যুগ রচিত হইল,—মহা আড়ম্বরে মহাভারত। কৌরব ও পাণ্ডব লড়িয়া লড়িয়া মরিল। নারদ (জ্ঞান) সংগ্রহ করিল। কলি যুগ মধ্যে চতুর্থ যুগ রচিত হইল। আচার-বিচার চুকিল। ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব, ঘরে ঘরে বিবাদ, ঘরে ঘরে কথক।

মনসা-চাঁদোর কাহিনীর গাঁথনে যে বৈদিক ঐতিহ্যের সরঞ্জাম বা মশলা আছে তাহা বিপ্রদাসের রচনা ধরিয়া উপরে যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য ॥[১]

৬

বিদ্যাপতির লেখা বলিয়া একটি মনসাপূজাবিধান পুথি পাওয়া গিয়াছে। পুথি উত্তরবঙ্গের, উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে লেখা।[২] পুথিটি বিদ্যাপতির রচনা বলিয়াই মনে হয়। প্রথম তরঙ্গের ভনিতা এই

ইতি সমস্ত প্রক্রিয়ালঙ্কৃত-ভূপতিবর বীর-শ্রীদর্পনারায়ণদেবেন সমরবিজয়িনাজ্ঞপ্ত-শ্রীরিদ্যাপতিকৃতৌ শ্রীব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণ্যাং···

এই পুষ্পিকার আগেই লেখক বলিতেছেন

অনুক্তং যদন্যদ্ দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণ্যামনুসন্ধেয়ং গ্রন্থগৌরবাশঙ্কয়াত্র পুনর্ন লিখিতমিতি।

নরসিংহ-দর্পনারায়ণের সভায় থাকিয়াই বিদ্যাপতি 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'ও লিখিয়াছিলেন।

'ব্যাড়ীভঙ্গিতরঙ্গিণী' নামটিতে "ব্যাড়ী" সংস্কৃত ব্যাল (অর্থ হিংস্র পশু) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। সর্প ব্যাল হইতে পারে কিন্তু মনসা কদাচ সাপ নয়। তবে "ব্যাড়" (ব্যাল) শব্দের আর এক অর্থ অনিষ্টকারী, দুষ্ট। এই অর্থে এখানে "ব্যাড়ী" শব্দ লইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে কামরূপের প্রাচীন কবি মনোহর ও দুর্গাবরের মনসামঙ্গলে[৩] "বাহুড়া" বা "বাহুরা" শব্দ দ্রষ্টব্য। "বাহুড়া" ("বাহুড়া ব্রাহ্মণী") মানে পর্যটক (ভবঘুরে)। শুধু মনসার নয় চণ্ডীরও এই নাম একদা চলিত ছিল। হয়ত তাহার স্মৃতি রহিয়াছে "(রঙ্কিণী) বহুলা"য়।

বিদ্যাপতি মনসাপূজার যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তা দুর্গোৎসবের মতই বিরাট ব্যাপার। বৃন্দাবনদাসের উল্লেখ হইতে মনে হয় পঞ্চদশ শতাব্দের উপান্তে

---

[১] মনসাবিজয়ের ভূমিকা।

[২] ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি (সংখ্যা K531, I); ১৫ পত্র ২৮ পৃষ্ঠা। শ্রীযুক্ত গণেশচরণ বসুর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (*New Indian Antiquary*—সপ্তমখণ্ড তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা)।

[৩] আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালা দেশে—পশ্চিমবঙ্গে—বিষহরির পূজা খুব ধূমধামেই হইত। পূজার প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি লৌকিক ঔষধ-মন্ত্রের সঙ্গে "বিষহরিমঙ্গলচণ্ডিকাগীতাদয়শ্চ" উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "তে চ প্রসিদ্ধা লোকবাদাঃ"। তাহার পর প্রমাণ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

লক্ষ্মীধরেণ নৌর্দত্তা যস্মিন্ মধুকরাভিধা।
তস্মান্ মনোরমাং নাবং কৃত্বা তত্র প্রপূজয়েৎ॥
মৃণ্ময়ীং প্রতিমাং কৃত্বা দেবতাদ্যৈঃ সমাবৃতাম্।
ঘট্টয়িত্বা বিচিত্রাং চ পূজয়েন্ গীতনর্তনৈঃ॥…
সন্নিধৌ ভূতনাথস্য বিপুলায়াশ্চ নর্তনে।
যে যে সমাগতা দ্রষ্টুং তাংস্তু তৎস্থান্ প্রপূজয়েৎ॥
ব্রহ্মাণং মাধবং রুদ্রং বাণীং লক্ষ্মীং চ পার্বতীম্।
কার্তিকেয়ং গণেশঞ্চ কালীয়ং পন্নগাষ্টকম্॥
জরৎকারুমাস্তীকঞ্চ মর্ত্যে চন্দ্রধরং তথা।
তৎপত্নীং বিপুলাঞ্চাপি শ্রীধরাখ্যং দ্বিজং তথা॥
যশোধরং চ দৈবজ্ঞং কর্ণধারঞ্চ দুর্লভম্।
অগ্রে গণেশং নৌকায়াঃ পত্তীনষ্টৌ মনোহরান্॥
ভাণ্ডারিণশ্চাস্ত্রধরান্ মধ্যেঽগ্রে মূলকে তথা।
লেখ্যাং [তু] রজকীঞ্চৈব সুগন্ধাংশ্চ তথাপরাম্॥
সুরেশ্বরীং তথা দুর্গাং দেবীং দিক্ষু সমন্ততঃ।
ইন্দ্রাদিলোকপালাংশ্চ সায়ুধান্ সস্ববাহনান্॥

'যেহেতু লক্ষ্মীধর (=লখিন্দর) মধুকর নামক নৌকা দিয়াছিলেন সেই হেতু মনোরম নৌকা (নির্মাণ) করিয়া সেই উপলক্ষ্যে পূজা করিতে হইবে। দেবতা-সমাবৃত (বিষহরির) মৃন্ময় মূর্তি গড়াইয়া বিচিত্রা ঘুরাইয়, নাচগানের দ্বারা পূজা করিবে। বেহুলার নৃত্যকালে মহাদেবের কাছে যাঁহারা যাঁহারা দেখিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সেই সেই স্থানে পূজা করিতে হইবে। (যেমন দেবলোকে—) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্বতী, কার্তিক, গণেশ, কালীয়, অষ্ট নাগ, জরৎকারু, আস্তীক, (মর্ত্যলোকে—) চন্দ্রধর (=চাঁদো), তাহার পত্নী, বেহুলা, ব্রাহ্মণ শ্রীধর, দৈবজ্ঞ যশোধর, কর্ণধার দুর্লভ, নৌকার আগে গণেশ, মধ্যে মনোহর; আট পাইক, ভাণ্ডারী, অস্ত্রধারী প্রহরিগণ নৌকার মাঝে আগে ও শেষে। আরও আঁকিতে হইবে,—রজকী (=নেতো), সুগন্ধা সুরেশ্বরী (=গঙ্গা) দেবী দুর্গা এবং চারিদিকে নিজ নিজ আয়ুধসমেত ইন্দ্রাদি লোকপাল।'

এইসব মূর্তি মাটির গড়াও হইত, "বিচিত্রা"য় আঁকাও হইত। মাটির পুতুলের উল্লেখ করিয়াছেন বৃন্দাবনদাস, "পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া নানাধন"। "বিচিত্রা" বিচিত্র ব্যজনী, অর্থাৎ ব্যজনীর আকারের বৃহৎ পট।[১] এমনি পটে আঁকা মনসার পূজা এখনো উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করিয়া আসামের গোয়ালপাড়া

---

[১] ইহা বিস্তৃত সর্পফণার প্রতীকও হইতে পারে। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন (উপরের উদ্ধৃতির পরে),

"দর্শনাচ্চ বিচিত্রায়া বাগ্‌দৃষ্টিহরণং ভবেৎ।
নাগো নাম্না চ গোহারী বিখ্যাতা সা মহীতলে॥"

জেলায়, প্রচলিত আছে। বিদ্যাপতির উদ্ধৃতিতে পাই "ঘট্টয়িত্বা বিচিত্রাং চ"। তাহা হইলে কি তাঁহার সময়ে মিথিলায় (এবং উত্তরবঙ্গে) মহরমের ঢাল ঘুরানোর মত সমারোহে বিচিত্রা ঘুরানো হইত?

বিদ্যাপতির উদ্ধৃতিতে মনসামঙ্গলের যে নামগুলি পাই তাহাতে মোটামুটি মিল আছে। মিল নাই পুরোহিতের নামে। অতিরিক্ত আছে দৈবজ্ঞ যশোধর। মিথিলায় ভদ্রলোকের নামের শেষাংশে "ধর" খুব প্রচলিত ছিল। তাই এখানে—লক্ষীধর, চন্দ্রধর, শ্রীধর, যশোধর। চাঁদোর স্ত্রীর নাম অনুল্লিখিত। অতিরিক্ত দেবী আছেন সুগন্ধা। বিজয় গুপ্তের নামাঙ্কিত মনসামঙ্গলে এ নাম আছে। অন্যত্র ইনি গন্ধেশ্বরী নাম পাইয়াছেন।

মিথিলায় ও বাঙ্গালায় মনসা 'সুরসা' নামেও পরিচিত ছিলেন। বিদ্যাপতি 'গৌড়মিথিলাকৃত্যাদিসংগ্রহ' হইতে এই শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন

প্রতিমায়াং [চ] চিত্রে বা মণ্ডনে বা ঘটেঽপি বা।
পূজয়েৎ সুরসাং দেবীং দুর্গাবদ্ ভুবি সাধকাঃ ॥

'প্রতিমায় অথবা চিত্রে অথবা বিচিত্র পটে অথবা ঘটে সুরসা দেবীকে সাধকেরা দুর্গার মতো পূজা করিবেন।'

পরের শ্লোক দুইটিতে আছে, ব্রত করিয়া ("ব্রতস্থ") যিনি ভক্তিভাবে সুরসাদেবীকে পূজা করিবেন তিনি ইহলোকে প্রার্থিত ভোগ লাভ করিয়া দেহান্তে উত্তম স্বর্গ পাইবেন, তাঁহার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র পর্যন্ত অরোগ থাকিবে ও লক্ষীলাভ করিবে এবং (তাহাদের) ডাকিনী প্রভৃতির ভয় অথবা সর্পভয় থাকিবে না ॥

৭

মনসা প্রাক্-পৌরাণিক দেবতা। ইনি পুরাণে স্থান পান নাই অথচ লোক-ব্যবহারে এবং লোকসাহিত্যে অর্বাচীন বৈদিককাল হইতে রূপ পাল্টাইয়া চলিয়া আসিয়াছেন। সংস্কৃত পুরাণ-সাহিত্যে ইনি একবার ঈষৎ ধরা দিয়াছিলেন। তাহা মহাভারতের আদিপর্বে জনমেজয়ের সর্পসত্রের পূর্বপ্রসঙ্গ-ক্রমে। কিন্তু মহাভারতে জরৎকারু-পত্নী আস্তীকমাতা মনসা নামে উল্লিখিত নহেন, তিনি "বিষহরী বিদ্যা"। কিন্তু মহাভারতে না থাকিলেও মনসা অর্বাচীন নয়। দ্রাবিড়গোষ্ঠীর অন্তর্গত কানাড়ী ভাষার "মন্চা অম্মা" বা "মনে মাঞ্চী" হইতে "মনসা মা" উৎপন্ন হয় নাই।[১] "মনসা" হইতেই "মন্চা" আসিয়াছে।

[১] শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী লিখিত 'বাঙ্গালায় মনসা পূজা' প্রবন্ধ (প্রবাসী আষাঢ় ১৩২৯) দ্রষ্টব্য।

নামটি সিদ্ধ করিবার জন্য পাণিনিকে একটি বিশেষ সূত্র করিতে হইয়াছিল, "মনসো নাম্নি"। পাণিনি হইতে চান্দ্র ব্যাকরণে গৃহীত এই সূত্রের উদাহরণ ধর্মদাস তাঁহার বৃত্তিতে দিয়াছেন, "মনসা দেবী"। শব্দটির ব্যুৎপত্তি "মনস্" শব্দ হইতে।[১] ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের বর্ণনার সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিপত্তন-কাহিনীর যোগাযোগ আছে। প্রাচীন মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই ঋগ্বেদীয় সৃষ্টিপত্তনকাহিনীর ভাবই অনুবৃত্ত। মূলে মনসার কাহিনীও ধর্ম-ঠাকুরের কাহিনীর সহিত জড়িত ছিল! আদ্যদেব ধর্মঠাকুরের "মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ" তাহা হইতেই আদ্যাদেবীর উদ্ভব। এই আদ্যাদেবীর নাম "কেতকা"। মনসামঙ্গলকাহিনীতেও মনসার নামান্তর "কেতকা"। নাথপন্থীরা তাঁহাদের পুরাতন ছড়ার এই কাহিনীর জের টানিয়া আসিয়াছেন।

মাতা হমারী মনসা বোলিয়ে
পিতা বোলিয়ে নিরঞ্জন নিরাকার।[২]

'আমাদের মাতাকে বলা হয় মনসা. নিরাকার নিরঞ্জনকে পিতা বলা হয়।'

মনসামঙ্গলের প্রধান উপাখ্যান লখাইবেহুলা-নেতার কাহিনীকে নাথপন্থী যোগীরা তাঁহাদের সাধনার রূপক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঞ্জাব-রাজপুতনার যোগী-অবধূতেরা এখনো গান করেন,

চন্দা-গোটা খুটা করিলৈ সূরিজ করিলৈ পাটী
অহনিশি ধোবী ধোবৈ ত্রিবেণী কা ঘাটি।[৩]
চন্দা করিলে খুটা সূরিজ করিলৈ পাট
নিত উঠ ধোবী ধোবৈ ত্রিবেণী কে ঘাট।[৪]

'চাঁদকে খুঁটা করা হইল, সূর্যকে করা হইল পাটা। ধোবা নিত্য উঠিয়া (কাপড়) ধোয় ত্রিবেণীর ঘাটে।'

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতম কবি বিপ্রদাস বিষপানমৃত শিবকে ঝাড়িবার প্রসঙ্গে মনসাকে দিয়া যে "মন্ত্রজাত" বলাইয়াছেন তাহাতে গুরু মীননাথের প্রতি শিষ্য গোরক্ষনাথের প্রবোধবচনের প্রতিধ্বনি শুনি।

মহাভারতে মনসার ও তাহার স্বামীর নাম একই, জরৎকারু।[৫] মনসার এই নামের ইঙ্গিত প্রাচীন মনসামঙ্গল-কাহিনীর উপক্রমে রহিয়াছে। কালিদহে

---

১ মনসার বিবিধ নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা বিপ্রদাসের কাব্যের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

২ ডাক্তার পীতাম্বর দত্ত বড়থোয়াল সম্পাদিত 'গোরখবাণী' (হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন, প্রয়াগ) পৃ ৬৭ দ্রষ্টব্য।

৩ ঐ পৃ ১৫১। ৪ ঐ পৃ ১৫৫। ৫ মহাভারতে এই নামের ব্যুৎপত্তি দিবার চেষ্টা আছে। আদিপর্বের অন্তর্গত আস্তীকপর্ব অধ্যায় ৪০ শ্লোক ৩৪ দ্রষ্টব্য।

নলিনীদলগতচঞ্চল শিববিন্দু পাতালে পৌঁছিলে বাসুকির মাতা বৃদ্ধা ("জরৎ") নির্মাণি ("কারু") তাহা হইতে মনসার সর্বাঙ্গসুন্দর মূর্তি গড়িয়া "জীবন্যাস করিয়া মনসা থুইল নাম"।

মনসামঙ্গলের প্রধান যে অপৌরাণিক অংশ তাহা যে শেষ অবধি চণ্ডীমঙ্গলের মতো সভাসাহিত্যের পূরা মর্যাদা পায় নাই তাহার একাধিক কারণ আছে। মনসার ব্রতকথা-পাঞ্চালী সকলেরই সমান উপভোগ্য ছিল। সে আসরে ধন-ঐশ্বর্যের আড়ম্বর কোন গণ্ডী রচনা করিতে পারে নাই। কোন ভূস্বামীও কোন কবিকে দিয়া মনসামঙ্গল লেখান নাই। তদুপরি, ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রভাব জনসাধারণের সাহিত্যস্পৃহা ও ধর্মরুচিকে বদলাইয়া দিতেছিল। তাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গে "মনসার ভাসান" গান নিম্ন হইতে নিম্নতর বিনোদন-চর্চায় নামিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু তা বলিয়া মনসামঙ্গল কাব্যকে পূরাপূরি "volkpoesie" বা লোকসাহিত্য বলিতে পারি না, কেননা মনসামঙ্গল-কবিরা সকলেই অশিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহাদের অনেকেরই মোটামুটি সংস্কৃতজ্ঞান ছিল। সমসাময়িক সভাসাহিত্যও তাঁহাদের অজানা ছিল না॥

৮

নানা দেবভাবনা ও রূপককল্পনা নানাদিগ্‌দেশাগত কাহিনীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া মনসামঙ্গলে মনসাদেবীরূপে বিচিত্র মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহাতে বহু উপাদান আছে,—(১) বৈদিক নদী-পুষ্টি-দেবভাবনাজাত ইলা, সরস্বতী ও শ্রী, (২) বৈদিক সোম-ঐতিহ্যগত গন্ধর্বসঙ্গিনী বাক্, যিনি পর্বতবাসিনী ("গৌরী", "হৈমবতী") এবং সলিলক্রীড়াপরায়ণা ("সলিলানি তক্ষতী"), যিনি রুদ্র আদিত্য বসু প্রভৃতি বিশ্বদেবতার শক্তি, (৩) বৈদিক রুদ্রের "মনা", (৪) বৈদিক "সর্পরাজ্ঞী" বা বসুন্ধরা, (৫) বৈদিক নিঋর্তি ও অরায়ী অর্থাৎ অপঘাতিনী ও অলক্ষ্মী, (৬) পরবৈদিক কমলাসনা দেবী, (৭) পরবৈদিক নাগ- (দুই অর্থে—হাতি ও সাপ) লাঞ্ছন দেবী, (৮) শেষবৈদিক কুমারী ও ময়ূরী এবং পরবৈদিক বিষনাশিনী মায়ূরী বিদ্যাধরী, (৯) লৌকিক বাস্তু-দেবতা —সিজ গাছে যাঁহার অধিষ্ঠান, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া পরে আবার চারটি দেবীতে পরিণত। প্রথম চণ্ডী। ইনি গোড়ায় সিংহ-বাহিনীরূপে স্বতন্ত্র দেবতা ছিলেন, তাহার পরে রুদ্রচণ্ডী হইলেন। মনসার সঙ্গে ইহার একটি স্পষ্ট যোগসূত্র হইতেছে চণ্ডীমঙ্গলের কমলে-কামিনী।

দ্বিতীয় কমলা-লক্ষ্মী। ইহার সহিত মনসার যোগ নামে ("পদ্মা", "কমলা"), নাগযোগে (এখানে হাতি, সাপ নয়) এবং কাজে—পুষ্টির দেবতা, শস্যের দেবতা। তৃতীয় সরস্বতী। ইনি বৈদিক বাক্ ও সরস্বতী, পুষ্টি ও কান্তির দেবতা এবং বিষহারিণী বিদ্যাধরী, অধুনা বিদ্যার ও সঙ্গীতের দেবতা। চতুর্থ মনসা।

উপরে যে বিশ্লেষণ করা হইল স্থাপত্য শিল্পেও তাহার যথেষ্ট এবং দৃঢ় সমর্থন রহিয়াছে॥

৯

বিষহরী দেবীর প্রথম ইঙ্গিত পাই ঋগ্‌বেদের একটি শ্লোকে।[১]

ত্রী সপ্ত ময়ূর্যঃ সপ্ত স্বসারো অগ্রুবঃ।
তাস্তে বিষং বিজভ্রির উদকং কুম্ভিনীরিব॥

'তিন সাত ময়ূরী, সাত ভগিনী কুমারী, তাহারা তোমার বিষ তুলিয়া লইয়াছে, যেমন কলসী-কাঁখে মেয়েরা জল (লইয়া যায়)।'

ইহার সহিত তুলনা করা চলে বিষ্ণু পালের ও রসিক মিশ্রের মনসামঙ্গলে উদ্ধৃত বিষঝাড়া মন্ত্রের এই ছত্র—"ডাহুকার বহুড়ী তারা ঘটে পানি ভরে"।

বৌদ্ধ মহাযান-মতে মহামায়ূরী দেবী বিষনাশনের আরোগ্যের এবং বিদ্যার দেবতা। এলোরায় ছয় নম্বর গুহার দ্বিতলে বারাণ্ডার একধারে মহামায়ূরীর যে মূর্তি আছে তাহাতে দেবী, বিদ্যা (অর্থাৎ পুথি ও পাঠক) এবং পেখমধরা ময়ুর—এক সঙ্গে পাই। মহাযান-মতে আরও একটি বিষহরী দেবী আছেন। তিনি জাঙ্গুলী তারা। এই নাম পরে মনসাতে বর্তিয়াছে—জাগুলী। অথর্ববেদের কয়েকটি মন্ত্রে বিষনাশন ও রোগহর "জঙ্গিড়" বস্তুটির উল্লেখ আছে। ইহা কোনও ঔষধি ("পর্ণমণি") হইতে পারে। "জঙ্গিড়" ও "জাঙ্গুলী" সম্পৃক্ত শব্দ হওয়া সম্ভব। মহাযান-তন্ত্রের উপাসনাপদ্ধতিতে ("সাধন"এ) আর্যজাঙ্গুলী মহাবিদ্যাকে বর্ণনা করা হইয়াছে, হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বে যে গন্ধমাদন পর্বত আছে তাহার শিখরে শতপুণ্যলক্ষণা কুমারীরূপে।

এণেয়চর্মবসনা সর্পমণ্ডিতমেখলা।
আশীবিষসুত্তলিকা দৃষ্টিবিষাবতংসিকা॥
খাদন্তী বিষপুষ্পানি পিবন্তী মালুতালতাম্।[২]

১ ১. ১৯১. ১৪। এটি বিষঘ্ন মন্ত্র।

২ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সাধনমালা' (সাধন ১২০) দ্রষ্টব্য।

'পরিধান মৃগচর্ম, সাপজড়ানো মেখলা। আশীবিষ[১] হার, দৃষ্টিবিষ[২] কর্ণভূষণ। খাইতেছেন বিষপুষ্প, পান করিতেছেন মালুতালতার রস।'

এই প্রসঙ্গে যে দীর্ঘ বিষনাশন মন্ত্রটি আছে তাহার গোড়ায় পাই

ইল্লা বিল্লা চক্কা বক্কা…

প্রথম শব্দ দুইটির সঙ্গে তুলনা করা যায় অথর্ববেদের একটি বিষনাশন মন্ত্রের[৩] প্রথম ছত্র,

আলিগী চ বিলিগী চ পিতা চ মাতা চ।

মহাযান-তন্ত্রসাধনায় জাঙ্গুলী দেবীর অপরিসীম প্রতিপত্তি হইয়াছিল। এমন কি বজ্রেশ্বরী "তারামহত্তরায়ী" অর্থাৎ তারা-ঠাকুরানীও আর্যজাঙ্গুলীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন,—"শুক্লবর্ণা চতুর্ভুজা জটামুকুটিনী শুক্লোত্তরীয়া সিতরত্নালঙ্কারবতী শুক্লসর্পভূষিতা।" মহাযান-তন্ত্রে দেবী একজটা তারার যে চিত্র পাই তাহা বহুকাল পরে প্রতিফলিত হইয়াছে মনসামঙ্গল-কাব্যে মনসার মূর্তিতে। অদ্বয়বজ্রের শিষ্য ললিতগুপ্ত তারাসাধনে লিখিয়াছেন[৪]

আত্মানং ভগবতীরূপং বিভাবয়েৎ শুক্লাং দ্বিভুজামেকাননাং দক্ষিণে নিরংশুকাক্ষমালাধরাং বামে নীলোৎপলকলিকাং বিভ্রতীং অতিপিঙ্গৈকজটাং ব্যাপ্তব্রহ্মাণ্ডখণ্ডাং ক্রূরনাগাভরণভূষিতাং শিরোবেষ্টনং কর্কোটকো নীলঃ কণ্ঠাভরণং তক্ষকো রক্তঃ নন্দোপনন্দৌ কর্ণকুণ্ডলৌ পীতৌ ব্রহ্মসূত্রং বাসুকিঃ শুক্লঃ দক্ষিণভুজে বলয়ং কুলিকঃ পারাবতবর্ণঃ ইতরভুজে বলয়ং শঙ্খপালো ধবলঃ নূপুরৌ পদ্মমহাপদ্মৌ রক্তৌ।

'নিজেকে ভগবতীরূপে ভাবিবে—শুক্লা, দ্বিভুজা, একাননা, দক্ষিণ হস্তে নিরংশুক অক্ষমালা বাম হস্তে নীলোৎপল মুকুল ধরিয়া, অতি পিঙ্গল একমাত্র জটা, ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডব্যাপিনী, হিংস্র-সর্পভূষণভূষিতা—মাথায় বেড়িয়া নীলবর্ণ কর্কোটক, কণ্ঠে আভরণ রক্তবর্ণ তক্ষক, কর্ণে দুই কুণ্ডল পীতবর্ণ নন্দ-উপনন্দ, উপবীত শুক্লবর্ণ বাসুকি, দক্ষিণ বাহুতে বলয় পারাবতবর্ণ কুলিক, অপর বাহুতে বলয় ধবলবর্ণ শঙ্খপাল, দুই নূপুর রক্তবর্ণ পদ্ম-মহাপদ্ম।'

জাঙ্গুলী বিষবিদ্যা বলিয়া বিষবৈদ্যের নাম হইয়াছিল "জাঙ্গুলিক" বা "জাঙ্গলিক"।[৫] জাঙ্গুলী পরে মনসার সঙ্গে মিলিয়া যায়, তাই মনসার নামান্তর হয় জাগুলি। মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম কবি বিপ্রদাস "জাগুলি" নামের লোক-ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন,—"জাগিয়া জাগুলি নাম সিজবৃক্ষে স্থিতি"।

---

[১] অর্থাৎ যাহার কামড়ে বিষ। [২] অর্থাৎ যাহার দৃষ্টিতে বিষ।

[৩] ৫. ১৩. ৭। মন্ত্রের দশম ও একাদশ শ্লোকে যথাক্রমে "তাবুবম্" ও "তস্তুবম্" পদ দুইটি আছে। প্রথমটিকে পণ্ডিতেরা পলিনেশীয় ভাষার "তপু" (যাহা হইতে ইংরেজী taboo আসিয়াছে) বলিয়া মনে করেন। দ্বিতীয়টি তাহিতী ভাষার "ততউ" (যাহা হইতে ইংরেজী tattoo) হইতে পারে।

[৪] সাধনমালা ১২৮। জাঙ্গুলিকের বিদ্যা পরে জাঙ্গুলী-বিদ্যাধরী হইয়াছে, এমনও সম্ভব।

[৫] প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী দ্রষ্টব্য।

কোন কোন মনসামঙ্গলে দেখি, মনসাকে গালি দেওয়া হইতেছে "চেঙ্গমুড়ি কানি" বলিয়া। চেঙ্গমুড়ি শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরা হয় "চেঙ মাছের মত মুড়া যাহার।" এই ব্যাখ্যায় কষ্টকল্পনা আছে, সঙ্গতিরও অভাব আছে। মনসার মাথা বা মুখ চেঙ মাছের মতো নয়, সাপের মতোও নয়। মনসা সর্পদেবতা বটে তবে সর্পরূপী দেবতা নয়, অন্যান্য দেবতার মতোই মানবাকৃতি। সুতরাং এ ব্যাখ্যা অচল। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন বলিয়াছেন যে আয়ুর্বেদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে সিজ গাছের এক নাম "চেংমুড়ু," আধুনিক তেলেগু ভাষায় "চেমুড়ু" বা "জেমুড়ু"।[১] "চেঙ্গমুড়ি" দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসা সম্ভব নয়। দক্ষিণের জীবিত সর্প-পূজার সহিত উত্তরের প্রতীক সর্প-পূজার কোন যোগ নাই। সিজ-পূজাও সেখানে অজ্ঞাত। এ পূজা আসিয়াছে উত্তর—হিমালয় অঞ্চল—হইতে।

"চেঙ্গমুড়ি কানি" শব্দের আসল অর্থ শববাহনে ব্যবহৃত বাঁশে ("চেঙ্গ", "চোঙ্গ") জড়ানো কাপড়। আধুনিক "চেঙ্গদোলা" শব্দের মধ্যেও চেঙ্গ শব্দের এই অর্থ লভ্য।

সিজ গাছ এখন অনেক স্থানে মনসা-সিজ বা মনসা-গাছ বলিয়া পরিচিত। মনসাপূজায় সিজ গাছ বা সিজ গাছের ডাল আবশ্যক বলিয়াই এই নাম চলিত হইয়াছে। প্রাচীন মনসাপূজায় অষ্টনাগের মূর্তি আঁকিতে অথবা মনসার মূর্তি গড়িতে হয়। ইহাই কেতকা-মনসার পূজা। অর্বাচীন মনসাপূজায় সিজের ডালই যথেষ্ট ॥

১০

বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী বাঙ্গালা দেশের বাহিরেও অল্পস্বল্প ছড়াইয়াছিল। বিহারের গ্রাম-অঞ্চলে বেহুলার ছড়া বোধ করি এখনো গাওয়া হয়। পশ্চিম বিহারের ভোজপুরী ভাষায় লেখা 'বিহুলা-কথা' অনেক দিন আগে ছাপা হইয়াছে।[২] গোড়ার দিকে অল্পস্বল্প নূতনত্ব থাকিলেও এই কাহিনী মোটামুটি বাঙ্গালা দেশের কাহিনীরই মতো। এই অংশের ভাষাতেও বাঙ্গালার ছাপ আছে।

---

[১] প্রবাসী আষাঢ় ১৩২৯।

[২] মুন্শী গমগুলামলাল সংশোধিত ও প্রহ্লাদ দাস প্রকাশিত সচিত্র 'বিহুলাকথা অর্থাৎ বিষহরী-চরিত্র' (পাটনা সত্যসুধাকর প্রেস)।

ভোজপুরী কাহিনীতে মনসা একজন নন। ইহারা পাঁচ ভগিনী—পৌরাণিক "পঞ্চাপ্সরসঃ"। তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ "মৈনা" (অর্থাৎ মদনা) বিষহরিই প্রধান। আর চারি বহিন—"দোতোলা" ("দোতোলা ভবানী" বা "দোতোলা কুমারী")[১], "(দেবী) বিষহরী", "জয়া (বিষহরি)" ও "পদুমাকুমারী"—ইহার সহচরী। কোকোলাপুর নগরে ছিল মহাদেবের মঠ, সেখানে মহাদেব-পার্বতী বাস করিতেন। সেই নগরে সোনাদহ পুকুরের ঘাটে মহাদেব স্নান করিতেন। একদিন স্নান করিবার সময় মহাদেবের জটার পাঁচগাছি চুল খসিয়া গিয়া পাঁচটি পদ্মফুলে লাগে। তাহাতে "পাঁচো বহিন বিষহরি" জন্মগ্রহণ করে। কমলদহে বারো বছর ঝুমরী খেলিয়া তাহারা পাতালে বাসুকি নাগের কাছে যায় নিজেদের পরিচয় জানিতে। বাসুকি বলে যে তাহাদের "ধরম কে বাবা" হইতেছেন মহাদেব, "ধরম কে মাই" পার্বতী। শুনিয়া তাহারা সোনাদহে আসিয়া পদ্মফুলের ভিতর লুকাইয়া থাকে। একদিন মহাদেব সেই ফুল তুলিয়া ঘরে আনিয়া এক কোণে রাখিয়া দিলেন এবং ভাঙ-ধুতুরা সেবন করিয়া ধ্যানে বসিলেন। রন্ধন শেষ হইলে সেই ফুলের উপর গৌরীর নজর পড়িল। ফুল হাতে করিতে গেলে বিষহরিরা মা মা বলিয়া কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সতীন মনে করিয়া গৌরী পার্বতী দূর দূর করিয়া উঠিলে মৈনা বিষহরি বলিল

> ধরমকে মাঈ মোরী গৌরা পারবতী হে
> তোহে কৈসে কহেঁ মাতা সৌতনী মোরী হে।

পার্বতী তাড়া করিয়া তাহাদের ঘরের বাহির করিয়া দিয়া ঠেঙা ছুড়িলে, তাহা লাগিল মৈনা বিষহরির ভুরুতে। মৈনা বিষহরি ক্রুদ্ধ হইয়া সুতোয়া নাগের দ্বারা পার্বতীকে দংশাইল। তখন "আপন সে মঁঠ গৌরা তেজলে পরাণ"। মহাদেবের ধ্যান টুটিয়া গেল, তিনি গৌরীর পাশে ছুটিয়া আসিলেন। ব্যাপার বুঝিয়া

> হুঙ্কারে লাগল মহাদেব দেবী বিষহরি হে।
> তৈয়ো নহী আবে মাতা মৈনা বিষহরি হে।

তখন তিনি দৌড়াইলেন "মন্ত্রী" (অর্থাৎ মন্ত্রবিদ্) কেশবের কাছে। কেশব ঝারি ভরিয়া মন্ত্রপূত জল লইয়া ঝাড়িতে আসিল। তখন

> এক টোনা কৈলে মাতা ঝারী-জল সুখল হে
> হারল জবাব দৈবা কেসো নাম মন্ত্রী রে।

---

[১] "দোতোলা" হইতেছে "তোতলা"র বিকৃত রূপ। উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলে মনসার নামান্তর "তোতলা" বা "তোতল"। মহাযান-তন্ত্রের তারার মন্ত্রে "তুত্তারে" (= হে তুত্তারা) ইহাই।

কেশব ওঝা হার মানিলে পাঁচ-বহিন বিষহরি আসিয়া দেখা দিল এবং মহাদেবের ব্যগ্রতায় পার্বতীকে বাঁচাইয়া দিল। খুশি হইয়া মহাদেব বর দিতে চাহিলে মৈনা বিষহরি এই "মহাদান" চাহিল

মর্ত্ত ভুবন হো বাবা পূজবা দিলায়ব হে
মর্ত্ত ভুবন হো বাবা চান্দো সদাগর হে
তেতীস-কোট দেবতা হো চাঁদবাকে আবাস হে।

মহাদেব বলিলেন, তথাস্তু

তোহরো জে পূজা বিষহরি চাঁদবা আবাস হে
জাহো তোহে আবে বিষহরি চাঁদবা আবাস হে।

কিন্তু চাঁদোর বাড়ি যাইবার অনুমতি পাইয়াই মন খারাপ হইয়া গেল।

চাঁদবাকে নাম বিষহরি রোদনা করল হে
বড় গরবী বনিয়াঁ চান্দো সোদাগর রে।

মানুষের খাতির বড় খাতির। বিষহরিকে চৌপাঈ নগরে চাঁদোর কাছে আসিতেই হইল। চাঁদো সাফ জবাব দিল, "হমে নহী পূজব দৈবা কানী বেংগাখোঁকী।" বিষহরিও নাছোড়বান্দা। বলিল

বিষহরি পূজবে বনিয়াঁ ভাল ফল পাইবে
বিষহরি না পুজবে বনিয়াঁ বড় দুখ দেবৌ।

শুনিয়া বাক্যব্যয় না করিয়া চাঁদো তাহাদের তাড়াইয়া দিল। বাহিরে আসিয়া পাঁচ ভগিনী কাঁদিতে কাঁদিতে শাসাইল, "তোরৈ মোরৈ আবে রে চান্দো লাগত বিবাদ"।

বিষহরি এখনো সন্ধির আশা ছাড়ে নাই। চান্দোর স্ত্রী সোনিকা ছয় ডিঙ্গা বরণ করিতে ঘাটে গিয়াছে, বিষহরি সেখানে গিয়া তাহাকে ধরিয়া বসিল। সোনিকা উত্তর দিবার পূর্বেই চান্দো আসিয়া তাহাদের ভাগাইয়া দিল। বেগতিক বুঝিয়া পাঁচ ভগিনী গেল ইন্দ্রের কাছে তাহার নাটুয়াকে পূজাপ্রচারের জন্য মর্ত্যভূমিতে অবতার করাইতে। ইন্দ্র রাজি হইল। তাহার পর বিষহরি স্বয়ং গিয়া এবং আর একবার হনুমানকে পাঠাইয়া চান্দোকে ভজাইতে বৃথা চেষ্টা করিল। বিষহরির কোপে পড়িয়া চান্দো বাণিজ্য হইতে প্রাণমাত্র লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সোনিকা বিষহরির পূজা করিতেছে। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া "লাতী মারি চান্দো কলস ভাঁগল"। বলিল

কৌন খুশি আবে সাহুনী পুজবা করহ
ছবো পুত্র তোর সাহুনী ত্রিবেণী ডুবলৌ
বারহো তো ডেঙ্গী সাহুনী ত্রিবেণী ডুবলৌ
হমরা ডুবাএ সাহুনী উপর করী দেল।

কিছুদিন পরে চৌপাঙ্গি নগরে সোনিকা সাহুনীর গর্ভে ইন্দ্রের নাটুয়া বালা লখীন্দর রূপে জন্ম লইল। ওদিকে নাটুয়া-পত্নীও উজানী নগরে মানিকো (বা মানিকা) সাহুনীর কন্যারূপে ভূমিষ্ঠ হইল। তাহার পর কাহিনী মোটামুটি বাঙ্গালা দেশের প্রচলিত উপাখ্যানেরই অনুসরণ করিয়াছে।

উপরে যে দুইচারি ছত্র করিয়া উদ্ধৃতি দিয়াছি তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার ছায়া থাকিলেও তাহা সর্বত্র খুব স্পষ্ট নয়। ভোজপুরী ও বাঙ্গালা একই প্রাকৃত মূল হইতে উৎপন্ন, সুতরাং পদে এবং বাগ্‌বিন্যাসে খানিকটা মিল থাকিবেই। ভোজপুরীতেও পয়ার ছন্দের উন্মেষ হইয়াছে, যদিচ তাহা বাঙ্গালা পয়ারের মতো সুগঠিত ও তরল হয় নাই। কিন্তু বিহুলা-কথায় বেহুলার কাহিনীতে এমন কিছু কিছু অংশ আছে যাহা অপেক্ষিত এবং অপরিহার্য বিকৃতি সত্বেও বাঙ্গালাই। এই অংশগুলি "বঙ্গলা রাগ", "বঙ্গলা ঢার" অথবা "ভটিয়া (অর্থাৎ ভাটিয়ালি) ঢার" বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন, "বিবাহখণ্ড বঙ্গলা রাগ।"

জালনী[১] পাঠাওলে চান্দো ব্রাহ্মণের বাড়ী
তোমার বেদৈ[২] বিহাইবো[৩] বালা লখীন্দর।
জালনী পাঠাওলে চান্দো মলীয়ার[৪] বাড়ী
তোমার মউরে[৫] বিহাইবো বালা লখীন্দর।
জালনী পাঠাওলে চান্দো সিন্দোরিয়ার[৬] বাড়ী
তোমার সিন্দূরে বিহাইবো বালা লখীন্দর।

অথবা "বিষহরী কা রোদনা"

কমল-দহএ মাতা ঝুমরী খেলএ   কান্দে দেবী মনসা হায় রে
চন্দবা জিতল হমে জে হারলা   কান্দে দেবী মনসা হায় রে।…
মানুষ জীতল হমে জে হারলা   কান্দে দেবী মনসা হায় রে।
দেবীর কান্দন শুনি অষ্ট নাগ আইলা করিলো প্রণাম
কান্দে দেবী মনসা হায় রে
কোঙ্গি না পান লইলো   কান্দে দেবী মনসা হায় রে।

বাঙ্গালার প্রাচীনতম মনসামঙ্গল-কাব্য বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে ভোজপুরী কাহিনীর বেশ মিল আছে। বাঙ্গালা দেশ হইতে মনসাকাহিনীর পশ্চিমে অভিযান ষোড়শ শতকের পরে নয় বলিয়াই মনে হয়॥

---

[১] = জাননী অর্থাৎ জানান, খবর। [২] = বেদে অর্থাৎ মন্ত্রপাঠে। [৩] অর্থাৎ বিবাহ দিব।
[৪] = মালিয়ার অর্থাৎ মালীর। [৫] = মুকুটে। [৬] অর্থাৎ সিন্দুর-বিক্রেতার।

১১

কাহিনীর দিক দিয়া বিচার করিলে মনসামঙ্গল-কাব্যগুলিকে তিনটি প্রধান থাকে ভাগ করা যায়—পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গীয়-অসমীয় এবং পূর্ববঙ্গীয়। মনে রাখিতে হইবে যে, এই আঞ্চলিক ভাগগুলির মধ্যেও কোন কোন বিষয়ে একটির সঙ্গে আর একটির মিল আছে। মনসামঙ্গল-গায়কেরা স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেন। নারায়ণ দেবের আত্মপরিচয় হইতে অনুমান করিতে পারি যে, তাঁহার পূর্বপুরুষ যখন রাঢ় হইতে গিয়া ব্রহ্মপুত্রের ধারে বসবাস করিয়াছিলেন তখনই তাঁহাদের দ্বারা মনসার পাঞ্চালী পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ববঙ্গে নীত হয় এবং সেখানে কতকটা নূতনভাবে পুনর্গঠিত হয়। উত্তরবঙ্গে আগে যে মনসা-কাহিনী প্রচলিত ছিল তাহার সঙ্গে মিথিলার কাহিনীর বেশি মিল ছিল মনে করিতে পারি। আসামের পশ্চিম অঞ্চলে, গোয়ালপাড়া ও কামরূপে, যাহা পাই তাহা হয় নারায়ণ দেবের কাব্যের রূপান্তর, নয় তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

উত্তরবঙ্গ-আসামের মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম কবি চারজন—নারায়ণ দেব, মনোহর, দুর্গাবর ও বিভূতি। ইহাদের কালানুক্রম জানা নাই, এবং এক জনেরও কাল ঠিকমত অনুমান করা যায় না। হয়ত চারজনই ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দের লোক। এখানকার অর্বাচীন কবি দুইজন—জগৎজীবন ঘোষাল ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্র। ইহারা যথাক্রমে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দে বর্তমান ছিলেন।

উত্তরবঙ্গ-আসামের এই কবিদের কাব্যের প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব—সংক্ষেপে সৃষ্টিপত্তন সারিয়া শিব-গঙ্গা-দুর্গার প্রণয়কাহিনী দিয়া বস্তুর আরম্ভ। (নারায়ণ দেবের রচনার এই অংশের স্বতন্ত্র পুথি 'কালিকাপুরাণ' নামে পরিচিত। কোন কোন পূর্ববঙ্গের কবিও—যেমন হরি দত্ত—নারায়ণ দেবের অনুসরণ করিয়াছেন।) দ্বিতীয় বিশেষত্ব হইতেছে লখিন্দরের মাতুলানীহরণ ব্যাপার। উত্তরবঙ্গে (আর পূর্ববঙ্গে) মনসামঙ্গল বিশেষভাবে 'পদ্মাপুরাণ' নামে পরিচিত।

নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল বা 'পদ্মাপুরাণ' অত্যন্ত খণ্ডিতভাবে রক্ষিত হইয়াছে। খণ্ডিত এই অর্থে যে, কোন পুথিতে[১] অথবা (আধুনিক অসমীয়

---

[১] ক ১৭৭১ (১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে চাটিগাঁ অঞ্চলে লেখা পুথি। ইহাতে অপর ভনিতা পাই—গঙ্গাদাস সেন, গৌরীকান্ত সেন, পণ্ডিত জগন্নাথ, বৈদ্য জগন্নাথ, যদুনাথ দেব, রামদাস, রামকান্ত সেন, বিদ্যাধর, বিদ্যাবল্লভ, ষষ্ঠীবর সেন ইত্যাদি।) গ ৯০৬ (ইহাও চাটিগাঁ অঞ্চলের পুথি, রচনার পূর্বাংশ। ইহাতে বলরাম দাস ও জয়দেব ভনিতাও আছে।)

অন্য পুথির সম্পর্কে দ্রষ্টব্য সা-প-প ৩ (পৃ ৭২-৭৩), ৬ (পৃ ৯২), ১৩ (পৃ ২৫); র-সা-প-প ৬ (পৃ ৮০-৯৭), ৭ (পৃ ৬১-৭৬), ৮ (পৃ ১১৩-১৪২); বা-প্রা-পু-বি ১-১ (পৃ ১২২)।

সংস্করণ[১] ছাড়া) কোন ছাপা বইয়ে[২] আগাগোড়া নারায়ণ দেবের ভনিতা পাওয়া যায় না।

কোন কোন পুথিতে ও ছাপা বইয়ে নারায়ণ দেবের যে আত্মপরিচয় পাওয়া যায় তাহা মিলাইয়া লইলে এই পাঠ হয়

নারায়ণ দেবে কহে জন্ম-মুগধ
মিশ্র পণ্ডিত নহি ভট্ট বিশারদ।
শূদ্রকুলে জন্ম মোর সৎকায়স্থ ঘর
মৌদ্‌গল্য গোত্র মোর গাঞি গুণাকর।
নরহরি-তনয় হয় নরসিংহ পিতা
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা।
বৃদ্ধ-পিতামহ মোর দেব উদ্ধারণ
রাঢ়দেশ ছাড়িয়া যে আসিলা আপন।
পুর্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধমতি
রাঢ় ছাড়িয়া বোরগ্রামেতে বসতি
(রাঢ় হৈতে আইলেন লৌহিত্যের পাশ)

"জন্ম-মুগধ" (অর্থাৎ জন্মমূর্খ) স্থানে বিকৃত পাঠে পাওয়া যায় "জন্ম মগধ"। ইহা ধরিয়া কেহ কেহ নারায়ণ দেবের জন্ম মগধে হইয়াছিল বলিয়া স্থির করিয়াছেন! বোরগ্রামে, এখনকার ময়মনসিংহ জেলায় নসিরুজিয়াল পরগনার মধ্যে (থানা তাড়াইল, মহকুমা কিশোরগঞ্জ)। গ্রামটি ব্রহ্মপুত্র-তীরে অবস্থিত ছিল। একটি পুথিতে একবার (?) এই ভনিতা মিলিয়াছে

স্থকবিবল্লভ রাম দেব নারায়ণ

ইহা ঠিক হইলে বুঝিব কবির পূরা নাম রামনারায়ণ দেব। তবে "রাম" স্থানে পাঠ সর্বত্র "হয়"। "স্থকবিবল্লভ হএ"—প্রায় সব পুথিতেই ভনিতা-ছত্রে প্রচুর পাওয়া যায়। কবি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তাহা বোঝা যায় নিম্নে উদ্ধৃত রচনার উপলক্ষ্য-নির্দেশ হইতে।

বারহ বৎসর কালে দেখিনু স্বপন
মহাজন সঙ্গে মোর হইল দরশন।

---

[১] 'পদ্ম-পুরাণ—ভাটিয়ালি খণ্ড' নামে দত্ত বরুয়া ব্রাদার্স এণ্ড কোং কর্তৃক নলবাড়ী হইতে প্রকাশিত (১৯৪৮)। আসামে প্রচলিত মনসামঙ্গল "স্থকনান্নী" নামে প্রসিদ্ধ। ইহা "স্থকবি-নারায়ণি"র বিকৃতি। নারায়ণ দেবের ভনিতায় এবং ভনিতার স্থানে প্রায়ই "স্থকবি" বা "স্থকবিবল্লভ" বিশেষণ পাওয়া যায়।

[২] ভৈরবচন্দ্র শর্মা সঙ্কলিত (শ্রীহট্ট ১২৮৪), বেণীমাধব দে প্রকাশিত (কলিকাতা) ; ময়মনসিংহ চারুপ্রেস হইতে প্রকাশিত (১৩১৪) ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৪২)।

শিশুরূপ হৈয়া আইল হাতে করি বাঁশি
আলিঙ্গন দিল মোরে আধ-অঙ্গে হাসি।
তার শেষে পদ্মাবতী দেখিনু স্বপন
কবিত্বের আশা মোর হৈল সে কারণ।

নারায়ণ দেবের জীবৎকাল নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কবির কাব্য সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করা হইলে হয়ত তখন কালনির্ণয়ের কিছু উপাদান মিলিবে। ইতিমধ্যে ষোড়শ শতাব্দের শেষ হইতে সপ্তদশ শতাব্দের গোড়া পর্য্যন্ত ধরিলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম হয়॥

১২

আসামে কামরূপ অঞ্চলে এখন নারায়ণ দেবের রচনার স্থানীয় "সংস্করণ"ই প্রচলিত। তবে সম্প্রতি দুইটি প্রাচীনতর কবির রচনার খণ্ডাংশ প্রকাশিত হইয়াছে।[১] এই দুই কবির রচনাকে কামতা-কামরূপের বিশিষ্ট মনসামঙ্গল বলিয়া ধরিতে পারি। কবি দুইজনের নাম মনকর ও দুর্গাবর। মনকরের রচনার প্রথম অংশ পাওয়া গিয়াছে, মনসার জন্ম ও শিবের সঙ্গে পরিচয় পর্যন্ত। দুর্গাবরের রচনার বণিকখণ্ডের খানিকটা মিলিয়াছে। মনকর ও দুর্গাবর একই কবি বলিয়া ধরিতে ইচ্ছা হয়। (নাম মনোহর কর, উপাধি দুর্গাবর?) তাহা না হইলে দুর্গাবর সম্ভবত মনকরের অনুকরণকারী। দুই রচনায় বেশ মিল আছে। দুই রচনাতেই মনসাকে বলা হইয়াছে—"পোঞা" (পদ্মা শব্দের তদ্ভব রূপ যাহা বিষ্ণু পালের রচনা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় নাই), "বাহুড়া (বাহুরা) ব্রাহ্মণী", "তোতোলা", "দিগম্বরী", "মানসাই" ইত্যাদি। মনকর অংশে "পোঞার পাঞ্চালি", দুর্গাবর অংশে, "পোঞা বেহুলীমঙ্গল"। উভত্রই কামতার রাজা জল্পেশ্বর এবং তাঁহার একশত মহিষী ও আঠার কুমারকে বন্দনায় উল্লিখিত। (দুর্গাবর যেন মনকরের ছত্রই উদ্ধৃত করিয়াছেন, শুধু জল্পেশ্বরের বদলে বিশ্বসিংহের নাম এবং "একশত" বদলে "আঠচল্লিশ" মহিষীর উল্লেখ করিয়া।[৩]) অতএব রচনাকাল বিশ্বসিংহের

[১] মনসা-কাব্য (প্রথম খণ্ড), সংগ্রাহক শ্রীকালিরাম মেধি, সম্পাদক শ্রীবিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ শর্মা। প্রকাশক শ্রীহরিনারায়ণ দত্ত বড়ুয়া, নলবাড়ী (১৯৫১)।

[২] "কামতাইর রাজা বন্দো রাজা জল্পেশ্বর, এক শত মহিষী বন্দো অঠার কুমর।" পৃ ১৭। জল্পেশ্বর এখানে ব্যক্তিনাম না হওয়াই সম্ভব, স্থানঘটিত নাম হইতে পারে।

[৩] "কমতা-ঈশ্বর রাজা বন্দো বিশ্বসিংহ নৃপবর, আঠচল্লিশ মহিষী বন্দো অঠর কোবঁর।" পৃ ৮৫।

(রাজ্যকাল ১৫২২-৫৪) খ্যাতি রূঢ় হইবার পরে, অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দের শেষভাগের আগে নয়।

মনকর-অংশে প্রথমে সৃষ্টিপত্তন। সর্বাগ্রে বন্দনা, তাহার পর মণ্ডপ-জাগানো, অর্থাৎ কল্পনায় মন্দির নির্মাণ ও পূজার আয়োজন-সম্ভার।

প্রথমে জাগোক সে মণ্ডপ চারি পায়া
তিনি গোট মাণ্ডলি জাগোক সারি সারি কয়া।
চৌচাল চাটনি জাগোক জাগোক চায়ানি
আড়ৈ গজ মাটি জাগোক পূজিবো ব্রাহ্মণী।...
মণ্ডপত জাগোক রত্নের চারি বাতি
ঝাড়ৈয়া মাড়লি জাগোক জতেক বরতি।
সোনারূপার ফুল জাগোক এ ডোর চামর
নেতের চান্দোয়া জাগোক পেটারি ভিতর।
গীতালোর কণ্ঠে হাতে জাগোক এ তাল চামর
পোঞা সুপ্রসন্নে গীত গায় মনকর॥

"প্রথমে জাগুক (অর্থাৎ আবির্ভূত হোক) চারপায়া মণ্ডপ। সারি সারি করিয়া তিনটি "মাণ্ডলি" জাগুক। চৌচাল ছিটনি জাগুক, জাগুক ছাউনি। আড়াই গজ মাটি জাগুক, জাগুক মনসা।...মণ্ডপে জাগুক চারি রত্নদীপ। যজমান ও যজমানপত্নী জাগুক, আর সব ব্রতীরা। সোনা রূপার ফল জাগুক, জরির ঝারা। নেতের চাঁদোয়া জাগুক দেবপীঠের উপর। গায়নের কণ্ঠে (জাগুক সুর), হাতে জাগুক করতাল ও চামর। পদ্মা সুপ্রসন্ন (হইবেন বলিয়া) মনকর এই গান জুড়িয়াছে।'

সংসার-পত্তনের উদ্দেশ্যে গোঁসাই একজোড়া পাখি সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাদের বলিলেন, বাছা তোমরা স্বামীস্ত্রীরূপে বাস কর। শুনিয়া (—ঋগ্বেদের সূক্তের যমের মতো—) পক্ষী কানে হাত দিয়া বলিল, এ কথা বলিতেও পাপ হয়,—কে কোথায় শুনিয়াছে যে ভাই ভগিনীকে বিবাহ করে? তখন গোঁসাই পাখি দুইটিকে উড়াইয়া দিলেন। বেঙ্গমা গেল উজানে বেঙ্গমী ভাটিতে। উজানে গিয়া বেঙ্গমা প্রচুর শামুক-শেওলা খাইতে লাগিল, ভাটিতে গিয়া বেঙ্গমী কিছুই আধার পাইল না। শামুক-শেওলা প্রচুর খাইয়া বেঙ্গমার কাম জাগিল, তাহার বিন্দুপাত হইল। সে বিন্দু সাগরে পড়িয়া ভাসিয়া গেল। বেঙ্গমী তাহা দেখিয়া আধার বলিয়া গলাধঃকরণ করিল। তাহার গর্ভ সঞ্চার হইল। তাহার পর দুইজনে গোঁসাইয়ের কাছে ফিরিয়া আসিল। গোঁসাই স্বাগত করিয়া তাহাদের বলিলেন, বাছা তখন বিবাহ করিতে চাহ নাই, এখন কেন গর্ভসঞ্চার দেখিতেছি? এখন দুইজনে বিবাহে রাজি হইল। গোঁসাই বিবাহ দিলেন, বাসা বাঁধিতে বলিলেন। কালে বেঙ্গমী তিনটি ডিম পাড়িল। গোঁসাই একে একে তিনটি ডিমই ভাঙ্গিলেন।

প্রথমর ডিমা গোসাঁই ভাঙ্গিয়া জে চাইলা
জীবজন্তু গোসাঁই তাত লাগ না পাইলা।
দোয়াজর ডিমা গোট ভাঙ্গিয়া জে চাইল
হিরিণ তিরিণ গোসাঁই তাত লাগ পাইল।
ত্রিতয়র ডিমা গোট ভাঙ্গিয়া যে চাইল
জতেক পৃথিবীর শস্য তাত লাগ পাইল।
বারে শস্য উপজিল আর দূর্বা ধান
এহিমতে পাতিলেক সৃষ্টির পত্তন।

এ কাহিনী অভিনব, শুধু মনকরের রচনাতেই পাওয়া গেল।

তাহার পর ত্রিদেবার তপস্যা-কাহিনী, অনেকটা যেমন ধর্মঠাকুরের আখ্যায়িকায় পাই।[১] ধর্মের মৃতদেহকে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু চিনিতে পারেন নাই। শিবই চিনিতে পারিয়া জল হইতে তুলিয়া শবের মুখে শাঁখের জল দিলেন। তখন অনাদি-মহাদেব চেতন পাইয়া শিবকে বলিলেন, হাঁ কর, তোমার পেটে ঢুকি।

মুখ মেল পুতা তোর গর্ভে লঞো বাস।

এবং তাঁহার হাতে গঙ্গা ও দুর্গাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের প্রতিপালন করিতে বলিলেন। গঙ্গাকে বিবাহ করিয়া শিব শিরোধার্য করিলেন আর লোহার মঞ্জুষায় ভরিয়া দুর্গাকে সাগরের জলে ভাসাইয়া দিলেন।

হেমন্ত-ঋষি সাগরতীরে তপস্যা করিতেছিলেন। লোহার মঞ্জুষা তাঁহার কোলে আসিয়া ঠেকিল। তিনি খুলিয়া দেখিলেন একটি নবজাত কন্যা রহিয়াছে। স্ত্রীকে আনিয়া দিলেন। যথাসময়ে প্রচার করা হইল, হেমন্তের রানী কন্যা প্রসব করিয়াছে। এই কন্যা দুর্গা।

ইতিমধ্যে শিব বিশ্বকর্মাকে দিয়া তাঁহার "বাসুয়া" (=বৃষভ) নির্মাণ করাইয়া তাহাতে জীবন্যাস দিয়াছেন। তাহার পর সোনার লাঙ্গল গড়াইয়া বেশ করিয়া জমি পাট করিলেন এবং গঙ্গার সাহায্যে পুষ্পোদ্যান নির্মাণ করিলেন। এই মালঞ্চে দুর্গাকে আনাইয়া তাঁহাকে হরণ করিতে শিবের মন গেল। কিন্তু দুর্গা এখন কোথায় তাহা তিনি জানেন না। নারদ আসিয়া খড়ি পাতিয়া দুর্গার সন্ধান বলিয়া দিল। ওদিকে দেবতারা আসিয়া দুর্গাকে শিবের মালঞ্চে ফুল তুলিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। বাপমায়ের মত হইল না। দুর্গা জোর করিল। বিচিত্র বেশ করিয়া সে শিবের মালঞ্চে গেল। শিবের

[১] সপ্তদশ শতাব্দের আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

বৃন্দাবনে ঢুকিয়া দেবী অশোক গাছের তলায় বিশ্রাম করিতে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে শিব আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ঘুম ভাঙ্গিলে দেবী কাঁদিতে লাগিল। শিব তাহাকে আশ্বাস দিলেন, বাড়ীতে গিয়া বলিয়ো ফুল তুলিতে গিয়া তোমার বেশবাস বিপর্যস্ত হইয়াছে। এদিকে নারদ গিয়া গঙ্গাকে জানাইল

> হেমন্তর ঝিউ দুর্গা গৈল ফুল-ধারি
> তার সঙ্গে মমাই যে খেলায়ে খেমালি।

'হেমন্তের কন্যা ফুলচুরি করিতে গিয়াছিল। মামা তাহার সঙ্গে স্ফূর্তি করিতেছেন।'

শুনিয়া গঙ্গা খানিকটা কাঁদিল। তাহার পর দুই পুত্র ডাঙ্গুর[১] ও মহানন্দকে ডাকিয়া বলিল, বাছা তোমরা নৌকা লইয়া নদীতীরে যাও আর ফুল লইয়া যে মালিনী আসিতেছে তাহাকে ডুবাইয়া মার। দুই ভাই মায়ের কথা পালিতে চেষ্টা করিল। মাঝ-নদীতে ঢেউ জাগাইয়া তাহারা জলে ঝাঁপ-দিল, ভাবিল নৌকা সমেত দুর্গা ডুবিয়া মরিবে। কিন্তু তাহা ঘটিল না।

> পাক হাতে বাহে নায় পাকে সিকে পানি
> আপুনি কাণ্ডার ভৈলা হেমন্তনন্দিনী।
> বায়ুবেগে দেবীয়ে নদীয়ে ভৈলা পার
> আঙ্গুলি দেখায় পুতা মোচারিবো ঘার

কাঁদিতে কাঁদিতে দুই ভাই ঘরে ফিরিয়া গিয়া মাকে জানাইল, দুর্গাকে ডুবানো গেল না। সে আঙ্গুল দেখাইয়া জানাইতেছে, আমাদের ঘাড় মোচড়াইবে। শুনিয়া গঙ্গা জানিল, তাহার সতীন হইয়াছে।

দুর্গা ঘরে ফিরিল। হেমন্ত তাহার সাফাই মানিলেন না। দুর্গাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হইল। তাহার পর একদিন শিব হেমন্তের ঘরে ভিক্ষা করিতে আসিয়া দুর্গাকে চাহিয়া বসিলেন। নিঃস্ব কাবাড়িকে কন্যা দান করিতে হেমন্ত রাজি হইলেন না। শিব তখন গঙ্গাকে ধরিয়া বসিলেন। গঙ্গা ভার দিল নারদের উপর। যথারীতি শিব-দুর্গার বিবাহ হইয়া গেল।

গঙ্গা ও দুর্গা লইয়া শিব ঘর করিতেছেন। একদিন "ফুলধাড়ি" যাইতে—অর্থাৎ দূরবনে গিয়া ফুল তুলিতে—তাঁহার মন হইল। গঙ্গা দুর্গা নিষেধ করিল। বলিল, যত ফুল চাও এখানে আনিয়া দিব। শিব বলিলেন, সে ফুলে হইবে না। শিব ফুল তুলিতে গেলেন। পথে দুর্গা কোঁচনী-বেশে তাঁহাকে ছলিল।

---

[১] মুদ্রিত পাঠ 'জাঙ্গুর' অশুদ্ধ।

মনসার জন্ম হইল।[১] যথাকালে শিবের সঙ্গে মনসার সাক্ষাৎ ঘটিল। মনসা বাপের সঙ্গে ঘরে যাইতে চাহিল। শিব প্রথমে রাজি হন নাই, পরে তাহার নির্বন্ধে রাজি হইলেন। মনসা মাছি হইয়া ফুলের সাজির মধ্যে লুকাইয়া রহিল। দুর্গার সন্দেহ হইল। অতঃপর মনকরের অংশ খণ্ডিত।

মনকর তাঁহার রচনাকে 'পোঞ্চা'র পাঞ্চালি' ছাড়া দুইবার বলিয়াছেন "শ্রাবণের গীত"[২] এবং শিব-দুর্গার বিবাহবর্ণনার সময়ে বলিয়াছেন, 'হরগৌরীর মঙ্গল'। উত্তরবঙ্গের তাবৎ মনসামঙ্গলে যেমন এখানেও তেমনি কাব্যের সৃষ্টি-পত্তনের পর প্রথম আখ্যায়িকা হইতেছে শিবপার্বতীর কাহিনী যাহা নারায়ণ দেব প্রভৃতির কাব্যে 'কালিকাপুরাণ' নামে পৃথক্‌ভাবে পাওয়া যায়।

দুর্গাবরের অংশের দুই স্থানে সম্ভবত কবির পোষ্টা অথবা বিশেষ স্নেহপাত্র এক বাহুবল শিকদারের উল্লেখ আছে।[৩] দুর্গাবরের ভনিতায় রামায়ণ-কাব্যও অসমীয় ভাষায় পাওয়া গিয়াছে।[৪] দুই দুর্গাবর একই ব্যক্তি না হইতে পারেন। আসামে একদা দুর্গাবর নাম বহুপ্রচলিত ছিল।

দুর্গাবরের অংশে চান্দোর নগরী চম্পায়নী গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত। সন্তানহীন বলিয়া চাঁদোর ও পত্নী সোনেকার মনে সুখ নাই। এক দিন বর্ষা-কালে উত্তর দেশ হইতে ধন্বন্তরি ওঝা আসিয়া চাঁদোর বাড়ির দরজায় ঢাক পিটাইল। শুনিয়া সোনেকা বাহির হইয়া আসিল। ধন্বন্তরি তাহাকে দেবী মনসার পূজা বাতলাইয়া দিল। (এ মনসা সলিলদেবী, যেন গঙ্গাই।)

ধন্বন্তরি বদতি বানিয়ার ঝিউ[৫] শুন
কহিতে না পারি যত এ দেবীর গুণ।
নিপুত্রির পুত্র হয়ে মুক্ত হয়ে বন্দী
ঘরে ঘণ্ট[৬] পাতি ঘিটো পূজয় প্রপঙ্কি[৭]।
এ ঋতু সময় দিনা নিয়মে থাকিয়া
সুবর্ণের পাঙ্ক ফুল অরঘ ধরিয়া।

---

[১] পুথির প্রাপ্ত অংশে এ কাহিনী নাই।

[২] "মনকরে রচিলেক শ্রাবণের গীত" পৃ ১০, ১২। মনকরের দেশে ও কালে শ্রাবণ মাসে মনসা-মঙ্গল গাওয়া হইত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

[৩] "বাহুবল শিকদার যে পোঞ্চা সুপ্রসন্নে, চিরজীবী হৌক কবি দুর্গাবর ভণে।" পৃ ১১৮। "সুগন্ধ পুষ্পত যেন মালতী সুবাস, বংশর মধ্যত বাহুবলর প্রকাশ। প্রতি দেব বরে পুত্র পাইলেক প্রধান, কবি দুর্গাবরে গীত করিল ব্যাখ্যান।" পৃ ৯৫।

[৪] অরণ্য হইতে উত্তর কাণ্ড। শ্রীমহেশ্বর নেওগ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া 'দুর্গাবরী গীতি-রামায়ণ' নামে শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী কর্তৃক গোলাহাট হইতে প্রকাশিত (১৯৫৪)।

[৫] মুদ্রিতপাঠ 'জীউ'। [৬] অর্থাৎ ঘট। [৭] অর্থাৎ ভালোভাবে।

মানসাই[১] মাই বুলি নামি গঙ্গাজলে
আরাধিলে সিদ্ধি হয়ে বাঞ্ছিত সকলে।

ধন্বন্তরির উপদেশ মানিয়া সোনেকা ঘট পূজিয়া গঙ্গাজলে নামিল। দুই ছাগল বলি দিল। সোনার ফুল ফেলিয়া দিল। তিন ডুব দিল—প্রথম ডুব ধর্মের নামে, দ্বিতীয় ডুব কূর্মের নামে, তৃতীয় ডুব মনসার নামে। কিন্তু

সাতষটি বেলা ভৈলা দোয়াজ প্রহর
তথাপি তো সাধুয়ানী না পাইলন্ত বর।

তখন ভগিনী স্বগন্ধিকে ডাকিয়া সোনেকা কাটারি আনিতে বলিল। সে আত্মহত্যা করিয়া গঙ্গার উপরে স্ত্রীহত্যা পাপ অর্পণ করিবে। শুনিয়া ডাঙ্গুর ও মহানন্দ ধাইয়া গিয়া গঙ্গাকে খবর দিল। তখন গঙ্গা চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে করিয়া মকরে চড়িয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং সোনেকাকে ছয়টি আমলকি দিয়া বলিল, এই ছয়টি খাইলে তোমার ছয় পুত্র হইবে।

যথাসময়ে একে একে ছয় পুত্র জন্মিল—নীলপাণি, শূলপাণি, গদাপাণি,[২] চক্রপাণি, হলধর[৩] ও স্বর্ধাই। বয়স হইলে তাহাদের বিবাহ দেওয়া হইল। ছয় বধূ—স্বরক্ষা, তিলোত্তমা, সত্যবতী, ধনমালা, হৃদয়া ও জয়ন্তাই। বিবাহে অনেক ব্যয় হইয়াছে। সেকারণে চাঁদো বাণিজ্যে যাইতে ব্যগ্র হইল। পুরানো নৌকা সব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নূতন নৌকা গড়ানো হইল। দ্রব্যাদি ভরিয়া যাত্রার আয়োজন করা হইয়াছে। "বুহিত" (নৌকা) পূজিতে মাগুর মাছ চাই। মাছ আনিতে সোনেকা কেওটনী সরদাইয়ের বাড়ীতে গেল আর দেখিল সরদাই ছয় বউকে লইয়া "পদুমাইকে পূজে পূর্ণ এ ঘণ্ট পাতিয়া।" জিজ্ঞাসা করিয়া এ পূজার ফল জানা গেল—অন্ধ চক্ষু পায়, ঘরে ধন ভরে, অপুত্রার পুত্র জন্মে, বন্দী মুক্ত হয়।

বরিষেক অন্তরে বরিষা সময়ত
চারিদিন পূজিবেক শ্রাবণ মাসত।
দুই সংক্রান্তির দুই পঞ্চমী পূজিবা
পদুমাই স্বপ্রসন্নে সুখত থাকিবা।

সদাগরের নৌকা বন্দর ত্যাগ করিলে সোনেকা বিষহরী-পূজায় বসিল। ছয় বধূ মঙ্গল গাহিতে লাগিল। ইতিমধ্যে চাঁদো নৌকা থামাইয়া ধনাই ভাণ্ডারিকে দুইটি জিনিস আনিতে বাড়ীতে পাঠাইয়াছে। ধনাই গিয়া চাঁদোকে পূজার

---

[১] অর্থাৎ মানসগঙ্গা কিংবা মনসা। মনকর লিখিয়াছেন, "মায়ক ডঙ্কিয়া ভৈল মনসাই নাম"।
[২] মুদ্রিত পাঠ "গয়াপাণি"। [৩] ঐ 'হলদ্ধর"।

কথা বলিয়া দিল। চাঁদো আসিয়া পূজার আয়োজন নষ্ট করিয়া দিয়া নৌকায় ফিরিয়া গেল।

তারপর কাহিনী পরিচিত পথে চলিয়াছে॥

১৩

উত্তরবঙ্গের আর একটি প্রাচীন কবির মনসামঙ্গলের সন্ধান সম্প্রতি পাইয়াছি। নাম বিভূতি তবে ভনিতায় প্রায় সর্বদা "তন্ত্রবিভূতি" বলিয়া উল্লিখিত। মনে হয় কবি জাতিতে তাঁতি ছিলেন তাই ভনিতায় নিজেকে "তন্ত্র" বিভূতি বলিয়াছেন। নাম ছাড়া কবির সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

তন্ত্র বিভূতি কবি বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি
সপনে পাইল গীত সেবি পদ্মাবতী।

এটুকু গায়নের অথবা পরবর্তী কোন কবির প্রক্ষেপ বলিয়া মনে হয়।

সপ্তদশ শতাব্দের শেষার্ধের কবি জগৎজীবন ঘোষাল বিভূতির রচনাকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ইহার রচনার সব প্রাচীন পুথিতেই মাঝে মাঝে তন্ত্রবিভূতির ভনিতা পাওয়া যায়। তন্ত্রবিভূতির যে পুথি[১] লইয়া এখানে আলোচনা করিতেছি তাহারও একেবারে শেষাংশে মাঝে মাঝে জগৎজীবনের ভনিতা আছে।

মনসা-আখ্যায়িকার উত্তরবঙ্গীয় রূপের আদর্শ বিভূতির কাব্যে পাইতেছি। সেজন্য বিভূতি-বর্ণিত কাহিনীর বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

প্রথমে যথারীতি বন্দনা।

মন দিঞা শুন সবে মনসার গীত
তন্ত্রবিভূতি গায় মনসাচরিত॥

ধর্মপূজার কথা শিব একদা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। একদিন হঠাৎ সে কথা মনে পড়িল। তিনি মানসসরোবরে গেলেন ফুল তুলিতে। এই উপলক্ষ্য করিয়া মনসার উৎপত্তি। শিবের বিন্দু মাংসপিণ্ড হইয়া পাতালের রাজা বাসুকির মাথায় গিয়া পড়িল। বাসুকি তাহাতে জল ছিটাইয়া দিল। তখন মাংসপিণ্ড মনসার আকার লইল। চতুর্ভুজ শরীর, সর্প-ভূষণ, হংস-বাহন। বাসুকি দেখিয়া

[১] ডক্টর শ্রীমান্ আশুতোষ দাস কর্তৃক সংগৃহীত। পত্রসংখ্যা ২৩০। লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগ। পুথির আরম্ভে আছে "মনসামঙ্গল লিখ্যতে"। ইহারই প্রতিলিপির মতো আর একটি পুথিও ডক্টর দাস সংগ্রহ করিয়াছেন। এটির পত্রসংখ্যা ২২৮, লিপিসমাপ্তি কাল ১২৪৪ সাল (ফাল্গুন), লিপিস্থান মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার একটি গ্রাম।

তাহাকে স্তব করিয়া সত্বর যে পথে আসিয়াছিল সেই পদ্মনালপথে উপরে উঠিতে বলিল, পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে। মানসসরোবরে ভাসিয়া উঠিয়া দেবী পদ্মপত্রে আসন লইল। শিবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মনসা তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলে শিব নিষেধ করিলেন।

আমার বাক্য শুন মা ব্রাহ্মণী তোতল
তুমি গেলে হবে মাই দ্বন্দ্ব কন্দল।

মনসা শুনিল না। শিব মনসাকে সাজির মধ্যে আনিয়া লুকাইয়া রাখিলেন। দুর্গার সন্দেহ হইল। শিবের অগোচরে সে সাজি খুঁজিয়া মনসাকে বাহির করিল এবং একটি একটি করিয়া ফুল নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে লাগিল। হালকা হইলে তুলিয়া রাখিল, ভারি হইলে আগুনে ফেলিয়া দিতে লাগিল। মনসার পক্ষে আর লুকাইয়া থাকা চলিল না। সে পাঁচ বছরের মেয়ে হইয়া মা মা বলিয়া পার্বতীকে সম্বোধন করিল। তাহার পর ঝগড়া ও মারামারি। মনসার সাপ দুর্গাকে দংশন করিল। শিব আসিয়া ব্রহ্মজ্ঞান জপিয়া দুর্গাকে বাঁচাইলেন। মনসাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য দুর্গা জেদ করিতে থাকিলে শিব মনসাকে ক্রোড়ে করিয়া নির্বাসন দিতে চলিলেন। তাঁহার চিন্তা

ছত্রিশ বর্ণেতে থাকে নগরের লোক
কোন স্থানে থুব নিঞা ব্রাহ্মণী নিতক[১]।

প্রথমে গেলেন ব্রাহ্মণের ঘরে, সেখানে দেখিলেন দেবী (দুর্গা) গন্ধেশ্বরী হইয়া রহিয়াছেন। অন্য ঘরে গেলে সেখানেও দুর্গার তাড়া। অবশেষে শিব কন্যাকে নিদ্রিতাবস্থায় বনে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন।

ঘুম ভাঙ্গিলে মনসা দেখিল পিতা পলাতক। গাছের তলায় বসিয়া মনসা কাঁদিতেছে এমন সময় একদল রাখাল গোরু তাড়াইয়া ঘরে ফিরিতেছিল। তাহারা মনসাকে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করিল। মনসার সাপের তাড়া খাইয়া তাহারা পলাইল কিন্তু একজন ছিল কুব্জ, সে পলাইতে পারিল না। মনসার কথায় কুব্জ বটপাতায় দুধ দুহিয়া দিল। খাইয়া মনসা তাহাকে বর দিল। তাহার কুব্জ ভালো হইয়া গেল। তখন অপর সব রাখাল আসিয়া জুটিল। তাহারা মনসাকে বলিল, আমাদের রাজ্য দাও। তখন

হাসেন মনসা মা রাখালের বোলে
রাখালেরে রাজ্য দিলে কেবা ভালো বলে।

---

[১] অর্থাৎ নিত্যাকে বা নেতোকে। এখানে ইহা মনসার নামান্তর।

আষাঢ় মাসে অষ্ট দিনে অম্বুবাচী হয়
হেনদিন রাখালে সকলে বর পায়।
ক্ষেত পাথারেতে শস্য খাইবে লুটিয়া
কেহ রাজা হৈঞা বিচার রাখালকে দিঞা।

চন্দন গাছের তলায় মনসা বসিয়া আছে। এমন সময় সেখানে ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত। তিনি তপস্যা করিতে চলিয়াছেন। মনসা তখনি তাঁহার সঙ্গ লইল। তীরে পৌঁছিয়া ব্রহ্মা সাগরকে বলিলেন, পার হইব উপায় করিয়া দাও। সাগর আধহাঁটু জল করিয়া দিল। ব্রহ্মা ও মনসা জলে নামিলেন। হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া মনসা চলিতেছে এমন সময় হঠাৎ ঝড়ে তাহার বস্ত্র স্থানচ্যুত হইল। পিছু ফিরিয়া দেখিতে ব্রহ্মার দৃষ্টি তাহার শরীরে পড়িল। ব্রহ্মার বিন্দুপাত হইল। সেই বিন্দু ভাসিয়া গিয়া পদ্মার উদরে প্রবেশ করিল। মনসা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া

জাঙ্গ চিরিঞা দেবী করিল বিন্দুপাত
বিষের জন্ম হইল ব্রহ্মার সাক্ষাৎ।

বিষ ব্যাপ্ত হইয়া গাছপালা শস্যাদি নষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া ব্রহ্মা

কুম্ভারের রূপে মাটির নান্দিয়া[১] গড়িল
নান্দিয়ার মধ্যে ব্রহ্মা বিষ সম্বরিল।
নান্দিয়াতে ভরাইল বিষ যে সকল
তন্ত্রবিভূতে গায় মনসামঙ্গল।

ঢাকন দিয়া আঁটিয়া সে নাদা সপ্তসাগরে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। এক বোয়াল মাছ তাহা গিলিয়া ফেলিয়া বিপদে পড়িল। সাগর ব্রহ্মার কাছে মাছকে আনিয়া হাজির করিল। ব্রহ্মা নাদা বাহির করিয়া লইয়া মাছকে বলিলেন

তোর জন্ম হউক গিঞা ধুবির পাটের তল।
ধবার[২] পাটের তলে থাকব পড়িঞা
গিরস্তের বহু বেটী লঞা যাইবে ধরিঞা।

ব্রহ্মা তখন সপ্তপাতালে বিষ পাঠাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রের মালিনী ব্রহ্মার শাপে কপিলা গাভী হইয়া জন্ম লইয়াছে। তাহার বৎস মনোরথ। কপিলা-মনোরথের কাহিনীতে নূতনত্ব নাই। সাগরমন্থন-কাহিনীতেও নূতনত্ব নাই। শেষ মন্থনে সেই বিষের নাদা উঠিলে শিব তাহা হইতে এক বিন্দু পান করিয়া মৃতবৎ হইলেন। গঙ্গার কথায় দুর্গা নারদকে পদ্মার কাছে পাঠাইল। ইতিমধ্যে পদ্মা "সিয়লি" পর্ব্বতে "মেঢ়" নির্মাণ করিয়া স্থিত

---

[১] পাঠ "নান্দিঞা" "নান্দিয়া"। =নাদা, মাটির বড় ডাবা। [২] অর্থাৎ ধোবার।

হইয়াছে। নারদ আসিয়া বলিল, "সত্বরে চলহ বহিন ডঙ্কদণ্ড[১] লইয়া।" মনসা বলিল, আমি সাধ করিয়াছি, দুর্গার কোলে চাপিয়া যাইব। দুর্গা অগত্যা রাজি হইল। যাইতে যাইতে মনসা একবার ভর দিল, তাহাতে "দুর্গার কাঁকালি হইল বেঁকা"।[২] মনসা শিবকে ঝাড়িতে লাগিল।

শঙ্খ জল দিয়া দেবী চিয়ায় শঙ্কর।
মূলমন্ত্র পড়ে দেবী ধিয়ান করিয়া
অষ্ট মন্ত্রে অষ্ট গরুড় দিল সমর্পিয়া।
বাজে শঙ্খধ্বনি আর ফুকারে কাহাল
দক্ষিণে বিশাল কাঢ়া বামে করতাল।
বিষ নাহিক গায়ে সমাধি করিয়া
আদি মন্ত্র পাঞা শিব উঠিল বসিঞা।

মনসার মন বিরস দেখিয়া শিব জিজ্ঞাসা করিলেন কি চাই। মনসা বলিল, দেবতারূপে গণ্য হইবার জন্য আমার কিছু সাজসরঞ্জাম চাই।

খটক[৩] ডম্বুর[৪] চাহে [আর] লাউয়া[৫] লাঠি
দশ সারা সিন্দূর চাহে আর ঘট দুটি।

শিব সব দিলেন।

মনসা যখন বেশ পরিধান করিতেছে তখন কিছুক্ষণের জন্য উলঙ্গ হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া দুর্গা ও নারদ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মনসাকে গালমন্দ করিতে লাগিল। মনসা ক্রুদ্ধ হইয়া পিতার উপর বিষ চড়াইয়া দিলে শিব আবার ঢলিয়া পড়িলেন। দেবতাদের সম্মিলিত অনুরোধে শিবকে বাঁচাইতে হইল। নারদ বুঝিল, এ মেয়েকে অবিবাহিত রাখা উচিত হইতেছে না। মানসসরোবরে তপস্যানিরত "জড়ৎকার" মুনির সঙ্গে ধরিয়া বাঁধিয়া মনসার বিবাহ দেওয়া হইল। নেতো মনসার "কর্মচারী" রূপে সঙ্গে গেল। বর্ষার সময় নালার জলে মনসাকে চেঙ্গ-বেঙ্গ খাইতে দেখিয়া মুনির ভয় হইল। মনসার পেটে হাত বুলাইয়া পুত্রলাভের বর দিয়া মুনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পতিপরিত্যক্ত কন্যাকে শিব এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন, তোমার পূজা মর্তলোকে সবাই করিবে।

জ্যৈষ্ঠমাস দশহরা অম্বুবাচী দিনে
মনসা পঞ্চমী লোকে করিবে পূজনে।

[১] ডঙ্কদণ্ড বোধহয় হেমতাল দণ্ড, যাহা দেখিলে নাগ ও নাগবিষ প্রশমিত হয়।
[২] দেবীর কঙ্কালী নামের ব্যাখ্যা।
[৩] খেটক। [৪] ডম্বরু। [৫] অলাবুপাত্র অর্থাৎ খর্পর।

দেবীরূপে মনসার প্রথম "পাত্র" (দ্ব্যর্থে পূজাপাত্র এবং পুরোহিত) হইল আসন-বাসন।

বাসনের বোলে তুষ্ট ব্রাহ্মণী তোতল।
প্রথম পাত্র আইল দেবীর আসন-বাসন

(আস্তীকের ও জনমেজয়ের সর্পসত্রের কোন উল্লেখ "তন্ত্র" বিভূতির পুথিতে নাই।)

আসন-বাসনের নির্দেশে দেবী কলিতে পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে চন্দ্রপতি সদাগরকে বাছিয়া লইল। চন্দ্রপতি আবাল্য শিবের ভক্ত। শিবের বরে "ধনে বংশে বাঢ়ে বালা চাম্পালি ভুবনে"। শিব মনসাকে লইয়া চাঁদোর দ্বারে আসিয়া বলিলেন, "ডাক মোর বড় পুত্র চান্দো সদাগরে"। শিবের কথায়ও চাঁদো মনসাকে ভজিতে রাজি হইল না। শিব চলিয়া গেলেন। মনসা এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিল,

জালু মালু দুই ভাই বিলে মৎস্য মারে
বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী-রূপে মাতা গেলা নদীতীরে।...
বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী রূপ দূরে তিয়াগিয়া
ষোড়শ্যা কুমারী-রূপ ধারণ করিয়া।

দেবী বলিল, আমাকে পার করিয়া দাও। জালু মালু বলিল, "খালি হাতে তোমাকে আমি পার না করিব"। নয়বুড়ি কড়ি পারানি লাগিবে। দেবী বলিল, আমি বামুনের মেয়ে টাকাকড়ি কোথায় পাইব।

ওষ্ঠ লাঙ্গল ব্রাহ্মণের জিহ্বা গোটা ফাল
ভিক্ষা করিয়া আমরা খাই সর্বকাল।

দেবী তাহাদের ধনী করিয়া দিবে বলিলে তবে রাজি হইল। নদীতে সোনার ঘট মিলিল। তাহা পূজিয়া তাহারা ধনী হইল।

চাঁদোর ভৃত্য লেঙ্গার সহিত একদিন হাটে জালুর পত্নী হীরার বিবাদ বাধিল। হীরা অপমানিত হইয়া ঘরে ফিরিয়া মনসার কাছে দুঃখ জানাইল। ইতিমধ্যে চাঁদোর পত্নী সোনেকা হীরাদের ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির কথা শুনিয়াছে। সে হীরার কাছে "ব্রাহ্মণী তোতল"-পূজা শিখিয়া লইল। লেঙ্গার কাছে সোনেকার মনসা-পূজার কথা ছাপা রহিল না। সে গিয়া চাঁদোকে লাগাইল, "সোনেকা ডাইনপনা শিখিছে বসিয়া"। চাঁদো আসিয়া মনসার ঘট লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল। মনসা শঙ্খিনী-সর্পরূপ ধরিয়া দংশন করিতে চাহিলে নেতোই সাবধান করিয়া দিল, "চান্দোকে সহায় আছে কুলের গন্ধেশ্বরী"। নেতোর

কথা উপেক্ষা করিয়া মনসা তাহার সর্পদল লইয়া চাঁদোর ভাণ্ডাগার আক্রমণ করিল। "হাতে হেমতাল করি" চাঁদো তাহাদের তাড়াইয়া দিল। অতঃপর নেতোর উপদেশে মনসা চাঁদোকে দাদা বলিয়া যাচিতে আসিল। তাহাতেও কিছু হইল না। তখন মনসা জালু, মালু ও সর্পদল লইয়া চাঁদোর "লক্ষের বাগান" কাটিতে গেল। চাঁদোর সেনাপতি বাঘা সৈন্যসামন্ত লইয়া তাহাদের পরাজিত করিলে মনসা কাতর হইয়া পড়িল। পরে মনসা মেঘ হইতে বিষবৃষ্টি করাইল। চাঁদোর সৈন্য মরিল, কিন্তু তাহার প্রার্থনায় শিব ধন্বন্তরিকে পাঠাইয়া তাহাদের বাঁচাইয়া দিলেন।

বিষাদিত হৈল মাতা দেবী পদ্মাবতী
পদ্মার চরণে গীত গাইল বিভূতি ॥

মনসা আসিয়া শিবকে ধরিয়া বসিল, চাঁদোকে মানাইয়া দিতে হইবে। শিব রাজি নন। চণ্ডী মনসার পক্ষ লইল।

অতঃপর ধন্বন্তরি-বধ আখ্যান। তাহার পর একে একে চাঁদোর পাঁচ পুত্রের সর্পদংশনে দেহত্যাগ। মনসার হুকুমে তাড়কা রাক্ষসী দেহগুলি নিজের হেফাজতে রাখিয়া দিল।

পুত্র কুলপাণিকে লইয়া চাঁদো দক্ষিণ-পাটনে বাণিজ্যযাত্রা করিল। ঘুজ্যড়ির ঘাট হইতে ছাড়িয়া জাহাজ ভ্রমরা-দহ পার হইয়া গঙ্গায় পড়িল এবং মরষুদাবাদ, চুনাখালি, বিষ্ণুপুর (যেখানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী), কাটোয়া, সপ্তগ্রাম ও নদিয়া পার হইয়া সাগরে পড়িল। সেখানে ত্রিবেণী। এখানে সর্পদংশনে কুলপাণির মৃত্যু হইল। তাহার দেহ জলে ফেলিয়া দেওয়া হইল। মনসা তাহা লইয়া গেল জলের তলায়। সেখানে বিশ্বকর্মা দেবীর জন্য পাথরের মেঢ় গড়িয়া দিলে "তথাতে রহিল দেবী বর্বটি রূপ হৈয়া"। এখানে তাড়কা চাঁদোর ছয় পুত্রের দেহ শুটকি মাছের মতো মমি করিয়া রাখিয়াছিল।

পেট চিরি নাড়ি খুলি তাহত করিল
চান্দোর ছয় পুত্রখানি শুখাঞা রাখিল।
ছয় জীব রাখে দেবী আপনার পাশে
তন্ত্রবিভূতি গায় মনসার দাসে ॥

চাঁদো মনসার ত্রিবেণী-নগর লুট করিতে গেল। ভয়ে মনসা জলের তলায় ময়নানগরে পলাইতে চাহিলে নেতো বাধা দিল। মনসা ঝঞ্ঝাবৃষ্টিকে ডাকিল। নদীতেও বান ডাকাইল। চাঁদোর জাহাজ ডুবিয়া গেল। দয়া করিয়া মনসা চাঁদোর কাছে ফুলের ভেলা পাঠাইল। চাঁদো প্রত্যাখ্যান করিলে তখন

"কাকরূপে চান্দোর মুখে বজ্জিল পদ্মাবতী"। তীরে উঠিয়া চাঁদোর নানারকম নিগ্রহ ও দুর্গতি। বন্ধু চন্দ্রকেতুর আশ্রয়ও সে পাইল না। সেখানে মনসার ঘট পূজিত দেখিয়া দেবীকে "চেঙ্গমুড়ি কানি বেটী" বলিয়া গালি দিল। তাহার পরেও লাঞ্ছনা। অবশেষে গৃহে প্রত্যাগমন। (চাঁদোর নৌকাডুবি হইতে গৃহ প্রত্যাগমন পর্যন্ত আখ্যান বিপ্রদাসের বর্ণনার সঙ্গে অনেকটা মিলিয়া যায়।)

অতঃপর লখিন্দর-বেহুলার জন্মবৃত্তান্ত। দেবসভায় সাবিত্রী-সত্যবান্ নাচ জুড়িয়াছে।

সরস্বতী গায়েন হৈলা গণেশ মান্দুলি।[১]
আপনে পার্বতী হৈলা নাটনাটেশ্বরী

মনসাও দেখিতে-শুনিতে আসিয়াছে, কিন্তু দেবসভায় ঠাঁই পায় নাই। তাই সে "বসিল সিজের ডালে লঞা পাত্রগণে"। তাহার পর যথারীতি তালভ্রংশ, অভিশাপ ও নরলোকে জন্মগ্রহণ।

লখিন্দরের বিবাহবয়স হইল কিন্তু মা বিবাহ দিতে নারাজ। তাহার মনোভাব কি তাহা মনসা নেতোকে বলিতেছে।

অঙ্গীকার কৈল পুত্রে বিভা নাহি দিব
অবিবাহ থাকিল বালা নাগে কি করিব।

লখিন্দরের মনে মনসা কাম-উদ্দীপনা দিল। লখিন্দর (—কৃষ্ণের অনুকরণে—) মামী কৌশল্যাকে ধর্ষণ করিল। শুনিয়া চাঁদো লজ্জিত হইয়া পুত্রের বিবাহের জোগাড় করিল। ভাবিল

মেঢ়-ঘর বান্ধি তাতে রাখিব প্রহরী
ঘরের ভিতরে থুব নেউল-মোউরী[২]।
এইমত একরাত্র জাগিব প্রহরী
কেমনে সাধিবে বাদ কানি বিষহরি।

ইহার পর প্রাপ্ত পুথিতে কাহিনীর উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্রতা নাই॥

১৪

বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত পাঠকসমাজের একটা বৃহৎ অংশের সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, বিজয় গুপ্ত খুব পুরানো মনসামঙ্গল-রচয়িতা এবং তিনি পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ

[১] অর্থাৎ মাদল-বাজিয়ে, বায়েন।
[২] নকুল ও ময়ূর।

দশকে (—ঠিক যে সময়ে বিপ্রদাসের কাব্য লেখা হইয়াছিল—) মনসামঙ্গল রচনা আরম্ভ অথবা শেষ করেন। এ বিশ্বাসের সমর্থনে বিন্দুমাত্র প্রমাণ নাই, এমন কি যুক্তিযুক্ত সংশয়েরও স্থান নাই। বিজয় গুপ্ত পুরানো অথবা অর্বাচীন, কবি কিংবা গায়ক অথবা লিপিকর হইতে পারেন। তাঁহার প্রাচীনত্বের পোষকতায় যেটুকু বলিবার আছে, তাঁহার অর্বাচীনত্বের পক্ষে তাহার অনেক বেশি বলিবার আছে। কালনির্ণয় নির্ভর করে মুখ্যত পুথির বয়সের উপর এবং গৌণত কবির উক্তি ও আভ্যন্তরীণ বস্তুর উপর। পুরানো বাঙ্গালা রচনার পুথি দৈবাৎ দুই একটি ছাড়া প্রায় সবই অষ্টাদশ শতাব্দে অথবা উনবিংশ শতাব্দের প্রথমার্ধে লেখা। এই জন্য মুখ্য সাক্ষ্য প্রায়ই নাই। গৌণ সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করিতে হয়। এইরূপে গৌণ সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করিয়া বিপ্রদাসকে পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ দশকের কবি বলিতে হইয়াছে। নতুবা মুখ্য-সাক্ষ্য অনুসরণ করিলে তাঁহাকে অষ্টাদশ শতাব্দের লোকই বলিতে হইত। বিজয় গুপ্তের বেলায় মুখ্য সাক্ষ্য একেবারে অনুপস্থিত। তাঁহার মনসামঙ্গলের যে পুরানো পুথির উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে তাহা অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ দশকে (অর্থাৎ ১১৮১ সালে ?) লেখা অনুপস্থিত পুথির আধুনিক প্রতিলিপি। বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ' সংগ্রহ করিয়াছিলেন প্যারীমোহন দাশগুপ্ত, প্রকাশ করিয়াছিলেন রামচরণ শিরোরত্ন, ছাপা হইয়াছিল (১৩০৬ সালে) বরিশাল আদর্শ যন্ত্রে নন্দকুমার দাস কর্তৃক।[১] প্রকাশক ভূমিকা লিখিয়াছিলেন[২] এবং 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' নামে একটু মুখবন্ধও দিয়াছিলেন।[৩] মুখবন্ধে প্রকাশক যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে বিজয় গুপ্তের কাব্যের মুদ্রিত সংস্করণের উৎপত্তি সম্বন্ধে খাঁটি খবর পাওয়া যায়।

> অনেক দিন যাবৎ বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক গৈলা গ্রাম নিবাসী শ্রীমান্ প্যারীমোহন দাসগুপ্ত অতীব যত্ন, পরিশ্রম ও উৎসাহ সহকারে পূর্ব বঙ্গের একমাত্র প্রাচীন কবি মহাত্মা বিজয় গুপ্ত প্রণীত মনসামঙ্গল নামক মহাকাব্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। সমগ্র গ্রন্থ ইতিপূর্বে আর কখনই মুদ্রিত হয় নাই। কেহ কেহ তালপত্রে কেহ বা তুলট কাগজে ইহা লিখিয়া রাখিতেন। সুতরাং ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও সাধারণে ইহা পাঠ ও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত না। এই পুস্তক অনেক প্রাচীন কালের হস্তলিখিত জীর্ণ শীর্ণ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বরিশাল জজ আদালতের ভূতপূর্ব হেডক্লার্ক ফুল্লশ্রী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার সেন মজুমদারের বৃদ্ধ পিতামহ

---

[১] প্রথম সংস্করণের বই ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে আছে। অধ্যাপক শ্রীমান্ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে এই সংস্করণের বিবরণ পাইয়াছি।

[২] পরবর্তী সংস্করণে ভূমিকার শেষে স্বাক্ষর আছে প্যারীমোহন দাশগুপ্তের।

[৩] পরবর্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত।

৺দেবীপ্রসাদ সেন মজুমদার কর্তৃক ১১৮১ সনের লিখিত গ্রন্থ, সরমহল গ্রামস্থ বরিশালের খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীকুমার গুপ্তের জনৈক পূর্বপুরুষ সনারাম গুপ্ত কর্তৃক ১৭২০ শকের লিখিত গ্রন্থ, গৈলা গ্রামস্থ ৺কৃষ্ণকিশোর মুন্সির লিখিত গ্রন্থ হইতে আমাদের সংগ্রহকারক যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন।

এই প্রথমপ্রকাশিত বইটিতে আছে গ্রন্থারম্ভে "মন্ত্রণা" ও "দেববন্দনা", তাহার পরেই "স্বপ্নাধ্যায়"। ইহাতে গ্রন্থরচনার হেতু ও কাল নির্দেশ আছে। শ্রাবণ মাসের রবিবারে সেবার মনসা-পঞ্চমী পড়িয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরে জগৎ নিদ্রামগ্ন। এমন সময়ে বিজয় গুপ্ত স্বপ্ন দেখিলেন, বিচিত্র রত্নালঙ্কারভূষিত, দিব্যবস্ত্রপরিহিত, অজগরসর্পবেষ্টিত এক ব্রাহ্মণনারী নাগরথ হইতে নামিয়া আসিয়া সোনার ঘটে ভর করিয়া তাঁহার পিঠে হাত দিয়া জাগাইতেছে আর বলিতেছে, চোখ মেলিয়া দেখ—আমি দেবী মনসা। সকাল হইলে তুমি কাপড় ছাড়িয়া "গীতছন্দে কর কিছু আমার স্তবন"। দেবী আরও বলিয়া দিল

ছিকলির মধ্যে গাইও পয়ার নাচাড়ী
গীতের আগে রচিও গোসাঞির পুষ্পবাড়ী ॥

এই প্রসঙ্গের শেষে আছে,

যেনমতে পদ্মাবতী করিলা সম্বিধান
তেনমতে করে বিজয় গীতের নির্মাণ।
ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক
সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক।
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি
নিজবাহু বলে রাজা শাসিল পৃথিবী।
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকসিম।
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে ঘণ্ডেশ্বর
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিতনগর।[১]

"ঋতুশূন্য বেদ শশী" বলিতে ১৪০৬ অর্থাৎ ১৪৮৪ খ্রীস্টাব্দে।[২] হোসেন-শাহার সিংহাসন লাভ করিতে তখনও বছর দশেক দেরি। সুতরাং এ তারিখ অগ্রাহ্য।

---

[১] নগেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সঙ্কলিত ও পুথির আকারে দুই সারিতে "কলিকাতা ৬০নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট বণিক প্রেস" হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত (১৩১৪), "মনসা-মঙ্গল। ৺বিজয় গুপ্ত কৃত পদ্মপুরাণ বা রয়ানী", বিজয়গুপ্তের ছাপমারা রচনার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ এবং শিরোরত্ন-সংস্করণের সর্বাধিক অনুগত। সেনগুপ্ত-সংস্করণে "ঋতুশূন্য······পণ্ডিতনগর" এই আট ছত্র নাই।

[২] এই কালজ্ঞাপক ছত্র অন্য নামের কবির পুথিতেও দেখা গিয়াছে। সা-প-প ৩ পৃ ১২৯ দ্রষ্টব্য।

"স্বপ্নাধ্যায়"[১] অংশে এবং অন্যত্র স্পষ্ট প্রক্ষেপ যথেষ্ট আছে।[২] (সংগ্রাহক প্যারীমোহনবাবু কবিতা লিখিতেন।) খাঁটি আত্মকথায় কোন প্রাচীন কবি নিজেকে প্রথম পুরুষে উল্লেখ করেন নাই। "ইন্দ্রের শচী কিংবা মদনের রতি"—এ রকম ছত্র অত্যন্ত অনপেক্ষিত। প্রথম সংস্করণে অথবা সেনগুপ্ত-সংস্করণে বিজয় গুপ্তের মাতাপিতৃপরিচয়জ্ঞাপক "সনাতন-তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত" ছত্রটি নাই। ইহাও অনুধাবনযোগ্য।

বিজয় গুপ্তের নামে যে মনসামঙ্গল ছাপা হইয়াছে তাহার মধ্যে সেনগুপ্ত-সংস্করণই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। ইহাতেও প্রক্ষেপ আছে, কেননা বইটি-ই প্রাচীন মালমশলা লইয়া আধুনিক কালে নির্মিত। তবে অন্য সংস্করণে যতবার এবং যে-পরিমাণে ঘষামাজা ও রদবদল হইয়াছে সেনগুপ্ত-সংস্করণে তেমন হয় নাই। সেইজন্য সেনগুপ্ত-সংস্করণ অবলম্বন করিয়া রচনাটির আলোচনা করিতেছি।

গোড়ার দিকে কাহিনী আগাগোড়া উত্তরবঙ্গের রীতি অনুযায়ী নয়। পুষ্পবাড়ীর কথা আছে, কিন্তু সে শিবের নয় চণ্ডীর। শিব ও চণ্ডীর বিবাহ-কাণ্ড নাই। চণ্ডীর ডোমনী-রূপ ধারণ মনসার জন্মের পরে। চণ্ডীর বিরহে শিবের ঘাম হইয়াছিল। সেই ঘাম শিব কাপড়ে মুছিয়াছিলেন। তাহাতে নেতার জন্ম। বস্ত্রমধ্যে জন্ম বলিয়া "শিব-বাক্যে নেতা স্বর্গরজকিনী হৈল"। আর "পদ্মার দাসী হৈল নেতা অষ্টাবক্র-শাপেতে"। ফুলের সাজি যাহাতে মনসা লুকাইয়াছিল তাহা শিব সরাসরি গৃহে লইয়া যাইতে সাহসী হন নাই।

[১] সেনগুপ্ত-সংস্করণে "স্বপ্নকথা"।

[২] ভূমিকায় প্রকাশক লিখিয়াছেন,

"বয়সের হিসাবেও বিজয়গুপ্ত অনেকেরই পূর্ববর্তী সুতরাং প্রাচীন। তবে সুদীর্ঘকাল এই গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন জিলায় সাধারণ লেখকের লেখনীতে পরিচালিত হওয়াতে, এইক্ষণে অকৃত্রিম অর্থাৎ কবির আদি ও অবিকৃত পাঁচালী সংগ্রহ করা সুকঠিন। আমরা কবি বিজয়গুপ্তের স্বগ্রামবাসী, সুতরাং অকৃত্রিম রচনা সংগ্রহে আমাদের বহুবিধ সুযোগ এবং সুবিধা থাকিলেও আমরা যে তাহার অমিশ্রিত গ্রন্থ প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছি একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি না। তবে কবির নিজ গ্রামে এবং নিজ জিলাতে যে সকল পুথি প্রচলিত আছে তাহাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বিবেচনায় আমরা তদবলম্বনেই এই মনসামঙ্গল গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম।

"মনসার ভাসান, পাঁচালী বা রয়ানী বিশেষতঃ তদন্তর্গত বেহুলা এবং লক্ষীন্দরের অপূর্ব কাহিনী সমগ্র বঙ্গদেশ এবং আসাম প্রদেশের প্রায় ঘরে ঘরেই গীত হয়। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকই এই গ্রন্থের বিশেষ পক্ষপাতী; কোন প্রকারে অক্ষরপরিচয় হইলেই মহিলারা এইগ্রন্থ অতি যত্ন ও আগ্রহের সহিত পাঠ করেন।"

বচাইয়ের ঘরে সাজি রাখিয়া তিনি মণিকর্ণিকায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। বচাই সাজি হাতড়াইয়া মনসাকে পাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল তাহার পিতা বুঝি তাহার জন্য পাত্রী আনিয়াছে। বিবাহের তোড়জোড় দেখিয়া মনসা নিজমূর্তি ধরিয়া বচাইকে বিষমূর্ছিত করিয়া দিল। শিব আসিয়া বচাইকে বাঁচাইয়া দিলেন এই সর্তে যে তাহারা মনসার পূজা করিবে। মনসার বরে বচাই চাষা-রাজা হইল।

মনসা আবার সাজির মধ্যে ঢুকিলে শিব সাজি লইয়া বাড়ি আসিলেন। তাহার পর যাহা হইবার হইল। চণ্ডী মনসাকে বাঁধিয়া মারিতে লাগিল। এখানে কোন্দল মেয়েলি ছড়া-গানে।

চণ্ডী তোমার এইতো রূপ দেখে গো
ভাল সে শিব আমার দেশে নাহি আসে গো।
ওগো সতীন গো শশুরের বাড়িতে তোমার ভেঙ্গে দিব মাথা গো॥

মনসা আর নাহি ব'ল মন্দ সতাই গণেশ আমার ভাই গো
সতাই গো আমি এলেম বাপের বাড়ী নায়র গো॥

চণ্ডী ভাল এইতো খোপার ঘটা দেখে গো
শিব আমার দেশে নাহি আসে গো।
সতীন গো তোমার বামচক্ষু করে দিব কানা॥

মনসা আর মন্দ না বইল সতাই
কার্তিক আমার গর্ভের ভাই গো।
আমি এলেম ভাইয়ের নায়র গো॥

চণ্ডী তোমার এই দন্তপাতি দেখে গো
ভাল সে শিব আমার দেশে নাহি আসে গো।
শশুরের বাড়িতে তোমার ভেঙ্গে দিব মাথা॥

মনসা মের[১] না মের না মাগো
আমার বন্ধন জ্বালায় প্রাণ যায় গো
মের না মের না মাগো ধরি তোমার পায় গো
তোমার প্রহারে মাগো আমার প্রাণ যায়।

এমন সময় গঙ্গা আসিয়া বলিল, "মা ব'লে যে ডাকে তারে মার কি কারণ"। তখন চণ্ডী গঙ্গাকে লইয়া পড়িল।

চণ্ডী ওগো গঙ্গা তোরে আমি ভালমতে জানি
তোরে আনিতে ভাগীরথে সুমেরু ঠেকিল মাথে
ঐরাবত মাগিল স্তুতি॥

---

[১] এমন পদ অত্যন্ত আধুনিক কালে শিক্ষিত ব্যক্তির সংশোধন বা সংযোজন। আঞ্চলিক ভাষায় হওয়া উচিত ছিল "মার‍্য", "নায়্যা", "বায়্যা, "তর‍্যা", "কর‍্যা"।

গঙ্গা ওগো ওগো ওগো চণ্ডী
আশ্বিন মাস এলে পরে নরলোকে পূজা করে
প্রথমেতে যাও হাড়ির বাড়ী
তারা শূয়র দেয় বলিদান পাছে দেয় গুয়াপান
বড় তুষ্ট তাহে হও তুমি ॥

চণ্ডী ওগো ওগো গঙ্গা গঙ্গা গো
সকল কাল যায় ভাল শ্রাবণেতে তোর যৌবন কাল
ভাদ্র মাসে নাম ধর বুড়ী ॥

গঙ্গা ওগো ওগো চণ্ডী চণ্ডী গো
আশ্বিন মাসের দিনে বাপ ভাইয়ের সনে
এক সঙ্গে গায় গো নবমী ।

চণ্ডী ওগো ওগো গঙ্গা গঙ্গা গো
কত শত শত নেয়ে বুকে যায় তোর ডিঙ্গা বেয়ে
তার মধ্যে গাবরে গায় সারী ॥

গঙ্গা ওগো ওগো চণ্ডী চণ্ডী গো
অশেষ পাতক করে মোর জলে যায় ত'রে
সকল্লেরি করি গো উপায় ।

ভনিতা ওগো ফুলশ্রীনগরে ঘর বিজয়গুপ্ত কবিবর
মাগো দয়া ক'রে রেখো রাঙ্গা পায় ॥

চণ্ডী মনসার বামচক্ষু কানা করিয়া দিলে মনসা তাহাকে বিষঘাত হানিল। শেষে বাঁচাইয়া দিলে মিটমাট হইয়া গেল। মনসা কৈলাসে বাপের ঘরেই স্থিতি করিল। মনসাকে যৌবনারূঢ় দেখিয়া শিব বিবাহ দিলেন জরৎকারুর সঙ্গে। চণ্ডীর চক্রান্তে বিবাহরাত্রিতেই স্বামীস্ত্রীর মনান্তর ঘটিল। মনসা মুনিকে মারিয়া ফেলিয়া পরে জীয়াইল। যাইবার আগে পত্নীকে আট পুত্র লাভের বর দিয়া জরৎকারু তপস্যায় চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া মনসা কাঁদিতে লাগিল। তখন মুনি মনসার নাভিতে হাত দিয়া মন্ত্র জপ করিয়া বলিল, তোমার গর্ভে এখনি পুত্র জন্মাইবে এবং "এই পুত্র হতে হবে বিপদ উদ্ধার"। এইভাবে অষ্ট নাগের ও আস্তীকের উৎপত্তি। ভূমিষ্ঠ হইয়াই আস্তীক তপস্যায় চলিয়া গেল মাতাকে এই সান্ত্বনা দিয়া,—"তখনই আসিব যখন করিবে স্মরণ।"

অষ্ট নাগ প্রসব করিয়া মনসা বিপদে পড়িল, স্তনে এত দুগ্ধ কোথায়। শিব বলিলেন, ভয় নাই। "অষ্ট নাগের তরে সাগর ভরিয়া দিব দুধে"। অষ্ট নাগ দুধ খাইয়া বাঁচিল কিন্তু তাহাদের মুখের বিষে সাগর বিষাক্ত হইয়া গেল।

সে বিষ পান করিয়া শিব অচেতন হইলে মনসা তাঁহাকে বাঁচাইল। এদিকে চণ্ডীর পরিত্যক্ত গর্ভপিণ্ড জলের সঙ্গে উদরস্থ করিয়া সুরভি গাভী গর্ভবতী হইয়া বৎস মনোরথকে প্রসব করিয়াছে। সুরভি তাহার জন্য সাগর দুধে ভরিয়া দিল। টিয়া পাখির মুখ হইতে তেঁতুল পড়িয়া সেই দুধ জমিয়া গেল। তখন দেবাসুর মিলিয়া সমুদ্রমন্থন করিল। যে সুধা উঠিল তাহা দেবতারাই ভাগ করিয়া লইল। শিব বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন।

বলবান অষ্ট নাগ-পুত্র লইয়া মনসা কৈলাসে নির্বিবাদে বাস করিতে পারিল না। চণ্ডীর বিবাদে মনসাকে বনবাস দিতে হইল। তাহার সঙ্গে নেতাকে দেওয়া হইল। বনবাসের স্থান "জয়ন্তী"।[১] সেখানে বিশ্বকর্মা পুরী নির্মাণ করিয়া দিল। সেখানে

অপার মহিমা দেবী জগতের মাতা
সম্মুখে দাঁড়ায় ধামু[২] বাম পাশে নেতা।[৩]

তাহার পর রাখালদের পূজা সংক্ষেপে বর্ণিত। রাখালেরা জুয়া খেলিতেছিল। তাহাদের দলপতি লাটিক চণ্ডাল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের (ব্রাহ্মণীর?) রূপ ধরিয়া মনসা তাঁহাদের কাছে গিয়া মনসা-ঘট দিয়া পূজা করিতে বলিল। পূজা করিয়া তাহারা অভীষ্ট বর লাভ করিল। অতঃপর আবার রাখালদের পূজা, তবে অতি সংক্ষেপে। এ কাহিনী বিপ্রদাসে যেমন, তেমনি বর্ণিত।

তাহার পর "হাসনহাটি-সংবাদ" বা হাসন-হোসেন পালা। ইহাও বিপ্রদাসের বর্ণনার অনুযায়ী। (এই অংশ শিরোরত্ন-সংস্করণেও আছে, তবে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বর্জিত। তাহার কারণ সহজেই বোঝা যায়।) পরবর্তী কাহিনীগুলিও যথাসম্ভব বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ের অনুযায়ী। (তবে মুসলমান চাষী-ভক্তের ইঙ্গিতমাত্র নাই!)

রচনায় মাঝে মাঝে গান আছে। তাহার অধিকাংশ ভনিতাহীন। কতকগুলিতে ভনিতা আছে—"বিজয়", "বিজয় গুপ্ত", "বৈদ্য বিজয় গুপ্ত"। একটি গানে পাই "দ্বিজ রামপ্রসাদ"। অন্যত্র হয় ভনিতা নাই, নয় বিজয় গুপ্তের ভনিতা। বার দুইয়েক "কবি চন্দ্রপতি"র এবং একবার "শ্রীপুরুষোত্তম"-এর।[৪] কোন কোন স্থানে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভনিতা প্রক্ষিপ্ত। যেমন

---

১ জয়ন্তিয়া পাহাড়? ২ বিপ্রদাসের কাব্যে ধামাই।

৩ আগে পাওয়া গিয়াছে—"ডাইনে সুগন্ধা দেবী বামে বসে নেতা" (পৃ ৪৬)। সুগন্ধার উল্লেখ আছে বিদ্যাপতির ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণীতে। সুগন্ধার সঙ্গে গন্ধেশ্বরী তুলনীয়।

৪ পৃ ৮৫-১০২।

বিজয় গুপ্ত বলে গাইন মন দেও কাজে।[১]
বিজয় গুপ্ত রচিল সংক্ষেপে[২]

বিজয় গুপ্ত বলে সবে কার্যে দেও চিত
বকসিস কাপড় দেওয়া গাইনে উচিত।[৩]

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল আমাদের কাছে যেভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা যে নিতান্ত আধুনিক কালের যোজনা তাহা দেখাইবার জন্য আরও কয়েকটি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।

যত গালি পাড়িলেক চান্দ অধিকারী
পুস্তক বাহুল্য ভয়ে লিখিতে না পারি।[৪]

ইন্দ্রালয়ে খেলা কর্ত্তে কল্লেম প্রস্থান[৫]

শিবের বোলে দ্বারবান্ চলি গেল বেগে[৬]

যাঁহাদের কণ্ঠে ও লেখনীতে প্রকাশিত রচনাটি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহারা মূল রচনার অর্থ সব সময় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। একটি মজার উদাহরণ দিতেছি। লখিন্দর-বেহুলার ডিঙ্গা গৃহাভিমুখে উজানে চলিয়াছে।

বাঁকে বাঁকে ডিঙ্গা পবনগতি যায়
শালবনের রাজ্য গিয়া ততক্ষণে পায়।[৭]

আসলে ছিল শালবানের (অর্থাৎ শালবাহনের) রাজ্য। "শালবান" অপরিচিত শব্দ, সহজেই তাহা পরিচিত রূপ লইল "শালবন"। তখন যোগ করা হইল শালবনের বর্ণনা!

অতিবড় শালবন জুড়িছে পাতে পাতে
মনুষ্যের গতি নাই সাত দিবসের পথে।

বিজয় গুপ্তের কাব্যের প্রচলিত সংস্করণে আত্মকথা-অংশে মনসার উক্তিতে "কানা" হরি দত্তের উল্লেখ আছে। মনসা বলিতেছেন, প্রথমে হরি দত্ত আমার গীত রচনা করিয়াছিল, কিন্তু সে মূর্খের রচনা, আমার মনঃপূত নয়, এবং তাও লুপ্তপ্রায়।

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।
হরিদত্তের গীত যত লোপ পাইল কালে···

কিন্তু শিরোরত্ন ও সেনগুপ্ত সংস্করণে এ কয়ছত্র পাওয়া যায় না।

---

[১] পৃ ৪০। [২] পৃ ৩৬৮। [৩] পৃ ৩৬৯। [৪] ১০৫। [৫] পৃ ১২০।
[৬] পৃ ৩৪৯। [৭] পৃ ৩৭৬।

কানা হরি দত্তের উল্লেখ রহিয়াছে "শ্রীপুরুষোত্তম"-ভনিতাযুক্ত নাচাড়ি পদে।

কানা হরিদত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়
তার অনুবন্ধে নাচারির ছন্দে
শ্রীপুরুষোত্তমে-গায়।[১]

এখানে "অনুবন্ধ" যদি নির্বন্ধ বোঝায় তাহা হইলে হরি দত্ত পুরুষোত্তমের সুহৃদ অথবা স্নেহভাজন ব্যক্তি। আর যদি অনুসার বোঝায় তবে পূর্ববর্তী কবি। কিন্তু পূর্ববর্তী কবিকে পরবর্তী কবি কি করিয়া বলেন, "মনসা হউক সহায়"!

হরি দত্তের ভনিতায় কালিকাপুরাণের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে।[২] "বৈদ্য (শ্রী) হরিদাস" ভনিতায় মনসামঙ্গলের একটি খণ্ডিত পুথি মিলিয়াছে।[৩] দুইটি পুথিই অষ্টাদশ শতাব্দের শেষকালের আগে লেখা হয় নাই। হরি দাস ও হরি দত্ত যদি একই ব্যক্তি হন তাহা হইলে ইহার পুরা নাম হরিদাস দত্ত। তাহা হইলে কালিকাপুরাণ মনসামঙ্গলের পূর্বাংশ হইতে পারে।

এই হরিদাস-হরিদত্ত পুরুষোত্তম-উল্লিখিত "কানা" হরি দত্ত হইতে বাধা নাই। তবে ইহার কাল যে অষ্টাদশ শতাব্দের আগে হইবে এমন মনে করিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই॥

---

১ পৃ ৩২৮। ২ গ ৪৯৭১। ৩ গ ৩৬০২

দশম পরিচ্ছেদ

ষোড়শ শতাব্দের প্রত্যূষ ও প্রভাত এবং সভা-সাহিত্য

১

পঞ্চদশ শতাব্দের উপক্রমে মিথিলায় বাঙ্গালায় এবং উড়িষ্যায় সাহিত্য-সংস্কৃতির নবজাগরণ সূচিত হইয়াছিল। রাজসভাকে আশ্রয় করিয়াই তখনকার ভদ্র সাহিত্যস্পৃহা প্রকাশোন্মুখ ছিল। মিথিলায় ইহা সর্বাগ্রে এবং সর্বাধিক স্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছিল। (তাহার কারণ সে রাজসভায় বরাবর শিক্ষিত রাজা ও রানী অধিষ্ঠিত।) উড়িষ্যায় একটু বিলম্বে এবং কিছু ক্ষীণভাবে দেখা দিয়াছিল। যদিও সে দেশ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ছিল তবুও সেখানে দেশি ভাষায় সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ ছিল না। উড়িষ্যার সংস্কৃতি ও শিল্পবোধ প্রধানত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হইয়াছিল। কাব্য-নাটকের বেলায় সংস্কৃতের সরণি সর্বদা উন্মুক্ত ছিল। মুসলমান-অধিকার না থাকায় উড়িষ্যায় তখন সংস্কৃত বিদ্যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না এবং শাসনকার্যে (ও রাজসভায়) দেশি ভাষায় (এবং সংস্কৃতের) একচ্ছত্রতা ব্যাহত হয় নাই। এখানে একথা অবশ্যই স্মরণ করিব যে পূর্বপ্রান্তীয় প্রদেশ তিনটির মধ্যে শুধু উড়িষ্যাতেই রাজকার্যে দেশি ভাষার ব্যবহার সর্বাগ্রে পাওয়া যাইতেছে। অন্য প্রদেশে তাম্রশাসনে ও দলিলে যখন সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত তখন উড়িষ্যায় উড়িয়া চলিতেছে।

বাঙ্গালা দেশে ইলিয়াস-শাহী সুলতানের সভায় হিন্দু কর্মচারীদের (ও সামন্তদের) ক্ষমতা বেশ বাড়িয়াছিল। দনুজমর্দন-গণেশ ও তাঁহার পুত্রের রাজ্যকালে সে ক্ষমতা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সুলতানদের রাজ্যকালেও সে ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। হোসেন-শাহার সময়ের পূর্ব হইতেই কিছুদিনের জন্য হিন্দু কর্মচারীদের প্রভাব কিছু বাড়িয়াছিল।[১] তবে তাঁহার রাজ্যকালের শেষের দিকে, সুবুদ্ধি মিশ্র, সনাতন ও রূপের বৈরাগ্য গ্রহণের পর হইতে, রাজসভায় হিন্দুপ্রভাব কমিতে থাকে। তবুও যতদিন হোসেন-শাহার বংশ রাজ্যাধিকারে ছিল ততদিন সে প্রভাব নির্মূল হয় নাই। আফগানদের ক্ষণস্থায়ী রাজ্যকালে

---

[১] চৈতন্যের কিশোর বয়সে নবদ্বীপে জোর গুজব রটিয়াছিল যে অচিরে গৌড়-সিংহাসনে ব্রাহ্মণ রাজা বসিবে।

কিছু গোলমাল হইয়াছিল। দেশের কৃষি ও রাজস্ব ব্যবস্থায় কিছু বিপর্যয় হইয়াছিল, ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। তাহার পর মোগল অধিকারের পর বাঙ্গালী সত্যসত্যই রাষ্ট্রীয় এবং আর্থিক স্বাধীনতা হারাইল। সে পরের কথা।

স্বাধীন সুলতানদের আমলে ব্রাহ্মণশাসিত উচ্চবর্ণের সমাজ ধীরে ধীরে আপনাকে গুছাইয়া লইতেছিল। বৃহস্পতি 'স্মৃতিরত্নহার' রচনা করিলেন। আরও কেহ কেহ স্মৃতি লিখিলেন। জাতিভেদের গণ্ডীর প্রসার বাড়াইয়া শূদ্রের মধ্যে "সৎ" "অ-সৎ" বিচারপূর্বক বিবিধ কম্পার্টমেণ্টে ভাগ করিয়া হিন্দুর "ছত্রিশ জাতি" মানিয়া লওয়া হইল। সব জাতির পক্ষেই "সংস্কার" ব্যবস্থা করা হইল। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে বিভেদ ছিল সে বিভেদ আচার-নিষ্ঠার দিকে কঠিনতর হইতে লাগিল বটে কিন্তু লোকব্যবহারে, সাধারণ জীবনে, সে বিভেদ নূতন করিয়া মনান্তর সৃষ্টি করে নাই। "যবনে ব্রাহ্মণে বাদ যুগে যুগে আছে"—একথা অস্বীকার না করিয়াও হিন্দু স্মার্তপণ্ডিত ও মুসলমান কাজী গ্রাম-সুবাদে পরস্পর আত্মীয়তার স্নেহসম্পর্ক ও সৌহার্দ্য রাখিতে কোন অসুবিধা বোধ করে নাই। আমুয়া মুলুকের কাজী চৈতন্যকে যে কথা বলিয়াছিল তাহা এই প্রসঙ্গে মূল্যবান্।

নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় মোর নানা
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।

রাজসভাশ্রিত উচ্চতর সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক আপোস কিছু হইয়াছিল। ইহার পিছনে দরবেশ-ফকীরদেরও প্রভাব ছিল। এবং সেই সূত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে সুফীভাবের কিছু ছাপ পড়িয়াছিল বলিয়া মনে করি॥

২

পঞ্চদশ শতাব্দে বাঙ্গালা দেশের আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় উন্নত হইয়াছিল। বহির্বাণিজ্য বোধ করি তখন বাঙ্গালী হিন্দুর হস্তচ্যুত, কিন্তু অন্তর্বাণিজ্য পুরাপুরি তাহার হাতে ছিল। বাণিজ্যের প্রধান সরণি ছিল ভাগীরথী, তাই সেকালের সমৃদ্ধিও ভাগীরথীর কূলে কূলে সঞ্চিত হইতেছিল। পাটনা (মধ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের "উত্তর-পাটন") হইতে সপ্তগ্রাম ও বেতড় পর্যন্ত এবং সমুদ্রপথে চাটিগাঁ হইতে মগরা-ছত্রভোগ এবং উড়িষ্যা-ত্রৈলঙ্গের উপকূল ("দক্ষিণ পাটন") পর্যন্ত

বাঙ্গালী বণিকের বাণিজ্য চলিত।[১] গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলের সমৃদ্ধিশালিতার জন্যই সেখানে লোকের ভিড় বাড়িতেছিল। নবদ্বীপ পূর্ব ও উত্তরপূর্ব বঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের কেন্দ্র ছিল বলিয়াই সেখানে পঞ্চদশ শতাব্দে চাটিগাঁ ও সিলেট প্রভৃতি স্থান হইতে ধনী ও সংস্কৃতিমান্ ব্যক্তিদের অনেকে উঠিয়া আসিয়া বাস করিয়াছিল। ইহার পিছনে স্থানীয় রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় থাকাও সম্ভব। উত্তরপূর্ব বঙ্গে কোচ-আহোমদের অভিযান এবং চাটিগাঁয় আরাকানিদের আক্রমণ অনুমান করিতে পারি। কোন কোন অঞ্চলে মুসলমান-অভিযানও ঘটিয়াছিল।

গৌড়-দরবার হইতে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকিরণ ঘটিয়াছিল পূর্ব দিকে,—চাটিগাঁ-আরাকানে বাণিজ্য ও রাষ্ট্রিক অভিযান সূত্রে, ত্রিপুরা-সিলেটে (আর চাটিগাঁয়েও) রাষ্ট্রিক অভিযান ও ধর্মপ্রচার সূত্রে, এবং কামতা-কামরূপে কেবল সাংস্কৃতিক প্রবাহ সূত্রে। এই সব অঞ্চলের রাজা-সামন্ত-শাসনকর্তারা গৌড়-দরবারের রীতি যথাসাধ্য অনুকরণ করিতেন। ইহাদের পোষকতায় মধ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ভদ্র (অর্থাৎ পুরাণকাহিনীময়) কাব্যগুলি রচিত হইতে পারিয়াছিল এবং গ্রাম্য সাহিত্যেরও ভদ্রসাজে সাজিবার সুযোগ হইয়াছিল।

গৌড়-সুলতানদের মধ্যে কেহ কেহ যথাসম্ভব সাহিত্যপ্রিয় ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা যে প্রত্যক্ষভাবে কোন দেশীয় কবিকে উৎসাহিত করিতেন এমন কথা বলা যায় না। তবে যেখানে কবি গান লিখিতেন (এবং গান করিতেন) সেখানে আলাদা কথা। হোসেন-শাহা এবং তাঁহার উত্তরপুরুষ হয়ত গান ভালোবাসিতেন। তাই দুই একজন বাঙ্গালী কবি তাঁহাদের রচনায় সুলতানের নাম ব্যবহার করিয়াছেন। এইভাবে আমরা হোসেন-শাহার, নসরৎ-শাহার ও গিয়াসুদ্দীন মামুদ-শাহার নাম পাই। হোসেন-শাহার বংশে শেষ সুলতান ফীরুজ-শাহা অল্প কয়েক মাসের জন্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি যে যুবরাজ অবস্থায়ও কবি-পোষক ছিলেন তাহা "কবিরাজ" শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ভনিতা হইতে জানা যায়।

নৃপতি নসির-শাহা-তনয় সুন্দর
সর্বকলানলিনীভোগিত মধুকর।
রাজা শ্রীপেরোজ-শাহা বিনোদ সুজান
দ্বিজ ছিরিধর কবিরাজ পরমাণ॥

[১] মধ্য বাঙ্গালা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের নায়কদের বাণিজ্যযাত্রায় গঙ্গার ও শাখানদীর তীরে যেসব স্থানের উল্লেখ আছে সেগুলি প্রায় সবই বিস্মৃত অতীতে একদা বাণিজ্য-বন্দর ছিল। টলেমি ও পেরিপ্লুস যে Portalis বন্দরের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই কি মধ্য বাঙ্গালা সাহিত্যে "পুরথল (>পুরথন)" বলিয়া উল্লিখিত? এস্থান এখন নবদ্বীপের পাশে পূর্বস্থলী।

পুরাণের বাহিরে প্রণয়রসাত্মক কাহিনী-কাব্য বাঙ্গালায় এইভাবে গৌড়-দরবারের ছায়ামণ্ডপে প্রথম উঁকি দিয়াছিল।

৩

প্রথম হইতেই দেশীয় সাহিত্য দুই খাতে প্রবাহিত। এক খাতে, আবহমান লোক-সাহিত্যের ধারা। এ ধারার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না। এ প্রবাহ প্রাচীন কাল হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছিল বৃহৎ সাধারণ-জনসমাজের আদৃত ও পুষ্ট নাটগান-আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া, ভদ্র লোকসমাদরের ছায়ামণ্ডপের বাহিরে। অপভ্রংশ-অবহট্টে এ প্রবাহের বেগ অনুভূত হইয়াছিল, আধুনিক ভাষার সাহিত্যেও ক্রমে ক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে। মঙ্গল-গানে পাঞ্চালীতে ইহারই পরিচ্ছন্ন রূপ প্রকটিত।

দ্বিতীয় খাতে প্রবাহ গোড়ায় ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। এ ছিল শিক্ষিত ব্যক্তির অনুশীলিত সাহিত্য। এ প্রবাহের উৎপত্তি সংস্কৃতে এবং পুষ্টি সংস্কৃতশিক্ষিতের দ্বারা, ধর্মারামের অথবা রাজসভার আশ্রয়ে। পূর্বভারতে তুর্কী অভিযানের প্রাক্‌কালে রাজসভায় যে-সাহিত্যের বহমান হইয়াছিল তাহার বস্তু পুরাণ হইতে নেওয়া এবং তাহার নির্মাণরীতি সংস্কৃত-সাহিত্যের ছায়াবহ। তুর্কী আক্রমণে স্বাধীন রাজসভা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এই দ্বিতীয় প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয়। তাহার পর দিল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হইয়া আবার যখন দেশের রাজ-দরবার হিন্দু সামন্ত-সেনাপতি-মন্ত্রীদের সহযোগে জাঁকাইয়া উঠিল তখন হইতে ধীরে ধীরে লোকলোচনে সে প্রবাহের পুনরাবির্ভাব ঘটিতে লাগিল।

বাঙ্গালা দেশের উত্তরপূর্বে পূর্বে ও পূর্ব-দক্ষিণে পার্বত্য অঞ্চলে ও উপত্যকা-ভূমিতে প্রধানত তিব্বত-চীনীয় (ভোটবর্মী) গোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত ছিল। অনেক দিন হইতেই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে বাঙ্গালা ভাষা ও ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি সেখানে ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দে এই অঞ্চলের কোন কোন রাজবংশ অল্পাধিক পরিমাণে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি ও বাঙ্গালা ভাষা স্বীকার করিয়া লয়। আরাকানের কথা আগে বলিয়াছি। কিন্তু আরাকান অনেকটা দূর ও বিচ্ছিন্ন ছিল বলিয়া সেখানে সাহিত্যের আসর জমিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু ত্রিপুরায় ও কাছাড়ের রাজসভায় বাঙ্গালা সংস্কৃতি জমিয়া উঠিতে বেশি দেরি হয় নাই। কোচবিহারের রাজসভায় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবাহ বাঙ্গালা ও কামরূপ এই দুই দিক হইতে আসিয়াছিল

বলিয়া এবং বাঙ্গালার পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশের সঙ্গে যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল বলিয়া সেখানে সাহিত্যের চর্চা আধুনিক কাল পর্যন্ত ধারাবাহী হইয়াছে।

ত্রিপুরায় ও কাছাড়ে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা খুব বেশি হয় নাই এবং —সেই কারণেই কি ?—সেখানে বাঙ্গালা ভাষার মর্যাদা শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। এমন কি কামতা-কামরূপের রাজসভায় সংস্কৃত-শাস্ত্রীদের প্রভাব এবং সংস্কৃত-চর্চার প্রসার ক্রমশ বাড়িলেও রাজ্যের সমস্ত কাজে এমন কি বিদেশি রাজার সহিত পত্রব্যবহারে এবং বিদেশি শক্তির সহিত সন্ধি ও চুক্তি পত্রে বাঙ্গালা ভাষারই ব্যবহার হইত। এখানে ফারসী তেমন আমল পায় নাই। কাজকর্মে বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম এবং ব্যাপক ব্যবহার যোড়শ শতাব্দ হইতে ত্রিপুরা-কাছাড়-কামতা অঞ্চলেই পাইতেছি॥

৪

রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই প্রাচীন মহাকাব্য-কাহিনী ভারতীয় সাহিত্যের দুই পাদস্তম্ভ। দুইটিরই কাহিনী বাঙ্গালায় রচিত হইয়াছিল একাধিক কবির দ্বারা। কিন্তু তাহার মধ্যে তফাৎ আছে। বাঙ্গালায় রামায়ণ গেয় পাঞ্চালী কাব্য, মহাভারত "পাঞ্চালী" ছাপ পাইলেও একান্তভাবে পাঠ্য কাব্য। রামায়ণ-গান আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল, সুতরাং কবিরা সকলেই ব্রাহ্মণ। ভারত পাঁচালী পাঠ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল না, তাই কবিরা সাধারণত কায়স্থ, দৈবাৎ ব্রাহ্মণ, কদাচিৎ অন্য জাতি।

রাজসভায় পুরাণ-পাঠ প্রাচীন রীতি। পুরাণ বলিতে প্রধানত মহাভারত। পালবংশের অন্যতম শেষ রাজা মদনপাল বৌদ্ধ হইলেও তাঁহার মহিষী চিত্রমতিকা নিয়মপূর্বক মহাভারত-পাঠ শুনিতেন। রাজসভায় পুরাণ-পাঠকারীদের পদবী দাঁড়াইয়া গিয়াছিল "পাঠক" (অথবা "ব্যাস")। পাঠান সুলতানদের দরবারে মহাভারত-পাঠের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ছিল না কিন্তু সামন্ত রাজাদের ও হিন্দু জমিদার ও রাজমন্ত্রীদের সভায় অবশ্যই ছিল।[১] আশ্চর্যের বিষয় বাঙ্গালায় লেখা প্রথম যে মহাভারত-কাহিনী পাইতেছি তাহা এক মুসলমান সেনাপতি-শাসনকর্তার অভিপ্রায়ে তাঁহারই সভাকবির রচনা। মনে হয় ত্রিপুরা-কাছাড় রাজসভা হইতেই ইহার প্রেরণা আসিয়াছিল। এই সেনাপতি ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন

১ এখনকার দিনে শুধু শ্রাদ্ধ-সভায় অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে মহাভারত (বিরাট পর্ব) পাঠ হয়। এ রীতির কোন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য আছে কিনা বলিতে পারি না। মনে হয় প্রাচীন কালে রাজসভায় পুরাণ-পাঠেরই জের হিসাবে আসিয়াছে।

এবং তাঁহার পুত্র ত্রিপুরার রাজাকে সন্ধি করিতে বাধ্য করিয়াছিল। হয়ত ত্রিপুরা-বিজয়ের সময়ে তিনি এই মহাভারত-রচয়িতার সখ্য লাভ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় যিনি এই প্রথম মহাভারত-কাহিনী লিখিয়াছিলেন তাঁহার নাম পরমেশ্বর দাস। ইনি নিজেকে "কবীন্দ্র" বলিয়াছেন। ইনি চাটিগ্রামের শাসনকর্তা হোসেন-শাহার সেনাপতি পরাগল খানের নির্দেশে রচনা-কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইটুকু ছাড়া কবি নিজের সম্বন্ধে বিশেষ আর কোন খবর দেন নাই।

পরাগল নাম ইতিহাসে নাই, অন্যত্রও পাওয়া যায় না। আরবী বা ফারসী ভাষা-মতে নামটির অর্থ অথবা ব্যুৎপত্তিও পাওয়া যায় না। নামটি যদি অন্-আর্য ভাষার শব্দ না হয় তবে কষ্টকল্পনায় ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে,—শত্রুর আগল। যাই হোক এটি "গুণরাজ খান", "যশোরাজ খান" ইত্যাদির মতো উপাধিস্থানীয় নামান্তর হওয়া সম্ভব। পরাগল যে মুসলমান ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার পিতার নাম রাস্তি খান।[১] কেহ কেহ মনে করেন রাস্তি খান অথবা তাঁহার পিতা হিন্দু ছিলেন, পদবী "রুদ্র"। পরমেশ্বরের রচনায় পরাগল "রুদ্রবংশ-রত্নাকর" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, ইহাও এখানে মনে করিতে হয়। পরাগল মুসলমান বলিয়াই পরমেশ্বর মহাভারতের কোন কোন অংশ বাদ দিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রাচীন পুথি হইতে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতেছি। মহাভারতে দ্রোণপর্বের শেষে রুদ্রস্তব আছে। সে প্রসঙ্গে পরমেশ্বর লিখিয়াছেন

> রুদ্রস্তব নাম এহি ত্রিভুবনখ্যাত
> তাহাকে শুনিলে খণ্ডে বহু উৎপাত।
> বড় উপযুক্ত নহে তোহ্মাতে কহিতে
> না লিখিল তাহাকে পয়ার রচিতে।
> লস্কর পরাগল গুণের সাগর
> অবতার-কল্পতরু ভবানীশঙ্কর।...[২]

সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগে চাটিগাঁয়ের কবি মোহাম্মদ খান তাঁহার 'মক্তুল হোসেন' কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন[৩] তাহাতে তাঁহার ঊর্ধ্বতন পুরুষের মধ্যে এই তিন পুরুষেরও নাম আছে,—রাস্তি খান, তৎপুত্র মিনা খান,

১ "রাস্তিখান-তনয় বহুল গুণনিধি" (১৬১০ শকাব্দের পুথি; সা-প-প ২৪ পৃ ১৬৬।) সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক-শাহার রাজাকালে ১৪৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে রাস্তি খান চাটিগ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন মজলিস-ই আলার আদেশে (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ২১৪-১৫ দ্রষ্টব্য)।

২ স ৫৩৪ ক।

৩ আহমদ্ শরীফ সম্পাদিত, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংকলিত 'পুথি-পরিচিতি' (বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮) পৃ ৪০৩ দ্রষ্টব্য।

তৎপুত্র গাভুর খান। রাস্তি খানকে বলা হইয়াছে চাটিগ্রামের অধিপতি, মিনা খানের "কীর্তি গৌড়দেশ ভরি", আর গাভুর খান ত্রিপুরা-বিজেতা। এখানে গাভুর খান নিশ্চয়ই পরাগলের প্রিয়পুত্র যাহাকে কবি অশ্বমেধ পর্বে "ছুটি (অর্থাৎ ছোট) খান" বলিয়াছেন। তাহা হইলে পরাগলই মিনা খান।

একটি প্রাচীন পুথিতে সভাপর্বের শেষে ও বনপর্বের গোড়ায় সংস্কৃতে একটি পরাগল-প্রশস্তি শ্লোক আছে।[১] এমন শ্লোক আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। পাঠ খুব অশুদ্ধ। যথাসম্ভব শুদ্ধ করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি।

> [যস্] তারুণ্যগুণার্পিতাহৃতমতিঃ সঙ্গীতবিদ্যাপতিঃ
> নানাকাব্যবিলাসকৌতুকমতিঃ সিদ্ধান্তবাচস্পতিঃ।
> নিত্যং ধর্মসুনিশ্চিতমতিঃ জাংহানডিম্বী (?)-পতিঃ
> [শ্রীমৎ] খান-পরাগলঃ স জীবতু[২] ক্ষৌণীন্দ্রসেনাপতিঃ॥

শ্লোকটি নিশ্চয়ই পরমেশ্বরের রচনা। ইনি যে সংস্কৃত ভালো করিয়াই জানিতেন তাহার পরিচয় তাঁহার বাঙ্গালা রচনায়ও আছে।

কাব্যরচনার উপলক্ষ্য পরমেশ্বর এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন

> শ্রীযুত পরাগল খান মহামতি
> পঞ্চম গৌড়েত যার বিখ্যাত খেয়াতি।
> নৃপতি হুষণ সাহা গৌড়ের ঈশ্বর
> তার এক সেনাপতি হয়ন্ত লস্কর।…
> আইলেন্ত চাটিগ্রামে হরষিত হৈয়া
> পুত্রে পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি
> পুরাণ শুনন্ত নিত্য হরষিত মতি।
> সংস্কৃত মহাশ্লোক শ্রুতি গুরুতর…
> কুতূহল বহুল ভারত-কথা শুনি
> কেমতে পাণ্ডবে হারাইল রাজ্যখানি।
> বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
> কোন কোন কর্ম কৈল বনের ভিতর…
> কেমত পৌরসে পাইল নিজ বসুমতী।
> এহি সব কথা কহ সংক্ষেপ করিয়া
> দিনেকে[৩] শুনিতে পারি পাচালি বলিয়া।[৪]

পরমেশ্বরের কাব্য বড় রচনা, এক দিনে শুনিবার মতো নয়। এক দিনে

---

[১] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি। লিপিকাল ১০৮০-৮১ সাল। ভনিতা গোড়ার দিকে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের, শেষের দিকে সঞ্জয়ের। শ্রীমান্ মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ শ্লোকটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

[২] পাঠ "খান শ্রীপরাগল সচিবক"।

[৩] পাঠান্তর "একদিনে"। [৪] বর্ধমান সাহিত্যসভার পুথি (৪৩৪ক)। লিপি ও কাগজ দেখিয়া এই প্রায়-সম্পূর্ণ খণ্ডিত পুথিটিকে প্রাচীনতম বলিয়া মনে হয়।

যদি অল্প দিনে এই অর্থ না বহন করে তবে বুঝিতে হইবে পরমেশ্বরের মূল রচনা অনেক ছোট ছিল। (নূতন পুথি-প্রমাণ আবিষ্কৃত না হইলে ইহার মীমাংসা হইবে না।) পরমেশ্বরের কাব্যের পুথি দুর্লভ নয়।[১] পশ্চিমবঙ্গে এবং উড়িষ্যায়ও পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইহা কাব্যটির প্রাচীনত্বের পরিপোষক। পরাগলের আদেশে লেখা এই 'পাণ্ডববিজয়' পাঞ্চালীর কথা আমাদের প্রথম শুনাইয়াছিলেন উমেশচন্দ্র বটব্যাল।[২] ইহার দুইটি পৃথক্ সংস্করণ ছাপা হইয়াছে।[৩] মূল রচনা অপ্রকাশিত।

পরমেশ্বর সমগ্র মহাভারত-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন কিনা নিশ্চয়ভাবে বলা যায় না। গৌরীনাথ শাস্ত্রীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণে আছস্ত "কবীন্দ্র" ভনিতা। কিন্তু এটিতে পরমেশ্বরের রচনার খাঁটি রূপ নাই। নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিজয়পাণ্ডব কথা' ভনিতা-বর্জিত। প্রাপ্ত অধিকাংশ পুথিতে সর্বত্র ভনিতা নাই, কোথাও কোথাও বা অন্য ভনিতা মিশিয়া গিয়াছে। অশ্বমেধ-পর্বে কোথাও পরমেশ্বর বা কবীন্দ্র ভনিতা নাই। তাই অনেকে মনে করেন যে পরমেশ্বর অশ্বমেধ-পর্ব লিখেন নাই এবং এই পর্বও পরাগল নহে, তাঁহার পুত্র লিখাইয়াছিলেন।[৪]

ডকৃটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ কেহ কেহ প্রথম সন্দেহ জাগাইয়াছিলেন যে

---

[১] যেমন গ ৪৯৭৭ (লিপিকাল ১৫৬৮ শক); গ ৪০৪৪ ও ৪১২৪ (একই মূল পুথির দুই অংশ; লিপিকাল ১৬২৭ শক); গ ৪২৫৬ (লিপিকাল ১১৩৪ সাল); গ ১৬৯ (লিপিকাল ১৬৩২ শক); প [illegible]৭ (লিপিকাল ১৭৯৬); স ৫৩৪; স ৫৩৪ ক; শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় সং[illegible] [illegible]থি (লিপিকাল ১৬২৬ শক)।

[illegible]হিত্য মাঘ ও ফাল্গুন ১৩০২ দ্রষ্টব্য। পুথি বগুড়ার, ১১৬১ সালে নকল করা।

[illegible]কটি পুথি (মুর্শিদাবাদের, লিপিকাল ১১৫০ সাল) নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া বঙ্গী[illegible]হিত্য পরিষৎ হইতে 'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত' নামে প্রকাশিত (১৩১২)। দ্বিতীয়টি ধৃ[illegible]ঞ্চলের পুথি, গৌরীনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত ও রাজা প্রভাতকুমার বড়ুয়ার সাহায্যে '[illegible]হাভারত' নামে প্রকাশিত (১৯৩১)।

[illegible]াগে আমিও মনে করিতাম যে পরাগলের পুত্র "ছুটি-খান" এর আদেশে অশ্বমেধ-পর্ব [illegible]য়াছিল। কিন্তু আদেশদাতা বলিয়া কোথাও ছুটি-খানের উল্লেখ নাই।

[illegible]কর নন্দী" ভনিতাযুক্ত অশ্বমেধ-পর্ব সাধারণত পরমেশ্বরের চিহ্নিত রচনার সঙ্গেই পাওয়া [illegible]এই পুথিগুলি মূল্যবান্,—গ ৪১২৪ (লিপিকাল ১৬২৭ শক); গ ৩৭১০ (১১৮৭ সাল); [illegible]; ক ৬১০৫। ১৫৭৫ (অথবা ১৫৮৫) ও ১৬৮৪ শকের দুইখানি পুথি অবলম্বনে [illegible]দ্র সেন 'শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধ-পর্ব' সম্পাদন করিয়াছিলেন (১৩১২ সালে সাহিত্যপরিষৎ [illegible]প্রকাশিত)।

[illegible]কর নন্দী" নামের মূল্যবান্ পাঠান্তর পাওয়া যায় "শ্রীকরণ নন্দী"। শ্রীকর নাম পঞ্চদশ-ষোড়শ [illegible] প্রচলিত ছিল। শ্রীকরণ নাম কোথাও পাওয়া যায় নাই। "শ্রীকরণ" মানে "করণ" [illegible] কায়স্থ-জাতীয়)।

পরমেশ্বর ও শ্রীকর একই ব্যক্তি। দুই ভনিতার কাব্যেই পরাগল ও তাঁহার পুত্র সম্বন্ধে একইরকম প্রশস্তি আছে এবং দুই জনেই পিতাপুত্রের প্রিয়পাত্র ছিলেন। এ সন্দেহ অমূলক নয়। মনে হয় "শ্রীকর(ণ) নন্দী" নাম নয়, পরাগলেরই জাতি ও পদবী। "শ্রীকরণ" মানে কায়স্থ বা করণ জাতি। "নন্দী" এই জাতির অন্যতম পদবী। জৈমিনীয়-সংহিতা হইতে অশ্বমেধ-পর্ব রচনা সর্বাগ্রে হইয়াছিল। তখনও কবি "কবীন্দ্র" হন নাই। তাই তত্র সে ভনিতা নাই। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে আপাত মনে হইতে পারে যে জৈমিনীয়-সংহিতা অবলম্বনে পৃথকভাবে অশ্বমেধপর্ব-কথা কহিবার জন্য পরাগল খান স্বতন্ত্র নির্দেশ দিয়াছিলেন।

পণ্ডিতে মণ্ডিত সভা খান মহামতি
একদিন বসি আছে বান্ধব-সংহতি।
শুনিল ভারত পোথা অতি পুণ্যকথা
মহামুনি জৈমিনির পুরাণ-সংহিতা।
অশ্বমেধ-কথা শুনি প্রসন্নহৃদয়
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়।
ব্যাসগীত-ভারত শুনিল চারুতর
তাহাত কহিল জৈমিনি মুনিবর।
সংস্কৃত ভারত না বুঝে সর্বজন
মোর নিবেদন কিছু শুন কবিগণ।
দেশী ভাষে এই কথা করিয়া প্রচার
সঞ্চরউ কীর্তি মোর জগৎ-ভিতর।
তাহার আদেশমালা মাথে আরোপিয়া
শ্রীকর নন্দীএ কহে পাঞ্চালী রচিয়া॥

পরাগলের প্রিয় পুত্র এবং পিতার জীবদ্দশায় তাঁহারই মতো হোসেন-শাহার সেনাপতি ছোট খাঁ ("ছুটি-খান", মোহাম্মদ খান উল্লিখিত "গাভুর খান") নামে পরিচিত ছিলেন।[১] ইঁহার আসল নাম নসরৎ খান।[২] "পরমেশ্বর" ভনিতাযুক্ত রচনায় ছুটি-খানের যথেষ্ট প্রশংসা আছে। মনে হয় ইঁহার সঙ্গে ছুটি-খানের বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। অশ্বমেধ-পর্বে আছে

খান পরাগল-সুত পিতৃভক্ত অতি
বাপের সংহতি সে নৃপতি সেনাপতি।

---

[১] অন্যত্র পরমেশ্বর-ভনিতায় আছে "প্রিয় পুত্র যাহার বিখ্যাত ছুটি-খান, পঞ্চম গৌড়ের মধ্যে তাহার সম্মান।" (স ৫৩৪ কখ)। "খান পরাগল-সুত দানে কল্পতরু, পিতার দুর্লভ বড় গুরুভক্তি চারু।" (গ ৩৭১০, পৃ ১৩৯)।

[২] "লস্কর পরাগল খানের তনয়, শুনিয়া যজ্ঞের কথা সরস হৃদয়। ছুটি-খান নাম নসরত মহামতি, পশ্চাতে কি হৈল হেন বুঝিল ভারতী। শ্রীকর নন্দীএ কহে শুনিয়া সংহিতা, জয়মুনি কহিলেক ভারতের কথা॥" (গ ৪১২৪ পৃ ৩০৪ খ)।

চিরকাল জীবন্ত লস্কর ছুটি-খান
যাহার লভিয়া সে প্রেম-সন্নিধান।
শ্রীকর নন্দীএ যে পয়ার রচিল
জৈমিনি কহিলেক যেহেন দেখিল।[১]

পিতা যাহা করিতে পারেন নাই পুত্র সেই কাজ, ত্রিপুরা-বিজয়, করিয়াছিলেন। সেইজন্য হোসেন-শাহার দরবারে ছুটি-খানের বেশি খাতির হইয়াছিল। অশ্বমেধ-পর্বে এবং অন্যত্র প্রায় একইভাবে পোষ্টা পিতাপুত্রের কীর্তি বিঘোষিত। পরমেশ্বর দাস লিখিয়াছেন

ভূপতি হোসেন-শাহা হয় মহামতি
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম খেয়াতি।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ প্রতাপে[২] অপার
কলিযুগে[৩] ভেল[৪] [যেন] কৃষ্ণ[৫] অবতার।...
সুলতান হোসেন-শাহা পঞ্চ গৌড়নাথ
ত্রিপুরার দ্বার সমর্পিল যার হাথ।
সোনার পালঙ্কি[৬] দিল আর এক[৭] ঘোড়া
সম্ভোগ সহিতে[৮] দিল লস্করি[৯] কাপড়া।

"শ্রীকর নন্দী" লিখিয়াছেন

লস্কর পরাগল খানের তনয়
সমরে নির্ভয়ে ছুটি-খান মহাশয়...
তাহার যতেক গুণ শুনিয়া নরপ্রতি
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতুহল-মতি।
নৃপতি অগ্রেতে তার বহুত সম্মান
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটি-খান।
ত্রিপুর-নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ
পর্বতগহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ।
গজ বাজী কর দিয়া করিল সম্মান
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্মাণ।[১০]
যদ্যপি অভয় দিল খান মহামতি
তথাপি আতঙ্কে থাকে ত্রিপুর-নৃপতি।
আপন নৃপতি সন্তর্পিয়া সবিশেষে
সুখে বৈসে লস্কর আপনার দেশে।

অশ্বমেধ-পর্বে যৌবনাশ্ব অনুশাল্ব নীলধ্বজ-জনা চণ্ডিকা সুধন্বা সুরথ হংসধ্বজ প্রমীলা-অর্জুন বভ্রুবাহন তাম্রধ্বজ ও চন্দ্রহাস আখ্যানগুলি বর্ণিত হইয়াছে॥

---

[১] গ ৪১২৪। [২] পাঠান্তর "মহিমা" [৩] ঐ "প্রভু", হরি"। [৪] ঐ "হৈলা", "হৈল", "হৈব"। [৫] ঐ "বামন"। [৬] পাঠ "পালঙ্ক"। [৭] পাঠান্তর "একশত"। [৮] ঐ "রাঙ্গা কঞ্চুক"। [৯] ঐ "বিবিধ"।

[১০] ত্রিপুরার পুরাতন রাজধানী বোধ হয় ছুটি-খানের আক্রমণেই বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

৫

পশ্চিমবঙ্গে লেখা প্রথম মহাভারত-কাহিনী রামচন্দ্র খানের অশ্বমেধপর্ব জৈমিনীয়-সংহিতার মর্মানুবাদ। রচনাটির তিনখানি পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[১] দুইটি পুথিতে রচনার তারিখ আছে কিন্তু পাঠ অতিশয় ভ্রান্ত।[২] পাঠ শুদ্ধ করিলে তারিখ পাই "ইন্দু বেদ ইষু যুগ" (অর্থাৎ ১৪৫৪ শক =১৫৩২-৩৩) অথবা "ইন্দু বেদ মুনি যুগ" (অর্থাৎ ১৪৭৪=১৫৫২-৫৩)।[৩] প্রথম তারিখটিই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ নিম্নে দ্রষ্টব্য।

প্রথম ও তৃতীয় পুথির শেষে কিছু আত্মপরিচয় রহিয়াছে। তবে তাহাতে বাসভূমি ও মাতৃনাম ছাড়া আর কোন মিল নাই। প্রথম পুথির পাঠ অনুসারে কবির জাতি কায়স্থ, নিবাস রাঢ়দেশে দণ্ড-সিমলিয়া-ডাঙ্গা গ্রামে, পিতার নাম কাশীনাথ। তৃতীয় পুথির মতে জাতি ব্রাহ্মণ, নিবাস জঙ্গীপুর, পিতার নাম মধুসূদন। জঙ্গীপুর উত্তররাঢ়ে। তিন পুথির মতেই কবির গুরু বাস করিতেন মধ্যরাঢ়ে গঙ্গার নিকটে কঙ্কগ্রামে।

> কঙ্কগ্রাম স্থান আছে[৪] মধ্যরাঢ়া দেশে
> গঙ্গার নিকটে গুরু সর্বকাল বৈসে।
> সেই গুরুপ্রসাদে মোর ধর্মে হৈল মন
> অশ্বমেধ-কথা কহোঁ শমনদমন।...
>
> রাঢ়া দেশে বসতি আছয়ে পুণ্যস্থানে
> দণ্ডসিমলিয়া ডাঙ্গা সর্বলোকে জানে।[৫]

---

[১] দুইখানি উত্তরবঙ্গের পুথি। একখানির লিপিকাল ১১৩৭ সাল (=১৭৩০-৩১)। প্রদীপ ১৩১০ পৃ ৩৮৪-৮৭ দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয়খানি মালদহ অঞ্চলের (লিপিকাল ১২৫৭ সাল) ডক্টর শ্রীমান্ আশুতোষ দাসের সংগ্রহ। তৃতীয়খানি পশ্চিমবঙ্গের পুথি (ক ৬১২৩), লিপিকাল ১৭৬৮। এই পুথির পুষ্পিকা —"তারিখ ১১ পৌষ রোজ শুক্রবার তিথি পূর্ণিমা চন্দ্রগ্রহণ দিনে এক প্রহরের মধ্যে পুস্তক সমাপ্ত। শকাব্দা ১৬৯০—রাম পাল তথা শ্রীশান্তিরাম কোঙর সাং বিনসরা পরগনে পাণ্ডুয়া চাকলা বর্দ্ধমান কোঙরের সাকিম নওয়াড়া পরগনে [রাণীহাটী ? চাকলা] বর্দ্ধমান ও পুস্তক পাঠার্থে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ঠাকুরের।... এ পুস্তক মোকাম পাঁচগেছ্যা নবাবগঞ্জে লেখা যাইল...সমাপ্ত হয়।..." বিশ্বভারতীর সংগ্রহে একটি 'পাণ্ডববিজয়' পুথি আছে। তাহাতে শুধু সভাপর্বে "দ্বিজ রামচন্দ্র" ভনিতা পাই।

[২] প্রথম পুথির পাঠ, "ইতি জৈমিনিভারতকথা সপ্তদশ শাকেন্দু বেদমুনিষে যুগান্তে পুরাণ"। তৃতীয় পুথির পাঠ, "জৈমিনি ভাগবতাঙ্গ সপ্তদশ শাকেন্দু বেদদানে নিধেয়ঃ।" "সপ্তদশ" ভুল পাঠ। "সমাপন" হইবে।

[৩] "যুগ" অর্থে "দুই" ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে ১৪৫২ ও ১৪৭২ শক হইবে।

[৪] প্রথম পুথির পাঠ "কঙ্কুগ্রাম স্থান"; দ্বিতীয় পুথিতে "কঙ্কগ্রাম নামে ছিল", তৃতীয় পুথিতে "কঙ্কপানি নামে"।

[৫] দ্বিতীয় পুথির পাঠ, "স্বদেশে বসতি ভাগীরথী পুণ্যস্থানে, জঙ্গিপুর সহর নাম সর্বলোকে জানে।"

কায়েত[১] কুলেতে জন্ম লস্কর[২] পদ্ধতি
কাশীনাথ[৩] জনক জননী পুণ্যবতী।
গুরুর কৃপাতে কি ভাল হৈল মন
রামচন্দ্র খান কৈল পঞ্চালী[৪] রচন।
সপ্তদশ-পর্ব কথা সব শ্লোক[৫]-বন্ধ
মূর্খ বুঝাইতে কৈল পরাকৃত-ছন্দ।

ভনিতা হইতে বোঝা যায় কবি ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন।

জন্মজন্মান্তরে ভক্তি রহু নারায়ণে
অশ্বমেধ-কথা কহে রামচন্দ্র খানে।

সকল সংসার মিথ্যা সত্য চক্রপাণি
রামচন্দ্র খানে কহে অমৃত-কাহিনী।

সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া চৈতন্য যখন নীলাচলে যাইতেছিলেন তখন তাঁহাকে নির্বিঘ্নে গৌড়-উৎকল সীমান্ত পার করাইয়া দিয়াছিলেন স্থানীয় ফৌজদার ("লস্কর") জমিদার রামচন্দ্র খান। ছত্রভোগে চৈতন্য ইহাকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।[৬] মনে হয় পরে ইনি নিত্যানন্দ-বিদ্বেষী হইয়াছিলেন।[৭] কবি রামচন্দ্র খানও "লস্কর" (অর্থাৎ সেনাপতি বা ফৌজদার) ছিলেন। বৃন্দাবন দাসের কথায়, "এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ-রাজ্যেতে।"

বর্ণনাময় রচনা। মধ্যে মধ্যে সরসতার পরিচয় আছে। যেমন যৌবনাশ্ব, বাঙ্গালী-সংসারের উপযুক্ত পুত্রের মতো, তাহার মাতাকে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ দেখিতে যাইতে বলিতেছে।

গঙ্গাস্নান করিবে মাতা হবে বড় ধর্ম
গোবিন্দ দেখিবে মাতা হবে বড় কর্ম।

মাতার উত্তরও সংসারাসক্ত হিসাবী বাঙ্গালী-গৃহিণীর মতোই।

বুড়ি বোলে কিবা কার্য গোবিন্দ সেবিঞা
কিবা কার্য গঙ্গাস্নানে যজ্ঞস্থানে গিঞা।
ধর্মকার্যে গৃহকার্য সব নষ্ট হৈব
ধান্য গোধূম শস্য কেবা সম্বরিব।
দধি দুগ্ধ ঘৃত তৈল সব নষ্ট হৈব
দাসীগণ বধূগণ সব ভ্রষ্ট হৈব।
সকল সম্পদ যাবে কথায় মন দেহ
না পারেঁ। যাইতে পুতা আর না বলিহ।

---

[১] ঐ "ব্রাহ্মণ"।
[২] প্রথম পুথির পাঠ "দণ্ডত"।
[৩] দ্বিতীয় পুথির পাঠ "মধুসূদন"।
[৪] ঐ "কবিত্ব"।
[৫] পাঠান্তরে "সংস্কৃতে"।
[৬] চৈতন্যভাগবত ৩-২। [৭] ঐ।

৬

"দ্বিজ" রঘুনাথের অশ্বমেধ-পাঁচালীর একটি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে।[১] কাব্য রচনা করিয়া কবি তাহা উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের সভায় পড়িয়াছিলেন।

উৎকলে যত রাজা না কৈল যেই কর্ম
শ্রীযুত মুকুন্দদেব সাধিল সেই ধর্ম।
মুকুন্দ রাজার গুণ শুনিঞাঁ শ্রবণে
বাঢ়িল বিনোদ বড় শ্রবণনয়নে।

রাজার কাছে গিয়া রঘুনাথ এই আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন

শ্রীরঘুনাথ বিপ্রকুলে উৎপত্তি
আইলুঁ তোমার দেশে গুণ শুনি অতি।
চিরকাল রাজ্য কর উৎকলের মাঝে
পাঞ্চালী রচিয়া আইলুঁ তোমার সমাজে।
অশ্বমেধ-পাঞ্চালী সে করিঞা কৌতুকে
আজ্ঞা দেহ আহ্মি পঢ়ি তোমার সভাতে।

রাজা হৃষ্ট হইয়া "আজ্ঞা দিল ব্রাহ্মণকে পাঞ্চালী পড়িতে"।

রঘুনাথ একস্থানে ভনিতায় মুকুন্দদেবের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "চিরদিন রাজ্য করি হইল অকল্যাণ"। ইহা বোধ হয় ১৫৬৭-৬৮ খ্রীস্টাব্দে সুলেমান খান কর্‌রানী কর্তৃক উড়িষ্যা-বিজয়ের পূর্ববর্তী কোন ঘটনা নির্দেশ করিতেছে।[২] ইহার অল্পকাল পরে কালাপাহাড়ের সঙ্গে যুদ্ধে মুকুন্দদেব নিহত হন। অতএব রঘুনাথের রচনার কাল ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি হওয়া সম্ভব।

পুথি প্রাচীন বলিয়া ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ আছে। পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক অন্যান্য মহাভারত-কাব্যের মতো রঘুনাথের অশ্বমেধ-পাঁচালী কাশীরাম দাসের মহাভারত-সাগরে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়॥

৭

কামতা-কামরূপে বাঙ্গালা-সংস্কৃতি আদৃত হইয়াছিল বিশ্বসিংহের (১৫২২-৫৪) রাজসভায়। "বিশু কোঁচ" নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতা বলে স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তুলিয়া বিশ্বসিংহ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। ইহার অনেক মহিষী এবং বহু

---

[১] সা-প-প ৫ পৃ ১৩৮-১৪৪। পুথি মালদহ অঞ্চলের এবং প্রাচীন, লিপিকাল ১৬২৪ খ্রীস্টাব্দ। পুষ্পিকা—"ইতি শ্রীমহাভারতে পঞ্চালিকাপ্রবন্ধে শ্রীরঘুনাথকৃতৌ ;অশ্বমেধপর্ব্বং সমাপ্তেতি। শ্রীরস্তু শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৪৬ শকে ১০৩১ সাল। তারিখ ১৩ মাহ শ্রাবণ। কৃষ্ণদশম্যাং তিথৌ বেলা প্রহর তিন উপরান্ত। রোজ সোমবার। ফতেয়পুর গ্রামনিবাসীয় শ্রীগৌরীদাস সাহ পুস্তকমিতি।" ইত্যাদি।

[২] কর্‌রানী কর্তৃক উড়িষ্যা অধিকারের অল্প কিছুকাল আগে মুকুন্দদেব কোটসামা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সন্তান। কোন কোন পুত্রকে তিনি গৌড়ে ও কাশীতে পাঠাইয়া সংস্কৃতে শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিশ্বসিংহের ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের পোষকতায় কামতা-কামরূপে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সংস্কৃত-বিদ্যাচর্চায় এবং বাঙ্গালায় পুরাণকথার অনুবাদে কামতা-কামরূপের রাজসভার প্রচেষ্টা খুব উল্লেখযোগ্য। বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণের আশ্রয় পাইয়া শঙ্করদেব শেষ জীবনে গ্রন্থরচনা ও ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়া কামরূপ-আসামকে মহিমান্বিত করিতে পারিয়াছিলেন।

বিশ্বসিংহের রাজসভার আওতায় আমরা একজন লেখককে পাইতেছি পুরাণ-কাহিনী অবলম্বনে যাঁহার লেখা দুইটি পৌরাণিক রচনা পাওয়া গিয়াছে এবং আরও দুইটির সন্ধান মিলিয়াছে। একটিতে ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বনে উষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী বিবৃত,[১] অপরটিতে মহাভারত অবলম্বনে নলদময়ন্তী উপাখ্যান বর্ণিত।[২] রচনাকাল প্রথমটির ১৪৫৫ অথবা ১৪৫৬ শকাব্দ (=১৫৩৩ অথবা ১৫৩৪), দ্বিতীয়টির ১৪৬৬ শকাব্দ (=১৫৪৪)।

> উষাপরিণয়-গীত হৈল সমাপতি।
> বাণ যুত বাণ বেদ শশাঙ্ক[৩] প্রমিত
> বৈশাখ মাসর[৪] শুক্ল পক্ষ পঞ্চমীত।
> রস ঋতু বেদ চন্দ্র শকের প্রমাণে
> কহে পীতাম্বর নারায়ণ-পরসনে ॥[৫]

কবি পীতাম্বর ব্রাহ্মণ ছিলেন না।[৫] পুরাণ লইয়া গ্রন্থ লিখিতেছেন, ইহা অব্রাহ্মণের পক্ষে অনধিকার মনে হইবে এই আশঙ্কায় তিনি নিজেকে "শিশু" (অর্থাৎ অবোধ) বলিয়াছেন। আর বার বার বলিয়াছেন

> ব্রাহ্মণের মুখে শুনি কথা[৬] পুণ্যবতী
> পয়ারপ্রবন্ধে রচোঁ হেন কৈল মতি।
> নহোঁ আমি পণ্ডিত [না করোঁ] অহঙ্কার
> বুদ্ধির স্বভাবে হের রচিলোঁ পয়ার।[৭]

---

[১] 'উষা-পরিণয়' নামে শ্রীমহেশ্বর নেওগ সম্পাদিত ও গোলাঘাট হইতে বড়ুয়া ব্রাদার্স প্রকাশিত (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭৭ শক)। [২] স ৫৩৮। পুথি আদ্যন্ত খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান উত্তরবঙ্গ।

[৩] পাঠান্তর "রস বাণ বেদ চন্দ্র শশাঙ্ক"।

[৪] অসমিয়া রূপ, "মাসের" স্থানে।

[৫] "দময়ন্তী-চরিত্র যেবা শুনে নিত্য আপদ খণ্ডে ততক্ষণে।
বহুত সম্প্রতি হরিপদে গতি দান পীতাম্বর ভণে ॥" (স ৫৩৮)।

[৬] পাঠ "সব"। [৭] স ৫৩৮ পৃ ৪৭ খ।

হেন মধুমত্ত কথা কহে ধীরজনে
শুনি পীতাম্বরে হেন গুণে মনে মনে।
শ্লোকবন্ধে ব্যক্ত কথা ব্যাস ঋষি মুখে
রচিলোঁ পাঞ্চালী যেন বুঝে সর্বলোকে।[১]

পীতাম্বর বৈষ্ণব এবং ভক্ত ছিলেন। ইহার পোষ্টা ছিলেন বিশ্বসিংহের পুত্র সমরসিংহ। এই সমরসিংহের আদেশে পীতাম্বর মার্কণ্ডেয়-পুরাণ কাহিনী বাঙ্গালায় লিখিয়াছিলেন।[২]

কামতা নগরে বিশ্বসিংহ নরেশ্বর
প্রতাপে প্রচণ্ড রাজা ভোগে পুরন্দর।
তাহার তনয় সে সমরসিংহ নাম
মহামায়া-চরণে ভকতি অনুপাম।
মহাপুণ্য কথা তার আজ্ঞা পরমাণে
পয়ারপ্রবন্ধে শিশু পীতাম্বরে ভণে॥

যুবরাজ সমরসিংহ একদিন সভামধ্যে বসিয়া কবিকে এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন[৩]

পুরাণাদি শাস্ত্রে যেহি রহস্য আছয়
পণ্ডিতে বুঝয় মাত্র অন্যে না বুঝয়।
এ কারণ শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার
নিজ দেশভাষা-বন্ধে রচিয়ো পয়ার।

তাহার পর কাব্যরচনারম্ভ কাল,

বেদ পক্ষ বাণ আর শশাঙ্ক শকত
আরম্ভ করিলোঁ মার্কণ্ডেয়-কথা যত।[৪]

"বেদ পক্ষ বাণ শশাঙ্ক" হয় ১৫২৪ শকাব্দ (=১৬০২)। এ পাঠ ঠিক নয় কেননা বিশ্বসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল ১৪৭৬ শকাব্দে। সম্ভবত প্রকৃত পাঠ হইবে "পক্ষ বাণ বেদ আর শশাঙ্ক শকত"। তাহা হইলে পাই ১৪৫২ শকাব্দ (=১৫৩০)।

---

[১] নেওগ সংস্করণ পৃ ২।

[২] কোচবিহার-দরবারে সংগৃহীত পুথি (তালিকায় সংখ্যা ১১৯)। কোচবিহার-দর্পণের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন গুপ্ত মহাশয়ের সৌজন্যে এই পুথির সন্ধান পাইয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকারের রচিত প্রবন্ধ 'কামতাবিহারী সাহিত্য' দ্রষ্টব্য (উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনে তৃতীয় অধিবেশনের কার্যবিবরণী প্রথম ভাগ পৃ ১২১, দ্বিতীয় ভাগ পৃ ১০৪)।

[৩] "মহারাজ বিশ্বসিংহ কামতা নগরে, তার পুত্র ভোগে তুল্য নহে পুরন্দরে।
একদিন সভামাঝে বসিয়া যুবরাজ, মনে আলোচিয়া হেন করিলেন্ত কাজ।"

[৪] পত্র ১-২।

পীতাম্বরের অনূদিত ভাগবতের দশমস্কন্ধের দুইখানি পুথি কোচবিহার দরবার লাইব্রেরীতে সংগৃহীত আছে।[১] এ রচনা সম্বন্ধে কিছু জানা নাই। উষা-অনিরুদ্ধ কাব্য ইহারই অংশ হইতে পারে।

বহুপুত্রবান্ বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পরে সমরসিংহের কোন উদ্দেশ পাই না। 'দরঙ্গরাজবংশাবলী'র মতে বিশ্বসিংহের পরে রাজা হইয়াছিলেন নরসিংহ। তাঁহাকে হটাইয়া দিয়া সিংহাসন অধিকার করেন নরনারায়ণ। তাঁহার ছোট ভাই শুক্লধ্বজ ইহাকে একাজে সাহায্য করিয়াছিলেন। শুক্লধ্বজের আসল নাম (অথবা নামান্তর) ছিল সংগ্রামসিংহ। সমর ও সংগ্রাম সমার্থক শব্দ, এবং প্রায় সমান ওজনের। শুক্লধ্বজ পুরাণশ্রবণে ও কবিপোষণে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তিনিই সমরসিংহ হইতে পারেন। তাহলে বুঝিব যে পীতাম্বর "যুবরাজ" বলিতে রাজকুমার বুঝাইয়াছেন॥

৮

বিশ্বসিংহ সংস্কৃত বিদ্যার অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার দুই প্রিয়পুত্র নরনারায়ণ (মল্লদেব) ও শুক্লধ্বজকে গৌড়ে এবং কাশীতে বিদ্যা ও সহবৎ শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যাগমনের আগেই বিশ্বসিংহের মৃত্যু হয়। ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই পৈতৃক সিংহাসনের জন্য বৈমাত্র ভাই নরসিংহের সহিত যুদ্ধ করেন। নরসিংহ পরাজিত হইয়া প্রথমে মোরঙ্গে পরে নেপালে এবং শেষে কাশ্মীরে আশ্রয় লইয়াছিলেন।[২] দুই ভাইই অত্যন্ত সাহসী ও পরাক্রমী ছিলেন। নরনারায়ণ নাকি লৌহমেষের শিরচ্ছেদন করিয়াছিলেন। অতর্কিত আক্রমণে পারদর্শিতার জন্য শুক্লধ্বজ "চিলারায়" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। নরনারায়ণ রাজা হইয়া (১৫৪৪) শুক্লধ্বজকে "যুবরাজ" (অর্থাৎ দ্বিতীয় রাজা) করিয়াছিলেন। কামতা-কামরূপের প্রজারা শুক্লধ্বজকে অতিশয় মান্য করিত এবং তাঁহাকেই রাজশক্তির মূল স্তম্ভ বলিয়া ভাবিত। ইংরেজ পর্যটক রালফ্ ফিচ্ নরনারায়ণ-শুক্লধ্বজের রাজ্যকালে কোচবিহারে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, এদেশের রাজা "শুকল কোঁচ"। দুই ভাইয়ের যৌথরাজ্য অবিবাদে চলিয়াছিল। শুক্লধ্বজের মৃত্যুর পরে (১৫৭১) কামতা-কামরূপ রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিল এবং নরনারায়ণের মৃত্যুর পরে (১৫৮৭) তাহা দুই টুকরা হইয়া গেল। প্রধান ভাগ, কামতা রাজ্য, নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের

[১] পুথি সংখ্যা ১১ ও ১১৮।

[২] শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার ভুইঞা সম্পাদিত 'দরঙ্গরাজবংশাবলী' (পৃ ৫৭ হইতে) দ্রষ্টব্য।

অংশে এবং ক্ষুদ্রতর ভাগ, কামরূপ, শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেবের অংশে পড়িয়াছিল।

নরনারায়ণ (মল্লদেব বা "মালগোসাঁই") ও শুক্লধ্বজ (চিলারায় বা "শুকলগোসাঁই") সংস্কৃতবিদ্যার যথেষ্ট পোষকতা করিতেন। রাজার আদেশে রাজপুত্রদের শিক্ষার জন্য পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ 'প্রয়োগরত্নমালা' ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন (১৫৩৮)। এ ব্যাকরণ এখনও চলে। শুক্লধ্বজ নিজে (অথবা পণ্ডিতকে দিয়া) গীতগোবিন্দের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। রাজার বিদ্বৎ-প্রিয়তা সম্বন্ধে সমসাময়িক সাক্ষ্য কিছু উদ্ধৃত করি।

ধর্ম নীতি পুরাণ ভারত শাস্ত্র যত
অহোরাত্রি বিচারন্ত বসিয়া সভাত।
গৌড়ে কামরূপে যত পণ্ডিত আছিল
সবাক আনিয়া শাস্ত্র-দেওয়ান পাতিল।[১]

শুক্লধ্বজ পুরাণপ্রিয় ছিলেন। প্রধানত তাঁহারই আগ্রহে ও উৎসাহে কামতা-কামরূপের রাজসভায় পুরাণকাহিনীর অনুবাদ শুরু হইয়াছিল। এ কাজ উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছিল। শুক্লধ্বজের সভায় পুরাণ-পাঠক ও কবিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অনিরুদ্ধ। ইঁহার উপাধি "রামসরস্বতী"।[২]

অনিরুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পিতা ভীমসেন, "কবিচূড়ামণি"। বড় ভাই কবিচন্দ্র।[৩] নিবাস কামরূপে চমরিয়া (বা পাটচওরা) গ্রাম। এই পরিচয় অনিরুদ্ধের ভীষ্মপর্বে পাওয়া যায়।

কামরূপ মধ্যে গ্রাম নাহিক উপাম
তাতে গ্রাম ভৈলা চমরিয়া যার নাম।
সেই গ্রামেশ্বর ভৈলা কবিচূড়ামণি
পণ্ডিতগণের মধ্যে যাক অগ্র গণি।...

---

[১] 'বনপর্ব', দুর্গাবর বরকটকী সংগৃহীত ও জোড়হাট হইতে প্রকাশিত, পৃ ৩।

[২] পরবর্তী কালেও কামতা-কামরূপের কোন কোন রাজসভাকবি এই উপাধি পাইয়াছিলেন অথবা লইয়াছিলেন।

[৩] কোন কোন পুথির পাঠ হইতে মনে হয় যেন রামসরস্বতীর নামান্তর ও উপাধি ছিল "কবিচন্দ্র"। যেমন, "পিতৃয়ে মাতৃয়ে নাম অনিরুদ্ধ থৈলা, কবিচন্দ্র নাম মোর দেওয়ানে বুলিলা। রামসরস্বতী নাম নৃপতি দিলন্ত।" একথা সত্য হইলে জানিব "কবিচন্দ্র" রাজসভায় পদিকের উপাধি। জয়দেবকাব্য রচনার সময়ে তাঁহার বড় ভাই "কবিচন্দ্র"-পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাই সেখানে বড় ভাইকে কবিচন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ("জ্ঞানচক্ষু দিলাহ সোদর রূপ ধরি, নমো কবিচন্দ্রের চরণে আগ বাঢ়ি")।

গোবিন্দর ভক্তিত যাহার দিন গৈল
আত অনন্তরে তার দুই পুত্র ভৈল।
জ্যেষ্ঠ ভৈলা কবিচন্দ্র আতি শুদ্ধমতি
তাহান অনুজ ভৈলা রামসরস্বতী।[১]

অনিরুদ্ধের পুত্র "পাঠক" গোপীনাথ তাঁহার রচিত দ্রোণপর্বে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,

পাটচওরা[২] নামে আছে এক গ্রাম···
সেই গ্রামেশ্বর মহাদেশধর ভীমসেন দ্বিজবর···
তাহান সন্ততি রামসরস্বতী পাঠক শুক্লধ্বজর।[৩]

শুক্লধ্বজের অনুরোধে অনিরুদ্ধ "ভারত-পয়ার" রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শুক্লধ্বজের সংগ্রহে যেসব মহাভারত পুথি ছিল তাহা তিনি গোরুর গাড়ি বোঝাই করাইয়া কবির ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার সংসারযাত্রার সমস্ত ভার বহন করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে হয়ত আরও অনেক রাজা-যুবরাজা এমন মহৎ কাজ করিয়া থাকিবেন কিন্তু ইহার আগে তাহার কোন উল্লেখ মিলে নাই। বনপর্বের মধ্যে অনিরুদ্ধ এই সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন।

জয় জয় নরনারায়ণ নৃপ সার
যার কীর্তি ব্যাপিলেক সমুদ্রের পার।
শুক্লধ্বজ অনুজ যাহার যুবরাজ
পরমগহন অতি অদ্ভুত কাজ।
তেঁহে মোক বুলিলন্ত মহাহর্ষমনে
ভারত-পয়ার তুমি করিয়ো যতনে।
আমার ঘরত আছে ভারত প্রশস্ত
নিয়োক আপন গৃহে দিলোহোঁ সমস্ত।
এহা বুলি রাজা পাছে বলধি যোড়াই
পাঠাইল পুস্তক আমাসাক ঠাই।
খাইবার সকল দ্রব্য দিলন্ত অপার।
দাস-দাসী দিলা নাম করাইলা আমার।
এতেকে তাহান আজ্ঞা ধরিয়া শিরত
কৃষ্ণের যুগলপদ ধরি হৃদয়ত।
বিরচিলো পদ ইতো অতি অনুপাম
পরমসুন্দর বনপর্ব যার নাম।[৪]

---

[১] গোপালচন্দ্র বড়ুয়া ও লক্ষেশ্বর শর্মা সম্পাদিত, ডিব্রুগড় ১৯০৫, পৃ ২৬৭।

[২] পাঠ "পাটচোরা"।

[৩] লক্ষেশ্বর শর্মা সম্পাদিত, যোড়হাট ১৯০৯, পৃ ৬৩৪-৬৫। গোপীনাথের সভাপর্বের দুইখানি পুথি কোচবিহার দরবার লাইব্রেরীতে আছে (সংখ্যা ৮৪, ৮৫)।

[৪] বনপর্ব (পুষ্পহরণ, ভীমচরিত্র) পৃ ২-৩।

অনিরুদ্ধ প্রথমে বনপর্ব-উদ্যোগপর্ব-ভীষ্মপর্বের আখ্যান ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন, তাহার পরে শুক্লধ্বজের কৃত গীতগোবিন্দের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'জয়দেব' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[১] কাব্যটিতে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার পটভূমিকায় গীতগোবিন্দ-পদাবলীকে বর্ণনাময় রূপ দেওয়া হইয়াছে। কাব্যের আরম্ভে রামসরস্বতী নিজের রচনার এক তালিকা দিয়াছেন।

পূর্বত রচিলোঁ পদ অতি অনুপাম
উদ্যোগর আত্মকথা ভাগবত নাম।
ভীষ্মপর্ব নিবন্ধিলোঁ ভীষ্মর নির্বাণ
পাছে ঘোষযাত্রা বনপর্ব যার নাম।
জয়দেব নামে কাব্য বিরচিলো সার
শুক্লধ্বজ রাজা টীকা করিলন্ত যার।
নরনারায়ণ নন্দ প্রতিপ্রাণ ভাই
মহারাজ শুক্লধ্বজ যার সম নাই।
তাহান টীকাক জিজ্ঞাসিয়ো বুধজনে
যদি অর্থ না পাবা নিন্দিবা মোক মনে।

অনিরুদ্ধের ভারত-পাঁচালী প্রধানত বর্ণনামূলক। তবে মাঝে মাঝে দুই একটি পদ আছে। বনপর্ব হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। পদটিতে অকৃত্রিম ভক্তিরসের পরিচয় আছে।

নমো নন্দসুত তনু মেঘসম শ্যাম
গলে বনমালা পীতবস্ত্র অনুপাম।
কর্ণত গুঞ্জার থোপা হাতত পাঁচনি
গোপর বালক সনে করে বংশীধ্বনি।
হেনয় কৃষ্ণক দুই অরুণচরণে
মোর মন ভ্রমরে রহুক সর্বক্ষণে।
তুমি প্রভু পতিত জনর নিজ গতি
কাকুতি করিয়া মাগোঁ রামসরস্বতী॥

৯

অনিরুদ্ধের পুত্র গোপীনাথ দ্রোণপর্ব অনুবাদ[২] করিয়াছিলেন, একথা আগে উল্লেখ করিয়াছি। বিরাটপর্ব অনুবাদ করিয়াছিলেন নরনারায়ণের পুত্র কামতার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সভাকবি বিশারদ চক্রবর্তী। ইঁহার রচিত

---

[১] গীতগোবিন্দ, কালীরাম দেবশর্মা সংগৃহীত (১২৯০), পৃ ২।

[২] অনাধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় "অনুবাদ" কথাটিকে ভাবানুবাদ ও কাহিনী-অনুবাদ বলিয়া লইতে হইবে। আক্ষরিক অনুবাদ কদাচিৎ হইয়াছে। সেখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইবে।

বনপর্বের অনুবাদের পুথিরও সন্ধান মিলিয়াছিল।[১] বিরাটপর্বের রচনারম্ভকাল ১৬৬৪ শকাব্দ (=১৬১৩)।

রত্নপীঠে লক্ষ্মীনারায়ণ নৃপবর
বিহার-কামতা নাম তাহার নগর।
বিজ্ঞ বিপ্র এক সেহি নগরত বাস
বিশারদ চক্রবর্তী রচে উপন্যাস।
বিরাটপর্ব সেহি কৈল লোকরসে
বেদ বহ্নি বাণ চন্দ্র শাকে চৈত্রমাসে।
বিরাটপর্বের কথা শ্রবণরমণ
বুদ্ধি অনুসারে তাক করিব রচন।
বেদ বহ্নি বাণ চন্দ্র শাকের প্রমাণে
চৈত্র গুরুদিনে পদ বিশারদে ভণে॥

বীরনারায়ণের রাজ্যকালে (১৬২৭-৩২) গোবিন্দ কবিশেখর 'কিরাতপর্ব' রচনা করিয়াছিলেন।[২] শুক্লধ্বজের সভাসদ ভবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র রামেশ্বরের পুত্র ব্রাহ্মণ শ্রীনাথ ("দ্বিজ কবিরাজ") মহারাজা প্রাণনারায়ণের (রাজ্যকাল ১৬৩২-৬৫) নির্দেশে মহাভারত-পয়ারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার 'দ্রোণপর্ব' মোদনারায়ণের রাজ্যকালে (১৬৬৫-৮০) রচিত।[৩]

সমসাময়িক ও পরবর্তী কালে কামতা দরবারে থাকিয়া আরও অনেকে ভারত-পয়ার করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম এইখানে করিতেছি।

আদিপর্ব লিখিয়াছিলেন রুদ্রদেব ও "দ্বিজ" রঘুরাম দুইজনে মিলিয়া।[৪] সভাপর্বের পুথিতে[৫] ভনিতা আছে তিনজনের—জয়দেব, (মহারাজা) হরেন্দ্রনারায়ণ[৬] ও ব্রজসুন্দর। বনপর্ব লিখিয়াছিলেন অনেকে—কৌশারি[৭], "দ্বিজ" বলরাম[৮], বৈদ্যনাথ[৯], পরমানন্দ[১০], মহীনাথ[১১], রামবল্লভ দাস[১২], ইত্যাদি। কর্ণপর্ব মিলিতেছে লক্ষ্মীরামের[১৩] ও "বৈদ্য" পঞ্চাননের[১৪]।

---

[১] সাহিত্য ১৩১৮, পৃ ৯১৪। সা-প-প ২ পৃ ১৯৭। বিরাটপর্বের পুথির লিপিকাল ১২১৫ সাল (=১৮০৮)। বনপর্বের ১৫৫৪ শকাব্দ (= ১৬৩২)। বিরাটপর্বের একটি প্রাচীনতর পুথি দেখিয়াছি ধুবড়ীর শ্রীযুক্ত অজয়কুমার চক্রবর্তীর সংগ্রহে।

[২] কোচবিহার দরবারের পুথি, সংখ্যা ৬৫।

[৩] ঐ ৪০ (আদিপর্ব, লিপিকাল ১৭১৮ শকাব্দ), ২১ (সভাপর্ব), ৬৫ (দ্রোণপর্ব)।

[৪] ঐ ৪১। [৫] ঐ ৮৬। [৬] ইনি উনবিংশ শতাব্দের প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন।

[৭] সংখ্যা ৪৯। [৮] ঐ ৫০, ৫৮। [৯] ঐ ৫১। [১০] ঐ ৫২, ৫৩।

[১১] ঐ ৫৪। [১২] ঐ ৫৭ (ঘ) লিপিকাল ১২৩৮। শুধু নলদময়ন্তীর উপাখ্যান।

[১৩] ঐ ৭১ (লিপিকাল ১৭৭১ শকাব্দ), ৭২। [১৪] ঐ ৭৩।

শল্যপর্ব রামনন্দনের[১]। গদাপর্ব রামনন্দনের[২] ও বৈদ্যনাথের[৩]। ঐষিকপর্ব (মহারাজা) হরেন্দ্রনারায়ণের[৪]। শান্তিপর্ব "দ্বিজ" বৈদ্যনাথের[৫]। অশ্বমেধপর্ব মহীনাথ শর্মার[৬]। আশ্রমিকপর্ব "দ্বিজ" কীর্তিচন্দ্রের[৭]। প্রস্থানিকপর্ব মহীনাথের[৮] ও মাধবচন্দ্রের[৯] ॥

১০

সপ্তদশ শতাব্দের মাঝামাঝি অবধি বাঙ্গালা ও অসমিয়া ভাষার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য দেখা দেয় নাই। ষোড়শ শতাব্দে আসাম-কামরূপে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বাঙ্গালার উত্তরপূর্বী উপভাষার সঙ্গে অভিন্ন ছিল। তাই এখানে এই সাহিত্যের আলোচনা করিতেছি।

কামরূপ-আসাম অঞ্চলের পৌরাণিক রচনার সব চেয়ে পুরানো নিদর্শন মাধব কন্দলীর 'শ্রীরাম-পাঁচালী', তাহার উল্লেখ আগে করিয়াছি।[১০] মাধব কন্দলী লঙ্কাকাণ্ড অবধি লিখিয়াছিলেন। উত্তরকাণ্ড শঙ্করদেবের লেখা।

এই কামরূপ-সাহিত্যের গোষ্ঠীপতি শঙ্করদেব। ইনি এবং ইহার শিষ্য-সম্প্রদায় আসামের বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ ছিল। মিথিলার ও নেপাল মোরঙ্গের সাহিত্য-ঐতিহ্যের সঙ্গেও সংযোগ ছিল। তবে কামরূপে রচিত বৈষ্ণব-পদাবলীর শ্রেণীবিভাগ কিছু স্বতন্ত্র। যেমন, "কীর্তন ঘোষা"—লীলাপদ, "নামঘোষা"—ভজনপদ, "বড় গীত"—ব্রজবুলিতে অথবা বাঙ্গালা-অসমিয়াতে লেখা কৃষ্ণলীলা-পদাবলী, "ভটিমা" বা "ভট্টিমা"—প্রশস্তিপদ[১১], "গুণমালা"—কৃষ্ণলীলাক্রম-অনুসরণে দীর্ঘ পদ (নামকীর্তনের মতো)। বিশেষ অনুশীলন পাইতেছি "নাট" বা "যাত্রা" পালাগুলিতে। অন্যত্র এ ধরণের কোন রচনা পাওয়া যায় নাই। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে

---

[১] ঐ ২৪।

[২] ঐ ৬৮ [৩] ঐ ৮৯ (ক) (লিপিকাল ১৭৫৪ শকাব্দ)। [৪] ঐ ৪৪।

[৫] ঐ ৬৭ (লিপিকাল ১৭২৭ শকাব্দ)। [৬] ঐ ৪৭ (লিপিকাল ১৭৫৪ শকাব্দ)।

[৭] ঐ ৪৬। [৮] ঐ ৮৯ (ক)। [৯] ঐ ৮৯ (খ)।

[১০] মাধব কন্দলীর রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের একটি পুথির লিপিকাল ১৪২৬ শকাব্দ (=১৬০৪)। হেমচন্দ্র গোস্বামী সঙ্কলিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৩০) *Descriptive Catalogue of Assamese Manuscripts* (পৃ ১৩৯) দ্রষ্টব্য।

[১১] ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ভাটের গান। "ভাটিয়ালী" শব্দটির মূলে এই অর্থ ছিল, এখন বিশিষ্ট সুর বা গানের ঢং বোঝায়।

আলোচ্য নাটের বেশ একটু মিল দেখা যায়। তবে আগে ও পরে এই নাট-গীতপদ্ধতির অনুশীলন দেখা গিয়াছে তিরহুতে ও নেপালে।

ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী আধুনিক নওগাঁ জেলার অন্তর্গত বরদোয়া গ্রামের ভূস্বামী ছিলেন কায়স্থ রাজ্যধর দলই (অর্থাৎ "দলপতি")। তাঁহার তিন পুত্র—সূর্যবর, জয়ন্ত ও মাধব। জ্যেষ্ঠ সূর্যবর বরাহ-রাজার কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার পুত্র ছিলেন খ্যাতনামা "ভৌমিক" কুসুমবর। ইহারই পুত্র শঙ্করদেব। এই আত্মপরিচয় কবি দিয়াছেন রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে। শঙ্করদেবের জন্ম ১৪৬১ খ্রীস্টাব্দে বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ১৫৩০ সাল পর্যন্ত শঙ্কর বড়দোয়াতেই ছিলেন। তাহার পর অন্যত্র চলিয়া যান এবং ১৫৪২ সালে বড়পেটাতে আসিয়া বাস করেন। ১৫৬০ সালে ইনি কামতায় চলিয়া আসেন, এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৫৬৮) কামতা-কামরূপ-রাজার আশ্রয়েই রহিয় গিয়াছিলেন।

শঙ্করদেব চৈতন্যকে দেখিয়াছিলেন একথা সকলে স্বীকার না করিলেও একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কৃষ্ণ ভারতীর 'সন্তনির্ণয়'এর[১] মতে চৈতন্য পূর্ববঙ্গে ভ্রমণের সময়ে হাজোতে তীর্থযাত্রায় আসিয়াছিলেন। চৈতন্য চলিয়া যাইবার পরে শঙ্করদেব সেখানে আসেন এবং চৈতন্যের কথা শুনিয়া পরে পুরীতে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। চৈতন্যের হাজোতে আসা হয়ত সত্য নয় তবে পুরীতে শঙ্করদেবের আগমন ও চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার মিথ্যা না হওয়া সম্ভব।

শঙ্করের তিরোভাবের পর আসামের বৈষ্ণবেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। এক সম্প্রদায় চৈতন্যের সঙ্গে শঙ্করের কোন সম্পর্ক স্বীকার করেন না, অপর দল করেন। প্রথম সম্প্রদায় "মহাপুরুষিয়া"র নেতা ছিলেন কায়স্থ মাধবদেব। দ্বিতীয় সম্প্রদায় "দামোদরিয়া"র নেতা ছিলেন ব্রাহ্মণ দামোদরদেব। দুইজনেই শঙ্করের শিষ্য।

কামরূপে শঙ্কর বৈষ্ণব-মত প্রচার করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যের মতো তাঁহারও উপদেশ ছিল,

সকল-নিগম-লতা তার অবিনাশি ফল
কৃষ্ণনাম চৈতন্যস্বরূপ
সুমধুর সুমঙ্গল শ্রদ্ধায়ে হেলায়ে লৈ
নর মাত্র তরে ভবকূপ।

---

[১] *Descriptive Catalogue of Assamese Manuscripts* পৃ ১৫৮ দ্রষ্টব্য।

শঙ্কর ব্রাহ্মণের প্রাধান্য মানিতেন না, তাই তাঁহার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণেরা আহোম-রাজার কাছে অভিযোগ করিয়াছিল, "শূদ্র একগোটা নাম শঙ্কর আছয়, শ্রাদ্ধবিধি করিবাক লোকক না দেয়"। বেগতিক দেখিয়া শঙ্কর চলিয়া গিয়াছিলেন বড়পেটায়, কামতা-রাজ নরনারায়ণের অধিকারে। কিন্তু, দৈত্যারি পণ্ডিত লিখিয়াছেন, সেখানেও

রাজার আগত খল দিলে বিপ্রলোক।
সমস্তে রাজাক নষ্ট করিল শঙ্কর
শূদ্র হয়া নমস্কার লয়ে ব্রাহ্মণর।
কৈবর্ত কোলতা কোচ ব্রাহ্মণ সমস্ত
একলগে খায় দুধ চিড়া ফল যত।

যে কারণেই হোক নরনারায়ণ একসময়ে শঙ্করদেবের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সন্তনির্ণয়ের মতে রাজা তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন। তখন রাজাকে খুশি করিবার জন্য শঙ্কর নাকি 'গুপ্তচিন্তামণি' বই লিখিয়াছিলেন। তবে রাজাকে প্রসন্ন করিবার জন্য শঙ্কর যে একাধিক প্রশস্তি ("ভটিমা") রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। একটির কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকায় এখানে অংশত উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠান সুলতানের অভিযানে নরনারায়ণ-শুক্লধ্বজের বিজয় লাভের বর্ণনা।

হাসি সুভাষিত করোঁ বহু ধীর
মল্ল নৃপতি সম নাহিকয় বীর
কাশী বারাণসী গৌড় পর্যন্তে
মল্ল-নৃপতিক সব মহিমা কহন্তে।...
এ সব গুণ কহে পশ্চিম-মাঝে
তাহেক শুনল পাংসা সমাজে।
উমরা সবক আনিয়ে বাত বোল
এতি বেরি গাডারা-ঘাট[১] মারিয়ে তোল।...
পাঠান সকলে কহে গাডারা ঘাট মারি রাঞ্
হারাম বাম হাতে রুটীয়া খাঞ্।
যুদ্ধ লগাওল অতি বড় টানে
খেদল ছেদল পলাওল প্রাণে।
পুনরপি ওমরা সকল সব আওএ
গলায়ে পটুকা বান্ধি শরণ সোমাওএ।
মুরুখ শঙ্কর ন জানে সকল
জয় মল্ল-নৃপতিক চরণযুগল ॥[২]

---

[১] সম্ভবত ব্রহ্মপুত্রতীরে ধুবড়ী ঘাট।

[২] বড়গীত, ভটিমা ও গুণমালা, শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমাধবদেব দ্বারা রচিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, আসাম তেজপুর নিবাসী হরিবিলাস গুপ্ত দ্বারা প্রকাশিত (১৩১৩), পৃ ৭৯-৮০।

'আনন্দে আমি বলিতেছি বহু ধৈর্যে, মল্ল-নৃপতির সমান বীর কোথাও নাই। কাশী বারাণসী হইতে গৌড় পর্যন্ত মল্ল-নৃপতির মহিমা কহে।...পশ্চিম দেশে এ সব গুণ কথিত হইলে বাদশার সভায় শোনা গেল। ওমারহগণকে ডাকাইয়া (বাদশা) বলিল, এইবার গাডারা (অর্থাৎ পারাপারের ঘাট) ধ্বংস কর।...পাঠান সকলে বলিল, গাডারঘাট ধ্বংস করিয়া যাই এবং বাম হাতে নিষিদ্ধ মাংস দিয়া রুটি খাই। খুব জোরে (তাহারা) যুদ্ধ লাগাইল, (কিন্তু) খিন্ন হইয়া ছিন্ন হইয়া প্রাণ লইয়া পলাইল। তাহার পর ওমরাহ সকলে আসিল এবং গলায় কোমরবন্ধ লাগাইয়া (মল্ল-নৃপতির) শরণ লইল। মূর্খ শঙ্কর সব (বিবরণ) জানে না। মল্ল-নৃপতির চরণযুগলের জয় হোক।'

কামতা-রাজ্যের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকিয়া শঙ্কর কালগত হন ১৪৯০ শকাব্দে (=১৫৬৮)।

রামায়ণ উত্তরকাণ্ড এবং পদাবলী ছাড়া শঙ্কর ছয় সাত স্কন্ধ ভাগবত-পুরাণ অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং[১] দুইখানি তত্ত্ব-নিবন্ধ—'অনাদিপাতন'[২], 'ভক্তি-প্রদীপ'[৩] ছাড়া ছয়খানি 'নাট' রচনা করিয়াছিলেন।[৪] অনাদিপাতনে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। গরুড়-পুরাণের কৃষ্ণার্জুনসংবাদ অবলম্বনে ভক্তি-প্রদীপ রচিত। আর এক ভক্তিপ্রদীপ-রচয়িতা বিষ্ণুপুরীর প্রশিষ্য মিথিলা-নিবাসী জগদীশ মিশ্র শঙ্করদেবকে ভাগবত পড়াইয়াছিলেন।

নাটগুলিতে সেকালের সাহিত্যিক গদ্যের নিদর্শন পাইতেছি। এই গদ্যও ব্রজবুলিতে লেখা। সূত্রধার কথকের মতো সব পাত্রপাত্রীর হইয়া অভিনয় করে। গোড়াতে এই "নাট" বা "যাত্রা" পুতুল-নাচের ধরণের ছিল, পরে হয় সংস্কৃত ভাণেরই মতো। ব্রজবুলি পদ যথেষ্ট আছে। সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা কাহিনীসূত্র আগাইয়া চলিয়াছে, যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। নিম্নে রামবিজয়-নাটের পরিচয় দিতেছি। ইহা হইতে নাট-যাত্রার গঠন বোঝা যাইবে। নেপালে প্রাপ্ত পুরানো নাট-গীতের সঙ্গে ইহার সম্পর্কও বোঝা যাইবে।

প্রথমে দুইটি নান্দী-শ্লোক, রামচন্দ্রের বন্দনা। তাহার পর গীতে[৫] নাট-কাহিনীর আভাস।

---

[১] প্রথম, দ্বিতীয়, অষ্টম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ। তৃতীয় হইতে পঞ্চম অনিরুদ্ধ দাসের এবং সপ্তম ও নবম কেশব দাসের রচনা। দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম মুদ্রণ হইয়াছিল গৌহাটীতে (১৮৭৯)। কোন কোন কাহিনী পুস্তিকাকারে স্বতন্ত্রভাবে ছাপা হইয়াছিল। যেমন 'নিমি নবসিদ্ধ' (জোড়হাট ১৮৭১) ; 'রুক্মিণীহরণ' (ঐ ১৮৭২) ; 'স্যমন্তকহরণ' (ঐ ১৮৭৫)।

[২] প্রথম ছাপা কবে হইয়াছিল জানি না। দ্বিতীয় মুদ্রণ কলিকাতা পটলডাঙ্গায় (১৮৯৯)।

[৩] গ ৫৩৭৮ (লিপিকাল ১৫৬৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪৫-৪৬)।

[৪] 'কালীয়দমন', 'পত্নীদাস', 'রুক্মিণীহরণ' (প্রথম মুদ্রণ জোড়হাট ১৮৭৫), 'রাসক্রীড়া' (বা 'কেলিগোপাল'), 'পারিজাতহরণ' ও 'রামবিজয়' ('সীতাস্বয়ম্বর নাটক' নামে হরিবিলাস গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ১২৯১)।

[৫] "রাগ নান্দী সুহই। একতালী।"

জয় জগজীবন রাম
করলো পরি পরণাম।[১] ধ্রু।
ওহি ভব অপারা
যাহে স্মরণ করু পারা।[২]
অজগব[৩]-ভঞ্জনকারী
পাওল জনককুমারী।
নৃপ সব ছেদল বাণে
কৃষ্ণকিঙ্কর এহ[৪] ভাণে॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ প্রবিশ্য অলমতিবিস্তরেণ মাধবো মাধব ইত্যুক্ত্বা শ্রীরামচন্দ্রং প্রণম্য সভাসজ্জনান্ সম্বোধ্য আহ

আর্যমিশ্রাঃ শৃণ্বন্তেতৎ প্রীতিযোগসমন্বিতাঃ।
শ্রীরামবিজয়ং নাম নাটকং মুক্তিসাধকম্॥

তাহার পর একটি রামচন্দ্রের "ভটিমা" পদ। তাহার পর কাহিনীর সূত্রপাত।

সূত্রধার। ভো ভো সভাসদঃ সাধুজনবান্ধব জগতক পরমগুরু নারায়ণ ভূমিক ভারহরণ-নিমিত্তে দশরথ-গৃহে অবতরল সেহি ভগবন্ত শ্রীরাম-রূপে ওহি সভা-মধ্যে প্রবেশ করে কহো সীতাবিবাহ-বিহারনৃত্য পরম কৌতুকে করব তাহেক সাবধানে দেখহ শুনহ নিরন্তর হরি বোল হরি।

আহে সখি দেবদুন্দুভি বাজত। আঃ সে জনকনন্দিনী সীতা সখী সব সহিতে মিলল মিলল।

শ্লোক। চকার জানকী কামং প্রবেশং সসখীজনা।
চিন্তয়ন্তী রামচন্দ্র-চরণং রুচিরাননা॥

সূত্রধার। আহে সামাজিক লোক সখী মদনমঞ্জরী কনকাবতী চন্দ্রমুখী শশিপ্রভা এসব সহিতে সে জনকনন্দিনী সীতা রামক চরণ চিন্তি প্রবেশ করে আওত। তা দেখহ শুনহ নিরন্তরে হরি বোল হরি।

॥ রাগ সুহই॥ একতালী॥
আয়ে জনক-সুতা করো পরবেশ
পেক্ষয়ে বদন মন মন্মথ-ক্লেশ। ধ্রু।
মানিক মুকুট কুণ্ডল করু কান্তি
দশন ওতিম নব মুক্তিম-পান্তি।[৫]
ঈষত হাসি চান্দক রুচি চোর
নীল অলকে লোলে লোচন-চকোর।
কঙ্কণ কেয়ূর রঞ্জন কায়
রামক চরণ চিন্তি চিত্ত লগায়।

---

১ অর্থাৎ, (ভূমিতে) পড়িয়া প্রণাম করিলাম।
২ অর্থাৎ ওই (দুরন্ত) ভবসাগর যাঁহার স্মরণে পার করিয়া দেয়। ৩ হরধনুর নাম।
৪ "কৃষ্ণকিঙ্কর" শঙ্করের বিশিষ্ট ভনিতা।
৫ অর্থাৎ, উত্তম দশন যেন নব মুক্তার পাঁতি।

পদপঙ্কজ-পংক্তি[1] করু বোল
রূপে ভুবন ভুলে শঙ্করে বোল।

সূত্রধার। আহে সামাজিক লোক সে জনকনন্দিনী সীতা সখীসবসহিতে নৃত্য করিয়ে। সে জাতিস্মরী কন্যা পূর্বজনমকথা মনে পড়ল। তাহে স্মরি পড়ি ক্রন্দন করে রহল। তাহা পেক্ষি সখী মদনমঞ্জরী কনকাবতী বাহু মেলি পুছত।

মদনমঞ্জরী বোল। আহে প্রাণসখি তোহো রাজনন্দিনী কোন সম্পত্তি নাহি ঠিক। কি নিমিত্তে তোহো বারম্বার বিলাপ করহ প্রাণসখি। হামার শপথ তোহোরি পায়রে লাগোঁ হামাত সত্বরে কথা কহ।

শ্লোক। ততঃ সীতা বিনিশ্বস্য চরিত্রং পূর্বজন্মনঃ।
সখীভ্যাং বর্ণয়ামাস রুদতী সুদতী সখী।

সূত্রধার। সীতা কিঞ্চিৎ স্বস্থ হুয়া অঞ্চলে আক্ষি মুখ মুছি নিশ্বাস-কোঁকারি সখীসবক সম্বোধি বোলল।

সীতা বোল। আহে সখীসব পরম-অভাগিনীত কি পুছহ। হামো পূর্ব-জনমে ঈশ্বর নারায়ণকে স্বামী ইচ্ছা কয়লো। অনেক কায়ক্লেশ করিয়ে বহুত বরিষ তপস্যা কয়লো। তদনন্তরে আকাশবাণী শুনলো—আহে কন্যা তোহো ওহি জনমে স্বামীকে ভেণ্ট নাহি পাওব আওর জনমে শ্রীরামরূপে তোহাক বিবাহ করব। ইহা জানি হামো অগনিত প্রবেশি প্রাণ ছাড়লো। সে হামার কারণে দৈববাণী বিফল ভেল। সে শ্রীরাম স্বামীক চরণ ওহি জনমে ভেণ্ট নাহি ভেলো।

সূত্রধার। ওহি বুলি সীতা পরম তাপ উপজল। হা রাম স্বামী বুলি মোহ হুয়া মাটি লুটি যৈসে বিলাপ করল তা দেখহ শুনহ নিরন্তরে হরি বোল হরি।…

নাট-পালার শেষে "মুক্তিমঙ্গল ভটিমা" পদ। পদের শেষাংশে শুক্লধ্বজের প্রশংসা। শুক্লধ্বজের উৎসাহেই ইহা রচিত (ও নাটগীতাভিনীত) হইয়াছিল।

রামক পরম-ভকতি রস-জান
শ্রীশুক্লধ্বজ নৃপতিপ্রধান
রামক বিজয় করাওত নাট
মিলব তাহে বৈকুণ্ঠক বাট।

'রামের পরম ভক্ত, রসজ্ঞাতা, নৃপতির প্রধান পাত্র শ্রীশুক্লধ্বজ রামবিজয় নাট করাইতেছেন। তাহাতে (তাঁহার) যেন বৈকুণ্ঠের পথ মিলে।'

শঙ্করদেবের সবচেয়ে শক্তিশালী শিষ্য মাধবদেব। ইনি শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে। তখনও শঙ্কর কামতা-রাজ্যে চলিয়া আসেন নাই। কামতা-রাজ্যে শঙ্করের আগমন এবং সবদিকে তাঁহার প্রতিষ্ঠা-লাভ ব্যাপারে মাধবদেবের খুব হাত ছিল বলিয়া মনে হয়। শঙ্করদেবের ধর্মে পাই ট্রিনিটি—নাম, দেব, ভক্ত। তাহাতে মাধব আর একটি যোগ করিয়া চতুষ্কলা পূর্ণ করিলেন—গুরু। শঙ্করদেবের অপর প্রধান শিষ্য দামোদরদেব।

[1] পদপঙ্কজের নূপুর।

শঙ্করের মৃত্যুর পর দুই প্রধান শিষ্যের মধ্যে মতবিরোধ হয়। দামোদরিয়া সম্প্রদায়ের নেতা দামোদর আসামে বড়পেটায় চলিয়া আসেন, মাধব কামতায় থাকিয়া যান। পরে ইনিও বড়পেটায় চলিয়া যান।

নরনারায়ণ-শুক্লধ্বজের রাজ্য বিভক্ত হইলে পর মাধব শুক্লধ্বজের পুত্রের রাজ্যভাগে পড়েন। পরে রঘুদেব তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে তিনি নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের (১৫৮৪-১৬২২) রাজ্যে চলিয়া আসেন। অতঃপর মাধব গজপতি-পুরুষোত্তমদেবের 'নামমালিকা' অনুবাদ করেন। ১৫১৮ শকাব্দে (=১৫৯৬-৯৭) মাধবদেবের মৃত্যু হয়। দামোদরদেবের মৃত্যু হয় অনেক পরে।

পদাবলী ("বড়গীত", "ভটিমা" ইত্যাদি) ছাড়া মাধবের উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে 'ভক্তিরত্নাবলী'[১] 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য'[২] ও 'চোরধরা ঝুমুরা'[৩]। 'চোরধরা' নিতান্ত ছোট নাট। ভাষায় যথারীতি ব্রজবুলির মিশ্রণ আছে। আরম্ভে শ্লোক,

যো লোকভারোদ্ধরণায় চক্রী চক্রেহবতারং বসুদেবগেহে।
গোপীজনানন্দকরো মুকুন্দঃ পায়াৎ স বো যাদবরাজসিংহঃ ॥

'চক্রধারী যিনি ভূভারহরণের জন্য বসুদেবের ঘরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, গোপীজনের আনন্দদায়ী যদুকুলের রাজসিংহ সেই মুকুন্দ তোমাদের রক্ষা করুন।'

মাধবের পদাবলীতে ভক্তিরসের নির্মল ও উজ্জ্বল প্রকাশ আছে। যেমন,

কা করু মনুয়া বিষয়-বিলাস
দুর্লভ মানবী তনু পুনুহো না পাস। ধ্রু।
ভারতে মানবী তনু তরণী উপাম
দেহ ভরা কলিকো ধরম হরিনাম।
গুরু কেরুয়ালি রাম অনুকুল বাও
হরিগুণ গায়া ভবসাগর কুলাও।
আশা সুফল সকল করো দূর
নাম-অমিয়া পানে মন করো পূর।
কহয় মাধবদাস গতি নাহি আন
সজ্জন জনর সঙ্গ লেহ অগিয়ান ॥[৪]

---

[১] প্রথম ছাপা হয় গৌহাটীতে (১৮৭৭)। [২] কোচবিহার-দরবারে পুথি ১৫৭।

[৩] 'রাজসূয়'ও মাধবদেবের নামে চলে। ইহা প্রথম ছাপা হয় নওগাঁয় (১৮৮৫)। কোচবিহার-দরবার সংগ্রহে যে পুথি আছে (১৫৩) তাহাতে অনন্ত কন্দলীর ভনিতা পাই।

[৪] হরিবিলাস গুপ্ত প্রকাশিত 'বড়গীত, ভটিমা ও গুণমালা' পৃ ৩৭।

'ও মন, কী বিষয় বিলাস করিতেছ? দুর্লভ মানব দেহ আর পাইবি না। ভারতে মানবজন্ম তরণীর মত, তাহাতে বোঝাই দাও কলির ধর্ম হরিনাম। গুরু (যেন) কেরোয়াল, রাম (যেন) অনুকূল বায়ু। হরিগুণ গাহিয়া ভবসাগরের কূল পাও। লাভের আশা সব দূর কর। নাম-অমৃত পান করিয়া মন পূর্ণ কর। মাধবদাস বলিতেছে, অন্য গতি নাই। হে অজ্ঞান, (তুমি) সজ্জনের সঙ্গ নাও॥'

মাধবদেবের এক শিষ্য গোপাল আতা 'জন্মযাত্রা' নাট[১] লিখিয়াছিলেন, আর এক শিষ্য (এবং আত্মীয়) রামচরণ লিখিয়াছিলেন 'কংসবধ যাত্রা'[২]। রামচরণের নাট শঙ্করদেবের রচনার মতো॥

---

[১] *Descriptive Catalogue of Assamese Manuscripts.* পৃ ৭৫।

[২] 'আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা পুথির বিবরণ', শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য (সা-প-প ২৭, পৃ ৭৪-৭৭)।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চৈতন্যাবদান

১

নিয়মিতভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের পত্তন হইবার পর হইতে গঙ্গাতীরে বসতির ভীড় বাড়িয়া চলে। মুসলমান অধিকারের বেশ কিছুকাল আগে হইতে ধর্মচিন্তায় গঙ্গার মাহাত্ম্য জাঁকাইয়া উঠিতে থাকে। পাল- ও সেন-রাজাদের সময়ে গঙ্গা ও গঙ্গার শাখা (ও উপ-) নদী দেশের শাসন রক্ষণ ও বাণিজ্য ব্যাপারে রাজপথে পরিণত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে নৌবাহিনীর গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গে মুসলমান অধিকারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাতীরে পূর্ববঙ্গের লোকের আগমন ও বসতিও বাড়িতে থাকে। নদীপথে নবদ্বীপের সঙ্গে এক দিকে পূর্ববঙ্গের অপর দিকে রাজধানী গৌড়ের সহজ সংযোগ ছিল। ভাগীরথী-তীরের বাণিজ্যকেন্দ্র (সপ্তগ্রাম) ও শাসনকেন্দ্র (আম্বুয়া) দুইই নবদ্বীপের অবিদূরে ছিল। কাছেই ধাইগাঁয়ে ("ধার্যগ্রাম") লক্ষ্মণসেনের উপ-রাজধানী ("উপকারিকা",—এখনকার জমিদারির ভাষায় কাছারি বাড়ি—) ছিল। লক্ষ্মণসেনের বিদ্বৎপ্রিয়তা সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার শাসনের অনেক আগে হইতেই আশে পাশে গঙ্গাতীরে সদাচারী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতেছিল। এইসব কারণে পঞ্চদশ শতাব্দের শেষার্ধে নবদ্বীপ-অঞ্চল—অর্থাৎ কালনা-নবদ্বীপ-শান্তিপুর—বিদ্বজ্জনাকীর্ণ ও ঘনবসতিপূর্ণ হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর পণ্ডিত ধনী মানী গুণী নবদ্বীপ-অঞ্চলে বাস উঠাইয়া আনিয়াছিলেন।

এইরকম এক উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণের ঘরে নবদ্বীপে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হইয়াছিল যিনি চারিত্র্যে ও ভগবদ্‌ভক্তিতে যুগের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি চৈতন্য। চৈতন্যের জন্ম হইয়াছিল ১৪০৭ শকাব্দের (=১৪৮৬) ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়। তখন চাঁদে গ্রহণ লাগিয়াছে। গঙ্গাতীরে স্নানার্থীর ভিড়। পথে-ঘাটে শঙ্খঘন্টার রব ও হরিধ্বনি।

চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ "মিশ্র পুরন্দর", মাতা শচী। জগন্নাথ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, সিলেট ("শ্রীহট্ট") হইতে আসিয়াছিলেন। এক প্রাচীন

জীবনী-লেখকের উক্তি অনুসারে জগন্নাথের বংশ আগে উড়িষ্যায় যাজপুরে বাস করিতেন। রাজা কপিলেন্দ্রের সময়ে তাঁহারা শ্রীহট্টে চলিয়া যান।[১] জগন্নাথের শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্তী খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। স্থানীয় মুসলমান শাসক ("কাজী") তাঁহাকে আত্মীয়-গুরুজনের মত মান্য করিত। নীলাম্বর ভালো জ্যোতিষী ছিলেন। চৈতন্যের জন্ম হইলে পর ইনি জন্মপত্রিকা বিচার করিয়া ভবিষ্যৎ বলিয়াছিলেন যে জাতক মহাপুরুষরূপে খ্যাত হইবেন।

জগন্নাথ-শচীর সংসার ধনীর না হইলেও সচ্ছল সাধারণ গৃহস্থের। দেশে তাঁহার কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। বড় ছেলে বিশ্বরূপ। তাহার পর কয়েকটি সন্তান জন্মিয়াই মরিয়া যায়। শেষে বারো বছর পরে চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। যে কারণেই হোক চৈতন্যের জন্মের পর হইতে সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়াছিল।

শ্রীহট্টের লাউড় অঞ্চল হইতে এক বৃদ্ধ রাজগুরু-পণ্ডিত ও তাঁহার পুত্র আসিয়া শান্তিপুরে বাস করিয়াছিলেন। পুত্র বড় হইয়া অদ্বৈত আচার্য নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতকে জগন্নাথ মিশ্র অভিভাবকের মতো মান্য করিতেন। শচী দেবী অদ্বৈতের কাছে দীক্ষা লইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ অদ্বৈতের কাছে প্রথমে বেদান্ত পরে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। চৈতন্য শৈশবেই অদ্বৈতের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই স্নেহ পরে শ্রদ্ধা ও ভক্তি বিজড়িত হইয়া অদ্বৈত-চৈতন্যের মধ্যে এক অপূর্ব সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল এবং চৈতন্যের জীবনের গতি নির্দেশ করিয়াছিল।

দেহকান্তির জন্য শিশুকাল হইতেই চৈতন্য আত্মীয়স্বজনের ও প্রতিবেশীর কাছে "গোরা" "গৌরাঙ্গ" নামে পরিচিত ছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবী নবজাতকের নাম রাখিয়াছিলেন "নিমাই"। কয়েকটি সন্তান নষ্ট হইবার পরে চৈতন্যের জন্ম হইয়াছিল, সেই জন্য এই নাম।[২] পরে বড় ভাই বিশ্বরূপের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চৈতন্যের ভালো নাম রাখা হইয়াছিল বিশ্বম্ভর। এ নাম বেশ চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সন্ন্যাসগ্রহণের পর

---

[১] জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের মতে শ্রীহট্টের মধ্যে জয়পুর গ্রামে জগন্নাথের পিতৃগৃহ ও শ্বশুরালয় ছিল। দৈববিপাক ও রাষ্ট্রবিপ্লব দুই মিলিয়া শ্রীহট্ট উচ্ছন্ন করিলে শচীদেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী সপরিবার-পরিজনে নবদ্বীপে চলিয়া আসেন। প্রসঙ্গান্তরে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—"চৈতন্য গোসাঞির পূর্বপুরুষ আছিলা যাজপুরে, শ্রীহট্টদেশেরে পলাঞা গেল রাজা ভ্রমরের ডরে।"

[২] নামটির দুই অর্থ সম্ভব। এক "যাহার মা নাই", অর্থাৎ—তাহা হইলে যমের করুণা হইবে। দুই, "নিমের মত", অর্থাৎ—যমের মুখে তিত লাগিবে।

তাঁহার নাম হইয়াছিল কৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে চৈতন্য। এই নামেই তিনি সন্ন্যাসের পর হইতে পরিচিত।

চৈতন্যের শৈশব সাধারণ ছেলের মতোই কাটিয়াছিল। মায়ের স্নেহ একটু প্রবল ছিল। বাপ কর্তব্যবোধে শাসন করিতেন। বিশ্বরূপ ভাইকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন এবং চৈতন্যও তাঁহার খুব অনুগত ছিলেন। যখন বিশ্বরূপের বিবাহ-জল্পনা চলিতেছে তখন তিনি অকস্মাৎ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন সন্ন্যাস লইতে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া পরিবারের তিনটি ব্যক্তির উপরেই পড়িয়াছিল। জগন্নাথ মিশ্রের দেহ-মন ভাঙ্গিয়া গেল। জ্যেষ্ঠ পুত্র পণ্ডিত হইয়া সংসারের ভার লইবে,—এই আশা তিনি পুষিয়াছিলেন। শচীদেবী চৈতন্যকে প্রবলতর স্নেহে কাছে টানিয়া রাখিলেন। চৈতন্যের হৃদয়ে অশান্তি জাগিল। বাপ-মা তাঁহাকে পড়িতে পাঠাইতেছেন না, ইহাতে বালক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার বাসনা, ভাইয়ের মতো পণ্ডিত হইয়া বাপ-মায়ের দুঃখ দূর করিবেন। পিতা পড়িতে দিতে চাহেন না ঠিক সেই কারণেই। তাঁহার আশঙ্কা, লেখাপড়া শিখিলে চৈতন্য ভাইয়ের পথ অনুসরণ করিবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুত্রের জেদই মানিতে হইল। জগন্নাথ ছেলেকে টোলে পড়িতে দিলেন। কিন্তু মেধাবী ও প্রত্যুৎপন্নমতি চৈতন্যের ব্যাকরণ ও অলঙ্কার বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি ও যশ লাভের আগেই জগন্নাথ স্বর্গারোহণ করিলেন। মাতাকে প্রবোধ দিয়া নিতান্ত অল্প বয়সেই চৈতন্য সংসারের দিকে মন দিলেন।

ষোল-সতেরো বছর বয়সে চৈতন্য স্বনির্বাচিত কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করিলেন। দরিদ্র ঘরের মেয়ে আসিয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিল। এইভাবে মায়ের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া চৈতন্য টোল খুলিলেন এবং ব্যাকরণ পড়াইতে শুরু করিলেন। সুদর্শন সুচরিত বালক-পণ্ডিতটিকে সকলেই ভালোবাসিত। প্রতিবেশীরা ছেলের মতো দেখিত। সমবয়সীরা সানন্দে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিত, অদ্বৈতের মতো কয়েকজন প্রবীণ ও ধীর বান্ধব ও প্রতিবেশী স্নেহমিশ্র ভক্তির চক্ষে দেখিত, সাধারণ লোকে তাঁহাকে স্নেহভক্তিমিশ্রিত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিত। রূপে সৌজন্যে ও সহৃদয়তায় বালক চৈতন্য নবদ্বীপের লোকের নয়ন ও মন দুইই অধিকার করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে চৈতন্য জলপথে পূর্ববঙ্গে গমন করিলেন। কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন তাহার কোন খাঁটি খবর নাই। সম্ভবত তিনি সিলেটে পিতৃভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। বোধ করি দেশের ভূসম্পত্তিও যাহা ছিল

তাহার শেষ ব্যবস্থা করিতেই তিনি বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গে গিয়া তাঁহার প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল এবং তিনি সেখান হইতে টাকাকড়ি লইয়া আসিয়াছিলেন,—এ কথা প্রায় সব প্রাচীন জীবনীলেখকই বলিয়াছেন। চৈতন্যের প্রথম ভক্ত তপন মিশ্র বঙ্গদেশেই চৈতন্যের সহিত প্রথম মিলিত হন এবং তাঁহারই উপদেশে সপরিবারে কাশীতে চলিয়া যান।

চৈতন্যের অনুপস্থিতিকালে লক্ষ্মীদেবী সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন। ঘরে ফিরিয়া চৈতন্য এ কথা শুনিয়া মনে খুব আঘাত পান। ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ এবং অন্তরঙ্গ দুই চারজন মিলিয়া নাম-সংকীর্তন চৈতন্যের বঙ্গদেশ যাত্রার আগেই শুরু হইয়াছিল। বঙ্গদেশে চৈতন্য দুই কাজই করিয়াছিলেন, “নাম দিয়া ভক্ত কৈল পড়াইঞা পণ্ডিত”।

বঙ্গদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে পর চৈতন্যের ভক্তি-অনুশীলনের বিশ্রব্ধ স্থান হইল শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ী। সেখানে অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তেরা আসিয়া মিলিত হইতেন। চৈতন্যের সমাধ্যায়ী সুকণ্ঠ মুকুন্দ দত্ত গান করিতেন। পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া শচী চিন্তিত হইলেন এবং ধন ও প্রভাবশালী রাজপণ্ডিত সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বিবাহের প্রস্তাব প্রথমে কন্যার পিতার তরফেই আসিয়াছিল। প্রথমে চৈতন্য ঘটককে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, পরে মায়ের মন বুঝিয়া বিবাহে সম্মতি দেন। মহাধূমধামে রাজপণ্ডিত-কন্যার সহিত নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ হইল। কিন্তু ঘরের দিকে মন পড়িবার পক্ষে নূতন অন্তরায় উপস্থিত হইল। হরিদাস নবদ্বীপে আসিয়া মিলিলেন। অচিরে নিত্যানন্দও আসিয়া জুটিলেন। এই দুই নির্ভীক নিরপেক্ষ ভগবৎ-প্রেমাতুর সহচর পাইয়া চৈতন্য যেন মাতিয়া উঠিলেন এবং নবদ্বীপের পথে পথে নাম-সংকীর্তন করিতে ও করাইতে লাগিলেন। চৈতন্যের প্রভাব দেখিয়া সাধারণ লোকে কানাকানি করিতে লাগিল,—গৌড়ের সিংহাসনে বামুন-রাজা বসিবে একথা বুঝি বা ফলিয়া যায়! অচিরে মুসলমান শাসকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিল। নবদ্বীপ অঞ্চল ছিল আম্বুয়া মুলুকের অন্তর্গত। মুলুকের কাজীর কাছে নালিশ হইল, চৈতন্য লোক খেপাইতেছে এবং হিন্দুয়ানি জাহির করিতেছে, সুতরাং তাহাকে জব্দ না করিলে মুসলমানের আধিপত্য টিকিবে না। কাজী একদল সংকীর্তনকারীকে খেদাইয়া দিয়া তাহাদের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিল। শুনিয়া চৈতন্য ক্রুদ্ধ হইয়া মিছিল করিয়া নগর-সংকীর্তনের আদেশ দিলেন। চৈতন্যের এই উদ্যম ভারতবর্ষে বিরুদ্ধ শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম চ্যালেঞ্জ।

সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে দলবল লইয়া চৈতন্য নগর-সংকীর্তনে বাহির হইলেন। অসংখ্য লোক আসিয়া যোগ দিতে লাগিল। শঙ্খ ঘণ্টা করতাল মৃদঙ্গের রোলে নবদ্বীপের পথঘাট মুখরিত, মশালের আলোয় উদ্দীপ্ত। নগর ঘুরিয়া সংকীর্তন যাত্রা কাজীর বাড়ীর কাছে পৌঁছিল। ভয়ে কাজী আগেই দ্বার বন্ধ করিয়াছে। চৈতন্য তাঁহাকে অভয় দিয়া ডাকাইলেন। কাজী আসিয়া ক্ষমা চাহিয়া সংকীর্তন-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিল। চৈতন্যের জয়জয়কার উঠিল।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ বাধিয়াছিল নিত্যানন্দ-হরিদাসের সহিত দুই অত্যাচারী দুষ্ট ব্যক্তির। চৈতন্যের অনুমতি লইয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস নবদ্বীপের পথে পথে হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তাঁহারা জগাই মাধাই দুই ভাইয়ের সামনে পড়িলেন। ইহারা নবদ্বীপের প্রধান গুণ্ডা। বামুনের ছেলে, কিন্তু কোন অনাচার-অত্যাচারে পরাঙ্মুখ নয়। সকলে ইহাদের ভয় করিত। নিত্যানন্দ ইহাদের হরিনাম-উপদেশ দিতে গিয়া প্রহৃত হন। শুনিয়া চৈতন্য সেখানে ছুটিয়া আসেন। তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া জগাই-মাধাইয়ের ভয় হয়, তাহাদের মন ফিরিয়া যায়। তাহারা বৈষ্ণব ভিখারীর বৃত্তি অবলম্বন করে। জনসাধারণের স্নানের সুবিধার জন্য ইহারা নিজে খাটিয়া গঙ্গায় একটি ঘাট বাঁধাইয়াছিল।

কিছুকাল পরে চৈতন্য শিষ্য-সহচর লইয়া পিতৃকৃত্য করিতে গয়ায় চলিলেন। গঙ্গাতীর-পথে কহলগাঁ-ভাগলপুর দিয়া মন্দার গেলেন, সেখান হইতে বৈদ্যনাথধাম ও বরাবর হইয়া গয়ায় পৌঁছিলেন। গয়ায় ঈশ্বর পুরীর সহিত মিলিত হইলেন। ঈশ্বর পুরী একবার নবদ্বীপে আসিয়া গোপীনাথ আচার্যের ঘরে কিছুদিন ছিলেন। তখন চৈতন্য প্রত্যহ তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। এখন ঈশ্বর পুরীর কাছে দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া চৈতন্যের মনে প্রবল ভক্তি ভাবাবেগ দেখা দিল। ঈশ্বর পুরী ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর প্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য। মাধবেন্দ্রের ঈশ্বরপ্রেমব্যাকুলতা তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে ঈশ্বর পুরীই সবচেয়ে বেশি পাইয়াছিলেন।

চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার অব্যবহিত কারণ কি তাহা বলা দুষ্কর। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন যে ভাবাবিষ্ট চৈতন্যকে কৃষ্ণনামের পরিবর্তে গোপীনাম জপ করিতে শুনিয়া কোন কোন পড়ুয়া অনুযোগ করায় তিনি তাহাদের মারিতে গিয়াছিলেন। ইহাতে নবদ্বীপের কোন কোন লোক তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। ইহা বুঝিয়া চৈতন্য খেদ করিয়া একটি হেঁয়ালি ছড়া

বলিয়াছিলেন। সে ছড়াটি চৈতন্যভাগবতে উদ্ধৃত আছে। এটিকে চৈতন্য-রচিত একমাত্র বাঙ্গালা পদ বলিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

করিনু পিপ্পলীখণ্ড কফ নিবারিতে
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে।

অর্থাৎ ভক্তিপ্রচার করিতে গিয়া বিদ্বেষ জাগাইয়া অভক্তির প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে।

দীক্ষা পাইয়া চৈতন্যের দেহে ও মনে যেন প্রেমপ্রবাহ বহিতে লাগিল। চৈতন্য ঈশ্বরপ্রেমে সব ভুলিয়া গিয়া বৃন্দাবন-মথুরায় ছুটিয়া চলিলেন। সঙ্গীরা অনেক যত্নে সুস্থ করিয়া তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল। কিন্তু ঘরে আর মন টেকা দায়। বৎসর পূর্ণ হইবার আগেই চৈতন্য গৃহত্যাগ করিলেন। কেশব ভারতী নামে এক সন্ন্যাসী নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। চৈতন্য তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৪৩১ শকাব্দের (=১৫১০) মাঘ মাসে কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীর স্থানে সন্ন্যাসদীক্ষা লইলেন। সন্ন্যাস লইয়া চৈতন্যের ভক্তিভাবাবেগ বাড়িয়া গেল। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিলেন বৃন্দাবনের দিকে। "রাঢ় দেশে" (অর্থাৎ উত্তর বর্ধমান, দক্ষিণপূর্ব বীরভূম ও সংলগ্ন মুর্শিদাবাদের অংশ) তিনদিন ঘুরিবার পর নিত্যানন্দ ও সঙ্গী ভক্তগণ তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে আনিয়া তুলিলেন। সেখানে মায়ের ও ভক্তদের সঙ্গে দেখাশোনা হইল। অদ্বৈতের নির্বন্ধে কয়েকদিন শান্তিপুরে থাকিয়া চৈতন্য পুরীতে চলিলেন স্থায়িভাবে বাস করিবার জন্য। মথুরা-বৃন্দাবনে না গিয়া পুরী যাইবার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে পুরী অনেক কাছে, সেখানে যাতায়াত সহজসাধ্য, সুতরাং ভক্তগণের সঙ্গে অনায়াসে মিলন হইবে এবং পুত্রের সংবাদ মাতা নিয়মিত পাইবেন। তা ছাড়া পুরী হিন্দু রাজ্য, সেখানে ধর্মাচরণের অবাধ স্বাধীনতা। এবং জগন্নাথের অনুগ্রহে ভিক্ষারও অনটন নাই। গৌড় হইতে যত লোকই আসুক কোন অসুবিধা হইবে না। (কোন কোন পণ্ডিত এখন মনে করেন যে চৈতন্যের উড়িষ্যা-আশ্রয়ে এবং সেখানে তাঁহার ধর্ম-বিস্তারে উড়িষ্যার ক্ষতি হইয়াছে। অর্থাৎ রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যমতাশ্রিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজশক্তি নির্বীর্য হইয়া পড়ে এবং উড়িষ্যার স্বাধীনতা অল্পকাল পরেই লুপ্ত হয়। এ অনুমান ইতিহাস-সম্মত নয়। চৈতন্য পুরীতে যাইবার কিছুকাল পূর্ব হইতেই উড়িষ্যার সঙ্গে বাঙ্গালার সংঘর্ষ বাধিয়াছিল এবং হোসেন-শাহা উড়িষ্যার উত্তর

সীমান্ত আক্রমণ করিয়া তাহার কিয়দংশ নিজরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণকালে বাঙ্গালা-উড়িষ্যার মধ্যে প্রধান যোগপথ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।[১] সে পথে বার দুই তিন গতায়াত করিয়া চৈতন্য তাহা পুনরায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রধানত তাঁহার এবং তাঁহার ভক্তদের প্রভাবেই হোসেন-শাহা ও তাঁহার পুত্র উড়িষ্যা আক্রমণ হইতে নিরস্ত ছিলেন। উড়িষ্যার স্বাধীনতাভ্রংশ চৈতন্যের ধর্মের জন্য নয়। চৈতন্যের তিরোভাবের কয়েক বছর বাদে এবং প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজসভায় চক্রান্ত জাগিয়াছিল। তাহাই উড়িষ্যার স্বাধীনতালোপের মুখ্য কারণ। চৈতন্য উড়িষ্যার ও বাঙ্গালার মধ্যে যে যোগ স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন তাহাতে উড়িয়া এবং বাঙ্গালী দুই প্রতিবেশীই সমানভাবে লাভবান হইয়াছে।)

পুরীতে গিয়া চৈতন্য প্রথমেই দুইটি শক্তিশালী ভক্ত লাভ করিলেন। একজন সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য[২] আর একজন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশী মিশ্র। কাশী মিশ্রের নির্জন বাগানবাড়ীতে চৈতন্য বাস করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই রাজা ও রাজপরিজন চৈতন্যের অনুগত হইল। বাঙ্গালার ও উড়িষ্যার লোক চৈতন্যকে দেবতা বলিয়া মানিয়া লইল। জগন্নাথের সচল রূপ বলিয়া চৈতন্য সর্বসাধারণের ভক্তি-অর্ঘ্য লাভ করিলেন।

১৪৩২ শকাব্দের গোড়াতেই চৈতন্য দক্ষিণে তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন। সমগ্র দক্ষিণভারত মায় মহারাষ্ট্র-সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিতে বৎসরাধিক লাগিয়াছিল। সার্বভৌম তাঁহাকে রামানন্দ রায়ের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। রামানন্দ উড়িষ্যার দক্ষিণ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। চৈতন্য রাজমহেন্দ্রীতে গিয়া গোদাবরীর তীরে রামানন্দের দেখা পাইলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গলুব্ধ রামানন্দ অতঃপর কর্মত্যাগ করিয়া পুরীতে নিজগৃহে ফিরিয়া আসেন। শ্রীরঙ্গমে আসিয়া পরমানন্দ পুরীর সহিত চৈতন্যের মিলন হইল। ইনি চৈতন্যের গুরু ঈশ্বর পুরীর

---

[১] চৈতন্যভাগবত দ্রষ্টব্য।

[২] পিতা মহেশ্বর বিশারদ খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি শেষ বয়সে কাশীবাস করিয়াছিলেন। সার্বভৌমের ভাই বিদ্যাবাচস্পতিও বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি গৌড়ে থাকিতেন। শিষ্য রাজমন্ত্রী সনাতনের বৈরাগ্য অবলম্বনের পর ইনি স্বগ্রামে (নবদ্বীপের কাছে) চলিয়া আসেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পিতাপুত্রের প্রশংসাসূচক এই শ্লোক উদ্ধৃত আছে,

উড়দেশে সার্বভৌমো বারাণস্যাং বিশারদঃ।
বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে ত্রিভির্ধন্যা বসুন্ধরা॥

বিদ্যাবাচস্পতির সম্বন্ধে আগে দ্রষ্টব্য।

গুরুভ্রাতা, অর্থাৎ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। পরমানন্দ পুরীও নীলাচলে আসিয়া রহিলেন। চৈতন্যের দক্ষিণভ্রমণের ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা দুইটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের পরিচয় লাভ করিল—"বিল্বমঙ্গল"এর 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্য আর 'ব্রহ্মসংহিতা'। ব্রহ্মসংহিতায় বৈষ্ণবভক্তিতত্ত্বের সঙ্গে শৈবতান্ত্রিক মতবাদের সামঞ্জস্য-চেষ্টা আছে।

১৪৩৫ শকাব্দের (=১৫১৩) শরৎকালে চৈতন্য গঙ্গাতীরপথে বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন কিন্তু লোকসংঘট্টের জন্য গৌড় হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল। গৌড়ে সনাতন ও রূপ তাঁহার সহিত প্রথম মিলিত হইলেন। যাইবার ও আসিবার পথে তিনি কুমারহট্টে ও শান্তিপুরে মায়ের ও অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েক মাস পরে (১৪৩৬ শরৎ) চৈতন্য বনপথে ("ঝারিখণ্ড" দিয়া) বৃন্দাবন অভিমুখে চলিলেন। এক ব্রাহ্মণ পাচক ও এক ভৃত্য সঙ্গে চলিল। উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের আরণ্য শোভা দেখিতে দেখিতে মহানন্দে চলিয়া চৈতন্য কাশী পৌঁছিলেন। সেখানে ছিলেন তাঁহার পূর্ববঙ্গীয় প্রথমতম ভক্ত তপন মিশ্র। আর ছিলেন বৈদ্য চন্দ্রশেখর এবং কীর্তনীয়া পরমানন্দ। চৈতন্য চন্দ্রশেখরের ঘরে বাসা করিলেন। তপন মিশ্রের ঘরে তাঁহার ভিক্ষা হইত। চারজনে মিলিয়া কীর্তন করিতেন। এই কীর্তন কাশীর সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিক্ষোভ তুলিয়াছিল। চৈতন্য সন্ন্যাসী। তিনি গৃহী ভক্তদের মতো নাচিয়া গাহিয়া ভাবুকগিরি করিবেন কেন? চৈতন্যের সঙ্গে আলাপ হইলে পর সন্ন্যাসীদের এই বিরুদ্ধতা কমিয়া যায়।

কাশী হইতে চৈতন্য প্রয়াগে গেলেন, সেখান হইতে মথুরায় ও বৃন্দাবনে। তখন বৃন্দাবনে তীর্থস্থলী বলিতে বিশেষ কিছু ছিল না। শুধু গোবর্ধনে গোপাল ছিলেন, মাধবেন্দ্র পুরী-প্রতিষ্ঠিত। চৈতন্য ব্রজমণ্ডল ঘুরিয়া বিভিন্ন লীলার স্থান নিরূপণ করিলেন। রাধাকুণ্ড ইত্যাদিও আবিষ্কার করিলেন। (তাঁহার ব্রজভ্রমণের পরে তাঁহারই নির্দেশক্রমে সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনের তীর্থগুলি প্রকট করেন এবং মদনগোপাল, গোবিন্দ ও গোপীনাথ এই তিন মুখ্য বিগ্রহের স্থাপনা করেন। এই বিগ্রহের পাশে আগে রাধার মূর্তি ছিল না। তাহা পরে রূপের শাস্ত্র-অনুসারে ও জীবের নির্দেশে স্থাপিত হইয়াছিল। বল্লভাচার্য ও তাঁহার সম্প্রদায় মথুরায় যে বিগ্রহের সেবা চালাইতেন তাহাতে রাধা-মূর্তির সংযোগ কখনই হয় নাই।) ব্রজমণ্ডলে অবস্থিতির সময়ে চৈতন্য ভাবাবেগে অত্যন্ত পীড়িত হইতে থাকেন। তাঁহার সহচর সেখানকার ভক্তদের সাহায্যে তাঁহাকে কোনরকমে

ব্রজভূমির বাহির করিয়া আনিয়া প্রয়াগে পৌছান। সেখানে গৃহত্যাগী রূপ ও তাঁহার ছোট ভাই বল্লভ (নামান্তর অনুপম) আসিয়া মিলিত হইলেন। রূপকে কিছু উপদেশ দিয়া ও ব্রজমণ্ডলে পাঠাইয়া চৈতন্য কাশীতে আসিলেন। এখানে পলাতক সনাতন আসিয়া মিলিলেন। রূপের মতো সনাতনকেও শিক্ষা দিয়া চৈতন্য বৃন্দাবনে পাঠাইলেন এবং বনপথে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন (১৪৩৭ শকাব্দ)। সন্ন্যাসগ্রহণের পর ছয় বৎসর এইভাবে গমনাগমনে কাটিয়া গেল। জীবনের বাকি আঠারো বছর চৈতন্য নীলাচল ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই।

নবদ্বীপের দুইজন সহচর চৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। অনুজকল্প স্নেহাস্পদ ভক্ত গদাধর পণ্ডিত চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পুরীতে আসিয়া ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমৃত্যু তিনি নীলাচলেই ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি "ঠাকুর" হরিদাস। ইহাকে চৈতন্য নিজের পোষ্যরূপে নীলাচলে রাখিয়াছিলেন। হরিদাসকে চৈতন্য প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিতেন এবং অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। মায়ের প্রতি তাঁহার খুবই ভক্তি ও ভালোবাসা ছিল, কিন্তু সেই মায়ের প্রতিও চৈতন্য সব কর্তব্য পালন করেন নাই। কিন্তু এই সর্বত্যাগী সর্বংসহ নিঃস্ব নিরপেক্ষ ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিটিকে তিনি পুত্র ও পিতা দুইভাবেই দেখিয়া পালন করিয়াছিলেন। হরিদাস মুসলমানের ঘরে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া অত্যন্ত সংকোচে থাকিতেন। জগন্নাথ-মন্দিরে যাওয়ার কথা দূরে থাক মন্দিরের কাছাকাছি পথে-ঘাটেও বাহির হইতেন না। তাই চৈতন্য প্রত্যহ তাঁহার কুটীরে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন এবং প্রত্যহ প্রসাদ পাঠাইয়া দিতেন। সনাতন ও রূপ নীলাচলে আসিলে হরিদাসের কুটীরেই থাকিতেন এবং সেইখানেই চৈতন্য আসিয়া মিলিতেন। হরিদাসের দেহ-ত্যাগের সময়ে চৈতন্য তাঁহার কাছে ছিলেন। মৃত্যু হইলে হরিদাসের দেহ কোলে লইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি নিজে প্রসাদান্ন ভিক্ষা করিয়া হরিদাসের নির্বাণোৎসব করিয়াছিলেন। (বৈষ্ণবসমাজে অন্ত্যেষ্টি-উৎসব বা "মচ্ছব" এই হইতেই শুরু। নাম-সংকীর্তন, কৃষ্ণলীলা-কীর্তন ও একত্র প্রসাদভক্ষণ এই তিনটি এই মহোৎসবের অঙ্গ। ইহারই কিছু রেশ রহিয়া গিয়াছে আধুনিককালে বৈষ্ণবশাক্ত-নির্বিশেষে ভদ্রসমাজে শ্রাদ্ধের আসরে পদাবলী-কীর্তন রীতিতে।)

বাঙ্গালা দেশ হইতে অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তেরা বছর বছর চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে পুরীতে আসিতেন। (নিত্যানন্দের ইচ্ছা ছিল পুরীতে

চৈতন্যের কাছে রহিতে। চৈতন্য তাঁহাকে বাঙ্গালা দেশে পাঠাইয়া দেন, তাঁহার আরব্ধ নামপ্রচার কার্য চালাইয়া যাইবার জন্য।) গৌড়ীয় ভক্তেরা দল বাঁধিয়া স্নানযাত্রার আগেই আসিয়া পৌঁছিতেন এবং রথযাত্রা দেখিয়া তিন চার মাস থাকিয়া তবে দেশে ফিরিয়া যাইতেন। এই ভাবে নীলাচলে চাতুর্মাস্য মহোৎসব চলিত।

চৈতন্যের হৃদয়ে ঈশ্বরবিরহ দুঃখ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার ভক্ত-সহচরদের মধ্যে তিন জন সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিলেন,—পরমানন্দ পুরী, রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ-দামোদর। স্বরূপ-দামোদর নবদ্বীপে চৈতন্যকে জানিতেন। চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পরে তিনিও গৃহত্যাগ করেন এবং নিত্যানন্দের মত যোগী হইয়া কিছুকাল দেশান্তরে কাটাইয়া নীলাচলে আসেন। স্বরূপ অত্যন্ত রসজ্ঞ ও বিশেষ মর্মজ্ঞ ভক্ত ছিলেন। তিনি সুকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। মহাপ্রভুর ভাববিহ্বলাবস্থায় তিনি জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির গান শুনাইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতেন। দিনের বেলায় চৈতন্য ভক্তগণের সঙ্গে কৃষ্ণকথা কহিতেন অথবা ভাগবত কৃষ্ণকর্ণামৃত ইত্যাদি কৃষ্ণলীলা-গ্রন্থ পাঠ শুনিয়া চিত্তবিনোদন করিতেন। মানুষের দেহে-মনে ঈশ্বরপ্রেমের ব্যাকুলতার এমন অপূর্ব প্রকাশ ইহার পূর্বে কেহ দেখে নাই, শুনে নাই, পড়ে নাই। কেবল তাঁহার গুরুর গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর দেহত্যাগকালে এমনি মহাভাব দেখা গিয়াছিল। জীবনমরণের মাঝ-দুয়ারটিতে পৌঁছিয়া মাধবেন্দ্র যে অনির্বচনীয় অনুভব পাইয়াছিলেন সেই অনুভবে আবিষ্ট থাকিয়া চৈতন্য একাদিক্রমে তাঁহার জীবনের শেষ আঠারো বছর কাটাইয়াছিলেন। ১৪৫৫ শকাব্দের রথযাত্রার পরেই তাঁহার তিরোভাব হয়। তখন বয়স আটচল্লিশ বছর॥

২

চৈতন্য তাঁহার জীবৎকালেই পূর্বভারতের এক বৃহৎ ভূখণ্ডে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। অন্যত্রও চৈতন্য-বিশ্বাসীর সংখ্যা কম ছিল না। যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, তাঁহার আকৃতি ও আচরণ দেখিত, তাহারা সকলেই তাঁহাকে দেবতা অথবা দেবকল্প মহাপুরুষ বলিয়া মাথা নত করিত। ঢাকঢোল বাজাইয়া কেহ চৈতন্যকে দেবত্বে অভিষিক্ত করে নাই। চৈতন্য নিজে সর্বদা দৈন্যভাবে থাকিতেন। তাঁহাকে দেবতার সম্মান দিতে গেলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। কিন্তু প্রিয়জনদের সর্বদা পারিয়া উঠিতেন না। তাঁহার একজন

পরম প্রিয়জন ও অত্যন্ত মান্য স্বজন অদ্বৈত আচার্য তাঁহাকে নীলাচলে প্রথম প্রকাশ্যে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গান করিয়াছিলেন।[১] তাহাতে চৈতন্য অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু জনসাধারণের সমর্থন থাকায় তিনি কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

সন্ন্যাস লইয়া চৈতন্য নীলাচলে চলিয়া গেলে পর বাঙ্গালা দেশে চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবদের নেতা হইলেন নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। চৈতন্য ছিলেন বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, অদ্বৈত বারেন্দ্র, নিত্যানন্দ রাঢ়ী। নিত্যানন্দের পৈতৃক নিবাস উত্তর রাঢ়ে একচাকা-খলপপুর গ্রামে। এই গ্রাম এখন বীরভূম জেলায়, মল্লারপুর রেলস্টেশনের কয়েক মাইল পূর্বে। নিত্যানন্দ পিতামাতার একমাত্র সন্তান। বাল্য হইতেই দেবলীলা-নাটগানে অনুরক্ত। শেষ কৈশোরে নিত্যানন্দ এক যোগী অতিথির সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যান এবং যোগী-তান্ত্রিক সাধুদের সঙ্গলোভে তীর্থে তীর্থে ঘুরিতে থাকেন। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। এ উক্তি প্রমাণসহ নয়। নিত্যানন্দ ছিলেন বেশে অবধূত, আকারে মহামল্ল, ভোজন-পানে বীরাচারী। এবং তাঁহার প্রবল অনুরাগ কৃষ্ণলীলা-শ্রবণে ও হরিনাম-গানে। ঘুরিতে ঘুরিতে নবদ্বীপে আসিলে চৈতন্যের সঙ্গে তাঁহার মিলন ঘটে। চেহারায় এবং বয়সে চৈতন্যের বড় ভাই বিশ্বম্ভরের সঙ্গে হয়ত তাঁহার মোটামুটি মিল ছিল। তাই শচীদেবী তাঁহাকে যেন কোলে টানিয়া লইলেন। নিত্যানন্দের বৈরাগী-জীবন প্রায় শেষ হইল।

চৈতন্য নিত্যানন্দকে বুঝিতেন, বুঝিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং বিশেষ স্নেহ করিতেন। কিন্তু নিত্যানন্দের শিশুসুলভ সরল স্বভাব, তাঁহার ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট মেজাজ ও সমাজনিরপেক্ষ আচরণ চৈতন্যগোষ্ঠীর সকলে বুঝিতে পারিত না। তবে চৈতন্য সর্বদা মানাইয়া লইতেন বলিয়া গোলমাল হইত না। নিত্যানন্দ চৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে আসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল মহাপ্রভুর সঙ্গেই থাকিয়া

[১] চৈতন্যভাগবতে (৩. ১০) আছে

"একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত প্রতি, বলিলেন পরানন্দে মত্ত হই অতি।
শুন ভাই সব এক কর সমবায়, মুখ ভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্যরায়।
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাঞি, সর্ব-অবতারময় চৈতন্য গোসাঞি।...
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি, বোলাইয়া নাচে প্রভু জগৎ নিস্তারি।
শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা-সাগর
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর।
অদ্বৈতসিংহের শ্রীমুখের এই পদ ইহার কীর্তনে বাঢ়ে সকল সম্পদ।"

যাইবেন। কিন্তু চৈতন্য বুঝিয়াছিলেন যে এ দেশে নিত্যানন্দ সর্বদা মানাইয়া চলিতে পারিবেন না। তাই দক্ষিণভ্রমণ হইতে ফিরিয়া চৈতন্য নিত্যানন্দকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ দুই জনের উপর ভার দিলেন তাঁহার আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করিবার জন্য।[১] অবধূত নিত্যানন্দের সঙ্গে রহিল রামদাস, গদাধর দাস, পরমেশ্বর দাস প্রভৃতি কয়েকজন ভাবোদ্দাম ভক্ত। গৃহস্থ মানুষ অদ্বৈত শান্তিপুরেই রহিলেন। অবধূত নিত্যানন্দ গঙ্গার তীরে তীরে ভক্তিপ্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নবদ্বীপেও কিছুদিন ছিলেন। উদ্ধারণ দত্ত প্রভৃতির মতো ধনী ভক্তেরা তাঁহার সেবায় লাগিয়া গেলেন। চৈতন্যের বড় ভাইয়ের মতো বলিয়া বৈষ্ণব ভক্তেরা নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা নিত্যানন্দের স্বভাবে ও আচরণেও পৌরাণিক বলরামের মতো নিরঙ্কুশতা ও সারল্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে আসিয়া কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ অবধূতের বেশ ত্যাগ করিয়া দেবোচিত অভিষেক স্বীকার করিলেন এবং রাজোচিত বস্ত্র অলঙ্কার ধারণ করিতে লাগিলেন।[২] ইঁহার প্রধান সহচরেরাও অনেকে বলরামের অনুচর গোপবালকের বেশ ধারণ করিতে লাগিলেন।[৩] চৈতন্যের তিরোভাবের বেশ কিছুকাল আগেই বাঙ্গালা দেশে কৃষ্ণ-বলরামের অবতাররূপে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের কাষ্ঠনির্মিত যুগলমূর্তির পূজা শুরু হইয়াছিল। ইহাতে অদ্বৈতের সম্মতি ছিল। সবার আগে এ মূর্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল আম্বুয়া-কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের ঘরে। গৌরীদাস পণ্ডিতের ভাই সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যাকে নিত্যানন্দ বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর নিত্যানন্দ খড়দহে (কলিকাতার সাত আট মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে) স্থিতি করিলেন এবং শ্যামসুন্দর-মূর্তির সেবা প্রকট করিলেন।

---

১ তুলনীয় চৈতন্যচরিতামৃত (১.১৫)
"আচার্যেরে আজ্ঞা দিলা করিয়া সম্মান, আচণ্ডাল-জনে কর কৃষ্ণভক্তি দান।
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে, অনর্গল প্রেমভক্তি করহ প্রকাশে।"

২ এ বিষয়ে চৈতন্যের কাছে অনুযোগও আসিয়াছিল। যেমন চৈতন্যভাগবতে (৩. ৭)
"ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে, সোনা রূপা মুক্তা সে সকল কলেবরে।
কাষায়-কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস, ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস।"

৩ যেমন চৈতন্যভাগবতে (৩. ৬)
"কারো কোন কর্ম নাই সংকীর্তন বিনে, সভার গোপাল-ভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাঁদড়ুরি গুঞ্জাহার, তাড় খাড়ু হাথে পায়ে নূপুর সভার।"
নিত্যানন্দের প্রধান বারো জন সহচর "দ্বাদশ গোপাল" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

চৈতন্য ছাড়া আর কাহারো জন্মমৃত্যুর তারিখ প্রাচীন জীবনীলেখকেরা উল্লেখ করেন নাই। তবে এটা ঠিক যে নিত্যানন্দ চৈতন্য অপেক্ষা বয়সে প্রায় বছর দশেক বড় ছিলেন এবং চৈতন্যের অন্তর্ধানের আট দশ বছর পরে নিত্যানন্দের তিরোভাব হয়। বয়সে অদ্বৈত আরও বড় ছিলেন, এবং সকলের শেষে তাঁহার তিরোভাব ঘটে। অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দ চৈতন্যের চেয়ে প্রায় পাঁচ ছয় বছর ছোট ছিলেন। ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়া নীলাচলে চৈতন্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন।

নিত্যানন্দের তিরোধানের পর বাঙ্গালার বৈষ্ণব মহান্তেরা অদ্বৈতকেই প্রধান নেতা বলিয়া মানিতেন। কিন্তু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের[১] শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে দলাদলি দেখা দেয়। নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ পত্নী, বীরভদ্রের বিমাতা জাহ্নবা অত্যন্ত প্রভাবশালিনী নারী ছিলেন। নিত্যানন্দের অবর্তমানে তাঁহার অনুচরেরা জাহ্নবাকেই প্রভু বলিয়া মানিত।

চৈতন্যের তিরোভাবের পূর্বে নিত্যানন্দের বিবাহ হইয়াছিল কিনা জানা নাই, তবে বীরভদ্রের জন্ম চৈতন্যের তিরোভাবের পরে। কেননা তাহা হইলে অদ্বৈত এবং অভিরাম দাস প্রভৃতি নিত্যানন্দ-অনুচর শিশুকে চৈতন্যের অবতার বলিয়া বন্দনা করিতেন না।[২] নিত্যানন্দের তিরোধানের পরে বীরভদ্রের দীক্ষাকাল উপস্থিত হইলে তিনি শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতের নিকট দীক্ষা লইতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু "নর্তক" গোপাল ও মীনকেতন রামদাস প্রভৃতি তাঁহাকে শান্তিপুরের পথ হইতে ফিরাইয়া আনেন এবং বিমাতার কাছে দীক্ষা লওয়ান।[৩] এইভাবে অদ্বৈতের জীবৎকালেই বাঙ্গালার বৈষ্ণবসমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। নিত্যানন্দের পরে তাঁহার স্থান লইলেন জাহ্নবা এবং জাহ্নবার স্থান বীরভদ্র। বীরভদ্রের পরে তাঁহার সন্ততি "শ্রীপাট" খড়দহে গুরুবংশ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈতের পরে সীতা প্রধান হইলেন। তাঁহার পরে অদ্বৈতের পুত্রেরা হইলেন গুরু। তবে অদ্বৈতের জীবৎকালেই তাঁহার কোন কোন পুত্র স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছিল। মোটামুটি বলিতে গেলে চৈতন্যের তিরোভাবের পর বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের মধ্যে নেতৃত্ব খড়দহ ও

[১] বীরচন্দ্র নামেও উল্লিখিত।

[২] শিশুকে দেখিয়া অদ্বৈত এই তরজা-প্রহেলিকা বলিয়াছিলেন,

"চোরার ঘরের ধন নিতি চুরি করে
এ চোরা ধরিব মোরা কেমন প্রকারে।"

[৩] 'নিত্যানন্দবংশবিস্তার' (বিষ্ণুপুর সাহিত্য-পরিষৎ সংগৃহীত প্রাচীন পুথি) পৃ ১৪ কথ দ্রষ্টব্য।

শান্তিপুর এই দুই গুরুবংশে প্রধানত নিবদ্ধ ছিল। আরও দুই একটি গুরুপরম্পরার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়। শ্রীখণ্ডের[১] (বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার কাছে) রাজবৈদ্য মুকুন্দ দাস, তাঁহার অনুজ নরহরি দাস সরকার এবং পুত্র রঘুনন্দন দাস তিন জনেই চৈতন্যের প্রিয় ভক্ত ছিলেন। নরহরির ও রঘুনন্দনের বহু শিষ্য-প্রশিষ্য ছিল। ব্রাহ্মণেও তাঁহাদের ঘরে দীক্ষা লইত। নরহরি দাস গৌরাঙ্গ-গদাধর পূজার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। গদাধর পণ্ডিত চৈতন্যের বয়ঃকনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। ইনি খুব ভালো ভাগবত-পাঠক ছিলেন। নীলাচলে চৈতন্যের কাছে থাকিয়া ইনি তাঁহাকে ভাগবত শুনাইতেন। চৈতন্যের প্রতি গদাধরের প্রীতি ও আনুগত্য দেখিয়া ভক্তেরা ইহাকে লক্ষ্মীর (বা রাধার) অবতার বলিয়া মনে করিতেন। মুকুন্দ-নরহরি-রঘুনন্দনের প্রতি নিত্যানন্দও অত্যন্ত অনুগ্রহশীল ছিলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গের সঙ্গে নিত্যানন্দের পূজা ইঁহাদের খুব পছন্দ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কীর্তন-গানে শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের স্থান খুব উচ্চে ছিল। রঘুনন্দনের নৃত্যগীতে চৈতন্য অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন।

খড়দহ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়ের অনেক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। নরহরি-রঘুনন্দন সচ্ছল সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন, ইঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা অধিকাংশ সাধারণ গৃহস্থ ছিল। জাহ্নবা-বীরভদ্র ধনী ছিলেন না বটে কিন্তু তাঁহাদের অনেক ধনী শিষ্য ছিল, সেইজন্য তাঁহারা ধনীর মতো থাকিতেন। শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়ের ঝোঁক পাণ্ডিত্যের দিকে ছিল না, সাহিত্যসঙ্গীতের পথে ছিল। খড়দহ-সম্প্রদায় বৃন্দাবনের প্রভাব মানিয়া লইয়া ব্রাহ্মণপ্রাধান্য ও বৈষ্ণববিদ্যার পথে ধাবিত হইয়াছিল॥

৩

সংসার পরিত্যাগী তপস্বী বৈরাগী ভক্তদের চৈতন্য বৃন্দাবনে পাঠাইতেন। মাধবেন্দ্র পুরীর আমল হইতে মথুরা-বৃন্দাবনে বৈরাগী ভক্ত বৈষ্ণবের অল্প অল্প সমাবেশ হইতে থাকে। চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পর হইতে ব্রজবাসী বাঙ্গালী বৈষ্ণবের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে থাকে। সনাতন-রূপকে শিক্ষা দিয়া চৈতন্য বৃন্দাবনে পাঠাইলেন এই উদ্দেশ্যে যে তাঁহারা সেখানে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিবেন ও নূতন ভক্তিশাস্ত্র রচনা করিবেন এবং নিঃসম্বল বাঙ্গালী বৈষ্ণব ভক্তদের পালন

[১] আসল নাম ছিল খণ্ড অথবা বৈদ্যখণ্ড। ভক্ত বৈষ্ণবের মুখে ইহা "শ্রীখণ্ড" হইয়াছে। এখানকার বাসিন্দারা প্রধানত বৈদ্য ছিলেন। মুকুন্দ দাসেরাও বৈদ্য।

করিবেন। সনাতন-রূপের ঠিক আগেই গৌড়-দরবারের আর একজন সম্ভ্রান্ত সভাসদকে চৈতন্য বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। ইনি সুবুদ্ধি রায়।[১] আগে গৌড়ের অধিকারী ছিলেন। হোসেন খাঁ সৈয়দকে তিনি দীঘি কাটাইতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদা কোন ব্যাপারে বিশেষ গলদ দেখিয়া রায় তাঁহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন। হোসেন খাঁ সিংহাসন অধিকার করিয়া হোসেন-শাহা সুলতান হইলে পর তাঁহার পূর্বতন মনিব (এবং সম্ভবত রাজ্যপ্রাপ্তির সহায়ক) সুবুদ্ধি রায়কে খাতির করিয়া উচ্চপদ দিয়াছিলেন। অনেককাল পরে হোসেন-শাহার বেগম একদিন তাঁহার গায়ে পুরাতন ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপার জানিয়া লয় এবং সুবুদ্ধি রায়কে শাস্তি দিবার জন্য জেদ করিতে থাকে। হোসেন-শাহা কিছুতেই রাজি হন নাই। শেষে সামান্য শাস্তি দিতে সম্মত হইলেন। এই সামান্য শাস্তি হইল সুবুদ্ধি রায়ের মুখে মুসলমানের ব্যবহৃত বদনার জল ঢালিয়া দেওয়া। (বোধ হয় এই সময়ে দরবারের হাওয়া ফিরিতে শুরু হইয়াছিল। সুবুদ্ধি রায়ের শাস্তির অনতিবিলম্বে রূপ ও সনাতন দরবার পরিত্যাগ করেন, ইহা অনুধাবনীয়।) সুবুদ্ধি রায় নিজেকে পতিত জ্ঞান করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া পণ্ডিতদের কাছে ব্যবস্থা খুঁজিতে কাশীতে চলিয়া আসিলেন। তাঁহাদের অনেকে বিধি দিলেন তপ্তঘৃত খাইয়া প্রাণত্যাগ ছাড়া আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। আবার অনেকে বলিলেন, অপরাধ এমন গুরুতর নয় যে কায়োৎসর্গ করিতে হইবে।

এই সংশয়ের সময়ে সেখানে চৈতন্যের সঙ্গে দেখা। সব কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, তুমি বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করিতে থাক, তাহাতেই হইবে। সেই কথা শিরোধার্য করিয়া রায় ব্রজমণ্ডলে আসিয়া রহিলেন। রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনে আসিলে পর তিনিই মথুরায় তাঁহাদের স্বাগত করিয়াছিলেন। তপস্বী রায়ের কঠিন জীবনযাত্রার বিবরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ দিয়াছেন।

> রায় শুষ্ক কাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে
> পাঁচ ছয় পৈসা হয় একেক বোঝাতে।
> আপনে রহে এক পৈসার চানা চাবানা খাইয়া
> আর পৈসা বানিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া।
> দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন
> গৌড়িয়া আইলে দধিভাত তৈলমর্দন।

---

[১] চৈতন্যচরিতামৃত ২. ২৫ দ্রষ্টব্য।

সনাতন ছিলেন রূপের অগ্রজ এবং গুরু। ছোট ভাই অনুপম (নামান্তর বল্লভ) অগ্রজদের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। সনাতন ও রূপ ছিলেন কৃষ্ণ-উপাসক, বল্লভ রাম-উপাসক। সনাতনের দুইজন বড় ভাই ছিলেন। তাঁহারা পূর্ববঙ্গে "দেশাধিকারী" (অর্থাৎ জমিদার) ছিলেন। তাহার মধ্যে একজন রাজকর্মচারী, সম্ভবত বাকলার শাসনকর্তা। জীবজন্তু মারিয়া বিস্তীর্ণ ভূমি খাসদখলে আনার জন্য হোসেন-শাহা তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। সনাতন হোসেন-শাহার প্রধান মন্ত্রীর মতো ছিলেন। সুলতান রাজধানীতে অনুপস্থিত থাকিলে সনাতন রাজপ্রতিনিধি হইতেন বলিয়া তাঁহাকে লোকে সাকর-মালিক ("সাকর মল্লিক") অর্থাৎ ছোটকর্তা বলিয়াই জানিত। রূপ ছিলেন সুলতানের খাশ মুন্শী বা প্রাইভেট সেক্রেটারী। তাই তাঁহার নাম হইয়াছিল দবীর-খাশ। রূপের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। সনাতন-রূপের ভাই ও আত্মীয়বান্ধব অনেকেই উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন।

সনাতন সুলতানের বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন। সেইজন্য বোধ করি তাঁহাকে মুসলমানি আদব কায়দা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তবে ঘরে হিন্দুর আচার বিচার ছিল। পরে তিনি ভাগবত-রসলুব্ধ ও কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। তবুও বরাবর "হীন ম্লেচ্ছ" বলিয়া আত্মদৈন্যে মুখর ছিলেন। রূপ অতটা দৈন্য করিতেন না। অনুপম কি কাজ করিতেন জানি না, তবে তিনি সম্পূর্ণভাবে ম্লেচ্ছাচার বর্জন করিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। রামভক্ত অনুপম রামায়ণ-গান শুনিতে ও করিতে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। এই তিন ভাইয়ের কাহারও জন্মকাল জানা নাই। সনাতন ও রূপ দুইজনেই চৈতন্যের চেয়ে বয়সে বেশ বড় ছিলেন। সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন। সনাতনের তিরোভাব হয় ১৫৫৪ খ্রীস্টাব্দের অল্পকাল পরে। রূপের হয় সম্ভবত পাঁচ ছয় বছর পরে। রূপ ও অনুপম সনাতনের আগে দরবার পরিত্যাগ করেন। চৈতন্যের সহিত তাঁহাদের দেখা হয় প্রয়াগে। সেখানে তাঁহারা এক মাস থাকিয়া গৌড়ে চলিয়া আসেন। গৌড়ে অনুপমের দেহত্যাগ হয় (১৫১৫-১৬)। তখন অনুপমের পুত্র জীব শিশু।

গৌড় হইতে রূপ নীলাচলে চৈতন্যের কাছে আসিলেন। বৃন্দাবনে তিনি এক কৃষ্ণলীলা নাটকের পত্তন করিয়াছিলেন। পথেও একটু একটু লেখা চলিতে-ছিল। পুরীতে আসিয়া চৈতন্যের কথায় বুঝিলেন যে সমগ্র কৃষ্ণলীলা—ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা—একটি নাটকে নিবদ্ধ করা সমীচীন হইবে না। তিনি

পুরীতে থাকিতেই দুইটি নাটক পৃথক করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। যতটুকু লেখা হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু চৈতন্য শুনিয়া খুশি হইয়া[১] বলিলেন, "ব্রজে তুমি রসশাস্ত্র কর নিরূপণ"। চার মাস নীলাচলে থাকিয়া রূপ গৌড়ে গেলেন। সেখানে এক বছর থাকিয়া আত্মীয়স্বজনের ব্যবস্থা ও ধনসম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া আসিলেন। তাহার পর ব্রজমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও রূপ যান নাই।

পুরীতে যে নাটক দুইটি আরম্ভ করিয়াছিলেন (১৫১৬) তাহার একটি সম্পূর্ণ হয় ১৫৮১ সংবতে (=১৫২৪) গোকুলে, দ্বিতীয়টি ১৪৫১ শকাব্দে (=১৫২৯) ভদ্রবনে।[২] ইহার দীর্ঘকাল পরে রূপ গোস্বামী তাঁহার তৃতীয় এবং শেষ নাট্যনিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। এটি একটি একোক্তি নাটক ("ভাণিকা"), নাম 'দানকেলীকৌমুদী', বিষয় কৃষ্ণের ঘাটদান লীলা। এ বিষয় কোন পুরাণে নাই। তবে বাঙ্গালা দেশে কবিতায় ও গানে প্রচলিত ছিল।[৩] রাধাকুণ্ড-তীরবাসী প্রিয় সুহৃদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামীর চিত্তবিনোদনের জন্য রূপ দানকেলীকৌমুদী রচনা করিয়াছিলেন নন্দীশ্বরে থাকিয়া ১৪৭১ শকাব্দে (=১৫৪৯)।[৪] ভরতবাক্য এই,

রাধাকুণ্ডতটীকুটীরবসতিস্ত্যক্তান্যকর্মা জনঃ
সেবামেব সমক্ষমত্র যুবয়োর্বঃ কর্তু্মুৎকণ্ঠতে।

[১] দ্বিতীয় নান্দী শ্লোকে চৈতন্যের অবতাররূপে বন্দনা ছিল। তাহা চৈতন্যের ভালো লাগে নাই। তবে ভক্তেরা সকলে রূপকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

[২] বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটক দুইটির রচনাকাল সব পুথিতে ও ছাপা বইয়ে পাওয়া যায় না। নির্ভরযোগ্য প্রাচীন পুথিতে (এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি I G 8) পুষ্পিকায় খাঁটি রচনা-কাল নির্দেশ আছে।

"রাধাবিলাসবীতাঙ্কং চতুঃষষ্টিকলাধরম্।
বিদগ্ধমাধবং সাধু শীলয়ন্তু বিচক্ষণাঃ॥
নন্দসিন্দূরবাণেন্দুসংখ্যে সংবৎসরে গতে।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্॥"

"পূর্ণং কলাচতুঃষষ্ট্যা লক্ষণৈর্ভূষিতৈরপি।
ভজন্তু শ্রিতগান্ধর্বং ধীরা ললিতমাধবম্॥
নন্দেষুবেদেন্দুমিতে শকাব্দে শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাম্।
দিনে দিনেশস্য হরিং প্রণম্য সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধম্॥"

[৩] পূর্বে দ্রষ্টব্য। দানকেলীকৌমুদী প্রথম ছাপা হয় ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে বহরমপুরে ('বৈষ্ণবধর্ম প্রকাশিকা' নামে বিদগ্ধমাধব সহ), দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে বহরমপুরে।

[৪] "গতে মনুশতে শাকে স্বরচন্দ্রসমন্বিতে।
নন্দীশ্বরে নিবসতা ভাণিকেয়ং বিনির্মিতা॥"
মুদ্রিত পাঠ "চন্দ্রস্বর" ভ্রান্ত।

বৃন্দারণ্যসমৃদ্ধিদোহদপদক্রীড়াকটাক্ষচ্ছটাভে‌স্
তর্ষাখ্যস্তরুরস্য মাধব ফলী তূর্ণং বিধেয়স্ত্বয়া।

'রাধাকুণ্ডের ধারে কুটীরবাস করিয়া অন্যকর্ম ত্যাগ করিয়া এই যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের দুই জনের সেবা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে, হে মাধব, তোমার লীলাকটাক্ষচ্ছটায় বৃন্দাবনের সমৃদ্ধি-সাধের পদক্ষেপে ইহার বাসনাতরু শীঘ্রই তোমাকে ফলবান্ করিয়া দিতে হইবে।'

'উদ্ধবসন্দেশ', 'গীতাবলী' ও 'পদ্যাবলী'র কথা আগে বলিয়াছি। তাহা ছাড়া রূপ বহু স্তবজাতীয় ছোট ছোট কাব্য ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। অপর বড় রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রের বই দুইখানি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'।[১] রূপ ইহাতে কৃষ্ণলীলা ভাবনাকে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের রসাভিব্যক্তির পথে প্রবাহিত করিয়া দিলেন।[২] পরবর্তী কালে যাঁহারা গীতিকবিতায় অথবা গেয় ও পাঠ্য কবিতায় কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই বিশেষ করিয়া উজ্জ্বলনীলমণির অল্পবিস্তর অনুশীলন করিয়াছিলেন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রথম তিন শ্লোকে যথাক্রমে রাধাকান্ত কৃষ্ণের, চৈতন্যের, ও গুরু সনাতনের বন্দনা। চৈতন্যবন্দনা-শ্লোকে নিজের নাম শ্লেষে উল্লিখিত।

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য।

'আমি হীনরূপ (বা হীন রূপ) হইয়াও হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণায় (এই গ্রন্থকর্মে) প্রবর্তিত হইয়াছি সেই চৈতন্যদেব হরির পদকমল বন্দনা করি।'

মনে হয় বইটি আরম্ভ করিবার সময়ে চৈতন্য প্রকট ছিলেন। তবে উজ্জ্বল-নীলমণি রচনায় হাত দিবার অনেক আগেই চৈতন্য অপ্রকট হইয়াছিলেন। বোধ করি সেই জন্যই বন্দনায় চৈতন্যের নাম ধরিয়া উল্লেখ নাই, গুরুর নামের শ্লেষে উল্লিখিত। (অথবা বইটির আরম্ভ কি গৌড়েই হইয়াছিল ?)

নামাকৃষ্টরসজ্ঞঃ শীলেনোদ্দীপয়ন্ সদানন্দম্।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভু র্জয়তি।

'রসজ্ঞ যিনি নামে আকৃষ্ট, চারিত্র্যে যিনি সদা আনন্দ উদ্দীপন করেন, তিনি নিজ রূপে (বা নিজ ভৃত্য রূপকে) উৎসব দান করেন, সেই সনাতনাত্মা প্রভু (বা সনাতন-রূপী গুরু) বিজয়ী হোন।'

---

১ বহরমপুর, বোম্বাই, নবদ্বীপ ইত্যাদি স্থান হইতে বিবিধ সংস্করণে প্রকাশিত।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর রচনা সমাপ্ত হয় গোকুলে ১৪৬৩ ("রামাঙ্গশক্র") শকাব্দে (= ১৫৪১)। উজ্জ্বলনীলমণি তাহার পরে লেখা (অথবা সম্পূর্ণ) হইয়াছিল।

২ কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে চৈতন্য রূপের দ্বারা ইহাই করাইতে চাহিয়াছিলেন। "শ্রীরূপ দ্বারায় ব্রজে প্রেমরসলীলা"।

৪

সনাতন-রূপের বৈরাগ্যভাব আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হোসেন-শাহার দরবারে হাওয়া বদলের পালা আসিয়াছিল। গৌড়-সুলতান হোসেন-শাহা সকীকে সদলবলে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে গৌড়-দরবারে পশ্চিমা মুসলমানদের প্রভাব জাগিতে থাকে বলিয়া মনে হয়। সনাতন চৈতন্যের প্রথম সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন রামকেলিতে। চৈতন্য তখন প্রথমবার বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বহু লোক জুটিয়া গিয়াছিল। সেইজন্য সনাতন সবিনয়ে ফিরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।[১] রাজমন্ত্রীর ইঙ্গিতে চৈতন্য বুঝিলেন, মুসলমান রাজার রাজধানীর উপর দিয়া এত লোক-সংঘট্টে যাওয়া উচিত হয় নাই। সেইখান হইতেই তিনি শান্তিপুর-কুমারহট্ট হইয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল আগেই সনাতন ও রূপ চৈতন্যের কাছে কর্তব্যাকর্তব্য জানিবার জন্য নিবেদনপত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে চৈতন্য একটি প্রাচীন শ্লোক লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেই শ্লোকটির মধ্যে চৈতন্যভাবিত রাগানুগ প্রেমভক্তির এবং পরবর্তী পরকীয়-প্রেমসাধনার মর্মকথা আছে।

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্।

'পরপুরুষানুরক্ত নারী ঘরের কাজে মন দিয়া থাকিলেও সে সর্বদা অন্তরে অন্তরে সেই নবনাগরের সঙ্গচিন্তারূপ রসায়ন আস্বাদ করিতে থাকে।'

চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর সনাতন অসুস্থতার ভান করিয়া রাজকার্য উপেক্ষা করিয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন। তাঁহাকে দেখিতে সুলতান তাঁহার খাশ চিকিৎসককে পাঠাইলেন। চিকিৎসক সনাতনকে শরীরে সুস্থ দেখিয়া সুলতানকে জানাইলে সুলতান নিজে সনাতনকে দেখিতে আসিলেন

[১] নীলাচলে ফিরিয়া চৈতন্য সার্বভৌম প্রভৃতিকে এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা চৈতন্য-চরিতামৃত (২. ১৬) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। চৈতন্য লোকচিত্তকে কতটা প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য ইহাতে মিলিবে।

"বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া, নিজ মাতা আর গঙ্গার চরণ দেখিয়া।
এত মনে করি কৈলুঁ গৌড়েরে গমন, সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে, লোকের সঙ্ঘট্টে পথ না পারি চলিতে।
যথা রহি তথা ঘর-প্রাচীর হয় চূর্ণ, যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ।...
গমনকালে সনাতন প্রহেলী কহিল।
'যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটী, বৃন্দাবন যাত্রার এই নহে পরিপাটী।'"

এবং রাজকার্যে মন দিতেছেন না বলিয়া তিরস্কার করিলেন আর তাঁহার সঙ্গে অভিযানে যাইতে বলিলেন। সনাতন বলিলেন, আমার দ্বারা আর কোন কাজ হইবে না, আমাকে ছাড়িয়া দাও। স্থলতান ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমি অভিযানে চলিলাম, তুমি বন্দীশালায় থাক। স্থলতানের হুকুমে তাঁহার পায়ে বেড়ি দিয়া কারাগারে রাখা হইল। ইতিমধ্যে রূপ প্রয়াগে গিয়া চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি সনাতনকে পলাইবার পরামর্শ দিয়া চিঠি পাঠাইলেন। রূপ লিখিলেন যে তিনি মুদির কাছে দশ হাজার টাকা রাখিয়া আসিয়াছেন। তাহা দিয়া সনাতন যেন মুক্তির চেষ্টা করেন। চিঠি পাইয়া সনাতন খুশি হইয়া নিষ্ক্রমণের চেষ্টা দেখিলেন।[১] কারাধ্যক্ষ একদা তাঁহার অনুগ্রহভাজন ছিল। তাহাকে হাত করিতে "বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি" রাজমন্ত্রী সনাতনকে বেশি বেগ পাইতে হইল না। কারাধ্যক্ষকে বলিলেন, আমাকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিব। তোমার পুণ্য অর্থ দুইই লাভ হইবে। স্থলতান আসিলে,

> তাঁহাকে কহিও—সেই বাহ্যকৃত্যে গেল
> গঙ্গার নিকটে গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল।
> অনেক দেখিল তার লাগি না পাইল
> দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাঁহা চলি গেল।
> কিছু ভয় নাই আমি এ দেশে না রব
> দরবেশ হৈয়া আমি মক্কায় যাইব।

কারাধ্যক্ষের দ্বিধাভাব দেখিয়া সনাতন

> সাত হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল।
> লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া
> রাত্রে গঙ্গা পার হৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া।

ধরা পড়িবার ভয়ে সনাতন গড়িদ্বার পথ এড়াইয়া চলিলেন। ভুঁইয়া সর্দারের সাহায্যে তিনি বনপথে পাতড়া পাহাড় পার হইয়া হাজিপুরে পৌঁছিলেন। সেখানে দেখা হইল ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সঙ্গে। শ্রীকান্ত তিন লক্ষ টাকা লইয়া আসিয়াছেন হরিহরছত্রের মেলায় স্থলতানের জন্য ঘোড়া কিনিতে।[২] শ্রীকান্ত তাঁহাকে পরিচর্যা করিতে চাহিলে সনাতন কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। অবশেষে নির্বন্ধাতিশয্যে শীত নিবারণের একটি "ভোট" (অর্থাৎ তিব্বতী বা পাহাড়ী)

---

[১] চৈতন্যচরিতামৃত ২. ২০ দ্রষ্টব্য।

[২] শোনপুরের মেলা তখনও ছিল। এ মেলা শীতকালে হয়। সনাতন সম্ভবত পৌষ মাসে গৌড় হইতে পলাইয়াছিলেন।

কম্বল মাত্র লইয়া গঙ্গা পার হইয়া বারাণসীতে চলিয়া আসিলেন। রূপ তাঁহাকে কাশীতে চৈতন্যের অবস্থানের কথা জানাইয়াছিলেন। সনাতন কাশীতে গিয়া চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হইলেন। দুই মাস কাশীতে চৈতন্যের সঙ্গে রহিলেন। চৈতন্য তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বৃন্দাবনে যাইতে বলিলেন। বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া শুনিলেন যে রূপ গৌড় হইয়া নীলাচলে চলিয়া গিয়াছেন। কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া তিনি বৃন্দাবন ছাড়িয়া বনপথে নীলাচলে আসিলেন। চৈতন্য প্রীত হইয়া তাঁহাকে কয়েক মাস রাখিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে থাকিয়া চৈতন্যনির্দেশ মতে এই কাজ করিতে লাগিলেন,

ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণ প্রেমতত্ত্বের নির্ধার
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব-আচার।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবাপ্রবর্তন
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্যশিক্ষণ।[১]

সনাতন প্রেমভক্তিতত্ত্ব নির্ণয় করিলেন 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃত' বইটিতে।[২] ইহার টীকা 'দিগ্‌দর্শিনী'ও তাঁহার লেখা। তাহা ছাড়া তিনি ভাগবতের দশম স্কন্ধের টিপ্পনীও লিখিয়াছিলেন 'বৈষ্ণবতোষণী' নামে। 'হরিভক্তিবিলাস' বৈষ্ণবকৃত্য ও বৈষ্ণবাচার শাস্ত্র। এ গ্রন্থের রচয়িতা রূপে সনাতন-রূপের বয়ঃকনিষ্ঠ সহযোগী গোপাল ভট্টের নামই বেশি পাওয়া যায়। মনে হয় সনাতন বৈষ্ণবতোষণী যেমন জীবকে দিয়া (বড় করিয়া ?) লিখাইয়াছিলেন তেমনি হরিভক্তিবিলাস গোপাল ভট্টকে দিয়া বাড়াইয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামীর রচিত 'তাৎপর্যদীপিকা' নামে মেঘদূত-টীকা পাওয়া গিয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণবজীবনীগ্রন্থে এ বইয়ের কোন উল্লেখ নাই। নিশ্চয়ই ইহা গৌড়ে থাকার সময়ে লেখা হইয়াছিল।

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থের মধ্যে গুরুত্ব এবং মৌলিকতা দুই দিক দিয়াই বৃহদ্‌ভাগবতামৃত সমধিক উৎকৃষ্ট রচনা। বইটি যেন ভাগবতের সার এবং তাহারই উত্তরখণ্ডরূপে লেখা। জৈমিনি বক্তা, জনমেজয় শ্রোতা। বিষয় শুকশিষ্য পরীক্ষিৎ কর্তৃক মাতা উত্তরাকে রূপককাহিনীর মধ্য দিয়া ভাগবত-তত্ত্বকথা বর্ণনা। প্রথমখণ্ড উপক্রমণিকার মতো। ইহাতে পুরাণপ্রোক্ত বিবিধ

[১] চৈতন্যচরিতামৃত ৩. ৪।

[২] নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্তৃক বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত, চৈতন্যাব্দ ৪১৯।

দেব ও মানব চরিত্র অবলম্বনে ভক্তিকথা বিবৃত। দ্বিতীয় খণ্ডে পাই রূপক-কাহিনীচ্ছলে প্রেমভক্তিসাধন কথা। কামরূপবাসী এক ব্রাহ্মণবালক স্বপ্নে দেবী কামাখ্যার কাছে দশাক্ষর গোপালমন্ত্র পাইয়া গঙ্গাসাগর কাশী গৌড় শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি নানা তীর্থ ও বিদ্যাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে বৃন্দাবনে আসে। সেখানে এক গোপকুমারের সঙ্গে পরিচয় হয়। গোপকুমার তাহাকে নিজের সাধন ও সিদ্ধির কথা বর্ণনা করিলেন। দশাক্ষর মন্ত্র জপিয়া গোপবালক সাধনার উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে লাগিলেন। তিনি স্বর্লোক মহর্লোক জনলোক তপোলোক ঘুরিলেন। সমাধি সত্য ও মুক্তি বুঝিলেন, ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ তত্ত্ব বুঝিলেন এবং আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর গেলেন শিবলোকে, সেখান হইতে বৈকুণ্ঠে। বৈকুণ্ঠে গিয়া বুঝিলেন ধ্যান হইতে সংকীর্তনের শ্রেষ্ঠতা। নারদের সঙ্গে তাঁহার কথা হইল। অবতারতত্ত্ব, ভগবৎমূর্তির চিন্ময়ত্ব ও মাহাত্ম্য, ভগবৎশক্তির অগাধত্ব,. কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা ইত্যাদি বুঝিয়া অযোধ্যায় ও দ্বারকায় গেলেন এবং সেখান হইতে গোলোক-বৃন্দাবনে পৌছিলেন। এখানে কৃষ্ণের করুণ ব্রজলীলার মাহাত্ম্য, জীবের আচার ও গোলোকপ্রাপ্তির উপায়, প্রেমপ্রাপ্তির সাধন ইত্যাদি অধিগত হইলে পর তিনি ব্রজে গিয়া মদনগোপালের দর্শনলাভ করিলেন। তাহার পর গোলোকধাম দর্শন, কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ ও গোলোকনাথের দর্শনলাভ। তাহার পর গোলোকমাহাত্ম্য বলিয়া গ্রন্থশেষ।

গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে শ্লেষের দ্বারা কৃষ্ণের ও চৈতন্যের বন্দনা এবং সেই সঙ্গে ভ্রাতা-শিষ্য রূপের নাম করিয়া শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। সনাতন চৈতন্যকে কিভাবে দেখিয়াছিলেন তাহার পরিচয় ইহাতে পাই।

জয়তি নিজপদাব্জপ্রেমদানাবতীর্ণো
বিবিধমধুরিমাব্ধিঃ কোঽপি কৈশোরগব্ধিঃ।
গতপরমদশান্তং যস্য চৈতন্যরূপাদ্
অনুভবপদমাপ্তং প্রেম গোপীষু নিত্যম্॥

'যিনি নিজপাদপদ্মে প্রেমদানের জন্য অবতীর্ণ, যিনি বিবিধ মাধুর্যের আকর, যাঁহার পরম দশাপ্রাপ্ত চৈতন্যরূপ হইতে গোপীদের প্রেম নিত্য অনুভবের বিষয় হইয়াছে, সেই কৈশোরমাধুর্যবান্ অনির্বচনীয়ের জয় হোক।'

দ্বিতীয় শ্লোকে রাধিকা প্রভৃতি গোপীদের বন্দনা।

শ্রীরাধিকাপ্রভৃতয়ো নিতরাং জয়ন্তি
গোপ্যো নিতান্তভগবৎপ্রিয়তাপ্রসিদ্ধা।...

'শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীদের অত্যন্ত জয় হোক, যাঁহারা ভগবানের পরমপ্রেয়সী রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।...'

তৃতীয় শ্লোকে চৈতন্যের বন্দনা।

স্বদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ
সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ।
জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ।

'স্বভাববশে যিনি স্বভক্তদের সুমধুর নিজভাব কল্পনা করিয়া লোভবশত ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (সেই) শ্রীশচীনন্দন, কনককায়, যতিবেশধারী, কৃষ্ণচৈতন্য নামে হরির জয় হোক।'

সনাতন রাধাকে গোপীদের মধ্যে রাখিয়াছেন, কৃষ্ণতুল্য অথবা কৃষ্ণাধিক করেন নাই এবং চৈতন্যকেও রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার বলেন নাই, ইহা এখানে লক্ষণীয়॥

৫

যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া চৈতন্যের উপদেশে বৃন্দাবনে বাস ও ভক্তিপ্রচার কাজ স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন সনাতন ও রূপ। ইহাদের নামের সঙ্গে আর চারজন সহযোগীর নাম জড়িত হইয়া আছে। এই ছয়জন বৃন্দাবনের "ছয় গোসাঞি" বলিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রথিত। ইহাদের সঙ্গে প্রভাবশালী ভক্ত আরও কয়জন ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাধনভজন লইয়া একান্তে থাকিতেন বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে বৈষ্ণবজীবনীকারেরা নীরব রহিয়া গিয়াছেন। "ছয় গোসাঞি" নামটি কৃষ্ণদাস কবিরাজই চালাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট-রঘুনাথ
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।
এই ছয় গোসাঞির করি চরণবন্দন
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ।

সনাতন ও রূপের বৃন্দাবনে আগমনের কয়েক বছর পরে চৈতন্যের নির্দেশে এবং প্রকটকালে রঘুনাথ ভট্ট (ভট্টাচার্য) ব্রজবাস করিয়াছিলেন। রঘুনাথ চৈতন্যের প্রথম অনুশিষ্ট ভক্ত (—"শিষ্য" বলিব না, কেন না চৈতন্য কাহাকেও গুরুরূপে দীক্ষা দেন নাই—) তপন মিশ্রের পুত্র। বৃন্দাবনে গমনাগমনের সময় চৈতন্য কাশীতে দুইবার আসিয়াছিলেন। দুইবারই তপন মিশ্রের ঘরে তাঁহার ভিক্ষা নির্বাহ হইত। বালক রঘুনাথ সে সময়ে তাঁহার পরিচর্যা করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।[১] বড় হইয়া রঘুনাথ নীলাচলে চৈতন্যের

[১] রঘুনাথ ভট্টাচার্য রন্ধনকার্যে সুনিপুণ ছিলেন। নীলাচলে থাকিবার সময় তিনি প্রায়ই মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন।

কাছে আসিয়াছিলেন। আট মাস রাখিয়া চৈতন্য তাঁহাকে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

> অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা
> বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিলা।
> বৃদ্ধ মাতা পিতা যাই করহ সেবন
> বৈষ্ণবস্থানে ভাগবত কর অধ্যয়ন।
> পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে
> এতবলি কণ্ঠমালা দিল তার গলে।

কাশীতে আসিয়া রঘুনাথ চার বৎসর রহিলেন। তাহার পর পিতা-মাতার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে আবার নীলাচলে আসিলেন। এবারেও আট মাস কাছে রাখিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে বিদায় দিলেন। বলিলেন

> আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবন
> তাহাঁ যাই রহ যাহাঁ রূপ সনাতন।
> ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম···
> চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা
> ছুটা পানবিঁড়া মহোৎসবে পাইয়াছিলা।
> সেই মালা ছুটা পান প্রভু তারে দিলা
> ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা।

বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামীর সভায় রঘুনাথ ভাগবত পাঠ করিতেন। তাহা সকলকেই মুগ্ধ করিত। একে ত তিনি ভাবুক ভক্ত, তাহার উপর সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতজ্ঞ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন

> পিকস্বর কণ্ঠ তাহে রাগের বিভাগ
> এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ।

চৈতন্যচরিতামৃত রচনা শেষ হইবার আগেই রঘুনাথের তিরোধান হয়। অন্ত্য লীলার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রঘুনাথের নির্বাণ সংক্ষেপে উল্লিখিত আছে।

> মহাপ্রভু-দত্ত মালা মরণের কালে
> প্রসাদ-কড়ার সহ বান্ধিলেন গলে।

রঘুনাথের ব্যক্তিত্বে সকলেই আকৃষ্ট হইত। অনেকে মনে করেন মহারাজা মানসিংহ রঘুনাথকে গুরু বলিয়া মানিতেন এবং ইহারই প্রীতিকামে গোবিন্দের মন্দির ও সেবাব্যবস্থা করিয়াছিলেন॥[১]

---

১ *Mathura*, F. S. Growse, পৃ ২৪৩-৪৪ দ্রষ্টব্য।

৬

চৈতন্যের ও স্বরূপ-দামোদরের তিরোধানের পরে রঘুনাথ দাস (মৃত্যু আনুমানিক ১৫৮২) ব্রজমণ্ডলে আসিয়াছিলেন। চৈতন্যের টানে যাঁহারা ব্যাকুল হইয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই অসামান্য দৃঢ় চরিত্রের লোক। রঘুনাথ দাস এই অসামান্যদের মধ্যেও অসামান্য। তাঁহার বৈরাগ্য-ব্যাকুলতার ও কৃচ্ছ্রসাধনার তুলনা ইতিহাসে নাই। সপ্তগ্রাম-নিবাসী দুই ভাই হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাস আদুয়া মুলুকের ইজারা লইয়াছিলেন। তাঁহাদের আদায় ছিল বিশ লক্ষ টাকা। সদ্বংশজাত, কায়স্থ, দুই ভাই সদাচারে রত ও ধর্মনিষ্ঠ। তাঁহারা নবদ্বীপের বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পোষণকর্তা ছিলেন।[১] চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁহাদের ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার চলিত। তাঁহারা চৈতন্যের পিতার সেবা করিয়াছিলেন এবং অদ্বৈত আচার্যকে তাঁহারা গুরুবৎ মান্য করিতেন। সুতরাং চৈতন্য তাঁহাদের জানিতেন। বড় ভাই হিরণ্য নিঃসন্তান। ছোট ভাই গোবর্ধনের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ। ইহাদের কুলপুরোহিত যদুনন্দন আচার্য অদ্বৈতের শিষ্য এবং চৈতন্যের নিষ্ঠাবান্ ভক্ত ছিলেন। ইনিই রঘুনাথের দীক্ষাগুরু।[২] বাল্যকালে রঘুনাথ কিছুদিন হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। তাই "বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস"। সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া চৈতন্য যখন শান্তিপুরে আসিলেন তখন তাঁহাকে দেখিতে অনেকের মতো রঘুনাথও আসিয়াছিলেন। অদ্বৈতের অনুগ্রহে রঘুনাথ তাঁহার গৃহে থাকিয়া "প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত"। চৈতন্য তাঁহাকে ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ঘরে আর মন বসিতে চাহিল না। নীলাচলে প্রভুর কাছে চলিয়া যাইতে ঘুরনাথ বার বার চেষ্টা করিলেন। পথ হইতে ধরিয়া আনিয়া পিতা তাঁহাকে সর্বক্ষণ নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন।

> পঞ্চ পাইক তারে রাখে রাত্রি দিনে
> চারি সেবক দুই ব্রাহ্মণ রহে তার সনে।
> একাদশ জন তারে রাখে নিরন্তর
> নীলাচল যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর।

গৌড় হইতে ফিরিবার পথে চৈতন্য শান্তিপুরে দুই চার দিন ছিলেন। তখন

---

[১] "নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়, অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়।" (চৈতন্যচরিতামৃত ২. ১৬)।

[২] বিলাপকুসুমাঞ্জলি শ্লোক ৪ দ্রষ্টব্য।

রঘুনাথ পিতাকে বলিয়া সেখানে চৈতন্যকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।[১] রঘুনাথ সাত দিন অদ্বৈত-গৃহে মহাপ্রভুর কাছে রহিলেন। তাঁহার মনে সর্বদা এই চিন্তা

রক্ষকের হাতে মুক্তি কেমনে ছুটিব
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব।

চৈতন্য তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া কহিলেন

স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল।
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।

মনে নিষ্ঠা রাখিয়া সংসারে কাজ করিয়া যাও, যথাসময়ে কৃষ্ণ তোমাকে উদ্ধার করিবেন। আমি বৃন্দাবন হইতে ফিরিলে তুমি কোন উপায়ে আমার কাছে আসিও। কৃষ্ণ যাহাকে টানিবেন তাহাকে কেহ রাখিতে পারিবে না। চৈতন্যের এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া রঘুনাথ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করিতে লাগিলেন। বাপ-মা খুশি হইলেন। রঘুনাথের পাহারা কিছু আলগা হইল।

মথুরা হইতে চৈতন্য নীলাচলে ফিরিয়াছেন, এই খবর পাইয়া রঘুনাথ সেখানে যাইবার উদ্যোগে করিতেছেন এমন সময় সংসারে এক অঘটন ঘটিয়া গেল। হিরণ্য দাস চৌধুরী হওয়ার আগে যে "তুড়ুক" (মুসলমান) শাসনকর্তা চৌধুরী অথবা মজুমদারের কাজও করিত তাহার স্বভাবতই হিংসা হইয়াছিল। বিশ লক্ষ টাকা আদায় রাজস্ব দেয় বার লক্ষ, লাভ থাকে আট লক্ষ। সে তুড়ুক ভাবিয়াছিল হিরণ্য-গোবর্ধন তাহাকে অবশ্য কিছু ভাগ দিবে। ভাগ না পাইয়া সে দরবারে মিথ্যা নালিশ করিল। দরবারে এখন হিন্দুর প্রতিপত্তি কমিয়াছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে ফৌজ লইয়া উজীর তদন্ত করিতে আসিল। খবর পাইয়া দুই ভাই পলাইল। উজীর আসিয়া রঘুনাথকে বন্দী করিল। তাঁহাকে ভয় দেখানো হইল বাপ-জেঠার সন্ধান করিয়া না দিলে শাস্তি দেওয়া হইবে। উজীর ভয় দেখায় কিন্তু শাস্তি দিতে সাহস পায় না।[২]

বিশেষ কায়স্থবুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর
মুখে তর্জে গর্জে মারিতে সভয় অন্তর।

---

১ "এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা,
আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ,
শুনি তাঁর পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া,
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন।
পাঠাইল তারে শীঘ্র আসিহ করিয়া।"

২ চৈতন্যচরিতামৃত ৩. ৬।

শেষে রঘুনাথ সে তুড়ুককে বুঝাইলেন, আমার বাপ-জেঠা ও তুমি ভাইয়ের মতো ছিলে। ভাইদের মধ্যে ঝগড়া যেমন আজ আছে কাল নাই, তোমাদের বিবাদও তেমনি একদিন মিটিয়া যাইবে। তুমি আমার বাপ-জেঠার মতো। আমাকে শাস্তি দেওয়া তোমার উচিত নয়। রঘুনাথের এই কথায় তুড়ুকের মন ভিজিয়া গেল। সে উজীরকে বলিয়া রঘুনাথকে মুক্ত করিল আর বলিল

তোমার নিবু দ্ধি জেঠা অষ্ট লক্ষ খায়
আমিহ ভাগী আমারে কিছু দিবারে জুয়ায়।
যাহ তুমি তোমার জেঠা মিলাহ আমারে
যেমত ভাল হয় করুন ভার দিল তাঁরে।

রঘুনাথ সব মিটমাট করিয়া দিলেন।

এমনি করিয়া এক বছর গেল। দ্বিতীয় বছরে রঘুনাথ বার বার পলাইবার চেষ্টা করায় মাতা স্বামীকে বলিল, "পুত্র যে বাতুল হৈল রাখহ বান্ধিয়া।" গোবর্ধন দুঃখিত হইয়া বলিলেন

ইন্দ্র-সম ঐশ্বর্য স্ত্রী অপ্সরা সম
এসব বান্ধিতে নারিলেক যার মন।
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিব কেমতে
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে।

তা ছাড়া চৈতন্য উহাকে টানিয়াছেন, "চৈতন্যপ্রভুর বাতুল কে রাখিবে ঘরে"?

নিত্যানন্দ পানিহাটিতে আসিয়াছেন শুনিয়া রঘুনাথ দেখা করিতে গেলেন। সেবক প্রভুকে জানাইল, রঘুনাথ প্রণাম করিতেছে। আনন্দিত হইয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন

নিকটে না আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে।
দধি-চিঁড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে…

রঘুনাথ তৎক্ষণাৎ চারদিকে লোক পাঠাইয়া প্রচুর চিঁড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ কলা মাটির গামলা মালসা ইত্যাদি জোগাড় করিলেন। মহোৎসব হইতেছে শুনিয়া অগণ্য জনসমাগম হইল। নিত্যানন্দ, বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ, ব্রাহ্মণ সজ্জন ও সাধারণ লোক সব ভোজনে বসিয়া গেলেন। তীরে যাহারা খাইতে ঠাঁই পাইল না তাহারা জলে দাঁড়াইয়া মালসা হাতে খাইতে লাগিয়া গেল। চিঁড়া-দধির পর সকলকে মালাচন্দন (ও যথাযোগ্য দক্ষিণা) দেওয়া হইল। নিত্যানন্দ খুশি হইয়া রঘুনাথকে আশীর্বাদ করিলেন

নিশ্চিন্তে হইয়া যাহ আপন ভবন
অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্যচরণ।

পানিহাটির এই চিঁড়াদধি মহোৎসব বৈষ্ণব-ইতিহাসে এক বৃহৎ স্মরণীয় ঘটনা।

ঘরে ফিরিয়া রঘুনাথ আর অন্তঃপুরে ঢুকিলেন না, "বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন"। সর্বদা চিন্তা কি করিয়া রক্ষকদের এড়াইয়া পালানো যায়। একদিন শোনা গেল, গৌড় হইতে ভক্তেরা নীলাচলে যাইতেছেন। রঘুনাথের মন ছটফট করিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই, তাহাদের সঙ্গে গেলে ধরা পড়িবেনই। কয়েক দিন পরে শেষ রাত্রিতে সুযোগ মিলিল। যদুনন্দন আচার্যের সঙ্গে একটু কাজে রঘুনাথ বাহিরে গেলেন। জাগরণক্লান্ত রক্ষীরা সঙ্গে গেল না, গুরু যদুনন্দন আছেন বলিয়া। মধ্যপথে রঘুনাথ ঘরে যাই বলিয়া চলিয়া আসিলেন। যদুনন্দন আচার্যের খেয়াল ছিল না যে রঘুনাথ এই সুযোগে পলাইতে পারেন। রঘুনাথ সটান নীলাচলের দিক ধরিলেন—পথে নয় অপথে। পথে গেলে ধরা পড়িবেন বলিয়া।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণ চিন্তিয়া
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া।
গ্রামের পথ ছাড়িয়া যায় বনে বনে…
পঞ্চদশ ক্রোশ চলি গেলা এক দিনে।

ধরিয়া আনিতে বাপ লোক পাঠাইলেন কিন্তু কোন সন্ধান মিলিল না। সন্ধান যখন মিলিল তখন রঘুনাথ চৈতন্যচরণে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। গৌড়ের ভক্তদের পৌঁছিবার তখনও অনেক দেরি।

বার দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম
পথে তিন দিন মাত্র করিল ভোজন।

চৈতন্য খুশি হইয়া বলিলেন, তোমার বাবা-জেঠা ভালো লোক, "ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণসহায়", তবুও তাঁহারা বিষয়ী। কৃষ্ণের অশেষ কৃপা তোমাকে বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। তাহার পর মহাপ্রভু

রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্রচিত্ত হঞা।
এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে
পুত্র ভৃত্য রূপে তুমি কর অঙ্গীকারে।

পথে রঘুনাথের উপবাস গিয়াছে জানিয়া মহাপ্রভু সেবক গোবিন্দকে বলিয়া দিলেন, "কতদিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ"। দুই-চার দিন পরে রঘুনাথ চৈতন্যের প্রসাদ না খাইয়া জগন্নাথমন্দিরের সিংহদ্বারে অযাচিত ভিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন।[১] এ কথা গোবিন্দ মহাপ্রভুকে জানাইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম আচরিল"।[২]

---

১ "জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীর গণ,
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া,
এইমত সর্বকাল আছে ব্যবহারে,
সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেতে গমন।
পসারির ঠাঞি অন্ন দেন কৃপা ত করিয়া।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া রহে সিংহদ্বারে।"

২ "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান,
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর ভগবান্।"

স্বরূপ-দামোদরের দ্বারা রঘুনাথ মহাপ্রভুর কাছে সাক্ষাৎ উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, স্বরূপকে তোমার উপদেষ্টা করিয়া দিয়াছি। উহার কাছে শিক্ষা কর। আমার চেয়ে অনেক বেশি উনি জানেন। তবে আমার কথায় যদি তোমার বিশেষ শ্রদ্ধা থাকে তবে এই উপদেশ পালন করিও,

> গ্রাম্যকথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্তা না কহিবে
> ভাল না খাইবে রঘু ভাল না পরিবে।
> অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে
> ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।

ইতিমধ্যে গৌড়ের ভক্তেরা আসিয়া পড়িল এবং চারমাস রহিয়া প্রত্যাবর্তন করিল। তাহাদের কাছে রঘুনাথের খবর পাইয়া গোবর্ধন ও তাঁহার স্ত্রী, এক ব্রাহ্মণ, দুই চাকর ও চার শত টাকা তখনি পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু পরের বারে ভক্তদের সঙ্গে ছাড়া পাঠানো সম্ভব হইল না। রঘুনাথ কিছুই স্বীকার করেন নাই। তবে সেই টাকায় দুই বৎসর মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করা চলিয়াছিল। শেষে সে নিমন্ত্রণ করাও রঘুনাথ ছাড়িয়া দিলেন। মহাপ্রভু স্বরূপের কাছে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, রঘুনাথ বুঝিয়াছে যে প্রভু অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহার মনে পাছে কষ্ট হয় ভাবিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছিলেন।

> উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ
> না মানিলে দুঃখী হইবেক মূর্খ জন।

শুনিয়া মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইলেন।

কিছুদিন পরে চৈতন্য গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে রঘুনাথ আর সিংহদ্বারে ভিক্ষার জন্য দাঁড়ায় না। দুপুরবেলায় ছত্রে যাইয়া মাগিয়া খায়। শুনিয়া

> প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার
> সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার।

চৈতন্য রঘুনাথকে নিজের দুইটি প্রিয় বস্তু দান করিলেন—গোবর্ধনের শিলা আর গুঞ্জামালা।[১] রঘুনাথ সেই শিলার পূজা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পর ছত্রে গিয়া ভিক্ষামাগাও ছাড়িয়া দিলেন। শরীরপোষণের জন্য রঘুনাথ এখন যাহা করিতে লাগিলেন তাহা আগে কোন কৃচ্ছ সাধক করিয়াছেন বলিয়া লেখা নাই।

---

[১] শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে ইহা আনিয়া চৈতন্যকে দিয়াছিলেন। চৈতন্য—"স্মরণের কালে গলে ধরে গুঞ্জামালা। গোবর্ধনশিলা কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে, কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু শিরে করে।... এইমত তিন বৎসর শিলা মালা ধরিল"।

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায়।
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে
সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গী গাই খাইতে না পারে।
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি
ভাত পাখালিয়া ফেলে দিয়া দিয়া বহু পানি।
ভিতরেতে দড় যেই মাজি ভাত পায়
লোন দিয়া রঘুনাথ সেই ভাত খায়।

সন্ধান পাইয়া একদিন চৈতন্য আসিয়া এই অন্ন একগ্রাস খাইয়া বলিলেন, অনেক রকম প্রসাদ পাইয়াছি এমন সুস্বাদু প্রসাদ তো কখনও খাই নাই।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রঘুনাথ কঠোর বৈরাগ্য-আচরণ ছাড়েন নাই ও সাধনার রুটিন বিপর্যস্ত করেন নাই। যিনি শেষ জীবনে তাঁহার পরিচর্যা করিতেন সেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন, নীলাচলে

সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে
সবে চারি দণ্ড আহার-নিদ্রা নহে কোন দিনে।
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন।
ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন...[১]

রঘুনাথ ষোল বছর মহাপ্রভুর চরণে ছিলেন। তাহার পর তাঁহার ও স্বরূপ-দামোদরের তিরোভাব হইলে সনাতন-রূপকে প্রণাম করিয়া গোবর্ধন হইতে ভৃগুপাতে পড়িয়া দেহত্যাগ করিবেন ঠিক করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। সনাতন-রূপ তাঁহাকে মরিতে দিলেন না, "নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল"।[২] দুই ভাই প্রত্যহ তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর লীলা শ্রবণ করিতেন। বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড-তীরে রঘুনাথের নিত্যকৃত্য ছিল এই,

অন্ন জল ত্যাগ কৈল অন্য কথন
পল দুই মাঠা মাত্র করেন ভক্ষণ।

---

[১] চৈতন্যচরিতামৃত ২. ৬।

[২] 'অভীষ্টসূচন'এর শেষ শ্লোকে ইহার উল্লেখ আছে,

"যৎপাদাম্বুজযুগ্মবিচ্যুতরজঃসেবাপ্রভাবাদহং
গান্ধর্বাসরসীগিরীন্দ্রনিকটে কষ্টোঽপি নিত্যং বসন্।
তৎপ্রেয়োগণপালিতো জিতসুধাধারামুকুন্দাভিধা
উদ্‌গায়ামি শৃণোমি মাং পুনরহো শ্রীমান্ স রূপোঽবতু॥"

'যাঁহার পাদপদ্মদ্বন্দ্বের স্খলিত রেণু গ্রহণের বলে দুঃখী আমিও রাধাকুণ্ড ও গোবর্ধনের নিকটে নিত্য-বাস করিয়া ও তাঁহার প্রিয়জনের দ্বারা পালিত হইয়া সুধাধারাকে পরাজিত করিয়াছে যে কৃষ্ণনাম তাহা উচ্চকণ্ঠে গান করিতেছি ও শুনিতেছি, সেই শ্রীমান্ রূপ আমাকে রক্ষা করুন।'

সহস্র দণ্ডবৎ করে লয়ে লক্ষ নাম
সহস্র বৈষ্ণবে করে নিত্য পরণাম।
রাত্রি দিন রাধাকৃষ্ণনাম যে সেবন
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন।
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন মান।
সার্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে।

রঘুনাথের জন্মাব্দ ও মরণাব্দ জানা নাই। সনাতন, রূপ ও রঘুনাথ ভট্টের পরে তিনি দেহত্যাগ করেন।[১] চৈতন্যচরিতামৃত রচনার কালে তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। চৈতন্যের শেষ যোল বছরের লীলা রঘুনাথ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাহা সনাতন, রূপ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বৃন্দাবনে তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি ছোট কবিতায় ('চৈতন্যাষ্টক' ও 'গৌরাঙ্গস্তব-কল্পবৃক্ষ') প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ আছে। 'মুক্তাচরিত্র' ও 'দানকেলি-চিন্তামণি' ছাড়া রঘুনাথ অনেকগুলি স্তব ও প্রার্থনা লিখিয়াছিলেন—সবই সংস্কৃতে। সেগুলি 'স্তবমালা'য়[২] সঙ্কলিত। স্তবমালার শ্লোকসংখ্যা সাত শতের উপর। রচনা কোমল ও সহৃদয়।

রঘুনাথ দাসের চরিত্র বেশি করিয়া বলিলাম। তাহার কারণ উন্মেষে বিকাশে ও পরিণতিতে এই চরিত্রটি আদ্যন্ত চৈতন্যভাবপ্রণোদিত। কর্মে-চিন্তায় শিল্পে-সাহিত্যে চৈতন্য-প্রভাবের গভীরতা সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টাচার্য, ইত্যাদির চরিত্রে মিলে। আর তাঁহার ত্যাগ-তপস্যার আদর্শ প্রকটিত সর্বাধিক রঘুনাথ দাসের চারিত্র্যে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহাদের সকলকে জানিতেন এবং তিনিই ইহাদের জীবনকথা বলিয়া গিয়াছেন। হরিদাস ঠাকুর ছাড়া অন্য কোন মহৎ ও মহত্তর চৈতন্যানুচরের বিষয়ে এতটা জ্ঞাতব্য কেহ কিছু বলিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহাদের চরিত্র আমাদের কাছে এমন উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত নয়॥

৭

তাঁহার গুরু ছিলেন প্রবোধানন্দ, এইটুকু ছাড়া গোপাল ভট্টের পরিচয় কিছু জানা নাই।[৩] গোপাল ভট্ট চৈতন্যের গোচরে অবশ্যই আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস

[১] 'প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দশক' শ্লোক ৪ দ্রষ্টব্য।

[২] রাধারমণ যন্ত্র বহরমপুর হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২৩।

[৩] কেহ কেহ অনুমান করেন, ইনি শ্রীরঙ্গম্ নিবাসী ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্র। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে চৈতন্য ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে চাতুর্মাস্য কাটাইয়াছিলেন। একথা সত্য হইলে চৈতন্যচরিতামৃতে অবশ্যই উল্লিখিত হইত। কৃষ্ণদাস গোপাল ভট্টকে ভালো করিয়া জানিতেন।

কবিরাজ চৈতন্যবৃক্ষের শাখা-বর্ণনায় তাঁহার নাম করিয়াছেন।[১] গোপাল ভট্ট অত্যন্ত বিনয়ী ও আত্মলোপী ছিলেন। সনাতন তাঁহাকে দিয়া 'হরিভক্তিবিলাস' পরিবর্ধিত করাইয়া টীকা লিখাইয়াছিলেন। হরিভক্তিবিলাসের টীকা সারার্থদর্শিনীর প্রারম্ভে গোপাল ভট্ট বলিয়াছেন যে, সনাতন রূপ ও রঘুনাথ দাসের সন্তোষের জন্য গ্রন্থটি সংকলন করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কাশীশ্বর, লোকনাথ ও কৃষ্ণদাসেরও নাম করিয়াছেন।[২] অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ও আচার-বিধিনিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া গোপাল ভট্টই বৃন্দাবনে গোস্বামীদের মধ্যে প্রধান দীক্ষাদাতা গুরুর অধিকার পাইয়াছিলেন। সনাতন ও রূপ নিজেদের নীচ শূদ্র বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের গুরুপরম্পরা ঘরোয়া। সনাতনের শিষ্য ভাই রূপ, রূপের শিষ্য ভাইপো জীব। রঘুনাথ ভট্ট আগেই তিরোহিত। তাই ষোড়শ শতাব্দের শেষভাগে গোপাল ভট্টই বৃন্দাবনের প্রধান দীক্ষাগুরু গোস্বামী ছিলেন। ইঁহার তিরোভাব ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ঘটে নাই॥[৩]

৮

জীব গোস্বামী (তিরোভাব আনুমানিক ১৬০৩) সনাতন-রূপের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অনুপম-বল্লভের পুত্র। পিতার মৃত্যুর সময়ে ইনি শিশু ছিলেন। দেশে থাকিয়া লেখাপড়া শেষ হইলে জীব নিত্যানন্দের আশীর্বাদ লইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া আসেন এবং পিতৃব্যের উপদেশ অনুসারে বৈষ্ণবমতের তত্ত্ব ও দর্শন বিচার করিয়া গ্রন্থ লিখিতে থাকেন। সনাতন ও রূপের অন্তর্ধানের পর জীব গোস্বামীই বৃন্দাবনের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের গোষ্ঠীপতিরূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

সম্প্রতি একটি প্রাচীন পুথির[৪] পাতায় জীব গোস্বামী সম্বন্ধে নূতন খবর

---

[১] "শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা সর্বোত্তম, রূপ-সনাতন সঙ্গে যার প্রেম-আলাপন॥" ১. ১০।

[২] সারার্থদর্শিনীর রচনাকাল "পঞ্চষট্‌শক্র" সংখ্যক অর্থাৎ ১৪৬৫ শকাব্দ (= ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ)। উপক্রমে প্রথম শ্লোকে চৈতন্যবন্দনা। তাহার পর এই দুই শ্লোকে মথুরা-বৃন্দাবনের সহযোগী বৈষ্ণব-প্রধানদের উল্লেখ,

"ভক্তে র্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ॥
জীয়াসুরাত্যন্তিক ভক্তিনিষ্ঠাঃ শ্রীবৈষ্ণবা মাথুরমণ্ডলে হত্র।
কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনে চকাস্তু শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ সলোকনাথঃ॥"

[৩] ৩১৭ পৃ ২ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[৪] বর্ধমান সাহিত্যসভার সংগ্রহ। মূল রচনাকাল ১৩৫২ শকাব্দ (= ১৬১০), লিপিকাল ১৬২০ (= ১৬৯৮)। প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য।

সনাতন ও রূপ বৈষ্ণবের আচার ও সাধন-মননকৃত্যের এবং অধ্যাত্মচিন্তার উপযোগী সাহিত্যসঙ্গীতাশ্রিত কৃষ্ণলীলারসাস্বাদনের পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। জীব গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অধ্যাত্মচিন্তাকে ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের বিচারে আনিয়া একটি নূতন ধর্মগোষ্ঠীর উপযোগী বিদ্যার ভিত্তিস্থাপন করিলেন ছয়টি "সন্দর্ভ"[১] ও কয়েকটি টীকাগ্রন্থ[২] ও অন্যান্য বই লিখিয়া। বৈষ্ণববালকের পড়িবার জন্য ব্যাকরণ রচনা করিলেন, 'হরিনামামৃত'। ইহাতে উদাহরণ সবই ভগবানের নাম। অন্যান্য অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিরাট 'গোপালচম্পূ'।[৩] ইহাতে কৃষ্ণের ব্রজলীলার সঙ্গে মিল করিয়া, গোলোকের লীলা পরিপূর্ণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার সমান মর্যাদা স্বীকার করিয়া জীব গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবচিন্তাকে নূতন দিকে ফিরাইয়া দিলেন। এই কাজের সূত্রপাত করিয়াছিলেন রামানন্দ রায় ও স্বরূপ-দামোদর। রঘুনাথ দাসের কাছ হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সে বিষয়ে পরে আলোচনা করিতেছি। কৃষ্ণের মূর্তির বামে রাধা মূর্তির প্রতিষ্ঠা এবং যুগল-মূর্তির উপাসনা জীব গোস্বামীর স্বীকৃতি পাইয়াই প্রথমে বৃন্দাবনে ও পরে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। যুগলমূর্তির স্বীকৃতি হইতেই বল্লভ ভট্টের সম্প্রদায়ের সঙ্গে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শেষ বিচ্ছেদ হইয়া গেল। জীব গোস্বামীর সময় হইতে বাঙ্গালার বৈষ্ণবসমাজ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সর্বাধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল॥

৯

আমরা এখন যে অর্থে প্রচার কথাটি ব্যবহার করি সে অর্থে চৈতন্য প্রচারক ছিলেন না এবং তিনি কখনো কোন ধর্ম প্রচার করেন নাই। বাল্যকাল হইতে তিনি কবিতা ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং শ্লোকের ও গানের মধ্য দিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ তাঁহার চিত্তকে উতলা করিত। এই সূত্রে তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিভাবের উন্মেষ। ভগবানের নাম শুনিলে তাঁহার অপার প্রীতি হইত

---

[১] 'তত্ত্বসন্দর্ভ', 'ভগবৎসন্দর্ভ', 'পরমার্থসন্দর্ভ', 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ', 'ভক্তিসন্দর্ভ', ও 'পরমাত্মসন্দর্ভ'।

[২] জীব গোস্বামী ভাগবতের, ব্রহ্মসংহিতার, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ও উজ্জ্বলনীলমণির টীকা লিখিয়াছিলেন। ভাগবতের টীকার নাম 'ক্রমসন্দর্ভ'।

[৩] গোপালচম্পূ দীর্ঘদিন ধরিয়া লেখা ও সংশোধন চলিয়াছিল। গ্রন্থটি নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ১৯৪৫ সংবতে বৃন্দাবন হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সংস্করণ অনুসারে "পূর্ব বিভাগ" ও "উত্তর বিভাগ" যথাক্রমে ১৬৪৫ ও ১৬৩৯ সংবতে লেখা শেষ হইয়াছিল। *History of Brajabuli Literature* পৃ ৩৮৫ দ্রষ্টব্য।

এবং ভগবানের নাম নাচের সঙ্গে গান করিয়া তিনি রাতের পর রাত কাটাইয়া দিতেন। এই অকাম অহেতু ভগবৎপ্রীতি হৃদয়ে জাগিলে মানুষের চিত্তে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব থাকে না, সে তাহার জীবনের কাজে বল পায়। এই ভাবিয়াই তিনি নিজে এবং নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে দিয়া নদীয়ার পথ হরিনামে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেন। চিরকাল যেমন তখনও তেমনি ধনীরা ক্ষমতালুব্ধ, দরিদ্রেরা অসহায় এবং সমাজের উঁচু-নীচু স্তরের মধ্যে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য লইয়া দুস্তর ব্যবধান। তাহার উপর দুইটি অতিরিক্ত সমস্যা ছিল। এক, গৌড়ের-দরবারের প্রভাবে বিদেশি চালচলনের প্রসার। দুই, তাহার প্রতিবিধানার্থে ব্রাহ্মণদের শুচিতা-গণ্ডীর ক্রমবর্ধমান সঙ্কীর্ণতা ও কঠোরতা। স্মৃতি-শাস্ত্রের শাসনে তখন বাঙ্গালী জাতি প্রায় দ্বিধাবিভক্ত হইবার যো হইয়াছিল। চৈতন্য নিষ্ঠাবান্ ঘরের ছেলে, দরিদ্রসন্তান ছিলেন না, এবং ধনী প্রতিবেশীদের ও ভক্তের ঘরে তাঁহার সমাদর ছিল। তবুও তাঁহার মনের টান ছিল দীনের দিকে। অদ্বৈতের ঘরে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনঘৃতাক্ত ভাত খাইয়া তাঁহার যেমন তৃপ্তি হইত তেমনি হইত খোলাবেচা শ্রীধরের ঘরে ফুটো লোহপাত্রে জলপান করিয়া। কোন ভক্তকে তিনি ধনী করেন নাই, বরং রঘুনাথ দাসের মতো প্রচণ্ড বড় লোকের ছেলেকে তিনি দরিদ্রতম জীবনে অনায়াসে নামাইয়া দিয়াছিলেন। মানুষ নিজেকে হীন, গরীব, দুঃখী, দুর্গত বলিয়া খাটো করিবে এ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন কি "দুঃখী", "ওরে" ইত্যাদি নিকৃষ্টতাসূচক ব্যক্তিনামও তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিত। শ্রীবাসের বাড়িতে দুঃখী নামে এক চাকরানী খাটিত। চৈতন্য তাহার নাম বদলাইয়া রাখিয়াছিলেন "সুখী"। সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে তিনি একবার অতিথি হইয়াছিলেন। তাহার তিন বছরের ছেলের নাম "গুহিয়া" শুনিয়া তিনি বদলাইয়া "জয়ানন্দ" রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে সব মানুষ সব জীব সর্বদা সমান, যেহেতু সকলের প্রাণেই কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত। কৃষ্ণ জগতের পিতা, সকল জীব তাঁহার পুত্র, অংশাধিকারী। তাই তিনি বলিতেন

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ।

চৈতন্য বলিতেন, মনে ভালো-মন্দ কোন মতলব ইহলোক-পরলোক-ঘটিত কোন বাসনা না রাখিয়া হরিনাম কর। তাহা হইলে কৃষ্ণ তোমাদের উদ্ধার করিবেন। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরে শান্তি জাগিবে এবং তখন ভিতরের

বাহিরের কোন বন্ধনই বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। ধর্মের নামে আচার-বিচারে নিষ্ঠা এবং পরমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা মানুষের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ আনে, সমাজকে খোঁয়াড়ে পরিণত করে, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ বাধায়। চৈতন্য সব মানুষকে যে খোলা হাওয়ার চলা পথে ডাক দিলেন তাহাতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র একসঙ্গে জুটিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই। চৈতন্যের দেহাকৃতি ও লাবণ্যময় স্নিগ্ধভক্তিভাব দেখিলেই লোকে আকৃষ্ট হইত।

> প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ
> আজানুলম্বিত ভুজ কমল লোচন।...
> বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
> করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়।

নবদ্বীপে চৈতন্যের ভক্তদের লইয়া কৃত্য সাধনা ছিল ভগবৎ-নামমালিকা পদ সংকীর্তন। যেমন

> হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
> গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

নবদ্বীপে-শান্তিপুরে, নীলাচলে, কাশীতে,—সর্বত্র মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তন-সাধনা সঙ্গীতের রসে উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশের ভাবুকচিত্তভূমি আর্দ্র ও সরস করিয়াছিল। তৎকালে প্রচলিত ধুয়া-পদ (গীতিকবিতার টুকরা) চৈতন্য গাহিতেন এবং শেষ আঠারো বছর নীলাচলে বিরহদশায় প্রায় সর্বদা জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের গান শুনিয়া অবসর যাপন করিতেন। ইহা হইতেই তাঁহার ভক্তসমাজে পদাবলী রচনায় ও গানে উচ্চ আধ্যাত্মিক মূল্য আরোপিত হয়। এই সঙ্গীতের পথেই চৈতন্য বাঙ্গালা সাহিত্যকে সাক্ষাৎভাবে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। পদ-গানে চৈতন্যের ভাষাবিচার ছিল না। নীলাচলে জগন্নাথ-মন্দিরে বিখ্যাত গুণ্ডিচানৃত্যের সময়ে তিনি উড়িয়া-পদ গাহিয়াছিলেন। পদটি অত্যন্ত চমৎকার, এবং আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। শুধু চৈতন্য-চরিতামৃতে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত আছে।

> জগমোহন পরিমুণ্ডা যাই
> মন মাতিলা রে চকা চন্দ্রকু চাহিঁ।

'জগৎমোহন, (আমি তোমার কাছে) আত্মসমর্পণ করিলাম। ওরে চন্দ্রকে চাহিয়া চক্রবাকের মন মাতিয়াছে।'

অধ্যাত্মভাবনায় চৈতন্য ছিলেন অনুরাগের পথের ("রাগমার্গ"এর) পথিক। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের যে নিত্যপ্রেমসম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধই পরম সত্য।

সেই প্রেম চিত্তে উদ্বুদ্ধ করা এবং উদ্বুদ্ধ হইলে তাহা জাগরূক রাখাই পরম সাধনা। ভুক্তি মুক্তি নির্বাণ—আমি কিছুই চাহি না, চাহি শুধু তোমাকে, তা তুমি আমাকে যে অবস্থায়ই রাখ না কেন।—চৈতন্যের এই যে পরমভাব তাহা অন্তরঙ্গদের কাছে স্পষ্ট ছিল। চৈতন্যের রচিত যে আটটি শ্লোক ("শিক্ষাষ্টক")[1] পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই কথাই বলা হইয়াছে।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।[2]

'হে জগতের ঈশ্বর, আমি তোমার কাছে কিছুই চাহি না—না ধন না জন না সুন্দরী নারী না কবিতারচনার প্রতিভা।[3] আমার জন্মে জন্মে ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কাম ভক্তি থাকুক।'

শেষ কয় বছরে চৈতন্য সর্বদা যে বিরহভাবে আচ্ছন্ন থাকিতেন তাহা সপ্তম শ্লোকে বর্ণিত।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।

'নিমেষ হইয়াছে যুগের মতো দীর্ঘ, চক্ষু শ্রাবণগগনের আচরণ করিতেছে। গোবিন্দবিরহে আমার সমস্ত জগৎ শূন্য হইয়া গিয়াছে।'

কৃষ্ণলীলা-পদাবলীতে কৃষ্ণবিরহিণী ব্রজবাসিনী রাধার এমনি অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া যে কল্পনা বৈষ্ণব-সাহিত্য জুড়িয়া আছে তাহা চৈতন্যের ভাব ও রূপ আধারেই সঞ্জাত।

এখনকার দিনে অনেকেই মনে করেন যে চৈতন্য কীর্তনের গানে নাচে বাঙ্গালী জাতিকে নির্বীর্য করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ ভক্তিভাবোচ্ছ্বাস পাইয়া বাঙ্গালী সংগ্রামভীরু ও জীবনধর্মে পলাতক হইয়াছে। (কেহ কেহ আবার এমনও ইঙ্গিত করিয়া থাকেন যে চৈতন্যের প্রভাবেই বীর্যবান্ উড়িয়ারা স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। এ সব ভাবনা অলস কল্পনা মাত্র, ইতিহাস-সমর্থিত যুক্তিযুক্ত চিন্তা নয়। উড়িষ্যার গজপতি রাজারা দুই পুরুষ—পুরুষোত্তম ও প্রতাপরুদ্র—ক্রমে ক্রমে রাজ্যাংশ হারাইতে ছিলেন। চৈতন্য নীলাচলে যাইবার ঠিক আগেই বাঙ্গালা-উড়িষ্যা সীমান্তে হোসেন-শাহার সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহাতে উড়িষ্যাসীমান্তের কিছু অংশ মুসলমান অধিকারে আসে। চৈতন্যের গতায়াতের দ্বারাই উড়িষ্যা-বাঙ্গালার উপকূল সীমান্ত-পথ আবার খুলিয়া যায় এবং চৈতন্য নীলাচলে থাকার ফলেই বাঙ্গালার

---

[1] চৈতন্যচরিতামৃত (৩. ২০) ও পদাবলী (রূপ গোস্বামী সঙ্কলিত) দ্রষ্টব্য। [2] চতুর্থ শ্লোক।
[3] শিক্ষিত উচ্চাভিলাষী মানুষের চিরকালের কামনা ইহাই।

সুলতানের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের আর সংঘর্ষ বাধে নাই। চৈতন্যের তিরোধানের আট-নয় বছর পরে তবেই উড়িষ্যা মুসলমান-শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পরে উড়িষ্যার অবনতি চৈতন্যপ্রভাবিত বৈষ্ণবভাবের জন্য ঘটে নাই। তাহার সাক্ষাৎ কারণ রাজসভায় ষড়যন্ত্র এবং ঈর্ষালু রাজপুত্রদের যোগ্যতাহীনতা।) চৈতন্য বাঙ্গালীকে নির্বীর্য করেন নাই। বাঙ্গালীর বীর্যহীনতা বলিতে যাহা বোঝায় তাহা তাহার দেশ-সমাজ-সংসারের পরিবেশ-প্রভাবিত। অল্পায়াসলভ্য শস্য, গ্রামনিবদ্ধ নিরুপদ্রব জীবনসংস্থান, পরস্পর-সহনশীলতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীনতা—এই সব মিলিয়া বাঙ্গালীকে ঘরপোষা ও নিরুদ্যম করিয়াছিল। বীর্যহীনতা যদি কিছু থাকে তবে তা দীর্ঘকালীন নিরুদ্যমের সূত্রেই আগত। বরং বলিতে পারি চৈতন্য বাঙ্গালীকে একটা বড় উদ্যমের পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন।

চৈতন্যের বৈরাগ্যধর্ম কর্মবিমুখ ভিক্ষুকের কর্মহীনতা নয়। এ ধর্ম অত্যন্ত কঠিন বীর্যবানেরই আচরণীয় নৈষ্কর্ম্য। এ বিষয়ে চৈতন্যের উক্তিই স্মরণ করি।[১]

> তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
> অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ো সদা হরিঃ॥

কিন্তু সংস্কৃত সুভাষিতে তরুর যে সহিষ্ণুতার কথা আছে[২] এ তো শুধু তা নয়, আরও অনেক কিছু। কৃষ্ণদাস কবিরাজের অনুবাদে,

> বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়
> শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়।
> যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন
> ঘর্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ।

"শুকাইয়া মৈলে তবু পানী না মাগয়,"—এই হইতেছে চৈতন্য-পথিক বৈরাগীর ধর্ম। রঘুনাথ দাস এই ধর্ম আচরণ করিয়াছিলেন। এ কি নির্বীর্যের ধর্ম? আমাদের দেশে বেদের সময় হইতেই দেবতার কাছে কেবলি দাও দাও বুলি। বেদে "রয়িং নো ধত্ত বৃষণঃ সুবীরম্"[৩], পুরাণে "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি"। কেবল চৈতন্যই বলিলেন, কিছু চাই না, কিছু দিও না, আমার প্রয়োজন শুধু তোমাকে। কোন্ ভারতীয় ব্যক্তি চৈতন্যের মতো একথা বলিয়াছে?

---

[১] শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোক। [২] "ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ॥" ইত্যাদি।
[৩] 'দাও আমাদের ধন, ভালো ঘোড়া আর বীর পুত্র'।

সাধারণ লোকের জন্য চৈতন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—নম্র হৃদয়ে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ। মূর্তিপূজার বিরোধিতা চৈতন্য কখনো করেন নাই, ভক্তিপথিকের জন্য সে ব্যবস্থা করেনও নাই। তিনি ঈশ্বরের রূপের স্থানে বসাইয়াছেন নাম। তাহাতে সকলকার সর্বত্র সর্বদা অবারিত অবসর ও অধিকার॥

১০

চৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা তাঁহাকে পরিপূর্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া জানিতেন। সেভাবে অদ্বৈতই তাঁহাকে প্রথম সাক্ষাৎ পূজা করিয়াছিলেন।[১] রামানন্দ রায় ও স্বরূপ-দামোদর চৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। অদ্বৈত আচার্য ইহারও উপক্রম করিয়াছিলেন। চৈতন্য কৃষ্ণের অবতার, কিন্তু তাঁহার দেহকান্তি ও আচরণ বিরহিণী রাধার মতো। তাই যুগলভাবে চৈতন্যকে দেখা সহজ হইয়াছিল। কিন্তু এই তত্ত্বের মধ্যে তান্ত্রিক মহাযান-মতের যুগনদ্ধ হেরুক-নৈরাত্মা সাধনার (বা উপাসনার) জের অবশ্যই আসিয়াছে। (ব্রাহ্মণ্য সমাজেও ইহার প্রভাব পড়িয়াছিল—শিবের অর্ধনারীশ্বর কল্পনায় এবং বিষ্ণু-লক্ষ্মীর তদ্বৎ মূর্তিতে। এমন মূর্তি সেনরাজারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।) তান্ত্রিক মহাযান-মতে বিশুদ্ধ ভক্তির আবির্ভাব চৈতন্যের আগেই দেখা গিয়াছিল। রামচন্দ্র কবিভারতীর 'ভক্তিশতক'এ তাহার পরিচয় মিলে।[২]

মহাপণ্ডিত অদ্বৈত বিবিধ মতের গোপন সাধনার খোঁজ রাখিতেন বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধ, শৈব ও যোগী তান্ত্রিকদের "চর্যা" বা প্রহেলিকা গান-ছড়ার মতো বস্তুও তাঁহার বেশ জানা ছিল। চৈতন্যও কিছু কিছু জানিতেন। অন্যের অজ্ঞাতব্য কিছু কথা চৈতন্যকে নিবেদন করিতে হইলে অদ্বৈত হেঁয়ালি ছড়া ("তর্জা") বলিতেন।[৩] চৈতন্যের তিরোভাবের অল্প কিছুকাল আগে অদ্বৈত এমনি প্রহেলিকা রচনা করিয়া জগদানন্দ পণ্ডিতের হাতে নীলাচলে চৈতন্যের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।[৪]

---

[১] প্রথম বৎসরে নীলাচলে অদ্বৈত যেভাবে নিভৃতে চৈতন্যের পূজা করিয়াছিলেন তাহার কিছু বর্ণনা চৈতন্যচরিতামৃতে আছে (২. ১৫)। আচার্য এই প্রণাম মন্ত্র পড়িয়াছিলেন,

"রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব।
যোঽসি সোঽসি নমস্তুভ্যং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে।"

[২] এই বাঙ্গালী বৌদ্ধ কবি-পণ্ডিত সিংহলের রাজা পরাক্রমবাহুর (চতুর্দশ শতাব্দী) সভায় উপস্থিত ছিলেন।

[৩] "আচার্য গোসাঞি প্রভুকে কহে ঠারেঠোরে, আচার্য তর্জা পড়ে কেহ বুঝিতে না পারে।" (চৈতন্যচরিতামৃত ২. ১৬)। [৪] ঐ ৩. ১৯।

বাউলকে কহিয় লোকে হইল আউল
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল।
বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল।

দেশে ধর্মের প্রসার কোন্ রূপ ও দিক্ লইতেছে বোধ করি তাহার আভাষ এই তর্জায় ছিল। জগদানন্দ ইহা পরিহাস রচনা মনে করিয়া কৌতুক বোধ করিয়াছিলেন। চৈতন্য শুনিয়া একটু হাসিয়া "তাঁর যেই আজ্ঞা" বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। স্বরূপ-দামোদর মানে জানিতে চাহিলে মহাপ্রভু শুধু বলিয়াছিলেন,

মহাযোগেশ্বর আচার্য তর্জাতে সমর্থ
আমিহ বুঝিতে নারি তর্জার অর্থ।

সেইদিন হইতে চৈতন্যের বিরহবেদনা দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল॥

১১

সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে বসিয়া নব বৈষ্ণব-মতের যে শাস্ত্র ও সাহিত্য রচনা করিতে লাগিলেন তাহার ভাষা সংস্কৃত। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে সংস্কৃত আশ্রয় না করিলে কোন নূতন চিন্তা ও আদর্শ গৃহীত হইবে না। তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে সংস্কৃতে নূতন শাস্ত্র চালাইতে হইলে তাহা পুরাতন শাস্ত্রের অনুবৃত্তি রূপেই উপস্থাপিত করিতে হইবে। সুতরাং চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাঁহারা কৃষ্ণলীলা স্মরণের ও কৃষ্ণ-উপাসনারই ব্যবস্থা দিলেন, এবং চৈতন্যলীলা-বর্ণনার ও চৈতন্যপূজার দিক দিয়া গেলেন না। এই কারণে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের শাস্ত্র ও অনুশাসন

আসিন্ধুনদীতীর আর হিমালয়
বৃন্দাবন মথুরাদি যত দেশ হয়

সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এই ভাবে চৈতন্যের তিরোভাবের পরে গৌড়ে ও বৃন্দাবনে বৈষ্ণব চিন্তা ও সাধনা ঈষৎ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। তবে উদ্দেশ্য এক, উপাস্যও এক। সুতরাং বিরোধ হয় নাই॥

১২

চৈতন্য তাঁহার জীবৎকালেই ঈশ্বর-অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং তখনই তাঁহার চরিত্র সংস্কৃতে শ্লোকে কাব্যে ও নাটকে এবং বাঙ্গালায় গানে ও

কাব্যে কীর্তিত হইতে শুরু হইয়াছিল। নবীন ভারতীয়-আর্য ভাষার সাহিত্যের গতানুগতিকতা এইখানেই ভঙ্গ হইল। ইহার আগে দেশীয় ভাষায় সাহিত্যের বিষয় ছিল মামুলি,—পুরাণের গল্প,দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনী,কৃষ্ণলীলা-পদাবলী। লৌকিক কাহিনীতে ঐতিহাসিক অ্যাখ্যানে ও জনশ্রুতিতে গল্প-কাহিনীর অঙ্কুর উঠিলে পরে তবে গানে গাথায় স্থান পাইত। তবে এমন কিছু বস্তু তখনও স্থায়ী রূপ পায় নাই। "যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গীত" নামেই শোনা গিয়াছে। তাহা কী বস্তু তাহা জানি না। তবুও একথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে চৈতন্যাবদান রচনার পূর্বে সমসাময়িক ইতিহাসের কথা দূরে থাক, অতীত ইতিহাসেরও কোন উপাদান মুখ্যভাবে সাহিত্যসৃষ্টির কাজে লাগানো হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দের প্রারম্ভ হইতে এই এক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইল। চৈতন্যের চরিতে লোকের মন অভাবিত মুক্তির স্বাদ ও আনন্দের স্পর্শ পাইল। অতীত স্বর্ণযুগকল্পনার ঠুলিতে রুদ্ধ বর্তমানের চক্ষু যেন রূপরসের মহোৎসবে উন্মীলিত হইল। তাই বৈষ্ণব-কবি গাহিলেন,

প্রণমহ্ঁ কলিযুগ সর্বযুগসার।

নবীন ভারতীয় সাহিত্য একটু অন্য দিকে বাঁক ফিরিল ॥

১৩

চৈতন্যের বর্তমানকালেই তাঁহাকে লইয়া পদ গান কবিতা ও নাট্যরচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। অদ্বৈত আচার্য এই কাজ প্রকাশ্যভাবে প্রথম করিয়াছিলেন। সে কথা আগে বলিয়াছি। গানের কথা পরে বলিব।

চৈতন্যের জীবনকাহিনী শ্লোকসূত্রে প্রথমে গাঁথিয়াছিলেন মুরারি গুপ্ত, তাহার পরে স্বরূপ-দামোদর। এই দুইজনের রচনা 'কড়চা' নামে অভিহিত। কড়চা শব্দটি আসিয়াছে প্রাকৃত 'কটকচ্চ', সংস্কৃত "কৃতকৃত্য" হইতে। 'কট' শব্দ প্রাচীন অনুশাসনে "খসড়া লেখা" (original draft) অর্থেই পাওয়া গিয়াছে। কড়চার অর্থও এই ব্যুৎপত্তির অনুরূপ—খসড়া রচনা, স্মারকলিপি, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। স্বরূপ-দামোদরের "কড়চা"র দুই-চারিটি শ্লোক চৈতন্যচরিতামৃতে ও অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। মনে হয় রচনাটি তখন "কড়চা" রূপেই জানা ছিল।[১]

[১] অনেক পরবর্তী কালে একশ্রেণীর বৈষ্ণবসাধকদের লেখা সাধনতত্ত্বঘটিত 'কড়চা' (বাঙ্গালায় লেখা নিতান্ত ছোট নিবন্ধ) মিলে। এই রকম একটি নিবন্ধের নাম 'স্বরূপদামোদরের কড়চা'। ইহার যে পুথি দেখিয়াছি তাহা ১২৭৯ সালে লেখা। আসল কড়চার সহিত সে পুথির প্রায় কোনই সম্পর্ক নাই।

মুরারি গুপ্তের কড়চা বলিয়া যাহা ছাপা হইয়াছে তাহা একটি বড় মহাকাব্যের ধরনের রচনা। নাম, গ্রন্থের প্রত্যেক সর্গের পুষ্পিকায় 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিত', নামপৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্।[১] বইটিতে সর্বসমেত আটাত্তর সর্গ, চারি প্রক্রমে ভাগ করা। মোট শ্লোক-সংখ্যা ১৯০৬। এত বড় বই কিছুতেই কড়চা নাম পাইতে পারে না। সুতরাং এই দিক দিয়া দেখিলে প্রথমেই ছাপা বইটির প্রাচীনত্বে ও অকৃত্রিমত্বে সন্দেহ জাগে। মুরারি গুপ্ত যে চৈতন্যের নবদ্বীপলীলা তাঁহার কড়চায় "সূত্রাকারে" লিখিয়া গিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। সমস্ত প্রাচীন জীবনীকারের সাক্ষ্য ইহার অনুকূলে। কড়চার দুই একটি শ্লোকও কোন কোন জীবনীগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। অথচ ছাপা বইয়ে চৈতন্যের মধ্যলীলা প্রায় সবটাই পাওয়া যাইতেছে, এবং লোচন দাস তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্যের মধ্যলীলার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা মুদ্রিত বইয়ের অনুগত।

ছাপা বইয়ে একটা বড় অসঙ্গতি অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। গ্রন্থের সর্বশেষ শ্লোকে রচনাকাল দেওয়া আছে। এই রচনাকাল প্রথম দুই সংস্করণে ছাপা ছিল "চতুর্দশ শকাব্দান্তে পঞ্চবিংশতি বৎসরে"। "পঞ্চবিংশতি বৎসরে" ব্যাকরণাশুদ্ধ[২] এবং অন্য দিকেও অগ্রাহ্য, যেহেতু ১৪২৫ শকাব্দের পরের অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। "পঞ্চত্রিংশতি বৎসরে"—ইহাও ব্যাকরণাশুদ্ধ[৩] এবং ইহাতেও বর্ণিত বিষয়ের কাল কুলায় না।[৪]

প্রকাশিত মুরারি গুপ্তের কড়চার কোন পুরানো আদর্শ পুথি নাই। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের একটি প্রতিলিপি এবং এই সময়ের কিছু পরের একটি দেবনাগর প্রতিলিপি অবলম্বন করিয়া শ্যামলাল গোস্বামী ছাপা বইটির পাঠ খাড়া করেন। এ বিষয়ে প্রকাশক মৃণালকান্তি

---

[১] মৃণালকান্তি ঘোষ প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ, চৈতন্যাব্দ ৪৫৯। হরিদাস দাসের বঙ্গানুবাদ সমেত।

[২] শুদ্ধ হইবে "পঞ্চবিংশে (পঞ্চবিংশতিতমে) বৎসরে"।

[৩] ঐ "পঞ্চত্রিংশে (পঞ্চত্রিংশত্তমে) বৎসরে"।

[৪] স্বর্গীয় হরিদাস দাসের লেখা 'চতুর্থ সংস্করণের অবতরণিকা' পৃ ২।১০ দ্রষ্টব্য। হরিদাস দাস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই গ্রন্থ চৈতন্যের অপ্রকটের পরে এবং ১৪৫৬ হইতে ১৪৬০ শকাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

ঘোষ মহাশয় 'তৃতীয় সংস্করণের অবতরণিকা'য় যাহা বলিয়াছেন তাহা অনুধাবনযোগ্য।[১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানিতেন যে চৈতন্যের আদি ও শেষ লীলা দুই ভক্ত "কড়চা" বা সূত্র রূপে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন। মুরারি গুপ্ত আদিলীলা গ্রথিত করিয়াছিলেন, স্বরূপ-দামোদর মধ্য ও অন্ত লীলা।

আদিলীলা মধ্যে যত প্রভুর চরিত
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিল গ্রথিত।
মধ্য-শেষ প্রভু-লীলা স্বরূপ-দামোদর
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।[২]

মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলাই সূত্ররূপে গ্রথিত করিয়াছিলেন। এই কথা মনে রাখিলে ছাপা বইয়ের তিনচতুর্থাংশ বাদ দিতে হয়। প্রথম চতুর্থাংশেও[৩] ভেজাল আছে। তবুও মুরারির আদি রচনা এই অংশে নিহিত বলিতে পারি। গয়া হইতে প্রত্যাগমন পর্যন্ত এই অংশে বর্ণিত। (বন্দনা শ্লোকগুলিতেও গয়া হইতে প্রত্যাগমন পর্যন্ত ঘটনাই উল্লিখিত আছে।)[৪] তাহার পরেই আদি গ্রন্থ শেষ হইয়াছিল। গ্রন্থরচনাকাল মহাপ্রভুর ব্রজপর্যটনের অল্পকাল পরে।[৫] এই সময়ে চৈতন্য দামোদর পণ্ডিতকে নবদ্বীপে মাতার তত্ত্বাবধান করিতে পাঠাইয়াছিলেন। সেই সময়েই বোধ করি "দামোদর-সংবাদ মুরারি-মুখোদিত" এই কড়চাটি লেখা হইয়াছিল।

---

১ "পরবর্তী লীলালেখকদিগের গ্রন্থসমূহে এই মুরারি গুপ্তের কড়চার নাম দেখিয়া এই গ্রন্থখানি উদ্ধার করিবার জন্য মহাত্মা শিশিরকুমার [ঘোষ] অনেক অনুসন্ধান করেন। অবশেষে ৪১২ গৌরাব্দে (১৩০৩ সালে) ঢাকা-উথালী নিবাসী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-বংশজাত (বর্তমানে গৌরধামপ্রাপ্ত) শ্রীল মধুসূদন গোস্বামি-প্রভুপাদের নিকট এই পুথির একখানি নকল পাওয়া যায়। সেই সময় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত হইয়াছিল—আর একখানি পুথি পাইলেই দুইখানি মিলাইয়া গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আর একখানি নকল পুথি হস্তগত হয়। এইখানি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত। দুর্ভাগ্যক্রমে দুইখানি পুথির একখানিও শুদ্ধভাবে লিখিত ছিল না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুবংশজাত (বর্তমানে নিত্যধামগত) শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামি-প্রভুপাদের উপর এই গ্রন্থ সম্পাদনের ভার অর্পিত হয়।"

২ চৈতন্যচরিতামৃত ১. ১৩।

৩ প্রথম প্রক্রম। এই অংশে ১৬ সর্গ, ৪৩৮ শ্লোক। কড়চার পক্ষে এই পরিমাণও অত্যধিক।

৪ প্রথম প্রক্রম প্রথম সর্গ শ্লোক ১-৭।

৫ গয়া-প্রত্যাবর্তনের পর নবদ্বীপলীলা, সন্ন্যাস, নীলাচলে আগমন, দক্ষিণে তীর্থযাত্রা. নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, মথুরা-বৃন্দাবন যাত্রা ও তথা হইতে প্রত্যাবর্তন—আটটি মাত্র শ্লোকে (১. ১৬ ১২-২৯) বর্ণিত হইয়াছে।

তাহার পর একাধিকবার পরিবর্ধন হইয়াছে। সে পরিবর্ধন কাহার দ্বারা তাহা বলিতে পারি না। মুরারি গুপ্তের দ্বারা নিশ্চয়ই নয়। লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে প্রায় শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের অনুসরণ দেখা যায়। এ ব্যাপার সকলেই ছাপা বইটির মোটামুটি প্রাচীনত্বের ও অকৃত্রিমত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ অধিকতর সম্ভাব্য হইতেছে এই যে, ছাপা বইটিতে যে শেষ সংস্করণ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা লোচনের গ্রন্থের অনুসরণেই। লোচনের গ্রন্থের অনেক পুথি পাওয়া গিয়াছে, ছাপা সংস্করণও গত একশ বছরের মধ্যে অনেক হইয়াছে। অথচ মুরারি গুপ্তের কড়চার মতো সর্বস্বীকৃত প্রামাণ্য গ্রন্থের কোনই পুথি ১৩০৩ সালের আগে মিলিল না এবং ১৩০৩ সালের পুথিরও আদর্শ নাই—এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার॥

১৪

চৈতন্যের জীবন-কাহিনী লইয়া তাঁহার জীবৎকালে একখানি ও তাঁহার তিরোধানের পরে একখানি সংস্কৃত-নাটক লেখা হইয়াছিল। প্রথমখানির রচয়িতা একজন "বঙ্গদেশীয় বিপ্র"। নাটকটি লিখিয়া চৈতন্যকে ও ভক্তদের শুনাইতে রচয়িতা নীলাচলে আসিয়াছিলেন। স্বরূপ-দামোদর আগে শুনিয়া অনুমোদন না করিলে কোন নূতন রচনা—গান, শ্লোক, কাব্যনাটক—চৈতন্যকে শোনানো হইত না। কেননা

রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্তবিরোধ
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ।

কবির বন্ধু ভগবান্ আচার্যের প্রশংসা শুনিয়া স্বরূপ-দামোদর নাটকটি শুনিলেন। রচনা বেশ মনঃপূত না হইলেও স্বরূপ-দামোদর কবিকে অনুগ্রহ করিলেন। (চৈতন্যকে জীবনী শোনানো হইল না, লেখা আরও ভালো হইলেও হইত না। তিনি নিজের প্রশংসা সহ্য করিতেন না।) বঙ্গদেশীয় কবি ভক্তসমাজে স্থান পাইয়াছিলেন।

তবে সব ভক্ত তারে অনুগ্রহ কৈলা
তার গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইলা।
সেই কবি সব ছাড়ি রহিলা নীলাচলে

নাটকখানি লুপ্ত হইয়াছে। তবে নান্দী-শ্লোকটি চৈতন্যচরিতামৃতের[১] পুটকে রক্ষা পাইয়াছে।

---

[১] অন্ত্যলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ।

'বিকশিত কমললোচন শ্রীজগন্নাথ নামে স্ব-বিগ্রহ বিদ্যমানেও যিনি কনককান্তি দেহ ধারণ করিয়াছেন, অশেষ জড়প্রকৃতিকে যিনি চেতনা দিতে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই দেব কৃষ্ণচৈতন্য তোমার মঙ্গল নির্দেশ করুন।'

এ নাটক যে স্বরূপ-দামোদর একেবারে চাপিয়া গিয়াছিলেন তাহা তখনকার পক্ষে হয়ত ভালোই হইয়াছিল। নতুবা হয়ত জগন্নাথের পাণ্ডারা চৈতন্যভক্তদের নীলাচলে তিষ্ঠিতে দিত না।

দ্বিতীয় নাটকটির নাম 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'। রচয়িতা চৈতন্যভক্ত শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দদাস। ইনি "কবি-কর্ণপূর" নামেই পরিচিত। শিবানন্দ প্রত্যেক বৎসর গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তত্ত্বাবধান করিয়া নীলাচলে লইয়া যাইতেন। চৈতন্য তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। শিবানন্দের দুই সন্তান জন্মিবার পরে চৈতন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে অতঃপর পুত্রসন্তান হইলে যেন "পুরীদাস" নাম রাখা হয়। পুরী মানে চৈতন্যের পরমশ্রদ্ধেয় মর্মজ্ঞ সঙ্গী গুরুর গুরুভ্রাতা পরমানন্দ পুরী। তাই ছেলেটির নাম হইয়াছিল পরমানন্দ (পুরী)-দাস। চৈতন্য পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে প্রথম মিলিয়াছিলেন দক্ষিণ ভ্রমণের সময়ে। তাহার পরই পুরী নীলাচলে চলিয়া আসেন। সুতরাং পরমানন্দদাসের জন্ম ১৫১৪ খ্রীস্টাব্দের আগে নয়, সম্ভবত ১৫১৬ হইতে ১৫২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।[১]

পরমানন্দের বয়স যখন সাত বছর তখন শিবানন্দ তাহাকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে আসিয়াছিলেন। প্রথম দিনে

কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু বলে বার বার
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার।

বাপও খুব চেষ্টা করিলেন ছেলেকে কৃষ্ণ বলাইতে। কিন্তু ছেলে কিছুতেই মুখ খুলে নাই। বিস্মিত হইয়া চৈতন্য বলিয়াছিলেন, আমি সারা জগৎকে ঈশ্বর নাম লওয়াইয়াছি কিন্তু ইহাকে পারিলাম না! পরে অন্য দিনে মহাপ্রভু বালককে কিছু পড়িতে বলিলে সাত বছরের ছেলে পরমানন্দ নিজ কৃত (!) এই শ্লোক পড়িয়াছিল,

---

১ আগে মনে করিয়াছিলাম ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে কর্ণপূরের জন্ম (HBL পৃ ২৬১)। তাহা ঠিক নয়।

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥[১]

'দুই কানের নীলপদ্ম, দুই চোখের কাজল, বুকের ইন্দ্রনীল মণিহার,—(এইরূপে) বৃন্দাবনের রমণীদের সম্পূর্ণ অলঙ্কার হইয়াছে যে হরি তাঁহার জয় হোক।'

এই শ্লোকের প্রথম পদ দুইটি লইয়াই পরমানন্দদাসের আখ্যা হইয়াছিল কবি-কর্ণপুর।

চৈতন্য-জীবনী লইয়া কবি-কর্ণপূর সংস্কৃতে একটি নাটক ও একটি মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এবং শেষ বয়সে চৈতন্যভক্তদের নামমালা গাঁথিয়াছিলেন। অপর রচনা হইতেছে বৃন্দাবনলীলাকাহিনী 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ'[২], অলঙ্কার শাস্ত্রের বই 'অলঙ্কারকৌস্তুভ'[৩] এবং খণ্ডকবিতাবলী 'আর্যাশতক'।

নাটকটির নাম 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'। কোন কোন পুথির পুষ্পিকায় যে তারিখ পাওয়া যায়—১৪৯৪ শকাব্দ (১৫৭২)—তাহা সকলে রচনাকাল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু "গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ"—এমন উক্তি রচয়িতার লেখনীনিঃসৃত বলিয়া মনে হয় না। শ্লোকটি এই

শাকে চতুর্দশশতে রবিবাজিযুক্তে
গৌরো হরির্ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয়লীলা-
গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ ॥

'রবিবাজি (=৭) যুক্ত চতুর্দশ শত শকাব্দে গৌরহরি ধরণীমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই শতাব্দে চুরানব্বই অঙ্কে তাঁহার এই লীলাগ্রন্থ কাহারো মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল।'

নাটকটি প্রতাপরুদ্রের অনুরোধে লেখা হইয়াছিল এই কথা প্রস্তাবনায় আছে এবং নাটককাহিনীতে প্রতাপরুদ্র মুখ্যপাত্রদের অন্যতম। সুতরাং প্রতাপরুদ্রের জীবৎকালেই (১৫৪০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে) রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। গ্রন্থরচনাকালে কবি যে অপরিণতবয়স্ক এবং চৈতন্য যে কিছুকাল আগেই তিরোহিত তাহা গ্রন্থসমাপ্তির দ্বিতীয় শ্লোক হইতে বুঝা যায়। ১৪৯৪ শকাব্দ যে অগ্রাহ্য তাহা নিম্নের আলোচনা হইতেও প্রতিপন্ন হইবে।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে দশ অঙ্ক। প্রথম অঙ্ক "স্বানন্দাবেশ", দ্বিতীয় "সর্বাবতার-দর্শন", তৃতীয় "দানবিনোদ", চতুর্থ "সন্ন্যাসপরিগ্রহ", পঞ্চম "অদ্বৈতপুরবিলাস",

[১] শ্লোকটি কবির 'আর্যাশতক'এর বন্দনা শ্লোক। চৈতন্যচরিতামৃতেও উদ্ধৃত আছে।

[২] অংশত মধুসূদন দাস অধিকারী কর্তৃক আলাটি (হুগলি) হইতে, সম্পূর্ণ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত।

[৩] বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি রাজশাহী হইতে প্রকাশিত।

ষষ্ঠ "সার্বভৌমানুগ্রহ", সপ্তম "তীর্থাটন", অষ্টম "প্রতাপরুদ্রানুগ্রহ", নবম "মথুরাগমন", দশম "মহামহোৎসব"।

কবিকর্ণপূর-রচিত চৈতন্যজীবনী মহাকাব্যের নাম 'চৈতন্যচরিতামৃত'। রচনাসমাপ্তিকাল ১৪৬৪ শকাব্দ (১৫৪২)।

> বেদা রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতিপ্রসিদ্ধে
> শাকে তথা খলু শুচৌ সুভগে চ মাসি।
> বারে সুধাকিরণনাম্ন্যসিতদ্বিতীয়া-
> তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুষ্যা ॥

'বেদ রস বেদ ইন্দু এই নির্দিষ্ট শকাব্দে এবং গ্রীষ্মকালে মাঙ্গল্য মাসে, সোমবারে, কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে এই (রচনার) পরিসমাপ্তি হইল।'[১]

'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' ছোট বই।[২] অধিকাংশ পুথিতে রচনাকাল পাওয়া যায়—"শাকে বসুগ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে" অর্থাৎ ১৪৮৯ শকাব্দ (১৫৬৭)।[৩] কোন কোন পুথিতে পাঠান্তর আছে—"শাকে রসারসমিতে মনুনৈব যুক্তে" (অর্থাৎ ১৪৭৬ শকাব্দ, ১৫৫৪) অথবা "শাকে রসগ্রহমিতে" (অর্থাৎ ১৪৬৯ শকাব্দ, ১৫৪৭)।[৪] এই দুই তারিখের মধ্যে যেটিই ঠিক হোক না কেন, ইহা চৈতন্যচন্দ্রোদয় রচনাসমাপ্তির নিম্নতম সীমা নির্দেশ করিতেছে। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় চৈতন্যচন্দ্রোদয় ও চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃতি আছে। মুরারি গুপ্তের কড়চারও উল্লেখ ও উদ্ধৃতি আছে ॥

১৫

চৈতন্যের অনেক ভক্ত সংস্কৃতে তাঁহার বন্দনা-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার জীবনের কথা আছে। ক্বচিৎ মূল্যবান্ উপাদানও আছে। রঘুনাথ দাসের গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষের ও চৈতন্যাষ্টকের উল্লেখ আগে করিয়াছি। রূপ গোস্বামীর কোন কোন স্তবও মূল্যবান্। অপর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সদাশিব কবিরাজের 'বিলক্ষণচতুর্দশক'।[৫]

---

[১] চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের কালজ্ঞাপক শ্লোকে আছে "অভবৎ" (লঙ্) আর এখানে আছে "অভুং" (লুঙ্)। লঙ্ সাধারণত দূর অতীতে ব্যবহৃত হয়, লুঙ্ অচির অতীতে।

[২] বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[৩] এখানে অঙ্কের বামগতি ধরিবার আবশ্যকতা নাই। ধরিলে ১৪৯৮ শকাব্দ (১৫৭৬) হইবে।

[৪] ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির পুথি ২৫১০। অঙ্কের বামগতি ধরিলে ১৪৬৭ শকাব্দ (১৫৪৫)।

[৫] *Notices of Sanskrit Manuscripts* (রাজেন্দ্রলাল মিত্র) চতুর্থ খণ্ড, ১২৬২।

সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় লেখা চৈতন্যচরিত গ্রন্থ ও কবিতা ছাড়াও চৈতন্যের কথা বাঙ্গালায়, উড়িয়ায় ও অসমিয়া পুরানো সাহিত্যের অন্যত্র পাওয়া যায় ॥[১]

১৬

বাঙ্গালায় লেখা প্রথম চৈতন্যাবদান কাব্য বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'। পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসকে "চৈতন্যলীলায় ব্যাস" বলিয়া বন্দনা করায় এবং বৃন্দাবনদাসের কাব্যকে ব্যাসের ভাগবত-পুরাণের মর্যাদা দেওয়ায় কাব্যটি 'চৈতন্যভাগবত' নামেই পরিচিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বইটিকে চৈতন্য-মঙ্গল নামেই জানিতেন।[২] অপ্রামাণিক প্রেমবিলাসের উক্তি,

> চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল
> বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল।

—আধুনিক ব্যাখ্যা। এ সম্বন্ধে কল্পিত কাহিনীও আছে। তাহাতে বলে যে লোচন দাস ও বৃন্দাবনদাস প্রায় একই সময়ে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করায় বৈষ্ণব-সমাজে বিভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। তখন বৃন্দাবনের মাতা নারায়ণী মধ্যস্থ হইয়া পুত্রের গ্রন্থের নাম পাল্টাইয়া সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন।

চৈতন্যের এক আদি ও মুখ্য ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতেরা চারি ভাই ছিলেন। শ্রীবাস বড়। তাঁহার এক ছোট ভাইয়ের কন্যা নারায়ণী বৃন্দাবনদাসের মা। বৃন্দাবনদাসের জন্মকাল জানা নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন চৈতন্যের গৃহত্যাগের কিছুকাল পরে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়। বৃন্দাবনের বাপের নাম কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। প্রধানত এই কারণেই বৃন্দাবনের জন্মসম্বন্ধে আধুনিক কালের আলোচনাকারী অনেকে অসন্দিহান নন। ইঁহারা কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির গূঢ় এবং কদর্থ কল্পনা করিয়া বলেন যে ব্যাসের মতই বৃন্দাবনদাস কানীন পুত্র। "সাতপ্রহরিয়া"—ভাবাবেশের সময়ে চৈতন্য নারায়ণীকে উচ্ছিষ্ট তাম্বূল দিয়াছিলেন। তাহা খাইয়া নারায়ণী কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন। এ ব্যাপারেরও তাঁহারা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু

---

[১] যেমন রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গলের (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত) বন্দনা; কৃষ্ণ ভারতীর 'সন্তনির্ণয়' (সা-প-প ২৭ পৃ ১৩১-৩৯) ইত্যাদি।

[২] "ওরে মূঢ়লোক শুন চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যমহিমা যাতে জানিবে সকল।
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস, চৈতন্যচরিতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল, যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল।" ১. ৮।

"বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন, চৈতন্যমঙ্গল যিহোঁ করিলা রচন।
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস, চৈতন্যমঙ্গলে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।" ১. ১১।

নারায়ণীর বয়স তখন চার বছর![1] কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন যে নিত্যানন্দের নিষেধের জন্যই বৃন্দাবনদাস চৈতন্যকে দেখিতে কখনও নীলাচলে যান নাই।[2] ইহাদের এই সিদ্ধান্ত চৈতন্যভাগবতের একটি ছত্রের ভুল পাঠের উপর নির্ভর করিতেছে।[3]

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ অনুচর ছিলেন। নিজেকে নিত্যানন্দের "সর্বশেষ ভৃত্য" বলিয়া বার বার খ্যাপন করিয়াছেন। নিত্যানন্দের অনুমতি তাঁহাকে চৈতন্যাবদান রচনায় বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিল।

> অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বুঝিলা কৌতুকে
> চৈতন্যচরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে। ১. ১. ১৫।
> অন্তর্যামীরূপ বলরাম ভগবান
> আজ্ঞা কৈল চৈতন্যের গাইতে আখ্যান। ২. ২।

চৈতন্যের কাহিনী বৃন্দাবন নিত্যানন্দের কাছে পাইয়াছিলেন।[4] অদ্বৈতও অনেক কথা বলিয়াছিলেন।[5] অন্য ভক্তদের কাছেও কিছু কিছু তথ্য মিলিয়াছিল।[6] বৃন্দাবনদাসকে নিত্যানন্দ ভাগবত পড়াইয়াছিলেন।[7]

চৈতন্যভাগবতের[8] সমাপ্তি আকস্মিক এবং উহাতে চৈতন্যের শেষলীলার উল্লেখ একেবারেই নাই। রঘুনাথ দাসের নামও নাই, কিন্তু রূপসনাতনের আছে এবং শেষলীলায় চৈতন্যের অন্তরঙ্গতম ভক্ত ছিলেন যে দুইজন তাঁহাদের নামও আছে।

> দামোদর-স্বরূপ আর পরমানন্দ পুরী।
> শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী।

চৈতন্যের তিরোধানের পরে যে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যমঙ্গল রচনায় হাত দেন

---

[1] "চারি বৎসরে সেই উন্মত্ত চরিত, হা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে নাহিক সম্বিত।"

[2] বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র প্রকাশিত সংস্করণ (১৯১৩-২২), ভূমিকা ('ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাস') পৃ ৪ দ্রষ্টব্য।

[3] "হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে, হইলাঙ বঞ্চিত সে মুখ দরশনে।" ১. ১০। (বহরমপুর সংস্করণ। আসল পাঠ "মুখ" নয় "সুখ")।

[4] "নিত্যানন্দপ্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব, কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য।" ২. ২০।

[5] "অদ্বৈতের শ্রীমুখের এই সব কথা" ২. ১০, ৩-৭।

[6] "বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে, তাহা লিখি যেই শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে।" ১. ১।

[7] "নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে ভাগবত, জন্মে জন্মে পড়িবাঙ এই অভিমত।" ১. ৮।

[8] প্রথম ছাপা হইয়াছিল ১২৪৫ সালে শোভাবাজারে তারাচন্দ্র তর্কবাগীশের পদ্মালয় যন্ত্রে। তাহার পর ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্নের সম্পাদনায় ১২৪৯ সালে (১৮৪৩) জ্ঞানরত্নাকর ও সারসংগ্রহ যন্ত্রে, প্রকাশক রাধাগোবিন্দ, রাধামাধব ও মধুসূদন শীল। এ সংস্করণটির পাঠ সবচেয়ে ভালো। শ্রীরামপুরে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে একটি সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল। পরে অনেক সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

তাহাতে সন্দেহ করা চলে না। চৈতন্যের বর্তমান কালে কোন ভক্ত, বিশেষ করিয়া নিত্যানন্দের অনুচর, একাজে হাত দিতেই পারিতেন না চৈতন্যের তীব্র বিরক্তির ভয়ে। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লীলাসূত্র বর্ণনার শেষে বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন,

শেষ খণ্ডে গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর
নীলাচলে বাস অষ্টাবিংশতি বৎসর।

সুতরাং চৈতন্যের তিরোভাব বৃন্দাবনের জানা ছিল। চৈতন্যের তিরোধানের অল্পকাল পরেই যে বইটি লেখা হইয়াছিল তাহার পরোক্ষ প্রমাণ কিছু আছে।[১] গ্রন্থরচনাকালে জ্যেষ্ঠ মাতামহ শ্রীবাস জীবিত ছিলেন[২], গদাধর পণ্ডিত জীবিত ছিলেন, নিত্যানন্দ জীবিত ছিলেন এবং অদ্বৈত জীবিত ছিলেন। চৈতন্যের দেহত্যাগের পর নিত্যানন্দ আট দশ বৎসর ও অদ্বৈত দশ বার বৎসর জীবিত ছিলেন। শ্রীবাস ও গদাধর ইঁহাদের বেশ কিছুকাল আগেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের বিবাহ ও পুত্রলাভের উল্লেখ করেন নাই। ইহার একাধিক কারণ থাকিতে পারে। গ্রন্থরচনাকালে নিত্যানন্দ হয় দারপরিগ্রহ করেন নাই নয় তখন বীরভদ্রের জন্ম হয় নাই। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে চৈতন্যভাগবতের রচনাসমাপ্তিকাল ১৪৩৫-৩৬ খ্রীস্টাব্দ ধরিতে হয়। এমনও হইতে পারে, গ্রন্থরচনা শেষ হইবার আগেই নিত্যানন্দের বিবাহ ও পুত্রলাভ হইয়াছিল। চৈতন্যের লীলাপ্রসঙ্গে সে ঘটনা তাৎপর্যহীন বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। তবে মোটামুটি বলা যায় যে নিত্যানন্দের জীবৎকালেই (আনুমানিক ১৫৪১-৪২ খ্রীস্টাব্দে) চৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল।

বৃন্দাবনদাস দীর্ঘজীবী ছিলেন। ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।[৩] নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর বৃন্দাবন দেনুড় "গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।"[৪] শেষ জীবনে ইনি বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করি।[৫]

---

[১] ১. ১। [২] "অদ্যাপিহ শ্রীবাসের চৈতন্য কৃপায়, দ্বারে সব উপসন্ন হতেছে লীলায়।" ৩. ৫।

[৩] নরোত্তমদাসের খেতরী উৎসবে বৃন্দাবনদাস উপস্থিত ছিলেন বলিয়া নরহরিদাস ভক্তিরত্নাকরে উল্লেখ করিয়াছেন। খেতরী উৎসব ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দের পরে ঘটিয়াছিল, কিন্তু কত পরে তাহা নির্ণয় করা যায় না। মনে হয় অনেক তিরোভূত বৈষ্ণব মহান্তকে সেই উৎসবে উপস্থিত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল। এখনও বৈষ্ণব মহোৎসবে চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের সঙ্গে চৌষট্টি মহান্তের ভোগ দেওয়া হয়।

[৪] এই গ্রাম এখন বর্ধমান জেলায় কালনা মহকুমার অন্তর্গত। দেনুড়ে বৃন্দাবনদাসের পাট আছে। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী প্রণীত 'বঙ্গরত্ন' (দ্বিতীয় ভাগ) দ্রষ্টব্য।

[৫] কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই উক্তির উপর নির্ভর করিতেছি,
"বৃন্দাবনদাস-পাদপদ্ম করি ধ্যান, তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ।" ১. ৮।

চৈতন্যভাগবত বড় বই। তিনখণ্ডে বিভক্ত। ছত্র সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার। আদি খণ্ডে পনেরো অধ্যায়, চৈতন্যের গয়া হইতে প্রত্যাগমনে শেষ। মধ্য খণ্ডে সাতাশ অধ্যায়, চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণে পরিসমাপ্ত। অন্ত্য খণ্ডে দশ অধ্যায়, গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে মিলন ও গুণ্ডিচাযাত্রা মহোৎসব পর্যন্ত বর্ণিত। প্রত্যেক অধ্যায়ের গোড়ায় চৈতন্যের (এবং প্রায়ই সেই সঙ্গে নিত্যানন্দের) বন্দনা আছে। শেষে সর্বদা এই দুই ছত্র,

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ পহুঁ জান[1]
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।

'শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দচন্দ্র (যাঁহার) প্রভু তাঁহার পদযুগে বৃন্দাবন দাস (এই) গান করিতেছে।'

সুরে তালে আবৃত্তি ও গান করিবার উদ্দেশ্যে কাব্যটি লেখা হইয়াছিল তাই মাঝে মাঝে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। গোড়ার দিকে কয়েকটি পদও আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবনের রচিত যে চারিটি পদ আছে তাহার একটিতে ব্রজবুলি শব্দের ব্যবহার আছে।[2] সেকালের প্রচলিত কয়েকটি ধুয়া-গানও উদ্ধৃত আছে। যেমন

রাম-গোপালে বাদ লাগিয়াছে।

ব্রহ্মা রুদ্র সুর	সিদ্ধ মুনীশ্বর	আনন্দে দেখিতেছে। ধ্রু।
নাগ বলিয়া[3]	চলি যায়	সিন্ধু তরিবারে
যশের সিন্ধু	না দেয় কূল	অধিক অধিক বাড়ে। ১. ১।

কাজী-দলন সংকীর্তন-অভিযানে লোকেরা এই পদটি গাহিয়াছিল। মনে হয় এটি সেকালের এক ছেলেভুলানো ছড়া।

বিজয় হইলা হরি নন্দঘোষের বালা।
হরি হরি হাতে বাঁশি গলে বনমালা। ২. ২৩।

বৃন্দাবনদাসের সংস্কৃতজ্ঞান ছিল এবং তিনি ভাগবত ভালো করিয়াই পড়িয়াছিলেন। ভাগবত ও অন্যান্য দুই একটি পুরাণ হইতে কিছু শ্লোক উদ্ধৃত আছে। চৈতন্য-নিত্যানন্দকে বৃন্দাবনদাস কৃষ্ণ-বলরামের অবতার বলিয়া দেখিয়াছিলেন এবং সেই ভাবেই উঁহাদের চরিত্র ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চৈতন্যের তিরোভাবের আগেই বাঙ্গালা দেশে কোন কোন চৈতন্যভক্তের মধ্যে কিছু নিত্যানন্দ-বিমুখতা দেখা দিয়াছিল, একথা আগে বলিয়াছি। বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে নিত্যানন্দ-বিমুখদের প্রতি উষ্মা আছন্ত

---

[1] প্রথম ছত্রের রূপান্তর, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান"

[2] যেমন, "হেরই না পারি", "কোই নাচত কোই গায়ত'। [3] = বলবান্।

প্রতিফলিত। নিত্যানন্দের অনুচরদের মধ্যে অনেকেই অব্রাহ্মণ ছিলেন। নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণসন্তান হইয়াও জাতিবিচার করিতেন না। প্রধানত এই কারণে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যপন্থীরা নিত্যানন্দের আচরণ পছন্দ করেন নাই। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে চৈতন্যকে মানিতেন কিন্তু নিত্যানন্দকে পছন্দ করিতেন না। ইহাদের বুঝাইবার জন্য বৃন্দাবনদাস যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিতেন কথায় সব ব্যাপার সকলকে বোঝানো যায় না। তাই তিনি নিজেই অসহিষ্ণু হইয়া বৈষ্ণব-দৈন্য ভুলিয়া গিয়া বলিয়াছেন,

এত পরিহারেও[১] যে পাপী নিন্দা করে
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে। ১. ৮।

এ বালসুলভ অসহিষ্ণুতা গুরু নিত্যানন্দের কাছে পাইয়া থাকিবেন।

অদ্বৈতের কোন শিষ্যভক্ত গুরুকে অবতাররূপে খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ চেষ্টাকেও বৃন্দাবনদাস ব্যর্থ বলিয়াছেন।[২]

চৈতন্য-নিত্যানন্দকে বৃন্দাবনদাস কৃষ্ণ-বলরামের অবতার বলিয়া সুদৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সে শুধু বিশ্বাস নয়, প্রগাঢ় ভালোবাসাও। তিনি নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রাণমন সঁপিয়াছিলেন। এই বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালোবাসা চৈতন্যভাগবতের গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া কাব্যটিকে কোমল স্নিগ্ধ ও সরস করিয়াছে। পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে আদ্যন্ত উদ্দীপ্ত, ইংরেজীতে যাহাকে বলে ইন্‌স্পায়ার্ড, রচনা বলিতে যদি কিছু থাকে তবে তাহা চৈতন্যভাগবত। চৈতন্যের নবদ্বীপলীলা কবি প্রত্যক্ষ করেন নাই, কিন্তু চৈতন্যের যে ছবি তিনি আঁকিয়াছেন তাহা জলন্ত এবং প্রত্যক্ষ। বৃন্দাবনদাস জানিতেন না যে তিনি কি কাজে হাত দিয়াছিলেন। যে সাহিত্যের চৌহদ্দি সত্যত্রেতাদ্বাপরের গণ্ডীঘেরা সেখানে তিনি সমসাময়িক মানুষকে সিংহাসনে বসাইয়া ঘোর কলিকালের কথা শুনাইয়াছেন। শুধু বাঙ্গালা সাহিত্যেই নয়, সমস্ত আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার সাহিত্যে এ ব্যাপার অপরিকলিতপূর্ব।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। তবে সে বিশ্বাস তাঁহার বাস্তবদৃষ্টিকে রঞ্জিত করে নাই এবং চৈতন্যের কোন চেষ্টিত তিনি আধ্যাত্মিক বা পৌরাণিক ব্যাখ্যায় মণ্ডিত করেন নাই। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যকে যেভাবে আঁকিয়াছেন তাহাতে তিনি মানুষই, অত্যন্ত স্বাভাবিক

[১] অর্থাৎ, সবিনয় নিবেদন, ক্ষমা ভিক্ষা।

[২] "এইমত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া, বোলায় অদ্বৈতভক্ত চৈতন্য নিন্দিয়া"। ৩. ১০।

অথচ অদ্ভুতপ্রকৃতির মানুষ, অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী মানুষ।[১] একটি উদাহরণ দিতেছি।

গয়া হইতে আসিয়া অবধি চৈতন্যের আর পড়াশোনায় মন নাই। টোলে গিয়া ছাত্রদের পাঠব্যাখ্যা না করিয়া কেবল কৃষ্ণনাম করিতে উপদেশ দেন। চৈতন্যের কথায় ছাত্রেরা হাসে, মনে করে নিমাই পণ্ডিতের বায়ু প্রকুপিত হইয়াছে। শেষে তাহারা চৈতন্যের শিক্ষাগুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে গিয়া অনুযোগ করিল। পণ্ডিত বলিল, তোমরা এখন বাড়ি যাও, আমি নিমাইকে বুঝাইব। তোমরা বিকালে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমার কাছে আসিও। ছাত্রদের সঙ্গে বিকালে গুরুগৃহে আসিয়া

গুরুর চরণধূলি প্রভু লৈল শিরে
বিদ্যালাভ হউক গুরু আশীর্বাদ করে।
গুরু বলে বাপ বিশ্বম্ভর শুন বাক্য
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন অল্প নহে ভাগ্য।
মাতামহ যার চক্রবর্তী নীলাম্বর
বাপ যার জগন্নাথ মিশ্রপুরন্দর।
উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার
তুমিও পরম যোগ্য ব্যাখ্যাতা টীকার।
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়
বাপ পিতামহ কি তোমার ভক্ত নয়।
ইহা জানি ভালমতে কর অধ্যয়ন
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কেমনে
ইহা জানি কৃষ্ণ বল কর অধ্যয়নে।
ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর মোর মাথা খাও।
প্রভু বোলে তোমার দুই চরণ প্রসাদে
নবদ্বীপে কেহ মোরে না পারে বিবাদে।
আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন
নবদ্বীপে তাহা স্থাপিবেক কোন জন।
নগরে বসিয়া এই পড়াইব গিয়া
দেখি কার শক্তি আছে দূষুক আসিয়া।
হরিষ হইলা গুরু শুনিয়া বচন
চলিল গুরুর করি চরণ বন্দন।[২]

---

[১] কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই প্রশংসা যথার্থ,
"চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন, সেহো মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ।
মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য, বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।"

[২] ২, ১।

বিশ্বরূপ প্রত্যহ অদ্বৈতের সভায় গীতা-ভাগবত পড়িতে যাইতেন। তখন নবদ্বীপে অদ্বৈতের টোল ছিল। বিশ্বরূপের আসিতে দেরি হইলে শচী শিশু চৈতন্যকে পাঠাইতেন ভাত খাইবার জন্য ডাকিয়া আনিতে। খুব অল্প কথায় বৃন্দাবনদাস শিশু চৈতন্যের এই মনোরম, বাস্তব ছবি আঁকিয়াছেন।

রন্ধন করিয়া শচী বলে বিশ্বম্ভরে
তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে।
মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত-সভায়
প্রভু আইসেন জ্যেষ্ঠ নিবার ছলায়।
আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল
অন্যোন্যে করে কৃষ্ণকথার মঙ্গল।
আপন প্রস্তাব শুনি শ্রীগৌরসুন্দর
সবারে করেন শুভদৃষ্টি মনোহর।
প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা।
দিগম্বর সর্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করয়ে উত্তর।
ভোজনে আইসহ ভাই ডাকয়ে জননী
অগ্রজ-বসন ধরি চলয়ে আপনি।
দেখি সে মোহন রূপ সর্ব ভক্তগণ
চকিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ।[১]

পড়ুয়াদের লইয়া চৈতন্য সংকীর্তন আরম্ভ করিলে অদ্বৈত আচার্য অত্যন্ত খুশি হইয়াছিলেন। বন্ধুদের বলিয়াছিলেন

উহার অগ্রজ পূর্বে বিশ্বরূপ নাম
আমার সঙ্গে আসি গীতা করিল ব্যাখ্যান।
এই শিশু পরম মধুর রূপবান
ভাইকে ডাকিতে আইসেন মোর স্থান।
চিত্তবিত্ত হরে শিশু সুন্দর দেখিয়া
আশীর্বাদ করোঁ ভক্তি হউক বলিয়া।
আভিজাত্য আছে বড় মানুষের পুত্র
নীলাম্বর চক্রবর্তী তাহার দৌহিত্র।
আপনেও সর্বগুণে উত্তম পণ্ডিত
উহার কৃষ্ণেতে ভক্তি হইতে উচিত।
বড় সুখী হইলাম একথা শুনিয়া
আশীর্বাদ কর সভে তথাস্তু বলিয়া।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সভারে
কৃষ্ণনামে মত্ত হউক সকল সংসারে

---

[১] ১. ৬।

যদি সত্যবস্তু হয় তবে এইখানে
সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে।

চৈতন্যের গৃহত্যাগের কথা বৃন্দাবনদাস সংক্ষেপেই দিয়াছেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও সে বর্ণনা পরিপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী। নিত্যানন্দ, শচীদেবী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ ছাড়া আর কাহাকেও চৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণের কথা আগে বলেন নাই। যে-রাত্রিতে গৃহত্যাগ করিবেন সে দিনে যথারীতি সকলের সঙ্গে মিলিয়াছিলেন। যাহারা দেখা করিতে আসিয়াছিল তাহারা প্রায় সকলেই মহাপ্রভুর জন্য চন্দন ও মালা আনিয়াছিল। প্রসাদ করিয়া সেই মালা তাহাকেই পরাইয়া দিয়া

আজ্ঞা করে মহাপ্রভু কৃষ্ণ গাও গিয়া।
বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণনাম
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন।
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকয়ে সভার
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর।

একটি লাউ হাতে করিয়া "খোলাবেচা" শ্রীধর আসিল।

লাউ ভেট দেখি হাসে শ্রীগৌরসুন্দরে
কোথায়ে পাইলা প্রভু জিজ্ঞাসে তাহারে

মহাপ্রভু জানেন, শেষ রাত্রিতে গৃহত্যাগ করিবেন। মাকে বলিলেন, লাউ রাঁধ। ভোজনের পর রাত্রিতে চৈতন্য শয়নকক্ষে শুইলেন, কাছে হরিদাস ও গদাধর শুইয়া রহিল। শচী জানেন নিমাই আজ ঘর ছাড়িবে, তাই তাঁহার ঘুম নাই, চোখে অনবরত জল ঝরিতেছে। চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে চৈতন্য উঠিলেন। গদাধর ও হরিদাস উঠিল। গদাধর বলিল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব। প্রভু বলিলেন, আমি কাহারো সঙ্গে যাইব না, "এক অদ্বিতীয় সে আমার সবে সঙ্গ।" শচী টের পাইয়া ঘরের দ্বারের পাশে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

আই[১] জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন
দুয়ারে আসিয়া রহিলেন ততক্ষণ।
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর
বসিয়া কহেন প্রভু প্রবোধ উত্তর।
বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন
পড়িলাম শুনিলাম তোমার কারণ।
আপনার তিলার্ধেক নাহি কৈলে সুখ
আজন্ম আমারে তুমি রাখিলে সম্মুখ।

---

১ অর্থাৎ পিতামহী বা মাতামহী। এখানে শচীদেবী।

দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার
আমি কোটি কল্পেও নারিব শোধিবার।...
শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার।
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত।
দশদিন অন্তরে বা এখনেই আমি
চলিবাঙ কোন চিন্তা না করিহ তুমি।
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার
সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার।
বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বার বার
তোমার সকল ভার আমার আমার।
যত কিছু বোলে প্রভু সব শচী শুনে
উত্তর না করে কান্দে অঝোর নয়নে।
পৃথিবীস্বরূপা হৈলা শচী জগন্মাতা
কে বুঝিব কৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলাকথা।
জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে
প্রদক্ষিণ করি তাঁরে চলিল সত্বরে।[১]

বৃন্দাবনদাস অলৌকিকচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি লইয়া। তাহাতে তাঁহার লৌকিকদৃষ্টি অস্বচ্ছ হইয়া যায় নাই। চৈতন্য-ভাগবতে চৈতন্য ঈশ্বরের অবতার তথাপি মানুষ, ছোট বড় অন্য মানুষও যতটুকু তাঁহার বক্তব্যের সীমার মধ্যে আসিয়াছে ততটুকু মানুষ, এবং সাধারণ মানুষরূপেই আঁকা পড়িয়াছেন। চৈতন্যের মহত্বের কন্‌ট্রাস্‌টের জন্যই হোক বা তাহার জীবনদৃষ্টির ঝলকেই হোক সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশ বৃন্দাবনের কাব্যে যে-পরিমাণে ও যেমনভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যের আর কোন রচনায় পাই নাই। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের মোহানায় বিশেষ করিয়া হোসেন-শাহার রাজ্যকালের প্রথম বিশ বছরে পশ্চিম বঙ্গের অ-রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাসের দুর্লভ উপাদান অনেকটা এখানেই প্রাপ্তব্য। কিছু নমুনা দিই।

হরিদাসের প্রতি মুলুকপতির উক্তি।

কত ভাগ্যে তুমি দেখ হৈয়াছ যবন
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন।
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশজাত।

---

[১] ২, ২৬

হরিদাসের প্রত্যুক্তি।

এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়।
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন
সেই মত কর্ম করে সকল ভুবন।...
হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।[১]

নিমাই পণ্ডিত শ্রীবাসের ঘরে অথবা নিজের ঘরে ভক্তদের লইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত নামকীর্তন করেন। তাহাতে পাড়ার লোকের অনেকের বিরক্তি জন্মিয়াছিল। বৃন্দাবনদাস তাহার এই বর্ণনা দিয়াছেন।

ঘন ঘন পাষণ্ডীর হয় জাগরণ।
নিদ্রাসুখভঙ্গে বহির্মুখ ক্রুদ্ধ হয়
যার যেনমত ইচ্ছা বলিয়া মরয়।
কেহ বলে এগুলার হইল কি বাই
কেহ বলে রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই।
কেহ বলে গোসাঞি রুষিব এই ডাকে
এগুলার সর্বনাশ হৈবে এই পাকে।
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার
পরম উদ্ধতপনা কোন ব্যবহার।
কেহ বলে কিসের কীর্তন কেবা জানে
এত পাক করে এই শ্রীবাসা ব্রাহ্মণে।
মাগিয়া খাইতে বুলে এরা চারি ভাই
হরি বলি ডাক ছাড়ে যেন মহাবাই।
মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয়।
কেহ বলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ
শ্রীবাসের জন্যে হৈল দেশের উচ্ছাদ।
আজি মুঞি দেয়ানে শুনিল সর্বকথা
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা।
শুনিলেন নদীয়ার কীর্তন বিশেষ
ধরি আনিবার হৈল রাজার আদেশ।
যে সে দিগে পলাইবে শ্রীবাস পণ্ডিত
আমা সভা লৈয়া সর্বনাশ উপস্থিত।

---

[১] ১. ১৪।

তখনি বলিনু মুঞি হইয়া মুখর
শ্রীবাসের ঘর পেলি গঙ্গার ভিতর।
তখন না কৈলে ইহা পরিহাস জ্ঞানে
সর্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে।[১]

১৭

চৈতন্যভাগবতের পরিসমাপ্তি আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজও সে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন।[২] দুইটি পুথি[৩] পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অন্ত্য খণ্ডের অতিরিক্ত তিনটি পরিচ্ছেদ বলিয়া একটি রচনা মিলিতেছে। এই পুথি দুইটি অবলম্বনে অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী (—ইনি দেনুড়ে বৃন্দাবনদাসের পাটের অধিকারী ছিলেন—) 'চৈতন্যভাগবতের অপ্রকাশিত অধ্যায়ত্রয়' বাহির করিয়াছিলেন।[৪]

অপ্রকাশিত-অধ্যায়ত্রয় বৃন্দাবনদাসের লেখা নয়। ইহাতে কয়েকটি মুখ্য ঘটনার এমন বিসদৃশ বর্ণনা আছে যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যেমন—চৈতন্য বৃন্দাবন যাইতেছেন কুলীনগ্রাম হইয়া, অর্থাৎ স্থলপথে দক্ষিণরাঢ়ের মধ্য দিয়া গৌড় হইয়া, রূপ-সনাতনকে সঙ্গে লইয়া। এবং ব্রজভূমিতে তিনি পাঁচ বৎসর ছিলেন॥

১৮

'(নিত্যানন্দপ্রভুর) বংশবিস্তার'[৫] নামে বৃন্দাবনদাসের বলিয়া একটি নাতিক্ষুদ্র রচনা পাওয়া যায়। এটিকে চৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট বলিয়া গণনা করিলেও চৈতন্যভাগবত-রচয়িতার রচনা বলিয়া নেওয়া যায় না। বইটিতে প্রধানত নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র (—এখানে বীরচন্দ্র—) ও তাঁহার বিমাতা জাহ্নবা-দেবীর কথাই স্থান পাইয়াছে। বিষয়ের অথবা রচনার দিক দিয়া বইটিকে

---

[১] ২. ২।

[২] "নিত্যানন্দলীলা বর্ণনে হইল আবেশ, চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ।" ১. ৮।

[৩] প ২০৮, ২১৭। প্রথম পুথি দেনুড়ে পাওয়া, লিপিকাল ১১২৭ সাল। দ্বিতীয় পুথিটি দিল্লীতে লেখা হইলেও প্রথমটির অনুলিপি বলিয়া সন্দেহ হয়। লিপিকর্তা দেনুড় অঞ্চলের লোক।

[৪] দেনুড় হইতে প্রকাশিত, চৈতন্যাব্দ ৪২৪।

[৫] নবীনচন্দ্র আঢ্য প্রকাশিত (১৭৯৬ শকাব্দ); বিপিনবিহারী গোস্বামী প্রকাশিত (১৮০৯ শকাব্দ); বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের সংগৃহীত প্রাচীন পুথি (পত্রসংখ্যা ৪৪)। বইটির আলোচনায় পুথিটিই নির্ভরযোগ্য। লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথম পাদের পূর্বে বলিয়া বিবেচনা করি। এই আলোচনায় পুথিই ব্যবহার করিয়াছি। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মানিকলাল সিংহের সৌজন্যে পুথিটি ব্যবহার করিতে পারিয়াছি।

নারায়ণী-নন্দন বৃন্দাবনদাসের লেখা বলা হয়ত চলিত। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন ছোটখাট অজ্ঞতার পরিচয় আছে যাহা চৈতন্যভাগবত-রচয়িতার কিছুতেই হইতে পারে না। একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে।

বীরচন্দ্র বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। জীব গোস্বামী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বীরচন্দ্র পরিচয় মাগিলে "মুক্ষ হরিদাস সব দিলা পরিচয়" (৪৪ক)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনের যে সব বৈষ্ণবের আজ্ঞায় ও অনুরোধে চৈতন্য-চরিতামৃত লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রসঙ্গে গোবিন্দমন্দিরে-সেবার অধ্যক্ষ পণ্ডিত হরিদাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন

পাঞা যার আজ্ঞাধন ব্রজের বৈষ্ণবগণ
বন্দো তার মুখ্য হরিদাস।

বংশবিস্তার-রচয়িতার এটুকু পড়া ছিল, কিন্তু এখানে "মুখ্য" কথাটির অর্থ জানা ছিল না, তাই গণ্ডগোল করিয়া ফেলিয়াছেন। অতএব তিনি চৈতন্য-ভাগবতের রচয়িতা হইতে পারেন না। "মুক্ষ" হরিদাসের আরো একবার উল্লেখ আছে, জাহ্নবাদেবীর বৃন্দাবনযাত্রা প্রসঙ্গে।

বংশবিস্তার তিন লীলায় ও দশ স্তবকে (অর্থাৎ পরিচ্ছেদে) রচিত। প্রথম স্তবক "বীরচন্দ্রাবতারকারণ", দ্বিতীয় "বীরচন্দ্রপ্রকাশ", তৃতীয় "বীরচন্দ্রবংশ-প্রকাশ",[১] চতুর্থ "জাহ্নবাগোস্বামিনী-বৃন্দাবনগমন", পঞ্চম "শ্রীমতী-বৃন্দাবনা-গমন" (অর্থাৎ জাহ্নবাদেবীর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন), ষষ্ঠ "নিত্যানন্দ-তত্ত্বনিরূপণ", সপ্তম ও অষ্টম (বীরচন্দ্রের) "দেশভ্রমণ",[২] নবমও তাহাই, দশম (বীরচন্দ্রের) বৃন্দাবনভ্রমণ।

নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের এবং বিশেষ করিয়া জাহ্নবাদেবীর, নিত্যানন্দ-অনুচরদের ও বীরভদ্রের প্রচেষ্টার ইতিহাস বংশবিস্তার হইতে অনেকখানি ধরা যায়।

বীরভদ্রকে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের ভক্তেরা চৈতন্যের অবতার বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং নিত্যানন্দের পুত্রলাভ ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দের আগে হয় নাই। বীরভদ্রের জন্মসংবাদ পাইয়া

অদ্বৈত গোসাঈঁ শান্তিপুর হৈতে আইল
দেখিয়া আনন্দিত হয়্যা সাবধান হৈল।
চোরার ঘরের ধন নিতি চুরি করে
এ চোর ধরিব মোরা কেমন প্রকারে।

---

[১] এইখানে আদ্যলীলা শেষ। [২] এইখানে মধ্যলীলা শেষ।

সহজেই অদ্বৈত গোসাই তরজায় সমর্থ
তান কৃপা যারে সেই জানে সব অর্থ ।[১]

নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোভাব হইলে খড়দহে মহোৎসব হইয়াছিল। সব বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল কিন্তু সকলে আসেন নাই।

তার মধ্যে দুর্ভাগ্য হইল কএ জনে
জন্মে জন্মে বিমুখ রহিল শ্রীচরণে।
সে সভার নাম লইতে শ্রদ্ধা নাহি হয়[২]

মহোৎসবের কয়েক দিন পরে বীরভদ্র জাহ্নবাদেবীকে বলিলেন যে তিনি অদ্বৈত আচার্যের কাছে দীক্ষা লইবেন। জাহ্নবাদেবী অমত করিলেন না। কিন্তু মীনকেতন-রামদাস প্রভৃতি নিত্যানন্দ-অনুচরের তাহা মনঃপূত হয় নাই। বীরভদ্রের নৌকা যখন শান্তিপুরের দিকে পাড়ি দিয়াছে তখন নৌকা ঘুরাইয়া আনা হইল।

ক্রোধ করি রামদাস বাকুরা ফেলিল
নির্ভরে বাজিল নৌকা দুই খণ্ড হৈল।[৩]

ভক্তদের কথায় বীরভদ্র জাহ্নবার কাছে দীক্ষা লইলেন। এই কার্যের দ্বারা বাঙ্গালায় বৈষ্ণব-সমাজে বংশগত গুরুপরম্পরার সূত্রপাত হইল।

বীরভদ্র উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে এবং উড়িষ্যায় প্রচার-ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যায় বিবাহ করিয়াছিলেন। উত্তর বঙ্গের প্রসঙ্গে এই কথা আছে,

উত্তর দেশের লোক অনেক প্রকার
শৈব শাক্ত কর্মী যোগী বিভিন্ন আচার।
মদ্য মাংস মৎস্য মার্গ মলেতে সাধন
কামিক্ষার ব্রত মহিপালের জাগরণ।
যোগিপাল ভোগিপালের যাত্রা মহোচ্ছব[৪]
ভোট কম্বল চট পরিধান সব।
এই সব লোক হরিসংকীর্তন করে
নিমাই চৈতন্য বলি ডাকে উচ্চস্বরে।[৫]

বীরভদ্রের সম্মানে মালদহে কেশব ছত্রীর পুত্র দুর্লভ ছত্রী বিরাট মহোৎসব করিয়াছিলেন। মহোৎসব-অন্তে দুর্লভ বীরভদ্রকে প্রচুর দক্ষিণা দিয়াছিলেন।

দুই সহস্র মুদ্রা রজত সহস্র[৬]
উত্তরের অশ্ব দুই বহুবিধ বস্ত্র।

---

[১] পৃ ১১ খ। [২] পৃ ১৩ খ। [৩] পৃ ১৪ কখ।
[৪] তুলনীয় চৈতন্যভাগবতে "যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত"।
"যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত, ইহা শুনিবারে সবলোক আনন্দিত।"
[৫] পৃ ৩০ খ। [৬] পাঠ ভুল মনে হইতেছে। "দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা রজত সহস্র"—এই রকম পাঠ মূলে ছিল বলিয়া মনে করি।

মহোচ্ছব স্থান ব্রহ্মোত্তর পাট লেখি
গলে বস্ত্র দিয়া পড়ে প্রভু পায়ে রাখি।[১]

বীরভদ্র ঘোড়ায় চড়িতেন। পিতৃভূমি রাঢ় দর্শনে তিনি ঘোড়ায় চাপিয়াই যাত্রা করিয়াছিলেন।

দ্রুতগতি যান প্রভু অশ্বতে চড়িয়া
ছড়ি হস্তে ভৃত্যগণ আগে যায় ধায়্যা।[২]

বংশবিস্তার যখন লেখা হয় তখন বীরভদ্রের পুত্রকন্যারা সব জন্মিয়াছে। বইটি লিখিয়া লেখক বৃন্দাবনদাস বীরভদ্রকে শুনাইয়া তাঁহার অনুমোদন লইয়াছিলেন।

এই গ্রন্থ লিখি শুনাইনু প্রভুস্থানে
তিঁহো মোরে কহিয়াছেন রাখিবে গোপনে।[৩]

বংশবিস্তারে অল্প কয়েকটি পদ আছে। একটি উদ্ধৃত করিতেছি।[৪]

মন নিতাই চৈতন্য বলি ডাক
এমন দয়ার প্রভু আর না পাইবে কভু
হৃদয়কমলে করি রাখ।
কিবা সে মধুর লীলা নটন কীর্তন কলা
অগতির গতি অবতার
আপনার গুপ্তধনে অনিয়মে করি দানে
ধনী কৈল এ তিন সংসার।
পরশমণির গুণে তুচ্ছ লাগে মোর মনে
লৌহ পরশিলে হেম করে
নিতাই চৈতন্য-গুণ গান করি কতজন
রতন হইল ঘরে ঘরে।
অমিঞা জিনিঞা হরি- নামসংকীর্তন করি
প্রেমাবেশে পড়েন ঢলিয়া
কহে বৃন্দাবনদাস মনেতে রহিল আশ
বঞ্চিত রহিলুঁ অভাগিয়া॥

১৯

চৈতন্যাবদান-গ্রন্থের মধ্যে প্রামাণিকতায় সর্বোপরি চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত। বই দুইটিকে একসঙ্গে নেওয়া উচিত। চৈতন্যভাগবতে নবদ্বীপ-লীলার বিস্তৃত ও যথার্থ বিবরণ থাকায় চৈতন্যজীবনীর এই অংশ চৈতন্যচরিতা-মৃতে অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। সন্ন্যাসগ্রহণের পর হইতে

[১] পৃ ৩২খ-৩৩ক। [২] পৃ ৩৪ক। [৩] পৃ ১৭ক। [৪] পৃ ৩৩ক।

চৈতন্যের জীবন ও আচরণ চৈতন্যচরিতামৃতে ভালো করিয়া আলোচনা করা আছে। সেই সঙ্গে আছে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের নিগূঢ় মর্মকথা। রচনার পর হইতে 'চৈতন্যচরিতামৃত'[১] নৈষ্ঠিক এবং রসিক, এই দ্বিবিধ বৈষ্ণবসমাজেই চৈতন্য-শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্তগ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে।

চৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ইনি নিজের সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহার অতিরিক্ত কিছু জানা নাই। চৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে যাহা বলা হইয়াছে তাহার মর্ম বলিতেছি।

কাটোয়ার কিছু উত্তরে প্রাচীন নৈহাটি গ্রামের কাছে ঝামটপুরে ইহার নিবাস ছিল। ইনি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। ঘরে গৃহদেবতার নিত্যসেবার ব্যবস্থা ছিল। সে সেবার অধিকারী ছিলেন ব্রাহ্মণ গুণার্ণব মিশ্র। কৃষ্ণদাস চৈতন্য-নিত্যানন্দের গাঢ় অনুরাগী নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব গৃহস্থ ছিলেন। মাঝে মাঝে বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া অহোরাত্রি-সংকীর্তন মহোৎসব করিতেন। একবার কৃষ্ণদাসের বাড়িতে অহোরাত্র সংকীর্তনের শেষে কৃষ্ণদাসের ভাইয়ের সঙ্গে নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবপ্রধান নিত্যানন্দ-অনুচর মীনকেতন-রামদাসের একটু কথা-কাটাকাটি হইয়াছিল। সম্ভবত কৃষ্ণদাসের ভাই নিত্যানন্দের বিষয়ে কিছু নিন্দাবাদ করিয়াছিল। কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন যে তাঁহার ভাই চৈতন্যের ভগবত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতেন কিন্তু "নিত্যানন্দ প্রতি তার বিশ্বাস আভাস"। অনপেক্ষিতভাবে প্রভুনিন্দা শুনিয়া রামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া হাতের বাঁশি ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলে পর এই লইয়া দুই ভাইয়ের মধ্যে মনান্তর হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস ভাইকে খুব ভর্ৎসনা করিলেন। সেইরাত্রিতেই কৃষ্ণদাস স্বপ্ন দেখিলেন, বলরাম-বেশী নিত্যানন্দ গোপবেশধারী পারিষদবর্গ লইয়া আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে অভয় দিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন।[২] নিত্যানন্দের আজ্ঞা পাইয়া কৃষ্ণদাস অবিলম্বে বৃন্দাবনে চলিয়া আসিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহার কি লাভ হইল তাহা তাঁহার কথাতেই বলি।

[১] প্রথম ছাপা হইয়াছিল বেণীমাধব দত্ত কর্তৃক চন্দ্রিকা প্রেসে (১৮২৭)। তাহার পর ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে তিনখণ্ডে। জ্ঞানচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশের সংস্করণও তিনখণ্ডে ছাপা হইয়াছিল (সারসংগ্রহ যন্ত্র, ১২৫১)। আধুনিক কালের সংস্করণগুলির মধ্যে অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীরই (বঙ্গবাসী কার্যালয় চতুর্থ সংস্করণ ১৩৩৪) সবচেয়ে ভালো। অবশ্য চৈতন্যভাগবতের যেমন চৈতন্যচরিতামৃতেরও তেমনি পাঠ যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে এবং প্রক্ষেপহীন হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। সেকালের বৈষ্ণবদের পাণ্ডিত্যের পক্ষে এ খুব বড় প্রশংসার কথা।

[২] "অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না করত ভয়, বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব লভ্য হয়।
এত বলি প্রেরিলা মোর হাতসানি দিয়া, অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা।"

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়
যাঁহা হইতে পাইনু রূপসনাতনাশ্রয়।
যাঁহা হইতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়।
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু রসভাবপ্রান্ত।

সনাতন-রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পর ইহারা তাঁহাকে মদনগোপালের সেবার কোন কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, কেননা মদন-গোপালের আজ্ঞা নিদর্শন পাইয়াই কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃত রচনায় হাত দিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামীর লিপিকর রূপেও সাহায্য করিয়া থাকিবেন। রূপ গোস্বামীর শেষ বয়সে কৃষ্ণদাস তাঁহার পরিচর্যা করিতেন বলিয়া মনে হয়। চৈতন্যচরিতামৃতের ভনিতায় কৃষ্ণদাস নিজেকে "রূপ গোসাঞির ভৃত্য" বলিয়াছেন।[১] রূপ গোস্বামীর তিরোধানের পর কৃষ্ণদাস রঘুনাথ দাসের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাই বলিয়াছেন, "সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার"।

কৃষ্ণদাস গুরুর নাম করেন নাই। সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট ও জীব—বৃন্দাবনের এই ছয় প্রধান বৈষ্ণবগুরুকে তিনি দীক্ষাগুরু বলিয়াছেন।[২] মন্ত্রগুরু না হইলেও রূপ ও রঘুনাথ দাসকে কৃষ্ণদাস দীক্ষাগুরুর মর্যাদা দিয়াছেন, প্রায় প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে নাম করিয়া।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

মনে হয় নিত্যানন্দই কৃষ্ণদাসের দীক্ষাগুরু বা মন্ত্রগুরু ছিলেন। কেবল বিনয়াতিশয্যেই সে কথা ফুটিয়া বলেন নাই, তবে ইঙ্গিতে বোঝা যায়। গ্রন্থারম্ভে বন্দনার মধ্যে নিত্যানন্দের প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন

নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপপ্রকাশ
তাঁর পাদপদ্ম বন্দোঁ যাঁর মুঞি দাস।

ছয় ছত্র পরে মহাপ্রভুকে নমস্কার জানাইয়া লিখিতেছেন

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

---

[১] গোবিন্দলীলামৃতের সর্গান্তিক শ্লোকে "শ্রীরূপসেবাফলে" এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে রূপগোস্বামীর এবং পরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর endowment দেবমন্দির ও সেবা সংস্থানের তত্ত্বাবধান করিতেন বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে নরহরি চক্রবর্তীর পদ হইতে কিছু ইঙ্গিত পাইয়াছি। সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[২] "এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।" ১. ১।

ইহা হইতে বুঝিতে পারি, চৈতন্যের দাস অথচ তাঁহার প্রকাশ যে নিত্যানন্দ তিনিই কৃষ্ণদাসের গুরু এবং কৃষ্ণদাস তাঁহারই দাস।[১] কিন্তু এ সিদ্ধান্তেও সংশয়ের অবকাশ আছে। চৈতন্যচরিতামৃতের শেষ কয় ছত্রে বন্দনার মধ্যে "শ্রীগুরু" বলিয়া পৃথক্ উল্লেখ অছে।

কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন নতুবা বৃন্দাবনদাসের মতো অতটা নিত্যানন্দভক্তির প্রকাশ হইত না। চৈতন্যকেও তিনি দেখিয়া থাকিবেন।

জগদ্বন্ধু ভদ্র কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে কিছু অতিরিক্ত কথা বলিয়াছেন।[২] তাঁহার মতে কৃষ্ণদাসের জন্ম ১৪১৮ শকাব্দে (=১৪৯৬), মৃত্যু ১৫০৪ শকাব্দে (=১৫৮২)। পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা, ভাইয়ের নাম শ্যামদাস। ইহারা জাতিতে বৈদ্য।—এইসব সংবাদ জগদ্বন্ধুবাবু কোথায় পাইয়াছিলেন তাহা জানান নাই। এবিষয়ে সত্যমিথ্যা যাচাই করিবার উপায় নাই।

কৃষ্ণদাস বৈদ্য ছিলেন কিনা জানি না। তবে তাঁহার "কবিরাজ" উপাধি বৈদ্যত্বের জন্য নয়, পাণ্ডিত্যের জন্য, সম্ভবত গোবিন্দলীলামৃত কাব্য রচনার ফলে লব্ধ। কৃষ্ণদাসের রচনাবলীতে সংস্কৃতবিদ্যায় গভীর অধিকারের এবং তাঁহার অধ্যয়নের ব্যাপকতার প্রচুর পরিচয় আছে। চৈতন্যচরিতামৃতে তিনি বহু শাস্ত্র ও গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, এমন কি ব্যাকরণ হইতেও। কিন্তু কোন বৈদ্যক গ্রন্থ হইতে এক ছত্রও তোলেন নাই। বৈদ্য পণ্ডিত হইলে আয়ুর্বেদ কিছু না কিছু পড়া থাকিত এবং অবশ্যই চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত হইত।

কৃষ্ণদাসের লেখা তিনখানি বই আমরা পাইয়াছি। দুইখানি সংস্কৃতে, একখানি বাঙ্গালায়। সংস্কৃতে লেখা হইয়াছিল কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা সারঙ্গরঙ্গদা'[৩] এবং 'গোবিন্দলীলামৃত'[৪] মহাকাব্য। একমাত্র বাঙ্গালা রচনা চৈতন্যচরিতামৃত গোবিন্দলীলামৃতের পরে লেখা।[৫]

---

[১] প্রেমবিলাস প্রামাণিক বই নয়। তবুও এ প্রসঙ্গে প্রেমবিলাসের সাক্ষ্য উপেক্ষার যোগ্য নয়, —"নিজ গ্রন্থে লিখে প্রভুর শিষ্য আপনাকে"। প্রেমবিলাসের মতে স্বপ্নে নহে, প্রত্যক্ষগোচরে নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসকে বৃন্দাবনে যাইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

[২] প্রথম সংস্করণ 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র (১৩১০) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[৩] বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মূলের সহিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[৪] বৃন্দাবন হইতে, এবং নবদ্বীপ হইতে (চৈতন্যাব্দ ৪৬৩) প্রকাশিত।

[৫] গোবিন্দলীলামৃত হইতে কয়েকটি শ্লোক চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত আছে।

গোবিন্দলীলামৃত তেইশ সর্গে গাঁথা। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত মহাকাব্যে সাধারণত ছন্দের বৈচিত্র্য খুব বেশি থাকে না। কৃষ্ণদাস কিন্তু এমন অনেক ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহার উদাহরণ ছন্দঃশাস্ত্রের বাহিরে মিলে না। 'নৈষধ-চরিত'এর অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণদাস আত্মপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোক সর্গান্তিক পুষ্পিকা রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপশ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্‌গতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গোঽয়ং রজনীবিলাসবলিতঃ পূর্ণস্ত্রয়োবিংশকঃ।

'শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মের মধুকর শ্রীরূপের সেবার যাহা ফলস্বরূপ, কৃতি শ্রীরঘুনাথ দাসের দ্বারা যাহা আদিষ্ট, শ্রীজীবের সঙ্গ হইতে যাহা উদ্‌গত, শ্রীরঘুনাথ ভট্টের বরে যাহা উৎপন্ন, সেই গোবিন্দলীলামৃত-কাব্যে রজনীবিলাসবর্ণনাময় ত্রয়োবিংশ সর্গ পূর্ণ হইল।'

ছয় গোস্বামীর মধ্যে একটির—গোপাল ভট্টের—উল্লেখ নাই। মনে হয় গোপাল ভট্টের বৃন্দাবনে আগমনের আগেই কাব্যটি লেখা হইয়াছিল।

রূপ গোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি বই দুইটিতে রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা ভাবনার যে দিশা দিয়াছেন তাহা অনুসরণ করিয়াই কৃষ্ণদাস এই কাব্যে নিত্যবৃন্দাবনে অর্থাৎ গোলোকে রাধাকৃষ্ণের আটপ্রহরিয়া নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন রাগমার্গের সাধকদের মানস অনুশীলনের জন্য।[১] রূপ গোস্বামীর রচনার মতো কৃষ্ণদাসের কাব্যটিও সমসাময়িক ও পরবর্তী বৈষ্ণবগীতিকবিদের রচনার কল্পনা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

কৃষ্ণদাস-বর্ণিত নিত্যলীলা গোলোকের বটে কিন্তু তাহাতে ব্রজলীলারই যথাসম্ভব অনুসরণ। যথাসম্ভব এইজন্য বলিতেছি যে, নিত্যবৃন্দাবনে কৃষ্ণ নবকিশোর নটবর ও সর্বদা রাধাসমেত। তাই ব্রজে কৃষ্ণের নিতান্ত শিশুলীলা অথবা গোবর্ধনধারণ কালিয়দমন কেশিবধ ইত্যাদি দ্বাপরযুগোচিত অবতার-কীর্তি নিত্যবৃন্দাবনে পুনরাবৃত্তির যোগ্য নয়। রাধাকৃষ্ণের অষ্টপ্রহরীয় নিত্য-লীলা কি তাহা কৃষ্ণদাস সূত্রাকারে কাব্যারম্ভে দিয়াছেন।

কুঞ্জাদ্‌ গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্‌ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্ণে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ॥

---

১ "শ্রীরূপদর্শিতদিশা লিখিতাষ্টকাল্যা শ্রীরাধিকেশকৃতকেলিততির্ময়েয়ম্‌।
সেবাপ্ত যোগ্যবপুষানিশমত্র চাস্থা রাগাধ্বসাধকজনৈর্মনসা বিধেয়া॥" ২৩ ৯৪।

'সেই কৃষ্ণ আমাদের রক্ষা করুন, যিনি প্রভাতে কুঞ্জ হইতে বাথানে যান, (দুগ্ধ) দোহন ও ভোজন করেন, সকাল-সন্ধ্যায় যিনি সখাদের সঙ্গে গোষ্ঠে গোরু চরাইয়া লীলায় বিহার করেন, মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে যিনি বৃন্দাবনে রাধিকার সঙ্গে বিলাস করেন, অপরাহ্নে যিনি গোষ্ঠে যান (অর্থাৎ গোরু লইয়া গোশালায় ফিরিয়া আসেন), আর যিনি সন্ধ্যায় সুজনদের আনন্দ দেন।'

২০

চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল লইয়া বিশেষ মতবিরোধ আছে। কোন কোন পুথিতে এবং প্রায় সব ছাপা বইয়ের শেষে এই যে রচনাসমাপ্তি কালজ্ঞাপক শ্লোক আছে তাহার উপর অনেকে নির্ভর করেন।

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ[1] জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেহহ্ন্যাসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ।

'সিন্ধু-অগ্নি-বাণ-ইন্দু (=৭৩৫১ অর্থাৎ ১৫৩৭) শকাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে কৃষ্ণপঞ্চমীতে বৃন্দাবন মধ্যে এই গ্রন্থ পূর্ণতা পাইল।'

কিন্তু নানাকারণে ১৫৩৭ শকাব্দ (=১৬১৫) চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাসমাপ্তি কাল বলিয়া নেওয়া চলে না। প্রথমত, এই তারিখ গ্রহণ করিলে কৃষ্ণদাসকে অত্যন্ত দীর্ঘজীবী, শতায়ুষ্ক, বলিয়া ধরিতে হয়। "বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির" —কৃষ্ণদাসের এই উক্তি সত্ত্বেও চৈতন্যচরিতামৃতের শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত যে অবধানের ও মনস্বিতার পরিচয় আছে তাহা সত্তর-পঁচাত্তর বছরের লোকের লেখা বলিতেও কুণ্ঠা হয়। দ্বিতীয়ত, চৈতন্যচরিতামৃত রচনার সময়ে সম্ভবত রঘুনাথ দাস জীবিত ছিলেন, চৈতন্যকে দেখা আরও কয়েকজন বৈষ্ণব জীবিত ছিলেন। যাঁহাদের অনুরোধে কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিত বর্ণনায় হাত দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গদাধর পণ্ডিতের দুই শিষ্য ভূগর্ভ গোস্বামী ও শিবানন্দ চক্রবর্তী এবং চৈতন্যসেবক কাশীশ্বরের শিষ্য গোবিন্দও ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত লিখিতে দীর্ঘকাল লাগে নাই। চৈতন্যের শেষলীলা বর্ণনা করিতে কৃষ্ণদাসের এত ব্যাকুলতা ছিল যে তিনি গ্রন্থশেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া মধ্যলীলার গোড়াতেই— অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণ উল্লেখের আগেই—শেষলীলা সূত্রাকারে বলিয়া রাখিয়াছেন। কেন যে করিয়াছিলেন তাহা কৃষ্ণদাসের কথাতেই বলি।

এই অন্ত্যলীলা-সার সূত্র মধ্যে বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন
ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে
এই লীলা ভক্তগণধন।

---

[1] পাঠান্তর আছে "শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ" অর্থাৎ ১৫০৩ শকাব্দে। কিন্তু এ তারিখে বার তিথির মিল হয় না।

ধরিতে পারি, চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিতে পাঁচ ছয় বৎসর লাগিয়াছিল। তাহা হইলে ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদাস গোস্বামী, অদ্বৈতের শিষ্য লোকনাথ চক্রবর্তী ইত্যাদির জীবিত থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। একটি প্রাচীন পুথির পাতা হইতে দেখাইয়াছি ১৬১০ খ্রীস্টাব্দের আগেই জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৃন্দাবনের প্রাচীন নেতারা সকলেই তিরোভূত হইয়াছিলেন।[1] সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃত ১৬১০ খ্রীস্টাব্দের বেশ কিছু কাল আগে লেখা হইয়াছিল।

তৃতীয়ত, চৈতন্যচরিতামৃতের প্রাচীনতর পুথি যে কয়টি দেখিয়াছি তাহার কোনটিতেই এই শ্লোক নাই।[2]

চতুর্থত, কোন কোন পুথিতে পাওয়া এই শ্লোকটি কিছু সন্দেহজনকও বটে। কৃষ্ণদাসের অপর বই দুইটিতে কোন কালজ্ঞাপক শ্লোক নাই। কৃষ্ণ-কর্ণামৃতের টীকায় না থাক, গোবিন্দলীলামৃতের মতো পল্লবিত ও আলঙ্কারিক রচনায় থাকা অবশ্যই উচিত ছিল। "গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ"—এ উক্তি রচয়িতার পক্ষে যেমন খাটে লিপিকর্তার পক্ষেও তেমনি খাটে, বোধ করি বেশি করিয়া খাটে। অতএব শ্লোকটি কোন একটি পুথির লিপিকালজ্ঞাপক, এবং সেই পুথিটি পরবর্তী একাধিক পুথির আদর্শ হইয়াছিল। শ্লোকটি কৃষ্ণদাসের মূলরচনার কালজ্ঞাপক হইলে ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে বৃন্দাবনে গোপাল ভট্টের শিষ্য (বা সেবক) বংশীদাসের পড়িবার জন্য লেখা পুথিতে[2] তাহা থাকিবে না কেন? এই পুথিটির অন্ত্যলীলার শেষে কোন শ্লোক নাই, মধ্যলীলার শেষে যে চারটি শ্লোক আছে তাহার দুইটি গ্রন্থারম্ভেও আছে,—"জয়তাং সুরতৌ" (মদন-গোপালের বন্দনা) এবং "শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী" (গোপীনাথের বন্দনা)। এ দুইটি যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় শ্লোক। দ্বিতীয় শ্লোক—গোবিন্দ-বন্দনা —নূতন।[3] চতুর্থ শ্লোকও নূতন। ইহাতে বৃন্দাবনের, গোবর্ধনের ও রাধা-কুণ্ডের প্রশংসা।

---

[1] পৃ ৩১৬-১৭ দ্রষ্টব্য।

[2] সবচেয়ে পুরানো পুথিটি ১০২০ সালে (১৬১৩) লেখা। "শ্রীরাধারমণজি শ্রীগোপালভট্টজি ভৃত্য বংশিদাসকি অয়ং গ্রন্থঃ"। বংশীদাসের পঠনার্থে জগন্নাথ দাস পুথিটি লিখিয়াছিলেন। পুথিখানি পাটনা গৌরাঙ্গ মঠের অধিকারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী মহাশয়ের কৃপায় দেখিয়াছি ও পরীক্ষা করিয়াছি।

[3] "মৎপ্রাণসর্বস্বপদাব্জরেণোর্মদীশ্বরীশ্রীযুতরাধিকায়াঃ।
প্রাণোরুসর্বস্বপদাব্জরেণুং তং শ্রীলগোবিন্দমহং প্রপদ্যে।"

'যাঁহার পদধূলিকণা আমার প্রাণ ও সর্বস্ব সেই আমার ঈশ্বরী রাধিকার পদাব্জরেণু যাঁহার মনপ্রাণ ও সর্বস্ব সেই শ্রীমান্ গোবিন্দকে আশ্রয় করি।'

পঞ্চমত, চৈতন্যচরিতামৃত লইয়া বৈষ্ণব-সমাজে যে সত্য মিথ্যা অথবা সত্য-মিথ্যা-বিজড়িত, জনশ্রুতি দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত আছে—তাহাতে চৈতন্য-চরিতামৃতের সমাপ্তি-শ্লোকগুলি লইয়া সন্দেহের উদ্রেক হয়। বিবর্তবিলাসের[১] মতে কৃষ্ণদাস গ্রন্থ শেষ করিয়া সমাপ্তিবাণীর জন্য জীবগোস্বামীর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত হইল গ্রন্থ রাধাকুণ্ড-তীরে
সমাপ্ত করিয়া মনে করিল বিচারে।
শ্রীজীব গোস্বামীর সহি বিনে চলিত নহিব
চৈতন্যচরিতামৃত টীকা[২] করাইব।
এই মনে কবিরাজ চলিলা সত্বরে
গ্রন্থ লইয়া আইলা বৃন্দাবন দেখিবারে।
তথাহি অন্ত্যের শেষে
চৈতন্য-শেষলীলায়াং শ্লোকানি যানি কানিচিৎ।
সম্পন্নানি মুদিতানি সুকেনি (?) চ কৃতানি চ।
রাধাকুণ্ডস্য পূর্বস্মিন্ রাধারমণকুট্টিমে।
চরিতামৃতশ্লোকানি পূরিতানি সুকেচন (?)।

চরিতামৃতের কোন পুথির শেষে এই দুই শ্লোক পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। সবচেয়ে প্রাচীন যে পুথির অস্তিত্ব অবগত আছি সেটি রাধারমণের মন্দিরে লেখা ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে। এটির শেষে কোন শ্লোক নাই।[৩] এই খানিকে কৃষ্ণদাসের স্বহস্তে লেখা পুথির নকল বলিয়া মনে করি।

চৈতন্যচরিতামৃত জীবগোস্বামীর ভালো লাগে নাই এই জনশ্রুতি অযথার্থ না হইতে পারে। বইটির রচনাকালেই যে আপত্তির গুঞ্জন উঠিয়াছিল তাহা কৃষ্ণদাসের কথাতেও অনুমান করিতে পারি।

যদি পুন হেন কহে গ্রন্থ হৈল শ্লোকময়ে
ইতরজন নারিবে বুঝিতে।

বিবর্তবিলাসের উক্তি হইতে[৪] মনে হয় যে কৃষ্ণদাসের স্বহস্তলিখিত গ্রন্থখানি প্রথমে পাঠকের অপ্রাপ্তব্য করিয়া কুঠুরীতে অন্যান্য মূল্যবান্ মূল গ্রন্থের সঙ্গে তালাবদ্ধ ছিল। জীবগোস্বামী চাহিয়াছিলেন চৈতন্যচরিতামৃতের প্রচার ব্রজধামে যেন না হয়। তবে শ্রীনিবাস আচার্যের মারফৎ অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থের মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠাইতে জীবগোস্বামী রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু

[১] কলিকাতা বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে মুদ্রিত ১৩৩২ সাল।
[২] অর্থাৎ প্রকাশ্য অনুমোদন। [৩] আগের পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। [৪] দ্বিতীয় বিলাস।

কৃষ্ণদাসের সুহৃৎ গোবিন্দ-মন্দিরের সেবায়েত পণ্ডিত হরিদাস গৌড়ে সে পুথি পাঠাইতে দিলেন না।

চরিতামৃত হরিদাস আনিতে না দিলা
কবিরাজের স্বাক্ষর গ্রন্থ ব্রজেতে রহিলা।

মতান্তরে এই পুথিই গৌড়ে পাঠানো হইয়াছিল। ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে পুথি লুট হইবার সংবাদ বৃন্দাবনে পৌছিলে কৃষ্ণদাস তাঁহার বই লুপ্ত হইল মনে করিয়া অন্নজল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন তাঁহার শিষ্য-সহায়ক মুকুন্দদাস।

হেনমতে কবিরাজ মনোদুঃখে রয়
গোসাঞি মুকুন্দ তাঁর পায়ে ধরি কয়।
স্নানাদি করহ প্রভু করহ ভোজন
অবশ্য মিলিবে প্রভু তোমার বর্ণন।
তবে কবিরাজ গোসাঞি হর্ষ হৈয়া চিতে
কেমনে পাইব বাপ কহ প্রিয় বাতে।
তবে কবিরাজ গোসাঞি করিয়া মধ্যাহ্ন
কি কহিলা বাপ কিছু না বুঝি কারণ।
মোর চিত্ত আত্মা মন সেই গ্রন্থ হয়
লোকে না পাইল মোর মরণ নিশ্চয়।
মুকুন্দ কহেন প্রভু করি নিবেদন
যে কালে আপনি করেন গ্রন্থের লিখন।
পরিচ্ছেদ সাঙ্গ হৈলে লৈয়াছি মাগিয়া
পড়িয়া লিখিয়া প্রভু দিতাম আনিয়া।
তিন লীলা গ্রন্থ প্রভু আছে মোর ঠাঁই।
সম্ভষ্ট হয়েন প্রভু মোর কেহ নাই।
ষষ্টি দুই পরিচ্ছেদ আছে মোর পাশ
ইহা শুনি কবিরাজ হইল উল্লাস।
মুকুন্দে আনন্দ হৈয়া কহিল বচনে
প্রকাশ না করিহ এবে রাখ সাবধানে।

কৃষ্ণদাসের স্বহস্তের এবং মুকুন্দের নকল করা—এই দুই পুথি পরবর্তী সব পুথির মূল। কৃষ্ণদাসের মূল পুথি যদি গৌড়ে পাঠানো হইয়া থাকে তো সে পুথি বিনষ্ট। যদি তাহার কোন নকল পাঠানো হইয়া থাকে তো তাহাও বিনষ্ট। আমার মনে হয় মূল পুথির নকল ব্রজধামে রাখিয়া মূল পুথি গৌড়ে পাঠানো হইয়াছিল। ব্রজধামে যে মূল পুথি নাই তাহার কারণ ইহাই।

চৈতন্যচরিতামৃতে জীবগোস্বামীর রচনার মধ্যে 'গোপালচম্পূ'ও[১] উল্লিখিত হইয়াছে। গোপালচম্পূ বিরাট বই, দুই "বিভাগ"এ বিভক্ত। উত্তর বিভাগের রচনাসমাপ্তিকাল ১৫৯২ খ্রীস্টাব্দ বলিয়া অনেকে মনে করেন।[২] এ তারিখ সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা ১৫৯২ খ্রীস্টাব্দের পরে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। গোপালচম্পূ লিখিতে দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। অনেক দিন ধরিয়া যে গোপালচম্পূর "শোধন" কার্য চলিয়াছিল তাহা শ্রীনিবাস আচার্যকে লেখা জীব গোস্বামীর পত্র হইতেই জানা যায়।[৩] রচনাসমাপ্তির তারিখটি শোধনসমাপ্তির পরে যোগ করা হইয়াছিল, ইহাই মনে করা যুক্তিসঙ্গত। গোপালচম্পূ দুই খণ্ডে রচনার পরিকল্পনা জীব গোস্বামী অনেক আগেই করিয়াছিলেন এবং রচনা আরম্ভও করিয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণদাস বইটির নাম করিয়া কিছু অন্যায় করেন নাই। চৈতন্যচরিতামৃতে গোপালচম্পূ হইতে কোন উদ্ধৃতি নাই, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।[৪] পরে আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে জীব গোস্বামীর গোপালচম্পূ কৃষ্ণদাসের গোবিন্দলীলামৃতের পরে লেখা।

চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল অজ্ঞাত। তবে মোটামুটি এই কথা বলিতে পারা যায় যে বইটি রূপ গোস্বামীর তিরোভাবের পরে এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাবের আগে লেখা হইয়াছিল। ১৫৬০-৮০ খ্রীস্টাব্দ রচনা-কালের গণ্ডী ধরিলে অন্যায় হইবে না॥

২১

বৃন্দাবনদাসের কাব্যের মতো কৃষ্ণদাসের কাব্যও তিন খণ্ডে বিভক্ত। তবে এখানে খণ্ডের নাম "লীলা"। প্রত্যেক লীলা কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। আদি লীলায় সতেরো পরিচ্ছেদ, মধ্য লীলায় পঁচিশ, অন্ত্য লীলায় বিশ। একটি বন্দনাশ্লোক দিয়া প্রত্যেক পরিচ্ছেদ শুরু হইয়াছে। শ্লোকগুলি কৃষ্ণদাসেরই রচনা। শ্লোকের পর দুইছত্রে সপরিকর চৈতন্যের বন্দনা।

---

[১] নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্তৃক নাগরাক্ষরে বৃন্দাবন হইতে এবং বঙ্গাক্ষরে বহরমপুর হইতে (১৯১১) খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত।

[২] HBL পৃ ৩৮৫।

[৩] ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত জীব গোস্বামীর পত্র দ্রষ্টব্য।

[৪] 'ভগবৎসন্দর্ভ' হইতেই বেশি উদ্ধৃতি, 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' হইতে দুই এক বার। জীব গোস্বামীর আর কোন বইয়ের উদ্ধৃতি চৈতন্যচরিতামৃতে নাই।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।

কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে যে দুই গোস্বামী-গুরুর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের বন্দনা করিয়া প্রত্যেক পরিচ্ছেদ শেষ করিয়াছেন।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ,
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

তাহার পর পুষ্পিকা, সংস্কৃতে।

ইতি চৈতন্যচরিতামৃতে ...খণ্ডে ...বর্ণনং নাম ...পরিচ্ছেদঃ।

প্রত্যেক লীলার শেষ পরিচ্ছেদে সেই লীলায় বর্ণিত বিষয়ের সূচী ("অনুবাদ") দেওয়া আছে।

চৈতন্যচরিতামৃত পড়িবার জন্য লেখা, গান করিবার জন্য নয়। তাই রাগরাগিণীর উল্লেখ নাই। তবে ত্রিপদী ছন্দে লেখা কাব্যরসসিক্ত অংশগুলি পাঠক ইচ্ছামত সুরে আবৃত্তি করিতে পারেন ইহা জানাইবার জন্য "যথা রাগঃ" এই নির্দেশ আছে। চৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম পঠনীয় অর্থাৎ অ-গেয় গ্রন্থ।

আদি লীলায় প্রথম বারো পরিচ্ছেদ মুখবন্ধ। বন্দনা, মঙ্গলাচরণ, চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত তত্ত্ববর্ণনা, ভক্তভাব-ভক্তস্বরূপ-ভক্তাবতার-ভক্ত-ভক্তশক্তি এই পঞ্চতত্ত্বের নিরূপণ এবং চৈতন্য-বৃক্ষের মুল স্কন্ধ ও দুই প্রধান শাখার বর্ণনা—ইহাই মুখবন্ধের বিষয়। তত্ত্বর্ণনায় কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন যে তিনি স্বরূপ-দামোদরের কড়চার অনুসরণ করিয়াছেন। চৈতন্য রাধা ও কৃষ্ণের সযুজ-অবতার—এই তত্ত্ব স্বরূপ-দামোদর ইঙ্গিত করিয়াছিলেন তাঁহার কড়চায়। কৃষ্ণদাস চৈতন্য-চরিতামৃতে এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। (হয়ত এই তত্ত্বের বীজ আসিয়াছিল তান্ত্রিক মহাযানের যুগনদ্ধ হেরুক-নৈরাত্মার, বাউলদের নিরঞ্জন-নৈরামণির, সাধনা-রীতি হইতে। কিন্তু চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার ধরিলে তাঁহার আচরণের সঙ্গে সঙ্গতি করা যায় এমন তত্ত্বাদর্শ হইতেই ইহা উদ্ভূত।)

চৈতন্যতত্ত্ববর্ণনে কৃষ্ণদাস স্বরূপ-দামোদরের কড়চা হইতে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদ্
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

'কৃষ্ণের প্রণয়বিকার রাধা, তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি। একাত্ম হইলেও তাঁহারা ভূলোকে (অর্থাৎ ব্রজধামে) পুরাকালে (অর্থাৎ দ্বাপর যুগে) ভিন্ন দেহ লইয়াছিলেন। সেই দুই এক হইয়া এখন চৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন। রাধার ভাব ও কান্তিমণ্ডিত কৃষ্ণস্বরূপ তাঁহাকে প্রণাম করি।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দতত্ত্ববর্ণনার শেষে প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণদাস তাঁহার ব্রজগমনের আর অষ্টম পরিচ্ছেদে গ্রন্থরচনার উপলক্ষ্য বিবৃত করিয়াছেন। সে সময়ে বৃন্দাবনদাস জীবিত ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন

বৃন্দাবনদাস-পাদপদ্ম করি ধ্যান
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ।

পরেও বলিয়াছেন

চৈতন্যলীলায় ব্যাস দাস বৃন্দাবন
তাঁর আজ্ঞায় করি তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্বণ।

আদি লীলার শেষ পাঁচ পরিচ্ছেদে চৈতন্যের বাল্যলীলা, পৌগণ্ডলীলা, কৈশোরলীলা ও যৌবনলীলা যথাক্রমে খুব সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। কারণ

বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে
বিস্তারি বর্ণিলা নিত্যানন্দ-আজ্ঞাবলে।

মধ্য লীলার প্রথম দুই পরিচ্ছেদে চৈতন্যের শেষ লীলার পূর্বাভাস দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সন্ন্যাসগ্রহণ হইতে নীলাচলে উপস্থিতি পর্যন্ত বর্ণিত আছে। তাহার পর তিন পরিচ্ছেদে দক্ষিণ-ভ্রমণ। তাহার মধ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা। দশম পরিচ্ছেদে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন ও গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে মিলন। একাদশ হইতে চতুর্দশ পরিচ্ছেদে রাজা প্রতাপরুদ্রকে অনুগ্রহ, বেড়া-সংকীর্তন (বা "পরিমুণ্ডা" নৃত্য), গুণ্ডিচামার্জন, রথাগ্রে নৃত্য ও হোরাপঞ্চমীযাত্রা ইত্যাদি উৎসব-লীলা। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিদায় ও সার্বভৌম-গৃহে ভোজন। ষোড়শে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে গঙ্গাতীর-পথে গৌড় পর্যন্ত গমন ও নীলাচলে প্রত্যাবর্তন। সপ্তদশে ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন-গমন। অষ্টাদশে বৃন্দাবন-ভ্রমণ। উনবিংশে মথুরা হইতে প্রয়াগে আগমন, রূপ ও অনুপম-বল্লভের সহিত মিলন, রূপকে উপদেশ এবং চৈতন্যের কাশী আগমন। বিংশে গৌড়ে বন্দীশালা হইতে সনাতনের পলায়ন ও কাশীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলন। একবিংশ হইতে চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে সনাতনকে শিক্ষা ও উপদেশ। পঞ্চবিংশে কাশীতে ভক্তিপ্রচার, নীলাচলে প্রত্যাগমন ও মধ্য লীলার "অনুবাদ"। মধ্য লীলায় সন্ন্যাসগ্রহণের পর হইতে ছয় বছরের বিবরণ।

অন্ত্য লীলার প্রথম পরিচ্ছেদে শিবানন্দ সেন ও পথের কুকুরের কাহিনী, রূপের নীলাচলে আগমন, তাঁহার নাটক রচনা শুরু এবং গৌড় হইয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন। দ্বিতীয়ে শিবানন্দ সেনের ও "ছোট" হরিদাস কীর্তনীয়ার কথা। তৃতীয়ে হরিদাস ঠাকুরের কথা। চতুর্থে সনাতনের নীলাচলে আগমন ও বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন। পঞ্চমে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কথা, বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের চৈতন্য-জীবনী-নাটকের কথা ও বিবিধ তত্ত্বকথা। ষষ্ঠে রঘুনাথ দাসের কথা। সপ্তমে বল্লভ ভট্টের নীলাচলে আগমন ও মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলন। অষ্টমে রামচন্দ্র পুরীর কথা। নবমে রামানন্দ রায়ের ভাই গোপীনাথ পট্টনায়কের বিপদ ও উদ্ধার। দশমে রাঘব পণ্ডিতের ঝালির (অর্থাৎ খাদ্যপূর্ণ থলির) কথা এবং "পরিমুণ্ডা" নৃত্য। একাদশে হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব ও তদুপলক্ষ্যে মহোৎসব। দ্বাদশে জগদানন্দ পণ্ডিতের অভিমান-কাহিনী। ত্রয়োদশে জগদানন্দের বৃন্দাবন-গমন এবং রঘুনাথ ভট্টের কথা। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর দিব্য বিরহোন্মাদ-প্রচেষ্টা ও বিলাপ। ষোড়শে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজী কালিদাসের কথা, কবি-কর্ণপূরের কথা এবং মহাপ্রভুর দিব্যবিরহ-প্রলাপ। সপ্তদশে দিব্যবিরহোন্মাদ-প্রচেষ্টা ও বিলাপ। অষ্টাদশে বিরহোন্মাদে সমুদ্রে পতন ও উদ্ধার। ঊনবিংশে প্রগাঢ় বিরহ-বিকার ও বিলাপ। বিংশে মহাপ্রভুর রচিত শিক্ষাষ্টকের আস্বাদন এবং অন্ত্য লীলার "অনুবাদ"।

চৈতন্যচরিতামৃতে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন গ্রন্থনির্দেশ না করিয়াও অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। উদ্ধৃত শ্লোকের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ভাগবত হইতে নেওয়া। অপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য —গীতা, কৃষ্ণকর্ণামৃত, ব্রহ্মসংহিতা, গীতগোবিন্দ, পদ্যাবলী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (রূপের), উজ্জ্বলনীলমণি (ঐ), লঘুভাগবতামৃত (ঐ), বিদগ্ধমাধব (ঐ) ললিতমাধব (ঐ), দানকেলীকৌমুদী (ঐ), নাটকচন্দ্রিকা (ঐ), স্তবমালা (ঐ), স্তবাবলী (রঘুনাথ দাস), হরিভক্তিবিলাস (সনাতন), ভগবৎসন্দর্ভ (জীব), শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (ঐ), গোবিন্দলীলামৃত (স্বরচিত), চৈতন্যচন্দ্রোদয় (কর্ণপূর), চৈতন্যচরিতামৃত (ঐ), আর্যাশতক (ঐ), জগন্নাথবল্লভ নাটক (রামানন্দ রায়), স্বরূপ-দামোদরের কড়চা, ভাবার্থদীপিকা (শ্রীধর স্বামী), মহাভারত, রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ, বিষ্ণুপুরাণ, কূর্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, নৃসিংহ-পুরাণ, যামুনাচার্যস্তোত্র, বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র, অভিজ্ঞানশকুন্তল, রঘুবংশ, কিরাতার্জুনীয়, মহাবীরচরিত (ভবভূতি), নৈষধচরিত, কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্য-

দর্পণ, অমরকোষ, বিশ্বপ্রকাশ, পাণিনিসূত্র, হরিভক্তিসুধোদয় ইত্যাদি। সংস্কৃত-উদ্ধৃতির পরিমাণ ও বৈচিত্র্য হইতে কৃষ্ণদাসের অধিগত বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব শিক্ষার্থীদের কাছে চৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকগুলি অবশ্যপাঠ্য হইয়াছিল। শুধু এই শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র পুথি লেখা হইত। তা বোধ করি অধ্যয়নের জন্যই।

আকারে চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যভাগবতের প্রায় সমানই। তবে শ্লোকগুলি বাদ দিলে গ্রন্থের আয়তন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমিয়া যায়। বাঙ্গালা অংশের ছত্রসংখ্যা বিশ হাজারের কম হইবে না।

চৈতন্যচরিতামৃত আখ্যান গ্রন্থ নয়, তত্ত্ব গ্রন্থ। ইহাতে চৈতন্যের জীবনকথার সঙ্গে চৈতন্যাবতারতত্ত্বকথা যুগপৎ এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত। সনাতন-রূপের ভক্তিরসতত্ত্ব এবং স্বরূপদামোদর-রঘুনাথের পররসতত্ত্ব এই বইটিতে বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ ঘটিত বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কৃষ্ণদাস বিশ্বাসী বৈষ্ণব ছিলেন কিন্তু তাঁহার তত্ত্ব শুধু বিশ্বাসের বলেই প্রতিষ্ঠিত করিতে যান নাই। অবশ্য যে বিষয় সাধারণ অনুভূতির বাহিরে সেখানে তিনি প্রমাণ বা যুক্তির জাল ফেলেন নাই। এমন দুরূহ বিষয় বাঙ্গালায় লেখা তখনকার দিনের পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভাবিত ব্যাপার ছিল। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন অনেকটা তাঁহার রচনারীতির নিজস্বতার জন্যই। তখনকার দিনের মানদণ্ডে কৃষ্ণদাসের কবিশক্তি তুচ্ছ করিবার নয়। দুরূহ সংস্কৃত কবিতা রচনায় তাঁহার স্বচ্ছন্দ অধিকার ছিল। ইচ্ছা করিলে তিনি বাঙ্গালাতেও কবিত্ব ফলাইতে পারিতেন। (ত্রিপদী অংশগুলিতে পরিচয় মিলিবে।) কিন্তু তিনি চাহিয়াছিলেন যাহা বলিবার তাহা ঠিকমতো বলিতে। এই জন্য ভাষায় খানিকটা—নিরঙ্কুশতা বলিব না—স্বাচ্ছন্দ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল ব্রজবাসী বাঙ্গালী বৈষ্ণবের মুখে সহজেই পরিচিত হিন্দী (ব্রজভাষা) শব্দ ও সেখানে বহুব্যবহৃত ফারসী শব্দ আসিয়া যাইত। কৃষ্ণদাসের রচনাতেও সেই ভাবে দৈবাৎ হিন্দী-ফারসী শব্দের অথবা ইডিয়মের ব্যবহার হইয়াছে। যেমন, কাহাঁ সো[১]; ঐছে, কৈছে, তৈছে, যৈছে[২]; যোই, কোই; ইহাঁ, কাহাঁ, তাহাঁ, যাহাঁ; অবহি; কাহে; চানা চাবানা[৩]; পৈসা[৪];

---

[১] "নাহি কাহাঁ সো বিরোধ" ২-২। [২] অর্থাৎ ঐসে কৈসে ইত্যাদি।

[৩] "আপনে রহে এক পৈসার চানা চাবানা খাইয়া" ২-২৫।

[৪] এই হিন্দী শব্দটি অনেক পরে বাঙ্গালায় চলিত হইয়াছে।

কুঞ্জা[১] ; বাত[২] ; ক্রিয়া—উতার[৩] ; ছুট[৪] ; ডার[৫] ; ফুকার[৬] ; ইত্যাদি। সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যার মুখে স্বভাবতই দুইচারটি সংস্কৃত পদ আসিয়া জুটিয়াছে। যেমন

> নিগ্রর্ন্থ হইয়া ইহাঁ অপি নির্ধারণে
> রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ যথা বিহরয়ে বনে।
> চ শব্দ অন্বাচয়ে অর্থ কহে আর
> বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয় যৈছে প্রকার।[৭]

চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষার জোর ও তীক্ষ্ণতা এইরূপ ভিন্নভাষার শব্দ প্রয়োগের দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়াছে॥

২২

চৈতন্যের জীবনী প্রত্যক্ষ করিয়া যাঁহারা নোট করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দুইজন মুখ্য। একজন নবদ্বীপ-লীলার সাক্ষী মুরারি গুপ্ত, আর একজন নীলাচল-লীলার শেষ পর্যন্ত সাক্ষী স্বরূপ-দামোদর। মুরারি গুপ্তের কড়চার উপর নির্ভর করিয়া এবং অপর প্রত্যক্ষকারীদের বিবরণ শুনিয়া বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের গৃহস্থাশ্রমের সম্পূর্ণ বিবরণ যথাসম্ভব পরিপূর্ণ ও নিখুঁতভাবে দিয়াছেন। সন্ন্যাসগ্রহণ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণের পর মহাপ্রভুর রাঢ় দেশে ভ্রমণ ও শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে আগমন-বৃত্তান্ত চৈতন্যভাগবতে যেমন আছে চৈতন্যচরিতামৃতে ঠিক তেমন নাই। এখানে কৃষ্ণদাস ইচ্ছা করিয়াই বৃন্দাবনদাসের অনুসরণ করেন নাই। তাহার কারণ নিশ্চয়ই তাঁহার কাছে বলবত্তর সাক্ষ্য বা দলিল ছিল। সন্ন্যাস লইয়া চৈতন্য উদ্‌ভ্রান্তভাবে তিনদিন যে স্থানে ঘুরিয়াছিলেন কৃষ্ণদাস সেই স্থানের লোক। সুতরাং তাঁহার সাক্ষ্যের জোর থাকিবারই কথা। শান্তিপুর হইতে নীলাচলে পৌছানোর বর্ণনা বৃন্দাবনদাস ভালো করিয়াই দিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণদাস এ ব্যাপার সংক্ষেপে সারিয়াছেন। নীলাচলে মহাপ্রভুর উপস্থিতির পর কোন ধারাবাহিক বর্ণনা বৃন্দাবনদাস দেন নাই। সুতরাং এইখান হইতেই কৃষ্ণদাস স্বাধীন পথ অনুসরণ করিয়াছেন।

---

[১] এই ফারসী শব্দও পরে আসিয়াছে। [২] "কহিতে না জানেন বাত" ইত্যাদি।

[৩] "গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত আগে পেটাঙ্গি উতার" ৩-১২।

[৪] "যৈছে তৈছে ছুটি (=মুক্ত হইয়া) আস" ২-১৯।

[৫] "মারি ডাকিয়াছে" (=মারিয়া ফেলিয়াছে) ২-১৮।

[৬] "আমি যদি ফুকারি" (=ডাক দিই) ২-১৮।

[৭] ২, ২৪।

স্বরূপ-দামোদরের কড়চা কৃষ্ণদাস পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাইয়াছেন।[১] রঘুনাথ দাসের কাছে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি রূপ ও রঘুনাথের রচিত চৈতন্যস্তব হইতে উপাদান আহরণ করিয়াছিলেন। সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্ট, ও অন্যান্য ব্রজবাসী বৈষ্ণব যাঁহারা চৈতন্যের সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের কাছেও অনেক কথা শুনিয়াছিলেন।

স্বরূপ গোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল
রঘুনাথ দাস মুখে যেসব শুনিল।
সেই সব লীলা লিখি সংক্ষেপ করিয়া[২]

চৈতন্যলীলারত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তিহোঁ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে
তাহাঁ কিছু যে শুনিল তাহা ইহাঁ বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে।[৩]

বোধ করি রচনা করিতে করিতেই কৃষ্ণদাস ব্রজবাসী বৈষ্ণবদের চৈতন্য-চরিতামৃত শুনাইতেন। এবং সংস্কৃত শ্লোকের প্রাচুর্য থাকায় কোন কোন বৈষ্ণবের কাছে তাঁহার রচনা সর্বত্র সুগম হয় নাই। রাগমার্গের কথা থাকাতেও কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকিবেন। এই দুই অভিযোগ উত্থাপন করিয়া কৃষ্ণদাস নিজেই তাহার জবাব দিয়াছেন মধ্য লীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে।

যদি কেহ হেন কহে গ্রন্থ হৈল শ্লোকময়ে
ইতরজন নারিবে বুঝিতে
প্রভুর যেই আচরণ সেই করি বর্ণন
সর্বচিত্ত নারি আরাধিতে।
নাহি কাহাঁ সো বিরোধ নাহি কাহাঁ অনুরোধ
সহজ বস্তু করি বিবেচন
যদি হয় রাগদ্বেষ তাহাঁ হয় আবেশ
সহজ বস্তু না যায় লিখন।[৪]

---

[১] কবি-কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় স্বরূপ-দামোদরের কড়চা হইতে দুই একটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে। এই শ্লোকগুলি ও চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি ছাড়া কড়চাটির আর খাঁটি অংশ নাই। কড়চা রঘুনাথের কণ্ঠস্থিত ছিল, লেখায় নয়।

[২] ৩.৩। [৩] ২.২।

[৪] এই দুই ছত্রে কৃষ্ণদাস আধুনিক কালের উপযুক্ত মধ্যস্থ-সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছেন। অর্থ—'কাহারও সঙ্গে বিরোধ নাই, কাহারও সঙ্গে খাতির নাই, সহজ বস্তু বিবেচনা করা হইতেছে। যদি অনুরাগ অথবা বিদ্বেষ হয় তবে চিত্তে আবিলতা আসে, সহজ বস্তু লেখা যায় না।'

যেবা নাহি জানে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি
শুনিলেই হৈবে বড় হিত।
ভাগবত শ্লোকময় টীকা তার সংস্কৃত হয়
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন
ইহাঁ শ্লোক দুই চারি তার ব্যাখ্যা ভাষা করি
কেন না বুঝিবে সর্বজন।

রাগমার্গের বিরোধীদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন

ছোট বড় ভক্তগণ বন্দোঁ সবার শ্রীচরণ
সবে মোরে করহ সন্তোষ
স্বরূপ গোসাঞির মত রূপ-রঘুনাথ জানে যত
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ।

চৈতন্যচরিতামৃত মহৎ বই, মহৎ লেখকের লেখা, মহৎ শ্রোতার জন্য লেখা।

পরবর্তী কালে লেখা কোন কোন রাগবর্ত্মপদ্ধতি (চলিত কথায় "সহজিয়া") পুস্তিকায় ও কড়চায় চৈতন্যচরিতামৃত সম্পর্কে জীব গোস্বামীর অসন্তোষের উল্লেখ আছে। চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়া জীব গোস্বামীকে দেখিতে দিলে (—তখন তিনি ব্রজবাসী বৈষ্ণবদের নেতা, সুতরাং তাঁহার অনুমোদন না হইলে বই চলিবে না—) তিনি নাকি অবজ্ঞা করিয়া, একমতে রাধাদামোদরের মন্দিরে গ্রন্থাগারপ্রকোষ্ঠে সব পুথির নীচে রাখিয়া দেন, অপর মতে যমুনায় ফেলিয়া দেন। তাহার কিছুদিন পরে, প্রথম মতে, গ্রন্থাগারের তালা খোলা হইলে দেখা গেল যে চৈতন্যচরিতামৃত পুথিখানি সব পুথির উপরে রহিয়াছে। দ্বিতীয় মতে, দেখা গেল যে পুথিখানি না ডুবিয়া ভাসিতে ভাসিতে উজানে মদনমোহনের ঘাটে আসিয়া ঠেকিয়াছে। অতঃপর বইটির মাহাত্ম্য জীব গোস্বামী অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

জীব গোস্বামীর সঙ্গে কৃষ্ণদাসের কেন কাহারো বিরোধ ছিল না, থাকিবার কথাও নয়। তবে দুইজনের মধ্যে বৈষ্ণবতত্ত্ব বিষয়ে মতানৈক্য ছিল। তাহা বুঝিতে পারি গোপালচম্পূ হইতে। গোবিন্দলীলামৃতে কৃষ্ণদাস যে নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহাতে ব্রজলীলার মধ্যে অবতারকার্যের ও শিশুবিক্রীড়িতের স্থান নাই, সে কথা আগে বলিয়াছি। গোপালচম্পূতে জীব গোস্বামী এ সব লীলাও নিত্যলীলার মধ্যে স্থান দিয়াছেন। কৃষ্ণদাসও এ বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

শ্রীগোপালচম্পূ নামে গ্রন্থ মহাশূর
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর।[১]

গোপালচম্পূ নামে আর গ্রন্থ কৈল
ব্রজপ্রেম-লীলারস সার দেখাইল।[২]

যেসব ব্রজবাসী মহান্তের অনুরোধে কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃত লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে জীব গোস্বামীর নাম নাই। সম্ভবত জীব গোস্বামী বাঙ্গালায় তত্ত্বকথাপূর্ণ কৃষ্ণলীলাময় চৈতন্যচরিত রচনা পছন্দ করেন নাই। বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী ভাষায় কিছুই লিখেন নাই, একথা এখানে মনে করিতে হইবে॥

২৩

চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যচরিত কাব্যমাত্র নয়। জীবনীবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে চৈতন্যপ্রবর্তিত ভক্তিধর্মের ও অধ্যাত্মতত্ত্বের বিবরণ ও বিশ্লেষণ আছে। তত্ত্ববিচার গ্রন্থটির বহিরঙ্গ নয়। চৈতন্যলীলা এবং বৈষ্ণবভাবনা বইটিতে অঙ্গাঙ্গিরূপে অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিবৃত ও বিচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণবভাবনা কৃষ্ণ-লীলাকাহিনীর সহিত ওতপ্রোত। চৈতন্যলীলাও কৃষ্ণলীলার ছাঁচে বিচারিত। তাই "কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত চৈতন্যচরিতামৃত"।

অনেকে মনে করিতে পারেন, কৃষ্ণদাস চৈতন্যের মানবলীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার ঐক্য দেখাইবার জন্যই চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়াছিলেন। এই ধারণা ভ্রান্ত। কৃষ্ণদাস যাহা মানিয়াছিলেন সেই স্বরূপ-দামোদরের সিদ্ধান্ত অনুসারে চৈতন্যের অবতারগ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল "শ্রীরাধার ভাব কান্তি অঙ্গীকার" করিয়া স্বাত্মানন্দ অনুভব করা। সুতরাং চৈতন্যের বিবিধ চেষ্টিতের সহিত বিরহিণী শ্রীরাধার বিজৃম্ভিত সর্বথা তুলনীয়। তদনুসারে কৃষ্ণদাস চৈতন্যের শেষ দশায় তাঁহাকে রাধার মতোই দেখিয়াছেন।

ঐতিহাসিকত্ব, রসজ্ঞতা, দার্শনিক তত্ত্ববিচার সব দিক্ দিয়াই চৈতন্যচরিতামৃত সমুন্নত কৃতি। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনদাসের মতো প্রধানত ভক্তির আবেশ লইয়া চৈতন্যচরিত লিখেন নাই। তাঁহার বিচারবুদ্ধিকেও যথাসম্ভব অতন্দ্রিত রাখিয়াছেন। চৈতন্যের শেষ কয় বৎসরের দিব্যোন্মাদ অবস্থার বিষয়ে বৃন্দাবন-দাস সম্পূর্ণ নীরব রহিয়া গিয়াছেন। কিন্তু "দিনে প্রভু নানাসঙ্গে হয় অন্যমনা, রাত্রিকালে বাঢ়ে প্রভুর বিরহবেদনা",—বুদ্ধিবিচারের অতীত সেই বিরহপীড়ার

---

[১] ২. ১। [২] ৩. ৪।

মর্ম উদ্‌ঘাটন করিতে কৃষ্ণদাসই অগ্রসর হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের বই লেখা না হইলে আমরা বৈষ্ণব-পদাবলীর রাধাকেও পাইতাম না।

চৈতন্যচরিতামৃতে কবিত্ব ফলাইবার স্থান ছিল না যে এমন নয়। কিন্তু কৃষ্ণদাস সে পথে যান নাই। তবে যখনই বিষয়ের মহত্ত্বে আবেগের সঞ্চার হইয়াছে তখনই তিনি ত্রিপদী ছন্দে "যথা রাগ" বলিয়া কিছু কবিত্ব করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতের ত্রিপদী ছত্রগুলির মতো সহজ-সুভগ রচনা পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ। যেমন মধ্য লীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেমা[১] নৃলোকে না হয়
যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য়।
এত কহি শচীসুত শ্লোক পঢ়ে অদ্ভুত
শুনে দোঁহে[২] একমন হৈয়া
আপন হৃদয়-কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ
তবু কহি লাজ-বীজ খাইয়া।
দূরে শুদ্ধপ্রেমগন্ধ কপটপ্রেমের বন্ধ
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়
তবে যে করি ক্রন্দন স্বসৌভাগ্যপ্রখ্যাপন
করি ইহা জানিহ নিশ্চয়।...
কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু
নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।
শুদ্ধপ্রেম সুখসিন্ধু পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়
কহিবার যোগ্য নহে তথাপি বাউলে কহে
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়।

চৈতন্যচরিতামৃত বাউল প্রভৃতি মিস্টিক সাধক, যাঁহাদের পুরাপুরি "বৈষ্ণব" বলা চলে না এবং যাঁহারা সাধারণত শাস্ত্রবিধি মানেন না, তাঁহাদেরও আর্ষ গ্রন্থরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাসের অধ্যাত্মচিন্তায় মিস্টিক অংশ যে নেহাত কম ছিল না উপরে উদ্ধৃত অংশের শেষ কয় ছত্রে তাহার সমর্থন মিলিতেছে।

---

[১] এটি সংস্কৃত পদ, পুংলিঙ্গ প্রেমন্ শব্দের কর্তার একবচন।

[২] অর্থাৎ স্বরূপ-দামোদর ও রামানন্দ।

গ্রন্থের উপসংহারে কৃষ্ণদাস যে আন্তরিক বিনয়জ্ঞাপন ও পরিহার-উক্তি করিয়াছেন তাহা উপহসিত হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও উদ্ধৃত করিবার যোগ্য।

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী।
তৈছে এক কণ আমি ছুঁইল লীলার
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার।
আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান
আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলী সমান।
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির।
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি
পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি।...
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে
তাঁহার চরণ ধুঞা করি মুঞি পানে।
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হৈল শ্রম।

কোন কোন অর্বাচীন[১] ও অপ্রামাণিক[২] বৈষ্ণবজীবনী গ্রন্থে কৃষ্ণদাসের ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণত্যাগের কথা আছে। বৃন্দাবন হইতে চৈতন্যচরিতামৃত সমেত বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রেরিত হইয়াছিল। সেগুলি ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে ডাকাতে লুট করে। এই খবর বৃন্দাবনে পৌছিলে কৃষ্ণদাস মনে দারুণ আঘাত পান, কেন না তাঁহার জ্ঞানমতে এইটিই একমাত্র পুথি। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে তাঁহার এক শিষ্য বা সেবক বইটি কপি করিয়া রাখিয়াছিল। মূল পুথিখানি পরে মল্লভূমের রাজদরবারে হাজির হইয়াছিল।—এই যে কাহিনী তা সমর্থনযোগ্য নয়। আর একটি কাহিনীতে পাই, রঘুনাথ দাসের তিরোধানের পর কৃষ্ণদাস দেহ রাখিয়া-ছিলেন। একটি বইয়ে[৩] দুই মৃত্যুকাহিনীর মধ্যে সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা আছে।

চৈতন্যচরিতামৃত প্রচার হইবার পর হইতেই ইহা ভাগবত ও গীতা ছাড়া প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সিদ্ধান্তগ্রন্থকে অপ্রয়োজনীয় করিয়া দিয়াছে। মিস্টিক বৈষ্ণব সাধকদের কাছে তো চৈতন্যচরিতামৃতই একমাত্র শাস্ত্র। সপ্তদশ শতাব্দের শেষের দিকে ব্রজবাসী বৈষ্ণব দার্শনিক মহান্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সংস্কৃতে চৈতন্যচরিতামৃতের টীকা লিখিয়াছিলেন। ইহার অপেক্ষা আর কি বহুমান বাঙ্গালা বইয়ের হইতে পারে॥

---

[১] ভক্তিরত্নাকর। [২] প্রেমবিলাস। [৩] কর্ণানন্দ।

২৪

লোচনদাসের পুরা নাম লোচনানন্দ দাস। ইনি 'চৈতন্যমঙ্গল'[১] লিখিয়াছিলেন মুরারি গুপ্তের অনুসরণে।[২] বৃন্দাবনদাসের রচনা ইহার জানা ছিল বলিয়া মনে হয় না। ছাপা বইয়ে এবং কোন কোন পুথিতে গোড়াতে বন্দনা-অংশে বৃন্দাবনদাসের রচনার উল্লেখ আছে।

বৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে
জগৎ মোহিত যার ভাগবতগীতে।

কিন্তু এ ছত্র কোন গায়নের অথবা সংস্কর্তার প্রক্ষেপ বলিয়া মনে হয়। যদি তা না হয় তবে বুঝিব, যেহেতু বৃন্দাবনদাসের কাব্য "ভাগবত" নামে উল্লিখিত সেই হেতু লোচনের কাব্য চৈতন্যচরিতামৃতের পরেকার রচনা। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সময়ে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গল 'চৈতন্যভাগবত' নামে পরিচিত ছিল না।

লোচনের কাব্য চৈতন্যচরিতামৃতের আগেই লেখা হইয়াছিল। লোচনের কাব্যে চৈতন্যের তিরোধানের কথা আছে আরও কিছু কিছু অনৈতিহাসিক কথা আছে। এই সব লক্ষ্য করিয়াই কৃষ্ণদাস লিখিয়াছিলেন

আর আর কড়চা-কর্তা রহে দূর দেশে।

চৈতন্যভাগবত-চৈতন্যচরিতামৃতের তুলনায় লোচনের চৈতন্যমঙ্গল বেশ ছোট রচনা। প্রাপ্ত গ্রন্থে প্রক্ষেপ কিছু কিছু আছে। তাহার কারণ লোচনের কাব্য জনসমাজে সমাদরপূর্বক গীত ও শ্রুত হইত।

চৈতন্যমঙ্গলের শেষে[৩] লোচন কিছু আত্মপরিচয় দিয়াছেন। জাতি বৈদ্য। পিতৃকুল মাতৃকুল দুয়েরই নিবাস কোগ্রামে (আধুনিক বর্ধমান জেলায় মঙ্গলকোটের কাছে)। পিতা কমলাকর দাস, মাতা সদানন্দী, মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত, মাতামহী অভয়া দাসী। উভয় বংশের একমাত্র পুত্রসন্তান বলিয়া লোচন আদুরে ছেলে ছিলেন। মাতামহ[৪] জোরজবরদস্তি করিয়া

---

[১] অনেক বাজার সংস্করণ প্রচলিত আছে। বঙ্গবাসী কার্যালয় প্রকাশিত সংস্করণটিই (দ্বিতীয়, ১৯১৮) ভালো। পুথির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—গ ১৭০৪, স ৩৩৯।

[২] "সেই যে মুরারি গুপ্ত বৈসে নদীয়ায়।...
শ্লোকবন্ধে হৈল পুথি গৌরাঙ্গচরিত, দামোদরসংবাদ মুরারি-মুখোদিত।
শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পিরীত, পাঁচালি প্রবন্ধে কহোঁ চৈতন্যচরিত।" (সূত্রখণ্ড বন্দনা।)

[৩] এই আত্মকাহিনী দুর্লভসারেও আছে।

[৪] "মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর, ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাহার।"

লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। চৈতন্যের এক আপ্ত ও প্রিয় অনুচর শ্রীখণ্ডের নরহরি দাস সরকার ইহার "প্রেমভক্তিদাতা" গুরু ছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দে রচিত দুইটি 'শাখানির্ণয়' পুস্তিকায়[১] লোচনদাস সম্বন্ধে এই কথা আছে

গুরুর অর্থে বিকাইল ফিরিঙ্গির হাথ।

এই সময়ের আর একটি নাতিক্ষুদ্র নিবন্ধে[২] লোচনদাসের সম্বন্ধে কিছু নূতন কথা আছে। তাহা সত্য বলিয়াই মনে হয়। এই বই অনুসারে লোচন নিত্যানন্দের আদেশে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং গুরুর নির্বন্ধে বন কাটাইয়া "কঙ্কণনগরে" বাস করিয়াছিলেন। লোচনের পত্নীর নাম কাঞ্চনা। চৈতন্যমঙ্গলের নাম আছে, অন্যান্য ছোটখাট নিবন্ধেরও উল্লেখ আছে।

গদাধর পণ্ডিত ও নরহরি দাস দুই জনে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং নবদ্বীপে চৈতন্যের অত্যন্ত অনুরক্ত অনুচর ছিলেন। গদাধরকে বিষ্ণুশক্তির ও রাধার অবতার ধরিয়া গৌর-গদাই মূর্তির যুক্ত উপাসনা নরহরি দাসই শুরু করিয়াছিলেন। সম্ভবত নিত্যানন্দ নীলাচল হইতে আসিবার পরে গৌর-নিতাই-পূজার প্রবর্তন হইলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু ভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার বৈষ্ণব মহান্তেরা এ ভেদের দিকে নজর দেন নাই। কিন্তু নিত্যানন্দের কোন কোন অনুচর এবং অদ্বৈতের অনুচরগণ নরহরির উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। অনুমান হয় এই কারণেই বৃন্দাবনদাস নরহরি দাসের নাম পর্যন্ত করেন নাই। লোচনের মনে কিন্তু এমন অনুদারতা ছিল না। নিত্যানন্দের উপর তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রবল ভক্তি ছিল।[৩] লোচন বন্দনায় বলিয়াছেন

অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত
শ্রীনিত্যানন্দ বন্দোঁ রোহিণীর সুত।
গোরা-গুণ গৌরবে গর্গর মাতোয়ার
বন্দিয়া গাইব শ্রীচরণ তাহাঁর।

চৈতন্যভাগবত লেখা হইয়াছিল পাঠ ও গান দুই উদ্দেশ্যে, চৈতন্যচরিতামৃত

---

[১] রামগোপাল দাসের ও রসিক দাসের রচিত।

[২] উদ্ধব দাসের 'ব্রজমঙ্গল' (ক ১০২২)। পুথির লিপিকাল ১৭৫৬। রচয়িতা লোচনের প্রপৌত্রের কনিষ্ঠ পৌত্র নয়নানন্দের শিষ্য ছিলেন।

[৩] পদাবলীর প্রসঙ্গে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

শুধু পড়িবার জন্য। তাই এই দুইটি কাব্যে অধ্যায়-পরিচ্ছেদ গ্রন্থবিভাগ আছে। লোচনের চৈতন্যমঙ্গল শুধু গান করিবার জন্যই প্রণীত। তাই এখানে অধ্যায়-পরিচ্ছেদ বিভাগ নাই। আছে চারটি খণ্ড-বিভাগ মাত্র,—সূত্র খণ্ড, আদি খণ্ড, মধ্য খণ্ড ও শেষ খণ্ড। এখানেও অপর দুইটি চৈতন্যচরিত হইতে ইহার পার্থক্য। সূত্র খণ্ড চৈতন্যমঙ্গলে অতিরিক্ত। ইহাতে সাধারণ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের মতো পৌরাণিক অবতার-গ্রহণের হেতুরূপে উপক্রমণিকা রহিয়াছে। কৃষ্ণ রুক্মিণীর কাছে বসিয়া রাধার ও প্রেমরসের কথা কহিতেছেন এমন সময়ে নারদ বিরস-বদনে সেখানে আসিল। বদনমালিন্যের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ কহিল, কলিকালে লোক সব কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া উৎসন্ন যাইতেছে, এইজন্য আমার দুঃখ। কৃষ্ণ হাসিয়া উত্তর দিলেন

> পুরুষের যত কথা পাসরিলে তুমি।
> কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা করিলা যেমতে
> মহেশ-সংবাদ মহাপ্রসাদ নিমিত্তে।
> আর অপরূপ কথা রুক্মিণী কহিলা
> শুনিয়া বিহ্বল হিয়া প্রতিজ্ঞা করিলা।
> ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে
> দীনভাব প্রকাশ করিব নিজ সুখে।
> ভকতজনার সঙ্গে ভকতি করিয়া
> নিজপদ প্রেমরস দিব ত যাচিয়া।
> নিজগুণ সংকীর্তন প্রকাশ করিব।
> নবদ্বীপে শচীগৃহে জনম লভিব।

শুনিয়া উল্লসিত হইয়া বীণা বাজাইতে বাজাইতে নারদ নৈমিষারণ্যে গেল, সেখানে উদ্ধবের সঙ্গে দেখা।[১] উদ্ধবের সঙ্গে কথাবার্তার পর মুনি চলিল কৈলাসে। শিব-পার্বতীর সহিত হরিকথা কহিয়া নারদ ব্রহ্মার কাছে গেল। এবং ব্রহ্মার সহিত কৃষ্ণের অবতার-তত্ত্বের আলোচনা করিল। এখানে ভাগবত গীতা ইত্যাদি হইতে কিছু শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার পর মুনি নীলাচলে গেল দারুব্রহ্ম দেখিতে। জগন্নাথ তাঁহাকে নিভৃতে বলিলেন, মহাবৈকুণ্ঠে গৌরসুন্দরকে দেখিতে যাও। তিনিই অবতার হইবেন।

---

১ লোচন এখানে জৈমিনি-ভারতের নজির দিয়াছেন।
"জৈমিনি ভারতে নারদ-উদ্ধব সংবাদ, শুনিয়া লোচন দাস আনন্দে উন্মাদ।
আমার বচনে যেবা প্রতীত না যায়, বিচার করুক পুথি বত্রিশ অধ্যায়।"
এ কয় ছত্র প্রক্ষিপ্ত হওয়াও অসম্ভব নয়।

মুনি চলিল, বৈকুণ্ঠ পার হইয়া "লোক বেদ অবিদিত" মহাবৈকুণ্ঠে পৌছিল। দেখিল মহাবৈকুণ্ঠপতির অভিষেক হইতেছে।

সব তরু কল্পদ্রুম তহি এক নিরুপম
রত্ননদী তার দুই পাশে
স্বর্ণসিংহাসন তায় বসিয়া গৌরাঙ্গরায়
অমৃতমধুর লহু হাসে।
শাখা মঙ্গলঘটে সিংহাসন সুনিকটে
বামপদাঙ্গুষ্ঠে পরশিয়া[১]...
রাধিকা করিয়া কাছে অনুচরী চারি পাশে
রতন-কলসী করি করে
বাম পাশে রুক্মিণী সঙ্গে কত সঙ্গিনী
রত্নস্বর্ণঘটে জল ভরে।

"হেমবরণিয়া" দ্বিভুজশরীর মহাপ্রভুকে দেখিয়া নারদ মূর্ছিত হইয়া নয়ননীরে ধরণী সিক্ত করিতে লাগিল। স্নান সমাপন হইলে প্রভু নারদকে কোলে তুলিয়া লইলেন। নারদের সব সংশয় ঘুচিয়া গেল। মুনি স্তব করিতে লাগিল। মহাপ্রভু বলিলেন, তুমি পৃথিবীতে যাও। বলরাম, শিব ইত্যাদি লইয়া আমি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইতেছি। নারদকে বিদায় দিয়া মহাবৈকুণ্ঠনাথ ডাহিনে রাধিকা বামে রুক্মিণী ও চারদিকে প্রধান রঙ্গিণীদের লইয়া আসন্ন অবতার-কার্যের কথা আলোচনা করিলেন।

তাহার পর নারদ শ্বেতদ্বীপে আসিয়া বলরামকে দর্শন করিল। দেখিয়া মুনি ভক্তিপ্রেমে ঢলিয়া পড়িল। বলরাম তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। স্তব করিয়া নারদ মহাপ্রভুর অবতারগ্রহণের কথা বলিল।

কলিপাপময় যুগে না দেখি নিস্তার লোকে
দয়া উপজিল প্রভু-চিত্তে
পালিব ভকত-জন আর ধর্ম-সংস্থাপন
জনম লভিমু পৃথিবীতে।
অধর্ম-বিনাশ কাজে আর কিবা মর্ম আছে
হেন বুঝি আকার-ইঙ্গিতে
প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে ঘোষণা দিবার তরে
শুনি প্রভু ভেল আনন্দিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদে জনমহ পৃথিবীতে
সুনাম ধরহ নিত্যানন্দ
তোমার অগোচর নহে প্রভুকর্ম সঙ্গ দেহে
আজ্ঞা করিলা গৌরচন্দ্র।

[১] যেমন পাথরের চণ্ডী ও মনসা মূর্তিতে।

শুনি বলরাম রায় আনন্দে চৌদিকে চায়
অট্ট অট্ট হাসি উচ্চনাদে
ঘন ঘন হুহুঙ্কার নয়নে বহয়ে ধার
আপনা পাসরে প্রেমানন্দে।
আজ্ঞা দিলা নিজ জনে পৃথিবী কর আগমনে
প্রভু আজ্ঞা পালিবার তরে
শুনহ নারদ মুনি জনম লভিব তুমি
অগোচর করিব গোচরে।
ঐছন অমৃতকথা শুনহ গোরা-গুণগাথা
সব জন কর অবধানে
সব অবতার সার করি গোরা অবতার
বিচার করহ মনে মনে।
তৃণ ধরে৺া দশনে বোলে৺া মো কাতর মনে
গোরাগুণে না করহ হেলা
সংসারে না দেহ মতি কর কৃষ্ণে পিরীতি
সংসার তরিতে এই ভেলা।
কভু নাহি হয় যেই গোরা অবতার সেই
হইব পরম পরকাশ
নির্জীবে জীবন পাবে অন্ধে পথ বিচারিবে
গুণ কহে এ লোচন দাস॥

লোচনের চৈতন্যমঙ্গল আকারে বৃন্দাবনদাস-কৃষ্ণদাসের কাব্যের তুলনায় অনেক ছোট। ছত্রসংখ্যা প্রায় ১১০০০। তাহার মধ্যে সূত্র খণ্ড প্রায় ১৮০০, আদি খণ্ড প্রায় ৩৩০০, মধ্য খণ্ড প্রায় ৪৩০০ এবং শেষ খণ্ড প্রায় ১৬০০। সূত্র খণ্ডের বিষয় অবতারারম্ভ। আদি খণ্ডে গয়াগমন পর্যন্ত বর্ণনা। মধ্য খণ্ড শেষ হইয়াছে নীলাচলে সার্বভৌমের প্রতি অনুগ্রহে। সব চেয়ে ছোট শেষ খণ্ডে তীর্থযাত্রার (দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম ভ্রমণ একসঙ্গে) বর্ণনা[১], বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশ দিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, প্রতাপরুদ্রের প্রতি অনুগ্রহ, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও বিভীষণের কাহিনী, মহাপ্রভুর তিরোধান।[২]

লোচনের গ্রন্থ পরিপূর্ণভাবে "পাঁচালি প্রবন্ধ"।[৩] সেইজন্য আদ্যন্ত রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। এবং "শিকলি" ও "নাচাড়ি" অংশ প্রায় সমান সমান।

[১] দক্ষিণ-ভ্রমণের তুলনায় বৃন্দাবন-ভ্রমণের কথা বেশি বলা হইয়াছে।

[২] সব পুথিতে ও ছাপা বইয়ে নাই।

[৩] "যে কিছু কহিল নিজ বুদ্ধি অনুরূপ, পাঁচালিপ্রবন্ধে কহোঁ মো ছার মুরুখ।" মধ্য খণ্ডের শেষ।

লোচনের কাব্যের সর্বত্র তাঁহার গুরুভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। যেমন সূত্র খণ্ডের শেষে,

শ্রীনরহরি দাস যে দয়াময় দেহ
পাতকী দেখিয়া দয়া বাঢ়ল সিনেহ।
দুরন্ত পাতকী অন্ধ অতি দুরাচারে
অনাথ দেখিয়া দয়া করিলা আমারে।

নরহরি দাসের কাছে লোচন চৈতন্যের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন॥[১]

২৫

নরহরি দাসের বড় ভাই মুকুন্দ দাস স্থলতান হোসেন-শাহার খাস চিকিৎসক ছিলেন। ইহাদের পিতা নারায়ণ দাসও "রাজবৈদ্য" ছিলেন। মুকুন্দ দাস আজীবন চিকিৎসায় ব্যাপৃত ছিলেন কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত ভক্তিরসিক।[২] চৈতন্য ইঁহাকে ভালোবাসিতেন। পুত্র রঘুনন্দন বাল্যাবধি ঈশ্বরনিষ্ঠ, আর কনিষ্ঠ নরহরি চৈতন্যের কৈশোর অনুচর। মুকুন্দের গূঢ় ও গাঢ় ঈশ্বরপ্রেমের একটি কাহিনী চৈতন্য নীলাচলে ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন।

বাহ্যে রাজবৈদ্য ইহোঁ করে রাজসেবা
অন্তরে প্রেম ইহাঁর জানিবেক কেবা।
একদিন ম্লেচ্ছ রাজার উচ্চ টুঙ্গিতে
চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে।
হেন কালে এক ময়ূর পুচ্ছের আড়ানি[৩]
রাজশিরোপরি ধরে এক সেবক আনি।
শিখিপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা
অতি উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা।
রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হইল মরণ
আপনি নামিয়া তবে করাইল চেতন।
রাজা বোলে ব্যথা তুমি পাইলে কোন্ ঠাঞি
মুকুন্দ কহেন বড় ব্যথা নাহি পাই।
রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি
মুকুন্দ কহে রাজা মোর ব্যাধি আছে মৃগী।
মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব জানে
মুকুন্দেরে হৈল তার মহাসিদ্ধ জ্ঞানে।

---

[১] "তাহার প্রসাদে যেবা শুনিল প্রকাশ, আনন্দে গাইল গুণ এ লোচন দাস।"

[২] চৈতন্যচরিতামৃত ২. ১৫।

[৩] অর্থাৎ বড় পাখা।

হোসেন শাহার রঙ খুব কালো ছিল। তাই মাথার উপরে ময়ূরপুচ্ছের পাখা ধরিতেই মুকুন্দের কৃষ্ণস্মৃতিজনিত ভাববিহ্বলতা আসিয়াছিল।

নরহরি-রঘুনন্দনকে লইয়া শ্রীখণ্ডে একটি পারিবারিক বৈষ্ণব-গোষ্ঠী জমিয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের বহু শিষ্য-প্রশিষ্য হইয়াছিল এবং এই শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণও ছিল; গুরু-পরম্পরা সৃষ্টি করিবার ফলেই ইহারা "ঠাকুর" পদবী পাইয়াছিলেন। (ব্রাহ্মণ হইলে "গোস্বামী" হইতেন।) পদাবলী-রচনায় এবং কীর্তন-গানে এই শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় অগ্রগণ্য ছিলেন। জগন্নাথের রথাগ্রে চৈতন্য যে বিখ্যাত "পরিমুণ্ডা" কীর্তন ও নৃত্য করিয়াছিলেন[১] তাহা সাত-সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। রথের চারি পাশে চারি সম্প্রদায়, দুই পাশে দুই, আর পিছনে এক —এই সাত সম্প্রদায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুই মার্দঙ্গিক, এক নৃত্যকারী এক প্রধান গায়ন আর পাঁচজন করিয়া "পালি" অর্থাৎ দোহার। সাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ছিল শ্রীখণ্ডের,

নরহরি নাচে তথা শ্রীরঘুনন্দন।

লোচনের নামে কয়েকটি ক্ষুদ্র সাধননিবন্ধের পুথি পাওয়া গিয়াছে।[২] তাহার মধ্যে 'দুর্লভসার'[৩] নিশ্চয়ই তাঁহার রচনা। অন্যগুলির সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা কঠিন।

নরহরির লেখা দুই-একটি ছোট সংস্কৃত নিবন্ধ আছে। তাহার মধ্যে একটি মূল্যবান্, নাম 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত'।[৪] বইটি গদ্যে ও পদ্যে লেখা। গদ্যের ছাঁদ সূত্ররীতির। এই বইটিতে নরহরির অধ্যাত্মচিন্তার খাঁটী খবর পাওয়া যায়। বইটির মধ্যে নরহরি এই যে-কথা ভবিষ্যদ্‌বাণীরূপে লিখিয়াছেন তাহাতে মনে হয় নিত্যানন্দের তিরোভাবের পরেই বইটি লেখা হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুণা শ্রীনিত্যানন্দেনাবতারে সংহৃতে মহান্ প্রলয়ো ভবিষ্যতি।
দেবনিগ্রহৈ রাজনিগ্রহৈঃ প্রজা দুর্গতা ভবিষ্যন্তীতি।
বৈষ্ণবাঃ সর্ব এব মহান্তো দিনে দিনে ঈশ্বরসঙ্গমে চলিতাঃ।
কেচিৎ কেচিদেব স্থাস্যন্তি তেঽপি নিজপ্রভাবং সংহরিষ্যন্তি।
কেবলমন্তঃপ্রীতিমেব নিগূঢ়ং প্রেম কদাচিৎ কদাচিদেব বোধয়িষ্যন্তি।
তত্তু মহদ্ভিরপি বোদ্ধুং ন শক্যতে। ১২০-১২৫।

---

[১] চৈতন্যচরিতামৃত ২. ১৩।

[২] যেমন, 'চৈতন্যবিলাস' (স ১৭৭), 'বস্তুতত্ত্বসার (গ ৩৯৬৩), 'আনন্দলতিকা' (গ ৬৯৬৫), 'বৃহৎ নিগম' (ক ৩৫৩৭) ইত্যাদি।

[৩] গ ৩৭২৯, স ৩২৮। বহুবার মুদ্রিত। প্রথম (?) মুদ্রণ ১৮৭২।

[৪] শ্রীনিত্যানন্দ দাস কাব্যতীর্থের অনুবাদ সহ, শ্রীখণ্ডস্থিত শ্রীরঘুনন্দন সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, রানীগঞ্জে মুদ্রিত, ১৩৩৯।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু ও নিত্যানন্দ কর্তৃক অবতারলীলা সংহরণ করিলে মহাপ্রলয় হইবে। দৈব-নিগ্রহে ও রাজার নিগ্রহে প্রজারা কষ্টে পড়িবে। বৈষ্ণব-মহান্ত সকলেই একে একে ঈশ্বরের কাছে চলিয়া যাইবেন। কেহ কেহ অবশ্য থাকিবেন, কিন্তু তাঁহারাও নিজ প্রভাব গুটাইয়া লইবেন। কেবল মাঝে মাঝে অন্তরের প্রীতি নিগূঢ় প্রেমই প্রকাশ করিবেন। সে ব্যাপার জ্ঞানীদেরও বুঝিবার সাধ্য নাই।'

বইটিতে অদ্বৈতের নাম একবারও নাই। ইহা ভাবিবার কথা। নিত্যানন্দ আছেন, তবে মুখ্যভাবে নাই। মুখ্যভাবে আছেন গদাধর পণ্ডিত। তাঁহাকে নরহরি রাধার অবতার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[১] চৈতন্য কৃষ্ণের অবতার। তিনি এই অবতারে কি কাজ করিয়াছিলেন তাহা নরহরি সংক্ষেপে বলিয়াছেন।

> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্তু কৌপীনধারী দীনবেশঃ সন্ন্যাসাশ্রমালঙ্কৃতোঽত্যন্তদুর্দান্তবলবন্তং মহাবৃষভদুর্দ্দ্রূঢ়মধ্যাত্মবাদিনং বিষয়ান্ধং কুযোগিনং জড়মজস্রং মদ্যপং পাপং চণ্ডালং যবনং মূর্খং কুলস্ত্রিয়ঞ্চ প্রেমসিন্ধৌ পাতয়ামাস। আনন্দেন বৈকুণ্ঠোপরি স্থাপয়ামাস। কেবলং প্রেমধারৈব সর্বেষামাশয়ং শোধিতবান্ আসুরীভাবঞ্চ চূর্ণিতবান্। ৯৫-৯৭।

'কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৌপীনধারী দীনবেশ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া সংখ্যাহীন অত্যন্ত দুর্দান্ত বলবান্ মহাবৃষভের মতো দুর্দমনীয় অধ্যাত্মবাদীকে, বিষয়ান্ধকে, হীনযোগমার্গগামীকে, নির্বোধকে, মদ্যপায়ীকে, পাপীকে, দুরাচারীকে, যবনকে, মূর্খকে, কুলনারীকে প্রেমসিন্ধুতে অবগাহন করাইয়াছিলেন। আনন্দের দ্বারা তাহাদের বৈকুণ্ঠের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শুধু প্রেমধারা ঢালিয়া তিনি সকলের হৃদয় শোধন করিয়াছিলেন, তাহাদের পরিগৃহীত অসুরভাব ধ্বংস করিয়াছিলেন।'

নরহরি তাঁহার নিবন্ধের শেষ শ্লোকে অন্তরঙ্গ বান্ধব স্বরূপ-দামোদরের প্রতি আনুগত্য দেখাইয়াছেন।[২] কিন্তু চৈতন্য যে একাধারে কৃষ্ণের ও রাধার অবতার—স্বরূপ-দামোদরের এই সিদ্ধান্ত তিনি অবগত ছিলেন না অথবা গ্রহণ করেন নাই।

চৈতন্যের বর্তমান কালে যাঁহারা তাঁহাকে উপাস্য দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন নরহরি তাঁহাদের একজন। ইনি গৌরাঙ্গ-পূজাবিষয়ে একটি

---

[১] "রাধা শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ এব সকলচরিত্রভাবঞ্চ প্রশস্য স্বৈ বিখ্যাতঃ।" ৯৭। ইত্যাদি।

[২] "চৈতন্যচারুচরণাম্বুজমত্তভৃঙ্গঃ শ্রীমৎস্বরূপ ইহ মে প্রভুরাশ্রয়শ্চ।
সখ্যুশ্চ তস্য ভজনামৃতসংশ্রয়েণ তুষ্টো ভবেদতিতরাং সফলা তদাশা।"

'চৈতন্যের চারুচরণাম্বুজের মত্তভৃঙ্গ শ্রীমান্ স্বরূপ এখন আমার প্রভু ও আশ্রয়। তাঁহার সখার ভজনামৃত বিষয়ে যদি তিনি তুষ্ট হন তবে তাহার আশা অত্যন্ত সফল হইবে।'

এই শ্লোক হইতে অনুমান হয় যে ভজনামৃত রচনাকালে স্বরূপ-দামোদর জীবিত ছিলেন।

ছোট নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পদ্যে লেখা। ছন্দ শার্দূলবিক্রীড়িত। নাম 'গৌরাঙ্গাষ্টকালিকা'।[১]

শ্রীখণ্ডের গোষ্ঠীতে রাগমার্গের দিকে ঝোঁক যে গোড়া থেকেই ছিল তা ভজনামৃত পড়িলে বোঝা যায়। পরে এইসূত্রে কিছু তান্ত্রিকভাবেরও আমদানি হইয়াছিল বলিয়া মনে করি ॥[২]

২৬

লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলের মতো আরো কয়েকখানি চৈতন্যচরিত কাব্য গেয় "পাঁচালিপ্রবন্ধ" রীতিতে বিরচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে একটি অংশত আর একটি পুরাপুরি পাওয়া গিয়াছে। অপরগুলি নামেমাত্র জানা।[৩]

অংশত পাওয়া গিয়াছে চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়'।[৪] বইটির একটি মাত্র (বেশ প্রাচীন) পুথি জানা আছে।[৫] তাহার গোড়ার কয়েকটি পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং শেষের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নাই। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতের মতোই চূড়ামণির গৌরাঙ্গবিজয় আদি মধ্য অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত, এবং মহাপ্রভুর গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনে আদিখণ্ডের সমাপ্তি।

আদি খণ্ড মধ্য খণ্ড শেষ খণ্ড কহিব
গৌরাঙ্গবিজয় তিন খণ্ডে পূর্ণ হৈব।
গয়া দেখি আইলে পূর্ণ আদিখণ্ড পুথি
বৈষ্ণবচরণে কিছু করিমু প্রণতি।...

---

১ HBL পৃ ৩৫ দ্রষ্টব্য।

২ 'শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩ জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলের গোড়ায় বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের পরে এইসব রচনার নাম করিয়া বলিয়াছেন, আমি সব শেষে চৈতন্যমঙ্গল গাহিলাম।

"গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী, চামর-প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি।
সংক্ষিপ্তে কহিলেন পরমানন্দ গুপ্ত, গৌরাঙ্গবিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত।
গোপাল বসু করিলেন সঙ্গীতপ্রবন্ধে, চৈতন্যমঙ্গল তাঁর চামর-বিছন্দে।
এবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্য রসে, জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গায় শেষে।"

এইসব রচনা কি ধরণের ছিল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে গৌরীদাস পণ্ডিতের চৈতন্যচরিতের উল্লেখ বিবর্তবিলাসেও আছে।

কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরেন সামর্থ্য
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতে রচিল যে চরিত ॥ পঞ্চম বিলাস।

৪ 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালায় দি এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৫৭)। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের পূর্ববর্তী সংস্করণে গ্রন্থটি 'ভুবনমঙ্গল' নামে বর্ণিত হইয়াছিল।

৫ গ ৩৭৩৬। কাগজ কালি ও লেখার ছাঁদ হইতে মনে হয় পুথিটি কমপক্ষে সপ্তদশ শতাব্দের শেষার্ধে লেখা।

অতঃপর পুথির পাতাগুলি পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত অংশে ছত্রসংখ্যা ছয় হাজার।

চূড়ামণির কাব্য অধ্যায়-পরিচ্ছেদে বিভক্ত নয়। "নাচাড়ি" অংশের তুলনায় "শিকলি" অংশই বেশি। রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দের পদাবলীসংগ্রহগ্রন্থে চূড়ামণি দাসের ভনিতায় একটি গান সঙ্কলিত আছে।[১] সেটি ইহার রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। তাহা ছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্যে কোথাও চূড়ামণির নাম নাই।

গৌরাঙ্গবিজয়ের কবি এক মুখ্য নিত্যানন্দ-অনুচর ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে তিনি গ্রন্থ কর্মে রত হইয়াছিলেন।[২] তিনি গুরুর কাছে ও গুরুভ্রাতা গদাধর দাস ও (মীনকেতন) রামদাস প্রভৃতির কাছে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ শুনিয়াছিলেন।[৩] চূড়ামণি এমনও বলিয়াছেন যে ধনঞ্জয় পণ্ডিত ও গদাধর দাসের কাছে নিত্যানন্দ যে সব কথা বলিয়াছিলেন তাহা তিনি সেইখানে থাকিয়া শুনিয়াছিলেন।

কহিছে নিতাই গদাধর-ধনঞ্জয়ে
সংসর্গে শুনিঞা আছোঁ কহিল নিশ্চয়।

আদি খণ্ডের শেষে নিজের ও গুরুর সম্বন্ধে চূড়ামণি এই কথা বলিয়াছেন।

আবালক কাল হৈতে স্বভাব আমার
অলস অদক্ষ অজ্ঞ অকৃতীর সার।
এ সব দুর্গতি দেখি ঠাকুর ধনঞ্জয়
করিল ত কৃপা মোরে দেখি দুরাশয়।
কোন ধর্মকর্মে[৪] তোর নাহি অনুরোধ
কৃষ্ণ-বৈষ্ণবে তোর হৈব সত্য বোধ।
এই ভরোসাএ বুলি ভিক্ষা করি সার
ঠাকুর রামাই কৃপা করিল আপার।
তোরে বড় কৃপা করি বৈষ্ণব ধনঞ্জয়[৫]

---

[১] প-ক-ত ১১৪২।

[২] "সুস্বপ্ন কহিয়াছে নিত্যানন্দ রাএ, চূড়ামণি দাস কহে এই ভরোসাএ।" পৃ ৫২। একথা অনেকবার বলিয়াছেন।

[৩] "কহিলেন নিত্যানন্দ এইসব পরবন্ধ গদাধর-ধনঞ্জয় সনে।
গৌর-মাধবেন্দ্র মেলি প্রেম-আনন্দ কেলি চূড়ামণি দাস রচনে। পৃ ৪০।

[৪] পাঠ "কর্মধর্মে"।

[৫] অতঃপর গ্রন্থ খণ্ডিত।

চৈতন্যচরিতামৃতে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বৈরাগ্যপরায়ণতার ও ভক্তিময়তার উল্লেখ আছে।[১] চূড়ামণি নিত্যানন্দেরও কৃপাভাজন ছিলেন।

নিত্যানন্দ-প্রভুশক্তি ধনঞ্জয় ধরে
কটক-উজ্জ্বল বলি কহিতেন তাঁরে।
তাঁর বলি কৃপা কৈল নিত্যানন্দ রাএ পৃ ৫৪।

মনে হয় নিত্যানন্দের তিরোভাবের পরে চূড়ামণি দাস বই লিখিতে আরম্ভ করেন। চূড়ামণি অন্য কোন চৈতন্যচরিত গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। ১৫৪২ হইতে ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে গৌরাঙ্গবিজয় রচিত হইয়া থাকিবে।

গৌরাঙ্গবিজয়ে অনেক নূতন কথা পাওয়া যাইতেছে। ঝাড়খণ্ডে মাধবেন্দ্র পুরীর তপস্যা, শান্তিপুরে নবদ্বীপ ও খলপপুরে[২] মাধবেন্দ্র পুরীর গমনাগমন এবং শিশু নিমাইকে দর্শন[৩], নিত্যানন্দপ্রভুর পিতৃগৃহের ও বাল্য কথা ইত্যাদি অনেক কিছু অন্যত্র নাই। তবে এ সকল বিবরণ যে সবই সত্য অথবা অধিকাংশ অসত্য এমন রায় সরাসরি দেওয়া যায় না। বৃন্দাবনদাসের মতো চূড়ামণি দাসেরও আশেপাশের খুঁটিনাটিতে দৃষ্টি ছিল। বৃন্দাবনদাসের লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণবহির্মুখ সমাজের দিকে আর চূড়ামণি দাসের লক্ষ্য পড়িয়াছিল বৈষ্ণব (অর্থাৎ বর্ণনীয় ব্যক্তিদের) সংসারের দিকে। সেইজন্য চৈতন্যের ছেলেবেলায় ও ছেলেখেলার কথা বেশ বড় করিয়া বলা হইয়াছে। চৈতন্যের গৃহের বর্ণনা চূড়ামণি ছাড়া আর কেহ দেন নাই। যৎকিঞ্চিৎ এবং অন্যত্র অসমর্থিত হইলেও এই বিবরণ মূল্যবান্।

দক্ষিণ ত পূর্বদ্বারী সুন্দর শ্রীঘরে
পূর্বদ্বার অভ্যন্তরে সুরম্য চত্বরে।
দক্ষিণ কপাট দিয়া অভ্যন্তরে আসি পৃ ৪৪।

চূড়ামণির মতে চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হইবার আগে পত্রব্যবহার চলিয়াছিল, নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ-জন্মতিথি পালন করিতেন এবং নবদ্বীপে তত্ত্বতাবাস করিয়াছিলেন। একথার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলে ধরিতে হইবে এই জন্মতিথিপূজা ও তত্ত্বাবাস চৈতন্যসন্ন্যাসের পরেই হইয়াছিল।

---

১ "নিত্যানন্দ-প্রিয় ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়, অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময়।" ১. ১২।

২ চূড়ামণি দাস সর্বদা খলপপুর বলিয়াছেন, একবারও 'একচাকা' বলেন নাই।

৩ মনে হয় চূড়ামণি এখানে মাধবেন্দ্র পুরী ও ঈশ্বর পুরী দুইজনের মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।

ঘরের সর্দার-চাকর শুভাইয়ের কাছে নিত্যানন্দ নিমাইয়ের কথা শুনিয়াছিলেন। সংসারের কাজে শুভাই মাঝে মাঝে নবদ্বীপ অঞ্চলে যাইত। একবার নিত্যানন্দ চিঠি লিখিয়া শুভাইয়ের হাতে দিয়া বলিলেন, এই চিঠি পুরন্দর মিশ্রের পুত্রকে দিবে। তুমি তাঁহাদের জান?

> হাসিয়া শুভাই কএ প্রভু দয়াবর
> তাঁসভারে চিনি আমি চিনি তাঁর ঘর।
> বলদ লইয়া যাই নদীয়া নগরে
> ধান্য বদলে কলায় আনিবার তরে। পৃ ৬৮।

প্রচুর উপায়ন লইয়া শুভাইয়ের সঙ্গে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে যাত্রা করিলে মাতা পদ্মাবতী মূর্ছিত ও পিতা মুকুন্দ পণ্ডিত পাগলের মতো হইয়া গেলেন। প্রতিবেশীরা সান্ত্বনা করিতে ছুটিয়া আসিল। তাহার মধ্যে বিদ্বেষী জ্ঞাতিও ছিল। এমনি একজনের সরস ও বাস্তব উক্তি পুরাপুরি উদ্ধৃতির যোগ্য।

> আখণ্ডল আচার্য আইলা হেনবেলা
> কথাগুলা কএ যেন বোড়া সাপের জ্বালা।
> অবা হে[১] ব্রাহ্মণপুত্র মোর বোল শুন
> স্বরূপ কহিএ[২] যদি হিত হেন মান।
> বন্দিঘটী বংশে বটি ত বড়ার পুত্র
> ভিন্নপর নহি বটি তোমার সগোত্র[৩]।
> সুপণ্ডিত জন বটি বয়স আপার
> আমারে ত ছোট বটে বাপ তোমার।
> প্রামাণ্য বচন মোর অল্প জ্ঞান কর
> অকাজে চলহ যার তার বোল ধর।
> আমারে পণ্ডিত বড় কারধিক[৪] বুধি
> কেবা সে জানএ কত কি পুথির শুধি।...
> মো হেন সুবুদ্ধি ধীর মোরে কর বাউল[১]
> এই সে কারণে সর্বকার্য হৈল আউল[২]।
> অকার্য গ্রাহক সে অবাচ্যে তোল বাণী
> কাটিয়া ত বড় নালা ঘরে আন পানী।
> ভালো গায় কাওইয়া তুমি কর বেথা
> দুঃখ অনুভবই জান বিসর্পণ কথা।
> ভালোমন্দ পরিণাম না জানসি তুম
> ছাওয়াল দোলাইতে লাগল ঘুম।

---

[১] অর্থাৎ ওহে। [২] পাঠ "কহিতে"। [৩] ঐ "ত সূত্র"। [৪] অর্থাৎ কার অধিক।
[১] পাঠ "বালু"। [২] ঐ "আলু"।

কোথা নদীয়াপুর মিশ্র পুরন্দর
কোথা বসে শচী কোথা বিশ্বম্ভর।
দশ বিশ জনে ধায় আগে জান সন্ধি[১]
বেটাএ ত ধরি আনি ঘরে কর বন্দি।
নানা রত্ন নানা বস্ত্র নানা দ্রব্য দিয়া
পাঠাই সেহেন পুত্র ঘরে কান্দ গিয়া।
না চিনি না শুনি তারে দেহ এত ধন
মোরে কাচাখান[২] দিতে না উঠএ মন।
এত বলি ক্রোধে চলি যাএ সে মন্দিরে
তারে অনুযোগ দেই যতেক সুধীরে। পৃ ৭৯।

মাঝে মাঝে আখণ্ডল আচার্যের আবির্ভাব ঘটিলে গৌরাঙ্গবিজয়ের স্বাদুতা বাড়িত।

নিত্যানন্দের নবদ্বীপযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ আছে। গৌরাঙ্গের সহিত মিলন ভালো করিয়া বলা হইয়াছে। নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিত্যানন্দ গঙ্গাহরি পণ্ডিতের কাছে পাঠ লইতে লাগিলেন। তিন মাসেই সব শাস্ত্র একটু একটু করিয়া জানা হইয়া গেল। কিছু দিন পরে দণ্ডকমণ্ডলুধারী এক যতী তাঁহাদের বাড়ীতে অতিথি হইলে নিত্যানন্দ তাঁহার সহিত রাতারাতি পলাইলেন। তাঁহারা প্রথমে গেলেন নীলাচলে। তাহার পর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর চূড়ামণি চৈতন্যের পিতৃভূমি শ্রীহট্ট-যাত্রার বিবরণ দিয়াছেন। নবদ্বীপে বারকোনা ঘাট হইতে নৌকা করিয়া তিনি শিষ্য ও ভৃত্য সঙ্গে পূর্বদেশে গিয়াছিলেন। পিতৃভূমিতে প্রচুর অভ্যর্থনা লাভ হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে গৌরাঙ্গের বিবাহ হইল। তাহার পরে গয়া-যাত্রা। গঙ্গাতীর-পথ ধরিয়া কহলগাঁ, বারাড়ি, ভাগলপুর হইয়া গৌরাঙ্গ গয়ায় পৌছিয়াছিলেন। পথের বর্ণনা বাস্তব।

গড়িদ্বার হৈতে প্রভু অতিবেগে চলে
পাএ লাগালি গৌরের হুঙ্কার বোলে।
কলিগ্রাম বারাড়ি তেজিয়া প্রভু যায়
সমুখে বাঘলপুর দেখিবারে পায়। পৃ ১০৭।

চূড়ামণির কাব্যে ব্রজবুলি পদের ব্যবহার বেশি আছে, বিশেষ করিয়া গান-গুলিতে। গানের একটি নিদর্শন দিই। শিশু নিমাইয়ের বর্ণনা।

---

[১] অর্থাৎ সন্ধান। [২] অর্থাৎ খাটো ধুতি।

অতি সুকুমার অঙ্গ সুকুমার দশা
চলচল কলমল নবরঙ্গরসা
আকুল আঁখিকুল বিছিরাম-ধানে
যব নব হেরয়ে না জান যেয়ানে।
পহিরল বিশম্ভর অম্বর নীলে
তড়িতজড়িত যেন ঘন মেঘমালে। ধ্রু।
নব বর সুধাকর শ্রীমুখ শোহই
হাসি সুধারাশি হেরি জগমন মোহে।
উতুঙ্গ জ্রূভঙ্গ প্রেমরস গেহে
বিপুল ধীঘল আঁখি শ্রুতি অবলেহে।
পরিসর শিরবর চারুতর চুলে
ভালতটে তিলকটে ভৃঙ্গ হেন বুলে।
মনোহর গ্রীববর বিস্তার উরে
নবতর করিবর সুদীঘল করে।
সুতুঙ্গ নিতম্ববিম্ব চারু উরু জঙ্ঘে
রক্তকঞ্জ রসপুঞ্জ রঞ্জে ভঙ্গিভৃঙ্গে।
ধনঞ্জয় নির্ভয় ধরি পদছায়া
গৌর-বাল্যরূপ চূড়ামণিদাস গায়া। পৃ ৩৪-৩৫

ভনিতায় চূড়ামণি দাস চৈতন্যকে মাঝে মাঝে "বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ" বলিয়াছেন। আর কোন চৈতন্যচরিত-লেখক তাহা করেন নাই। গৌরাঙ্গবিজয়ে চৈতন্যকে অবতার বলিয়া প্রমাণ করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নাই। যে জনসাধারণ চৈতন্যকে অবতার বলিয়া স্বতই বিশ্বাস করিতেন তাহাদের জন্য বইটি লেখা॥

২৭

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'[১] লোচনের ও চূড়ামণির কাব্যের মতো গেয় ও আবৃত্তি-যোগ্য, বৃন্দাবনের ও কৃষ্ণদাসের রচনার মতো প্রধানত পঠনার্থ অতএব অধ্যায়-পরিচ্ছেদে বিভক্ত নয়। খণ্ডে বিভক্ত, তবে তিন বা চারি খণ্ডে নয়—নয় খণ্ডে। লোচনের কাব্যের মতো পৌরাণিক কথামুখ আছে, তবে খুব সংক্ষেপে।

[১] জয়ানন্দের গ্রন্থের প্রথম সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (৪ পৃ ১৯৬ হইতে)। বইটি প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালে (=১৯০৫) সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক। সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ। কিছুকাল পূর্বে (১৯৫২) শ্রীমতী শিবানী বসু বইটি সম্পাদনা করিয়া ছাপাইয়াছেন কিন্তু বিশেষ কারণে অদ্যাপি বিক্রয়ার্থ প্রকাশিত হয় নাই। আমি এই সংস্করণটি ব্যবহার করিয়াছি।

সম্পূর্ণ পুথি একটি মাত্র জানা আছে (গ ৫৩৯৮, লিপিকাল ১০৯৬ মল্লাব্দ = ১১৯০)। খণ্ডিত পুথি কয়েকটিই পাওয়া যায় তবে সেগুলি প্রধানত ধ্রুবচরিত্র, ইন্দ্রদ্যুম্ন-আখ্যান ইত্যাদি অংশেরই।

নৈমিষারণ্যে একদিন উদ্ধব নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কলিকালে জীব পাপে মগ্ন হইয়া কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের উদ্ধারের জন্য কি কৃষ্ণের অবতার হইবে না? নারদ বলিলেন, উদ্ধব শুন। কলিযুগে

সর্বলোক বৈষ্ণব হবেক আচম্বিতে।
দ্বিজকুলে জনমিব গৌর ভগবান
অখিল জীবেরে সে করিব প্রেমদান।
ঘরে ঘরে প্রতি গ্রামে হব দেবালয়।
কলিযুগে সর্বলোকে হব ধর্মময়।

তাহার পর নারদ "জৈমিনিসংহিতা" অনুসারে ব্রহ্মা-মহেশ্বরসংবাদ উদ্ধবকে শুনাইলেন। কলিযুগে অনাচার দেখিয়া পৃথিবী ব্রহ্মার কাছে গিয়া নালিশ করিলেন।

রসাতল যাই আমি দেখ বিদ্যমান।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর বহিল আমি ভার
আর জনে দেহ ব্রহ্মা কলির অধিকার।

ব্রহ্মা পৃথিবীকে লইয়া ক্ষীরোদসাগরে গেলেন। ভগবান্ দ্বিজরূপে অবতীর্ণ হইবেন, স্বীকার করিলেন।

কাব্যমধ্যে স্থানে স্থানে (জয়ানন্দের উক্তি অনুসারে) তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায়। তাঁহারা জাতি ব্রাহ্মণ, বন্দ্যঘটি গাঁই। নিবাস মধ্যরাঢ়ে আমাইপুরা গ্রামে। (এই গ্রামের সন্ধান নাই। মনে হয় গ্রামটি হয়ত আধুনিক বর্ধমান জেলার সাতগেছে থানার অন্তর্গত বড়োয়াঁ গ্রামের নাতিদূরে ছিল বা আছে।[১] পাঠে আছে "বর্ধমান" সন্নিকটে। ষোড়শ শতাব্দে যে বর্ধমান প্রসিদ্ধ ছিল সে এখনকার বর্ধমান শহর নয়। তখনকার বর্ধমান এখন স্বাভাবিক ধ্বনি-পরিবর্তন অনুসারে বড়োয়াঁয় পরিণত।) জয়ানন্দের মায়ের নাম রোদনী। বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র, চৈতন্যভক্ত ছিলেন। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন

জয়ানন্দের বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞি
পরম ভাগবত উপমা দিতে নাঞি।
পূর্বে গোসাঞির শিষ্য পুস্তক লিখনে
আপনে চিন্তান পাঠ যত শিষ্যগণে। আদি খণ্ড।

[১] জয়ানন্দ বলিয়াছেন, এই গ্রাম হইতে চৈতন্য বায়ড়া গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে গিয়াছিলেন। বায়ড়া গঙ্গাতীরে, নবদ্বীপের অপর পারে ছিল। মান্দারন সরকারে যে বায়ড়া ছিল বা আছে তাহার কথা এখানে উঠিতে পারে না, আধুনিক বর্ধমান শহরের কথাও নয়। চৈতন্য সত্যই আমাইপুরায় গিয়াছিলেন কিনা তাহা পরে বিচার করিতেছি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের শাখায় এক সুবুদ্ধি মিশ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি জয়ানন্দের বাপ হইতে পারেন। "পূর্বে গোসাঞির"—এই পাঠ একদা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু কাব্যের শেষেও আবার এই কথা আছে।[১] সুতরাং এখানে "গোসাঞি" বলিতে চৈতন্য গোসাঞি। জয়ানন্দের পিতা সম্ভবত চৈতন্যের টোলে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি পুথিও লিখিতেন। ("পুস্তক লিখনে") এবং অন্য চৈতন্য-পড়ুয়ার মতো নিজে নিজেই পড়িতেন। জয়ানন্দ তাঁহার খুড়া-জেঠাদের নাম করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহারা পণ্ডিত ও শক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন এবং চৈতন্যকে মানিতেন না, আর তাঁহারা রামমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন।[২]

বন্দিঘটি বংশে রঘুনাথ-উপাসক
তার মধ্যে জয়ানন্দ চৈতন্য-ভাবক।

জয়ানন্দ বোধ হয় গদাধর পণ্ডিতের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। তাই বেশির ভাগ এই রকম ভনিতা,

চিন্তিঞা চৈতন্য-গদাধর পদদ্বন্দ
আনন্দে বৈরাগ্য খণ্ড গায় জয়ানন্দ ॥

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন,[৩] নীলাচল হইয়া (বৃন্দাবন উদ্দেশে) গৌড় যাত্রা কালে চৈতন্য রেমুনা বাঁশদা দাঁতন জলেশ্বর হইয়া মান্দারনে ঢুকিয়া বর্ধমানে দেখা দিলেন। জ্যৈষ্ঠমাসের প্রখর রৌদ্র, পথের বালি তাতিয়া উঠিয়াছে। ক্লান্ত হইয়া তিনি গাছের তলায় শয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পর

বর্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে
আমাইপুরা তার নাম
তাহে সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞির পূর্ব শিষ্য
তার ঘরে করিলা বিশ্রাম।
তাহার নন্দন গুহিয়া জয়ানন্দ নাম থুইঞা[৪]
রোদিনী রান্ধিল তারে লঞা
রোদিনী ভোজন করি চলিলা নদীয়াপুরী
বায়ড়ায় উত্তরিল গিঞা।...

[১] "তাহে সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞির পূর্ব শিষ্য তার ঘরে করিলা বিশ্রাম।"

[২] বৈরাগ্য খণ্ড। [৩] বিজয় খণ্ড।

[৪] একথা আদি ও বৈরাগ্য খণ্ডে আরও স্পষ্ট করিয়া আছে,
"গুহিয়া নাম ছিল মায়ের মড়াচিয়া বাদে, জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্যপ্রসাদে।"

বায়ড়া গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য
ধন্য মাতা ধন্য পিতা ধন্য বংশ রাজ্য।
চলিল চৈতন্য বিদ্যাবাচস্পতি-ঘরে
সহস্র সহস্র লোক যায় দেখিবারে।

এখানে হয়ত কিছু ভুল আছে। চৈতন্য নীলাচল হইতে গৌড়ের দিকে আসিয়াছিলেন পানিহাটি পর্যন্ত নৌকাপথে। কুমারহট্ট কুলিয়া বায়ড়া হইয়া গৌড়ে গিয়াছিলেন এবং গৌড় হইতে বায়ড়া কুলিয়া শান্তিপুর কুমারহট্ট পানিহাটি বরাহনগর পর্যন্ত (অন্তত) আসিয়াছিলেন স্থলপথে। সুতরাং জয়ানন্দের উক্তি সত্য হইলে তিনি গৌড় হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে আমাইপুরা হইয়া বায়ড়ায় আসিয়াছিলেন। জয়ানন্দের কথা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক নয় তাহার প্রমাণ উক্তিটির মধ্যেই আছে। মৃতাপত্য মাতার সন্তান যমের দৃষ্টি এড়াইতে পারিবে এই আশায় জয়ানন্দের নাম রাখা হইয়াছিল "গুহিয়া"[১]। চৈতন্য এই কুৎসিত নাম পাল্‌টাইয়া "জয়ানন্দ" রাখিয়াছিলেন। চৈতন্য মানুষের অবমাননা কোন প্রকারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। (শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে এক ঝি ছিল, তাহার নাম দুঃখী। সব দেহে কৃষ্ণ বিরাজমান, সুতরাং কাহাকেও দুঃখী বলিয়া চিহ্নিত করিবার অধিকার অপরের নাই। চৈতন্য সেই দাসীর নাম বদলাইয়া "সুখী" রাখিয়াছিলেন।) সুতরাং জয়ানন্দ যে শৈশবে চৈতন্যের দৃষ্টি-প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা না হইতে পারে।

নিত্যানন্দের এক প্রধান অনুচর অভিরামদাসের ও নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের আশীর্বাদ জয়ানন্দ পাইয়াছিলেন। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আজ্ঞা ও চৈতন্যের অনুগ্রহ তাঁহার উপর ছিল। তদুপরি বাপের পুণ্য তো ছিলই। এই সবের বলে জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল-রচনায় মন দিয়াছিলেন।[২] গ্রন্থের উপক্রমে জয়ানন্দ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের নাম করিয়াছেন। সেই সঙ্গে আরও কয়জন চৈতন্যজীবনী-রচয়িতার নাম করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের রচনার বিশেষ কোন হদিশ পাওয়া যায় নাই।[৩] চৈতন্যজীবনীর বাহিরে সাতজন

---

১ আধুনিক কালে "গুয়ে"।

২ "শ্রীবীরভদ্র গোসাঞির প্রসাদমালা পাঞা,
শ্রীঅভিরাম গোসাঞির কেবল বল পাঞা।
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা শিরে ধরি,
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গীত কিছু যে প্রচারি।"
আদি খণ্ড।

"শ্রীঅভিরাম গোসাঞির পাদোদক প্রসাদে,
পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা চৈতন্য-আশীর্বাদে।
বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র তপস্যার ফলে,
জয়ানন্দের মন হৈল চৈতন্যমঙ্গলে।"
বৈরাগ্য খণ্ড।

৩ পূর্বে পৃ ৩৭৩ পাদটীকা ৩ দ্রষ্টব্য।

অগ্রগামী কবির নাম করা হইয়াছে,[১]—বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস রামায়ণে, ব্যাস ও গুণরাজ খান ভাগবতে, জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলায়।

রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি
পাঁচালি করিল কীর্তিবাস অনুভবি।
শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র করিল প্রকাশ।

জয়ানন্দ বৃন্দাবনদাসের পরে চৈতন্যমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। তখন বীরভদ্র বৈষ্ণবসমাজের নেতারূপে স্বীকৃত হইয়াছেন, এবং যদি নিম্নে উদ্ধৃত গ্রন্থশেষের ছত্র দুইটি প্রক্ষিপ্ত না হয়, তবে তখন তাঁহার সন্তানাদিও হইয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দ নিবাস করিল খড়দহে
মহাকুল যোগেশ্বর বংশ যাহে রহে।

সুতরাং মনে হয় ১৫৫০ হইতে ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়া থাকিবে॥

২৮

জয়ানন্দের কাব্যের ছত্রসংখ্যা মোটামুটি সাড়ে তেরো হাজার। আদি, নদীয়া, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, উৎকল, প্রকাশ, তীর্থ, বিজয় ও উত্তর—এই নয় খণ্ডে বইটি বিভক্ত।[২] খণ্ডগুলির পরিমাণ অসমান—কয়েকটি খণ্ড খুব ছোট, কয়েকটি মাঝারি, কয়েকটি বড়। আদি খণ্ডে পৌরাণিক ভূমিকা। নদীয়া খণ্ডে জন্ম হইতে জগাই-মাধাই উদ্ধার। বৈরাগ্য খণ্ডে সন্ন্যাসগ্রহণের ইচ্ছা-উদ্ভব পর্যন্ত। সন্ন্যাস খণ্ডে সন্ন্যাসগ্রহণ ও শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে আগমন। উৎকল খণ্ডে নীলাচলে আগমন। প্রকাশ খণ্ডে নীলাচল-মাহাত্ম্য ও চৈতন্যের নীলাচলে স্থিতি। তীর্থখণ্ডে বৃন্দাবন মথুরা ও দক্ষিণ ভারতে তীর্থভ্রমণ। বিজয় খণ্ডে মহাপ্রভুর গৌড়দেশে আগমন, নিত্যানন্দপ্রভুর নীলাচল পরিত্যাগ ও গৌড়ে স্থিতি। উত্তর খণ্ডে গ্রন্থের "অনুবাদ", মহাপ্রভুর তিরোভাব ও ভক্তদের শোক, নিত্যানন্দের ও অদ্বৈতের তিরোভাবের উল্লেখ। নীলাচলে আগমনের পর হইতে ঘটনার পৌর্বাপর্য রক্ষিত হয় নাই, অনেক ঘটনার গোলমাল

[১] এ অংশ গায়নের প্রক্ষেপ হওয়া অসম্ভব নয়।

[২] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও আসলে নয় খণ্ডে বিভক্ত,—জন্ম, তাম্বূল, দান, নৌকা, ভার, ছত্র, যমুনা, বংশী ও রাধাবিরহ। নবখণ্ড পৃথিবীর ধারণা হইতে এই সংখ্যা লব্ধ হইতে পারে।

হইয়াছে। চৈতন্যের নীলাচল গমনের পর হইতে তাঁহার জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে জয়ানন্দের খুব অস্পষ্ট ধারণা ছিল। বৃন্দাবনদাসের মতো জয়ানন্দও নিত্যানন্দের ও তাঁহার ভক্তদের কথায় বই শেষ করিয়াছেন।

জয়ানন্দ ছাড়া আর কেহ চৈতন্যের দেহত্যাগের বিবরণ দেন নাই। শুধু লোচন বলিয়াছেন জগন্নাথ-দেহে লীন হইবার কথা। জয়ানন্দ যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

আষাঢ় পঞ্চমী রথবিজয় নাচিতে
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে।
অদ্বৈত চলিলা প্রাতঃকালে গৌড়দেশে
নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষে।
নরেন্দ্রের জলে সর্ব পারিষদ সঙ্গে
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে।
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠী দিবসে
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে।
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা।

এই বর্ণনায় খানিকটা সত্য থাকা সম্ভব। কিন্তু সবটা নয়। কেননা রথ-বিজয় নৃত্যের পরের দিন অদ্বৈত বা কোন ভক্ত নীলাচল ছাড়িয়া আসিবেন বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়ত সে সময়ে চৈতন্যের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিলেন স্বরূপ-দামোদর ও রামানন্দ রায়, তাহার পর পরমানন্দ পুরী, গদাধর পণ্ডিত ইত্যাদি। জয়ানন্দের বর্ণনা গদাধর-গোষ্ঠীতে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী।

চৈতন্যমঙ্গলের যাহাতে সর্বত্র প্রচার হয় সেজন্য জয়ানন্দের উদ্বেগ মাঝে মাঝে ভনিতায় ব্যক্ত হইয়াছে।

জয়ানন্দে আশীর্বাদ করহ বিশেষে
চৈতন্যমঙ্গল যেন গাহে দেশে দেশে।

জয়ানন্দে আশীর্বাদ করহ হরিষে
চৈতন্যমঙ্গল যেন গাই[১] দেশে দেশে॥

জয়ানন্দের সহজ কবিত্বশক্তি ছিল, অনুশীলনও ছিল। তাঁহার বর্ণনার অনেক স্থানেই কবি-হৃদয়ের উষ্ণতা সঞ্চারিত হওয়ায় গীতিকবিতার ঝঙ্কার উঠিয়াছে। যেমন, বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাসিয়া বিরহাশঙ্কা।[২]

[১] অর্থাৎ গাওয়া হয়। [২] বৈরাগ্য খণ্ড। পদটি পাঠান্তরে লোচনের নামেও পাওয়া গিয়াছে।

ফাল্গুনে পৌর্ণমাসী তোমার জন্মদিনে
উদ্বর্তন তৈল স্নান কর গৃহাঙ্গনে।
পিষ্টক পায়স ভোগ ধূপ দীপ গন্ধে
সংকীর্তনে নাচ প্রভু পরম আনন্দে।
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে,
তোমার জন্মতিথি পূজা
আনন্দিত নবদ্বীপ বাল বৃদ্ধ যুবা।...

চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে
শুনিঞা যে প্রাণ করে তা কহিব কাকে।
প্রচণ্ড উদ্ভট বাত তপ্ত সিকতা
কেমনে ভ্রমিবে প্রভু পদযুগ-রাতা।
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে,
তোমার নিদারুণ হিয়া
গঙ্গাএ প্রবেশ করি মরু বিষ্ণুপ্রিয়া।...

গানের অর্থাৎ পদাবলীর ধরণের রচনায় জয়ানন্দের দক্ষতা বেশ পরিস্ফুট। নিম্নে উদ্ধৃত গানটির ভাবে ও ভঙ্গিতে লোচনদাসের রচনা স্মরণ করায়। গৌরাঙ্গ লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন। ছাওনাতলায় গৌরাঙ্গকে দেখিয়া পুরনারীরা মনপ্রাণ হারাইয়াছে।

একে সে লাবণ্যরূপে কি কহিব এক মুখে
আর নানা ফুলের ছামনি আল সজনী।
আর তাহে মধুর হাসি জীবোঁ হেন নাঞি বাসি
আর তাহে পিরীতি চাহনি। আল সজনী।

কোন বিধি গড়িল মুখচান্দে
কেমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন
পরাণপুত্তলি মোর কান্দে।
বিধিরে বলিব কি করিল কুলের ঝি
আর তাহে নহি স্বতন্তরী
কহিতে সে লাজ ভয়ে পরাণ রাখিল নহে
মদন-আলসে পুড়্যা মরি।
কহিব কাহার আগে কহিলে পিরীতি ভাঙ্গে
জাতি কুল শীল নাহি থাকে
জয়ানন্দ বলে ডাকি শুন সব চন্দ্রমুখী
(আজি) ঠেকিলে গৌরাঙ্গ-বেড়াপাকে॥ আল সজনী॥

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ধ্রুবচরিত্র, জড়-ভরতের কথা ও ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার জগন্নাথ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী আছে। জড়-ভরতের কাহিনীতে

স্থানীয় রঙ কিছু লাগিয়াছে। জড়-ভরতকে দেবীপূজায় নরবলির মহুষ্যপশু ("মেরায়া") করা হইয়াছে। একটি বিশুদ্ধ দেশি পৌরাণিক কাহিনীও আছে।[1] সেটি বলিতেছি।

কোন এক নগরে দুইজন জুয়াড়ি ও একজন জুয়ার আড্ডাধারী থাকে। তিন জনে সর্বদাই জুয়া খেলে ও খেলায় এবং সেইজন্য কোন পাপ কাজই তাহাদের আটকায় না। যেখানে পায় সেখানেই জুয়া খেলে আর সর্বদা মিথ্যা কথা বলে। একদিন তাহারা যুক্তি করিয়া গ্রামান্তরে জুয়া খেলিতে গেল। সে গ্রামে নির্জন পরিবেশে এক বিষ্ণুমন্দির ছিল। তাহারা সেইখানে গিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া জেদের উপর জেদ করিয়া জুয়া খেলিতে লাগিল। একজন জিতিতে লাগিল আর একজন কেবলই হারিতে লাগিল। যে জিতিতেছিল তাহাকে আড্ডাধারী সুপারি যোগাইতেছিল।

> বাদে বাদে সর্ব রাত্রি জুআ খেলে রঙ্গে।
> একজন জিনে হারে একজন আর
> জিনা জুআরে গুয়া যোগায় সভার।

যে হারিতেছিল সে সুপারি চাহিলে আড্ডাধারী আঁচল ঝাড়িয়া দেখাইল, শুধু সুপারির খোলা একটু আছে। তাহার পর সে শুধু চুন দিয়া সাজা পান মাত্র তাহাকে দিল। হারুয়া দ্যূতকারের সুবুদ্ধি হইল, সে চুনটুকু বিষ্ণুমন্দিরের গায়ে মুছিয়া সেই পান মুখে দিল।

> আঁচল ঝাড়িয়া তারে দেখায় সভারে
> চুনাতি পান দিঞা সভার ভাণ্ডিল জুআরে[2]
> ঠাকুর করুণাবান হইল তাহারে।

বিষ্ণুমন্দিরে সুধা লেপন করিয়াছে এই পুণ্যে মৃত্যুর পরে সেই হারুয়া জুয়াড়ি যমদূতের হাত এড়াইয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল ॥

২৯

চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পর হইতে দক্ষিণ-ভ্রমণ পর্যন্ত সময়ের প্রামাণিক বিবরণ বলিয়া একটি ছোট বই—গেয় নহে পাঠ্য কবিতা—১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে জয়গোপাল

---

[1] প্রকাশ হও।

[2] পাঠ "চুনাতি পান দিঞা জুআর ভাণ্ডিল তাহারে।"

গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে।[১] প্রকাশের পর হইতে বইটির অকৃত্রিমতা লইয়া প্রাচীন সাহিত্যরসিক ও বৈষ্ণব পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ হইয়াছিল। অনেকেই বইটিকে খাঁটি বলিয়া লইতে পারেন নাই।

কড়চার আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক জয়গোপাল গোস্বামী শান্তিপুর-নিবাসী ও অদ্বৈতবংশীয়। ইনি দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং কবিতা উপন্যাস ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মূল পুথির কোন বিবরণ তিনি দেন নাই এবং সে পুথি তিনি ছাড়া আর কেহ নয়নগোচর করে নাই। কিন্তু বইটির ভাষায় আধুনিকতার ছড়াছড়ি। তাহা ছাড়া চৈতন্যচরিতামৃতের স্পষ্ট অনুকরণ আছে। এই সব এবং অন্যান্য কারণে কড়চার প্রামাণিকতায় অবিশ্বাসীরা গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিলে সমর্থকেরা এই কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন যে পুথিটি খুব কীটদষ্ট ছিল তাই গোস্বামী মহাশয় "অনেক স্থানে পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়া নিজে শব্দ যোজনা করিয়াছেন, কোন কোন জায়গায় কীটদষ্ট ছত্রটি বুঝিতে না পারিয়া সেই ছত্র নিজে পূরণ করিয়া দিয়াছেন।" এই স্বীকৃতিটিই বইটির অপ্রামাণিকতার অকাট্য প্রমাণ। রাসেলকোণ্ডা (Russellkonda) একটি আধুনিক স্থান, ইংরেজের নামে। কড়চায় সেট হইয়াছে "রসালকুণ্ড"। কিন্তু এ তো কীটদংশনের রিপুকর্ম বলিয়া চালানো যায় না।

কড়চার লেখক "গোবিন্দদাস কর্মকার" চৈতন্যের সন্ন্যাসের সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণ ভ্রমণেরও সঙ্গী হইয়াছিলেন,—এইকথা কড়চার বিশেষ উপপাদ্য। কিন্তু এ নামে কোন অনুচর সন্ন্যাসের সময়ে চৈতন্যের সঙ্গে ছিল না এবং দক্ষিণেও যায় নাই। কড়চার সমর্থনকারীরা বলেন গোবিন্দ কর্মকারের উল্লেখ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে। কিন্তু জয়ানন্দের উক্তি—যাহা পুথিতে পাইতেছি—বিচার করিলে তো গোবিন্দ কর্মকারকে খাড়া করা যায় না। বৈরাগ্য খণ্ডে আছে, সন্ন্যাসের কয়েকদিন আগে চৈতন্য বলিতেছেন,

মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য আর গোবিন্দ কর্মকার
মোর সঙ্গে আইস কাঁটোয়া গঙ্গাপার।

---

[১] দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গোবিন্দদাসের কড়চার আগাগোড়া প্রামাণিকত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। এই বিশ্বাসের জোরে তিনি এক বড় ভূমিকা লিখিয়া কড়চাটিকে আবার ছাপাইয়াছিলেন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৬)। মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় দীনেশবাবুর সমর্থনের সমুচিত জবাব দিয়াছেন তাঁহার 'গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্য' পুস্তকে। দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যবাসী অমৃতলাল শীল প্রবাসীতে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে কড়চা যিনি লিখিয়াছিলেন তিনি ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দের লোক হইতেই পারেন না, তিনি অত্যন্ত আধুনিক ব্যক্তি।

কিন্তু সন্ন্যাস খণ্ডে পাই

মুকুন্দ গোবিন্দানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে পার হইলা গৌরচন্দ্র।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, চৈতন্যের সন্ন্যাসযাত্রার সময়ে সঙ্গে ছিলেন পাঁচজন,—নিত্যানন্দ, মুকুন্দ দত্ত, আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখর (চৈতন্যের মেসো), গদাধর ও ব্রহ্মানন্দ।[১] আর সন্ন্যাসের পরে চৈতন্য যখন বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া বিভ্রান্ত হইয়া রাঢ়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন, কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে, সঙ্গে ছিলেন নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আর মুকুন্দ।[২] অতএব জয়ানন্দের উক্তির পাঠ ভ্রান্ত। "আচার্যরত্ন" বা "আচার্যচন্দ্র" বা "চন্দ্রশেখর" স্থানে "গোবিন্দানন্দ" হইয়াছিল। বৈরাগ্য খণ্ডের উক্তির শুদ্ধ পাঠ এই রকম হইবে বলিয়া মনে করি (জয়ানন্দের গ্রন্থ অনুসারে নিত্যানন্দ আগে গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছিলেন),

মুকুন্দ দত্ত গদাধর ব্রহ্মানন্দ আর
মোর সঙ্গে আইস কাঁটোয়া গঙ্গাপার।

যুক্তিতর্কের উপরে বিশ্বাসকে স্থান না দিলে গোবিন্দদাসের কড়চাকে খাঁটি বলা অসম্ভব। দীনেশবাবু সরল বিশ্বাসী ছিলেন, রোমান্টিকও ছিলেন। তাই দক্ষিণ ভারতে যেখানে আজও উচ্ছে করলা অজ্ঞাত সেখানে ষোড়শ শতাব্দের দ্বিতীয় দশকে অজ্ঞ বাঙালী মানুষকে "অষ্টখানি করলার ভাজা খাই সুখে" এই ব্যাপার ডায়েরিতে নোট করিতেছে পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে সেকালের কোন কর্মকারজাতীয় লোক বিদ্যাবুদ্ধিতে ও রচনাপটুতায় কৃষ্ণদাস কবিরাজকে টেক্কা কিছুতেই দিতে পারিত না। অন্য কথা ছাড়িয়াই দিলাম। সুতরাং বর্তমান কালের বিচারক যদি সরল বিশ্বাসকে সাক্ষ্যরূপে গ্রাহ্য না করিয়া সম্পাদক-প্রকাশক জয়গোপাল গোস্বামীকে গোবিন্দদাসের কড়চার উদ্ভাবক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন তবে তাহা ন্যায়সঙ্গতই হইবে।

যে চৈতন্য সর্বদা সন্তর্পণে নিজেকে বিষয়ী ও নারী হইতে দূরে রাখিয়া চলিতেন তিনিই কড়চা-লেখকের মতে রাজাদের কাছে ধর্মের বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং বারনারীদের কাছে স্যালভেশন আর্মির নেতার মতো হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব-মহাজনেরা এমন পাষণ্ডদলন ও পতিতোদ্ধার যথেষ্ট করিয়া থাকিবেন। কিন্তু চৈতন্যের সম্বন্ধেও কি তাহা মানিয়া লইতে হইবে?

[১] চৈতন্যভাগবত ২. ২৬

[২] চৈতন্যচরিতামৃত ২. ৩।

৩০

বৈষ্ণববন্দনা, বৈষ্ণবমহান্তগণাখ্যান ও শাখানির্ণয় প্রভৃতি নিতান্ত ছোটখাট রচনাগুলিতে জীবনীর উপাদান বিশেষ কিছু নাই। সেগুলি প্রায়ই নামের তালিকা-মাত্র। তবে এই রচনাগুলির একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে। বৈষ্ণবপদাবলী-রচয়িতাদের কালনির্ণয়ে কিছু সাহায্য পাওয়া যায়, এইমাত্র।

বৈষ্ণববন্দনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো দেবকীনন্দনের এবং মাধবদাসের (বা মাধব আচার্যের) রচনা। উভয়েই চৈতন্য-পারিষদের শিষ্য ছিলেন। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনা কবিতাটি এখনো বৈষ্ণবদের নিত্যপাঠ্য, সুতরাং বহুবার মুদ্রিত। ইহাতে বীরভদ্রের পুত্রত্রয়ের উল্লেখ আছে। এই অংশ প্রক্ষিপ্ত না হইলে বুঝিতে হইবে, পুস্তিকাটি ষোড়শ শতাব্দের শেষের দিকে রচিত হইয়াছিল। দেবকীনন্দন একজন ভালো পদকর্তা ছিলেন।

মাধবের বৈষ্ণববন্দনা শিবচন্দ্র শীল প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৩১৭ সাল)। মহাপ্রভুর পারিষদদের মধ্যে একাধিক মাধব ছিলেন। তাহার মধ্যে কোন্ মাধব বৈষ্ণববন্দনা লিখিয়াছিলেন তাহা বলা দুষ্কর। মাধবের কবিতা দেবকী-নন্দনের রচনার পূর্ববর্তী বলিয়াই বোধ হয়॥

৩১

অদ্বৈত আচার্যের জীবনী ও তাঁহার পত্নী সীতাদেবীর মাহাত্ম্য-নিবন্ধ কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নিত্যানন্দের কোন জীবনী রচিত হয় নাই। ইহা আপাতবিস্ময়ের কারণ বটে। কিন্তু চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থে নিত্যানন্দের সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই ভালোভাবে দেওয়া আছে, সেইজন্য পৃথক্‌ভাবে নিত্যানন্দ-জীবনীর প্রয়োজন হয় নাই। নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য চৈতন্যের সঙ্গে মিলনের পরেই প্রকট হইতে শুরু হইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্য-জন্মের অনেক আগে হইতেই অদ্বৈতের অধ্যাত্মজীবনের যাত্রারম্ভ হইয়াছিল। চৈতন্যের তিরোধানের পর নিত্যানন্দ খুব বেশি দিন বর্তমান ছিলেন না এবং সে কয় বছরে তাঁহার কোন উল্লেখযোগ্য নূতন প্রচেষ্টাও ছিল না। নিত্যানন্দের তিরোধানের পরেও অদ্বৈত বর্তমান ছিলেন, এবং চৈতন্য আবির্ভূত হইবার পূর্বে অদ্বৈত-প্রভুর বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইয়াছিল। এই সময়ের ইতিহাস চৈতন্য-জীবনীর বাহিরে, সুতরাং বিশেষ করিয়া এই কারণেও অদ্বৈত-জীবনীর আবশ্যকতা ছিল। অদ্বৈতের পত্নী সীতাদেবী অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন ছিলেন।

চৈতন্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহ ছিল। বহুপুত্রবান্ আচার্যের কোন কোন পুত্র স্বতন্ত্রভাবে গুরুগিরি শুরু করিয়াছিলেন। চৈতন্যের জীবৎকালেও অদ্বৈতের কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে অবতাররূপে প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১] এই সব বিচার করিলে মনে হয় অদ্বৈত-সীতার অনুচরদের ধর্মনীতিতে অল্পস্বল্প বিশিষ্টতা দেখা দিয়াছিল, এবং তাঁহাদের কেহ কেহ নিত্যানন্দ-গোষ্ঠী হইতে নিজেদের তফাতে রাখিতেন। এই স্বতন্ত্রতার জন্যও অদ্বৈত-সীতা-মহিমা বর্ণনার আবশ্যকতা ছিল।

অদ্বৈত-জীবনী অনুসারে শ্রীহট্ট-লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ পরিণত বয়সে সংসারত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈত আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম হইল কৃষ্ণদাস। ইনি অদ্বৈতের 'বাল্যলীলাসূত্র' রচনা করিয়াছিলেন, বলা হয়। এটি সংস্কৃতে লেখা, আট সর্গে বিভক্ত। মুদ্রিত বইটির[২] প্রামাণিকতা অত্যন্ত সন্দেহজনক। রচনাকাল দেওয়া আছে ১৪০৯ শকাব্দ (১৪৮৭)[৩], অথচ গ্রন্থারম্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে পাই গৌরগোপালের বন্দনা। বিষ্ণু পুরীর সঙ্কলন 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী'র[৪] অনুবাদ[৫] এই কৃষ্ণদাসের লেখা বলিয়া অনুমান করা হয়।

'অদ্বৈতসূত্রকড়চা'ও[৬] এক কৃষ্ণদাসের লেখা। নিবন্ধটিতে মাধবেন্দ্র পুরী ও অদ্বৈত আচার্যের মধ্যে কথোপকথনের আকারে তত্ত্বকথা বর্ণিত হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন যে তাঁহার উপজীব্য হইতেছে "অদ্বৈতপ্রভুর মূল কড়চা"। ইহাতে ছয় গোস্বামীর উল্লেখ আছে। ভনিতা অবিকল চৈতন্যচরিতামৃতের মতো॥

৩২

অদ্বৈত আচার্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য শ্যামদাস আচার্য গুরুর জীবনী রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু শ্যামদাস আচার্যের ভনিতায় কোন

---

[১] চৈতন্যচরিতামৃত ১. ১২ দ্রষ্টব্য।

[২] অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি কর্তৃক সম্পাদিত ও পদ্যে অনূদিত (১৩২২)।

[৩] "অঙ্কশূন্যমনুমিতে শকাব্দে মাসি মাধবে। বাল্যলীলাসূত্রমিদং কৃষ্ণদাসেন চিত্রিতম্।
শ্রীমান্ ভাগবতাচার্যঃ শ্যামদাসদ্বিজোত্তমঃ। তস্য সাহায্যতঃ পূর্ণোঽভবদ্ গ্রন্থোঽয়মাদিতঃ॥"
৮. ৩৮. ৩৯।

[৪] বঙ্গবাসী কার্যালয় (৪১৯ চৈতন্যাব্দ)। [৫] সা-প-প ৬ পৃ ১৬৬।

[৬] ক ৩৯৫৮ (লিপিকাল ১২৪২); স ১৮২ (লিপিকাল ১২৬৬)।

অদ্বৈতমঙ্গলের পুথি পাওয়া যায় নাই। শ্যামদাসের রচিত গুরুবন্দনা (সংস্কৃতে) 'অদ্বৈতাষ্টক' হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গলে উদ্ধৃত আছে। শ্যামদাস হয়ত গুরুর জীবনকথা সংক্ষেপে সংস্কৃত শ্লোকে কড়চার আকারে গাঁথিয়া থাকিবেন। শ্যামদাসের কাছে অদ্বৈতের অনেক কথা হরিচরণ শুনিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

শ্যামদাস আচার্য রাঢ় দেশের লোক ছিলেন। প্রথম জীবনে ইনি সাধারণ দক্ষিণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো পাণ্ডিত্য-উদ্ধত ছিলেন।[১] অদ্বৈতের সঙ্গে ভক্তিশাস্ত্রের বিচারে হারিয়া গিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও ভক্তিপথের পথিক হন।

হরিচরণদাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল'[২] সবটা না হোক খানিকটা খাঁটি বলিয়া মনে হয়। হরিচরণ অদ্বৈতের শিষ্য ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অদ্বৈত-শাখার মধ্যে তাঁহার নাম করিয়াছেন। বইটির মধ্যে হরিচরণের কোন পরিচয় নাই। মনে হয় অদ্বৈতের জীবৎকালেই হরিচরণের বই লেখা হইয়াছিল। কবি-কর্ণপূর ছাড়া আর কোন চৈতন্যজীবনীর উল্লেখ নাই।

> শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণিলা কবি কর্ণপূর
> তাহে নিত্যানন্দলীলা রসের প্রচুর। ১. ২।

অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দের আজ্ঞায় ও বলরাম কৃষ্ণমিশ্র গোপাল জগদীশ ইত্যাদি অন্যপুত্রদের অনুমতিক্রমে হরিচরণ অদ্বৈতমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

> আমি ক্ষুদ্র জীব হৈয়া বর্ণিতে কি পারি ইহা
> শ্রীঅচ্যুতানন্দ আজ্ঞা মানি ১. ১।

> শ্রীঅচ্যুতানন্দ বলরাম কৃষ্ণমিশ্র
> গোপাল জগদীশ রূপ সহজে সহস্র।
> তোমা সভার কৃপা বলে অদ্বৈতচরিত
> দ্বিতীয় অবস্থা কিছু করিব বিদিত। ১. ৪।

---

[১] "শ্যামদাস আচার্য হএন রাঢ়দেশবাসী, রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সেহি সর্বক্ষুদ্র বাসি।
শাস্ত্র পড়িয়াছেন করিয়া যতন, ভক্তিশাস্ত্র নাহি দেখে উদ্ধত তার মন।
যাহাঁ তাহাঁ ফিরেন তবে বিচার করিতে, সর্ব শাস্ত্রে জিনে হারে ভক্তিতে।" (হরিচরণের 'অদ্বৈতমঙ্গল'।)

[২] দুইটি পুথি পাওয়া গিয়াছে,—প ২৬৬ (লিপিকাল ১৭১৩ শকাব্দ) ক ৩২২৩ (লিপিকাল ১২৫০)। ব্রজসুন্দর সান্যাল তিনটি পরিচ্ছেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৩০৮)। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মাইতির সম্পাদনায় বইটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বৈতমঙ্গলের প্রথম পরিচয় বাহির হইয়াছিল সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় (৩ পৃ ২৫৫ হইতে)।

অদ্বৈতের বাল্যকথা হরিচরণ বিজয় পুরীর কাছে শুনিয়াছিলেন। বিজয় পুরী, হরিচরণের মতে, অদ্বৈতের গ্রাম সম্পর্কে মাতুল সুতরাং গুরুস্থানীয় ছিলেন। অদ্বৈতের গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর সতীর্থ ছিলেন বিজয় পুরী। অদ্বৈতের কাছেও কিছু কিছু তথ্য হরিচরণ পাইয়াছিলেন।

এহি লীলা লিখি প্রভুর মুখেতে শুনিয়া
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী জানেন বিবরিয়া। ৩. ১।

অদ্বৈতমঙ্গল বড় বই নয়। ছত্রসংখ্যা সাড়ে আট হাজারের অনধিক। বইটি পাঁচ "অবস্থায়" ও তেইশ "সংখ্যা"য় বিভক্ত। প্রথম অবস্থায় চার সংখ্যা। ইহাতে অদ্বৈতের পিতৃপরিচয় ও বাল্যকথা আছে। দ্বিতীয় অবস্থায় দুই সংখ্যা। বৃদ্ধ কুবের আচার্য[১] পত্নী লাভা ও বালক পুত্র কমলাকান্তকে লইয়া সিলেট নবগ্রাম ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সম্ভবত দেশের রাজার সহিত পুত্রকে লইয়া কিছু গোলমাল হইয়াছিল। কিছুকাল পরে রাজাও রাজ্য ত্যাগ করিয়া (অথবা হারাইয়া) কৃষ্ণদাস নাম লইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। শান্তিপুরে অধ্যয়ন করিয়া কমলাকান্ত পণ্ডিত হইলেন ও অদ্বৈত আচার্য নাম পাইলেন। পিতা ও মাতার মৃত্যু হইলে অদ্বৈত আচার্য তীর্থ পর্যটনে বাহির হইলেন। গয়া হইয়া কাশীতে গেলেন। সেখানে বিজয় পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তৃতীয় অবস্থায় চার সংখ্যা। কাশী হইতে প্রয়াগ, সেখান হইতে মথুরা গেলেন। সেখান হইতে বৃন্দাবন। সেখানে কৃষ্ণদাস (ভূতপূর্ব রাজা) তাঁহার সঙ্গী হইল। যমুনার তীরে এক টিলা খুঁড়িয়া মূর্তি পাইয়া অদ্বৈত বংশীবটের কাছে মদনগোপাল নামে প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই মদন গোপাল মূর্তির ছবিও আঁকাইয়া আনিয়াছিলেন।[২] শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিবার পর মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত মিলন ও তাঁহার কাছেই অদ্বৈতের দীক্ষালাভ হইল। তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকথা ও অবতারবার্তা হইল।[৩] তাহার পর দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত জয়। চতুর্থ অবস্থায়ও চার সংখ্যা। প্রথমে কৃষ্ণদাসের সঙ্গে অদ্বৈতের তত্ত্বকথা,—কৃষ্ণদাসের কড়চা অনুসারে বর্ণিত। তাহার পর

---

[১] ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া কথিত। কিন্তু হরিচরণ বলিয়াছেন,
"জ্যোতিষ শাস্ত্র আচার্য একালে কহয়, রাশি নাম গণিয়া কুবের নাম কয়।"

[২] "সেহি গোপালমূর্তি লিখিয়া আনিল, শ্রীভাগবত-পাঠ গৃহে পট রাখাইল।" ৩. ২।

[৩] "এসব নিগূঢ় কথা কৃষ্ণদাস লিখিলা, সেহি পত্র শ্রীনাথ আচার্য সে দিলা :...
শ্রীনাথ কৃপা করি দিলা যে আমারে, তদনুসারে লিখি করিয়া বিচারে।" ৩, ৩।
"শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তত্ত্ব শ্রীমুখের বাণী, কৃষ্ণদাস লিখিল লিখনে সর্ব জানি।"

হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে মিলন। অতঃপর শ্যামদাস আচার্য কীর্তন করিয়া অদ্বৈতের মন ভুলাইল। শ্যামদাসকে অদ্বৈত দীক্ষা দিয়াছিলেন। শ্যামদাসের গৌরব করিয়া অদ্বৈতমঙ্গল-রচয়িতা বলিতেছেন

এ সব মহান্তের অগ্রে শ্যামদাস
শ্যামদাস কহিল প্রভুর শাস্ত্রের প্রকাশ। ৪. ৩।

দক্ষিণ অঞ্চল হইতে শ্রীনাথ আচার্য[১] আসিলেন। ইনি সনাতন-রূপের পিতা কুমারদেবের পুরোহিত ছিলেন। কুমারদেব কোন স্বাধীন রাজার বা স্বাধীন ভূঞার সেনাপতি বা মন্ত্রীর মতো ছিলেন। সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। অদ্বৈত এবিষয়ে জানিতে চাহিলে শ্রীনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে সনাতন-রূপের জীবনের গোড়ার কথা কিছু পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ সত্য হয় তো নয়, তবুও এই বর্ণনার মধ্যে সত্যের ছায়া অনুভূত হয়।

প্রভু কহে তোমার দেশ গেল গৌড় ভূপতি
রাজা কুমার[২] কথাএ তাহার[৩] পুত্র কতি।
কহিতে লাগিলা তবে সব বিবরণ
শ্রীনাথ কহে কথা শুনে সর্বজন।
প্রথমে রাজায়ে কৈল বহুত যতন
গৌড়াধীশ হারিল করিয়া যে রণ।
পিছে সব ভূঁয়াকে যে হাত করি
মারিল রাজার সব শহর নগরী।
কুমারদেব পরলোক বড় যুদ্ধ করি
তিন পুত্র কুটুম্ব গেল দেশ[৪] দেশ ফিরি।
আর ঘরেতে ছিল সনাতন রূপ
শ্রীবল্লভ রহিয়াছে পর্বত মহাকূপ।
বড়রাজ্য ছিল প্রভুর ধার্মিক প্রবীণ
দাক্ষিণাত্য আমার গোষ্ঠী হয় যে প্রাচীন।
এবে রাজ্য গেল প্রভু ঈশ্বর-ইচ্ছাতে
তোমার অকৃপা তাহা রহিব কিমতে।
প্রভু কহে রাজ্য বিষয় স্থির কভু নহে...
সনাতন রূপের কথা কহ বিবরিয়া
কি কার্য করিলা তারা কোথাএ রহিয়া।
শ্রীনাথ কহেন আমি তার পুরোহিত
দুইটি বালক হয় বড়ই অদ্ভুত।

---

[১] এই শ্রীনাথ কবি-কর্ণপুরের গুরু ছিলেন বলিয়া মনে হয়।
[২] পাঠ "রাজকুমার"। [৩] ঐ "তার"। [৪] "নিজ" হইবে?

শাস্ত্র অলঙ্কার কাব্য বেদান্ত ভাগবত
আমি পড়াইল দোঁহাকে কাব্য বেদহিত।
কৃষ্ণনাম দিলাম দোঁহাকে গোদাবরী তীরে…
শ্রীবল্লভ কুটুম্ব লইয়া মিলিল আসি একা…
তবে গৌড় অধিপতি এবে সদয় হৈয়া
যতন করিয়া নিল তাহার দুই ভাইয়া।
অল্পকালে দুঁহে হয় মন্ত্রী প্রবীণ… । ৪. ৪ ।

পঞ্চম (বা বৃদ্ধ) অবস্থায়[1] নয় সংখ্যা। প্রথম সংখ্যায় শ্যামদাস আচার্যের চেষ্টায় এবং হিরণ্য-গোবর্ধনের পুরোহিত যদুনন্দন আচার্যের যত্নে সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী নারায়ণপুর-গ্রামবাসী নৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যা সীতার সহিত অদ্বৈতের বিবাহ হইল। কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীদেবীকেও ভাদুড়ী (যৌতুকরূপে) সমর্পণ করিল।[2] দ্বিতীয় সংখ্যায় সীতাকে দীক্ষা। সীতার কথা। দুই নপুংসক[3] শিষ্য নন্দিনী-জঙ্গলীর কথা এবং জঙ্গলীর বিশেষ মাহাত্ম্য কথা। তৃতীয় সংখ্যায় নিত্যানন্দের জন্ম হইলে পিতা কর্তৃক শিশুকে শান্তিপুরে অদ্বৈতের কাছে আনিবার কথা। অদ্বৈতমঙ্গলের মতে মাতার ও পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে নিত্যানন্দের জীবন ছন্নছাড়া হইয়াছিল। তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু যদুবীর[4] দত্তের সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন।

মাতাপিতা অন্তর্ধান রহে যথা তথা
যদুবীর[4] দত্ত হয় সখা অন্তরঙ্গ
তাহারে লইয়া তীর্থ করে বড় রঙ্গ।
অবধৌত আশ্রম করিয়া প্রকট ৫. ৩।

চতুর্থ সংখ্যায় চৈতন্যের জন্ম ও লীলা। অদ্বৈতমঙ্গলের মতে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে চৈতন্যের জন্ম হইয়াছিল। পঞ্চম সংখ্যায় শান্তিপুরে অদ্বৈতের একদিনের লীলার বর্ণনা, ষষ্ঠ সংখ্যায় পুত্রদের কথা এবং শাখা-বর্ণন, সপ্তমে চৈতন্যের সঙ্গে লীলা। অষ্টমে সীতার সুচারু রন্ধন ও তিন প্রভুর ভোজন। নবম সংখ্যায় শান্তিপুরে গঙ্গায় তিন প্রভুর নৌকা ও দানলীলা ক্রীড়া। অদ্বৈত-মঙ্গলে দানলীলার যে বর্ণনা আছে তাহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন স্মরণ করায়। যেমন, বড়ায়ির প্রতি রাধার উক্তি—

[1] "বৃদ্ধ যৌবন প্রভুর একই সমান, তাঁর আজ্ঞা বৃদ্ধ আমি লিখিল প্রমাণ।" ৫. ১।

[2] "আর কোথা যাব আমি পাত্র আনিতে, এহো কন্যা তোমারে দিল সেবা করিতে।" ঠিক এমনিভাবেই অনেককাল পরে নিত্যানন্দ বসুধাকে বিবাহ করিয়া জাহ্নবাকে যৌতুক পাইয়াছিলেন।

[3] সম্ভবত ইঁহাদের সেক্‌স পরিবর্তন হইয়াছিল। [4] পাঠান্তর "উদ্ধারণ"।

বিষম দানীর হাথে ঠেকাইলা তুমি সাথে
উচ্চ কুচ মাগে বহু দান
নিতম্ব দেখিয়া বড় তেরছা নয়ান দড়
দ্বিগুণ করয়ে তার মান।

সর্বশেষে "অনুবাদ"। শেষের ভনিতা

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা
শ্রীগুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা।
শ্রীশান্তিপুরনাথ-পাদপদ্ম করি আশ
অদ্বৈতমঙ্গল কহে হরিচরণ দাস।

অদ্বৈতমঙ্গলে অদ্বৈত আচার্যকে শিবের অবতার বলা হয় নাই, বাসুদেবের (বিষ্ণুর) অংশাবতার বলা হইয়াছে।

তিন প্রভু এক হয় সিদ্ধান্তের সার
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণ আর। ৩. ৪।

প্রাপ্ত বইটিকে পরিপূর্ণভাবে প্রামাণিক অর্থাৎ অদ্বৈত-শিষ্য হরিচরণের লেখা বলিতে পারি না। এটিকে হরিচরণের রচনার একটি সংস্করণ বলা চলে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বই সংস্কর্তার ভালো করিয়া পড়া ছিল॥

৩৩

ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ'[১] খাঁটি রচনা নহে বলিয়াই মনে করি। এমন কি পুরানো প্রক্ষেপ বলিতেও সঙ্কোচ হয়। প্রাচীন গ্রন্থ ও পাঠ বিচারে যে সব সূত্র অবলম্বন করা হয় তাহার কোনটিই ইহার বেলায় খাটে না। বিবিধ প্রাচীন ও অর্বাচীন গ্রন্থ এবং জনশ্রুতি মিলাইয়া কল্পনাযোগে বইটির সৃষ্টি। নিত্যানন্দের তিরোধান, অদ্বৈতের খড়দহে উপস্থিতি, মহাপ্রভুর তিরোধানে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তপস্যা—ইত্যাদি নানারকম জ্ঞাতব্য কথা অদ্বৈতপ্রকাশে আছে। কিন্তু তাহার যথার্থতা নির্ভরযোগ্য নয়। ভাষা ও রচনারীতি আধুনিক। চৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব সুস্পষ্ট।

বইটি বারো পরিচ্ছেদে বিভক্ত। আদ্যন্ত পয়ার ছন্দ। ছত্র-সংখ্যা আনুমানিক সাড়ে পাঁচ হাজার। লেখকের হরিচরণের বই জানা বা দেখা

[১] গোবিন্দদাসের কড়চা প্রকাশের দুই বছর পরে অমৃতবাজার পত্রিকা কার্যালয় হইতে অচ্যুতচরণ চৌধুরী কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত (১৮৯৭)। দ্বিতীয় সংস্করণ সতীশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত (১৯২৬)। "১৭০৩ শকের" পুথি অবলম্বনে বইটির পরিচয় প্রথমে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (৩ পৃ ২৪৯ হইতে) বাহির হইয়াছিল। কিন্তু অদ্যাবধি পুথিটির খোঁজ নাই। দ্বিতীয় কোন পুথিও মিলে নাই।

ছিল না।[১] হরিচরণের গ্রন্থের সঙ্গে বেশ অমিল আছে। অদ্বৈতপ্রকাশে অদ্বৈতের আসল নাম কমলাক্ষ, অদ্বৈতমঙ্গলে কমলাকান্ত।[২] অদ্বৈতমঙ্গলে ঈশান ছিল জলতোলা ভৃত্য। অনবরত ঘড়া করিয়া জল তুলিতে তুলিতে তাহার মাথায় ঘা হইয়াছিল। এ প্রসঙ্গ অদ্বৈতপ্রকাশে নাই।

৩৪

প্রধানত অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীর (এবং তদুপলক্ষ্যে তাহার দুই নপুংসক শিষ্য নন্দিনী-জঙ্গলীর) মাহাত্ম্য বর্ণনা উপলক্ষ্যে দুইখানি খুব ছোট নিবন্ধ পাওয়া যাইতেছে। নাম যথাক্রমে 'সীতাগুণকদম্ব'[৩] ও 'সীতাচরিত্র'।[৪] সীতাগুণ-কদম্বের "লেখক" বিষ্ণুদাস আচার্য বলিতেছেন, তিনি কুলিয়ার নিকটবর্তী বিষ্ণুপুরবাসী মাধবেন্দ্র আচার্যের পুত্র এবং সীতাদেবীর শিষ্য। বইটি যে জাল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে প্রদত্ত রচনাকালে (১৪৪৩ শকাব্দ=১৫২১) অথচ রূপ গোস্বামীর লেখা শ্লোক ইহাতে উদ্ধৃত আছে!

সীতাচরিত্রের লেখক লোকনাথ দাস। লেখক কিছু কিছু স্বরচিত (?) সংস্কৃত শ্লোকও দিয়াছেন। বোধ করি বইটির মূল যে সংস্কৃতে ছিল তাহা বোঝাইবার উদ্দেশ্যেই একাজ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাসের ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের উল্লেখ আছে। লেখক অদ্বৈত-শিষ্য লোকনাথ (চক্রবর্তী) গোস্বামী হইতে পারেন না।

সীতাচরিত্রে কিছু নূতন কথা আছে। এখানে চৈতন্যের গৃহস্থাশ্রমের ভৃত্য ঈশান ও অদ্বৈতের ভৃত্য ঈশান একই ব্যক্তি।

---

[১] লেখক বলিতেছেন যে তাঁহার বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণদাসের লেখায় (বাল্যলীলাসূত্রে?) পড়িয়াছিলেন এবং কৃষ্ণদাস শ্যামদাস ও পদ্মনাভের মুখে শুনিয়াছিলেন। কোন চৈতন্য-জীবনীর উল্লেখ নাই।

[২] হরিচরণ হয়ত অদ্বৈতকে বিষ্ণুর অবতার করিতে গিয়া নাম পরিবর্তন করিয়া থাকিবেন।

[৩] শ্রীহৃষীকেশ বেদান্তশাস্ত্রী কর্তৃক 'বিষ্ণুদাস আচার্যের সীতাগুণকদম্ব' নামে (১৩৪৩) প্রকাশিত। পুথি উত্তরবঙ্গের, লিপিকাল ১১৯৬ (=১৭৮৯)।

[৪] অচ্যুতচরণ চৌধুরী সম্পাদিত ও আলাটি (হুগলী) হইতে মধুসূদন দাস অধিকারী কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৩৩)। প্রথম পরিচয় বাহির হয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় (৩ পৃ ১৭৬ হইতে)। পুথি এখন নিখোঁজ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রথম ক্রম

১

বৈষ্ণব-গীতিকবিতাকে এখন "পদ" বলা হয়। এই অর্থ অষ্টাদশ শতাব্দের পূর্বে চলিত হয় নাই। আগে "পদ" বলিতে দুই ছত্রের গান অথবা গানের দুই ছত্র বুঝাইত। যেমন "ধ্রুবপদ"। জয়দেব "পদাবলী" শব্দটি প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন, তবে দ্ব্যর্থে। এক অর্থ তখনকার প্রচলিত—পদালঙ্কার, পাঁয়লি (আধুনিক পাঁয়জোর)। অপর অর্থ জয়দেবের অভিপ্রেত—পদময় গীত। জয়দেবের সরস্বতীর পাদশিঞ্জিনীর নিক্কণ মধুর মৃদু ও সলজ্জ, এবং জয়দেবের বাণী মধুর কোমল কান্ত পদসমূহে নিবদ্ধ।[১] অনেক কাল পরে, প্রায় আধুনিক সময়ে, যখন "পদাবলী"র অর্থ দাঁড়াইল গীতিকবিতা ও তাহার সঙ্কলন, তাহার আগেই "পদ"এর অর্থ পরিবর্তন ঘটিতে শুরু হইয়াছে। বৈষ্ণব-পদাবলীর রচয়িতারা অধিকাংশই "মহাজন" বা "মহান্ত" (অর্থাৎ সাধুপুরুষ বা গুরু) ছিলেন। এইজন্য সপ্তদশ শতাব্দের শেষ ভাগ হইতে বৈষ্ণব-গীতিকবিতা "মহাজন-পদাবলী" নামেও খ্যাত হয়।[২]

পূর্ব হইতেই বৈষ্ণব-গীতিকবিতার দুইটি ভাষা-ছাঁদ, বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি। কোন কোন পদে বাঙ্গালা ও ব্রজবুলির মিশ্রণও দেখা যায়। ব্রজবুলি রচনায় মাঝে মাঝে দুই চারটা ব্রজভাষা (হিন্দী) শব্দও পাওয়া যায়। ব্রজবাসী বৈষ্ণবের রচিত ব্রজভাষাতে লেখা পদও দুইচারিটি মিলিয়াছে॥

২

জয়দেবের অনুকরণে সংস্কৃতে গীতিকবিতা লেখা কিছু কিছু চলিয়াছিল, তবে মন্দীভূত বেগে। জয়দেবের রচনার পরেই উল্লেখযোগ্য হইতেছে রূপের গীতাবলী।[৩] গীতগোবিন্দের ও গীতাবলীর মাঝখানে পাইতেছি দুইটি

---

[১] চৈতন্যভাগবতে ও চৈতন্যচরিতামৃতে "তথাহি পদম্" বলিয়া সাধারণত দুইটি ছত্রই উদ্ধৃত আছে।

[২] "মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্।"

[৩] পুরানো পদাবলীসংগ্রহে অজ্ঞাতনামার রচনা "মহাজনস্য", বলিয়া উদ্ধৃত আছে।

"ধ্রুবগীতি"। একটি গান্ধার রাগে অপরটি শ্রী রাগে গেয়।[১] প্রথম গানটি কৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি।

কেশব কমলমুখীমুখকমলম্
কমলনয়ন কলয়ালতুমমলম্।
কুঞ্জগেহে বিজনেঽতিবিমলম্। ধ্রু।
সুরুচিরহেমলতামলম্বা তরুণতরুং ভগবন্তম্
জগদবলম্বনমবলম্বিতুমনুকলয়তি সা তু ভবন্তম্।

'ওহে কমলনয়ন কেশব, কমলমুখী (রাধার) অতুল অমল অতি বিমল মুখকমল কুঞ্জগৃহে দেখ গিয়া। সুশোভিত হেমলতা অবলম্বন করিয়া সে প্রতীক্ষা করিতেছে, জগদবলম্বন তরুণতরু ভগবান-তোমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য।'

দ্বিতীয় গানটি কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি।

রসিকেশ কেশব হে
রসসরসীমিব মামুপযোজয়
রসমিব রসনিবহে॥

"হে রসিকরাজ কেশব, আমাকে রসাবগাহনার্থে রসসরসীর মত অঙ্গীকার কর।'

গীতগোবিন্দের অনুসরণে মিথিলায় যেসব গীতিনাট্য রচিত হইয়াছিল তাহাতে গানগুলি সংস্কৃতে লেখা নয় ব্রজবুলি-মৈথিলীতে লেখা। এধরণের রচনা পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দে বাঙ্গালা দেশে পাওয়া যায় নাই। উড়িষ্যায় পঞ্চদশ শতাব্দে ও ষোড়শ শতাব্দের গোড়ার দিকে দুইটি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। একটি পঞ্চদশ শতাব্দের রচনা, কপিলেন্দ্রদেবের 'পরশুরামবিজয়', ইহার উল্লেখ আগে করিয়াছি। ষোড়শ শতাব্দের রচনাটি হইতেছে রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভ নাটক'।[২] ইহাতে একুশটি গান আছে। সবই সংস্কৃতে লেখা। রামানন্দ উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন, চৈতন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু।[৩] চৈতন্যের সহিত মিলনের পূর্ব হইতেই ইনি রাগমার্গের সাধনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার এই "সঙ্গীতনাটক"এও তাহার পরিচয় আছে। নাটকের গানগুলি শুনিতে চৈতন্য ভালোবাসিতেন।

নাটকটি ছোট। সংস্কৃতে-প্রাকৃতে রচিত। অনেক শ্লোক আছে।[৪] সেগুলি গানের তুলনায় ভালো। যেমন তৃতীয় অঙ্কে অনুরাগিণী রাধার উক্তি।[৫]

---

১ বৃহদ্ধর্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড চতুর্দশ অধ্যায়। প্রাচ্যবাণীমন্দির প্রবন্ধাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২-৩।
২ বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত।
৩ চৈতন্যচরিতামৃত দ্রষ্টব্য।
৪ চৈতন্যচরিতামৃতে অনেকগুলিই উদ্ধৃত।
৫ চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাসের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্বলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধে কা গতিঃ।

'হরি ইনি, প্রেমপ্রত্যাখ্যানের বেদনা জানেন না। প্রেমও স্থান অস্থান অবগত নয়। মদন জানে আমরা অ-বলা। একজনের পক্ষে আর একজনের সকল দুঃখের বৃত্তান্ত জানা সম্ভব নয়। জীবন কাহারও বশে নয়। যৌবন দুইচার দিনের মাত্র। হায় হায়, বিধাতা, কী হইবে (আমার)!'

নায়ক (কৃষ্ণ), নায়িকা (রাধা) ও দূতী (মদনিকা) এই তিন মুখ্য ভূমিকা ছাড়া একটি পাত্র (বিদূষক—রতিকন্দল) এবং চারিটি পাত্রী (রাধার তিন সখী শশীমুখী অশোকমঞ্জরী ও মাধবী, এবং বনদেবী)। প্রস্তাবনা সাধারণ সংস্কৃত নাটকের মতো। তাহার পর পাঁচটি ছোট ছোট অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে বৃন্দাবনে বসন্ত-সৌন্দর্যসম্ভারের মধ্যে কৃষ্ণ ও রাধার প্রথম দর্শন ও প্রণয়োৎপত্তি। দ্বিতীয় অঙ্কে প্রণয়াক্ষিপ্তহৃদয় রাধার সখীগণের সঙ্গে সংলাপ এবং কালিদাসের শকুন্তলার মত কৃষ্ণকে প্রণয়লিপি প্রেরণ। শশীমুখী ফিরিয়া আসিল কৃষ্ণের উত্তর লইয়া। কৃষ্ণ ধর্ম ও নীতির দোহাই দিয়া রাধাকে ক্ষান্ত হইতে বলিয়াছে। তৃতীয় অঙ্কে রাধা প্রণয়জর্জরিত। শশীমুখী কৃষ্ণের কাছে রাধার চিত্র পাঠাইয়াছে। কৃষ্ণ জবাব দিল। রাধা খুব খুশি হইতে পারিল না। চতুর্থ অঙ্কে কৃষ্ণ প্রণয়পীড়িত, সখা রতিকন্দলের সহিত কথা কহিতেছে। মদনিকা আসিয়া রাধার অবস্থা বলিল। কৃষ্ণ নিকুঞ্জে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। মদনিকা রাধাকে সেখানে লইয়া গেল। পঞ্চম অঙ্কে পরদিনের প্রভাতে নিকুঞ্জের দ্বারে মদনিকার কাছে শশীমুখী রাত্রির প্রেমকাহিনী বলিতেছে এমন সময় বিপর্যস্ত বেশে কৃষ্ণ ও রাধা বাহিরে আসিল। ঠিক সেই সময়েই বৃষভানুর অরিষ্ট তাহাদের আক্রমণ করিল। কৃষ্ণ তাহাকে দমন করিল। এখন বিপর্যস্ত বেশভূষার সঙ্গত কারণ হওয়ায় নায়ক-নায়িকা হৃষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিয়া গেল।

জগন্নাথবল্লভ নাটকের সংস্কৃত গান প্রায় সবই জয়দেবের গানের মকশ। ভনিতায় সর্বদা কবি রাজার নাম করিয়াছেন। দুই একটিতে ছন্দের সামান্য বৈচিত্র্য আছে। যেমন, কর্ণাট রাগে, রাধার উক্তি।

মঞ্জুতরগুঞ্জদলিপুঞ্জমতিভীষণম্
মন্দমরুদন্তরগগন্ধকৃতদূষণম্।
সকলমেতদীরিতম্
কিঞ্চ গুরুপঞ্চশরচঞ্চলং মম[১] জীবিতম্। ধ্রু।

[১] "মে" পাঠ ধরিলে ছন্দ ঠিক থাকে।

মত্তপিকদত্তরুতমুত্তমাধিকরং বনম্
সঙ্গসুখমঙ্গমপি তুঙ্গভয়ভাজনম্।
রুদ্র-নৃপমাশু বিদধাতু সুখসঙ্কুলম্
রামপদধামকবিরায়কৃতমুজ্জ্বলম্॥

'মধুকরপুঞ্জের সুন্দরতর গুঞ্জনধ্বনি অতিশয় ভয়াবহ হইতেছে। মন্দপবন-বাহিত সুগন্ধ (বায়ুমণ্ডল) যেন দূষিত করিয়াছে। এ সকলই ব্যক্ত। অধিকন্তু গুরুতর পঞ্চশরাঘাতে আমার জীবন সংশয়ারূঢ়। মত্ত কোকিল ডাক দিতেছে, তাহাতে কুঞ্জবনের অস্বাস্থ্যকরতা বাড়িয়াছে। যে অঙ্গের সঙ্গে সুখ হয় তাহাও অত্যন্ত ভয়ের কারণ হইয়াছে।

রামপদ যাঁহার (নামের) আশ্রয় সেই রায়-কবি (অথবা কবিশ্রেষ্ঠ) কৃত এই উজ্জ্বল গান সত্বই (প্রতাপ-) রুদ্র নৃপতির সুখসমূহ বিধান করুক।'

প্রতাপরুদ্রের প্রীতিকামনায় জগন্নাথবল্লভ লেখা হইয়াছিল। নাটকটি জগন্নাথ-মন্দিরে অভিনীতও হইয়াছিল। রামানন্দ রায় নিজে দেবদাসীদের অভিনয়-নির্দেশ দিতেন।[১] চৈতন্যের নাম না থাকিলেও মনে হয়, চৈতন্যের সঙ্গে প্রথম মিলনের পরে বইটি লেখা হইয়াছিল।

বাঙ্গালা দেশে ষোড়শ শতাব্দের আগে লেখা এমন কোন সঙ্গীতনাটকের সন্ধান মিলে না। ষোড়শ শতাব্দের একেবারে শেষের দিকে গোবিন্দদাস কবিরাজ 'সঙ্গীতমাধব' নামে যে বইটি লিখিয়াছিলেন সেটিও প্রায় নামমাত্রে পর্যবসিত।[২] সম্ভবত এই সঙ্গীতনাটকের একটি সংস্কৃত গান বৈষ্ণব-পদাবলী সংগ্রহে গ্রথিত আছে।[৩] গোবিন্দদাসের সমসাময়িক ও পরবর্তী কোন কোন লেখক এক-আধটি সংস্কৃত গান লিখিয়াছিলেন।[৪] উদাহরণ রূপে একটি "ধ্রুবা গীতি" উদ্ধৃত করিতেছি। এটি পুরুষোত্তম মিশ্রের রচনা।[৫]

সুজন বদ মধুরিপুনাম
দুষ্কৃতমপহায় যাহি দুর্লভহরিধাম। ধ্রু।
পুত্রমিত্রবান্ধবগণমিহ ন কলয় সত্যম্
পুরুষোত্তমমিশ্র-গদিতমনুভাবয় নিত্যম্॥

'সুজন হে, মধুসূদনের নাম বল, (আর) দুষ্কার্য ত্যাগ করিয়া দুর্লভ হরির স্থানে চলিয়া যাও। এ জগতে পুত্র মিত্র কুটুম্ব প্রভৃতির উপরে আস্থা রাখিও না। পুরুষোত্তম মিশ্রের (এই) উক্তি সর্বদা স্মরণ কর।'

---

[১] চৈতন্যচরিতামৃত দ্রষ্টব্য।

[২] পরে দ্রষ্টব্য। [৩] প-ক-ত ৩৭৯।

[৪] *History of Brajabuli Literature* পৃ ৩৮৬-৮৭। 'রাসোল্লাসতন্ত্র' (স ২০৯; লিপিকাল ১৬৭৬ শকাব্দ)।

[৫] নরহরি চক্রবর্তীর 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' গ্রন্থে (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সম্পাদিত) উদ্ধৃত।

৩

বৈষ্ণব-পদাবলী বলিতে যাহা বুঝি তাহা চৈতন্যের আগে উচুদরের বৈঠকি গানের মতো ছিল। এ গানের আসর ছিল রাজসভায় অথবা ধনীর মজলিশে। রাজসভা হইতে ইহা চলিয়া আসে তখনকার দিনের মার্জিতরুচি সঙ্গীতপ্রিয় শিক্ষিত ব্যক্তির সুহৃদ্-গোষ্ঠীতে। চৈতন্যের হৃদয়মনের অনুমোদনই এই সাধারণ প্রণয়ের গানে ও সে গানের শৈলীতে আধ্যাত্মিক অভীপ্সার ইঙ্গিতসঙ্কেত বহনের শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল।[১] তখন হইতেই যথার্থ "বৈষ্ণব"-পদাবলীর আরম্ভ।

বাঙ্গালী বৈষ্ণব-গীতিকবিদের রচনার প্রধান আদর্শ ছিল বিদ্যাপতির গান। এ বিদ্যাপতিকে মিথিলার বিশেষ একজন রাজকবি মনে করা উচিত হইবে না।[২] এখানে "বিদ্যাপতি" এক-ধরণের গীতি-রচয়িতা কবিদের সাধারণ নাম। এ কবিদের মধ্যে মৈথিল ছিল, বাঙ্গালী ছিল, সম্ভবত নেপালীও ছিল। তবে তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখ্যতম যিনি তিনিই আমাদের জানা কবি, "সপ্রক্রিয়-সদুপাধ্যায়" বিদ্যাপতি ঠকুর। ইনি ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত, সমর্থ ও অধ্যাপনরত ছিলেন।[৩]

মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাসদ্ বলিয়া পরিচিত বিদ্যাপতির যে ঐতিহ্য মিথিলায় সপ্তদশ শতাব্দের শেষে প্রথিত ছিল সে অনুসারে মিথিলায় কীর্তন-পদাবলী রচনার ও গীতপদ্ধতির রূপ বিদ্যাপতির ও শিবসিংহের উদ্যোগেই সুনির্দিষ্ট হইয়াছিল। 'রাগতরঙ্গিণী'র সঙ্কলয়িতা লোচন এ বিষয়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা অদ্যাবধি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই বলিয়া এখানে উপস্থাপিত করিতেছি।[৪]

> বিখ্যাতভূদেবসুবংশসূতির্বিদ্যাবিভূতির্ভবভূতিরাসীৎ।
> স দেবতায়াঃ কিল সিদ্ধিযোগাৎ কাব্যং পুরাণপ্রতিমং চকার॥
> অধীত্য তৎসংসদি পার্থিবেভ্যঃ কথাস্তদীয়াঃ কথয়াম্বভূব।
> অতস্তদানীং সুমতিঃ কলাবান্ কায়স্থসূনুঃ কথকো বভুব॥
> সুমতিসুতোদয়জন্মা জয়তঃ শিবসিংহদেবেন।
> পণ্ডিতবরকবিশেখর-বিদ্যাপতয়ে তু সন্ন্যস্তঃ।

---

[১] রামানন্দ রায়ের সঙ্গে চৈতন্যের প্রেমমার্গের আলোচনায় এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা রিপোর্ট করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

[২] 'বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী' পৃ ৫-৬ দ্রষ্টব্য। [৩] ঐ পৃ ২২।

[৪] পণ্ডিত বলদেব মিশ্র সম্পাদিত (দরভঙ্গা ১৯৩৪) পৃ ৩৭।

এতৈঃ সঙ্গীতবিদ্‌ভিঃ সুরনিকরসরিৎকান্তমন্তর্বিগাহ্য
প্রোচ্ছীলৎসুস্বরৌঘপ্রবিততগতিকাঃ কল্পিতাঃ কেঽপি রাগাঃ।
তদ্‌গানার্থঞ্চ বিদ্যাপতিকবিকৃতিনা কল্পিতাস্তু ধ্রুবা যাঃ
তাসামেকোঽগ্রগাতাভবদিহ জয়তঃ সংসদি শ্রীনৃপস্য ॥

বিখ্যাত ব্রাহ্মণবংশে বিদ্যাবান্ ভবভূতি জন্মিয়াছিলেন। তিনি দেবতার কাছে সিদ্ধিবর পাইয়া পুরাণকল্প কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে অধ্যয়ন করিয়া বিভিন্ন রাজসভায় তাঁহার (ভবভূতির) কথা-সকল (অর্থাৎ গ্রথিত কাহিনী) ব্যক্ত করিতেন বলিয়া তখন সুমতি নামে এক কায়স্থসন্তান কলাবান্ কথকরূপে (প্রসিদ্ধ) হইয়াছিলেন।

সুমতির পুত্র উদয়। তাঁহার পুত্র জয়ত। ইনি শিবসিংহ রাজা কর্তৃক পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ কবিশেখর বিদ্যাপতির কাছে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এমন সঙ্গীতজ্ঞেরা সুরসাগরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া উচ্ছ্বসিত সুরপ্রবাহের লহরীর গতি অনুসরণ করিয়া কতকগুলি রাগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই রাগ গান করিবার জন্য কৃতী কবি বিদ্যাপতি যে ধুয়াগুলি রচনা করিয়াছিলেন শ্রীমান্ রাজার সভায় সেগুলির একমাত্র শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন জয়ত।'

জয়তের পুত্র কৃষ্ণ পিতার কাছে এই নূতন রাগ ও তদাশ্রিত বিদ্যাপতির ধ্রুবা গীতি ভালো করিয়া শিখিয়াছিলেন। যে কোন কারণে হোক কৃষ্ণ মিথিলায় থাকেন নাই।[১] হয়ত তিনিই বিদ্যাপতির গান বাঙ্গালা দেশে (উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম বঙ্গের কোন রাজসভা বা ধনিসংসদের মারফৎ) আমদানি করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের পুত্রপৌত্র অথবা শিষ্যপ্রশিষ্য পরম্পরায় এই গানের ধারা চলিয়া আসিয়াছিল।[২]

বাঙ্গালা দেশে পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাসের প্রথম পর্যায় পাই চৈতন্যের সময়ে তাঁহারই সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষ প্রেরণায়, শান্তিপুরে (সম্ভবত নবদ্বীপেও) এবং নীলাচলে। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে এবং গৌড়-গমনাগমনের পথে শান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘরে এবং পরে নীলাচলে যে নৃত্যগীত হইয়াছিল তাহার প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে গীতিগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা পুরা পদাবলী নয়, ধ্রুবা গীতি। একথা মনে রাখিলে লোচনের উক্তির গুরুত্ব বোধগম্য হইবে এবং বিদ্যাপতির গানের কিছু সমস্যাও মিটিবে।

কৃষ্ণদাসের উল্লিখিত ধুয়া পদগুলি এই। একটির ভাষা ব্রজবুলি-মৈথিল, অপরটির বাঙ্গালা।

---

[১] "পিতুরনূনগুণঃ কিল কলাভিরানন্দদঃ প্রথিতঃ।
জয়তাদজনি বিতৃষ্ণঃ কৃষ্ণো নিজদেশিগায়কসংসদি ॥"

[২] যেমন, হরিহর মল্লিক, তৎপুত্র ঘনশ্যাম ইত্যাদি. ঘনশ্যামের তিন পুত্র লক্ষ্মীরাম, রাঘবরাম ও টীকারাম।

কি কহব রে সখী আজুক আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥

সেই ত পরাণনাথ পাইনু
যাঁহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু ॥

হাহা প্রাণ প্রিয়সখী কিনা হৈল মোরে
কানুপ্রেম-বিষে মোর তনুমনজরে।
রাত্রিদিনে পোড়ে মন সোয়াথ না পাও
যাহাঁ গেলে কানু পাও তাহাঁ উড়ি যাও ॥

মৈথিলীতে এমন ধুয়া পদগুলিতে এখন পুরা ভনিতা, এবং পুরানো সঙ্কলন-পুথিগুলিতে "ভণ(ই) ইত্যাদি" এইটুকু মাত্র যোগ করাতে আধুনিক বিদ্যাপতি-পদাবলী-সঙ্কলনগ্রন্থ এমন স্ফীতকায় হইয়াছে। বাঙ্গালায় ধুয়াপদগুলি পরবর্তী পদাবলী রচয়িতারা কাজে লাগাইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করি। কতক ধুয়াপদ ধুয়া রূপেই চলিয়া আসিয়াছিল।[১] পরবর্তী কালের কোন কোন জীবনীগ্রন্থে কিছু কিছু ভালো ধুয়া পদ উদ্ধৃত আছে। একছত্রের ধুয়া পদও ছিল। যেমন

শারঙ্গধর তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে ॥[২]
একেত কালিয়া কানু তিনু ঠাঁই বাঁকা ॥[৩]

ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দের পাঞ্চালী কাব্যে যে ধুয়া ছত্র বা পদ পাওয়া যায় তাহার কতকগুলি প্রাচীন ধুয়া পদেরই অনুবৃত্তি বলিয়া মনে করি। কোন কোন ধুয়াপদকে কেন্দ্র করিয়া নূতন গীতিকবিতারও সৃষ্টি হইয়াছিল। একটি উদাহরণ দিই। উপরে ধুয়া-পদের যে প্রথম উদাহরণটি দিয়াছি তাহা অবলম্বন করিয়া বিদ্যাপতির নামে দুইটি পৃথক গান গঠিত হইয়াছিল। প্রথম গানটি রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র'এ (আনুমানিক ১৭৩০) সঙ্কলিত আছে, দ্বিতীয়টি বিভিন্ন পদসংগ্রহে স্থান পাইয়া সুপরিচিত হইয়াছে।

দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল
হরিমুখ হেরইতে সব দূরে গেল।
যতহুঁ আছিল মোর হৃদয়ক সাধ
সে সব পূরল হরি-পরসাদ।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর[৪]	কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর। ধ্রু।	চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।

---

[১] গেয় পাঞ্চালী কাব্যগুলিতে অনেক ভালো ভালো প্রাচীন ধুয়া রক্ষিত হইয়াছে।

[২] চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত। [৩] 'রসিকমঙ্গল' সারদাপ্রসাদ মিত্র প্রকাশিত, পৃ ৭৩।

[৪] সংকীর্তনামৃতের পাঠান্তর "আজুক কি কহব আনন্দ ওর"।

রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল
অধরকি পাশ[১] বিরহ দূর গেল।
ভনহ বিদ্যাপতি আর নহ আধি
সমুচিত ঔষধে না রহে বেয়াধি।

পাপ সুধাকর যো দুখ দেল
পিয়া মুখ দরশনে সব সুখ ভেল।
আঁচল ভরিয়া যদি মহানিধি পাওঁ
আর দূরদেশে হাম পিয়া ন পাঠাওঁ।
শীতের উড়নী পিয়া গিরিষের বা
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।
ভনএ বিদ্যাপতি শুন বরনারী
পিয়াসে মিলল যেন চাতকে বারি[২]॥

মূল ধুয়া গানে তিনটি পদ ছিল, পদামৃতসমুদ্রের পাঠের প্রথম ছয় ছত্র। দ্বিতীয় পাঠে মূলের প্রথম ছত্র দুইটি ভাবান্তরিত হইয়াছে তৃতীয়-চতুর্থ ছত্রে। প্রথম গানটি প্রাচীনতর। দ্বিতীয় গানটির বর্ধিতাংশ বাঙ্গালী কবির রচনা॥

৪

"আদি" অর্থাৎ স্থূল প্রণয়রসের গানে বস্তুরূপে কৃষ্ণের গোপীলীলা প্রথম দেখা দিয়াছিল, একথা আগে বলিয়াছি। শারদ অথবা হৈমন্তিক, গার্হস্থ্য ও গ্রাম্য উৎসবে এই গান রীতিসিদ্ধ ছিল। দুর্গাপূজার একদা-অঙ্গীভূত শাবর (বা আভীর) ঋতু-উৎসবের অশ্লীল গীতে-নৃত্যে কৃষ্ণলীলা বাদ যায় নাই। তাহার প্রমাণ শারদ-রাসপ্রসঙ্গে ভাগবতের উক্তি।[৩]

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স অত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥

'এইরূপে, প্রেমমুগ্ধ নারীগণ লইয়া কামগন্ধহীন তিনি নিজের দেহমধ্যে কামাভিব্যক্তি অবরোধ করিয়া, শারদকাব্যকথারসময় সেই চন্দ্রকরোদ্ভাসিত রাত্রিগুলি সব উপভোগ করিয়াছিলেন।'

নায়ক কৃষ্ণ বিষ্ণু-অবতার হইলেও আগে ব্রজবিলাস-গানের সঙ্গে অধ্যাত্ম-চিন্তার কোন সম্পর্ক ছিল না। কালিদাসও তাই সাধারণ নরনারীর যৌবন-শ্রীবিলাসের বাসর অথবা আসর রূপেই গোবর্ধন-গিরিগুহার ও বৃন্দাবনের উল্লেখ করিয়াছিলেন।[৪] কালিদাসের সময়ে ব্রজলীলা স্থূলরসের গ্রাম্যগীতির বিষয় ছিল বলিয়াই বোধ করি তিনি ইহা কাব্যের বিষয়ীভূত করেন নাই, শুধু ইঙ্গিত করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন।[৫] ক্রমে ক্রমে বহুনারীবিলাসের পরিবর্তে

---

[১] অর্থাৎ স্পর্শ।
[২] পাঠান্তর "সুজনক দুখ দিন দুই চারি"।
[৩] ১০. ৩৩. ২৫।
[৪] রঘুবংশ ৬. ৫০. ৫১।
[৫] মেঘদূত পূর্বমেঘ ১৫।

একনারীবিলাস আদৃত হইতে থাকিলে তবেই কৃষ্ণের গোপীলীলা-কথা সংস্কৃত সাহিত্যের সীমানায় ধরা দেয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহাতে আধুনিক আর্যভাষার সাহিত্যে কৃষ্ণলীলার গানে ভক্তিরসের রঙ কিছু পড়িয়াছিল বটে কিন্তু চৈতন্যের স্বীকৃতির দ্বারাই তাহা হইতে আদিরসের ক্লেদ একেবারে ঘুচিয়া যায় এবং কৃষ্ণ-রাধার প্রেমলীলা মানব-জীবনের গূঢ়তম অভীপ্সার প্রতিফলন ও সিম্বল বলিয়া গৃহীত হয়। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সংলাপ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

গান মধ্যে কোন গান জীবের নিজ ধর্ম
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম।[১]

দেবায়ন সম্পূর্ণতা পাইল চৈতন্যের ধর্মে। ঈশ্বরবিরহের তীব্রব্যাকুলতা যখন মূর্তিমান হইল শ্রীচৈতন্যের আচারে ভাবে ভঙ্গিতে, তখনি প্রত্যক্ষের মাহাত্ম্য পরোক্ষকে ছাপাইয়া গেল। পরমাত্মা-কৃষ্ণ যেন সিম্বল রহিয়া গেল কিন্তু মানবাত্মা রাধার বিরহ-বেদনা ভাবুকের চিত্তে সকরুণ গুঞ্জনধ্বনি তুলিতে লাগিল। তাহার পরে চৈতন্যের চারিত্রে রাধাকৃষ্ণ এক হইয়া গেল এবং বৈষ্ণব-কবিতা হৃদয় হইতে মনের উপর তলে ভাসিয়া উঠিল। ভাবের বিষয় সাধনার বস্তুতে পরিণত হইল।

চৈতন্যের আগে সংস্কৃত কবিতায় ব্রজপ্রেমী বলিতে কৃষ্ণই, রাধা (বা গোপীরা) নয়। রাধা (বা গোপীরা) কৃষ্ণের প্রেমের পাত্র, উপলক্ষ্য মাত্র। তাই ব্রজবিরহী কৃষ্ণই অতীত প্রেমলীলার স্মৃতি বহন করিত। কৃষ্ণের প্রতি রাধার (বা গোপীদের) প্রেমের স্মৃতির কোনই উল্লেখ নাই। আগে[২] উমাপতি ধরের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহাতে রাধার প্রতি দ্বারকাবাসী কৃষ্ণের তখনও পর্যন্ত সম্ভোগ প্রেমের কথা আছে। আর একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।[৩] এটি আরও পুরানো। ইহাতে ব্রজপ্রোষিত কৃষ্ণ বৃন্দাবনের নির্জন প্রেমলীলাস্থলীর স্মৃতি রোমন্থন করিতেছে। সে লীলা শুধু রাধার সঙ্গে নয়, বহু কান্তার সঙ্গেও। ব্রজ হইতে আগত কোন সুহৃৎকে কৃষ্ণ কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতেছে

তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দরাজতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পনবিধিচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ ॥

[১] চৈতন্যচরিতামৃত ২. ৮। [২] পৃ ৩৮ দ্রষ্টব্য।
[৩] কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় (সুভাষিতরত্নকোষ), অসতীব্রজ্যা ৫০১।

'ভাই, গোপবধূদের সেই বিলাসের অনুকূল, রাধার গোপনতার সাক্ষী, যমুনাতীরের লতাকুঞ্জগুলির কুশল তো? প্রেমলীলার শয্যা-রচনাব্যবস্থার জন্য যেমন প্রয়োজন এখন লুপ্ত হওয়াতে, বোধ হয়, সে লতাপল্লব সব বিবর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়িবার মতো হইয়াছে।'

চৈতন্যের জন্যই বৈষ্ণব-পদাবলীতে প্রেমলীলার মুখ্য পাত্র বলিয়া রাধা কৃষ্ণকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। "যঃ কৌমারহরঃ"[১] এই সাধারণ নায়িকার উক্তি কবিতাটি চৈতন্য যে কনটেক্‌স্‌টে ব্যবহার করিয়াছিলেন[২] তাহাই এই পরিবর্তন সূচিত করে। বৈষ্ণব-গীতিকাব্য অবশ্যই ধর্ম-সাহিত্য, কেন না তাহা ভক্তিরসের উৎস হইতে উৎসারিত। কিন্তু তাহা শুধু ধর্ম-সাহিত্যেই পর্যবসিত নয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দের অনুকরণ-অনুসরণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার বেশ খানিকটাই যে-কোন ভাষার সমসাময়িক সাহিত্যের নিকষে অম্লানরেখ। বৈষ্ণব-গীতিকবিতা ছাড়া পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যের অল্প কিছুই এমন দেশকালাতি-শায়িত্বের দাবি করিতে পারে। বৈষ্ণব-পদাবলীর বিষয় সঙ্কীর্ণ ও ধর্মাঙ্কিত এবং ভাব মেয়েলি ও কৃত্রিম বলিয়া এই দেশকালাতিশায়িত্বের সম্বন্ধে সংশয় জাগিতে পারে। স্বীকার করি, বৈষ্ণব-কবির বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য নাই, পরিসরের অভাব আছে, সমাজদৃষ্টিতে বস্তুও সব সময় গ্লানিহীন নয়। কিন্তু যখন ভাবরসের দৃষ্টিতে পদকর্তাদের মানস অনুবর্তন করিয়া উপলব্ধি করি এ সবই সিম্বলিক, তখন দেশ-কাল-সমাজ পরিবেশের সীমানা ভুলিয়া যাই। "পৃথিবীতে যে ভালবাসার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু দেখা যায় না—যাহার সহিত পূর্বকৃত কোন সম্বন্ধবন্ধন জড়িত নাই—এমন কি, যাহা সমস্ত সম্বন্ধবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া দুরূহ দুরাশায় আত্মবিসর্জন করিতে যায় বৈষ্ণব কবিগণ পৃথিবীর সেই ভালবাসাকেই পরমাত্মার প্রতি আত্মার অনিবার্য নিগূঢ় ভালবাসার আদর্শ রূপকস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।"[৩] বৈষ্ণব-কবির ভাষায় বৈচিত্র্যহীনতার মালিন্য আছে সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহাদের ভাবে সহজতায় এবং বিশ্বাসে অকৃত্রিমতায় কবিত্বে সংশয় জাগায় না। বৈষ্ণব-কবিতা অর্থ যেটুকু প্রকাশ করে তাহার তুলনায় দ্যোতনা বহন করে অনেক বেশি।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতার ধারাবাহিক অর্থাৎ কালগত পরিণতি বৈষ্ণব-গীতিকাব্যে যথাসম্ভব রহিয়াছে। এই পরিণতি বেশি লক্ষ্য হয় অলঙ্কারে ও ইমেজে। বৈষ্ণব-গীতিকবিতার বাক্‌পরিমিতি ও ভাষানৈপুণ্য সংস্কৃত কবিতার

---

১ ঐ ৫০৮। ২ চৈতন্যচরিতামৃত ৩. ১ দ্রষ্টব্য।

৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি (১৩০২)।

সূত্রেই লব্ধ। এই বাক্‌শিল্প সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্যে অন্যত্র দেখা যায় নাই।

রাধা ও গোপীদের সঙ্গে প্রণয়লীলা ছাড়াও ব্রজকাহিনীর অন্যান্য কিছু কিছু বস্তু বৈষ্ণব-গীতিকাব্যে স্বীকৃত হইয়াছে। যেমন যশোদার বাৎসল্য। বাৎসল্য-পদের সংখ্যা বেশি নয়, এবং তাহার মধ্যে ভালো কবিতার সংখ্যা খুবই কম। তবুও এই পদাবলী ভারতীয় সাহিত্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন সুর জাগাইয়াছে। (সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত কাব্যে বাৎসল্যরসের স্থান অলঙ্কারের সূত্রে যদিও বা থাকে তা সাহিত্যের আসরে দেখা দেয় নাই বলা যায়।)

বৈষ্ণব-পদাবলীর বিষয় সর্বদা কৃষ্ণলীলাময় নয়। চৈতন্যও কৃষ্ণের (এবং রাধার) অবতাররূপে পদাবলীতে বহুধা গীত হইয়াছেন। চৈতন্যের কীর্তনমগ্ন ও ভাবতন্ময় আচার ও অবস্থা দেখিয়া ও স্মরণ করিয়া তাঁহার কয়েকজন ভক্ত বন্দনা-পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের অনেক কবিও এই পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যের তিরোধানের পরে যখন পালা-বন্দি কীর্তন-গানের আসর বসিতে শুরু করিল তখন এই পদগুলি প্রত্যেক পালার উপক্রমে গীত হইতে থাকিল। মান, বিরহ ইত্যাদি ভাবের অনুযায়ী গৌর-পদাবলী আবশ্যকমতো রচনা হইতে লাগিল। এইভাবে কীর্তনারম্ভে গীত গৌরাঙ্গ-পদাবলী 'গৌরচন্দ্রিকা' নামে খ্যাত হইয়াছে।[১] চৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দ এবং কখনো কখনো অদ্বৈত ও গদাধর প্রমুখ ভক্তও বন্দিত হইয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীর প্রধান সুর বিরহের। এই বিরহ-সুরের রণনেই বাৎ-সল্যের, অনুরাগের এবং মিলনের শ্রেষ্ঠ পদগুলি উৎকর্ষপ্রাপ্ত। সংস্কৃত সাহিত্যে বিরহ প্রধানত পুরুষের তরফে। যেমন ঋগ্বেদে পুরুরবার বিরহ, রামায়ণে রামের বিরহ, মেঘদূতে যক্ষের বিরহ। নবীন আর্যভাষার সাহিত্যে তথা বৈষ্ণব গীতিকাব্যে বিরহ একান্তভাবে নারীরই। ইহার কারণ দুইটি। এক, ইতিমধ্যে সংসারে নারীর মর্যাদা হ্রাস পাইয়াছে। দুই, প্রাদেশিক সাহিত্যের প্রধান বিষয়গুলি মেয়েলি ছড়া-গান হইতে গৃহীত॥

---

১ *Journal of the American Oriental Society* পত্রিকায় (৭৮ খণ্ড তৃতীয় সংখ্যা) প্রকাশিত অধ্যাপক এডোয়ার্ড সি ডিমকের (*Edward C. Dimock*) *The Place of Gaura-candrika in Bengali Lyrics* প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

"এস হে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ সঙ্গে করি",—এইরকম পদ গাহিয়াই কীর্তন আরম্ভ হয়।

চৈতন্যের সুহৃদ্ ও অনুচর কেহ কেহ দুইচারটি করিয়া গান রচনা করিয়াছিলেন। দুইএকজন ধারাবাহিক পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ইহারাই চৈতন্য-পদাবলী রচনার পথপ্রদর্শক। চৈতন্যের মহিমাসূচক পদ প্রথম রচনা করিয়া প্রকাশ্যে গাহিয়াছিলেন অদ্বৈত আচার্য নীলাচলে। সে কথা আগে বলিয়াছি।[১]

চৈতন্যের আদ্য অনুচরদের মধ্যে মুরারি গুপ্তকেই প্রথম পদাবলী রচয়িতা রূপে পাই। ইহার লেখা চৈতন্যজীবনীর আলোচনা যথাস্থানে করিয়াছি। মুরারি গুপ্তের কড়চা যাহা ছাপা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে মুরারি আগে গান লিখিতেন। দামোদর পণ্ডিত তাঁহাকে গান রচনা ছাড়িয়া দিয়া জীবনী রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।[২] বাঙ্গালায় ও ব্রজবুলিতে মুরারি সাত-আটটির বেশি গান (পদাবলী) লিখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।[৩] তাহার মধ্যে দুইটি[৪] খুব ভালো, বৈষ্ণব-পদাবলীর শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। পূর্বগামী পদাবলী-রসিকেরা, বোধ করি ভনিতায় পরিচিত নাম না দেখিয়া, পদ দুইটিকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম গানে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নাই, দ্বিতীয় গানে শুধু "রাই" আছে।

প্রথম গানে প্রেমবিপন্নার সর্বত্যাগী দুঃসাহসের অভিব্যক্তি।

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও।
নয়নপুতলী করি লইলোঁ মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ
পিরীতি আগুন জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান।
না জানিয়া মূঢ়লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণগোচরে
স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে।
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার যশ তিন লোকে গায়।

---

[১] পৃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
[২] দ্বিতীয় প্রক্রম চতুর্থ সর্গ শ্লোক ২৩-২৪ দ্রষ্টব্য।
[৩] HBL পৃ ১৮ দ্রষ্টব্য।
[৪] প-ক-ত ৭৫১, ১৬৯৯।

দ্বিতীয় গানটিতে বিরহিণীর গভীর মর্মপীড়া প্রকাশিত। কবি যে চিকিৎসক-ব্যবসায়ী তাহাও জানা যায়।

কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই
সফরী সলিল বিন গোঙাইব কত দিন
শুন শুন নিঠুর মাধাই।
ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগবাতি[১]
সে কেমনে রহে অযোগানে[২]
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসোঁ হেন[৩]
ঝাট আসি রাখহ পরাণে।
বুঝিলাম উদ্দেশে[৪] সাক্ষাতে পিরীতি তোষে[৫]
স্থান-ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়
তার সাক্ষী পদ্ম-ভানু জল ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পিরীতি না রয়।
যত সুখে বাঢ়াইলা তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদবন্ধু-ভাতি[৬]
গুপ্ত কহে একমাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহূ-রাতি॥[৭]

৬

মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন, যদিও চৈতন্য তাঁহার সঙ্গে বয়স্যের মতো আচরণ করিতেন। মুকুন্দ দত্ত ছিলেন মহাপ্রভুর সমাধ্যায়ী, সুকণ্ঠ সুগায়ক ও অত্যন্ত প্রিয় বয়স্য। মুকুন্দ দত্তের বড় ভাই বাসুদেব দত্তকেও চৈতন্য অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন। মুকুন্দ গানে আর বাসুদেব নাচে পারদর্শী ছিলেন। ইহাদের আদি নিবাস ছিল চাটিগাঁয়ে। পদাবলী-রচয়িতা রূপে দুই-ভাই অপরিমিত। কিন্তু দুই জনেই কিছু পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া স্বচ্ছন্দে অনুমান

---

[১] যে বাতি এক যুগ ধরিয়া জ্বলিবে, অর্থাৎ সুবৃহৎ প্রদীপ। অথবা যুগ্ম বর্তিকা, যুগল বাতি।
[২] তৈল না যোগাইলে। [৩] এমনি বুঝিতেছি। [৪] প্রকারান্তরে।
[৫] দেখাদেখি হইলে তবেই প্রেম তৃপ্তি দেয়।
[৬] চন্দ্রের দশা করিলে। চন্দ্র যেমন এক পক্ষ ধরিয়া বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহার পরপক্ষে আবার ক্ষয় পাইতে থাকে, সেইরূপ পূর্বে তুমি আমাকে (রাধাকে) স্নেহ করিয়া বাড়াইয়া এখন বিরহে পোড়াইতেছ।
[৭] একমাসের মধ্যে চন্দ্র দেশ ছাড়িল, অর্থাৎ লুপ্ত হইল। আর নিদানে অর্থাৎ রোগের সঙ্কটাবস্থায় অমাবস্যা আসিল। পীড়ার সঙ্কট অবস্থায় অমাবস্যা পড়িলে রোগীর জীবনে আশঙ্কা থাকে। এই উৎপ্রেক্ষাটি হইতে বোঝা যায় যে কবি চিকিৎসক বৈদ্য ছিলেন।

করিতে পারি। তবে দুই জনের শুধু একটি করিয়া গৌর-পদাবলী মিলিয়াছে। ভাষা ব্রজবুলি।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে দুই চার দিন থাকিয়া চৈতন্য নীলাচলে চলিতেছেন। সেই সময়ে রাধাভাবভাবিত অদ্বৈতের বিলাপ মুকুন্দের গানে বর্ণিত।

আরে আমার গৌরাঙ্গ গোপীনাথ
যাহার লাগিয়ে গেহ গুরু ছোড়নু
সেহি করল পরমাদ।
অপরূপ বেশ কেশ সব মুণ্ডন
পিন্ধন অরুণ[১] কৌপীন
যো পহু ত্রিভুবন রস-উল্লসিত
সেহি বেশ সন্ন্যাস প্রবীণ।
ঞিহা গুণ সোঙরি রোয়ত শান্তিপুর-নাথ
যব পহু নীলাচলে যাই
হেরইতে প্রেম-অঙ্গ মুকুন্দ মন ভুলল[২]
লগাওত লোক বুঝাই।[৩]

বাসুদেবের পদটি পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাসের ভনিতায় থাকিলেও ইহা প্রাচীনতর ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে বাসুদেবের ভনিতায় পাওয়া যায় বলিয়া বাসুদেবের রচনা বলিয়াই গ্রহণ করা কর্তব্য।[৪]

অপরূপ গোরা নটরাজ
প্রকট প্রেম- বিনোদ নবনাগর
বিহরে নবদ্বীপ মাঝ।
কুটিল কুন্তল গন্ধ পরিমল
চন্দন তিলক ললাট
হেরি কুলবতী লাজ-মন্দির
দুয়ারে দেয়ই কপাট।
করিবর-কর জিনি বাহুর সুবলনি
দোসরি গজমোতি হারা
সুমেরু-শিখরে যৈছন ঝাঁপিয়া
বহই সুরধুনি-ধারা।
রাতুল অতুল চরণ যুগল
নখমণি বিধু উজোর
ভকত-ভ্রমরা সৌরভে মাতল
বাসুদেব দত্ত রহু ভোর॥

১ পাঠ "অরূপ"। ২ পাঠ "ভুবন"। ৩ সীতাগুণকদম্ব পৃ ৪০৬-০৭। ৪ HBL পৃ ৪৬৫ দ্রষ্টব্য

"বাসুদেব দাস" ও "বাসুদেব" ভনিতায় গোটা তিনেক পদ পাওয়া যায়। সেগুলি বাসুদেব দত্তের রচনা বলিয়া অনুমান করি। একটি পদ বাৎসল্যরসের। রচনা ভালো এবং উদ্ধৃতির যোগ্য। গোষ্ঠগমনোদ্যত কৃষ্ণকে যশোদা বলরামের হাতে ছাড়িয়া দিতেছেন।

দণ্ডে শতবার খায় যাহা দেখে তাহা চায়
ছানা দধি এ ক্ষীর নবনী
রাখিও আপন কাছে ভোকছানি[১] লাগে পাছে
আমার সোনার যাদুমণি।
শুন বাপু হলধর এক নিবেদন মোর
এই গোপাল মায়ের পরাণ
যাইতে তোমার সনে সাধ করিয়াছে বনে
আপনি হইও সাবধান।
দামালিয়া[২] যাদু মোর না জানে আপন পর
ভালো মন্দ নাহিক গেয়ান
দারুণ কংসের চর তারা ফিরে নিরন্তর
আপনি হইও সাবধান।
বাম করে হলধর দক্ষিণ করে গিরিধর
শুন বলাই নিবেদন-বাণী
বাসুদেবদাস বলে তিতিল নয়ান-জলে
মুরছিয়া পড়িল ধরণী।[৩]

৭

নরহরি দাস সরকারের কথা আগে বলিয়াছি। নরহরি রাজকর্মচারী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। নতুবা সরকার উপাধির মানে হয় না। নরহরি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, কিন্তু মন্ত্রদীক্ষা দানে তাঁহার অধিকার ছিল তাই তিনি পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-গ্রন্থে "সরকার ঠাকুর" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সমসাময়িক কালে নরহরি প্রসিদ্ধ পদকর্তা ছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দের গোড়ায় এক বড় গ্রন্থকর্তা নরহরি চক্রবর্তী "নরহরি" ভনিতায় অনেক পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া সরকার ঠাকুরের পদগুলি প্রায়ই এখন পৃথক করিয়া চিহ্নিত করা যাইতেছে না। নরহরি চক্রবর্তীর আগেও কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে নরহরির নামে কিছু পদ সংকলিত আছে। সেগুলি আপাতত নরহরি সরকারের রচনা বলিয়া মনে করিতে বাধা নাই।

---

[১] ক্ষুধাজনিত অবসন্নতা। [২] দুরন্ত।
[৩] পদকল্পলতিকায় ও কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত। HBL পৃ ৩৬৪ দ্রষ্টব্য।

সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগে সঙ্কলিত একটি গ্রন্থে[১] এই পদটি সরকার ঠাকুরের রচনা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিরহখিন্ন রাধার প্রাণসংশয় শুনিয়া কৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়াছে। তাহার সেই ব্যাকুলতার মধ্যে মিলনে প্রেমের তীব্রতার বর্ণনা। ভাষা ব্রজবুলি।

রাই-বিপতি শুনি[২] বিদগধশিরোমণি
পুছই গদগদ ভাষা
নিজ মন্দির তেজি চলু বরনাগর
পুন পুন পরশই নাসা[৩]।
বিছুরল[৪] চরণ রণিত মণিমঞ্জীর
বিছুরল মুরলিক রন্ধ্র
বিছুরল বেশ বসন ভেল বিগলিত
বিগলিত শিখিপুছচন্দ্র।
মলয়জ পরিমলে দশদিগ মোদিত
যামিনী বহে অতি পুঞ্জে[৫]
লালস দরশ পরশে দুহুঁ আকুল
চিরদিনে মীলল কুঞ্জে।
দুহুঁ মুখ হেরই অথির ভেল দুহুঁ তনু
পরশিতে ভুজে ভুজে কাঁপ
নরহরি-হৃদি মাঝে অপরূপ জাগল
জলধর বিধুবর ঝাঁপ॥

নীচের পদটি রাধামোহন ঠাকুর সংকলিত পদামৃতসমুদ্রে[৬] এবং অন্তত আর একটি পুথিতে নরহরি ভনিতায় আছে। পরবর্তী কালের পুথিতে এবং গ্রন্থে ইহার ভনিতায় "চণ্ডীদাস" পাঠ আছে। পদামৃতসমুদ্রে নরহরি চক্রবর্তীর কোন পদ থাকিবার কথা নয়, এবং নাই-ও। সুতরাং ইহা নরহরি দাস সরকারের রচনা হওয়া সম্ভব। পদটিতে যে আকুলতা ধ্বনিত তাহা প্রাচীন পদাবলীর সুরেরই অনুযায়ী। রাধা সখীর কাছে হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতেছে।

কিনা হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি।
খাইতে সোয়াথ নাই নিন্দ গেল দূরে
নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে।

---

[১] গোপালদাসের রসকল্পবল্লীতে উদ্ধৃত। ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতেও আছে (পদসংখ্যা ১৪১)।
[২] রাধার বিপন্ন অবস্থা।
[৩] যাত্রা শুভ হইবে কিনা বুঝিবার জন্য।
[৪] বিস্মৃত হইল।
[৫] রাত্রি গভীর হইয়াছে।
[৬] বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত (১২৮৫, দ্বি-স ১৩১৫), পৃ ৪৪৫।

যে না জানে এই রস সেই আছে ভাল
মরমে রহল মোর কানু-প্রেম-শেল।
নবীন পাউযের[১] মীন মরণ না জানে
শ্যাম-অনুরাগে চিত নিষেধ না মানে।
আগমে পিরীতি মোর নিগমে অসার[২]
কহে নরহরি মুঞি পড়িনু পাথার॥

নীচের পদটি দীনবন্ধুদাসের সংকীর্তনামৃতে[৩] আছে। এই সংকলনে নরহরি চক্রবর্তীর কোন পদ নাই, সুতরাং এইটিও সম্ভবত নরহরি দাসের লেখা। ইহাতেও চণ্ডীদাসি সুর অনুভূত।

সই কত না সহিব ইহা

আমার বন্ধুয়া	আন বাড়ী যায়	আমার আঙ্গিনা দিয়া। ধ্রু।
যে দিনে দেখিব	আপন নয়ানে	কহে কার সনে কথা
কেশ ছিঁড়িব	বেশ দূরে থোব	ভাঙ্গিব আপন মাথা।
যাহার লাগিঞা	সব তেয়াগিনু	লোকে অপযশ গায়
এ ধন-পরাণ	লএ আন জন	তা না কি আমারে সয়।
কহে নরহরি	শুন লো সুন্দরি	কারে না করিহ রোষ
কানু গুণনিধি	মিলাওল বিধি	আপন করম দোষ॥

নরহরি গৌর-পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু সরকার ঠাকুরের রচিত বলিয়া নিশ্চিতভাবে লইতে পারি এমন কোন পদ নাই। জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় এই বিষয়ে নরহরির রচনা বলিয়া যে পদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা খাঁটি বলিয়া লইতে বাধা আছে। প্রথমত ভাষার ছাঁদ আধুনিক। দ্বিতীয়ত কোথায় পদটি পাওয়া গিয়াছে তাহার কোন নির্দেশ নাই। পদটি উদ্ধৃত করিতেছি।

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি
মুঞি তো অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি।
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখন জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে
কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহু।

[১] বর্ষা (প্রাবৃষ)।
[২] অর্থাৎ, আমার প্রেম আমাকে আগাইয়া আনিয়াছে, আর ফিরাইতে অসমর্থ।
[৩] ব-সা-প প্রকাশিত (১৩৩৬), পৃ ৩৮১।

গৌরগদাধর-লীলা আদ্রব করয়ে শিলা
কার সাধ্য করিবে বর্ণন
সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি
আর সদাশিব পঞ্চানন।
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভু-লীলা
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা।[১]

নরহরি-ভনিতায় কয়েকটি রাগাত্মিক বা সহজসাধনঘটিত পদ পাওয়া গিয়াছে।[২] এগুলি সবই সরকার ঠাকুরের রচনা না হওয়া সম্ভব।

৮

গোবিন্দ মাধব ও বাসুদেব ঘোষ তিন ভাই প্রথমে কুমারহট্ট-নিবাসী ছিলেন। তাহার পর নবদ্বীপবাসী হন। ইহাদের মাতৃবংশ সিলেট হইতে আগত, পিতৃবংশ সম্ভবত চাটিগাঁ হইতে। তিন ভাই চৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার সঙ্গী ছিলেন। তিন ভাইই বিবাহ করেন নাই। ইহাদের ইচ্ছা ছিল নীলাচলে থাকিয়া বরাবর চৈতন্যের সঙ্গসুখ লাভ করেন। কিন্তু চৈতন্য ইহাদের নিত্যানন্দের সঙ্গী করিয়া বাঙ্গালা দেশে পাঠাইয়া দেন। তাহার পর হইতে তিন জনে নিত্যানন্দের সহচর হন।

তিন জনেই গান রচনায় কুশল ও সঙ্গীতে দক্ষ ছিলেন। কীর্তন গানে মাধবের দক্ষতা বেশি ছিল। ইহার প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন,

সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্তনে তৎপর
হেন কীর্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর।[৩]

দুই অগ্রজের (?) সম্বন্ধে বাসুদেব লিখিয়াছেন,

গোবিন্দ মাধব ঘোষের গান
শুনি কেবা ধরয়ে পরাণ।[৪]

বাসুদেবের গৌর-পদাবলীর প্রশংসায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন,

বাসুদেব গীত করে প্রভুর বর্ণনে
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।[৫]

---

[১] গৌরপদতরঙ্গিণী পৃ ১১-১২। [২] স ১৪৩ (চ), ৪০২ (ক), ৫৪০ ; ক ২৮৮, ৩৪৩৬।
[৩] চৈতন্যচরিতামৃত ২. ৫। [৪] প-ক-ত ২৩১৫। [৫] চৈতন্যচরিতামৃত ১. ১১।

গোবিন্দ ঘোষ পরে অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ বিগ্রহস্থাপন করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। গোবিন্দ ঘোষের বলিয়া চিহ্নিত করা যায় এমন পদ পাঁচ-ছয়টির বেশি পাওয়া যায় নাই। তবে ইহার আরও কয়েকটি পদ বিভিন্ন "গোবিন্দদাস" কবির রচনার সঙ্গে মিশিয়া থাকা অসম্ভব নয়। নিম্নে উদ্ধৃত পদটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের বার্তায় ভক্তের উদ্বেগকাতরতা বর্ণিত।

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও।
তো সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে।
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়
পরাণপুতলি নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।
আর না করিব মোরা কীর্তনবিলাস।
কান্দয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া॥[১]

চৈতন্যের সন্ন্যাসস্থল কাটোয়ার নিকটে দাঁইহাটে মাধব ঘোষ বাস করিয়াছিলেন। ইহার রচিত পদাবলীও সংখ্যায় বেশি নয়। তাহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী ও গৌর-পদাবলী দুইই আছে। নিম্নে উদ্ধৃত ব্রজবুলি পদটিতে ক্ষণিক বিচ্ছেদের ভয়ে কৃষ্ণের ও রাধার ব্যাকুলতা বর্ণিত।

নিজ নিজ মন্দিরে যাইতে পুন পুন
দুহুঁ দোহাঁ বদন নেহারি
অন্তরে উয়ল[২] প্রেম-পয়োনিধি
নয়নে গলয়ে ঘন বারি।
মাধব হামারি বিদায় পায়ে তোর
তোহারি প্রেম সঞে[৩] পুন চলি আসব[৪]
অব দরশন নাহি মোর।
কাতর নয়নে নেহারিতে দুহুঁ দোহাঁ
উথলল প্রেমতরঙ্গ
মুরুছল রাই মুরুছি পড়ু মাধব
কব হব তাকর সঙ্গ।
ললিতা সুমুখি সুমুখি করি ফুকরত
রাইক কোরে আগোর
সহচরী কানু কানু করি ফুকরত
ঢরকত[৫] লোচন-লোর।

---

[১] প-ক-ত ১৬২২। [২] উদিত হইল। [৩] তোমার প্রেমের হেতু (অর্থাৎ আকর্ষণে)।
[৪] আসিব। [৫] ঝরিতে লাগিল।

কখি গেও অরুণ- কিরণ ভয় দারুণ
কখি গেও লোকক ভীত[1]
মাধব ঘোষ অবহু নাহি সমুঝল
উদভট মুগধ[2] চরিত[3]।

বাসুদেব ঘোষ শেষ জীবনে তমলুকে বাস করিয়াছিলেন। ইনি বহু পদ লিখিয়াছিলেন।[4] দীনবন্ধুদাসের মতে ইহার গৌর-পদাবলীর সংখ্যা আশি।[5] এইগুলিই আদি গৌরচন্দ্রিকা।[6] ইনি কিছু কিছু কৃষ্ণলীলা-পদাবলীও লিখিয়াছিলেন। যেমন, বর্ষাভিসারোৎসুক রাধার উক্তি।

অহে নবজলধর
বরিষ হরিষ বড় মনে
শ্যামের মিলন মোর সনে।
বরিষ মন্দ ঝিমানি
আজু সুখে বঞ্চিব[7] রজনি
গগনে সঘনে গরজনা
দাদুরি দুন্দুভি-বাজনা।
শিখরে শিখণ্ডিনী বোল
বঞ্চিব[7] সুরনাথ-কোল।
দোহার পিরীতি-রস আশে
ডুবল বাসুদেব ঘোষে।[8]

বাসুদেব কৃষ্ণলীলার সহিত মিলাইয়া গৌর-পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। এগুলি কবিতা হিসাবে খুব ভালো নয়। কিন্তু যে গৌর-পদাবলীতে নবদ্বীপ-লীলায় অথবা নীলাচললীলায় গৌরাঙ্গের স্বরূপ আঁকা হইয়াছে অর্থাৎ যেখানে বাসুদেব নিজের অভিজ্ঞতা অথবা অনুভূতি কাজে লাগাইয়াছেন সেখানে তাঁহার রচনা সার্থক হইয়াছে। যেমন, চৈতন্যের শৈশবলীলার বর্ণনা

---

[1] লোকভয়। [2] প্রেমমুগ্ধ। [3] প-ক-ত ২৮।

[4] একটি খণ্ডিত পুথিতে (স ৩৯৯) বাসুদেবের আটাত্তরটি পদ পাইয়াছি।

[5] "গৌরাঙ্গের জন্ম আদি যত যত লীলা।
বিস্তারি অশীতিপদে সকলি বর্ণিলা।" সংকীর্তনামৃত পৃ ২।

[6] "গৌরচন্দ্রজননাদিসমস্তলীলা-বিস্তারিতানি ভুবি সর্বরসানি সন্তি।
শ্রীবাসুঘোষরচিতানি পদানি যানি তান্যেব গায়ত বুধাঃ কিল কীর্তনাদৌ॥"
'শ্রীগৌরচন্দ্রের জন্ম প্রভৃতি সমস্ত লীলায় বিস্তারিত হইয়া সব রস ভুবনে রহিয়াছে। যে পদগুলি শ্রীবাসুঘোষের রচিত, হে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা, তাহা কীর্তনের আরম্ভে গান করুন।'

[7] কাল কাটাইব। [8] নটবর দাসের 'রসকলিকা'য় (ক ১১২৩) উদ্ধৃত।

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না হেরিনু।
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে।
বাসুদেব ঘোষ বলে অপরূপ শোভা
শিশু-রূপ দেখি হয় জগ-মন লোভা ॥[১]

কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া ব্রজের গোপযুবতীরা যেমন মুগ্ধ হইয়াছিল গৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়া নবদ্বীপ-যুবতীবৃন্দও অনুরূপভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল—এই ভাবের পদাবলী এখন "নদীয়ানাগরী" ছাপ পাইয়াছে। বাসুদেব ঘোষের লেখা এই ধরণের একটি পদ নিদর্শনরূপে উদ্ধৃত করিতেছি।

আজু মুই কি পেখিলু গোরা নটরায়
অসীম মহিমা গোরার কহনে না যায়।
কেমনে গঢ়ল বিধি কত রস দিয়া
ঢরঢর গোরাতনু কাঞ্চন জিনিয়া।
কত কত চাঁদ জিনি বদন কমল
রমণীর চিত্ত হরে নয়ন যুগল।
বাসুদেব ঘোষ কহে হইয়া বিভোর
সুরধুনীতীর গোরা করিল উজোর ॥[২]

চৈতন্যের সন্ন্যাসবিষয়ে একটি গাথা ধরণের দীর্ঘ গান চাটিগাঁ অঞ্চলের পুথিতে পাওয়া গিয়াছে।[৩] মনে হয় এটি বাসুদেবের গানের পরবর্তী কালে এক লোকগীতি-পরিণতি ॥

৯

বংশীবদন চট্ট চৈতন্যের প্রতিবেশী এবং বয়ঃকনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম ছকড়ি, মায়ের নাম চন্দ্রকলা। চৈতন্য নীলাচলে চলিয়া গেলে বংশীবদন শচীদেবীর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার তত্ত্বাবধান করিতেন। বংশীবদন অনেকগুলি পদ লিখিয়াছিলেন। সেগুলি প্রায় সবই বাঙ্গালায় লেখা, সহজ সরল ভাবে, অনেকটা মেয়েলি ছাঁদে। ইনি "বংশীবদন", "বংশীদাস" এবং "বংশী" এই তিন ভনিতাই ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতে আমাদের একটু অসুবিধা হইয়াছে। সপ্তদশ

[১] প-ক-ত ১১৫১। [২] গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৭২।
[৩] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত।

শতাব্দের গোড়ার দিকে বংশীদাস নামে একাধিক পদকর্তা ছিলেন। এক নামের এই কয় কবির পদ সব সময়ে পৃথক করা সম্ভব নয়।

বংশীবদনের গৌর-পদাবলীতে প্রত্যক্ষদর্শিতার প্রত্যয় অনুভূত হয়। যেমন, চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পরে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ বর্ণনা।

আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকা তিলক কাচ
আর না হেরিব সোনার কমলে
নয়নখঞ্জন নাচ।
আর না নাচিবে শ্রীবাস-মন্দিরে
ভকত চাতক লইয়া
আর কি নাচিবে আপনার ঘরে
আমরা দেখিব চাহিয়া।
আর কি দু-ভাই নিমাই নিতাই
নাচিবেন এক ঠাঁই
নিমাই করিয়া ফুকরি সদাই
নিমাই কোথাও নাই।
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ
গৌরাঙ্গ-সুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া মাঝ।
কেবা হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌর রায়
শাশুড়ী-বধূর রোদন শুনিয়া
বংশী গড়াগড়ি যায়।[১]

রাধাকৃষ্ণলীলা-বর্ণনায় বংশীবদন কোন কোন বিষয়ে ধারাবাহিক গান রচনা করিয়াছিলেন। এমনি একটি মৌলিক বিষয় হইতেছে যমুনাতীরে কদম্ব-তরুবীথিকায় অকস্মাৎ কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার আত্মবিস্মৃতি ও ভূতে পাইয়াছে বলিয়া তাহার চিকিৎসা। ঘটনা কি তাহা ঘরে আসিয়া সখীকে রাধা বর্ণনা করিতেছে।

আলো সই কি হইল মোরে প্রেমজ্বালা
মো মেনে আপনা খাইলুঁ কেনে বা যমুনা গেলুঁ
শয়নে স্বপনে দেখোঁ আঁলা।

---

[১] প-ক-ত ১৮৫৫।

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে নানা আভরণ অঙ্গে
সাধে গেলুঁ জল ভরিবারে
তেমাথা পথের ঘাট সেখানে ভুলিনু বাট
কালা মেঘে ঝাঁপ্যাছিল মোরে।
যমুনা যাইতে পথে দোসারি কদম্ব তাথে
বনচারী সে কোন দেবতা
তার গলের মালা দিতে আচম্বিতে মোর গলে[১]
সে হৈতে মরমে হৈল বেথা।
বংশীবদনে কয় যুবতি জীবার নয়
দেখিলে মরমে দেয় হানা
সে কালা কালিয়া শ্যাম কালিয়া তাহার নাম
কালিন্দী কদমতলে থানা ॥[২]

সখী গিয়া রাধার অবস্থা প্রবীণ গোপীকে জানাইল।

দিন দুই চারি নারি আঁখি মেলাইতে[৩]
তোমরা আসিয়া দেখ একি আচম্বিতে।
কেহ কিছু জানে তার পায় করোঁ সেবা
না জানিয়ে রাইয়েরে পাইয়াছে কোন দেবা।
কদম্বের তলে কিবা মূরুতি দেখিয়া
গীম[৪] মুড়ি মুড়ি রাই পড়ে মুরুছিয়া।
বংশীবদনে কয় সেইখানে নিয়ে[৫]
চাহিতে চিন্তিতে রাই পাছে বা না জীয়ে ॥[৬]

প্রবীণ গোপী (—বড়ায়ি বা পৌর্ণমাসী—) দেখিয়া বুঝিয়া প্রতিকার ব্যবস্থা করিল।

বুঝিনু ভাবিনীর ভাব নহে দৈত্য দানো
কদম্বতরুর দেবতারে কিছু মানো।
কালিয়া-কুমর[৭] বৈসে কদম্বের ডালে
সুকুমারী দেখিয়া পাইয়াছে শিশুকালে।
সব দেব হাকারি[৮] কহিলু শ্রুতিপটে
কালিয়া-কুমর নামে কাঁপি কাঁপি উঠে।
নিরবধি কালো ছায়া ফিরে সাতে সাতে
কি করিবে মণিমন্ত্র কালা-অপঘাতে।
মনে কিছু না ভাবিহ প্রাণে না মরিব
নিজ পূজা পাইলে আপনি ছাড়ি যাব।
বংশীবদনে কয় এই কথা দড়
পূজা না করিলে হবে পরমাদ বড় ॥[৯]

---

[১] এই ছত্রে পাঠবিকৃতি আছে। [২] গীতচন্দ্রোদয় পৃ ১৪৬। [৩] মেলিতে।
[৪] গ্রীবা, ঘাড়। [৫] লইয়া যাওয়া হউক, নীয়তে (সংস্কৃত)। [৬] গীতচন্দ্রোদয় পৃ ১৪৬।
[৭] কুমার। [৮] সব দেবতার নাম ডাকিয়া। [৯] গীতচন্দ্রোদয় পৃ ১৪৭।

পরবর্তী কালের অক্ষম লেখনীতে এই কাহিনীর বর্ণনায় রাধাকে ভূত-ঝাড়ানো করা হইয়াছে।

ওঝা বেজা[১] আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা
কাঁপি ঝাঁপি উঠে এই বৃষভানুসুতা।
কালা-কুমর হিরণবসন যবে পড়ে মনে
মুরছি পড়িয়া কান্দে ধরি ভূমখানে।
রক্ষা অক্ষা পড়ে মন্ত্র ধরি ধনী-চুলে
সভে বোলে আনি দেহ কালা গলার ফুলে।
চেতনা পাইয়া তবে উঠিবেক বালা
ভূতপ্রেত যাইবেক ঘুচিবে অঙ্গজ্বালা।
চণ্ডীদাস কহে তুমি যারে বোলো ভূত
শ্যামচিকণ সে নন্দের ঘরে পুত।[২]

নবানুরাগে এমন প্রেমবৈক্লব্যের ইঙ্গিত সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতায় আগেই পাওয়া গিয়াছে। ভোজদেবের সভাকবি ছিত্তপের এই প্রশস্তি-কবিতাটি তাহার উদাহরণ। বিরহিণীর অবস্থা সম্পর্কে সখীদের মধ্যে আলোচনা।

কিং বাতেন বিলম্বিতা ন ন মহাভূতার্দিতা কিং ন ন
ভ্রান্তা কিং ন ন সংনিপাতলহরীপ্রচ্ছাদিতা কিং ন ন।
তৎ কিং রোদিতি মুহ্যতি শ্বসিতি কিং স্মেরং চ ধত্তে মুখং
দৃষ্টঃ কিং কথয়াম্যকারণরিপুঃ শ্রীভোজদেবোঽনয়া।[৩]

'অপদেবতার হাওয়া লাগিয়াছে কি? না না। দুষ্ট ভূতে পাইয়াছে কি? না না। মাথা খারাপ হইয়াছে কি? না না। সন্নিপাত ব্যাধির ঝোঁক লাগিতেছে কি? না না। তবে কেন কাঁদিতেছে, মূর্চ্ছা যাইতেছে, হাঁপাইতেছে, মুখ হাসাহাসি করিতেছে? তাহা হইলে কি বলিতে পারি যে শ্রীভোজদেব মেয়েটির নজরে পড়িয়া অকারণে শত্রুতা সাধিতেছেন?'

পরবর্তী কালে কোন কোন পদাবলী-রচয়িতা এখানে কৃষ্ণকে অপদেবতা না দেখাইয়া ব্যাধ করিয়াছেন।[৪]

বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাস এবং পৌত্র শচীনন্দনদাস[৫] দুই জনেই পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন॥

১০

বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বৈষ্ণবেরা প্রতি বৎসর নীলাচলে চৈতন্য-সঙ্গমে যাইতেন। ইঁহাদের মধ্যে কুলীনগ্রামের বৈষ্ণবদের দল বেশ বড় ছিল।

---

[১] বৈদ্য। [২] গীতচন্দ্রোদয় পৃ ১৪৬।
[৩] কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় (সুভাষিতরত্নকোশ) বিরহিণীব্রজ্যা ৫০।
[৪] HBL পৃ ২৩৯ দ্রষ্টব্য। [৫] ঐ পৃ ৮৯-৯০, ২০৬ দ্রষ্টব্য।

ইহাদের কীর্তনগানের নিজস্ব সম্প্রদায় ছিল এবং তাহাদের মুখ্য ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের কবি মালাধর বসুর দুই পুত্র সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসু।[১]

রামানন্দ বেশি পদ লিখেন নাই। যাহা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে কৃষ্ণের বাৎসল্য পদাবলী আছে[২], গৌর-পদাবলীও আছে। বৈষ্ণব-পদাবলী রচয়িতাদের মধ্যে রামানন্দের স্থান খুব উঁচুতে, মুরারি গুপ্তের সঙ্গে। রামানন্দের পদরচনার উৎকর্ষের একটিমাত্র উদাহরণ দিব।

স্বপ্নমিলনের পর নিদ্রাভঙ্গে বিরহিণী রাধার খেদ একাধিক বৈষ্ণবকবি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে তিনজন উল্লেখযোগ্য[৩],—রামানন্দ বসু[৪], বংশীবদন[৫] ও জ্ঞানদাস[৬]। ইহাদের মধ্যে রামানন্দের পদটিই রচনাকৌশলে এবং মিত-ভাষিতায় শ্রেষ্ঠ।

> তোমারে কহিয়ে সখি স্বপনকাহিনী
> পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি। ধ্রু।
>
> শাঙন মাসের দে[৭] রিমি ঝিমি বরিষে
> নিন্দে তনু নাহিক বসন[৮]
> শ্যামলবরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর
> মুখ ধরি করয়ে চুম্বন।
> বোলে সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
> লাজে মুখ রহিল মোড়াই
> আপন[৯] করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
> বোলে কিনো যাচিয়া বিকাই[১০]।
> চমকি উঠিলুঁ জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
> যে দেখিনু সেহো নহে সতি[১১]
> আকুল পরাণ মোর দুনয়ানে বহে লোর
> কহিলে কে যায় পরতীতি।[১২]

---

[১] রামানন্দ যে সত্যরাজের ভাই তাহার সুনিশ্চিত প্রমাণ রহিয়াছে রামগোপালদাসের 'চৈতন্য-তত্ত্বসার' নিবন্ধে (সাহিত্যসভার পুথি, পৃ ৬ খ),—"রামানন্দ সত্যরাজ হএন দুই ভ্রাতা।"

[২] স ৯৬, ৯৯।

[৩] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাবিরহের প্রথম পদটিকে ধরিলে চারজন।

[৪] গীতচন্দ্রোদয় পৃ ২৬১, প-ক-ত ১৪৫। [৫] গীতচন্দ্রোদয় পৃ ২৬১।

[৬] প-ক-ত ১৪৪। পদরত্নাকরে ইহা বলরামের ভনিতায় আছে। পদরত্নাকর (পদকল্পতরু, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড পৃ ১০২) দ্রষ্টব্য।

[৭] দেব, আকাশ। [৮] নিদ্রায় (অচেতন বলিয়া) অঙ্গের বসন স্থানভ্রষ্ট। [৯] নিজেকে।

[১০] বলিতেছিল,—আমাকে কিনিয়া লও, আমি আপনাকে বিকাইতে আসিয়াছি।

[১১] সত্য। [১২] প্রতীতি, নিশ্চয়বোধ।

কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিণী
কত রঙ্গভঙ্গিমা চালায়
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইলে তায়[১]।

বংশীবদনের পদ আগে কিংবা পরে লেখা হইতে পারে, সম্ভবত পরে। কিন্তু রামানন্দের রচনা ইঁহার জানা ছিল না। কিন্তু বলরামদাস ও জ্ঞানদাসের সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। বংশীবদনের পদটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

কি পেখিনু নিশির স্বপনে
এক পুরুষবর তনু নব জলধর
হাসিয়া করয়ে আলিঙ্গনে। ধ্রু।
শরদ-পূর্ণিমা চান্দ জিনিয়া বদন-ছান্দ
মোর ঘরে করিয়া প্রবেশে
মধুর মধুর বোলে যৈছন অমিয়া ঝরে
মুখে মুখ দিয়া পুন হাসে।
নবীন তুলসীদাম গাঁথা অতি অনুপাম
আজানুলম্বিত গলে দোলে
মাথায় বিনোদ চূড়া মালতীমালায় বেড়া
শিখিপুচ্ছ ঝলমল করে।
কপালে চন্দন-চাঁদ কামিনীমোহন ফাঁদ
ভূষণে ভূষিত সব অঙ্গ
বংশীবদনে বোলে অনেক ভাগ্যেতে মিলে
এই ব্রজে নবীন অনঙ্গ॥

এই স্বপ্নসমাগম মোটিফ (motif) আগেই সংস্কৃত কবিতায় দেখা দিয়াছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষের কবি বসুকল্পের এই কবিতাটি তাহার প্রমাণ। নায়কের কাছে দূতীর নিবেদন।

বপুঃ সারঙ্গাক্ষ্যাস্তদবিরলরোমাঞ্চনিচয়ং
ত্বয়ি স্বপ্নাবাপ্তে স্নপয়তি পরঃ স্বেদবিসরঃ।
বলাকর্ষত্রুট্যদ্‌বলয়জকড়ংকারনিনদৈর্
বিনিদ্রায়াঃ পশ্চাদনবরতবাষ্পাম্বুনিবহাঃ॥[২]

'তোমাকে স্বপ্নে পাইলে হরিণ-আঁখির দেহ ঘন রোমাঞ্চে কণ্টকিত হইয়া উঠে আর প্রচুর ঘর্মস্রাব যেন স্নান করাইয়া দেয়। জোরে টানিতে গিয়া স্খলিত বলয়ের ঝঙ্কার-শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পর অনবরত চোখের জল ঝরিতে থাকে।'

---

১ কেন বিধাতা সে আনন্দ হইতে জাগাইয়া দিল। পাঠান্তর "কি লাগি চিয়ায় বিধাতায়"।
২ কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় (সুভাষিতরত্নকোশ) দূতীবচনব্রজ্যা ৮।

অবশ্য বসুকল্পের অনেক কাল আগে কালিদাস উমার তপস্যা প্রসঙ্গে কুমার-সম্ভবে এ ব্যাপার ভালো করিয়াই লিখিয়া গিয়াছিলেন।

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগ্
অসত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা ॥

'রাত্রির তিন প্রহর যখন কাটিয়া গিয়াছে তখন (আমার সখী, পার্বতী) একটিবার চক্ষু বুজিয়া অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। "নীলকণ্ঠ, কোথাও যাও"—এই কথা অস্ফুটভাবে বলে, (আর) যে নাই তাহার যেন গলা জড়াইয়া ধরে।'

১১

পরবর্তী কালে কীর্তন-পালাগানে উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ার জন্য, নামসাম্যের দরুন, অথবা অন্য বিবিধ কারণে চৈতন্যের সমসাময়িক ও ভক্ত কোন কোন পদকর্তার রচনা সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে হারাইয়া গিয়াছে। অথচ তাঁহাদের কাহারও কাহারও খ্যাতি সপ্তদশ শতাব্দ পর্যন্ত জাগিয়া ছিল।

এইরকম পদকর্তাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করা যায় গোবিন্দ আচার্যের। ইহার সম্বন্ধে মাধবদাস বৈষ্ণববন্দনায়[১] লিখিয়াছেন

গোবিন্দ আচার্য পদ করিল বন্দন
রাধাকৃষ্ণরহস্য[২] যে করিল বর্ণন।

রামগোপাল দাসের রসকল্পবল্লীতে গোবিন্দ আচার্যের এই দুইটি ধুয়া-পদ উদ্ধৃত আছে। প্রথমটি রাধার উক্তি, দ্বিতীয়টি সখীর।

ঘন মেঘ বরিষয়ে বিজুরি ললপে
তাহা দেখি প্রাণ মোর থরহরি কাঁপে।
ছোড় ছোড় অঞ্চল নিলাজ মুরারি
লাজ নাহি তোর অঙ্গে হাম পরনারী ॥

তোড়লি কাঁচলি ছিঁড়লি হার
নখে রে[৩] বিদারলি পযোধর-ভার।
তা সঞে ধামালি করহ বনয়ারি
তুহুঁ চঞ্চল বড় সো তৈছে নারী ॥

নিম্নে উদ্ধৃত চৈতন্যবন্দনা পদটি এমন এক গোবিন্দের রচনা যিনি চৈতন্যের সাক্ষাৎ ভক্ত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এটি আমি গোবিন্দ আচার্যের রচনা বলিয়াই গ্রহণ করিতেছি।

[১] শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত (১৩১৭) পৃ ২০। [২] অর্থাৎ গোপন প্রেমলীলা। [৩] 'নখরে'?

হরি হরি বড় দুখ রহল মরমে
গৌরকীর্তনরসে জগজন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই
দীনহীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই।
হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে
না ভজিলাম হেন অবতার
দারুণ বিষয়বিষে সতত মজিয়া রৈনু
মুখে দিনু জ্বলন্ত অঙ্গার।
এমন দয়ালু দাতা আর না পাইব কোথা
পাইয়া হেলায় হারাইনু
গোবিন্দদাসিয়া কয় অনলে পুড়িল নয়
সহজেই আত্মঘাতী হৈনু।[১]

নীচের পদটিও গোবিন্দ আচার্যের রচনা বলিয়া মনে করি। কৃষ্ণের মিলন-প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া শেষে হতাশ হইয়া রাধা ব্যর্থ প্রেমের অনুতাপ করিতেছে।

রসের হাটে বিকে আইলাঙ সাজিঞা পসার,
গাহক নহিল রে যৌবন ভেল ভার।
বড় দুঃখ পাই সখি বড় দুঃখ পাই,
শ্যাম-অনুরাগে নিশি কান্দিয়া পোহাই।
অরাজক দেশে রে জনম দুরাচার,
আপন-ইচ্ছায় লুটে দোহাই দিব কার।
বসন্ত দুরন্ত বাত অনলে পোড়ায়,
চন্দ্রমণ্ডল হেরি হিয়া চমকায়।
মাতল ভমরা রে রস মাগে তায়,
লুকাইতে নাহি ঠাঞি শিখি দরশায়[২]।
দারুণ কোকিল প্রাণ নিতে চায়,
কুহু কুহু করিয়া মধুর গীতি গায়।
তোলা-বিকে সব গেল[৩] বহি গেল কাজ,
যৌবনের সঙ্গে গেল জীবন বেয়াজ।
ফুলশরে জরজর হিয়া চমকায়,
গোবিন্দদাসের তনু ধরণী লোটায়।[৪]

পরমানন্দ গুপ্ত কিছু গৌর-পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারই অল্পবয়স্ক সমসাময়িক পরমানন্দ সেন "কবি-কর্ণপূর" সাক্ষ্য দিয়াছেন[৫]। হয়ত জয়ানন্দ এই পদগুলিকেই 'গৌরাঙ্গবিজয়' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৬] পদ-

---

১ কীর্তনগীতরত্নাবলী ৮৮৪।
২ আগুন দেখা যায়।
৩ ওজন করিয়া বিক্রয়ে বস্তু সব গেল।
৪ রসমঞ্জরী পৃ ২৫-২৬।
৫ "পরমানন্দগুপ্তো যৎকৃতা কৃষ্ণস্তবাবলী" গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৯০।
৬ পৃ ৩৭৩ পাদটীকা ৩ দ্রষ্টব্য।

কল্পতরুতে সংকলিত ছয়টি পদের মধ্যে পাঁচটি[১] পরমানন্দ গুপ্তের আর একটি[২] রূপ গোস্বামীর শিষ্য পরমানন্দ ভট্টাচার্যের রচনা বলিয়া মনে করি।[৩]

কাশীতে এক "কীর্তনিয়া" পরমানন্দ ছিলেন। ইনি চন্দ্রশেখরের বন্ধু। চৈতন্য বৃন্দাবন গমনাগমন-মুখে কাশীতে কিছু দিন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন তিনি পরমানন্দের গান শুনিতেন।[৪] সনাতন যখন কাশীতে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন তখন তাঁহারা চারজনে মিলিয়া এই পদে নাম-সংকীর্তন করিতেন

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ-যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥[৫]

এই পরমানন্দ সম্ভবত তিরহুতিয়া ছিলেন, বাঙ্গালী পদকর্তা নন। পদকর্তা (?) পরমানন্দ গুপ্তকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ-শাখার মধ্যে ধরিয়াছেন। ইঁহার গৃহে নিত্যানন্দ কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন ॥

১২

মুখ্য চৈতন্য-অনুচরদের শিষ্য-ভক্তেরা কেহ কেহ পদাবলী-রচনায় অনুরাগ ও নিষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ-ভক্তেরাই প্রধান। চৈতন্যের কাছ হইতে চলিয়া আসিবার পর কয়েক বছর ধরিয়া নিত্যানন্দ ভক্তশিষ্য লইয়া নবদ্বীপ শান্তিপুর অম্বিকা ইত্যাদি গঙ্গাতীরবর্তী স্থানে বিহারচ্ছলে নাম প্রচার করিতে থাকেন। তখন তিনি মুখ্যভাবে সখ্যরসাশ্রিত। তিনি বলরামের মত বেশ ধারণ করিতেন এবং তাঁহার বিশিষ্ট অনুচরেরাও (—যাঁহারা পরে "দ্বাদশ গোপাল" নামে বন্দিত হইতে থাকেন—) গোপবালকের বেশ ও ধরণধারণ অনুকরণ করিতেন।[৬] পদাবলীতে সখ্যভাবের প্রবাহ নিত্যানন্দের প্রভাবেই আসিয়াছিল। বাৎসল্য-ভাবের পদাবলী যিনি সর্বাগ্রে লিখিয়াছিলেন সেই বাসুদেব ঘোষও নিত্যানন্দের সঙ্গী ছিলেন। বাসুদেবের পরে যাঁহারা বাৎসল্যভাবের পদাবলী লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক বিশিষ্ট ছিলেন

---

[১] ১৮৩, ১৫৮৫, ২৮৫৮, ২৮৭১, ২৯৭৪। [২] ২৯০৬। [৩] HBL পৃ ৪৬৬।

[৪] "পরমনন্দ কীর্তনীয়া শেখরের সঙ্গী
প্রভুকে কীর্তন শুনায় অতি বড় রঙ্গী ॥" চৈতন্যচরিতামৃত ২. ২৫।

[৫] চৈতন্যচরিতামৃত ২. ২৫।

[৬] "নিত্যানন্দ-গণ যত সব ব্রজের সখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা ॥" চৈতন্যচরিতামৃত ১. ১১।

বলরামদাস। ইনি নিত্যানন্দের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। বলরামদাস নামে পরে একাধিক পদকর্তার সন্ধান পাওয়া গেলেও যিনি এই নামধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।[১] বলরাম বাস করিয়াছিলেন আধুনিক বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে দোগাছিয়া (দোগেছে) গ্রামে।

বলরাম বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি দুই ভাষাছাঁদেই পদ লিখিয়াছিলেন, তবে ব্রজবুলি পদের তুলনায় বাঙ্গালা পদগুলি অনেক ভালো। চৈতন্য ও নিত্যানন্দ বিষয়ে যে পদ তিনি লিখিয়াছিলেন সেগুলিতে হৃদয়ের স্পন্দন অনুভূত হয়। একটি পদে বলরাম পরবর্তী কোন কোন বৈষ্ণব লেখককে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া মনে করি। নরোত্তমদাস ও আরও কোন কোন বৈষ্ণব কবি চৈতন্য-নিত্যানন্দের প্রেমধর্ম প্রচার ব্যাপারের বর্ণনায় হাটে কেনা-বেচার রূপক অবলম্বন করিয়াছেন। বলরামদাস একটি নিত্যানন্দ-বন্দনা পদের এই "হাট-পত্তন" রূপক সর্বাগ্রে ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইতেছে। পদটি[২] উদ্ধৃত করিতেছি।

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়
মথিয়া সকল তন্ত্র হরিনাম-মহামন্ত্র
করে ধরি জীবেরে বুঝায়। ধ্রু।
অচ্যুত-অগ্রজ নাম মহাপ্রভু বলরাম
সুরধুনীতীরে কৈল থানা[৩]
হাট করি পরিবন্ধ[৪] রাজা হৈল নিত্যানন্দ
পাষণ্ডদলন বীরবানা[৫]।
পসারী[৬] শ্রীবিশ্বম্ভর সঙ্গে লয়্যা গদাধর
আচার্য চত্বরে[৭] বিকে কিনে
গৌরীদাস হাসি হাসি রাজার নিকটে বসি
হাটের মহিমা কিছু শুনে।

---

[১] "বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় অধিক উন্মাদী।" চৈতন্যচরিতামৃত ১. ১১।
"সঙ্গীতকারক বন্দোঁ বলরামদাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁর অধিক বিশ্বাস।" দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনা।
বলরামদাসের সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদিত (১৯৫৬) 'বলরাম দাসের পদাবলী'র 'পূর্বাভাষ' দ্রষ্টব্য।

[২] ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ২৫. ২।

[৩] আস্তানা, আড্ডা।

[৪] হাট পত্তন করিয়া।

[৫] পতাকা।

[৬] আড়তদার।

[৭] পাঠান্তর "চত্বরে"।

পাত্র রামাই লঞা রাজা আজ্ঞা ফিরাইয়া[১]
কোটাল[২] হইলা হরিদাস
কৃষ্ণদাস হৈলা দাড়া[৩] কেহ যাইতে নারে ভাঁড়া[৪]
লিখয়ে পড়য়ে শ্রীনিবাস[৫]।
বলরামদাসে বোলে অবতার কলিকালে
জগাই মাধাই হাটে আসি
ভাণ্ড হাতে ধনঞ্জয় ভিক্ষা মাগিয়া লয়
হাটে হাটে ফিরয়ে তপাসি[৬] ॥

নিত্যানন্দের ভক্ত বলরাম যে নীচে উদ্ধৃত বন্দনা-পদটির রচয়িতা তাহা নিঃসন্দেহ।

গজেন্দ্রগমনে যায় সকরুণ দিঠে চায় পদভরে মহী টলমল
মহামত্ত সিংহ জিনি কম্পমান মেদিনী পাষণ্ডিগণ শুনিয়া বিকল।
আয়ত অবধূত করুণার সিন্ধু
প্রেমে গরগর মন করে হরিসংকীর্তন পতিতপাবন দীনবন্ধু। ধ্রু।
হুঙ্কার করিয়া চলে অচল সচল নড়ে প্রেমে ভাসে অমরসমাজ
সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ খেলন রঙ্গে অলখিত করে সব কাজ।
শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ অবতারী নারায়ণ যার অংশ-কলায় গণন
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের হিতকর্তা সেই রাম রোহিণীনন্দন।
যার লীলা-লাবণ্যধাম আগমনিগমে গান যার রূপ মদনমোহন
এবে অকিঞ্চন বেশে ফিরে পঁহু দেশে দেশে উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন।
ব্রজের বৈদগ্ধি সার যত যত লীলা আর পাইবারে যদি থাকে মন
বলরামদাসে কয় মনোরথ সিদ্ধ হয় ভজ ভাই শ্রীপাদচরণ ॥[৭]

রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনায় বলরামদাস আপনার হৃদয়াবেগ সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য পদকর্তাদের মধ্যে তাঁহার স্থান সুনির্দিষ্ট। রূপানুরাগের ও রসোদ্গারের বর্ণনায় বলরামদাস অসংশয়িত কৃতিত্বের অধিকারী। নিম্নে উদ্ধৃত পদটি বাঙ্গালায় লেখা শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার মধ্যে একটি।

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম
মুরতি মরকত-অভিনব কাম।
প্রতি-অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে।
মলুঁ মলুঁ কিবা রূপ দেখিলুঁ স্বপনে
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে।
অরুণ-অধর মৃদু মন্দ-মন্দ হাসে
চঞ্চলনয়নকোণে জাতিকুল নাশে।

---

[১] অর্থাৎ ঢেঁঢরা দিয়া। [২] চৌকিদার। [৩] "দ্বার্যা" (অর্থাৎ দৌবারিক) স্থানে ভ্রান্ত পাঠ। [৪] ঠকাইয়া। [৫] অর্থাৎ শ্রীবাস গোমস্তা। [৬] ঢুঁড়িয়া। [৭] গীতচন্দ্রোদয় পৃ ২৭-২৮।

দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু-ভঙ্গি
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী।
মন্থর চলনখানি আধ আধ যায়
পরাণ যেমন করে কি কহিব কায়।
পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে
বলরামদাসে কয় অবশ পরশে।[১]

বাৎসল্যভাবের পদাবলীতেও বলরামদাস অনেক বৈষ্ণব কবিকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন।[২] উদাহরণরূপে একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে
বন কত অতিদূর নব-তৃণ-কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে।
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন
নব-তৃণাঙ্কুর-আগে রাঙ্গা পায়ে জনি লাগে
প্রবোধ না মানে মোর মন।
নিকটে গোধন রাখ্য মা বল্যা শিঙ্গায় ডাক্য
ঘরে থাকি শুনি যেন রব
বিধি কৈলা গোপ-জাতি গোধন-পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই যাদব।
বলরামদাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়
চরণের বাধা[৩] লইয়া দিব মোরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিল নিশ্চয়।[৪]

১৩

জ্ঞানদাসকে নিত্যানন্দের গণ বলিয়া ধরা হইলেও আসলে ইনি ছিলেন জাহ্নবা দেবীর অনুচর। নিত্যানন্দের তিরোধানের বেশ কিছুকাল পরে জাহ্নবা ব্রজধামে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পরিজনের মধ্যে জ্ঞানদাসও ছিলেন।

"জ্ঞানদাস" (ও "জ্ঞান") ভনিতায় অনেক পদ মিলিয়াছে।[৫] জ্ঞানদাস নাম তখন এবং পরেও অনেকের নিশ্চয়ই ছিল। এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ না

---

[১] প-ক-ত ১৪৬। [২] সম্ভবত রামানন্দ বসু ছাড়া। [৩] জুতা। [৪] প-ক-ত ১২১৮।
[৫] সাহিত্যসভার পুথি, খণ্ডিত তবে জ্ঞানদাসের পদাবলীর সবচেয়ে পুরানো পুথি।

কেহ পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এ নামে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে ধরা যাইতেছে না এবং পদগুলির মধ্যে দ্বিতীয় লেখনীর নিশ্চিত পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং আপাতত জ্ঞানদাস-নামিত সমস্ত পদই একজনের উপর চাপাইতে হয়। ব্রজবুলি এবং বাঙ্গালা দুই ভাষারীতিতেই পদ পাওয়া গিয়াছে। চৈতন্যনিত্যানন্দ-বন্দনা ও বাৎসল্য-পদাবলী দুইই আছে। তবে বাৎসল্য-পদাবলী গতানুগতিক।[১]

পদাবলীর কবি বলিয়া জ্ঞানদাসের খ্যাতি চণ্ডীদাসের পরেই। সে খ্যাতির কারণও আছে। একই ভাবের পদ দুই নামেই পাওয়া গিয়াছে। কৃতিত্ব কাহার তা লইয়াই বিবাদ। বলরামদাসের দুইচারটি ভালো পদের প্রতিধ্বনি জ্ঞানদাসের পদে আছে। রামানন্দ বসুর অনুসরণও আছে।[২] যেমন এই স্বপ্নসমাগম পদটি। ভাষায় ব্রজবুলির মিশ্রণ লক্ষ্য করিতে হইবে।

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা শুন শুন পরানের সই
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামলবরণ দে[৩] তাহা বিনু আর কারো নই।
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া[৪] গরজন রিমিঝিমি শবদে বরিষে
পালঙ্কে শয়নরঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে।
শিখরে শিখণ্ডরোল মত্ত দাদুরী-বোল কোকিল কুহরে কুতূহলে
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে স্বপন দেখিনু হেন কালে।
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ শ্রবণে ভরল সেই বাণী
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত ধিক্ রহু কুলের কামিনী।
রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা যিনি ইন্দু মালতীর মালা গলে দোলে
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে আমা কিন বিকাইলুঁ বোলে।
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণভূষিত অঙ্গ কাম মোহে নয়নের কোণে
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয় ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে।
রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল অধরে অধর পরশিল
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥

পদটি পদরত্নাকরে বলরামদাসের ভনিতায় পাওয়া যায়। সেখানে অনেক স্থানেই পাঠ উন্নততর।[৫] তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্র নাই, অতিরিক্ত আছে শেষ দুই ছত্র।

---

[১] শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'যশোদার বাৎসল্যলীলা' (১৯৪০) পালাবন্দি রচনা, অত্যন্ত বর্ণহীন।

[২] আগে পৃ ৪২০ দ্রষ্টব্য। [৩] দেহ। [৪] (ইন্দ্র) দেব অর্থাৎ মেঘ।

[৫] যেমন, "ডাহুকিনী ঘন গাজে" (ছত্র ৬), "হৃদয়ে" স্থানে "নয়নে" (ঐ ৭), "ভাবিয়া সে রীত" (ঐ ৮)।

অঙ্গ অবশ ভেল 	লাজ ভয় মান গেল 	জলদে বিজুরি আগোরল।
কি করিব সখি আর 	অঙ্গ পরশিতে তার 	আনন্দে হইনু অগেয়ান
বলরামদাস রটে 	সেজন তোমার বটে 	ইথে কিছু না ভাবিহ আন।

তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রে রামানন্দ বসুর অনুসরণ সুস্পষ্ট।

জ্ঞানদাসের আর একটি ভালো পদের সমস্যা উপস্থাপিত করিতেছি।

মনের মরম কথা শুন লো সজনি
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবসরজনী।
কিবা রূপে কিবা গুণে মন মোর বান্ধে
মুখে না নিঃসরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে।
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব।
কোন বিধি নিরমিল কুলবতী বালা
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা।
জ্ঞানদাস কহে মুঞি কারে কি বলিব
বন্ধুর লাগিয়া আমি সাগরে পশিব।[১]

এই পদের প্রথম দুই ছত্র ধুয়া-পদ রূপে রসিকমঙ্গলে উদ্ধৃত আছে,

আমার মনের কথা শুন লো সজনি
শ্যামনাগর পড়ে মনে দিবসরজনী।

পদটির যে পাঠান্তর ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে সংকলিত আছে তাহাতে জ্ঞানদাসের ভনিতা তো নাইই, কোন ভনিতার স্থানও নাই। দুইটি ছত্র বেশি আছে। এই পাঠ সমগ্র উদ্ধৃত করিবার যোগ্য।

কিবা রূপে কিবা গুণে মোর মন বান্ধে
মুখেতে না স্ফুরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে।
মনের মরম কথা শুন লো সজনি
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবসরজনি। ধ্রু।
কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা।
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব।
ঘর হৈতে বাহির বাহির হৈতে ঘর
দেখিবারে করি সাধ নহি স্বতন্তর।

---

[১] পদামৃতসমুদ্র পৃ ৪১৩-১৪।

সখি সেই সে করিব
কানুর পিরীতি লাগি সাগরে মরিব।[১]

জ্ঞানদাসের (এবং বলরামদাসের) ভালো ভালো পদগুলিতে যাহাকে বলে মেমোরেবল্ লাইন্‌স্ অর্থাৎ মনোগুঞ্জরণীয় ছত্র তা কিছু আছে। যেমন

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান[২]

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি-অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।[৩]

জ্ঞানদাসের ব্রজবুলি পদে বিদ্যাপতির অনুসরণ চেষ্টা আছে। যেমন

অবনত-বয়নী না কহে কছু বাণী, পরশিতে তরসি[৪] ঠেলই পিয়-পাণি।
সুচতুর নাহ করয়ে অনুরোধ, অভিমানী রাই না মানয়ে বোধ।
পিরীতি বচন কছু কহল বিশেষ, রাইক হৃদয়ে দেখল রসলেশ।
পহিরণ[৫] বাস ধরল যব হাত, তব ধনী দিব[৬] দেওল নিজ মাথ।
রস পরসঙ্গে করয়ে বহু রঙ্গ, নিজ পরথাব[৭] নামে দেই ভঙ্গ।
নাহক আদর বহুত বাঢ়ায়, জ্ঞানদাস কহে এত না জুয়ায়।[৮]

হালকাভাবে লেখা বাঙ্গালা পদগুলি চণ্ডীদাসি রীতি স্মরণ করায়, লোচন-দাসের রচনাও মনে পড়ায়। যেমন

শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু ভুলিয়া পিরীতি কৈনু
পিরীতি বিচ্ছেদে সহন না যায় ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু।
সই পিরীতি দোসর ধাতা[৯]
বিধির বিধান সবে করে আন না শুনে ধরম কথা। ধ্রু।
সবাই বোলে পিরীতি-কাহিনী কে বলে পিরীতি ভাল
শ্যাম নাগরের পিরীতি ঘুষিতে পাঁজর খসিয়া গেল।
পিরীতি মিরিতি[১০] তুলে তোলাইনু[১১] পিরীতি গুরুয়া ভার
পিরীতি বিয়াধি যারে উপজয় সে বুঝে না বুঝে আর।[১২]
কেন হেন সই পিরীতি করিনু দেখিয়া কদম্বতলে
জ্ঞানদাসে কহে এমন পিরীতি ছাড়িলে কাহার বোলে॥[১৩]

---

[১] ৪. ৫। [২] প-ক-ত ১২৩। [৩] ঐ ৭৮৪।
[৪] ত্রস্ত হইয়া [৫] পরিধান। [৬] দিবা
[৭] প্রস্তাব [৮] ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ৮. ১৫ [৯] বিধাতার প্রতিদ্বন্দ্বী।
[১০] মৃতি অর্থাৎ মৃত্যু। [১১] দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিলাম। [১২] অপর ব্যক্তি।
[১৩] ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ১. ৯৫। পদকল্পতরুর পাঠ ভালো নয়।

জ্ঞানদাসের রচনা বলিয়া একটি ছোট বৈষ্ণব-আগম নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল।[১] নাম 'ভাগবততত্ত্বলীলা' বা 'ভাগবতোত্তর'। নিবন্ধটি আবার "যুগলের দাস" ভনিতায়ও পাইয়াছি।[২] জ্ঞানদাসের রচনা না হওয়া সম্ভব।

১৪

বৃন্দাবনদাস নামে একাধিক বৈষ্ণব গ্রন্থকার ও পদকর্তা ছিলেন।[৩] তাঁহাদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে প্রাচীন তিনি চৈতন্যভাগবতের রচয়িতা। বৃন্দাবন-দাস-ভনিতার পদগুলি সব একাকার হইয়া গিয়াছে। তবে আভ্যন্তরীণ প্রমাণে চৈতন্যভাগবত-রচয়িতার পদ বলিয়া কোন কোনটি চিনিতে পারা যায়। যেমন নীচের নিত্যানন্দ-বন্দনা পদটি।

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার, পতিত-উদ্ধার লাগি দু-বাহু পসার।
গদগদ মধুর মধুর আধ বোল, যারে দেখে তারে প্রেমে ধরি দেই কোল।
ডগমগ নয়ন ঘুরয়ে নিরন্তর, সোনার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর।
দয়ার ঠাকুর নিতাই পরদুঃখ জানে, হরিনাম-মালা গাঁথি দিল জগজনে।
পাপ পাষণ্ডী যত করিলা দমনে, দীনহীন জনে কৈল প্রেমবিতরণে।
আহা শ্রীগৌরাঙ্গ বলি পড়ে ভূমিতলে, শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে।
বৃন্দাবনদাস এই মনে বিচারিল, ধরণী উপরে কিবা বিজুরী পড়িল।[৪]

১৫

নিত্যানন্দের আরও কয়েকজন ভক্ত অল্পস্বল্প বা এক আধটি পদ রচনা করিয়াছিলেন। কুমারহট্ট-বাসী সদাশিব কবিরাজ ও তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তম দুই জনেই নিত্যানন্দ-অনুচর ছিলেন। ভাগবতের কতকগুলি শ্লোক গাঁথিয়া পুরুষোত্তম বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলীর ধরণে 'হরিভক্তিতত্ত্বসারসংগ্রহ'[৫] সংকলন করিয়াছিলেন। শেষে সংকলয়িতা এই আত্মপরিচয় দিয়াছেন,

পুরুষোত্তম-শর্মা শ্রীসদাশিব-তনূভবঃ।
রত্নগর্ভসমুদ্ভূতঃ খলিকালী-নিবাসভূঃ।

"পুরুষোত্তম শর্মা শ্রীসদাশিবের ঔরসজাত ও রত্নার গর্ভসম্ভূত। নিবাসভূমি খলিকালী।'

তাহার পরে যাহা লেখা আছে তাহাতে বুঝি যে মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে বইটি সংকলিত হইয়াছিল। এবং তখন নিত্যানন্দ বর্তমান ছিলেন।

---

১ প্রদীপ ১৩১০ পৃ ২৬৮-৭১ (ব্রজসুন্দর সান্ন্যালের 'শিবরহস্য' প্রবন্ধ) দ্রষ্টব্য। ২ স ১৬৫
৩ HBL পৃ ৩১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। ৪ গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৯৭।
৫ হরিদাস দাস প্রকাশিত (গৌরাব্দ ৪৬৯)।

কৃতাবতারৌ স্থিতয়ে ধর্মস্ত জগদীশ্বরৌ ।
কলৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ মদীশ্বরৌ ।
যদ্বিদং সর্বমাখ্যাতং তদেব সুমহাত্মসু ।
শ্রীনিত্যানন্দ-দেহেষু ঘটতে নান্যদেহিষু ।
নিত্যানন্দ-পদদ্বন্দ্বমকরন্দমধুব্রতাঃ ।
তেষাং দাসানুদাসোঽসৌ পুরুষোত্তমশর্মকঃ ।

'ধর্মের স্থিতির জন্য কলিকালে জগদীশ্বর মৎপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাহা কিছু সব বর্ণিত হইল তাহা পরমমহিমাময় শ্রীনিত্যানন্দের দেহেই ঘটিতে দেখা যায়, আর কোন ব্যক্তির দেহে নয়। নিত্যানন্দের পদদ্বয়ের মধুপানে যাঁহারা মৌমাছির মতো তাঁহাদের দাসানুদাস এই (লেখক) পুরুষোত্তম শর্মা।'

পুরুষোত্তম-ভনিতায় যে পদগুলি পাওয়া গিয়াছে সেগুলি প্রধানত ইহারই রচনা বলিয়া অনুমান করি।[১] আশ্চর্যের বিষয় পুরুষোত্তমের ভনিতায় চৈতন্য-বন্দনা পদ দেখি নাই।

পুরুষোত্তমের পুত্র কানুরাম (কানুদাস)[২] কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে এই নামে একাধিক ব্যক্তি পদ লিখিলেও কোন্ কোন্ পদ ইহার তাহা বাছিয়া নেওয়া কঠিন নয়। ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে যে নিত্যানন্দ-বন্দনা পদটি আছে[৩] তাহা মনে হয় ইহার রচনা।

পুরুষোত্তমের আর এক শিষ্য দেবকীনন্দন[৪] কয়েকটি পদ লিখিলেও বিখ্যাত হইয়া আছেন দীর্ঘতর রচনা 'বৈষ্ণববন্দনা'র জন্য। কবিতাটি এখনও ভক্ত বৈষ্ণবের নিত্যপাঠ্য। দেবকীনন্দনের পদ অধিকাংশ চৈতন্য-বন্দনা।

পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দের একজন বড় ভক্ত ছিলেন। বংশবিস্তার বইটিতে ইহাকে মল্লভূমবাসী এবং মল্লিক-উপাধিক বলা হইয়াছে।

নদীপার নিকটস্থ এক মহাশয়
পরমেশ্বর দাস মল্লিক নাম হয়।
নিত্যানন্দ-গণ তিহঁ সবংশ সহিতে[৫]

পরমেশ্বরদাস-ভনিতায় দুইটি পদ ইহার রচনা বলিয়া মনে করি।[৬] এই ভনিতার অপর পদগুলিও ইহার রচনা হইতে কোন বাধা নাই। নিম্নে উদ্ধৃত পদটিতে তথাকথিত "চণ্ডীদাসি সুর" পাই।

আর কি শ্যামের বাঁশি কুলের ধরম থোবে
নাম ধরি ডাকে বাঁশি বেকত হবে কবে।

---

[১] HBL, পৃ ৫৯-৬০। [২] ঐ পৃ ৮৪-৮৭। [৩] ১০, ২। [৪] HBL পৃ ৪৮-৪৯।
[৫] পুথি পৃ ৩৫খ। [৬] HBL পৃ ৯০-৯১।

নিষেধ না মানে বাঁশি সদা করে ধ্বনি
বাহির-দুয়ারে কান পাতে ননদিনী।
ননদী জঞ্জাল বড় অন্তর-বিষাল
আসিঞা ঘরের মাঝে পাতিবে জঞ্জাল।
যে দেশের বাঁশিয়া বটে সে দেশে মানুষ নাই
রাধারে বধিতে বাঁশি এনেছে কানাই।
পরমেশ্বরদাসে কয় শুন রসবতী
বাঁশির কোন দোষ নাক্রি কালিয়ার দুর্গতি।

আত্মারাম-ভনিতায় একটি ও আত্মারামদাস-ভনিতায় দুইটি পদ পাওয়া গিয়াছে।[১] পদগুলি নিত্যানন্দ-ভক্ত আত্মারামদাসের রচনা বলিয়া মনে হয়। নিত্যানন্দের আর এক ভক্ত আচার্য-চন্দ্রের একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। পদটি নিত্যানন্দ-বন্দনা।[২]

"দ্বিজ" গঙ্গারামের একটি নিত্যানন্দ-বন্দনা ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে সংকলিত আছে। মনে হয় কবি নিত্যানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন।

চন্দ্রশেখরদাসের তিনটি বাঙ্গালা পদের মধ্যে দুইটি চৈতন্য-বন্দনা।[৩] মনে হয় যে রচয়িতা চৈতন্যের সাক্ষাৎ-ভক্ত অথবা চৈতন্য-অনুচরের ভক্ত ছিলেন।

অদ্বৈত আচার্যের দুইজন শিষ্য ছিলেন অনন্ত নামে। একজন অনন্তদাস আর একজন অনন্ত আচার্য।[৪] অনন্ত আচার্যের ভনিতায় একটি পদ মিলিয়াছে,[৫] অনন্তদাসের ভনিতায় অনেকগুলি। "রায় অনন্ত" ভনিতায়ও দুইটি পদ পাই।[৬] অনন্তদাসের পদগুলি সব ব্রজবুলিতে লেখা। নিম্নে উদ্ধৃত পদটি প্রায় সব প্রাচীন পদসংগ্রহে সঙ্কলিত আছে।

বিকচ সরোজ ভান মুখমণ্ডল দিঠি-ভঙ্গিম নট-খঞ্জন জোর
কিয়ে মৃদু-মাধুরি হাস উগারই পী পী আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর।
বরনি না হয় রূপ বরণচিকনিয়া
কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুবলয়-দল কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া।
অঙ্গদ বলয় হার মণিকুণ্ডল চরণে নূপুর কটি-কিঙ্কিণী-কলনা
অভর-বরণ-কিরণে অঙ্গ ঢর-ঢর কালিন্দীজলে যৈছে চাঁদকি চলনা।
কুঞ্চিত কেশ বেশ কুসুমাবলি শির পর শোভে শিখি-চাঁদকি ছাঁদে
অনন্তদাস পহুঁ অপরূপ-লাবণি সকল যুবতি-মন পড়ি গেও ফাঁদে।

[১] HBL পৃ ৯১-৯২। একটি ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে ও পদকল্পতরুতে, এবং দুইটি শুধু পদকল্পতরুতে আছে। পদকল্পতরুর একটি পদ (২৪৯৪) ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে "দ্বিজ" গঙ্গারামের ভনিতায় আছে। [২] HBL, পৃ ২১১ দ্রষ্টব্য। [৩] ঐ পৃ ৩৯৫-৯৭।

[৪] HBL পৃ ৭৩-৭৪। ইনি কিংবা আর এক অনন্ত আচার্য গদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত দেখা যায়। [৫] প-ক-ত ২২৮৫। [৬] ঐ ২৩২৮, ২৩৩৭।

অনন্ত বাঙ্গালা পদ রচনায়ও সহজ কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। নীচের পদটি দানলীলার। মনে হয় কবি এই পালায় ধারাবাহিক পদ রচনা করিয়াছিলেন। কবির গুরু অদ্বৈত আচার্য দানখণ্ডের নাটগান পছন্দ করিতেন। প্রথম ছয় ছত্র কৃষ্ণের উক্তি, শেষ দুই ছত্র রাধার।

আহির-রমণী যত চালাঞা বাহির পথ
আপনি আস্থাছ আন ছলে[১]
বাহু নাড়া দিঞা যাও দানী পানে নাহি চাও
এত না-গরব কর কারে।
গলে গজমতি হার এক লক্ষ দান তার
দুই লক্ষ সিঁথার সিন্দুর
তিন লক্ষ কেশপাশ দান মাগে পীতবাস
চারি লক্ষ পাএর নূপুর।
হেদে লো কিশোরী গোরী নিতি যাও মধুপুরী
দান দেহ যে হয় উচিত
শুন বৃষভানু-ঝি আঁচলে ঝাঁপিলে কি
দেখাইঞা কর পরতীত।
কে জানে কিসের দান কি বোল বলিলে কানু
অন্য হৈতে আমি ভাল জানি
যদি বল আন বোল মাথায় ঢালিব ঘোল
হাসিলা অনন্ত পহুঁ শুনি॥

পদটির ভাবে ও ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রেশ শোনা যায়। এই অনন্তের সঙ্গে "অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস"এর সম্পর্ক থাকা বিচিত্র নয়।

অদ্বৈত আচার্যের এক প্রধান শিষ্য শ্যামদাস আচার্যের রচিত দুইটি অদ্বৈত-বন্দনা পদ পাওয়া গিয়াছে।[২] "দ্বিজ" শ্যামদাস ভনিতার পদগুলি ইহার রচনা কিনা বলা যায় না।[৩]

গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যভক্তদের মধ্যে যাঁহারা পদরচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুইজন প্রধান,—নয়নানন্দ ও শিবানন্দ। নয়নানন্দ গদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।[৪] তিনি যে পদগুলি লিখিয়াছিলেন তা প্রায় সবই চৈতন্য-বিষয়ক। পদগুলিতে ভক্তহৃদয়ের ঝঙ্কার শোনা যায়। যেমন

[১] অর্থাৎ গোপীদের বাহির পথ দেখাইয়া তুমি একলা এ পথে বিশেষ উদ্দেশ্যে আসিয়াছ।
[২] ঐ ২৩৫০, ২৩৫২।
[৩] HBL পৃ ১৭৮-৭৯।
[৪] শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের এক শিষ্য ছিলেন নয়নানন্দ (কবিরাজ) নামে।

গোরা মোর গুণের সাগর
প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরন্তর।
গোরা মোর অকলঙ্ক শশী
হরিনামসুধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি।
গোরা মোর হিমাদ্রিশিখর
তাহা হৈতে প্রেমগঙ্গা বহে নিরন্তর।
গোরা মোর প্রেমকল্পতরু
যার পদ-ছায়ে জীব সুখে বাস করু।
গোরা মোর নবজলধর
বরষি শীতল যাহে করে নারী-নর।
গোরা মোর আনন্দের খনি
নয়নানন্দের প্রাণ যাহার নিছনি।

শিবানন্দ আচার্য (চক্রবর্তী) বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন।[১] ইহার কয়েকটি বাঙ্গালা পদে "শিবাই[২] ও "শিবা সহচরী" ভনিতা পাই।

ভক্তিরত্নাকরের সাক্ষ্য অনুসারে যদুনন্দনদাস-ভনিতার কতকগুলি পদ গদাধরের শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্তীর লেখা।[৩] গদাধরের আর এক শিষ্য উদ্ধব-দাসও কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছিলেন।[৪]

জগন্নাথদাস (বা জগন্নাথ) নামে চৈতন্যের একাধিক ভক্ত ছিলেন। এই নামে অন্তত একটি করিয়াও নিত্যানন্দের, অদ্বৈতের ও গদাধরের ভক্ত ছিলেন। জগন্নাথদাসের ভনিতায় পদসংগ্রহগ্রন্থে অল্প কয়েকটি পদ সংকলিত আছে। জগন্নাথদাসের পদাবলীর পুথি বড় পাওয়া যায় না। তবে একটি খণ্ডিত পুথিতে এক শত তেইশটি পদ ছিল।[৫] সুতরাং ইনি যে ধারাবাহিকভাবে ব্রজলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। জগন্নাথের গৌর-পদাবলী পড়িলে মনে হয় যে ইনি চৈতন্যের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন।[৬] "অভিনব-সংকবি" জগন্নাথদাসের বিশিষ্টতম পদের শেষাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।[৭]

ব্রহ্ম-পুরন্দর দিনমণি-শঙ্কর
যো চরণাম্বুজ সেবে নিরন্তর
সো হরি কৌতুক ব্রজবালক সাথে
গোপনাগরী-অভিলাষা রে
সো পহুঁ পদতলপরাগধূসর
মানস মম করু আশ নিরন্তর
অভিনব-সংকবি দাসজগন্নাথ-
জননীজঠরভয়নাশা রে।

---

[২] HBL, পৃ ৫৫-৫৬। [৩] HBL, পৃ ৫২। [৪] ঐ ৮৮-৮৯। [৫] কান্দী অঞ্চলের পুথি। পত্রসংখ্যা ২৮। সা-প-প ৮ পৃ ৫৪। [৬] HBL পৃ ৮১০-৮৪। [৭] প-ক-ত ১৩২৩।

১৬

শ্রীখণ্ডের নরহরি-রঘুনন্দনের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা পদাবলী-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের গ্রন্থ প্রধানত এই কেন্দ্রে অনুশীলিত হইয়া বৈষ্ণব-পদাবলী রচনায় মোড় ফিরাইতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দের ব্রজবুলি-কবিদের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট তাঁহারা সকলেই এই অঞ্চলের লোক এবং/অথবা নরহরি সরকারের অথবা রঘুনন্দন দাসের শিষ্য-ভক্ত। সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগে রামগোপাল দাস তাঁহার 'শাখানির্ণয়' নিবন্ধে[১] যে সাক্ষ্য দিয়াছেন সে অনুসারে যশোরাজ খান, কবিরঞ্জন, কবিশেখর ইত্যাদি ব্রজবুলি-কবিরা "রাজসেবী" ও শ্রীখণ্ডের অধিবাসী, এবং শেষোক্ত দুইজন রঘুনন্দনের শিষ্য।

কবিরঞ্জন ও কবিশেখর লইয়া বিবাদ আছে। এ দুইটি নাম নহে, উপাধি। সুতরাং একাধিক কবির হইতে বাধা নাই। বিদ্যাপতিরও এই দুই উপাধি ছিল মনে করিয়া ইহাদের ভালো পদগুলির গতি করা হইয়াছে। কিন্তু "কবিরঞ্জন" নাম বা উপাধি কোন কোন মৈথিল কবি ব্যবহার করিয়া থাকিবেন ইহা মানিয়া লইলেও বিদ্যাপতির অধিকার স্বীকৃত হয় না। তবে যখন এক বা একাধিক বাঙ্গালী বিদ্যাপতির অস্তিত্ব কিছুতেই উড়াইয়া দেওয়া যায় না তখন বিদ্যাপতি-কবিরঞ্জনের মামলা খারিজ করিয়া দিতেই হয়। রামগোপাল দাসের কথা সবই অগ্রাহ্য করা যায় না। তিনি হয়ত জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। কিন্তু যেখানে কোন বিপরীত তথ্য নাই সেখানে ষোড়শ শতাব্দের কবিদের বিষয়ে সপ্তদশ শতাব্দের স্থানীয় জনশ্রুতির মূল্য অবশ্যই দিতে হইবে—তবে যথাযোগ্য বাট্টা দিয়া। রামগোপাল দাস লিখিয়াছেন, যাঁহার কবিতাগীতে ত্রিভুবন ভাসিয়া গিয়াছিল, যিনি "ছোট বিদ্যাপতি" বলিয়া খ্যাত ছিলেন, সেই (শ্রী-) খণ্ড-বাসী বৈদ্য কবিরঞ্জন শ্রীরঘুনন্দনকে অতিশয় ভক্তি করিতেন এবং তিনি রঘুনন্দনকে বন্দনা করিয়া "শ্যাম গৌরবরণ এক দেহ" এই পদটি লিখিয়াছিলেন।[২] এই প্রসঙ্গে রামগোপাল একটি শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

> গীতেষু বিদ্যাপতিবদ্‌বিলাসঃ
> শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবিকালিদাসঃ।
> রূপেষু নির্ভং সিতপঞ্চবাণঃ
> শ্রীরঞ্জনঃ সর্বকলানিধানঃ।

---

[১] রাখালানন্দ ঠাকুর কর্তৃক মধুমতী-সমিতি হইতে প্রকাশিত, শ্রীখণ্ড নিত্যানন্দ প্রেসে মুদ্রিত (১৯০৯)। [২] ঐ পৃ ১৬-১৭।

'গীত (রচনায়) যাঁহার বিলাস বিদ্যাপতির মতো, শ্লোক (রচনায়) যিনি সাক্ষাৎ কবি (-শ্রেষ্ঠ) কালিদাস, রূপে যিনি কামদেবকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই শ্রী (কবি ?) রঞ্জন সর্বকলাকুশল ।'

কিন্তু "শ্যাম গৌরবরণ এক দেহ" পদটি লইয়া মুশকিল হইয়াছে। রামগোপাল পদটি উদ্ধৃত করেন নাই, কিন্তু তিনি যে পদটি জানিতেন তাহাতে নিশ্চয়ই রঘুনন্দনের উল্লেখ ছিল। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহার পদসংগ্রহগ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন রামগোপালের প্রায় সমকালে। তিনি বৃন্দাবনে বসিয়া যে পাঠ পাইয়াছিলেন তাহাতে রঘুনন্দনের নামগন্ধ নাই, তাহা চৈতন্যবন্দনা বলিয়া বোধ হয়। সে পাঠ এই

শ্যামর-গৌর-বরণ এক দেহ
পামর জন ইথে করয়ে সন্দেহ ।
সৌরভে আগোর মূরতি রসসার
পাকল ভেল যৈছে ফল সহকার।
গোপজনম পুন দ্বিজ অবতার
নিগম—না পাওই নিগূঢ়, বিহার।
প্রকট করল হরিনাম বাখান
নারীপুরুষ মুখে না শুনিয়ে আন ।
ত্রিপুরাচরণকমল মধুপান
সরসসঙ্গীত কবিরঞ্জন ভান ॥[১]

পদকল্পতরুর অধিকাংশ পুথিতে যে ভনিতা আছে, তাহাতে ত্রিপুরা স্থানে রঘুনন্দন পাই কিন্তু কবিরঞ্জনকে পাই না।

শ্রীরঘুনন্দনচরণ করি সার
কহ কবিশেখর গতি নাহি আর ॥[২]

এদিকে গৌরপদতরঙ্গিণীতে ত্রিপুরা-কবিরঞ্জনও নাই রঘুনন্দন-কবিশেখরও নাই, আছে গৌর-মাধবীদাস।

করি গৌরচরণ-কমলমধু পান
সরসসঙ্গীত মাধবীদাস ভান ॥[৩]

তিনটি ভনিতার মধ্যে দ্বিতীয়টিকে প্রথমেই বাতিল করিতে হয়। পদটি অসন্দিগ্ধভাবে গৌর-পদাবলী, কোনক্রমেই রঘুনন্দন দাস ঠাকুরের বন্দনা বলিয়া নেওয়া চলে না। এদিক দিয়া তৃতীয় ভনিতাই গ্রহীতব্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সেখানেও বাধা। "গৌর-চরণ" কৃত্রিম বলিয়া ঠেকিতেছে, যেন

---

[১] ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ৯, ১। এই পাঠ পদরসসারে ও পদকল্পতরুর অন্তত একটি পুথিতে আছে (পদকল্পতরু ৩ পৃ ২৫৩)। [২] সংখ্যা ২১৮৯।

[৩] দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ ১০-১১।

"ত্রিপুরা-চরণ"এর পরিবর্তিত পাঠ। দ্বিতীয়ত মাধবীদাসের নামে কিছু পদ পাওয়া যায় বটে কিন্তু এই ভনিতা কোন পদেই নির্ভরযোগ্য নয়। (মাধবদাস করিয়া লইলে চলে।) তৃতীয়ত "সরসসঙ্গীত…ভান" মাধবীদাসের সঙ্গে খাপ খাইতেছে না। চতুর্থত—যেটা সবচেয়ে বড় আপত্তি—মাধবীদাসের এই পদ কোথায় পাওয়া গিয়াছে তাহার কোনই নির্দেশ সংকলয়িতা (জগদ্বন্ধু ভদ্র) অথবা সংস্কর্তা (মৃণালকান্তি ঘোষ) দেন নাই। বোধ হইতেছে, প্রথম ভনিতাই এখানে চৈতন্য-বন্দনার সঙ্গে মিল রাখিয়া পরিবর্তিত হইয়াছে।

প্রথম ভনিতার বিরুদ্ধে একমাত্র আপত্তি হইতে পারে ত্রিপুরার নাম। গৌরাঙ্গের বন্দনা লিখিলেও গৃহদেবতার দোহাই দিতে বাধা কি? চণ্ডীদাসের বাশুলী তো নজীর রহিয়াছে। কবিরঞ্জন ষোড়শ শতাব্দের প্রথমার্ধের লোক এবং চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। "পামর জন ইথে করয়ে সন্দেহ"—সমসাময়িকের উক্তি বলিয়াই ঠেকিতেছে। তাঁহার পক্ষে পরে রঘুনন্দনের অনুগত হওয়া অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়।

আর একটা কথা। রামগোপাল দাস যে পদটিকে রঘুনন্দনের বর্ণনা বলিয়াছেন তাহাও আমাদের অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে। রামগোপাল লিখিয়াছেন

তার হয় রঘুনন্দনে ভক্তি দড়
প্রভুর বর্ণনা-পদ করিলেক দঢ়।

এখানে প্রভু বলিতে উপরের ছত্রের রঘুনন্দনকে ধরিলেই গোল বাধে। প্রভু এখানে স্বচ্ছন্দে চৈতন্যকে বুঝাইতে পারে। তখন আর কোন আপত্তি থাকে না। এই গোলমাল রামগোপালের আগেই শুরু হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ দ্বিতীয় ভনিতা।

কবিরঞ্জনের অধিকাংশ পদ ব্রজবুলিতে লেখা। কোন কোন পদে কিছু বাঙ্গালা মিশাল আছে। ব্রজলীলা-পদগুলি প্রায় সবই সখীদৌত্যের। উদাহরণ দিই। প্রথমপদে সহচরী রাধাকে দিবাভিসারে উৎসাহিত করিতেছে।

বড় বিশোয়াসে তুয়া পন্থ নেহারি
যামুনকুঞ্জ রহল বনয়ারি।
সুন্দরি মা কুরু মনোরথ ভঙ্গ
অহ-অভিসারে দ্বিগুণাধিক রঙ্গ।
তুহুঁ ধনি সহজহিঁ পদুমিনী জাতি
তোহাঁর বিলম্ব উচিত নহে আতি।

ভুখল জন যদি না পায়ব অন্ন
বিফল ভোজন দিন অবসন্ন।
আরতি রতি দুঁহু নহে সমতুল
গাহক আদর সবহু বহুমূল।
গহ মেলি নাগরী যদুমণি পাহ
কহে কবিরঞ্জন রস নিরবাহ।[১]

'অত্যন্ত বিশ্বাস করিয়া বনমালী (কৃষ্ণ) তোমার পথ চাহিয়া যমুনাকুঞ্জে রহিয়াছে। সুন্দরী (তাহার) আশা ভঙ্গ করিও না। দিবা অভিসারে দুগুণের বেশি মজা। তুমি এমনই সৌভাগ্যবতী পদ্মিনী নারী। বেশি দেরি করা তোমার উচিত নয়। ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যদি (সময়ে) অন্ন না পায় তবে বেলা শেষে (অর্থাৎ পিত্ত পড়িয়া গেলে) ভোজনে ফল কি? আগ্রহ আর সুখ দুই বস্তু সমান ভাবে মিলে না। সকলেই গ্রাহকের আদর বহুমূল্য জ্ঞান করে। নাগরী, তুমি ঘর ছাড়িয়া যদুমণির কাছে যাও। কবিরঞ্জন কহিতেছে (তবেই) রসের ব্যাপার নিষ্পন্ন হইবে।'

দ্বিতীয় পদটিতে সহচরী কৃষ্ণকে বুঝাইতেছে সঙ্কেতস্থানে আসিতে কেন রাধার বিলম্ব হইতেছে। এটি বর্ষায় নৈশাভিসারের বর্ণনা।

পন্থ পিছর নিশি কাজর-কাঁতি
পাঁতরে ভৈ গেল দীগভরাঁতি।
চরণে বেঢ়ল অহি তাহে নাহি শঙ্ক
সুন্দরি হৃদয়ে নূপুর পরি পঙ্ক।
কি কহব মাধব পিরীতি তুহারি
তুয়া অভিসারে না জিয়ে বরনারী।
বরাহ-মহিষ-মৃগ পালে পলায়
দেখি অনুরাগিণী বাঘ ডরায়।
ফণীমণি দীপভরমে দেই ফুক
কত বেরি লাগিলা নাগিনীমুখে মুখ।
কহে কবিরঞ্জন করহ সন্তোষ
আজুকার বিলম্ব-গমনে নাহি দোষ॥[২]

'পথ পিছল, রাত্রি কাজলের মত কালো, প্রান্তরে দিগ্‌ভ্রম হইয়া গেল। পায়ে সাপ জড়াইল, তাহাতেও শঙ্কা নাই। সুন্দরীর মনে (হইল, বুঝি) নূপুরে কাদা লাগিয়াছে। মাধব, তোমার প্রতি প্রেমের কথা আর কি বলিব। সুন্দরী (রাধা) তোমার অভিসারে প্রাণ পণ পড়িয়াছে। (পথে তোমাকে দেখিয়া) বরাহ-মহিষ-মৃগপাল পলাইয়া যায়। অনুরাগিণী (তোমাকে) দেখিয়া বাঘও ভয় পায়। সাপকে মণিদীপ ভাবিয়া (নিভাইবার জন্য অভিসারিণী) ফুঁ দেয়। কতবার নাগিনীর মুখে মুখ লাগিল। কবিরঞ্জন কহিতেছে, মন খুশি কর। আজিকার বিলম্বে আগমনে (রাধার) দোষ নাই।'

কবিশেখরের প্রসঙ্গ পরে দ্রষ্টব্য॥

---

[১] পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী (নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ১৩০৬) পৃ ৪ দ্রষ্টব্য। পাঠের ভুল কিছু কিছু সংশোধন করিয়াছি।

[২] ঐ পৃ ৫। দ্বিতীয় ছত্রের পাঠ অত্যন্ত ভ্রান্ত, শুদ্ধ করিয়া লইয়াছি।

১৭

লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলের আলোচনা আগে করিয়াছি। পদকর্তাদের মধ্যে লোচনের একটি বিশেষ স্থান আছে। ইনি কতকগুলি মেয়েলি ভাবের রূপানুরাগের পদ লিখিয়াছিলেন। সে পদগুলির ভাষা ঘরোয়া, এমন কি গ্রাম্য বলা চলে, এবং ছন্দ নাচনিয়া, ছড়ার থেকে নেওয়া। এধরণের পদের সাধারণ নাম "ধামালি" বা "ঢামালি" (অর্থাৎ নাগরালি)। এগুলি প্রায় সবই গৌর-পদাবলী। যেমন

আর্ শুন্যাছ আলো সই গোরাভাবের্ কথা
কোণের্ ভিতর্ কুলবধূ কান্দ্যা আকুল্ তথা।
হল্দি বাঁ- টিতে গোরী বসিল যতনে
হল্দি বরণ্ গোরাচাঁদ্ পড়্যা গেল মনে।
কিসের রাঁধন্ কিসের্ বাড়ন্ কিসের্ হল্দি বাঁটা
আঁখির্ জলে বুক্ ভিজিল ভাস্যা গেল পাটা।
উঠিল গৌ- রাঙ্গ-ভাব্ সম্বরিতে নারে
লোহেতে ভি- জিল বাঁটন্ গেল ছারে- খারে।
লোচন্ বলে আলো সই কি বলিব আর্
হয় নাই হবার্ নয় গোরা অব- তার্ ॥[১]

লোচনের কয়েকটি পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে "সজনি ও ধনি কহ কে বটে" এই অত্যন্ত পরিচিত পদটিও আছে।[২]

লোচনের এই অদ্বৈত-বন্দনা পদটি উল্লেখযোগ্য

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য দয়াময়
যাঁর হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয়।
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর
যাঁর প্রেমবশে আইলা গৌরাঙ্গ নাগর।
যাহারে করুণা করি কৃপা দিঠে চায়
প্রেমাবেশে সেজন গৌরাঙ্গ-গুণ গায়।
তাঁহার চরণে যেবা লইল শরণ
সেজন পাইল গৌরপ্রেম-মহাধন।
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিনু
লোচন বোলে নিজ মাথে বজর পাড়িনু ॥[৩]

---

[১] প-ক-ত ২১৭৪। [২] ঐ ২১০। আসল ভনিতা—"এ দাস লোচন কহয়ে বচন শুনহ নাগরচাঁদা।"

[৩] গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৩১।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণব-সাধনায় বিধি-পর্যায়

১

চৈতন্যের ভক্তিস্রোতে দেশের মানসিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া যেন পাল্‌টাইয়া গেল। হরিনাম-উপদেশ দিয়া চৈতন্য সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরাভিমুখ করিয়া তাহার জীবন-মননের মান উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন। সমাজে ও সংসারে যাহারা অত্যন্ত দুর্গত, বিনা দোষে সমাজসংস্কৃতি-বহিষ্কৃত, তাহারাও কৃষ্ণের জীব, তাহাদের দেহও কৃষ্ণের মন্দির—এই বিশ্বাস ও বোধ জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠ মানুষের আসরে সমান আসনের অধিকারী করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিকতা সব লোকেরই চিত্ত দ্রবীভূত করিয়াছিল। তাঁহার ও তাঁহার ভক্তদের প্রচারিত সংকীর্তনে গানে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার পর হইতে চৈতন্যের আকর্ষণ দুর্নিবার হইয়া উঠিল। সে আকর্ষণে বাঙ্গালা দেশের লোক প্রতিবৎসর দল বাঁধিয়া নীলাচলে ছুটিত। তবে তখনই চৈতন্য বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের ফল অবিমিশ্রভাবে ভালো হয় নাই। তাই শান্তিপুরে মায়ের কাছে মনের কথা বলিয়াছিলেন,

> কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন
> যে কালে সন্ন্যাস কৈলুঁ ছন্ন হৈল মন।

ভক্তেরা সকলে কাজকর্ম ছাড়িয়া নীলাচলে থাকিয়া তাঁহার কাছে মজলিশ করিবে ইহা চৈতন্য সর্বদা পছন্দ করেন নাই। দেশের কাজ প্রায় সবই বাকি রহিয়াছে। তাই তিনি নিত্যানন্দকে নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং কয়েকজন শক্তিশালী ভক্তকে তাঁহার সঙ্গী করিয়া দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া গিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে নাম-প্রেম প্রচার করিতে লাগিলেন। সকলকে তিনি জীবনের সবকিছু উপেক্ষা করিয়া শুধু হরিনামে মাতোয়ারা হইতে ডাক দিয়াছিলেন। জনসাধারণের প্রতি নিত্যানন্দের উপদেশের মুল কথা, ব্যঙ্গবিজড়িত হইলেও, এই ছড়াটিতে প্রতিধ্বনিত আছে।

> মাগুর মাছের ঝোল
> ভর-যুবতীর কোল
> বোল হরিবোল।

অর্থাৎ—সংসারের সবরকম ভোগসুখে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়াও শুধু হরিনাম করিলেই পরলোকে নিস্তার হইবে।

হরিনামের ও হরিগানের প্রচারে সাধারণ লোকের কতকটা চিত্তসংস্কার হইল, কিন্তু কেহ কেহ ভাবাতুর হইয়া সংসারকৃত্য ও সমাজকৃত্য উপেক্ষা করিতে লাগিল। সংসার ত্যাগ করিয়া অথবা ত্যাগ না করিয়া বৈরাগ্যময় নৈষ্কর্ম্যে ঝোঁক পড়িল। এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াই অদ্বৈত আচার্য প্রহেলিকার মধ্যে সংপুটিত করিয়া চৈতন্যকে সংবাদ দিয়াছিলেন, "বাউলকে কহিও লোক হইল আউল" ইত্যাদি। চৈতন্য শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন।

নবদ্বীপে থাকিতে চৈতন্য নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের মতো প্রথমে গৃহদেবতার পূজা করিতেন। তাহার পর ভক্তিভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় আর তাহা করিতেন না অথবা করিতে পারিতেন না। সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে দেবপূজার কথাই উঠে না। চৈতন্যের পরমগুরু মাধবেন্দ্র পুরী গোপাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজে দেবতার পূজা না করিলেও দেবতার সেবায় অত্যন্ত অবহিত ছিলেন। চৈতন্য কিন্তু নীলাচলে আসিয়াও কোন দেববিগ্রহের পূজা বা সেবা করেন নাই। কেবল প্রত্যহ জগন্নাথ দর্শন করিতেন। সে পূজা কিংবা সেবা নয়, দর্শন স্মরণ মনন, অর্থাৎ সাধনা। যতদিন চৈতন্য বর্তমান ছিলেন ততদিন তাঁহার কোন ভক্ত কোন বিগ্রহ—অবশ্যই কৃষ্ণমূর্তি—প্রতিষ্ঠা করেন নাই। (তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের পরে কোন কোন ভক্ত তাঁহার অগোচরে তাঁহার মূর্তি পূজা করিতেন বলিয়া মনে হয়।) কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পরে বাঙ্গালা দেশে নিত্যানন্দ এবং অনেক ভক্ত কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ব্রজধামে এই কাজ সনাতন ও রূপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা চৈতন্যের নির্দেশেই মাধবেন্দ্র পুরীর আরব্ধ কাজ চালাইয়াছিলেন এবং উপরন্তু কৃষ্ণায়ণ-শাস্ত্রের পদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন। তবে বাঙ্গালা দেশে একাজ করিতে তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ বা অনুরোধ ছিল বলিয়া মনে হয় না।

চৈতন্যকে ভক্তেরা ঈশ্বরের রসময় বিগ্রহ বলিয়া ভাবিতেন, কিন্তু চৈতন্য সর্বদা জগন্নাথকে ঈশ্বরমূর্তি বলিয়া খ্যাপন করিতেন। চৈতন্যের তিরোভাবের পর প্রত্যক্ষ উপাসনার জন্য যত না হোক প্রত্যক্ষ সেবার জন্য বিগ্রহের প্রয়োজন হইল এবং এই বিগ্রহ-সেবায় অনেকটা জগন্নাথের ভোগ-সেবার পদ্ধতি অনুসৃত হইল। বৈষ্ণব-মহান্তেরা একদিকে কৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবায়েত, অপর দিকে সংসারী ব্যক্তির গুরু হইলেন। বিগ্রহ-সেবায় বৈষ্ণব-মহান্তের নিষ্ঠা অত্যন্ত প্রগাঢ় ছিল। তাহার একটি মাত্র উদাহরণ দিব। পদকর্তা ও কীর্তনীয়া গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ বিবাহ করেন নাই। তাঁহার ঐহিক-পারত্রিক সব চিন্তাই সর্বদা গোপীনাথ ও তাঁহার সেবা লইয়া। গোবিন্দ সন্ন্যাস অবলম্বন করেন নাই, সুতরাং মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। সে কাজ করিবেন তাঁহার হৃদয়নন্দন গোপীনাথ। গোবিন্দের নির্দেশ অনুসারে গোপীনাথ-বিগ্রহকে শ্রাদ্ধকর্তারূপে সামনে রাখিয়া শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান পুরোহিতেরা নির্বাহ করিয়াছিলেন।

চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের তিরোধানের পর গুরুর গুরুত্ব বহুগুণে বাড়িয়া গেল। চৈতন্যের গুরু ছিল। তিনি গুরুর এবং গুরুর গুরুর কাছে তাঁহার ঋণ সর্বদা স্বীকার করিতেন। কিন্তু বিনা গুরু-করণে যে জীবের গতি নাই এমন কথা তিনি কখনও বলেন নাই। গুরুহীনেরও অধ্যাত্মপথে অগ্রাভিসার তিনি স্বীকার করিতেন। পরম সত্য যে কাহারও কাহারও হৃদয়ে এমনিই আভাসিত হইতে পারে এবং সাধারণত সেই ভাবেই পরম সত্য (বা ব্রহ্মবোধ) মানব-হৃদয়ে জাগ্রত হয় তাহা উপনিষদেই স্পষ্ট করিয়া বলা আছে,—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"। সে কথা চৈতন্যও সনাতনকে শিক্ষাছলে বলিয়াছিলেন,

> জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাহে গুরু চৈত্ত্য রূপে
> শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে।

অর্থাৎ চিত্তে যেখানে আপনিই আলো জ্বলিয়া উঠে সেখানে গুরু অলেখ বা "চৈত্ত্য"। মহান্তরূপে কৃষ্ণই শিক্ষা দেন। চৈতন্য বলিতে চাহিয়াছিলেন যে কৃষ্ণই গুরু, মানুষরূপে হোক অরূপে হোক মনের উদ্ভাসে হোক।

চৈতন্যের নির্দেশে সনাতন ও রূপ যে ভক্তিশাস্ত্র রচনা করিলেন তাহাতে গুরুর প্রাধান্য ঈশ্বরের পরেই। চৈতন্যের ধর্মে শুধু ভগবান ও ভক্ত, মাঝখানে কেহ নাই কিছু নাই। এখন মাঝখানে আসিলেন গুরু এবং ভগবান্ আর ভক্তের প্রিয় বা প্রেমিক রহিলেন না। ভক্তের স্থান লইল রাধা। রাধাকে লইয়া কৃষ্ণের লীলা। সে লীলার সহায়ক গুরু। প্রথম শ্রেণীতে গুরু সখী। এবং সখীরা গোপী, রাধার অংশ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে গুরু সখীসহায়ক "মঞ্জরী" (ফুলের কুঁড়ি) বা সেবাদাসী। সখীরা অপ্রাকৃত, মঞ্জরীরা মহাগুরুস্থানীয়। মহান্ত-গুরু হইতেছেন মঞ্জরীদের অনুগৃহীত। তিনি শিষ্যসাধককে মঞ্জরীর অনুগ্রহ লাভ করিতে সহায়তা করেন। মঞ্জরীর কৃপা হইলে সিদ্ধদেহ পাইয়া সাধক ব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবারসের আস্বাদন করেন ও মঞ্জরীত্ব প্রাপ্ত হন। সখী-মঞ্জরীর অনুগ্রহ ছাড়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির কোনই উপায় নাই।—এই হইল রাগানুগ-মার্গের রহস্য।

গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে।[১]

মঞ্জরী-অনুগতির কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন রঘুনাথ দাস।

যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপপূর্বা
ব্রজভুবি বত নেত্রদ্বন্দ্বদীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণকমললাক্ষাসংদিদৃক্ষা মমাভূৎ ॥[২]

'যে দিন কোন এক রূপমঞ্জরী এই ব্রজভুবনে আমার উপর উজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছেন সে দিন হইতে, হে বৃন্দাবনেশ্বরী, তোমার চরণকমলের অলক্তরাগ দর্শনের জন্য আমার প্রগাঢ় বাসনা হইয়াছে॥'

শ্রীরূপরতিমঞ্জর্যোরঙ্ঘ্রিসেবৈকগৃধ্নুনা।
অসংখ্যেনাপি জন্মনা ব্রজে বাসোঽস্তু মেঽনিশম্ ॥[৩]

'রূপমঞ্জরী ও রতিমঞ্জরীর পদসেবালুব্ধ হইয়া অসংখ্য জন্মে যেন আমার সর্বদা ব্রজে বাস হয়।'

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার কাব্যে মঞ্জরীদের সেবার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

মঞ্জরীতত্ত্ব গৃহীত হইতে দ্বিধা বা বিলম্ব হয় নাই। প্রথমে রূপ ("রূপমঞ্জরী"), সনাতন ("রতিমঞ্জরী" বা "লবঙ্গমঞ্জরী"), রঘুনাথ দাস ("রসমঞ্জরী"), গোপাল ভট্ট ("গুণমঞ্জরী"), রঘুনাথ ভট্ট ("রাগমঞ্জরী"), জীব ("বিলাস-মঞ্জরী"), তাহার পর বৃন্দাবনের অন্যান্য মহান্ত যেমন কৃষ্ণদাস কবিরাজ ("কস্তূরীমঞ্জরী") ইত্যাদি, শেষে বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব-মহান্তও যেমন জাহ্নবা দেবী ("অনঙ্গমঞ্জরী") ইত্যাদি সিদ্ধনাম প্রাপ্ত হন। কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় অনেক সিদ্ধ ("মঞ্জরী")-নাম দেওয়া আছে।

ভক্ত ও ভগবানের মাঝে গুরু এই যে আড়াল টানিয়া দাঁড়াইলেন ইহাতে চৈতন্যের ধর্মে একটু নূতন সাজ চড়িল। সংস্কৃতিতে ও শিল্পচিন্তায় ইহার ফল ভালোই হইল। শিক্ষিত গুরুর পরিবার-পরিজন ও শিষ্য-সেবকবৃন্দ যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য সংস্কৃত বিদ্যা আয়ত্ত করিতে যত্নবান্ হইলেন। মহান্ত-গুরুর পত্নী-পুত্রবধূরা, প্রয়োজন হইলে, গুরুকৃত্য করিতেন বলিয়া তাঁহাদেরও লেখাপড়া শিখিতে হইত। স্ত্রীশিষ্য ও শিষ্যপত্নীরাও, অবস্থা অনুকূল হইলে, সেই পথ অনুসরণ করিতেন। বিশেষ করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত অবশ্যপাঠ্য হইয়াছিল এবং পদাবলী-গান সাধনার এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। এইসব কারণে ষোড়শ শতাব্দের শেষার্ধ হইতে বাঙ্গালী বৈষ্ণব-সংসারে মেয়ে-পুরুষের একরকম প্রায় আবশ্যিক শিক্ষাগ্রহণ শুরু হইয়াছিল। এখন হইতে আধুনিক কাল—অর্থাৎ

---

[১] চৈতন্যচরিতামৃত ২. ৮।
[২] বিলাপকুসুমাঞ্জলি ১৪। [৩] প্রার্থনামৃত ১।

নবিংশ শতাব্দের মাঝামাঝি—পর্যন্ত বাঙ্গালা-বিদ্যায় বৈরাগী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবেরাই সব চেয়ে অগ্রসর ছিলেন।

বষ্ণব-মহান্তের ধনী শিষ্যদের দানে ব্রজমণ্ডলে ও বাঙ্গালা দেশে দেবমন্দির নির্মিত হইতে লাগিল। বৃন্দাবনে সনাতন-রূপের আমলে প্রথমে যে মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল তাহা গৌড়ীয় রীতির অনুযায়ী।[১] এইভাবে বাঙ্গালা দেশের মন্দির-দেবকুলের স্থাপত্য-রীতি ব্রজমণ্ডলে গিয়া স্থানীয় রীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল। পরে এ প্রভাব রাজস্থানেও প্রসারিত হইয়াছিল। এই কাজে সব চেয়ে বেশি হাত ছিল আকবরের সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহের (মৃত্যু ১৬২১)। মানসিংহ রঘুনাথ ভট্টকে গুরু বলিয়া মানিতেন। তিনি বাঙ্গালা দেশেও কিছুকাল ছিলেন॥

২

চৈতন্যের তিরোধানের পরে বাঙ্গালা দেশে দুইটি প্রধান গুরুগোষ্ঠী জমিয়া উঠিল। অদ্বৈত, সীতাদেবী ও তাঁহার পুত্রেরা শান্তিপুরে আগের মতোই অনাড়ম্বরে বৈষ্ণবদীক্ষা দিতে থাকিলেন। নিত্যানন্দ বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইলেন। তিনি সম্ভবত কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষা দেন নাই। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী জাহ্নবা দেবী ও কিছুকাল পরে পুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র (—প্রথম

---

[১] মদনগোপাল বা মদনমোহনের প্রাচীন মন্দির বৃন্দাবনে গৌড়ীয় রীতির বোধ করি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মুল মন্দিরের গায়ে দক্ষিণদিকে ঠিক তেমনি আর একটি মন্দির আছে। তাহাতে কারিগরির পরিচয় আরও বেশি। এই মন্দিরের পাশ-দরজার মাথায় বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে লেখা একটি শ্লোক আছে। সেই শ্লোকের যে পাঠ গ্রাউস (F. A. Grouse, *Mathura: A District Memoir* তৃ-স ১৮৮৩, পৃ ২৫১) দিয়াছেন তাহাতে "রাধাবসন্তঃ" পাঠ হয়ত ভুল, "রায়ো বসন্তঃ" হইতে পারে।

"হর ইব গুরুবংশো যৎপিতা রামচন্দ্রো
গুনিমণিরিব পুত্রো যস্য রাধাবসন্তঃ।
স কৃতসুকৃতরাশিঃ শ্রীগুণানন্দনামা
ব্যধিত বিধিবদেতন্মন্দিরং নন্দসূনোঃ॥"

'শিবের মত যাহার পিতা গুরুবংশজাত রামচন্দ্র, যাঁহার পুত্র রাধাবসন্ত গুণীদের মধ্যে মণির মতো, সেই শ্রীগুণানন্দ নামধারী (ব্যক্তি) যিনি বহুপুণ্যসঞ্চয় করিয়াছেন, নন্দনন্দনের এই চন্দ্রের মত উজ্জ্বল মন্দির নির্মাণ করাইলেন।'

মনে হয় এই গুণানন্দ পুত্রের নামের ঠিক পাঠ যদি রায়ো বসন্তঃ হয় তবে তিনিই সম্ভবত গোবিন্দদাস কবিরাজের সুহৃৎ "দ্বিজ রায় বসন্ত"। পরে দ্রষ্টব্য।

পত্নী বসুধা দেবীর গর্ভজাত—) রীতিমত দীক্ষা দিতেন। বীরভদ্রের পর হইতে খড়দহের গুরুপাট জাঁকিয়া উঠে।[১] নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গা দেবীর পরে তাঁহার সন্ততিও নিজস্ব গুরুপরম্পরা চালাইয়াছিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে জাহ্নবা দেবীই প্রথম মহিলা-মহান্ত ("গোস্বামিনী") যিনি অন্তঃপুরের বাহিরে আসিয়া গোস্বামীদের সমান মর্যাদা পাইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা জাহ্নবাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। কৃষ্ণমূর্তির পাশে রাধামূর্তির স্থাপনায় জাহ্নবার সমধিক উৎসাহ ছিল। ইনিই বৃন্দাবনে কৃষ্ণমূর্তির পাশে বসাইবার জন্য রাধামূর্তি গড়াইয়া বাঙ্গালা দেশ হইতে পাঠাইয়াছিলেন। জাহ্নবা নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া প্রথম জীবনে বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্রকে (১৫৩৪-৮৩) পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহ্নবার তীর্থপর্যটনে রামচন্দ্র ("রামাই") সঙ্গে থাকিতেন। পরে জাহ্নবা বৈধী সাধনমার্গের দিকে মনোযোগ দিলে পর বোধ হয় রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ কিছু শিথিল হইয়াছিল। রামচন্দ্র বাঘনাপাড়ায় (গঙ্গাতীরে কালনার অদূরে) কৃষ্ণ-বলরামের মূর্তি স্থাপন করিয়া বাস করিতে থাকেন। ইহার ভজনপদ্ধতি কতকটা তান্ত্রিক অথবা রাগানুগমার্গের অনুসারী ছিল। রামচন্দ্র গোস্বামীর পরে বাঘনাপাড়া পাটের (বা আখড়ার) গুরুশিষ্যেরা ক্রমশ সহজমার্গের সাধনার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। তবে তাঁহারা কখনও রামচন্দ্রের গুরু জাহ্নবার দোহাই দিতে ভুলেন নাই।

বীরভদ্রের দীক্ষাগ্রহণের কাহিনী আগে বলিয়াছি। বীরভদ্র মনস্বী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাহার উপর পিতার সহৃদয়তাও পাইয়াছিলেন। তাঁহার আধিপত্য বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা সানন্দে স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রধান গুরুগোসাঁই বলিয়া বীরভদ্রকে বৈধী ভক্তির শিক্ষাই দিতে হইত। তবে তাঁহার মনে "বামনাই" অনুদারতা স্থান পায় নাই। ইহার একটি ভালো দৃষ্টান্ত

[১] ইঁহাদের সেবক-শিষ্যেরা "নাড়া, নাড়ী" (পরে নেড়া-নেড়ী) বলিয়া কথিত হইত। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে নেড়া-নেড়ীরা প্রথমে বৌদ্ধ ছিল, তাই এই নাম। এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। আগে হিন্দু রাজাদের খাশ ভৃত্যের মাথা নেড়া থাকিত। তাহা হইতে রাজা-জমিদারের প্রিয় পার্শ্বচর ভৃত্যের সাধারণ নাম হয় "নাড়া"। এইজন্যই কি আবেশ হইলে গৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে "নাড়া (নাঢ়া)" বলিয়া ডাকিতেন? না, তাঁহার অবতার নাট্যের সূত্রধার বলিয়া?

বংশবিস্তারের উল্লেখ অনুসারে খড়দহের গুরুগোষ্ঠীতে

"বার শত নাড়া আর তের শত নাড়ি
কেহ বহে গঙ্গাজল কেহ শোধে বাড়ী।" পৃ ১৭ ক।

আছে। শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দ একদা তাঁহার সম্মুখে শ্রীখণ্ডের (বৈদ্য) রঘুনন্দনকে শূদ্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। (রঘুনন্দনের ভক্তি-তন্ময়তা সর্বজনজ্ঞাত, এবং এইজন্য চৈতন্য পরিহাস করিয়া মুকুন্দ দাসকে একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি রঘুনন্দনের পিতা না রঘুনন্দন তোমার পিতা? চৈতন্যের ভাব বুঝিয়া মুকুন্দ দাস উত্তর দিয়াছিলেন, রঘুনন্দনকে দেখিয়া ভক্তি শিখিয়াছি, তাই সে গুরু অতএব আমার পিতা।) গতিগোবিন্দ এমন মহাপুরুষের জাতিবিচার করিতেছেন শুনিয়া বীরভদ্র হাতের চাবুক দিয়া তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিলেন।[১]

বীরভদ্র বৈষ্ণব-গোস্বামী হইলেও কতকটা রাজার অর্থাৎ গদির মোহান্তের ভাবে থাকিতেন ও সেই চালে চলিতেন। যখন তিনি তীর্থযাত্রায় বা দেশভ্রমণে অথবা ধনী শিষ্যবাড়ীতে যাইতেন তখন রীতিমত শোভাযাত্রা হইত। পূর্বদেশে (ঢাকায়) গমনের বেলায় এমনি শোভাযাত্রার বর্ণনা আছে বংশবিস্তারে।

অনেক মহান্ত সঙ্গে বহু শিষ্যগণ, নরযান[২] অশ্বযান বহুত সাজন
শ্বেত নীল কৃষ্ণ রক্ত পতকা সাজন, কেহ পূর্ণচন্দ্র অর্ধচন্দ্র দরশন।...
অতুল ঐশ্বর্য সঙ্গে ভৃত্যগণ মিল, যানবাহী[৩] ভাগ্যবান্ অনেক আইল।
ময়ূরের পুচ্ছগুচ্ছ হস্তে বহু দাস, শ্বেত কৃষ্ণ চামর ঢুলায় দুই পাশ।
সুবর্ণ রজত ছড়ি বেত্র বেণু হাথে, গলে সিলি[৪] গুঞ্জামালা রাঙ্গা টোপ মাথে।
প্রভু পরিচ্ছদ করি চড়ি নরযানে, শিরেতে বেষ্টন[৫] গজমুক্তা দোলে কানে।
নাড়া[৬] সব প্রেমে মত্ত ক্রমাগত হঞা, অগ্রে অতি শীঘ্র চলে কীর্তন করিঞা...।
মত্ত সিংহ সম সব নাড়ার নর্তন, হরি বোল হরি বোল এই সে কীর্তন।
মৃদঙ্গ খঞ্জরি ডম্ফ করতাল শৃঙ্গ, চারি পাশে বেড়ি যায় বরনার (?) ভৃঙ্গ।
জ্ঞানদাস কৃষ্ণদাস রামদাস করি, নিত্যানন্দদাস রামাঞি চলে দোলা ঘেরি
নৃসিংহদাস নামে সব নাড়ার প্রধান, খন্তি[৭]-বাহক সব চলে আগুয়ান।...
গ্রামে গ্রামে মহোচ্ছব কীর্তন প্রচার, দেখিয়া সকল লোক হয়ে চমৎকার।[৮]

আবশ্যক হইলে বীরভদ্র ঘোড়াতেও চড়িতেন। ঘোড়ায় চড়িয়াই তিনি গঙ্গাতীর পথে পিতৃভূমি একচাকা গ্রামদর্শনে গিয়াছিলেন॥[৯]

[১] বংশবিস্তার পৃ ৩৪ ক।
[২] =পাল্‌কি। [৩] =পাল্‌কি বেয়ারা।
[৪] =শেলি, মুক্তার বা স্ফটিকের কণ্ঠমালা। [৫] =পাগড়ি।
[৬] এখানে "নাড়া" মানে নাটুয়া।
[৭] অর্ধচন্দ্র লাঞ্ছনযুক্ত লৌহদণ্ড, বীরভদ্রের রাজচিহ্ন।
[৮] বংশবিস্তার পৃ ২৭ খ-২৮ ক। [৯] ঐ পৃ ৩৪ ক।

৩

বৃন্দাবনের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সর্বাধিকারও স্বীকৃত হইয়াছিল। তবে খাস বাঙ্গালা দেশে চৈতন্যের পরেই নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের গৌরব মান্য ছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচনায়—কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃতের আগে—নিত্যানন্দের ও অদ্বৈতের গৌরবের সমুচিত স্বীকৃতি নাই। ইহার কারণ এ নয় যে নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের মহিমা বৃন্দাবনের গোস্বামীরা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বরং ইহাই সত্য যে প্রধান গোস্বামী চারজন—সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস—দুই প্রভুর মহিমা প্রত্যক্ষ অবগত ছিলেন। রঘুনাথ দাস নিজে অদ্বৈতের শিষ্যের শিষ্য। আসল কথা এই, গোস্বামীরা শাস্ত্র এবং সাধনাপদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন। শাস্ত্র মানেই যথাসম্ভব এবং যথোপযুক্তভাবে পুরাতনের সঙ্গে মিল রাখিয়া নূতনকে গ্রহণীয় ও প্রতিষ্ঠিত করা। এইজন্যই তাঁহাদের গ্রন্থের ভাষা সংস্কৃত, শাস্ত্রের দেবতা কৃষ্ণ—গভীর-দৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণ। চৈতন্য কৃষ্ণের অবতার এবং তিনি রাধার দেহকান্তি ও প্রেমভাব আশ্রয় করিয়াছিলেন। অতএব তিনি যুগপৎ রাধাকৃষ্ণ। এখানে কোন অধীন-ঈশ্বর বা উপভগবানের স্থান থাকিতে পারে না এবং নাইও। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ ভগবৎশক্তির অংশভাক্ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সখী-মঞ্জরীগণের মধ্যেও ফেলা যায় নাই। সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহদ্ভাগবতামৃতে বৈধী ভক্তি-সাধনার প্রসঙ্গে যে ব্রহ্মা শিব বিষ্ণু মহাবিষ্ণু ইত্যাদির কথা বলিয়াছেন তাঁহারা কৃষ্ণেরই কলাধর। নিত্যানন্দ-অদ্বৈত তাই কৃষ্ণের অংশাবতার। গোলোকের প্রেমলীলার রঙ্গমঞ্চে কৃষ্ণের অংশভাক্‌দের (—তাহার মধ্যে নিত্যানন্দের অবতারী সংকর্ষণ বা বলরামও আছেন—) কোন ভূমিকা নাই। অতএব বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রসশাস্ত্র রাগানুগ-সাধনপদ্ধতি নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রসঙ্গবিবর্জিত।

অথচ তখন বাঙ্গালা দেশের গোস্বামীদের মতে বৈষ্ণবের উপাস্য ও মুখ্য ভক্তিসেবনের পাত্র ও শ্রদ্ধার বস্তু হইতেছেন

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা।

দুই ভিন্নমুখী বৈষ্ণবচিন্তার ধারা মিলিত হইল কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রযত্নে। তিনি চৈতন্যচরিতামৃত লিখিলেন। ইহাতে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের তাবৎ গ্রন্থের মর্ম সমাহৃত, এবং সেই সঙ্গে তাহাতে বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব-ঠাকুরদের

রচনার ও ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত। চৈতন্যচরিতামৃতের প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথম ও শেষ পদ হইতেই কৃষ্ণদাসের উদ্দেশ্য বোঝা যায়।

> জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ
> জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।...
> শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ
> চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

৪

ব্রজমণ্ডলের ও গৌড়মণ্ডলের বৈষ্ণবসমাজের মিলন যখন ঘনীভূত হইল তখন হইতে বাঙ্গালা দেশে বৃন্দাবনের গোস্বামী-গুরুসরণির প্রতিষ্ঠা। এই সরণি ধরিয়াই চৈতন্যচরিতামৃত তথা গোস্বামী-গ্রন্থগুলি বাঙ্গালা দেশে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। যাঁহাদের দ্বারা একাজ শুরু হইয়াছিল তাঁহারা বাঙ্গালা দেশ হইতে ব্রজমণ্ডলে গিয়া ওখানে গোস্বামীদের কাছে দীক্ষা ও শিক্ষা অথবা শুধু শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান তিনজন।[১] তিনজন তিন জাতির। একজন ব্রাহ্মণ, একজন কায়স্থ, আর একজন সদ্‌গোপ। তিনজনের কর্মস্থলও বিভিন্ন। একজনের পশ্চিমবঙ্গ, একজনের উত্তরবঙ্গ, আর একজনের বঙ্গ-উড়িষ্যা-প্রান্ত। যিনি ব্রাহ্মণ এবং যাঁহার কর্মস্থল পশ্চিমবঙ্গ তিনিই —প্রধানত ব্রাহ্মণ ও ভাগবত পাঠক বলিয়া—তিন প্রধানের মধ্যে মুখ্য। তাঁহার নাম শ্রীনিবাস আচার্য।

শ্রীনিবাস আচার্যের পিতার নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, মাতার নাম লক্ষ্মী। নিবাস ভাগীরথীর পূর্ব তীরে (নদীয়া জেলায়, অধুনা ভাগীরথী-গর্ভে লুপ্ত) চাখন্দী গ্রামে। শিশুকাল হইতে শ্রীনিবাস যাজিগ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতেন। যাজিগ্রাম শ্রীখণ্ডের খুব কাছে। শ্রীনিবাসের পিতা চৈতন্যভক্ত ছিলেন, তাই তাঁহার নামান্তর ছিল চৈতন্যদাস। বাল্যকালে শ্রীনিবাস নরহরি দাসের স্নেহলাভ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীনিবাস পুরী নবদ্বীপ শান্তিপুর খড়দহ প্রভৃতি পাটে গিয়া মহান্তদের দর্শন ও অনুগ্রহলাভ করেন, তাহার পর পিতৃবিয়োগ হইলে বৃন্দাবনে চলিয়া যান। তখন সনাতন ও রূপ তিরোধান করিয়াছেন। শ্রীনিবাস গোপাল ভট্টের কাছে দীক্ষা লইয়াছিলেন এবং জীব গোস্বামীর কাছে বৈষ্ণবতত্ত্বের পাঠ লইয়াছিলেন। ভাগবতের পাঠে ও ব্যাখ্যায় তাঁহার বিশেষ

---

[১] ইঁহাদের বিবরণ ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, অনুরাগবল্লী, রসিকমঙ্গল ও প্রেমবিলাস ইত্যাদি গ্রন্থে লভ্য। প্রেমবিলাসের প্রামাণিকতা কিছু সন্দিগ্ধ।

ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। সম্ভবত বৃন্দাবনে থাকিতেই শ্রীনিবাস নরোত্তমদাসের ও শ্যামানন্দের সহিত পরিচিত হন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দের সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালা দেশে ও উপান্ত অঞ্চলে বৈষ্ণবভাবের যে নূতন বন্যা আসিয়াছিল তাহা বৃন্দাবনে মিলিত এই তিন বন্ধুকে উৎস করিয়া।

শ্রীনিবাস সুপুরুষ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ভক্তিভাবে লোকে সহজেই আকৃষ্ট হইত। ধনী ও বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও তাঁহাকে সহজে উপেক্ষা করিতে পারিত না। বিশেষ করিয়া তিনি গৌড়দেশে গোস্বামী-গ্রন্থ প্রচারের ভার পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মর্যাদা বাড়িয়া গিয়াছিল। বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর শ্রীনিবাসের শিষ্য হইয়াছিলেন। সেই হইতে শ্রীনিবাসের প্রতিষ্ঠার শুরু। বীরহাম্বীরের সভায় শ্রীনিবাসের আবির্ভাব সম্বন্ধে গল্প আছে যে লুট-করা বৈষ্ণবগ্রন্থের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতেই শ্রীনিবাস মল্ল-রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। এ কথা কতটা সত্য কতটা মিথ্যা তাহা বলা যায় না। তবে এটা ঠিক যে মল্লভূমিতে শ্রীনিবাসের পদার্পণের বেশ কিছুকাল আগেই বীরহাম্বীরের সভায় ভাগবত-পাঠ শুরু হইয়াছিল। সনাতন-রূপ-জীবের সম্বন্ধে আগে যে পুঁথির পাতাটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা হইতেই জানা যায় যে জীবের এক ভাই অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র মল্লভূমিতে বাস করিয়াছিলেন। রাজার পুরোহিত বা সভাপণ্ডিত "ব্যাস" চক্রবর্তী, যিনি-রাজসভায় ভাগবত পড়িতেন, তিনি প্রথমে সস্ত্রীক[১] শ্রীনিবাসের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাহার পর গুরুকে রাজসভায় লইয়া যান। বীরহাম্বীরের বৈষ্ণবভাবাশ্রয়ে জীব গোস্বামী খুব খুশি হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবসাধকরূপে বীরহাম্বীরের নাম হইল "শ্রীচৈতন্যদাস"। পুত্র যুবরাজ ধাড়িহাম্বীরও শ্রীনিবাসের কাছে মন্ত্র লইয়াছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণব নাম হইল "শ্রীজীবগোপালদাস"।[২] শ্রীনিবাসের মল্লরাজসভাবিজয় বাঙ্গালায় বৈষ্ণব ধর্মের ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা বৃহৎ ঘটনা। সাহিত্যে যত না হোক সঙ্গীতে এবং কারুশিল্পে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও শিল্পভাবনা এখানে একটু নূতন পথে বিকশিত হইয়াছিল।

বৃন্দাবনের "ছয় গোসাঞি"র মধ্যে গোপাল ভট্ট (এবং জীবও) বৈষ্ণবীয় বিধিমার্গের সব চেয়ে বড় পোষক ছিলেন। তাঁহার শিষ্য ও প্রতিনিধি শ্রীনিবাস বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব-আচারে বিধিমার্গের প্রধান প্রচারকারী হইয়াছিলেন।

---

[১] পত্নী ইন্দুমতী, পুত্র শ্যামদাস।

[২] অর্থাৎ জীব গোস্বামীর ও গোপাল ভট্টের (শ্রীনিবাসের গুরু) ভৃত্য।

ইহার পুত্র কন্যা ও শিষ্যসম্প্রদায় যে বৃহৎ গুরুগোষ্ঠী স্থাপন করিয়াছিল তাহার শাখা পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যেই বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। শ্রীনিবাসের জীবৎকালেই পদাবলী-কীর্তনরীতি বিধিবদ্ধ ও সাধনভজনের উপায়রূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল। ইহার সম্প্রদায়ের দ্বারাই পদাবলী রচনা বোধ করি সব চেয়ে ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হইয়াছিল।

রচনাকার্যে শ্রীনিবাস নিজে খুব উৎসাহী ছিলেন না। তাঁহার সংস্কৃত রচনা কিছু পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালা পদ কয়েকটি[১] মিলিয়াছে। একটি পদ খুব ভালো। কৃষ্ণের রূপবর্ণনা।

> বদনচান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো
> কে না কুন্দিলে দুটি আঁখি
> দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ কেমন করে
> সেই সে পরাণ তার সাথী।…
> অমিয়া-মধুর বোল সুধা থানিথানি গো
> হাতের উপরে লাগি পাও
> তেমনি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো
> ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাও।
> করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো
> হিঙ্গুলে মড়িত তার আগে
> যৌবনবনের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো
> উহারি পরশরস মাগে।…

অনুমান করি, পদটি গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর রচনা।

৫

নরোত্তম দাস (দত্ত) ধনীর সন্তান। পিতা কৃষ্ণানন্দ, মাতা নারায়ণী। নিবাস পদ্মাতীরে গোপালপুর গ্রামে। গোপালপুর আধুনিক রাজশাহী জেলার অন্তর্গত। প্রাচীন দেওপাড়া—যেখানে বিজয়সেন প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন—তাহার নিকটেই। নরোত্তম পরে বাস করিতেন একটু তফাতে খেতরী গ্রামে। নরোত্তমের পিতৃব্য পুরুষোত্তম দত্ত গৌড়ের রাজকর্মচারী ছিলেন।[২]

---

[১] HBL পৃ ৯৪। এগুলি তাঁহার ভক্ত-শিষ্যের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়।

[২] গোবিন্দদাস কবিরাজের 'সঙ্গীতমাধব' নাটকের প্রস্তাবনায় এই তথ্যটি পাই, "পদ্মাবতীতীরবর্তিগোপালপুরনগরনিবাসিগৌড়ধিরাজমহামাত্য-শ্রীপুরুষোত্তমদত্তসত্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষ-দত্তঃ। স হি শ্রীনরোত্তমদত্তসত্তমমহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্যভ্রাতৃশিষ্যঃ।" লুপ্ত সঙ্গীতমাধবের এই অংশটুকু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় উদ্ধার করিয়াছিলেন।

রঘুনাথ দাসের মতোই নরোত্তম বাল্যকাল হইতে ধর্মপরায়ণ এবং বিষয়-বিমুখ। রীতিমত সন্ন্যাসগ্রহণ না করিলেও ইনি বৈরাগীর জীবনযাপন করিতেন বলিয়া অনুমান হয়। পিতৃব্যপুত্র ও শিষ্য সন্তোষ দত্ত (সন্তোষ রায়) বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। এক মতে পিতার মৃত্যুর পরে আর এক মতে পিতার জীবৎকালেই—নরোত্তম বৃন্দাবনে চলিয়া যান। সেখানে অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য লোকনাথ (চক্রবর্তী) গোস্বামীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া জীব গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সম্ভবত এইখানেই শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সঙ্গে তাঁহার মিলন। দ্বিতীয় মতই সত্য বলিয়া মনে হয়। কেন মনে হয় বলিতেছি।

নরোত্তমের ধর্মজীবনের সূত্রপাত যে বাল্য হইতেই এবং বৃন্দাবনগমনে যে সে জীবনের প্রথম পর্যায়ের অবসান তাহা সাধনপথে প্রবর্তকদের উপদেশচ্ছলে 'সাধনভক্তিচন্দ্রিকা' (নামান্তর 'ভক্তিউদ্দীপন') নিবন্ধে নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন।[১]

বালককালেতে স্বপ্নে সাধু-আজ্ঞা পাইয়া
মন মধ্যে সিদ্ধি হয় কৃষ্ণগুণ গাইয়া।
তবে ত পৌগণ্ড আসি উপস্থিত হয়
আচম্বিতে অন্যকথায় কৃষ্ণগুণ গায়।
অন্যান্য বালক সঙ্গে হস্ততালি দিঞা
কৃষ্ণগুণ গায় তবে নাচিয়া নাচিয়া।
তবে ত কৈশোর আসি হয় উপস্থিত
নানা দুর্দৈব তবে পড়ে আচম্বিত।
মাতা পিতা স্থানে তবে দৃঢ় আজ্ঞা লইয়া
বৈষ্ণব গুরু করি দূর পথে যাইয়া।
যদি তারে আজ্ঞা নাহি দেয় পিতামাতা
মন মধ্যে সাধু-আজ্ঞা পালি স্বপ্নকথা।
মাতাপিতার আজ্ঞা তবে কিছুই না মানে
ক্রোধে উপবাস করি রহে প্রিয়স্থানে।
এইমত কত দিন বিষাদ করিয়া
সেই উপাসনা করে মাতাপিতাকে ছাড়িয়া।...

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া নরোত্তম এখানে ওখানে ভক্তিপ্রচার করিয়া বেড়ান নাই। ঘরে বসিয়া সাধনভজনে নিরত ছিলেন। দেববিগ্রহের প্রতিষ্ঠা

[১] অনেকগুলি পুথি মিলিয়াছে। ক ১২৫৩ (লিপিকাল ১৭৭৩ শকাব্দ), বি ১৩৭, বি ১৭৯, বি ৫২০ (লিপিকাল মাঘ ১১১১ মল্লাব্দ?)। সা-প-প- ৬ পৃ ২৫৫ দ্রষ্টব্য।

উপলক্ষ্যে মহোৎসবসম্ভার করিয়াছিলেন, এবং সব চেয়ে বড় কথা পদাবলী-কীর্তনগানকে একটি বিশিষ্ট ও উৎকৃষ্ট শিল্পের ভূমিতে উন্নীত করিয়াছিলেন। নরোত্তম খেতরীতে যে মহোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহাতে বাঙ্গালা দেশের সর্বস্থান হইতে বৈষ্ণব-মহান্ত ও ছোটবড় ভক্ত সমবেত হইয়াছিল। আসর পাতিয়া রীতিমত পদাবলী-কীর্তনের শুরুও সেই উৎসব হইতে। খেতরী-উৎসবের তারিখ জানা নাই। অনেকে মনে করেন ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ। এ তারিখের সমর্থনে কোন তথ্য নাই, প্রবল যুক্তিও নাই। আরও বিশ-পঁচিশ বছর পরে হওয়া কিছু মাত্র অসম্ভব নয়।

শ্রীনিবাস (এবং গুরু লোকনাথ?) একদা নরোত্তমের কাছে আসিয়া দশ দিন ছিলেন। সেই সময়েই রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে নরোত্তমের অন্তরঙ্গতার শুরু। গুরু লোকনাথ, আচার্য শ্রীনিবাস ও সুহৃৎ রামচন্দ্রের মৃত্যুতে কাতর হইয়া নরোত্তম যে একটি শোচক স্তব লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই তথ্য পাই। পদটি উদ্ধৃতির যোগ্য।[১]

পতি বিনে সতী কাঁদে শিরে দিয়া হাত
এই দশা করি গেল স্বামী লোকনাথ।
পড়িনু অগাধ জলে কূল রহে দূর
কেশে ধরি তুলি লেহ আচার্য ঠাকুর।
দশ রাত্রি সঙ্গে করি বহু কৃপা কৈল
রামচন্দ্র কবিরাজের সাথে সঁপি দিল।
আমার আগে রামচন্দ্র পুনঃ পুনঃ কয়
এই কৈল যেন কিছু নরোত্তমে রয়।
হায় রে দারুণ বিধি কি কর্ম করিলা
রামচন্দ্র কবিরাজ হরিয়া লইলা।
একুইকালে ছাড়ি গেল ঠাকুর শ্রীনিবাস
তেপান্তরে পড়ি কাঁদে নরোত্তম দাস।

নরোত্তম অপণ্ডিত ছিলেন না, কিন্তু নিজ রচনায় পাণ্ডিত্যের ছায়া ফেলেন নাই। গোস্বামীদের ভক্তিশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন কিন্তু সার করিয়াছিলেন—ভাগবত নয়, চৈতন্যচরিতামৃত।[২] নরোত্তম যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন সব বাঙ্গালায়।

[১] নরোত্তম-পদাবলীর পুথি, শ্রীমান্ সত্যকিঙ্কর সাঁই সংগৃহীত। লিপিকাল ১৭৩৩ শকাব্দ। নরোত্তমের বিরাশীটি পদ আছে।

[২] চৈতন্যচরিতামৃতের শ্লাঘ্য প্রশংসা সর্বপ্রথম নরোত্তমই করিয়াছিলেন তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য়

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকতমাঝ যেহোঁ কৈল চৈতন্যচরিত
গৌরগোবিন্দলীলা শুনিতে গলয়ে শিলা তাহে না জন্মিল মোর প্রীত।"

কয়েকখানি উপদেশ ও সাধন-নির্দেশনিবন্ধ, কয়েকটি সাধন ও প্রার্থনা কবিতা ও পদ, এবং কিছু রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী—ইহাই নরোত্তমের রচনাবলী। গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত বল্লভদাসের ভনিতাযুক্ত একটি পদে নরোত্তমের রচনার যে তালিকা আছে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।[১] পদটি কোন প্রামাণিক পদাবলীসংগ্রহে পাওয়া যায় নাই। হয়ত বল্লভদাস নরোত্তম-শিষ্য নহেন, হয়ত তিনি অনেক পরবর্তী কালের লোক। তবুও সরাসরি অগ্রাহ্য করা যায় না।

চন্দ্রিকা পঞ্চম সার তিন মণি সারাৎসার
গুরুশিষ্যসংবাদপটল
ত্রিভুবনে অনুপাম প্রার্থনা গ্রন্থের নাম
হাটপত্তন মধুর কেবল।
রচিলা অসংখ্য পদ হৈয়া ভাবে গদ্‌গদ
কবিত্বের সম্পদ সে সব…

পাঁচ "চন্দ্রিকা" হইতেছে 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'[২], 'সাধনভক্তিচন্দ্রিকা'[৩], 'সাধ্যপ্রেম-চন্দ্রিকা'[৪], 'সিদ্ধভক্তিচন্দ্রিকা' (বা 'রসভক্তিকা')[৫] ও 'চমৎকারচন্দ্রিকা'।[৬] 'গুরুশিষ্যসংবাদপটল'এর নামান্তর 'উপাসনাপটল' (বা 'উপাসনাতত্ত্বসার' বা 'সিদ্ধিপটল')।[৭] আরও দুই একটি "পটল" পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে একটি, 'চতুর্দশপটল' নরোত্তমের রচনা হওয়া সম্ভব।[৮] তিন "মণি"র মধ্যে একমাত্র 'প্রেমভক্তিচিন্তামণি'[৯] পাওয়া গিয়াছে। অপ্রাপ্ত নিবন্ধ দুইটির নাম নাকি 'চন্দ্রমণি' ও 'সূর্যমণি'। 'হাটপত্তন' কবিতা বলরামদাসের একটি পদের বিস্তারিত সংস্করণের মতো। এই কবিতাটি বৈষ্ণবদের নিত্যপাঠ্যরূপে সেদিন পর্যন্ত সমাদৃত ছিল।

নরোত্তম রাগমার্গের সাধক ছিলেন। তাঁহার সাধনরীতিতে তান্ত্রিক আচার

---

[১] দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ ৪৭।

[২] বহু বহুবার মুদ্রিত। পুরানো পুথি—গ ৩৬১৬ (লিপিকাল ১০১৬ মল্লাব্দ ?), গ ৩৫৮৬ (লিপিকাল ১১১১ মল্লাব্দ ?), স ২৫৮ (লিপিকাল ১১৫৮)। সা-প-প ৬ পৃ ৬২ (বর্ণিত পুথির লিপিকাল ১০৯৬ মল্লাব্দ ?) [৩] আগে দ্রষ্টব্য। [৪] সা-পা-প ৮ পৃ ৪১ দ্রষ্টব্য। [৫] স ৭৯ (লিপিকাল ১২১৪)। সা-প-প ৬ পৃ ৬৬। গোবিন্দদাসের ভনিতায় রসভক্তিচন্দ্রিকা মিলিয়াছে (স ১৮৬)। শ্রীচৈতন্যদাস-ভনিতায় 'আশ্রয়নির্ণয়' নামান্তরে রসভক্তিচন্দ্রিকা মিলিয়াছে। [৬] স ৩০৭ (লিপিকাল ১২১০)। লা-প-প ৬ পৃ ২৬৩ দ্রষ্টব্য। [৭] ক ১২৫৯, ক ১২৬০ (লিপিকাল ১২২২), গ ৫৪৪৩ (লিপিকাল ১২২৯); সা-প-প ৬ পৃ ৫৪ (লিপিকাল ১২১২); বি ৯৭০ (লিপিকাল মাঘ ১১৮৬)। [৮] বি ৫১৮ (লিপিকাল ১০৮০ মল্লাব্দ)। আর একটি হইতেছে 'অভিরামপটল' (ক ১৩১২)। [৯] গ ৫৩৫৬।

কিছু ছিল কিনা জানি না। তবে তিনি বৈষ্ণব-তান্ত্রিক সাধক—যাঁহাদের আমরা এখন সহজিয়া বা বাউল বলিয়া চিহ্নিত করি—তাঁহাদের গুরুস্থানীয় বলিয়া মান্য হইয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের অনেক রচনাও সেই কারণে নরোত্তমের নামে চলিয়া গিয়াছে। এইসব রচনার নাম একত্র করিতেছি। এগুলির মধ্যে নরোত্তমের রচনা কিছু হয়ত আছে। তবে অধিকাংশই তাঁহার রচনা নয় এবং সেগুলি আকারে নিতান্ত ছোট।

'দেহকড়চ'[১], 'স্মরণমঙ্গল'[২], 'স্বরূপকল্পতরু'[৩], 'ছয়তত্ত্বমঞ্জরী' বা 'ছয়তত্ত্ব-বিলাস'[৪], 'বস্তুতত্ত্ব' বা 'বস্তুতত্ত্বসার'[৫], 'ভজননির্দেশ'[৬], 'আশ্রয়নির্ণয়' বা 'আশ্রয়তত্ত্ব'[৭], 'রাধাতত্ত্ব' বা 'নবরাধাতত্ত্ব'[৮], 'রাগমালা'[৯], 'ভক্তিলতাবলী'[১০], 'ভক্তিসারাৎসার'[১১], 'প্রেমবিলাস'[১২], 'বৈষ্ণবামৃত'[১৩], 'প্রেমমদামৃত'[১৪], 'মঙ্গলারতি'[১৫] ইত্যাদি।

দেহকড়চ ও সিদ্ধিপটলের মতো রচনাগুলি গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তররূপে রচিত। ভাষা পদ্য নয়, গদ্যও নয়। পাঠশালায় যেমন করিয়া নামতা ঘোষা হয় অথবা মজুরেরা ভারি বস্তু টানিবার সময় যেমন তালে তালে চেঁচায় (—"মারো জোয়ান" "হঁইও"—) তেমনি কাটা কাটা ছড়ার মতো। সেকালে বোধ করি এমনি করিয়াই প্রথম শিক্ষার্থীকে পাঠ পড়ানো হইত। যেমন

> তুমি কে : আমি জীব। তুমি কোন জীব : আমি তটস্থজীব।
> থাকেন কোথায় : ভাণ্ডে।...[১৬]
> কোন রস : প্রেম রস। কোন প্রেম : নব প্রেম।
> কোন গণ : প্রহরার গণ। কোন প্রহরা : নবরস প্রহরা।...[১৭]

---

[১] ক ৫৩৯। সা-প-প ৪ পৃ ৪০-৪৬ (লিপিকাল ১৬০৩ শকাব্দ)।

[২] গ ৩৭৩০ (লিপিকাল ১০১২ মল্লাব্দ?)। সা-প-প পৃ ৪৯ (১৬৮৫ শকাব্দ)।

[৩] স ৫৩৬ (৩৬ পাতার পর খণ্ডিত)। [৪] স ৩৫৪, ৩৫৫। [৫] স ৩১৬, ৩১৭। লোচন-দাসের 'বস্তুতত্ত্বসার' দীর্ঘতর নিবন্ধ (গ ৩৯৬৩)।

[৬] গ ৩৮২১ (লিপিকাল ১২২৯)।

[৭] স ২১১; সা-প-প ৮ পৃ ৫৩-৫৪ (লিপিকাল মাঘ ১৭০৫ শকাব্দ); বি ৩২৩, ৭৫৫। কৃষ্ণদাসের ভনিতায়ও আশ্রয়নির্ণয় পাওয়া যায় (গ ৩৫৮৫)।

[৮] ক ১১৭৪, গ ৪৯৪৭ (লিপিকাল পৌষ ১১৪৫)।

[৯] গ ৫৩৮৫। সা-প-প ৬ পৃ ২৬৭ (লিপিকাল ১২৪১) পৃ ৫১ (লিপিকাল পৌষ ১১৪৩); বা-প্রা-পু-বি ২-১ পৃ ৭৬-৭৮ (লিপিকাল ১১৫৭)।

[১০] গ ৩৫৪৪ (লিপিকাল ১১১১ মল্লাব্দ?), গ ৫৪৩৫। [১১] গ ৪৯৫৭। আরম্ভে যদুনাথ দাস-ভনিতায় পদাংশ উদ্ধৃত আছে। [১২] গ ৫৩৬৮। [১৩] গ ৪৯৮৯ A, বি ১৭৮। শেষে ভনিতায় "শ্রীআচার্যপ্রভুর" পাদপদ্মের উল্লেখ আছে। [১৪] ক ১২১২। [১৫] বি ১০৮। [১৬] দেহকড়চ।

[১৭] সিদ্ধিপটল।

নরোত্তমের সমস্ত রচনার মধ্যে প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাই শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক সমাদৃত। ইহাতে সরল ভাষায় ও মসৃণ ছন্দে বৈষ্ণব ভক্তিসাধনার কয়েকটি মূল কথা সহৃদয় ও মধুর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র কাব্যটি বাঙ্গালী বৈষ্ণব সাধু ও গৃহী ভক্তেরা কণ্ঠহাররূপে ধারণ করিয়া আসিতেছেন আজ অবধি। অভিন্নহৃদয় মিত্র রামচন্দ্র কবিরাজের মৃত্যুর পর তাঁহারই 'স্মরণদর্পণ'এর অনুসরণে নরোত্তম প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা রচনা করিয়াছিলেন। নরোত্তম যে কতটা পরিমাণে রঘুনাথ দাসের ভাবে ভাবিত ছিলেন তাহা প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (ও প্রার্থনা পদ) হইতে বোঝা যায়। একটু নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি।

তুমি তো দয়ার সিন্ধু অধম-জনার বন্ধু মোএ প্রভু কর অবধান
পড়িনু অসৎ-ভোলে কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে ওহে নাথ কর মোরে ত্রাণ।
যাবৎ জনম মোর অপরাধে হইনু ভোর নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা
তথাপি তুমি সে গতি না ছাড়িহ প্রাণপতি আমা সম নাহিক অধমা।...
তুমি তো পরমদেবা নাহি মোরে উপেখিবা শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর
যদি করোঁ অপরাধ তথাপিহ তুমি নাথ সেবা দিয়া কর অনুচর।
কামে মোর হত চিত নাহি মানে নিজ হিত মনের না ঘুচে দুর্বাসনা
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু ওহে বাঞ্ছাকল্পতরু করুণা দেখুক সর্বজনা।...
নরোত্তম বড় দুখী নাথ মোরে কর সুখী তোমার ভজন সঙ্কীর্তনে
অন্তরায় নাহি যায় এই তো পরম ভয় নিবেদন করি অনুক্ষণে।

সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দে মোহনমাধুরীদাস প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার ব্যাখ্যা-নিবন্ধ রচিয়াছিলেন। বইটির নাম 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাকিরণ'।

'স্বরূপকল্পতরু' নিবন্ধটি মূল্যবান্। তবে এটি নরোত্তমের লেখা কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারি নাই। যদিচ গ্রন্থের রচয়িতা বলিতেছেন যে ইহা প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার পরে লেখা এবং যে-সব গুহ্যকথা পূর্বগ্রন্থে বলিতে পারেন নাই তাহা এখানে বিবৃত করিতেছেন,[১] তবুও ইহা যে নরোত্তমেরই লেখা সে বিষয়ে নিঃসংশয় নই। সংশয়ের কারণ, ভনিতায় গুরুর অনুল্লেখ এবং অনঙ্গমঞ্জরীর উল্লেখ।[২]

অনঙ্গমঞ্জরীর-পদ অহর্নিশি আশ
স্বরূপকল্পতরু কহে নরোত্তম দাস॥

বৈষ্ণব রসসাধনার অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব ইহাতে আছে, চৈতন্যচরিতামৃতের কোন কোন ছত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও আছে। প্রসঙ্গক্রমে নরোত্তমের নিজ

[১] "দন্তে তৃণ লঞা কহি শুন ভক্তগণ, এই গ্রন্থ সদা ভাই রাখিবে গোপন।...
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা পূর্বে করিয়াছি লিখন, আপন ভজনকথা রাখিনু গোপন।"

[২] খণ্ডিত পুথিটিতে (স ৫৩৬) ভনিতা একবার মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

কৃত ও অন্য-রচিত পদ এবং পদ্যাংশ উদ্ধৃত আছে। যেমন "তিন দ্বারে কবাট প্রভু যায়েন বাহিরে"—চৈতন্যচরিতামৃতের এই ছত্রের ব্যাখ্যায় কৃষ্ণদাস-ভনিতায় এই পদটি[১] উদ্ধৃত হইয়াছে।

সই সহজ বুঝিবে কে

তিমির আন্ধারে	আছে যেই জন	সহজ পায়্যাছে সে।
চাঁদের কাছে	অবলা আছে	সেই সে পিরিতি-পার
বিষেতে অমৃতে	একত্র মিলন	কে জানে মহিমা তার।
ভিতরে তাহার	তিনটি দুয়ার	বাহিরে একটি রয়
চতুর হইয়া	দুইটি ছাড়িয়া	একের কাছেতে হয়।
যেন আম্রফল	ভিতর বাহির	কুসি ছাল তার কষা
তার আস্বাদন	জানে যেই জন	করহ তাহার আশা।
কৃষ্ণদাস বলে	লাখে এক মিলে	ঘুচায়ে মনের ধান্ধা
শ্রীরূপ-কৃপাতে	যদি ইহা পাবে	হিয়া মন রাখ বান্ধা।[১]

নরোত্তম-ভনিতায় রাগাত্মিক পদ অন্যত্রও পাওয়া গিয়াছে।[২] স্বরূপ-কল্পতরুতে এই ভালো পদটি[৩] আছে।

সখি পিরিতি আখর তিন	জপহ রজনি দিন
পিরিতি না জানে যারা	কাষ্ঠের পুতলি তারা।
পিরিতি জানিল যে	অমর হইল সে।
পিরিতে জনম যার	কে বুঝে মহিমা তার।
যে জনা পিরিতি জানে	বেদবিধি সে কি মানে।
পিরিতি বেদের পর	হৃদয়ে তাহারি ঘর।…
ভজন পূজন যত	পিরিতি বিহনে হত।
পিরিত করহ আশ	কহে নরোত্তমদাস।

ভারতীয় সাধকদের সনাতন শুষ্ক বৈরাগ্যের ও কামিনীবিদ্বেষের বৈপরীত্যে বৈষ্ণব-সাধকের নারীসম্বন্ধে সহজ ভাবনা যে কতটা স্বাভাবিক ও সুস্থতার পরিচায়ক তাহা স্বরূপকল্পতরুর এই কয় ছত্র হইতে জানা যায়।

নারী বিনে কোথা আছে জুড়াবার স্থান
সর্বভাবে নারী হৈতে জুড়ায় পরাণ।…
পতিভাবে পুত্রভাবে ভ্রাতৃপিতৃভাবে
স্নেহ-মোহ-সমতা-মমতাভাবে সেবে।

---

[১] পৃ ১৫ খ। চণ্ডীদাস-ভনিতাযুক্ত একটি রাগাত্মিক পদের সঙ্গে এই পদের মিল আছে।

[২] স ৩৫৯। এই পুথিতে নরোত্তম ভনিতায় এগারোটি, নরহরি ভনিতায় তিনটি, চণ্ডীদাস ভনিতায় দুইটি, এবং আদি-চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, তরুণীরমণ, বংশী ও কবিরাজ-কৃষ্ণদাস ভনিতায় একটি করিয়া রাগাত্মিক পদ আছে। [৩] পৃ ৩২ খ।

নরোত্তমের প্রার্থনা-পদাবলী[১] অত্যন্ত সহৃদয় ও স্নিগ্ধ রচনা। বিশ্বস্ত বৈষ্ণব সাধকের জন্য বিশ্বাসী বৈষ্ণব সাধকের লেখা। অপ্রাকৃত-বৃন্দাবনে আস্থাহীন ও প্রাকৃত-বৃন্দাবনে বীতরাগ অ-বৈষ্ণব ব্যক্তির চিত্তও যদি বিশেষ কোনও রাগে রঞ্জিত না থাকে তবে নরোত্তমের প্রার্থনা-পদ শুনিলে আর্দ্র হইবে। একটি খুব পরিচিত পদ উদ্ধৃত করিতেছি।[২]

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক-শরীর
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর।
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।
রূপ-রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি।
রূপ-রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস।

নিম্নে উদ্ধৃত পদটিতে[৩] সাধক-কবি রাধাভাবে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় বাসনা অনুরাগিণী রাধার মনের কথায় প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন।

কিবা সে তোমার প্রেম কত লক্ষ কোটি হেম
সর্বদাই জাগিছে অন্তরে
পূরুবে আছিনু ভাগী তেঁই সে পাইয়াছি লাগি
প্রাণ কাঁদে বিচ্ছেদের ডরে।
কালিয়া বরণখানি আমার মাথার বেণী
আঁচরে ঢাকিয়া রাখি বুকে
দিয়া চাঁদমুখে মুখ পূরাব মনের সুখ
যে কহু সে কহু ছার লোকে।
মণি নহ মুকুতা নহ গলায় গাঁথিয়া লহো
ফুল নহ কেশে করি বেশ
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিত দেশে দেশ।
নরোত্তমদাস কয় তোমার চরিত্র নয়
তুমি মোরে না ছাড়িহ দয়া
যেদিন তোমার ভাবে আমার পরাণ যাবে
সেই দিন দিহ পদছায়া।

---

[১] প্রার্থনা-পদাবলীর সংখ্যা তিরিশের কম নয় (বি ৫০৬ দ্রষ্টব্য)। সব রকম পদ মিলিয়া আশীর উপর। ১৭৪৩ শকাব্দের (=১৮২১) পুথিতে পদসংখ্যা ৮২। ১২০০ সালে লেখা একটি পুথিতে ৭৯ পদ ছিল (সা-প-প ৮ পৃ ২১; স ৪৭৭)। 'গীতচিন্তামণি' নামে নরোত্তম-পদাবলী ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে ছাপা হইয়াছিল। [২] প-ক-ত ৩০৪৬। [৩] কীর্তনানন্দ পৃ ৩১৪।

লোকপ্রচলিত গল্প-রূপকথা অবলম্বনে গঠিত ও অধ্যাত্মসাধনাঘটিত নিম্নে উদ্ধৃত পদটিও নরোত্তমের উল্লেখযোগ্য রচনা।[১]

যাবার বেলায় পথে সম্বল নাহিক সাথে সুধামৃত পড়্যা গেল মনে
হঞাছিলাম বিস্মৃত স্মৃতি হৈল আচম্বিত প্রাপ্ত বস্তু নিল কোন জনে।
শুন ওহে বান্ধব কেবা হরিল মোর ধন
অনেক করিয়া শ্রম পাঞাছিলাম প্রেমধন হেন ধন নিলে কোন জন।
কলিঙ্গদেশেতে ছিল গাছে চড়ি হেথা আইল সঙ্গে করি দুই হাড়ির ঝি
কি করিতে কিনা করি আপনি বুঝিতে নারি সেই হৈতে বাউল হঞাছি।
কিবা ফাঁসিয়ার খুড়ি আদর করিল বড়ি[২] তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিল স্ত্রীকলাতে[৩]
ধন মন সব নিল প্রাণে কেনে না মারিল মুই রহি কি সুখ ভুঞ্জিতে।
কুহক জাতিয়ার ঝি লাগাইঞা ভেলকি দেখাইঞা অকৈতব ধন
স্বর্ণকারের নারী[৪] ফেরে ফুরে কৈল চুরি তামা দিঞা লইল রতন।
বাদিয়ার সতিনী সঙ্গে করি দুই ফণী সেই ফণী দংশিল কপালে
বিষেতে জারিল গা কোথা হাত কোথা পা লোটাঞা পড়িনু ভূমিতলে।
নরোত্তমদাস কয় একথা অন্যথা নয় রাখ প্রেম সাবধান হঞা
চৈত্য[৪] -রূপের দয়া হবে পরম আনন্দ পাবে কেনে মর ভাবিঞা গুণিঞা।

একটি এক পাতার পুথিতে এই অধ্যাত্মরূপক কবিতাটির রূপান্তর আর একটু বড় পদ পাইয়াছি।[৫] নরোত্তমের অধ্যাত্মসাধনার নির্দেশ ইহাতে পাওয়া যায় এবং কবিতাটির মধ্যে গল্পের আমেজ আছে বলিয়া এখানে সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করিলাম। পুষ্পিকায় কবিতাটির নাম আছে 'পদাবলীচূর্ণ'। পাঠে অল্পস্বল্প ভুলচুক আছে।

কোন ভাগ্যবান্ পথে যাইতে ভাবিল, দূরদেশ নাহি সাথে সম্বল রহিল।
কি করিতে কী না করি না জানি নিশ্চয়ে, ভাবিতে বান্ধব মন হইল সদয়ে।
রাধাকৃষ্ণপাদপদ্মমকরন্দ এড়ি, করিলে বিষয় ভোগ সাধুসঙ্গ ছাড়ি।
ভক্তিবীজ পাঞা তাতে না কৈলে শ্রবণ[৬] বাড়ি গেল উপশাখা নহিল ছেদন।
যথা গেল এ লতা তথা অবিলম্বে যাবে, এ জনমের মতে ফল ফুল না পাইবে।
লিঙ্গযুক্ত কায় ধরি জীবদেশে ছিল, শরীরের বৃক্ষ চড়ি পৃথিবী আইল।
পুণ্য প্রতিষ্ঠা দুই হাড়ির কুমারী, সঙ্গে করি আনিয়াছে প্রতিষ্ঠা বড় করি।
কর্ম তোমার ফাসিয়ারা মাতাপিতার শোকে, পিতার রাগ মাতার প্রেম[৭] দোহে পরলোকে।
খুড়া তোর অনুরাগ খুড়ি প্রতিমৃত্যু, ছেউড় দেখিয়া অস্ত্র দিল শিক্ষা হেতু।

---

[১] বি ৫৩৮। শ্রীমান্ পঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত 'পুথি-পরিচয়' দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ২৩১ দ্রষ্টব্য। পাঠ কিছু সংশোধন করিয়া লইয়াছি।

[২] পাঠ "বহুরি"। [৩] ঐ "তিরিকলাতে"। [৪] ঐ "চৈত্র"।

[৫] মালদহ অঞ্চলে প্রাপ্ত পাতড়া। শ্রীমান্ আশুতোষ দাস সংগৃহীত। আরম্ভে আছে,— "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নমস্করোমি", শেষে,—"ইতি পদাবলিচূর্ণ সমাপ্ত।" লিপিকার বিদ্যাধর সরকার।

[৬] "সেবন" হইবে। [৭] "পিতা…মাতা" হইবে?

অঙ্গ শব্দে অস্ত্র করি রামার[১] বাম অঙ্গ, বাহ্য রস মগ্ন দেখি দোহে দিল ভঙ্গ।
জ্ঞান তোল[২] দেখাইল অকৈতব ধন, বাহ্য ছাড়িয়া কর্ম কাণ্ডে দিল মন।
সম্পদের স্বর্ণকার[৩] অকস্মাৎ আসি, পুত্র বধূ পরিবার সহ হৈল দাসী।
পুত্র নাম বাণিজ্য বধূ নাম লভ্য, লাভে লুব্ধ হৈল চিত্ত ভোল ভক্তি লভ্য।
দানি বাদিয়া আইল দানি বাদিয়ানি, তার শোভায় মগ্ন হৈল দিবসরজনি।
দানির ভূষণ ছিল দুই মণি গলে, ফণী আগে মণিতে দংশিল কপালে।
এক ফণী মুক্তি হয় আর ফণী ধর্ম, তার বিষে অবশাঙ্গ কামে সর্ব কর্ম।
রাধাকৃষ্ণ না ভজিলে কহিলে কি হয়, মুক্তি ব্যাঘ্রিনীর পেটে যাইবে নিশ্চয়।
স্মরণ কীর্তন জন তবে হবে সাথ লতা অঙ্গে পল্লব জন্মিব অকস্মাৎ।
নরোত্তমদাসের পুন এই নিবেদন, শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥

'কোন ভাগ্যবান্ (সাধক) দূর দেশে যাইবার বাসনা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল যে সঙ্গে কোন পাথেয় নাই। তখন বন্ধুর উপদেশ মনে পড়িল। 'রাধাকৃষ্ণের পদারবিন্দ মধু পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ ছাড়িয়া', বিষয়ভোগ করিলে। ভক্তিবীজ পাইয়া তাহাতে সেচন করিলে না। উপশাখা বাড়িয়া গেল, তাহা ছেদন হইল না। এ ভক্তিলতা (বাড়িয়া বাড়িয়া) যেখানে গিয়াছে সেইখানে অবিলম্বে যাইতে হইবে। তবে এ জন্মে ফুল ও ফল ধরিবে না। লিঙ্গরূপ কায় ধরিয়া (আত্মা) জীবদেশে ছিল, শরীররূপ বৃক্ষে চড়িয়া (ডাকিনীর মত) এদেশে আসিয়াছে। দুই হাড়িঝি (ডাকিনী দেবী) পুণ্য ও প্রতিষ্ঠাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠা বড়। মাতাপিতার শোকে তোমাকে ফাঁসুড়ের কাজ করিতে হইতেছে। পিতা রাগ (প্রীতি) ও মাতা প্রেম দুইজনেই পরলোকপ্রাপ্ত। তোমার খুড়া অনুরাগ, খুড়ি···মাতাপিতৃহীন দেখিয়া শিক্ষার জন্য (তোমাকে) অস্ত্র দিল'। নারীর (বা শরীরের) বাম অঙ্গ অস্ত্র। (তোমায়) বাহ্যরসে মগ্ন দেখিয়া দুইজনেই পলাইল। অকৈতব ধন বলিয়া অতুল জ্ঞান দেখাইল। বাহ্য ছাড়িয়া কর্মকাণ্ডে মন দিল। সম্পদ্‌রূপ স্বর্ণকার অকস্মাৎ আসিল এবং পুত্র বধূ পরিবার সহিত দাসী হইল। ছেলের নাম বাণিজ্য, বউয়ের নাম লাভ। চিত্ত লাভলুব্ধ হইয়া ভক্তিলভ্য ভুলিল। দানী (কর-আদায়কারী) বেদে ও বেদেনী আসিল। তাহারা সবাই (মূলে "সোভায়") দিনরাত্রি মগ্ন রহিল। দানীর গলায় ভূষণ ছিল দুইটি মণি (ফণী?)। মণি সত্ত্বেও ফণী কপালে দংশন করিল। এক (ফণী) মুক্তি, অপর ফণী ধর্ম। তাহার বিষে সর্বাঙ্গ অবশ, সব কর্ম কামময় (?)। রাধাকৃষ্ণ ভজনা না করিলে শুধু কথায় কিছুই হইবে না এবং মুক্তি-বাঘিনীর পেটে যাইতে হইবে। স্মরণকীর্তনে সাথী যখন পাওয়া যাইবে তখন অবিলম্বে (ভক্তি-) লতার অঙ্গে পাতা গজাইবে।' নরোত্তম দাস এই নিবেদন করিতেছে যে, (ইহাতে) শাখাচন্দ্রন্যায় অনুসারে (সাধন-পদ্ধতির) দিগ্‌দর্শন করা হইল।'

৬

শ্যামানন্দ দাসের নাম গুরুর (মতান্তরে জীব গোস্বামীর) দেওয়া। বাপ-মা নাম রাখিয়াছিলেন "দুঃখী" (বা "দুঃখী কৃষ্ণদাস")। পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতা দুরিকা। জাতি সদ্‌গোপ। আধুনিক মেদিনীপুর জেলার খড়্‌গপুরের নিকটে ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে ইহাদের নিবাস ছিল। শ্যামানন্দ পরে দণ্ডেশ্বর গ্রামে গিয়া বাস করেন। জন্মকাল জানা নাই, মৃত্যু আনুমানিক ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দে।

[১] অথবা "কায়ার"। [২] "জ্ঞান অতুল"? [৩] পাঠ "সম্বলার", "সম্বলার"।

চৈতন্য-নিত্যানন্দের ভক্ত আম্বুয়া-নিবাসী গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ানন্দ (বা হৃদয়চৈতন্য) শ্যামানন্দের দীক্ষাগুরু। বৃন্দাবনে গিয়া শ্যামানন্দ জীব গোস্বামীর কৃপা লাভ করেন এবং শ্রীনিবাস-নরোত্তমের সঙ্গে মিলিত হন। শ্যামানন্দের সাধনা পুরাপুরি সখীভাবের এবং নরোত্তমের মতোই। তবে শ্রীনিবাসের মতো তিনি এখানে ওখানে যাইতেন এবং ভক্তিপ্রচারের উদ্দেশ্যে প্রভাব বিস্তার করিতেন। একাজে ইহার দক্ষিণহস্ত হইয়াছিলেন মুরারি দাস, যিনি পরে রসিকানন্দ বা রসিকমুরারি নামে সমধিক পরিচিত হইয়াছিলেন।[১] বাঙ্গালা-উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলে ও ঝারিখণ্ডে চৈতন্যের ভক্তিধর্ম প্রচার মুখ্যত শ্যামানন্দ ও তাঁর শিষ্যেরই কীর্তি।

শ্যামানন্দ সংস্কৃত জানিতেন তবে সংস্কৃতে কিছু রচনা করেন নাই। বাঙ্গালায় কিছু স্তব, পদাবলী ও ছোট ছোট সাধন-নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 'গোবর্ধনস্তব' অনুবাদ।[২] প্রথম স্তবক উদ্ধৃত করিতেছি। চতুর্থ চরণ ধুয়া, রঘুনাথ দাসের 'গোবর্ধনবাস প্রার্থনাদশক'এর ধুয়ার প্রতিধ্বনির মতো,—"নিজ-নিকটনিবাসং দেহি গোবর্ধন ত্বম্"।

> তিন অক্ষরে বীজ তিন বর্ণ ধরে
> লাল নীল পীত সেই অতি শোভা করে।
> তব বস্তু যে বা সাধে সেই তুআ জানে
> দ্বার দেহ গিরি দেখি নন্দের নন্দনে।[৩]

পদকল্পতরুতে প্রাপ্ত "দুঃখী কৃষ্ণদাস" ভনিতার অন্তত তিনটি পদ শ্যামানন্দের রচনা বলিয়া মনে করি।[৪] "দীন কৃষ্ণদাস" ভনিতার দুই একটি পদও ইহার রচনা হইতে পারে। শুধু "দুঃখী" ও দুঃখিনী" ভনিতায়ও কয়েকটি পদ (এবং স্তব) পাওয়া গিয়াছে।[৫] (দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "দুঃখিনী" ভনিতার

---

[১] গোপীজনবল্লভ দাসের 'রসিকমঙ্গল'এ (দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীযুক্ত গোপালগোবিন্দ দেব গোস্বামী সম্পাদিত ও শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর হইতে প্রকাশিত, চৈতন্যাব্দ ৪৫৫ রসিকাব্দ, ৩৫১) রসিকানন্দের ও শ্যামানন্দের কথা আছে। নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকরে ও নরোত্তমবিলাসে শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের বিবরণ আছে।

মুরারি আচার্যের 'বিন্দুপ্রকাশঃ' গ্রন্থে শ্যামানন্দের বৃন্দাবনগমন ইত্যাদির কথা আছে। বইটির রচনাকাল ১৬১৮ শকাব্দ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দগোপালানন্দ দেব গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৪১)। কৃষ্ণচরণ দাসের 'শ্যামানন্দপ্রকাশ' দ্রষ্টব্য।

[২] স ৫৩৭ খ। স্তবক-সংখ্যা তেইশ। এই ধরণের আরও একটি রচনা আছে (স ৫৩৭ গ)।

[৩] দ্বিতীয় ছত্রে "লাল" শব্দটির ব্যবহার সন্দেহজনক। রক্তবর্ণ অর্থে আরবী শব্দটির ব্যবহার তখন বাঙ্গালায় খুব চলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে বৃন্দাবন-অঞ্চলে হয়ত হইয়াছিল।

[৪] HBL পৃ ১০১ দ্রষ্টব্য। [৫] স ৫৬৭, ৫৩৭ঙ। খণ্ডিত পুথি, মেদিনীপুর অঞ্চলের। শেষ পদের সংখ্যা ২৮। মধ্যের পুষ্পিকা, "ইতি শ্যামানন্দ দাস বিরচিতং সাধকে সিদ্ধরূপস্থ দর্শন প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ।'

পদগুলি কোন নারী-কবির রচনা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুবর্তীরা এখনও এই ভুল ধারণা আঁকড়াইয়া আছেন।) কিছু উদাহরণ দিতেছি প্রথম পদটি রাধার নৃত্য বর্ণনা, সে কালের বাই-নাচের ভঙ্গিতে।

প্রথমে তুরিতগতি নাচিতে লাগিলা
পদ কটি হৃদি গ্রীবা ঘন চালাইলা।
তবে কবুতরগতি নর্তন আরম্ভ
ভূমিতে লুটিয়া বুলে উলটিআ-ছন্দ।
নিজ শিরে দুই পদ উলটিআ দিআঁ।
মউর-অঙ্গেতে যেন পুচ্ছ পসারিআঁ।
ভূমি পরি চিবু ধরি হস্তের চালন
ক্ষণে দ্রুতগতি ক্ষণে মন্থরগমন।
এই মতে নানা নৃত্য করি কতক্ষণ
ক্রমেতে নাচেন সব প্রিয়সখীগণ।...
আহা মরি কি মাধুরি ভাবের তরঙ্গ
দুখি ভাবে অনুভবে বিনু রাই-সঙ্গ।

দ্বিতীয় পদটির ভনিতায় "দুঃখী" ও "দুঃখিনী" দুইই পাই।[১]

এইরূপ নিরখিয়া শ্রীরতি-কস্তুরী[২]
হাসিতে লাগিলা দোঁহে করি ঠারাঠারি।
দেখ' সখি শ্যাম-অঙ্গে বিকার রাধার
কামতরঙ্গ রতি নাম ইহার।
রাই ভাবে অবশ হইল শ্যাম-দেহ
অন্তরে বিনোদ প্রেম মাধুর্যের গেহ।
এইরূপে রাই-কানু-প্রেমরসে বশ
মাধুর্য-আনন্দ নিধি পরম উৎকর্ষ।
দেখ দুখি মিলি আঁখি কস্তুরিকা[৩] কহে
করযোড়ি নমস্করি দুখিনি রহএ॥

শ্যামানন্দের নামে এই সাধনানিবন্ধগুলি পাওয়া গিয়াছে,—'উপাসনাসার' (বা 'উপাসনাসারসংগ্রহ'),[৪] 'ভাবমালা',[৫] 'অদ্বৈততত্ত্ব,[৬] ও 'বৃন্দাবন-পরিক্রমা'[৭]। উপাসনাসারের আদ্যন্তমধ্যে জীব গোস্বামীর দোহাই আছে। শেষের ভনিতা

শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর পাদপদ্ম আশ
উপাসনাসার কহে শ্যামানন্দ দাস।

---

[১] ঐ পদসংখ্যা ১৭।

[২] অর্থাৎ রতিমঞ্জরী ও কস্তুরীমঞ্জরী। [৩] অর্থাৎ কস্তুরীমঞ্জরী। [৪] সা-প-প ৬ পৃ ২৫২।

[৫] স ৫৩৭ ঘ। [৬] সা-প-প ৫ পৃ ১৯৭। পুথি শ্রীহট্ট অঞ্চলের, সুতরাং অন্য কাহারও রচনা হইতে পারে। [৭] ঐ পৃ ২০৩। ইহাতে "দুঃখী কৃষ্ণদাস" ভনিতা আছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণলীলা পাঞ্চালী ও পদাবলী-বিধান

১

বাঙ্গালায় প্রথম কৃষ্ণলীলা কাব্য শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবত অনুসরণে লেখা। তাহার কিছুকাল পরে যশোরাজ খান যে 'কৃষ্ণমঙ্গল' লিখিয়াছিলেন সে এখন বিলুপ্ত।[১]

অতঃপর যে কয়খানি কৃষ্ণলীলা কাব্য রচিত হইয়াছিল সেগুলি চৈতন্যভক্তের রচনা। প্রথমে গোবিন্দ আচার্যের 'কৃষ্ণমঙ্গল'। গোবিন্দ আচার্য পদাবলীও লিখিতেন। সে কথা আগে বলিয়াছি। "দ্বিজ" গোবিন্দ ভনিতায় একটি কৃষ্ণমঙ্গলের পুথি অনেক দিন হইতে এসিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহে আছে।[২] এই রচনাটিকে আমি গোবিন্দ আচার্যের কৃষ্ণমঙ্গল বলিয়া মনে করি। ভনিতা হইতে জানা যায় যে কবি চৈতন্য-নিত্যানন্দের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন।[৩] ষোড়শ শতাব্দের প্রথম দিকে বৈষ্ণবেরা প্রধানত গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা-লাভ করিতেন। গোবিন্দের উপাস্যও গোপাল। ভনিতায় বার বার উল্লেখ আছে।[৪] মায়ের উপর কবির বিশেষ ভক্তি ছিল।

প্রণামিঞাঁ জননীর চরণ কমলে
গোপাল ভাবিয়া দ্বিজ গোবিন্দ বোলে।

কাব্যটি পুরাপুরি বর্ণনাময়। ছন্দ বেশির ভাগ পয়ার। ভাষায় ব্রজবুলির ছাপ নাই। সর্বদা রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। সুতরাং কাব্যটি গেয় পাঞ্চালী বটে। প্রথমে পরীক্ষিতের কাহিনী, তাহার পর যথাক্রমে ধ্রুবচরিত্র, অজামীলের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, গজেন্দ্রমোক্ষণ ও রামলীলা। এই অবধি ভাগবতের

---

[১] পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে উদ্ধৃতিটুকু ছাড়া কাব্যটির সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। আগে পৃ ১০১ দ্রষ্টব্য।

[২] গ ৪১৩৪। পুথি প্রাচীন, তবে খণ্ডিত। "রাগ ইমন" (আরবী শব্দ) উল্লিখিত আছে (পৃ ৮৮ খ)।

[৩] "চিন্তিয়া চৈতন্যদেবের চরণকমল, দ্বিজ গোবিন্দ বোলে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল"। (৩৩ খ); "নিতাই চৈতন্য পদ পাইয়া সরস, গান দ্বিজ গোবিন্দ কৃষ্ণকথারস"। (৮৪ খ); মথুরার সংবাদ শুনি অক্রূরের স্থানে, দ্বিজ গোবিন্দ গায় চৈতন্যচরণে"। (৯১ ক; দ্রষ্টব্য ৯৪ খ)।

[৪] "দ্বিজ গোবিন্দ গায় গোপালের বরে" ইত্যাদি।

প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাড়া-ছাড়া অনুসরণ। তাহার পর দশম-একাদশ দ্বাদশ স্কন্ধের কথা,—কৃষ্ণলীলা। ব্রজলীলার প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের কথা আছে। এইখানে বড়াইয়ের উল্লেখ পাইতেছি।

কবি ভক্তহৃদয়। তাহার পরিচয় মাঝে মাঝে নিতান্ত অল্প কথায় পাওয়া যায়। যেমন

> ত্রিজগত-নাথ হরি ভকত-সদয়কারী
> বাঁধা যায় আপনার গুণে।[১]

২

পরমানন্দের কৃষ্ণলীলা কাব্যের একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে।[২] তবে পুথিটি প্রাচীন।[৩] ইহাতে ভাগবতের স্কন্ধ ধরিয়া অনুসরণ করা হইয়াছে।[৪] পিতার নাম দুর্লভ। ইহা ছাড়া প্রাপ্ত অংশে কবির সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে পারা যাইতেছে না। একটি গৌরাঙ্গবন্দনা পদ আছে। তাহা হইতে কবিকে সাক্ষাৎ চৈতন্যভক্ত বলিয়া অনুমান করিতেছি। পদটিতে পাঠ-বিকৃতি আছে।

> পরশমণির সনে কি দিব তুলনা রে
> পরশ করিলে হয় সোনা
> আমার গৌরাঙ্গের গুণ গাইয়া শুনিঞা রে
> রতন হইল কত জনা।
> শচীর নন্দন বনমালী
> ভুবনে তুলনা দিতে নারি। ধ্রু।
> সে গুণে সুরভি সুর- তরু সম নহে রে
> হেন রস পায় কত জন
> না ভজিলে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে
> যাচিয়া দিলেন প্রেমধন।
> গোরাচাঁদে(র তুলে) চাঁদ কলঙ্কী রে
> এমন করিতে নারে আলো
> নিকলঙ্ক নদিয়ায় চাঁদের উদয় রে
> মনের আঁধার দুর গেল।
> গোরা গোসাঞি (গুণের) তুলনা রে
> গৌর গোসাঞির সাথে
> পরমানন্দের (এই) মনের আকুতি (রে)
> বিচার করিয়া দেখ সভে॥

---

[১] পৃ ৩৯ খ। [২] ক ১০২৪।

[৩] লিপিকাল ১০৮৫ সাল (= ১৬৭৮)। পুথিটি সম্পূর্ণ নয়, নবম স্কন্ধের কিয়দংশ অবধি আছে।

[৪] যেমন ভনিতা, "গোবিন্দপদারবিন্দ-মধুলুব্ধ আশে, প্রথম স্কন্ধ প্রবন্ধ পরমানন্দ ভাষে।"

প্রচুর রাগ-তালের উল্লেখ আছে। সুতরাং কাব্যটি গাহিবার উদ্দেশ্যেই লেখা হইয়াছিল মনে করিতে পারি।

চৈতন্যের এক ভক্ত পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণলীলা[১] ও গৌরাঙ্গ-বিজয় পদাবলী (এবং 'গৌরাঙ্গবিজয়' কাব্য ?)[২] লিখিয়াছিলেন। ইহার পিতার নাম জানা নাই। তাহা হইলে দুই পরমানন্দ এক ব্যক্তি কিনা তাহার মীমাংসা হইত।

রঘু পণ্ডিতের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'ও[৩] স্কন্ধ-অধ্যায় ধরিয়া ভাগবতের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

রঘু পণ্ডিতের বাস ছিল কলিকাতার উত্তরে বরাহনগরে। গৌড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীচৈতন্য ইহার গৃহে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ভাগবত-পাঠে সুভগতার জন্য ভাগবতাচার্য নাম চৈতন্যেরই প্রদত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। "ভাগবতাচার্য" রঘুনাথ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। ভনিতায় বহুস্থলে "ভক্তিরসগুরু" শ্রীগদাধরের উল্লেখ আছে।[৪]

কাব্যের ভনিতায় প্রায়ই "ভাগবতাচার্য" পাওয়া যায়। ক্বচিৎ আসল নাম। যেমন

> কহে রঘুপণ্ডিত গোবিন্দগুণগান
> কৃষ্ণগুণ সবে শুন হয়্যা সাবধান।

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর রচনা গাঢ় ও গম্ভীর, এবং যথাসম্ভব মূলের অনুগত। মাঝে মাঝে পদলালিত্য আছে। যেমন পূতনার বর্ণনা।

> কেশপাশবিনিহিত ফুল্লমল্লীমালা
> পৃথুশ্রোণীকুচভরগমনমন্থরা।
> ক্ষীণকটিতট পট্টবাসপরিধানা
> কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ড মুদিতরচনা।

---

[১] গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৯৯। [২] জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে উল্লিখিত।

[৩] নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত (১৩১২); বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত ও বঙ্গবাসী কার্যালয়-প্রকাশিত (১৩১৭)। পরিষৎ সংস্করণ একেবারে অকিঞ্চিৎকর এবং কোনটিই সুপ্রাচীন পুথি অবলম্বনে সম্পাদিত নয়। রঘু পণ্ডিতের কাব্যের প্রাচীন পুথি দুর্লভ। গ ৪১৩৭ কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর একমাত্র প্রাচীন ও প্রামাণ্য পুথি। মাধব আচার্যের কৃষ্ণমঙ্গলের অনেক পুথিতে রঘু পণ্ডিতের কাব্যের অংশ প্রবেশ করিয়াছে। গায়কেরা বোধ হয় উভয়ের রচনা মিলাইয়া গান করিত। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় (২০৩) ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর উল্লেখ আছে। রমাকান্ত বলিয়া ভাগবতাচার্যের কোন শিষ্য ভাগবত অনুবাদ করে নাই। রমাকান্ত বলিয়া এক ব্যক্তি ভাগবতাচার্যের কাব্য নকল করিয়াছিল।

[৪] "পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীযুক্ত গদাধর নামে,...মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুই চরণ।"

ভুরুভঙ্গবিলসিতমুনিমনোহরা
বিলোল-অলকাবলী কুঞ্চিতকুন্তলা।
অলসবিলসগতি কমল ঢুলায়
চকিতচপলদিঠি নন্দঘরে যায়।

এই বর্ণনা প্রাচীন কালের লীলালাস্যময়ী যক্ষিণীমূর্তি স্মরণ করাইয়া দেয়॥

৩

"দ্বিজ" মাধবের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'[১] ভাগবত-অনুসারী কৃষ্ণলীলা-পাঞ্চালী। তবে ইহাতে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের মতো ভাগবতের অতিরিক্ত লীলা-কাহিনী বর্জিত হয় নাই। মূল রচনায় শুধু ব্রজলীলার ও মথুরালীলার বর্ণনা ছিল, অথবা যেমন পাওয়া যাইতেছে, দ্বারকালীলা পর্যন্ত বর্ণিত ছিল কিনা বলা যায় না। তবে প্রাপ্ত কাব্যের শেষার্ধে রঘু পণ্ডিতের ও মালাধর বসুর রচনা প্রচুর মিশিয়া গিয়াছে। সে মিশ্রণ-মিলন কতটা তাহা খুঁটিয়া বিচার করিলে তবে নির্ধারণ করা যাইবে।

কোন কোন পুথির ও ছাপা বইয়ের ভূমিকা হইতে মনে হয় মাধব চৈতন্যকে দেখিয়াছিলেন।

চৈতন্য-চরণধূলি শিরে বিভূষণ করি
দ্বিজ মাধব রস ভানে।
চৈতন্যচরণ ধন শিরে করি আভরণ
দ্বিজ মাধব রস গানে॥

কলিযুগে চৈতন্য সেই অবতার
দ্বিজ মাধব কহে কিঙ্কর তাহার॥

চৈতন্যচরণে দ্বিজ মাধব রচিত॥

দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা মাধব আচার্যকে চৈতন্য-ভক্তের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

মাধব আচার্য বন্দো কবিত্ব শীতল
যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

---

[১] প্রথম ছাপা হইয়াছিল 'শ্রীমদ্‌ভাগবতসার' নামে ১২৩৩ (= ১৮২৬) সালে। এই সংস্করণ শম্ভুচন্দ্র বসুর অনুরোধে তৈয়ারি হইয়াছিল। অনেকবার পুনর্মুদ্রণ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে দুইটি দেখিয়াছি (১৮৫৩ ও ১৮৬৯)। আধুনিক কালেও 'ভাগবতসার' নামে কিছু বাদসাদ দিয়া ছাপা হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণ (দ্বিতীয়, ১৩৩৩ সাল) প্রস্তুত করিবার কালে কিছু কিছু পুথির সাহায্য লওয়া হইয়াছিল। সমস্ত ছাপা সংস্করণের মধ্যে এইটিই ভালো।

ভালো পুথির মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য, স ৪২৬ ও গ ৫৪৪৭। প্রথম পুথিটি প্রাচীন নয়, ১২১৯ সালের লেখা। তবুও পাঠ বেশ বিশুদ্ধ। "দ্বিজ" মাধবের ছাড়া অন্য ভনিতা নাই।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ও চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্য-শাখায় যে মাধব আচার্যের নাম আছে তিনি কৃষ্ণমঙ্গলের কবি হইতে পারেন।[1] আবার কোন কোন ভনিতা হইতে অনুমান করিতে হয় যে মাধব কোন চৈতন্য-ভক্তের শিষ্য ছিলেন।

কলিযুগে চৈতন্য প্রকাশ
কহে দ্বিজ মাধব তার দাসের দাস ॥[2]

কোন কোন সংস্করণে কবির এই যে পরিচয় আছে তাহা প্রামাণিক বলিয়া মনে করা কঠিন,

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার।

মাধবের কাব্যে "শিকলি" (অর্থাৎ বর্ণনা-অংশ) ও "নাচাড়ি" (গীত-অংশ) ভাগে প্রায় সমান সমান। তবে শেষের দিকে শিকলিই বেশি। মনে হয় মূল রচনায় পদাবলী অংশই বেশি ছিল। প্রক্ষেপের ফলে বর্ণনাময় অংশের বাহুল্য হইয়াছে। কোন কোন পদে ব্রজবুলির ব্যবহার আছে।

মাধবের রচনায় পরিচয় হিসাবে নৌকাখণ্ড হইতে রাধাকৃষ্ণের "ঢামালি"র প্রথম পদটি উদ্ধৃত করিতেছি। কৃষ্ণের উক্তি

আমার সুন্দর নায় যেবা আসি দেয় পায় হাসিয়া গণএ ষোল পণ
এ তোর নিতম্ব কুচ অতি গুরুতর উচ একেলায় ভরা দশজন।
গোয়ালিনী বুঝিল তুমি বড় ঢাট
দান ফুরাইয়া চাপ আসি ঝাট। ধ্রু।
লাখের পসরা তোর নায় পার হবে মোর ইহাতে পাইব আমি কী
বুঝিয়া আপনে বলো পাছে যেন নহে কল[3] এই জীবিকায় আমি জী।
তুমি তো যুবতী মায়া আমিহ যুবক নায়্যা হাসপরিহাসে গেল দিন
ও-কূলে মানুষ ডাকে খেয়া রহে মিছা তাকে এতক্ষণে হৈত ভরা তিন।
ক্ষীর নবনীত দই আগুয়ান[4] কিছু খাই নৌকা বাহিতে হউ বল
দ্বিজ মাধব কহে রসিক যাদবরায়ে মিছাপাকে হারাবে সকল ॥

---

[1] অপ্রামাণিক প্রেমবিলাসের (বহরমপুর সংস্করণ ১৩১৮ পৃ ৩১৬) মতে মাধব আচার্য ছিলেন চৈতন্যের শ্যালকপুত্র, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভাই কালিদাসের পুত্র, এবং মাধবের গুরু ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। কোন কোন পুথিতে (গ ৫৪৪৭ পৃ ৪ ক) ও ছাপা বইয়ে (১২৩৩ সালের ও বঙ্গবাসীর) যেভাবে অদ্বৈতের উল্লেখ পাই তাহাতে কবিকে অদ্বৈত-শিষ্য বলিয়া মনে হয় না,— "সুরধুনীতীরে বিশেষ নবদ্বীপ, যথা চৈতন্যচন্দ্র অদ্বৈত সমীপ।"

[2] বঙ্গবাসী সংস্করণ (১৩৩৩)।

[3] =কলহ। [4] অর্থাৎ অগ্রিম।

৪

"দুঃখী" শ্যামদাসের কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য 'গোবিন্দমঙ্গল'[১] নামেই পরিচিত। কবির পিতা শ্রীমুখ, মাতা ভবানী।[২] ইহা ছাড়া আর কোন পরিচয় কাব্য হইতে পাওয়া যায় না। বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক ঈশানচন্দ্র বসু বলিয়াছেন, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরগনার মধ্যে হরিহরপুর নামে এক গ্রাম আছে। এই গ্রাম মেদিনীপুর নগর হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পূর্ববর্তী। এই গ্রামে দুঃখী শ্যামদাসের বাস ছিল। ইনি ভরদ্বাজ-গোত্রীয় দে-বংশীয় কায়স্থ।"[৩] মহাভারত-পাঁচালী-রচয়িতা কাশীরামের এক খুল্লপিতামহের নাম ছিল শ্রীমুখ। ইহারাও দে-বংশীয় কায়স্থ। এবং কাশীরাম হরিহরপুরের উল্লেখ করিয়াছেন।[৪] এতগুলি তথ্যের সন্নিপাত হইতে মনে করি যে শ্যামদাসের পিতাই কাশীরাম-দাসের খুল্লপ্রপিতামহ। তাহা হইলে গোবিন্দমঙ্গলের রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দের মাঝামাঝি হইবে।

গোবিন্দমঙ্গলের প্রামাণিক পুরানো পুথি পাওয়া যায় নাই। মুদ্রিত সংস্করণও প্রাচীন পুথি অনুসরণ করে নাই। তবুও প্রাচীনত্বের চিহ্ন নিঃশেষে অবলুপ্ত নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো গোবিন্দমঙ্গলেও "রাধা-চন্দ্রাবলী", "কালা-কানু", "আয়ান খুরের ধার", "হিয়া মেলে চির", এবং

> পাপ-ননদিনী ভয়ে না ছাড়ি নিশ্বাস
> শাদূ'লসমাজে যেন কুরঙ্গিণীবাস।

গোবিন্দমঙ্গলের দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড কাহিনীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণনার বেশ মিল আছে। অন্যত্র ভাগবতের কাহিনীরই অনুসরণ। কাব্যটি আদ্যন্ত বর্ণনাময় নয়। মাঝে মাঝে পদ আছে। কয়েকটি পদ ব্রজবুলিতে লেখা। সরল কবিত্বের ও অকৃত্রিম ভক্তির স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশও মাঝে মাঝে বেশ আছে। নিদর্শনরূপে রাধার বারমাসিয়ার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

> চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দমধু
> সচেতন নহে অঙ্গ না দেখিয়া বঁধু।

---

[১] প্রথম (?) মুদ্রণ ১৮৭০। বটতলায় বহুবার ছাপা। বঙ্গবাসী কার্যালয় (দ্বি-স ১৩১৭)। ভালো পুথি—স ৩৬, ৩৮।

[২] ভনিতায় মাঝে মাঝে বাপমায়ের নাম আছে। যেমন,

"শ্রীমুখ জনমদাতা স্থমতি ভবানী মাতা যার পুণ্যে নিরমিল তনু।"

[৩] ভূমিকা পৃ ৪। বসু মহাশয় অনুমান করেন যে শ্যামদাস সপ্তদশ শতাব্দের শেষ ভাগে বর্তমান ছিলেন।

[৪] গুরুবংশের বাসস্থান বলিয়াই উল্লিখিত।

চিত নিবারিব কত বিরহব্যথায়
চিতা যেন দহে দেহ বসন্তের বায়।
উদ্ধব চিত্ত ছলছল করে
চঞ্চল চড়ুই যেন পড়িয়া পিঞ্জরে।...
আষাঢ়ে আঙ্গিনা বসে আছিনু শুতিয়া
আমার শিয়রে আসি শ্যাম বিনোদিয়া।
আলিঙ্গন দেই মুখে বুলাইয়া হাথ
উঠিয়া আকুল হৈনু কোথা প্রাণনাথ।
উদ্ধব অনেক যন্ত্রণা
অধিক আশের দোষে এত বিড়ম্বনা।

বৈষ্ণব-পদাবলীর মধ্যেও একসঙ্গে এতগুলি ভালো ছত্র সুলভ নয়॥

৫

'গোপালবিজয়'[১] পাঞ্চালীর রচয়িতা কবিশেখর কাব্যমধ্যে যেটুকু আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানি যে তাঁহার আসল নাম দৈবকীনন্দন সিংহ, পিতার নাম চতুর্ভুজ, মাতার নাম হীরাবতী। লোকে তাঁহাকে কবিশেখর বলিত।

সিংহবংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন
শ্রীকবিশেখর নাম[২] বলে সর্বজন।
বাপ শ্রীচতুর্ভুজ[৩] মা হীরাবতী
কৃষ্ণ যার প্রাণধন[৪] কুলশীল জাতি।

কবি নিজের রচনাবলীর তালিকা দিয়াছেন। গোপালবিজয় ছাড়া চারিখানি গ্রন্থ। প্রথম গোপালচরিত মহাকাব্য, দ্বিতীয় গোপালের কীর্তনামৃত, তৃতীয় গোপীনাথবিজয় নাটক।[৫] গোপালচরিত নিশ্চয়ই, গোপীনাথবিজয় সম্ভবত, সংস্কৃতে লেখা। বাকি দুইটি "লৌকিক" ভাষায়।

---

[১] ছয়খানি পুথি পাওয়া গিয়াছে—ক ৯৬০ (আদর্শের লিপিকাল "গজ অব্ধি শরচন্দ্র" অর্থাৎ ১৫৪৮ (=১৬২৬) অথবা ১৫৭৮ (=১৬৫৬) শকাব্দ, পুথির লিপিকাল ১৫৯৫ শকাব্দ (=১৬৭৩); ক ৯৬১ (লিপিকাল ১৬...শকাব্দ); ক ৯৬৩ (লিপিকাল ১৭০১ শকাব্দ); গ ৪৮৮০ ; প ৩১২ ; বি ২৬২৪, ৫৩৯৪। প্রথম দুইখানি বিশেষভাবে মূল্যবান্। এই দুইটিতেই প্রারম্ভ-শ্লোক তিনটি মিলিয়াছে। রামগোপাল দাসের রসকল্পবল্লীতে গোপালবিজয় হইতে উদ্ধৃতি আছে।

গ্রন্থটি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] পাঠান্তর "বুলি"। [৩] ঐ "বাপ চতুর্ভুজ নাম"। [৪] ঐ "মনপ্রাণ"।

[৫] "তবে মহাকাব্য কৈল গোপালচরিত, তবে কৈল গোপালের কীর্তন অমৃত।
গোপীনাথবিজয় নাটক কৈল আর, তমু গোপবেশে মন না পুরে আমার।
তবে সে পাঁচালী করি গোপালবিজয়ে, বৈষ্ণবচরণরেণু ধরিয়া হৃদয়ে॥"
বৈষ্ণববন্দনার দেবকীনন্দন কি ইনিই ?

"কবিশেখর (রায়)", "শেখর (রায়)" ও "রায় শেখর" ভনিতায় এক বা একাধিক কবি অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতেছে, গোপালবিজয়ের কবিশেখর আর পদাবলীর (কোন) কবিশেখর এক ব্যক্তি কিনা। বিরুদ্ধে যুক্তি আছে তিন-চারটি। প্রথমত, পদাবলী-রচয়িতা কোন কবিশেখরের আসল নাম যে দৈবকীনন্দন (সিংহ) তাহা কেহই বলেন নাই। একটি প্রাচীন শাখানির্ণয়ে কবির নাম আছে "শ্রীকবিশেখর রায়"।[১] দ্বিতীয়ত, রসিক দাস কবিশেখরকে শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়াছেন ;[২] তৃতীয়ত, গোপালবিজয়ে চৈতন্যেরই উল্লেখ নাই, অন্য চৈতন্যভক্তের কথা দূরে থাক। আর, চতুর্থত গোপালবিজয়ে ভনিতায় কবির নামের আগে বা পরে "রায়" মিলে না বলিলেই হয়।[৩] কিন্তু এই চার যুক্তিকে খণ্ডন করা খুব কঠিন নয়। কবি ভুলে একবারও কোথাও নিজের আসল নাম ভনিতায় ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং একশ বা দেড়শ বছর পরেকার পদাবলী-সংগ্রহকার যে ভনিতার নামকেই আসল বলিয়া লইবেন তাহাই স্বাভাবিক। পদকর্তা কবিশেখর যে রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন এ কথা—রসিকদাসের উল্লেখ বাদ দিলে—প্রমাণসহ নয়। রামগোপাল ও রসিকের শাখানির্ণয়ে যে কবিরঞ্জন-কবিশেখরে গোলমাল হইয়া গিয়াছিল তাহা কবিরঞ্জনের প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে কবিশেখর রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন তাহা হইলেও গোপালবিজয়ে গুরুর অনুল্লেখ অনুমানের বাধক হয় না। সকলেই যে সর্বত্র গুরুর নাম করেন এমন নয়। গ্রন্থ রচনার পরে দীক্ষা লইলে গুরুর নাম থাকিবার কথা নয়। গোপালবিজয়ে গুরুর বা চৈতন্যের উল্লেখ না থাকা মারাত্মক নয়। কাব্যটি কৃষ্ণলীলা, তাই কবি অন্য অবতারের নাম করেন নাই। চৈতন্যের উল্লেখ না থাকিলেও গোপালবিজয়ের কবি যে চৈতন্যপথের পথিক তাহা বোঝা দুরূহ নয়। "কৃষ্ণ যার প্রাণ ধন কুল শীল জাতি", "বৈষ্ণবচরণরেণু করিয়া হৃদয়ে", "নন্দের নন্দনে বিনি কান্দনে ন পাই"—এমন কথা যিনি চৈতন্যের ভক্তিরসের মর্ম না বুঝিয়াছেন তাঁহার কলমে কিছুতেই বাহির হইত না। (ষোড়শ শতাব্দের শেষের দিকে উত্তর রাঢ়ে জয়গোপাল নামে এক প্রভাবশীল বৈষ্ণব মহান্ত সাধনভজন-উপদেশে কিছু

---

[১] "ততঃ সদ্গুণযুক্তঃ শ্রীকবিশেখররায়কঃ।
চিত্রাণি গীতপদ্যানি গীয়ন্তে যস্য সজ্জনৈঃ॥" শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত (সমালোচনী মাঘ ১৩১১ পৃ ২৯৪। [২] ঐ পৃ ২৫৩)।

[৩] কোন কোন পুথিতে এক আধবার "রায় শেখর" পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা সন্দেহজনক।

স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্বতন্ত্র পথটি কি, তাহার কোন উল্লেখ নাই। অনুমান হয় চৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে কৃষ্ণ-বলরামের অবতার ও উপাস্যরূপে অস্বীকার ও নিজেকে জাহির। এইজন্য তখনকার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অধিনেতা জীব গোস্বামী জয়গোপালকে বৈষ্ণব-সমাজের অপাংক্তেয় করিয়াছিলেন। কবিশেখর এই জয়গোপালের দলভুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াও অনুমান করিতে পারি। তাহা হইলে 'গোপালচরিত', 'গোপালবিজয়' ইত্যাদি নামকরণের একটা উদ্দেশ্য বোঝা যায়। অবশ্য এ সবই অনুমান মাত্র।) কবিশেখরের ভনিতায় চৈতন্যবন্দনা পদ কয়েকটি আছে। সেগুলি সবই যে পরবর্তী কালের রচনা তা বলা চলে না।

ভাব ও রচনারীতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে কবিশেখর-শেখর ভনিতার পদগুলিকে অন্তত তিনজন পৃথক্ কবির রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতেই হয়। একজন কবিশেখর, ষোড়শ শতাব্দের শেষার্ধের কবি এবং ভালো পদাবলী-রচয়িতা। আর একজন ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দের সন্ধিকালের কবি।[১] ইঁহাকেই আমরা গোপালবিজয়ের কবি বলিয়া আপাতত গ্রহণ করিব। আর একজন, কবিশেখর রায় (রায় শেখর), সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগের কবি।[২] ইনি শ্রীখণ্ডের শিষ্য হইতে পারেন।[৩] তবে শেষ দুইজন এক ব্যক্তি হওয়াও সম্ভব।

কবিশেখরের গোপালচরিত মহাকাব্যের ও গোপীনাথবিজয় নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কীর্তন-অমৃত সম্ভবত পদাবলী গ্রন্থ। গোপীনাথবিজয় সঙ্গীতনাটক হইলে তাহাতেও কিছু পদাবলী (গান) ছিল। হয়ত তাহার দুই একটি কবিশেখরের পদাবলীর মধ্যে বিকীর্ণ আছে।

গোপালবিজয়-পাঞ্চালীর প্রারম্ভে তিনটি শ্লোক আছে।[৪] পাঠ অত্যন্ত বিকৃত। ছন্দ রক্ষা করিয়া যথাশক্তি শুদ্ধ করিয়া যে পাঠ খাড়া করিয়াছি তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

---

[১] ক ৯৬০ পুথির পুষ্পিকায় যাহা আদর্শপুথির লিপিকাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি তাহা মূলগ্রন্থের রচনাকাল হওয়া অসম্ভব নয়। "শ্রীকবিশেখর মুখপদ্ম বিনির্গত শ্রীগোপালবিজয় সম্পূর্ণ। শাকে গজাব্ধিশরচন্দ্রমিতে মুকুন্দ [পদাব্] জষট্পদ…"। শকাঙ্কটি শ্লোকে নিবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। ১৬২৬ স্বচ্ছন্দে গোপালবিজয়ের রচনাকাল হইতে পারে। প্রাপ্ত পুথি নরোত্তম নন্দীর লেখা (১৬৭৩)। ক ৯৬১ পুথিও পুরানো, এটির লিপিকর "শ্রীকররঞ্জন"।

[২] ইঁহার একটি পদে (পদকল্পতরু ২৬৫১) পোর্তুগীস শব্দ "আতা" আছে।

[৩] একটি পদে নরহরির উল্লেখ আছে (গীতচন্দ্রোদয় পৃ ২৮৯)।

[৪] শুধু প্রাচীনতর পুথি দুইটিতেই (ক ৯৬০, ৯৬১) শ্লোকগুলি পাওয়া যায়।

দধাতি[১] বিবরং হরেঃ কৃতহুরুহকাব্যালয়ে
ন কংসভয়মীক্ষতে[২] হরিতবংশসাধুধ্বনিঃ।
নিরন্তরমিবান্তর-[৩] স্ফুরদযন্ত্রবৃন্দাবনঃ
স ভক্তজনজীবনো জয়তি দৈবকীনন্দনঃ॥

গোপীজননন্দনাভরণঃ[৪]
সজ্জনচরণরজোঽলংকরণঃ।
গঙ্গাজলবিমলান্তঃকরণঃ
সৎকবিপণ্ডিতচিত্তহরণঃ॥

লিখতি[৫] শ্রীকবিশেখর এতাং
প্রতিপদসমুচিত[৬] পদসমুপেতাম্
নিরবধিমধুরিপুকৃতরসকেলীং[৭]
শ্রীগোপালবিজয়-পাঞ্চালীম্॥

কাব্য পুরাপুরি বর্ণনাময় এবং বর্ণনা প্রায়ই সংস্কৃত পুরাণ কাব্য অনুযায়ী। অবতীর্ণ হইবার পূর্বে বিষ্ণু-কৃষ্ণ দেবতাদের বলিয়াছিলেন

তোমরা যত দেবদেবী সত্বর চলহ ভুবি
জন্ম লাভ নিজ নিজ অংশে।

কাহিনী মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো আদিরসাল। এখানেও বড়ায়ি কুট্টিনী। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দের পাঞ্চালী-কাব্যে কৌতুকরসের ভূমিকা প্রায়ই বৃদ্ধা প্রেমিকার বা কুট্টিনীর। গোপালবিজয়েও তাই। যেমন, রাধা ও তাহার সখীগণ মদনপূজায় চলিয়াছে, বড়ায়ি তাহাদের দলপতি। বড়ায়ির বর্ণনা

ধবল কেশের মাঝে সিন্দূর উজ্জলে
ফুটিল কাশির বন[৮] জলন্ত আনলে।...
সদাই সে মুখানিতে বন্দী আছে হাসি
ছুতা হাণ্ডী মুখে যেন চুন যায় ভাসি।...
কথাএ মরিল কাম জীআবারে পারে।[৯]

দানখণ্ডের রচনা বেশ সরস। বড়ায়ির পরামর্শে কৃষ্ণ একদিন দানছলে গোপীদের পথে আটকাইয়া বলিল,

যবে দান দিতে নার এক বোল ধর
রাধা এড়ি বিকে যাহ মথুরা নগর।
প্রতীত নিমিত্ত রাধা থাকু মোর কাছে
বোধ দিয়া রাধা লৈয়া ঘর যাবে পাছে।

---

[১] পাঠ "দধাসি", "দধাক্তী"। [২] ঐ "ঈক্ষতো", "ঈক্ষত"। [৩] ঐ "মিবান্তরা"।
[৪] ঐ "গোপীজনবন্দেভবাধন"। [৫] ঐ "লিখিত"। [৬] ঐ "প্রতিপদসময়ং", "প্রতিপদসম্"।
[৭] ঐ "নিরবধিমধুরিপ্রকৃতরসিকালীং", নিরবধিরাসকালিং"। [৮] —প্রস্ফুটিত কাশফুলের ঝাড়।
[৯] অর্থাৎ তাহার রসময় বাক্যে ভস্মীভূত অনঙ্গও পুনরুদ্দীপিত হয়।

বড়ায়ি হাসিয়া সাধু সাজিয়া বলিল,

চোর চাহে আন্ধার ধাউড় চাহে গোল
ছিনার চাহে নিভৃতে আছে বেদবোল।
প্রতীত নিমিত্ত যদি বল বনমালী
আমি তোর ঠাক্রি থাকি যাউক গোআলী।

দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের মত অ-(ভাগবত-) পৌরাণিক লীলা-কাব্যের মধ্যে বর্ণনা করার জন্য কবি ভক্তশ্রোতার ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছেন। কৃষ্ণের স্বপ্নাদেশেই তিনি কাব্যরচনা করিয়াছিলেন এবং অপৌরাণিক কাহিনী বাদ দেন নাই।

আর একখানি দোষ না লবে আক্ষার
পুরাণের অতিরেক লিখিব আপার।
অবিচারে আমারে না দিহ দোষভারে
স্বপনে কহিয়া দিল নন্দের কুমারে।

বাঙ্গালায় লেখা বলিয়া কৃষ্ণলীলা কাব্যটিকে অগ্রাহ্য করিতে কবি বার বার নিষেধ করিয়াছেন।

লৌকিক বলিয়া না করিহ উপহাসে
লৌকিক মন্ত্রে সি সাপের বিষ নাশে।

কহে কবিশেখর করিয়া পুটাঞ্জলি
হাসিয়া না পেলাহ লৌকিক ভাষা বলি।

কাব্যটি যে পণ্ডিতদের জন্য লেখা নয় তাহা কবি শ্রোতাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। পণ্ডিতদের উপর তাঁহার আস্থা ছিল না।

কলিতে বিদ্যায় পুনু বাড়ে অহঙ্কার
পুথিত অভ্যাস করে ধন অর্জিবার।...
লোক রঞ্জিবারে করে আচার বিচার
মনশুদ্ধি নাহিক আটোপ মাত্র সার।

ব্রাহ্মণদের উপরেও নয়। প্রমাণ এই উক্তি

বিপ্র বহি কেহ চিত-হস্ত নাহি করে।

কিন্তু সাধারণের জন্য লেখা হইলেও গোপালবিজয়ে সংস্কৃত কাব্যের মতো বর্ণনার অনুসরণ যতটা আছে ততটা আর কোন পুরানো কাব্যে দেখি নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির[১] প্রতিধ্বনি শোনা যায় এই দুই ছত্রে,

যাকে যার অভিরুচি সেই তাকে ভায়ে
পল্লব ছাড়িয়া উষ্ট্র কণ্টক চিবায়ে।

কবিশেখরের কৃষ্ণলীলা-পদাবলী একদা "দণ্ডাত্মিকা লীলা" নামে সংগৃহীত

---

[১] "অভক্ত উষ্ট্রের ইথে নাহিক প্রবেশ"।

হইয়াছিল।[১] ইহাতে রাধাকৃষ্ণের আট প্রহরের লীলাবিলাস তিরিশ দণ্ডে বিভক্ত ও বর্ণিত হইয়াছিল। লীলাবর্ণনা রূপ গোস্বামীর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণ অনুযায়ী। কয়েকটি পদ খুবই ভালো। এগুলি ব্রজবুলিতে লেখা। যেমন, এই পরিচিত পদটি

কাজররুচিহর রয়নি বিশালা
তছু পর অভিসার করু ব্রজবালা।...
যতনহিঁ নিঃসরু নগর দুরন্তা
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা।[২]

শেখর সখী বা মঞ্জরী হইয়া রাধার অলঙ্কার-ভার বহিয়া চলিয়াছেন, এমন কথা ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দের আগে কোন পদকর্তা লিখিতে পারিতেন না। কবিশেখরের কোন কোন পদ বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুর দেওয়া বিখ্যাত "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর" পদটি।[৩] পদটি সর্বপ্রথম মিলিয়াছে সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগে পীতাম্বর দাসের অষ্টরস-ব্যাখ্যায়। সেখানে শেখরেরই ভনিতা। এ ভনিতা অন্যত্রও মিলিয়াছে।[৪]

ভনহঁ শেখর কইছে বঞ্চব
সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া।

একটি পুরানো পদসংগ্রহ পুথিতে পাঠান্তর পাইতেছি,

ভনয়ে শেখর কৈছে গোঙাব
কাহ্নু বিনু এহো রাতিয়া।

কবিশেখর রায়ের একটি চৈতন্যবন্দনা পদ উদ্ধৃত করিতেছি।[৫]

হেরলুঁ গৌরকিশোর সুরধুনীতীরে উজোর।
সুঘড় ভকতজন সঙ্গ, করতহি কত কত রঙ্গ।
মন্দ মধুর মৃদু হাস, কুন্দ কুমুদ পরকাশ।
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড, জীতল করিবর শুণ্ড।
অহর্নিশি ভাবে বিভোর, কুলকামিনী-চিতচোর।
মন্দমন্থর গতি ভাঁতি, মুরছিত মনমথ-হাতী।
সো পদপঙ্কজ-বায়, কহ কবিশেখর রায়।

পদাবলীতে "নৃপ কবিশেখর" ও "নব কবিশেখর" ভনিতাও দেখা যায়। "নৃপ" "নব"-স্থানে ভুল পাঠ হইতে পারে, "রায়"-এর অনুবাদও হইতে পারে। "নব কবিশেখর" অন্য ব্যক্তির ভনিতা। সম্ভবত ইনি কবিশেখরের পূর্ববর্তী।

---

[১] শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্তের শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব কবি' প্রবন্ধ (সমালোচনী মাঘ ১৩১১ ও প্রদীপ জ্যৈষ্ঠ ১৩১২) দ্রষ্টব্য।

[২] প-ক-ত ২৭০৬। [৩] প-ক-ত ১৭৩৫। [৪] HBL পৃ ৪৯৩। [৫] গীতচন্দ্রোদয় পৃ ২৫।

একবার "শেখরদাস" আছে।[১] এ ভনিতা প্রাচীন অর্বাচীন দুই শেখরেরই হইতে পারে॥[২]

৬

কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'[৩] সবচেয়ে ছোট কৃষ্ণলীলা-পাঞ্চালী। কবি দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের সম্পর্কে হরিবংশের দোহাই দিয়াছেন।[৪] পরবর্তী কালে ভবানন্দ এই নামেই কৃষ্ণলীলা-পাঞ্চালী রচিয়াছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক মনে করি যে বাঙ্গালায় লেখা কখনো কোন "লৌকিক" হরিবংশের অস্তিত্ব ছিল না।[৫] সেকালে ধারণা ছিল যে কৃষ্ণলীলা হরিবংশেও প্রাপ্তব্য এবং ভাগবতে যাহা নাই তাহা অবশ্যই হরিবংশে থাকিবে। কৃষ্ণদাস ভারখণ্ড ও বাঁশিচুরি কাহিনীও বর্ণনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণদাসের পিতার নাম যাদবানন্দ, মাতার নাম পদ্মাবতী। নিবাস "জাহ্নবী-পশ্চিমকূলে"। কবি কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা মাধব আচার্যের সেবক ছিলেন। সেবকের রচনা দেখিয়া মাধব বলিয়াছিলেন,

> দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার
> এখানে গাইতে গ্রন্থ রহিল আমার।[৬]

মাধব আচার্য কৃষ্ণদাসের গুরু ছিলেন না। যেভাবে গুরুর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় জাহ্নবা দেবীই কৃষ্ণদাসের গুরু অথবা পরমগুরু ছিলেন।

> আমার······প্রভু শ্রীমতী ঈশ্বরী
> দীক্ষামন্ত্র দিলা প্রভু মোর কানে ধরি।[৭]

প্রথম চরণে ফাঁক থাকায় সন্দেহ রহিয়া গেল।

রচনা সরল, চলিত শব্দবহুল। মাঝে মাঝে প্রবচনের যুতসই ব্যবহার আছে॥

---

১ প-ক-ত ২৫৭। ২ HBL, পৃ ১৪৬-৪৭ দ্রষ্টব্য।

৩ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, ১৩৩৩।

৪ "আর অপরূপ কথা অমৃতের ভাণ্ড, না লিখিল বেদব্যাস এই নৌকাখণ্ড।" (পৃ ১৫০); "দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে, অজ্ঞ নহি কিছু কহি হরিবংশ মতে।" (পৃ ২৩৭)।

৫ "লৌকিক" হরিবংশের অস্তিত্ব আমি পূর্ববর্তী সংস্করণে অনুমান করিয়াছিলাম।

৬ পৃ ৬। ৭ পৃ ৩৮৪।

৭

কবিবল্লভের 'রসকদম্ব'[১] মুখ্যভাবে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ। তবে ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা আছে বলিয়া এই সঙ্গে বিবরণ দিতেছি। "কবিবল্লভ" কবির উপাধি কি নাম ("কবি" বল্লভ) তাহা বোঝা গেল না। পিতার নাম রাজবল্লভ, মাতার নাম বৈষ্ণবী। নিবাস "করতোয়া তীরে মহাস্থানের সমীপে আরোড়া গ্রামেতে"। কবির গুরু উদ্ধবদাস। গদাধর পণ্ডিতের শাখায় যে উদ্ধবদাস উল্লিখিত তিনিই এই উদ্ধবদাস বলিয়া মনে করি। রসকদম্ব-রচনা সমাপ্ত হয় ফাল্গুনপূর্ণিমা দিনে ১৫২০ ("বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত") শকাব্দে (=১৫৯৯)। নরহরি দাস সরকারের শিষ্য, ব্রাহ্মণ "মুকুটরায়" কবিবল্লভের বন্ধু ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে রসকদম্ব রচিত। সনাতন-রূপের অনুগ্রহভাজন বনমালী দাস আলোচ্য বিষয়ে কবিবল্লভকে উপদেশ দিয়াছিলেন। রচনার প্রধান উপজীব্য ছিল 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'।[২]

বইটি বাইশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে একটি করিয়া "রস" বর্ণিত হইয়াছে। রচনায় জ্ঞানের, সহৃদয়তার ও নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। বাঙ্গালায় রচিত পুরানো বৈষ্ণব তত্ত্বনিবন্ধসমূহের মধ্যে বইটির মূল্য কম নয়॥

৮

পদাবলী-কীর্তনরীতি প্রতিষ্ঠিত হইলে পর কৃষ্ণমঙ্গল-পাঞ্চালীর আসর সঙ্কীর্ণতর হইতে থাকে। পদাবলী-কীর্তন জনসাধারণের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, হইয়াছিল শিক্ষিত বিদগ্ধ ভাবুক বৈষ্ণবের জন্য। তবে কৃষ্ণমঙ্গল সকলের জন্য। তাই কৃষ্ণমঙ্গলে কাব্যশিল্পরীতির উন্নয়ন হয় নাই বরং একঘেয়েমির দরুন এবং অঞ্চলবিশেষে গ্রাম্যরসভাগ-বৃদ্ধির দরুন অবনতিই হইতে থাকে। পদাবলী-কীর্তনে গীতিকবিতার ও সঙ্গীতের রস সম্মিলিত হইয়া নূতনতর অধ্যাত্ম-ভাবনার রসায়নসংযোগে সাহিত্যশিল্পে অভিনবত্ব সৃষ্টি করিয়াছিল। তবে তখনকার দিনে ইহা ঠিক সাহিত্যশিল্প বলিয়া গণ্য হইত না। সাধনাশিল্প বলিয়াই পদাবলী-কীর্তন উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কোন কোন বিশেষ সম্প্রদায় ছাড়া অধ্যাত্ম-চিন্তায় বা সাধনায় পদাবলী-কীর্তনের

[১] তারকেশ্বর ভট্টাচার্য ও আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, ১৩৩২ সাল।

[২] পৃ ৮৩।

ব্যবহার সপ্তদশ শতাব্দের মাঝের দিকেই বিরল হইয়া পড়িয়াছিল। সাহিত্যের দিক হইতেই অবনতি ঘটিয়াছিল। নিতান্ত গণ্ডীবদ্ধ বিষয়ে একই ভাবের ও ভাষার অনুবৃত্তি কতদিন চলিতে পারে। তবে উন্নতি হইতেছিল সঙ্গীতের দিক দিয়া, বিভিন্ন প্রাদেশিক ধনী জমিদার-সভায় কৃষ্ণলীলাগীতি অবলম্বনে। যে গানের রীতি অন্ততপক্ষে জয়দেবের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছিল তাহা প্রধানত নরোত্তমের চেষ্টায়, রাগতালের নূতন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বিদগ্ধ বৈষ্ণব-সভায় পরিবেশিত হইয়া পদাবলী-কীর্তনের সৃষ্টি করিয়াছিল। একাজে নরোত্তমের বিশিষ্ট সহায়ক ছিলেন মৃদঙ্গবাদক দেবীদাস। পদাবলী-গীতিও আর প্রকীর্ণ গান মাত্র রহিল না, কৃষ্ণলীলার পালা অনুসরণ করিয়া ধারাবাহিক হইল। এই হইল বাঙ্গালার বৈষ্ণব গীতিকবিতার ইতিহাসে দ্বিতীয় পর্যায়,—পদাবলীবিধান।

দ্বিতীয় পর্যায়ের পদাবলীতে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা দুইমতে পাই। এক, কৃষ্ণের ব্রজলীলা—জন্ম, শৈশবে বীরবিক্রান্ত (পূতনাবধ, শকটভঙ্গ, যমলার্জুনবধ ইত্যাদি), গোষ্ঠলীলা (গোচারণ ও অসুরবধ), রাধার সঙ্গে প্রেমলীলা, গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা, মথুরাগমন ইত্যাদি ইত্যাদি। দুই, রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা। এখানে জন্ম, শৈশবপ্রচেষ্টা ইত্যাদি নাই। প্রথম হইতেই কৃষ্ণ নবকিশোর। অসুরবধাদি নাই, রাসলীলাও নাই। শুধু আছে দিনে রাত্রে নানা ব্যপদেশে রাধাকৃষ্ণের মিলন। সখীরা সে মিলনের আয়োজনেই ব্যাপৃত। রাত্রিতে রাধাকৃষ্ণ শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলে তবেই সখীদের ছুটি।

পদকর্তার ভূমিকার বিচারে দুই পর্যায়ের পদাবলী সহজেই পৃথক্ করা যায়।[১] পদকর্তা প্রথম পর্যায়ে রাধার সখী, কৃষ্ণের দূতী-বন্ধু, দ্বিতীয় পর্যায়ে মঞ্জরী, রাধার পরিচারিকা। নায়ক-নায়িকা এখানে নাচের পুতুলের বা মুখোস-পরা নটের মতো, সজীব মানুষের মতো নয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের পদাবলী-কবিরা প্রধানভাবে তিনটি গুরু-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত,—শ্রীনিবাসের সম্প্রদায়, নরোত্তমের সম্প্রদায় ও শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়। বাকি সকলে বিবিধ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ॥

---

[১] যেমন, প্রথম পর্যায়ে

"ঐছন কাতর নাগর-ভাষ
শুনি কবিরঞ্জন চলু ধনী পাশ।" (গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৩৫৩।)

দ্বিতীয় পর্যায়ে

"শেখর অভরণ ভেল বহস্তা।",

৯

আলোচ্য সময়ে পদকর্তাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। প্রথমেই নাম করিব রামচন্দ্র কবিরাজের। ইনি পদকর্তারূপে পরিচিত নন, তবে কয়েকটি ভালো পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং ইঁহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সমসাময়িক একাধিক পদকর্তাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। ইঁহার পরিচয় নিয়ে গোবিন্দের প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

রামচন্দ্র সুপুরুষ, সহৃদয় ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। নরোত্তমের সঙ্গে রামচন্দ্রের অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা ছিল, যদিও নরোত্তমকে তিনি গুরুর মতো মান্য করিতেন। রামচন্দ্রের ও নরোত্তমের সাধনপ্রণালী একই রকম ছিল। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁহার 'স্মরণদর্পণ'[১] অনুসরণ করিয়া নরোত্তম প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা লিখিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের অপর সাধননিবন্ধ 'দুর্লভামৃত'[২], 'সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা'[৩] ও 'পদ্মমালা'[৪]। ('জাতকসংবাদ'এ[৫] রচয়িতার নাম "দ্বিজ" রামচন্দ্র। অতএব এটি ইঁহার রচনা নয়। রামচন্দ্র গোস্বামীর লেখা হইতে পারে)।

স্মরণদর্পণে কয়েকটি পদ আছে। একটি পুথিতে রামচন্দ্রের সতেরোটি পদ পাওয়া গিয়াছে।[৬] রামচন্দ্রের একটি ভালো পদ উদ্ধৃত করিতেছি।[৭]

কাহারে কহিব মনের কথা কেবা যায় পরতীত
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদন সদাই চমকে চিত।
গুরুজন-আগে বসিতে না পাই সদা ছলছল আঁখি
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।
সখী সঙ্গে যদি জলেরে যাই সে কথা কহিলে নয়
যমুনার জল আকুল কবরী ইথে কি পরাণ রয়।
কুলের ধরম রাখিতে নারিনু কহিনু সবার আগে
রামচন্দ্র কহে শ্যাম নাগর সদাই মরমে জাগে॥

একটি পদে কবির নাম আছে রামচন্দ্র মল্লিক। সেকালে ধনী বৈদ্যের মল্লিক পদবী বা উপাধি ছিল। মনে হয়, পদটি রামচন্দ্রের বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণের আগেকার রচনা, তাই "মল্লিক" পদবী রহিয়া গিয়াছে। পদটি ভালো।[৮] মানিনী রাধার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি।

---

[১] ভক্তিপ্রভা কার্যালয় (আলাটী, হুগলী) হইতে অচ্যুতচরণ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। পুথি —গ ৫৪২৬ (লিপিকাল ১২০৩ সাল); সা-প-প ৬ পৃ ৭৮ (লিপিকাল ১১৩২ সাল)।

[২] সিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় উল্লিখিত। [৩] স ২৭৬। [৪] গ ৪৯৫০। গদ্যে পদ্যে লেখা। [৫] গ ৪০৪২।

[৬] সা-প-প ৮ পৃ ৪৮। চাটিগাঁ অঞ্চলের পুথি।

[৭] অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, সতীশচন্দ্র রায়, ৪১০।

[৮] HBL পৃ ৪১৪।

রাধে তুমি মোরে না বাসিহ ভিন
রভসে বিরসবাণী না বলিয় চন্দ্রাননী
আমি তোমার প্রেমের অধীন।
মিনতি করিয়া কই আমি আর কারো নই
তোমার তোমার বিনোদিনী
অশোধল তুয়া ধার শুধিতে নারিল আর
রহিলাঙ হয়্যা তোমার ঋণী।
এ মুখপঙ্কজ তোর মন মধুকর মোর
না বলিহ বিরস বচন
প্রাণসঞ্জীবনী তুমি তৃষিত চাতক আমি
তুমি প্রিয়া মোর নবঘন।
স্বরূপে কহিলাঙ রাই বিকাইলাঙ তুয়া ঠাঞি
অভিনব-যৌবনী নারী
রামচন্দ্র মল্লিকে কয় অতি প্রেম অতিশয়
বিরস সহএ না পারি।

১০

রামচন্দ্রের ছোট ভাই গোবিন্দ দ্বিতীয় পর্যায়ের পদাবলী-রচয়িতাদের মধ্যে সব-দিক দিয়াই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাবৎ ব্রজবুলি-গীতিকবিদের মধ্যে ইনি রচনাপ্রাচুর্যে ও রচনা-গৌরবে সর্বমুখ্য। রামচন্দ্র-গোবিন্দের পিতার নাম চিরঞ্জীব, মাতার নাম স্নুনন্দা। মাতামহ দামোদর সেন শ্রীখণ্ডের একজন প্রধান পণ্ডিত, ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় দুই ভাই শ্রীখণ্ডে মাতামহাবাসে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। পরে পৈতৃক নিবাস কুমারনগরে এবং আরও পরে তেলিয়া-বুধুরী গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর ইত্যাদি পরবর্তী কালের জীবনীগ্রন্থ অনুসারে মাতামহ শক্তি-উপাসক ছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র ও গোবিন্দ প্রথম জীবনে শক্তি-উপাসক ছিলেন। বেশি বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের নজরে আসিয়া ও তাঁহার প্রভাবে পড়িয়া দুই ভাইই সপরিবারে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দের পত্নীর নাম মহামায়া, পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। বৈষ্ণব হইবার আগেও গোবিন্দ অল্পস্বল্প পদ লিখিয়াছিলেন। বৈষ্ণব হওয়ার পর হইতে তিনি অনর্গল রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী রচনা করিতে থাকেন। শ্রীনিবাস আচার্য গোবিন্দের রচনা বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর কাছে পাঠাইয়া দিতেন। (কবির সঙ্গেও জীব গোস্বামীর পত্রব্যবহার ছিল।) সে পদাবলী পড়িয়া ও শুনিয়া জীব-প্রমুখ বৃন্দাবনের গোস্বামীরা

অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। সেই প্রীতির চিহ্ন হিসাবে জীব গোস্বামী গোবিন্দকে "কবীন্দ্র" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস বৈদ্য বলিয়া কবিরাজ ছিলেন না, কবিশ্রেষ্ঠ গণ্য হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি "কবিরাজ"।[১]

গোবিন্দদাস যে প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন এবং তখনই পদ-রচনায় হাত দিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়াছিলাম শ্রীখণ্ড হইতে পাওয়া একটি পুথিতে।[২] নাম 'রসনির্যাস', রচয়িতা বৃন্দাবনদাস। বিষয় সংক্ষেপে বৈষ্ণব অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিবিধ রসের আলোচনা ও সেই সঙ্গে পদাবলী-সংকলন। পদটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।[৩] অর্ধনারীশ্বরের বন্দনা।

হেম-হিমগিরি দুহুঁ তনু-ছিরি
আধনর আধনারী
আধ-উজর আধ-কাজর
তিনই লোচন ধারী।
দেখ দেখ দুহুঁ মিলিত একগাত[৪]
ভকত-[নন্দিত] ভুবন-বন্দিত
ভুবন-মাতরি[৫]-তাত।
আধ-ফণিময় আধ-মণিময়
হৃদয়ে উজোর হার
আধ-বাঘাম্বর আধ-পট্টাম্বর
পিন্ধন দুহু উজিয়ার।
না দেব কামিনী [না] দেব কামুক
কেবল প্রেম প্রকাশ
গৌরীশঙ্কর- চরণ কিঙ্কর
কহই গোবিন্দদাস।

সমসাময়িক মানী গুণী ধনী অনেকেরই সঙ্গে গোবিন্দদাস কবিরাজের হৃদ্যতা ছিল। কয়েকটি সামন্ত-জমিদারের সভায়ও তিনি সসম্মানে স্বাগত হইতেন। কোন কোন কবিতার ভনিতায় গোবিন্দদাস তাঁহার সুহৃৎ ও পোষ্টাদের নাম করিয়াছেন। নরোত্তমের আত্মীয় ও শিষ্য সন্তোষ দত্তের অনুরোধে গোবিন্দদাস

---

[১] গোবিন্দদাস কবিরাজ ও তাঁহার পদাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়' (১৩৩৬) দ্রষ্টব্য।

[২] পুথিটি শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আনিয়াছিলেন। আলোচ্য পদটি আমি প্রথমে বঙ্গশ্রী পত্রিকায় (মাঘ ১৩৪০ পৃ ১৩৮) ও পরে *History of Brajabuli Literature* গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছিলাম। [৩] HBL পৃ ৩১৯। [৪] =গাত্র। [৫] =মাতৃ।

'সঙ্গীতমাধব' নাটক লিখিয়াছিলেন।[১] এই নাটক এখন লুপ্ত তবে ইহার গানগুলি (ব্রজবুলিতে ও সংস্কৃতে লেখা) সম্ভবত তাঁহার পদাবলীর মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া আছে। তাহার মধ্যে নিম্নে উদ্ধৃত পদ দুইটি অন্যতম বলিয়া মনে করি। প্রথমটি[২] সংস্কৃতে লেখা, দ্বিতীয়টি[৩] ব্রজবুলিতে। দুইটিই কৃষ্ণের রূপবর্ণনা।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপঙ্কজকলিতম্
ব্রজবনিতাকুচকুঙ্কুমললিতম্।
বন্দে গিরিবরধরপদকমলম্
কমলাকরকমলাঞ্চিতমমলম্।
মঞ্জুলমণিনূপুররমণীয়ম্
অচপলকুলকামিনীকমনীয়ম্।
অতিলোহিতমতিরোহিতভাসম্
মধুমধুপীকৃতগোবিন্দদাসম্।

মরকত মুকুর মিলিত মুখমণ্ডল
মুখরিত মুরলী সুতান
শুনি পশু পাখী শাখিকুল পুলকিত
কালিন্দী বহই উজান।
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামরচন্দ
কামিনী মনহি মুরতিময় মনসিজ
জগজন নয়ন আনন্দ। ধ্রু।
তনু অনুলেপন ঘনসার চন্দন
মৃগমদ কুঙ্কুম-পঙ্ক
অলিকুলচুম্বিত অবনিবিলম্বিত
বনি বনমাল বিটঙ্ক।
অতি সুকুমার চরণতল শীতল
জীতল শরদরবিন্দ
রায় সন্তোষ মধুপ-অনুসন্ধিত
নন্দিত দাস গোবিন্দ।

শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণের প্রীতিতে গোবিন্দদাস একটি রামবন্দনা-

---

[১] সঙ্গীতমাধবের খণ্ডিত পুথি উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক পণ্ডিত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় দেখিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে এইটুকু উদ্ধৃত করিয়াছিলেন (বঙ্গদর্শন ফাল্গুন ১৩১৭ পৃ ৫৫৭): "প দ্মা ব তী তী র ব র্তি-গোপালপুরনগরনিবাসি-গৌড়াধিরাজ-মহামাত্য-শ্রীপুরুষোত্তমদত্তসত্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষ দত্তঃ। স হি শ্রীনরোত্তমদত্তসত্তমমহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্যভ্রাতৃশিষ্যঃ। তেন চ শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রকটলীলানুসারেণ লৌকিকরীত্যা পূর্বরাগাদিবিলাসাঢ্য-সঙ্গীতমাধবং নাটকং বিরচয্য নানারত্নাদিদানেন সাম্না পুরস্কৃত্য সমর্পিতোঽস্তি।"

[২] পদামৃতসমুদ্রে ও পদকল্পতরুতে (৩৭৯) সঙ্কলিত।

[৩] গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৬-৭ ; প-ক ত ২৪২৪।

পদ লিখিয়াছিলেন। ভনিতায় রাজার নাম আছে। বৈষ্ণব-পদাবলীতে রামবন্দনা পদ আর দেখি নাই বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।[১]

জয় জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন জনকসুতারতিকন্ত
সুর নর বানর খচর নিশাচর যছু গুণ গায় অনন্ত।
দুর্বাদল নব শ্যামল সুন্দর কঞ্জনয়ান রণধীর
বামে ধনুর্ধর ডাহিনে নিশিত শর জলধি কোটি গম্ভীর।
শ্রীপদ-পাদুক ধরু ভরতানুজ চামর ছত্র নিছোড়ি
শিব চতুরানন সনক সনাতন শতমুখ রহু কর জোড়ি।
ভকত-আনন্দন মারুতনন্দন চরণকমল করু সেবা
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল হরিনারায়ণ দেবা॥

নরোত্তমের শিষ্য ব্রাহ্মণ বসন্ত রায় গোবিন্দদাসের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন। ইনিই গোবিন্দদাসের পদাবলী লেখা হইলে বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর কাছে পৌঁছাইয়া দিতেন।[২] বসন্ত রায় নিজেও ভালো পদকর্তা ছিলেন। গোবিন্দ-দাসের তিনটি পদে বসন্ত রায়ের নাম আছে। একটি উদ্ধৃত করিতেছি। সন্দেহ অলঙ্কারের দ্বারা নবজলধর কৃষ্ণের রূপবর্ণনা।[৩]

সুরপতিধনু কি শিখণ্ডক চূড়ে, মালতীঝুরি কি বলাকিনি উড়ে।
ভাল কি ঝাঁপল বিধু আধখণ্ড, করিবরকর কিয়ে ও ভুজদণ্ড।
ও কিয়ে শ্যাম নটরাজ, জলদ-কল্পতরু তরুণি-সমাজ। ধ্রু।
কর-কিশলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ, মুরলি-খুরলি কিয়ে চাতক-ভাষ।
হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ, হার কি তারক দ্যোতিক ছন্দ।
পদতল কি থল-কমল ঘনরাগ, তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ।
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত, ভুলল যাহে দ্বিজ রায় বসন্ত॥

(শিরে ও) কি ইন্দ্রধনু, না ময়ূরপুচ্ছের চূড়া? ও কি মালতীর ঝুরি, না বলাকা উড়িতেছে? ও কি কপাল, না (পাতলা মেঘে) ঢাকা অর্ধচন্দ্র? ও কি দিঙ্‌নাগের শুঁড়, না (সুবলিত) বাহুদণ্ড? ও কি নটবর শ্যাম, না তরুণিসমাজে (অচিরে বিরহমোচনের আশ্বাসদাতা) কল্পতরুর মতো মেঘ? ও কি করপল্লব, না অরুণোদয় আভা? ও কি বংশীধ্বনি, না চাতকের ডাক? ও কি হাসি, না অমৃত মধু? ও কি হার, না তারার দীপ্তি গাঁথা? ও কি পদতল, না স্থলকমলে ঘনীভূত রক্তিমা? তাতে ও কি কলহংস, না চঞ্চল নূপুর? গোবিন্দদাস বলিতেছে, বুদ্ধিমান দ্বিজ বসন্ত রায় যাহাতে ভুলিয়াছেন (কী সে)?

একটি পদে রামচন্দ্র রায়ের নাম আছে। ইনি কি কবির বড় ভাই? পদটি অপ্রকাশিত। এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।[৪] মানিনী রাধার কাছে কৃষ্ণের হইয়া সখীর অনুনয়।

---

[১] ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত। HBL পৃ ১০৭।
[২] ভক্তিরত্নাকর দ্রষ্টব্য। [৩] প-ক-ত ১০৫০। [৪] বি ১৮৯৫।

ব্রজরাজনন্দন   রাজ-ভুখন   শয়ন সুখময় শেজ
কি খেনে তুয়া সঞে   নেহ কয়লহি   সে সব দূরহিঁ তেজ।
শুন বৃষভানুনন্দিনী রাই
সরলা-মণ্ডলে   কিরিতি রাখলি[১]   এ তুয়া মান বিথাই। ধ্রু।
এতহুঁ যাকর   বিরস আনন   হেরি, মুরছলি শেল[২]
কৈছনে পামরি   বচন ঐছন   নিরদয় অন্তর ভেল।
তোঁহারি নাগর   ধূলি-ধূসর   সে নাহ-নাগরী তোই
বাম করতলে   বদন[৩]-লম্বিত   ধরণী লিখি লিখি রোই।
যে জন বহুজন-   বেদন জানয়ে   তাকর অন্তর জান
রায় রামচন্দ্র   তেঁই সে সাধয়ে   দাস গোবিন্দ ভান।

দুইটি পদে শ্রীবল্লভের নাম আছে।[৪] একটি অথবা দুইটি পদে "রায় চম্পতি"[৫], দুইটি পদে "রাজা রূপনারায়ণ"[৬], আর সম্ভবত একটি অথবা দুইটি পদে "প্রাত-আদিত" (অর্থাৎ প্রতাপ-আদিত্য)[৭] উল্লিখিত।

আটটি পদে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের যুক্ত ভনিতা আছে।[৮] এগুলির সম্বন্ধে রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পদামৃতসমুদ্রের টীকায় বলিয়াছেন যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অসম্পূর্ণ পদ সম্পূর্ণ করিয়া নিজের ভনিতাও যোগ করিয়াছিলেন।[৯] আগে দেখানো হইয়াছে যে বিদ্যাপতি কতকগুলি ধুয়া-পদ লিখিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস এমনি ধুয়াপদ কতকগুলিকে বাড়াইয়া প্রচলিত পদাবলীর দীর্ঘতা দিয়া থাকিবেন। কিন্তু প্রাপ্ত পদগুলি সমস্যাপূরণ বা জোড়াতালির মতো বোধ হয় না। বরং মনে হয়, যেন বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস দুই বন্ধু মিলিয়া পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। যেমন, মানিনী রাধার কাছে সখী কৃষ্ণের বিরহ বর্ণনা করিতেছে।[১০]

মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি,   শুতি রহল হরি কছু না আলাপি।
পরসঙ্গে কহল মু নামহি তোরি,   তবহি মেলি আঁখি রহে মুখ মোরি।
সুন্দরি ইথে নাহি কহি আন ছন্দ,   তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ।
যোই নয়নভঙ্গি না সহে অনঙ্গ,   সোই নয়নশরে লোর-তরঙ্গ।

---

[১] পাঠ "রহল"।   [২] ঐ "ছেল"।   [৩] ঐ "মদন"।

[৪] গীতচন্দ্রোদয় পৃ ২৭২-৭৩, ২৮৬। অন্যত্রও আছে। তবে গীতচন্দ্রোদয়ের পাঠ ভালো।

[৫] প-ক-ত ৫৩২, ৫৩৮। দ্বিতীয় পদটিতে পাঠান্তরে রায়-চম্পতি স্থানে "প্রাত আদিত" আছে।

[৬] একটিতে "রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ" (গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৭, প-ক-ত ২৪১৬। পাঠান্তরে "বৈদ্যনাথ রূপনারায়ণ"), অপরটিতে "ভূপতি রূপনারায়ণ" (প-ক-ত ২৪২০)।

[৭] যদি "রায় চম্পতি" ঠিক পাঠ না হয় তবে প ক-ত ৫৩৮ পদটিতে প্রতাপ-আদিত্য উল্লিখিত। "প্রতাপ-আদিত্য" পাঠ বি ১৮৯৫ পুথিতে এবং 'কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু'তেও পাওয়া যায়। [৮] বিচিত্র-সাহিত্য প্রথম খণ্ড পৃ ১৩৮, ১৫১ দ্রষ্টব্য। [৯] ঐ ১৫২। [১০] গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৩২৬, প-ক-ত ৯৩।

সোই অধরে সদা মধুরিম হাস, সোই নিরস ভেল দীঘ নিশাস।
বিদ্যাপতি কহ মিছ নহি ভাখি, গোবিন্দদাস কহু তুহু সখী[১] সাখী॥

নিম্নে উদ্ধৃত পদটি বিদ্যাপতির ধ্রুবগীতির সম্পূরক বলিয়া বোধ হয়।[২] গোবিন্দদাস স্বীকার করিয়াছেন যে পদটি বিদ্যাপতির রচনা পড়িয়া লেখা। বিদ্যাপতির ধুয়াটি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক ছিল না বলিয়া সন্দেহ করি। গোবিন্দদাস পদটিকে নব-অনুরাগী কৃষ্ণের উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণ নিশ্চয়ই বড়ায়িকে "এ সখি" সম্বোধন করেন নাই।

এ সখি অপরূপ পেখনু রামা
কুটিল কটাখ লাখ বাণ বরিষণে মন বাঁধল বিনু দামা। ধ্রু।
পহিল-বয়স ধনী মুনিমনমোহিনী গজবরগতি জিনি মন্দা
কনকলতা তনু বদন ভান জনু উয়ল পুনমিক চন্দা।
কাঁচা কাঞ্চন সাঁচ ভরি দো কুচ চুচক মরকতশোভা
কমল কোরে জনু মধুকর শূতল তাহে রহল মনলোভা।
বিদ্যাপতি-পদ মোহে উপদেশল রাধা রসময় কন্দা
গোবিন্দদাস কহ তৈছন হেরব[৩] যো হেরি লাগল[৪] ধন্দা॥

গোবিন্দদাস তিন পূর্ববর্তী কবির উদ্দেশে বন্দনাপদ লিখিয়াছিলেন। জয়দেবের উদ্দেশে একটি[৫], চণ্ডীদাসের উদ্দেশে একটি[৬], বিদ্যাপতির উদ্দেশে দুইটি।[৭] গোবিন্দদাস যে বিদ্যাপতির রচনার দ্বারা প্রচুর প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহা ইহা হইতেও বোঝা যায়।

নরোত্তম-বন্দনা পদটিতে নরোত্তমের সম্বন্ধে খাঁটি খবর কিছু আছে। ইহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের উল্লেখ আছে। গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের বন্দনায় তাঁহার আকৃতিপ্রকৃতির ছবি আছে।

কাঞ্চন বরণ- হরণ তনু সুবলিত কৌষিক বসন বিরাজে
প্রেম নাম কহি কহত ভাগবতে ঐছে বরণ তনু সাজে।
নিজ নিজ ভকত পারিষদ সঙ্গহি প্রকটহি চরণারবিন্দে
নিরবধি বদনে নাম বিরাজিত রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দে।

চৈতন্যবন্দনা অনেকগুলিই আছে। কয়েকটি পদ বেশ ভালো। নীচে উদ্ধৃত পদটিতে বন্দনা ও মনঃশিক্ষা সম্মিলিত।

[১] প-ক-ত পাঠ "তাহে"।
[২] গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৩৮৩-৮৪; পদামৃতসমুদ্র (দ্বি-স) পৃ ৯৭।
[৩] পাঠান্তর "হেরল"। [৪] ঐ "লাগয়ে"। [৫] 'শ্রীগোবিন্দদাস' পৃ ৬০।
[৬] ঐ। [৭] প-ক-ত ২৩৮৬। 'শ্রীগোবিন্দদাস' পৃ ৫৯-৬০।

শ্রীপদকমল-সুধারস পানে
শ্রীবিগ্রহগুণগণ করি গানে।
শ্রীমুখবচন-সুধারস সঙ্গী
অনুভবি কত ভেল ভাব-তরঙ্গী।
রে মন কাহে করসি অনুতাপে
পহুক প্রতাপমন্ত্র করু জাপে। ধ্রু।
যো কিছু বিচারি মনোরথে চড়বি
পহুক চরণযুগ সারথি করবি।
রথবাহন করু প্রাণ তুরঙ্গ
আশা পাশ জোরি নহ ভঙ্গ।
লীলা-জলধি তীরে চলি যাই
প্রেমতরঙ্গে অঙ্গ অবগাই।
রঙ্গ-তরঙ্গী সঙ্গী হরিদাস
রতি মণি দেই পূরব অভিলাষ।
সো রস জলধি মাঝে মণিগেহ
তহিঁ রহু গৌরী সুশ্যামরদেহ।
সারথি মেলি মিলায়ব তায়
গোবিন্দদাস গৌরগুণ গায়॥

গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভাষা ব্রজবুলি, এবং সে ভাষা শুদ্ধ ব্রজবুলি। অর্থাৎ তাহাতে অ-সংস্কৃত বাঙ্গালা শব্দ খুব কম আছে। ব্রজবুলি কবিতার ছন্দ অপভ্রংশ-অবহট্টের মতো মাত্রামূলক। মাত্রামূলক ছন্দে সব অক্ষর (syllable) সমমাত্রিক হইলে চলিবে না, দীর্ঘ অক্ষর যথেষ্ট চাই। দীর্ঘ অক্ষর মানে দীর্ঘ-স্বরযুক্ত বিবৃত অক্ষর অথবা হ্রস্বস্বরযুক্ত সংবৃত অক্ষর। এরকম অক্ষর সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দেই প্রধানত লভ্য। যেখানে তদ্ভব শব্দ লইতে হইয়াছে সেখানে সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত উচ্চারণরীতিও মানিতে হইয়াছে অথবা তৎসম শব্দকে প্রাকৃত-অপভ্রংশের অনুযায়ী বদলাইতে হইয়াছে। যেমন

প্রেম-আকুল গোপ গোকুল কুলজ-কামিনী কন্ত।

এখানে সংস্কৃত শব্দ "কান্ত" প্রাকৃত-অপভ্রংশের উপযোগী "কন্ত" হইয়াছে। এই পদেরই শেষ ছত্র

অমল কমল চরণ কিশলয় নিলয় গোবিন্দদাস॥

"কিশলয়" চার মাত্রার চার অক্ষরের শব্দ, এখানে চাই তিন মাত্রার শব্দ। সুতরাং প্রাকৃত ভাষার পরিবর্তন অনুযায়ী হইল "কিশল"। এই মতো উচ্চারণ না করিলে ছন্দ কাটিবে।

গোবিন্দদাসের কান খুব দুরস্ত ছিল। ছন্দের হাত নিখুঁত, হয়ত একটু

বেশিরকম নিখুঁত। সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে তাঁহার বেশ অধিকার ছিল। সে অধিকারের পরিচয় তাঁহার পদাবলীতে অভ্রান্তভাবে প্রকাশিত। সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার ভাব তাঁহার কয়েকটি কবিতায় আরও ভালো ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন, অমরুশতকের এই শ্লোকটি, মানিনীর প্রতি সখীর অনুযোগ।

অনালোচ্য প্রেম্ণঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদস্
ত্বয়া কান্তে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃতঃ।
সমাকৃষ্টা হ্যেতে বিরহদহনোদ্ভাস্বরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ॥

'হে সরলে, তুমি—প্রেমের পরিণতি (কি হইতে পারে তাহা) না ভাবিয়া, বন্ধুদের (উপদেশ) না মানিয়া প্রিয় কান্তের উপর মান করিয়াছ কেন? এই জ্বলন্ত-শিখা বিরহ-অগ্নির অঙ্গার তুমি নিজের হাতে ধরিয়া রাখিয়াছ। অতএব বৃথা এখন এই অরণ্যে রোদন।'

গোবিন্দদাসের এই কবিতাটিও সখীর উক্তি।[১]

শুনইতে কানু- মুরলীরব-মাধুরী শ্রবণে নিবারলুঁ তোর
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলুঁ তব মোহে রোখলি ভোর।
সুন্দরী তৈখনে কহল মো তোয়
ভরমহি তা সঞে নেহ বাঢ়াওলি জনম গোঙায়বি রোয়। ধ্রু।
বিনু গুণ পরখি পরক রূপ-লালসে কাহে সোঁপলি নিজ দেহা
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ-লাবনি জীবইতে ভেল সন্দেহা।
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্যামজলদরস-আশে
সো অব নয়ন- নীর দেই সিঞ্চহ কহতহি গোবিন্দদাসে॥

'কানুর মধুর মুরলীধ্বনি শুনিতে গেলে তোমার কান বুজিয়াছিলাম, (তাহার) রূপ দেখিতে গেলে তোমার চোখ ঢাকিয়াছিলাম। তখন মিথ্যা আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিলে। সুন্দরী, আমি তোমাকে তখনই বলিয়াছিলাম, ভুল করিয়া উহার সঙ্গে প্রেম করিলে, কাঁদিয়া জন্ম কাটাইতে হইবে। গুণ পরখ না করিয়া (শুধু) পরপুরুষের রূপলালসায় কেন নিজের দেহ সমর্পণ করিলে? এই তো তোমার রূপলাবণ্য দিন দিন খোয়াইতেছ, জীবনেই সন্দেহ হইয়াছে। যে প্রেমতরু তুমি হৃদয়ে রোপণ করিলে শ্যাম জলধরের প্রত্যাশায়, সে এখন নয়ননীর দিয়া সেচন কর। গোবিন্দদাস (স্পষ্ট) বলিয়া দিতেছে।'

ছন্দে গোবিন্দদাস যে ঝনৎকার ও বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন তাহা বৈষ্ণব-পদাবলীতে কেন পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যত্রও অনতিক্রান্ত। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

একধ্বনির মিল

তনু ঘন-মঞ্জন জনু দলিতাঞ্জন কঞ্জনয়নী-নয়ন-দলিতাঞ্জন
নন্দ-সুনন্দন ভুবন-আনন্দন নাগরী-নারী-হৃদয়-ঘন-চন্দন। ধ্রু।
লোচন খঞ্জন জগজন-রঞ্জন কুলবতী-যুবতী-বরত-ভয়ভঞ্জন
গোবিন্দদাস ভণ রসিকরসায়ন রসময় ভূপতি রূপনারায়ণ॥[২]

[১] প-ক-ত ৪৩৫। [২] প-ক-ত ২৪২০।

আওয়ে কুসুমবনি রাই রমণীমণি ধনি ধনি বৃষভানু নবীনতনী। ধ্রু।
অরুণ বসন বনি বরণ হিরণমণি অবনি উয়ল জনু থির সৌদামনী।
বদন চাঁদ জিনি বচন অমিয়া-কণি হরিণীনয়নী প্রাণ সহচরী গণি।
অরুণ চরণে মণি- নূপুর ঝনঝনি মুগধগমনী ধনী গোবিন্দদাস ভণি।[১]

'ধন্য ধন্য বৃষভানুর নবীন তনয়া রমণীমণি রাধিকা কুসুমবনে আসিতেছে। অরুণ বসন পরিহিত, বর্ণ সোনা-বাঁধা হীরার মতো। যেন ভূতলে বিদ্যুল্লতা অবতীর্ণ। বদন চন্দ্রকে হার মানাইয়াছে। বচন অমৃতের কণা। হরিণনয়না তরুণী সহচরীকে প্রাণ ভাবে। অরুণচরণে মণিনূপুর ঝঙ্কৃত। মুগ্ধা নারীর মত ধন্যা তরুণীর গমন। গোবিন্দদাস বলিতেছে।'

অনুপ্রাস চরমে উঠিয়াছে বর্ণমালানুসারী "চিত্রগীত"গুলিতে।[১] ঙ, ঞ, ণ —এই তিন অক্ষর কোন শব্দের আদিতে নাই, তাই এই বর্ণগুলিকে বাদ দিয়া প্রত্যেক ব্যঞ্জন-আদি শব্দ লইয়া গোবিন্দদাস একটি করিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন। কেবল একটিমাত্র পদে সব মূর্ধন্য অক্ষর, আর একটি পদে "শ, স" এবং একটি পদে "জ, য"। একটি উদাহরণ দিতেছি। দূতী আসিয়া কৃষ্ণকে বর্ষাভিসারিণী রাধার সহিত মিলিত হইতে বলিতেছে।[১]

ঝর ঝর জলধর-ধার, ঝঞ্ঝা পবন বিথার।
ঝলকত দামিনীমালা, ঝামরি ভৈ গেল বালা।
ঝুট কি কহব কানাই, ঝুরত তুয়া বিনু রাই।
ঝনঝন বজর-নিশান, ঝাঁপি রহত দুই কান।
ঝিঞ্ঝি-ঝঙ্কর রাতি, ঝঙ্ক সহনে নাহি যাতি।
ঝুমরি দাদুরী-বোল, ঝুলত মদন হিন্দোল[২]।
ঝটকি চলহ[৩] ধনীপাশ, ঝগড়ত গোবিন্দদাস।

ঝরঝর জলধারা (ঝরিতেছে)। ঝঞ্ঝা পবন (দিকে দিকে) বিস্তারিত। বিদ্যুৎ ঝলকাইতেছে। বালা (ভয়ে) বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কানাই, তোমাকে কি মিথ্যা বলিব? তোমা বিনা রাই অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। ঝন্ঝন্ বজ্রধ্বনি, (শুনিয়া রাধা) দুই কান ঢাকা দিয়া রহিয়াছে। ঝিঞ্ঝি-ঝঙ্কৃত রাত্রি, গোলমাল সহা যাইতেছে না। ভেকের কোলাহল ঝুমরী (গানের মতো), মদন (যেন) ঝুলন-দোলায় ঝুলিতেছে। ঝট করিয়া ধন্যা তরুণীর কাছে চল। (এই বলিয়া) গোবিন্দদাস ঝগড়া করিতেছে।'

গোবিন্দদাস একটিও বাঙ্গালা পদ লিখেন নাই একথা জোর করিয়া বলা যায় না। শ্রীনিবাস আচার্যের আর এক শিষ্য গোবিন্দদাস ভালো পদকর্তা ছিলেন। গোবিন্দদাস ভনিতায় বাঙ্গালা পদগুলি সাধারণত ইঁহারই রচনা বলিয়া গণ্য

---

১ গীতচন্দ্রোদয় পৃ ২৫৬-৫৭।

২ পদগুলি অধিকাংশ পদামৃতসমুদ্রে সঙ্কলিত আছে (২৯৯, ৩০৮, ৩১১, ৩১৭, ৩১৮, ৩২৫-৩২৯, ৩৩১, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৮)।

৩ পাঠ "হিল্লোল"। ৪ ঐ "চলত"।

হয়। কিন্তু কতকগুলি বাঙ্গালা পদের গাঁথুনি দেখিলে সেগুলিকে গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা বলিতে পারা যায়। যেমন,[১]

নীলরতন কিয়ে নবঘনঘটা
লখিলে লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা।
চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা
মদন মহেন্দ্রধনু কিবা দিল দেখা।
কি পেখলু কদম্বতলে শ্যাম চিকনিয়া
রূপ দেখি আইল জাতি কুল মজাইয়া। ধ্রু।
বদনকমল কিয়ে পুনমিক চন্দ
অধর স্থকিশলয় বাঁধুলি বন্ধ।
তাহে অতি স্থমধুর মুরলীর তানে
ভুলাইল[২] আখির লাজ সামাইল কানে।
নয়নযুগল কিয়ে ভ্রমর বিরাজ
অথলিতে দংশে যুবতি-হিয়া মাঝ।
গোবিন্দদাস কহে সে না দিঠি বিষে
না পীলে অধরস্থধা কেবা জীয়া আইসে[৩]।

১১

গোবিন্দদাসের রচিত 'অষ্টকালীয় লীলাবর্ণন' বা 'একান্নপদ' নামে পুথি অনেক পাওয়া গিয়াছে এবং ছাপাও হইয়াছে। সে গানগুলি এখনও কীর্তনে গাওয়া হয়। কাব্যের মতো ধারাবাহিকরূপে গাঁথা এই পদগুলি গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা নয় বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তবে গোবিন্দদাস কবিরাজের ভালো পদ কোনটিই এই একান্নপদের অন্তর্গত নয়। তাই অনুমান করিতে ইচ্ছা হয় যে গানগুলি কোন বৈষ্ণব-মহান্তের আদেশ বা অনুরোধ অনুসারে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত অনুসরণে ফরমাসি রচনা।[৪] একান্নপদের মর্মানুসরণ করিতেছি।

নন্দের মন্দিরে কৃষ্ণ ও রাধা একত্র নিশাযাপন করিয়াছে। ভোর হইতেই সখীরা জাগিয়া উঠিলে বৃন্দাদেবী বলিল, সকাল হইয়া আসিল, রাধাকে শীঘ্র তাহার গৃহে লইয়া যাও। বৃন্দার আদেশে পাখি সব ডাকিয়া উঠিল। জটিলা

[১] গীতচন্দ্রোদয় পৃ ২১৪-২১৫।
[২] পাঠ "ভুলল"। [৩] অর্থাৎ, তাহার দৃষ্টিতে বিষ, সে বিষ লাগিলে তাহারই অধরস্থধা পান ভিন্ন বাঁচিবার উপায় নাই।
[৪] পূর্বে দ্রষ্টব্য।

আসিতেছে—সখীরা এই ডাক দেওয়ায় রাধার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বৃন্দাদেবী সখীদের কাহাকে কি করিতে হইবে বলিয়া দিল। মন্দিরের নিকটে গাড়ু লইয়া গোবিন্দদাস দাঁড়াইয়া দেখিতেছে (১)।[১] সখীরা শয্যার কাছে আসিয়া রাধাকে দেখিতে লাগিল। এমন সময় বাঁদর ডাকিতে লাগিল। গোবিন্দদাসের প্রভু শুনিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল (২)। সখীরা রাধাকে বলিতেছে, তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়, এখনই লোক আসিয়া পড়িবে, "গুরুজন পরিজন ননদিনী দুরজন তুহুঁ কি না জানসি রীত" (৩)। কৃষ্ণ নিজের বস্ত্রাঞ্চলে রাধার মুখ মুছাইয়া বেশ বাস ঠিক করিয়া সীঁথি কাটিয়া খোঁপা বাঁধিয়া সিঁদুর পরাইয়া দিল। তাহার পর ভূষণগুলি একে একে পরাইয়া, চোখে কাজল দিল, মুখে পান গুঁজিয়া দিল। গোবিন্দদাস আর কি বলিবে, শেষে পায়ে আলতা পরাইতে বসিল (৪)। প্রসাধন শেষ হইলেও কৃষ্ণ রাধাকে ছাড়িতে চায় না। কৃষ্ণের চোখে জল আসে, বার বার পায়ে পড়ে। বিনোদিনী রাধা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন দিয়া বিদায় মাগিল। কৃষ্ণকে চিত্তে ধৈর্য ধরিতে বলিয়া সুন্দরী নূপুর কাপড়ে বাঁধিয়া নিঃশব্দে নিজ মন্দিরে গিয়া শয্যায় বসিয়া সখীদের ডাকিতে লাগিল। সকাল হইল, গুরুজন জাগিল। গোবিন্দদাসের তাক লাগিয়া গেল (৫)। সকাল হইল, গুরুজন জাগিল, সখীরা নিত্যকর্মে রত হইল। কেহ দধিমন্থন করিতে গেল, কেহ গুরুজনের সেবা করিতে লাগিল, কেহ স্বর্ণকলস লইয়া জল তুলিতে গেল, কেহ ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে বসিল, কেহ ঘরের কাজ কেহ বা বাহিরের কাজ করিতে লাগিল (৬)। শয়নগৃহে আসিয়া যশোদা কৃষ্ণকে জাগাইতেছে,—রোদ উঠিয়াছে আর এখনও তোমার ঘুম ভাঙ্গিল না। কৃষ্ণ গা মোড়ামুড়ি দিলে যশোদা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চোখে ফাগ লাগিল কেন? বুকে আঁচড় লাগিল কিসের? নীলোৎপল দেহ ম্লান দেখি কেন? নিশ্চয়ই কাহারও দৃষ্টি লাগিয়াছে। আজ ঘরে তোমাকে মঙ্গলস্নান করাইয়া দই ভাত খাওয়াইব। মায়ের এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া হাসিল (৭)। জননী আবার উঠিতে বলিলে কৃষ্ণ উঠিয়া গোঠে গেল দুধ দুহিতে। গোবিন্দদাস মটকি (=দোহনপাত্র) লইয়া ধাইল (৮)। গোঠে গিয়া কৃষ্ণ গোরু দুহিতে লাগিল। সে কী শোভা! "গোরস নীর বিরাজিত অঙ্গ, তমালে বিথারল মোতিক রঙ্গ।" মটকি মটকি ভরিয়া কৃষ্ণ দুধ রাখিতে লাগিল। গোবিন্দদাস প্রভুর দিকে তাকাইয়া থাকে (৯)।

---

[১] সংখ্যাগুলি পদসংখ্যার নির্দেশক।

এদিকে রাধা সুবাসিত তৈল হরিদ্রা আমলকী লইয়া সখীগণ সঙ্গে নদীতে স্নান করিতে চলিয়াছে। তাহার সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা দেখিবার মতো। গোবিন্দদাস বলিতেছে, ও রূপ দেখিয়া বিদগ্ধশ্রেষ্ঠ (কৃষ্ণ) ভুলিল (১০)। রাধার দিকে চোখ রাখিয়া কৃষ্ণ না দেখিয়াই গোরু দুহিতে লাগিল। তাহার বৃথা অঙ্গুলিচালনা দেখিয়া ব্রজবাসীরা হাসিয়া ফেলিলে কৃষ্ণ লজ্জা পাইয়া "ধবলী-ভরমে ধবল-পদ ছান্দই"। গোবিন্দদাসের মন মুগ্ধ হইল (১১)। কৃষ্ণ গোদোহন ছাড়িয়া দিয়া রাধা প্রেমে আত্মবিস্মৃত হইল (১২)। তাহার পর রাধা-কৃষ্ণের বিপিনমিলন ও জলকেলি এবং স্নানশেষে সখীসহ রাধার গৃহে প্রত্যাবর্তন (১৩, ১৪)। সখীদের ডাকিয়া যশোদা বলিল, রাধার বাড়ী তত্ত্ব লইয়া যাও আর তাহার গুরুজনদের বলিয়া তাহাকে ডাকিয়া আন। সখীরা রত্নথালী ভরিয়া

বিবিধ মিঠাই ক্ষীর দধি শাকর পিষ্টক বড়ই মধুর।
কর্পূর তাম্বূল হার মনোহর বাসিত চন্দন কটোর

থালায় সূক্ষ্ম বস্ত্র ঢাকা দিয়া চলিল (১৫)। সহচরী রাজার গৃহে গিয়া তত্ত্ব নামাইল আর গুরুজনদের যশোদার সন্দেশ কহিয়া রাধাকে লইয়া বাহির হইল। রাধা লাল পাটের শাড়ী পরিয়াছে, চোখে কাজল দিয়াছে, পায়ে নূপুর পরিয়াছে (১৬)। রাধা আসিয়া নন্দের মহলে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া যশোমতীর আমোদ ধরে না। রাধা গোপনে সুবাসিত অন্নব্যঞ্জন রাঁধিল, চন্দন গুলিয়া তাহাতে কুঙ্কুম দিল এবং কর্পূর দিয়া মুখশুদ্ধি পান সাজিল। শেষে সুবাসিত জলে গাড়ু ভরিয়া রাখিয়া দিল (১৭)। কৃষ্ণ-বলরাম দুই ভাই সখাদের লইয়া ভোজনে বসিল। রোহিণী দেবী পরিবেশন করিতেছে, রাধা তাহার হাতে খাদ্যপাত্র আগাইয়া দিতেছে। ভোজন সারিয়া নন্দনন্দন সুখময় পালঙ্কে শুইল। যাহা-কিছু রহিল তাহা রাধা ভোজন করিতে লাগিল। গোবিন্দদাস গাড়ু লইয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে পাখা করিতেছে (১৮)। ভোজন শেষ হইলে (দাসীকে) আঁচল ভরিয়া মিঠাই দিয়া রাধা বাড়ী চলিয়া গেল। এইরকম প্রত্যহ হয়, নগরের লোক কেহ কিছু জানিতে পারে না।

কানাই বলাই কাপড় বাগাইয়া পরিয়া গোরু লইয়া যমুনাতীরে চলিল। সঙ্গে অগণিত গোপ-বালক। অসংখ্য বাঁশী ও শিঙ্গা বাজিতেছে। সুবল সখার সঙ্গে কৃষ্ণ হাসপরিহাস করিতেছে। তাহার মাধুর্য গোবিন্দদাস এক মুখে কি করিয়া বলিবে (১৯)। গোধন লইয়া কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে রঙ্গ করিতে করিতে চলিয়াছে।

গোপ-পুরনারীরা আনন্দে হুলুধ্বনি দিতেছে। তাহারা গৃহদ্বারে মঙ্গলকলস বসাইয়াছে। রাধা অট্টালিকার উপরে দাঁড়াইয়াছে। দুইজনের দৃষ্টি লুব্ধ চকোরের মত সতৃষ্ণ। চোখে চোখে কত কথা হইল।

নয়নে নয়নে কত প্রেমরস উপজত দুহুঁ মন ভৈ গেল ভোর
প্রেম-রতন-ধন দুহেঁ দুহাঁ পিয়াওন দুই চিত দুহেঁ করু চোর।

কৃষ্ণের পা আর উঠে না। বসনভূষণ সব আলগা হইয়া গেল (২০)। গোরু ও গোয়াল-ছেলেদের লইয়া যমুনাতীরে কৃষ্ণ যথেচ্ছ খেলা করিতেছে (২১)। (বেলা আড়াই প্রহর হইলে পর) কৃষ্ণ ছল করিয়া সুবলের হাত ধরিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল। ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিল এবং (রাধা-) কুণ্ডতীরে পল্লবশয্যা বিছাইয়া পথ চাহিয়া রাধাকে ভাবিতে লাগিল। প্রেমাবেশে কৃষ্ণ সুবলকে কোলে করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল (২২)।

বিরহিণী রাধা আপনার গৃহে প্রিয়সখীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিল, যেখানে কৃষ্ণ গোচারণ করিতেছে সেখানে এখনি যাও। সহচরীর দ্বিধা দেখিয়া তাহার হাত নিজের মাথায় ধরিয়া কাতরস্বরে বলিল, বংশীবট, কদম্বতট, মণিকর্ণিক, ধীরসমীর, সঙ্কেত-স্থান, কেলিকদম্ব, কুণ্ডের তীর, যমুনা-পুলিন, গহন বৃন্দাবন, নিধুবন-স্থান, বিলাসকুঞ্জ, নিকুঞ্জবন, গোবর্ধন-কানন—এইসব স্থানে খোঁজ কর গিয়া। সঙ্গে গোবিন্দদাস চলুক (২৩)। সখী বনে বনে ঘুরিয়া শেষে কুণ্ডের তীরে পৌছিল। দেখিল, কৃষ্ণ সুবলের গলা ধরিয়া কাঁদিতেছে। সুন্দরী নিকটে আসিলে কৃষ্ণ সুস্থির হইয়া বসিল (২৪)। কৃষ্ণের দর্শন পাইয়া সখী সত্বর রাধার কাছে ফিরিয়া গেল। শুনিয়া রাধা ও সহচরীরা আনন্দে গান করিতে করিতে লাসবেশ করিতে লাগিল (২৫)। কৃষ্ণ-আরাধনের জন্য গুরুজনের কাছে খাদ্যদ্রব্য, কর্পূর তাম্বুল চন্দন ইত্যাদি মাগিয়া লইয়া রাধা ও গোপযুবতীরা জয়কার ও হুলুধ্বনি দিতে দিতে ও শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে কুণ্ডতীরে গিয়া পৌছিল। কৃষ্ণ ও রাধা পরস্পরের মুখে চাহিয়া হাসিল (২৬)। ললিতা প্রভৃতি সখী ফুল তুলিয়া কুঞ্জ সজ্জিত করিল ও দোলনা খাটাইল (২৭)। কুঞ্জকানন ফোটা ফুলে হাস্যময়, কোকিলরবে মুখর। কুঞ্জমধ্যে রত্নময় হিন্দোল। তাহাতে কিশোরী বসিয়াছে। সখীরা দোলায় ঠেলা দেওয়াতে রাধা ভয় পাইয়া কৃষ্ণকে জড়াইয়া ধরিল। সকলে হাসিয়া উঠিল। গোবিন্দদাস রঙ্গ দেখিতে লাগিল (২৮)। ঝুলন-শেষে সখীগণকে কুঞ্জে রাখিয়া রাধা ও কৃষ্ণ ছল করিয়া অন্যপথে বনশোভা দেখিতে গেল। তাহাদের মিলন হইল (২৯)। ক্লান্ত কৃষ্ণ

শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। সখীগণ আসিয়া মিলিলে তাহাদের সঙ্গে যুক্তি করিয়া রাধা কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করিল। একটু পরেই কৃষ্ণ জাগিয়া উঠিল (৩০)। বাঁশি হারাইয়া কৃষ্ণ কাতর হইল। বাঁশি কোথায় গেল জিজ্ঞাসা করিতে রাধা বলিল, কোথায় ফেলিয়া দিয়া এখন আমাদের কাছে চাহিতেছ। তুমি কি করিবে কর। তোমার সর্বস্ব ধন কে চুরি করিয়াছে (আমি জানি না)। কাতর দৃষ্টিতে কৃষ্ণ সখীদের কাছে মুরলী ভিক্ষা চাহিলে সখীরা বলিল, কুঞ্জগৃহে দেখ গিয়া (৩১)। সখীগণ-সঙ্গে দুইজনে কুণ্ডে স্নান করিতে নামিল। তাহাদের জলকেলি দেখিয়া গোবিন্দদাস অবাক্ হইয়া গেল (৩২)। নাহিয়া উঠিলে সখীরা রাধা-কৃষ্ণের গা মুছাইয়া দিল। কৃষ্ণ রাধার বেশ বনাইয়া দিল,—চুল আঁচড়াইয়া খোঁপা আবার বাঁধিয়া দিল, অলকতিলক কাটিল, সীঁথি করিয়া তাহার উপর মৃগমদে বিচিত্র চিহ্ন আঁকিল, পায়ে আলতা দিল—সে যেন রতিজয়রেখা। তাহার পর অঙ্গ প্রসাধন করিয়া শেষে নূপুর পরাইল (৩৩)। শীতল বনছায়ায় স্থান পরিষ্কার হইলে কৃষ্ণ ভোজনে বসিল। ভোজন-শেষে সখীরা জল ও কর্পূরবাসিত পান ধরিয়া দিল। কেহ কেহ কৃষ্ণের অঙ্গে বিলেপন লাগাইল, কেহ কেহ বাতাস করিতে লাগিল (৩৪)। সেখান হইতে রাধা সঙ্গিনীদের লইয়া অন্যত্র গিয়া সূর্যপূজা করিল। কৃষ্ণ পুরোহিত হইল। আবার ভোজন পান (৩৫)। কৃষ্ণের গলায় ফুলের মালা পরাইয়া রাধা সখীদের লইয়া ঘরে ফিরিল। কৃষ্ণ সেই গহন বনে রহিল (৩৬)। ঘরে ফিরিয়া রাধা আহার করিল। সখীরা নিজের নিজের কাজ করিল, গুরুজনদের সেবা করিল। এইভাবে অপরাহ্ণ বেলা অবসান হইয়া আসিল (৩৭)। গোরু চরাইয়া কৃষ্ণ বন হইতে ফিরিতেছে। গোরুর খুরের ধূলায় ও হাম্বা ডাকে চারিদিক ও আকাশ বাতাস পূর্ণ। সখারা বেণু বিষাণ বাজাইয়া রঙ্গভঙ্গ করিতেছে। মেঘদর্শনে চাতকীর মত ব্রজবধূরা হৃষ্ট হইয়া মঙ্গল গাহিতেছে। বিপিনবিহার শ্রমে কৃষ্ণের মুখ ম্লান নীলোৎপলের মতো দেখাইতেছে। তাঁহার সৌন্দর্য দেখিলে জগৎ ভরিয়া প্রেমের বিস্তার হয়—গোবিন্দদাস এই কথা বলিতেছে (৩৮)।

গোয়ালে গোরু সব ঢুকিল। সখারা ঘরে আসিল। তাহার পর গো-দোহন হইল। কৃষ্ণের অভিনব রূপ দেখিয়া ব্রজ-রমণীরা মুগ্ধ (৩৯)। সন্ধ্যাবেলায় পুত্র ঘরে ফিরিয়াছে, তাহাতে নন্দ-যশোদা আনন্দিত। থালায় দীপ জ্বালাইয়া (মঙ্গল) গান গাহিয়া মেয়েরা কৃষ্ণের বরণ-আরতি করিল। চারিদিকে ঘিরিয়া আরতি হইতেছে, গান বাজনা হইতেছে, হুলুধ্বনি পড়িতেছে। এ অপূর্ব দৃশ্য।

"গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে সংশয় যৌবনরাজ" (৪০)। যশোদা কৃষ্ণকে ঘরের ভিতরে আনিয়া বসাইল, অঙ্গ মুছাইয়া দিয়া বেশভূষা করিয়া দিল (৪১)। রাধা সযত্নে কৃষ্ণের ফলমিষ্টান্ন ও মাল্যচন্দন জলযোগ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। সোনার থালা করিয়া সব সে সহচরীর হাতে পাঠাইয়া দিয়াছে। যশোদা কৃষ্ণকে ভোজন করাইল। থালায় অবশেষ যাহা-কিছু রহিল তাহা গোবিন্দদাস রাধার জন্য লইয়া গেল (৪২)।

মন্দিরের বাহিরে সুন্দর স্থানে কৃষ্ণের রাজসভা সজ্জিত হইয়াছে—"বিচিত্র সিংহাসন পাট পটাম্বর লম্বিত মুকুতাদাম"। সভার সদস্য গোপবালকেরা ঘিরিয়া বসিল। কেহ গায়, কেহ বাজায়, কেহ তাল দেয়। কেহ পাখার বাতাস দেয়, কেহ মশাল ধরে। সোনার বাটায় কর্পূর-তাম্বূল ভরা। ব্রজরাজ কৃষ্ণসভায় উপনীত হইল (৪৩)। কৃষ্ণ ও বলরাম দুইভাই আসিয়া বসিল। সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল। যুবতীদের প্রাণ অস্থির হইল (৪৪)। সভাভঙ্গ হইলে কৃষ্ণ নিজগৃহে গিয়া শয়ন করিল। সদস্যেরা নিজের নিজের বাড়ী গেল। রাজা নন্দ ভোজন করিল। নগরের লোক নিঃশব্দ হইল। কেবল "ময়ুর-ময়ূরীগণে ঘন দেই নাদ" (৪৫)।

কুঞ্জকাননে ফুল ফুটিয়াছে, শুক-সারী কোকিল ডাকিতেছে, ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া ভালো স্থান দেখিয়া ফুলশয্যা পাতিল। আর আকুল হৃদয়ে রাধার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল (৪৬)। গুরুজন পরিজন নিদ্রিত জানিয়া রাধা অভিসারে প্রয়াণ করিল। নিভৃত নিকুঞ্জে মিলন হইল। সখীরা গানবাজনা রঙ্গরস করিতে লাগিল। প্রেমাকুলতা বাড়িয়াছে জানিয়া সখীরা ফুলশয্যা পাতিয়া দিল। প্রত্যহ এমনি বিলাস হয়। গোবিন্দদাস চরণসেবা করে (৪৭, ৪৮)। প্রেমক্রীড়া অনেকক্ষণ চলিল, তাহার পর দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রিয়সখী চামর ঢুলাইতে লাগিল। সহচরীরা ঝারি ভরিয়া সুগন্ধ বারি দুইজনের পাশে রাখিয়া দিল। "মন্দির নিকটে পদতলে শূতল সহচরী গোবিন্দদাস" (৪৯-৫১)।

রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহসেবা পদ্ধতি ঠিক এই অনুসারেই বাঁধা হইয়াছিল॥

১২

গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহও[১] শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন। ইনি পদকর্তা ছিলেন না। তবে দুই-একটি পদ লিখিয়াছিলেন। ইহার ভনিতায় একটিমাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে।[২]

যব ধরি পেখলুঁ কালিন্দী-তীর
নয়নে ঝরয়ে কত বারি অথির।
কাহে কহব সখি মরমক খেদ
চিতহিঁ না ভায়ে কুসুমিত শেজ।
নবজলধর জিতি বরণ উজোর
হেরইতে হৃদি মাহা পৈঠল মোর।
তব ধরি মনসিজ হানয়ে বাণ
নয়নে কানু বিনু না হেরিয়ে আন।
দিব্যসিংহ কহে শুন ব্রজরামা
রাই কাহু একতনু দুহুঁ একঠামা।

১৩

গোবিন্দদাস নামে শ্রীনিবাস আচার্যের আর এক শিষ্য ছিলেন। ইনি ব্রাহ্মণ। নাম গোবিন্দদাস চক্রবর্তী। নিবাস বোরাকুলি গ্রামে। পত্নীর নাম সুচরিতা, পুত্র মাধবেন্দ্র।[৩] মতান্তরে তিন পুত্র—রাজবল্লভ, রাধাবিনোদ ও কিশোরীদাস।[৪] গোবিন্দদাস সস্ত্রীক ও সপুত্র শ্রীনিবাসের শিষ্য হইয়াছিলেন। গোবিন্দদাস সঙ্গীতজ্ঞ ও ভাবুক ছিলেন বলিয়া "ভাবক চক্রবর্তী" নামে খ্যাত ছিলেন।

সতীর্থ বান্ধব কবিরাজের মতোই চক্রবর্তী ভালো পদকর্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পদাবলী কবিরাজের পদাবলীর সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ায় তাঁহার কবিকৃতির যথাযথ মূল্য নিরূপণ অসম্ভব হইয়াছে। রামগোপাল দাস, রাধামোহন ঠাকুর ও বৈষ্ণবদাস অল্প কয়েকটি পদ গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর বলিয়া নির্দেশ

[১] পুত্রের নামকরণের সময়ে গোবিন্দদাস শাক্ত ছিলেন, তাই এই দেবীবাহন নাম।

[২] সংকীর্তনামৃত (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, ১৯২৯) ১৯১।

[৩] "সস্ত্রীক-শ্রীলগোবিন্দচক্রবর্তিমহাশয়ঃ। তৎপুত্রো মাধবেন্দ্রস্তু" (গ ৫৬৩৮)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংকলিত *Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts* (Vol, IV. পৃ ১১৭-১৯) দ্রষ্টব্য।

[৪] কর্ণানন্দ (বহরমপুর, রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত) প্রথম নির্যাস দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন।[১] শুধু এই পদগুলি অনুসরণ করিলে একটুমাত্র বলিতে পারি যে গোবিন্দদাস চক্রবর্তী বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি দুই ছাঁদেই দক্ষ ছিলেন এবং "গোবিন্দ-দাসিয়া" ভনিতার কতক পদ তাঁহারই রচনা। (এই ভনিতার অপর কোন কোন পদ গোবিন্দ আচার্যের রচনা বলিয়া অনুমান করি।)

তবে এটা ঠিক যে চক্রবর্তী কবিরাজের তুলনায় অনেক বেশি বাঙ্গালা পদ লিখিয়াছিলেন এবং চক্রবর্তীর লেখায় চটকের অপেক্ষা রসভার বেশি। রসকল্প-বল্লীতে রামগোপাল দাস নিম্নে উদ্ধৃত পদটিকে চক্রবর্তী ঠাকুরের রচনা বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন।[২]

উলসিত মঝু হিয়া আজি আওব পিয়া
দৈবে কহল শুভবাণী
শুভসূচক যত প্রতি অঙ্গে বেকত
অতএ নিচয় করি মানি।
সজনী সবহি বিবাদ দূরে গেল
সুখসম্পদ বিহি আনি মিলায়ব
অইছন মতিগতি ভেল।
মঙ্গলকলস পর দেহ নবপল্লব
রোপহ ঠামহি ঠাম
গ্রহগণক আনি করহ বিভূষিত
তুরিতে মিলয়ে জনু শ্যাম।
হারিদ দাড়িম কাজর দরপণ
দধি ঘৃত রতনপ্রদীপে
সুবরণ-ভাজন লাজহি ভরি ভরি
রাখহ নয়ন সমীপে।
নব নব রঙ্গিণী দেই হুলাহুলি
বসন ভূষণ করু শোভা
প্রাণপ্রাণ হরি নিজ ঘরে আওব
গোবিন্দদাস মনলোভা॥

'আমার হৃদয় উল্লসিত। আজ প্রিয় আসিবে—এই শুভবাণী দৈবজ্ঞ কহিয়াছে। (আমার) প্রতি অঙ্গে শুভসূচক (স্পন্দন) ব্যক্ত হইতেছে, তাই দৈবজ্ঞের কথা সত্য হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। সখী, সব বিপদ দূর হইল। বিধাতা সুখসম্পদ আনিয়া দিবে। আমার মনে এই রকম নিশ্চয় হইতেছে। মঙ্গলকলসের উপরে নব (আম্র) পল্লব দিয়া স্থানে স্থানে বসাইয়া দাও। দৈবজ্ঞকে আনিয়া তাহাকে বসনভূষণ দাও যাহাতে শ্যাম যেন শীঘ্র আসিয়া মিলিত হন। হলুদ, দাড়িম, কাজল, আরসি, দধি ঘৃত, রত্নপ্রদীপ ও খই দিয়া সোনার থালা ভরিয়া চোখের সামনে রাখিয়া দাও। নব নব রঙ্গিণীরা উলুধ্বনি করুক আর বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া শোভা করুক। প্রাণের প্রাণ হরি আজ নিজগৃহে আসিবে। গোবিন্দদাসের মন তাই লোভাতুর।'

১ HBL পৃ ১৩৫ দ্রষ্টব্য। প-ক-ত, ১৩৩, ২৬৭, ২৭৭, ১৭০৪, ১৮০২, ১৮০৪-১৮১৪, ১৯৫৬।
২ প-ক-ত ১৭০৪।

বাঙ্গালায় গোবিন্দদাস ভনিতায় লেখা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী অধিকাংশই চক্রবর্তীর লেখা বলিয়া অনুমান করি। উদাহরণস্বরূপ একটি উদ্ধৃত করিতেছি।[১] পদগুলি "নদীয়া নাগরী"-ভাবের, অর্থাৎ গৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়া নবদ্বীপের তরুণীরা ব্রজবালার মত ফাঁদে পড়িয়াছে।

রসিয়া রমণী যে
মদনমোহন গৌরাঙ্গবদন দেখিলে জীয়ে কি সে।
যে ধনী রঙ্গিণী হয়
ও ভাঙ-ধনুয়া নয়ানের বাণে তার কি পরাণ রয়।
যে জানে পিরীতি বাধা
সেহ কি ধৈরজ ধরয়ে শুনিয়া ও চাঁদমুখের কথা।
বিলাসিনীর মনে দুখ
আজানুলম্বিত বাহু হেরি ঝুরে পরিসর গোরা-বুক।
কামিনী কামনা করে
গুরুয়া নিতম্ব-বিলাস বসনপরশ পাবার তরে।
গোবিন্দদাসের চিতে
গৌরাঙ্গসুন্দর-চরণনখর-চাঁদের মাধুরী পীতে॥[২]

নিম্নে উদ্ধৃত রাধাবিলাপ পদটি কীর্তনগানে আজ পর্যন্ত গায়কের ও শ্রোতার আগ্রহ অটুট রাখিয়াছে।[৩]

পিয়ার ফুলের বনে পিয়াসী ভ্রমরা
পিয়া বিনে মধু না খায় উড়ে বেড়ায় তারা।
মো যদি জানিতাঙ পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাঙ বান্ধিয়া। ধ্রু।
কোন নিদারুণ বিধি পিয়া হরি নিল
এ ছার পরাণ কেনে অবহু রহিল।
মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ
নিচয় মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ।
এইখানে করিত কেলি নাগররাজ
কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ।
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরানী।
চরণে ধরিয়া কহে গোবিন্দদাসিয়া
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া॥

---

১ গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৬৭-৬৮; প-ক-ত ২১৩১।
২ শেষ ছত্রের পাঠান্তর "গৌরাঙ্গচাঁদের চরণনখর তাহার মাধুরী পীতে" (প-ক-ত)।
৩ প-ক-ত ১৬৫৫।

ব্রাহ্মণ বলিয়া শ্রীনিবাস আচার্যের দুই শিষ্য গোবিন্দদাসের মধ্যে চক্রবর্তীই মল্লরাজসভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বীর হাম্বীর (এবং শ্রীনিবাস আচার্য) ভনিতার পদগুলি ইঁহারই রচনা বলিয়া মনে করি।

একটি দীর্ঘ বারমাস্যা পদ দুই বন্ধু গোবিন্দদাসের যুক্ত রচনা।

১৪

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই এক-আধটি পদ লিখিয়াছিলেন। এই অনেকের মধ্যে মল্লভূমের রাজা বীরহাম্বীরের নামও আছে। বীরহাম্বীরের নব-রাজধানীর "বিষ্ণুপুর" নামকরণ শ্রীনিবাসই করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাসের যেন দ্বিতীয় পাট-বাড়ী ছিল। রাজার পুরাণপাঠক 'ব্যাস" চক্রবর্তী পত্নী ইন্দুমুখী ও পুত্র শ্যামদাস সহ শ্রীনিবাসের শিষ্য হইয়াছিলেন। রাজা নিজে ব্যাসকে "আচার্য" উপাধি দিয়াছিলেন।[১]

বৈষ্ণবসাধক রূপে বীরহাম্বীরের ও তাঁহার পুত্র ধাড়িহাম্বীরের[২] যে নূতন সাধক নাম[৩] হইয়াছিল, সে কথা আগে বলিয়াছি।

বীরহাম্বীরের ভনিতায় দুইটি পদ পাওয়া গিয়াছে। একটি উদ্ধৃত করিতেছি।[৪] পদটি চমৎকার, মুরারি গুপ্তের লেখা স্মরণ করায়।[৫] রূপানুরাগিণী রাধা নিজ প্রেমপীড়ার কথা বলিতেছে।

শুন গো মরম-সখী কালিয়া কমল-আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি
কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়ানু পরানী।
শুনিয়া দেখিনু কালা দেখিয়া পাইনু জ্বালা
নিভাইতে নাহি পাই পানী
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি
না নিভায় হিয়ার আগুনি।

---

[১] "শ্রীব্যাসচক্রবর্তী তু রাজ্ঞঃ পৌরাণকঃ সুধীঃ। পুরাণশ্রাবকাদস্যাচার্যোপাধিং দদৌ নৃপঃ॥ তেনাখ্যাতাচার্যকোঽসৌ সর্বেষাং পরিমাণিতঃ। তৎপত্নী শ্রীমতী ইন্দুমুখী ভক্তিপরায়ণা॥ তৎপুত্রঃ শ্রীশ্যামদাসচক্রবর্তী মহামতিঃ।" (গ ৫৬৩৮।)

[২] নামটি আসলে পদবী, অর্থ যুদ্ধ-সেনাপতি।

[৩] "শ্রীল শ্রীবীরহাম্বীরো মহান্ মল্লমহীপতিঃ। শ্রীজীবগোপালদাসাখ্যো ভক্তিলম্পটঃ॥ তৎপুত্রো ধাড়িহাম্বীরো যুবরাজঃ শ্রিয়াযুতঃ।" (গ ৫৬৩৮।)

[৪] ভক্তিরত্নাকর পৃ ৫৮২, কর্ণানন্দ পৃ ১৯-২০।

[৫] আসলে গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর রচনা বলিয়া অনুমান করি।

বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লৈয়া যায় যমুনার তীরে
কি করিতে কিনা করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি থীরে।
শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়
এ বীরহাম্বীর-চিত শ্রীনিবাস-অনুগত
মজি গেলা কালাচাঁদের[১] পায়।

শ্রীনিবাসের কনিষ্ঠ পুত্র এবং উত্তরাধিকারী গতিগোবিন্দ অল্প কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছিলেন।[২] তাহার মধ্যে দুইটি নিত্যানন্দ-বন্দনা। একটি উদ্ধৃত করিতেছি।[৩]

নাচে নিত্যানন্দ ভুবন-আনন্দ বৃন্দাবন গুণ শুনিয়া
বাহুযুগ তুলি বোলে হরি হরি[৪] চলত মোহন[৫] ভাঁতিয়া।
কিবা সে মাধুরী বচন-চাতুরী রহ গদাধর[৬] হেরিয়া
মাধব গোবিন্দ[৭] শ্রীবাস মুকুন্দ গাওত ও রস ভাবিয়া[৮]।
নাচে নিত্যানন্দ চাঁদ রে
প্রেমে গদগদ চলে আধ পদ পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ[৯] রে।
ও চাঁদবদনে হাস সঘনে[১০] অরুণ লোচন ভঙ্গিয়া রে
কুসুম হার হিয়ার উপর[১১] সুঘড় রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া[১২] রে।
রাতুল চরণে রতন নূপুর[১৩] রঙ্গের নাহিক ওর রে
মনের আনন্দে শ্রীনিবাস-সুত এ গতিগোবিন্দ[১৪] ভোর রে॥

গুরু বীরভদ্রের (বীরচন্দ্রের) প্রশস্তি রূপে গতিগোবিন্দ একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন 'বীররত্নাবলী'[১৫] নামে।

দশ পনেরোটির বেশি পদ লিখিয়াছেন এমন শ্রীনিবাস-শিষ্যের মধ্যে এই চারজনের নামও উল্লেখযোগ্য,—মোহন দাস, বল্লভ দাস, রাধাবল্লভ দাস ও যদুনন্দন দাস।

মোহন দাসের তেইশটি ব্রজবুলি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত আছে।[১৬] বল্লভ দাস নামে একাধিক পদকর্তা ছিলেন।[১৭] গোবিন্দদাসের দুইটি পদে যে

---

[১] রাজার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। [২] HBL পৃ ২১৩ ১৪।
[৩] ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ১৯৬, প ক ত ২৩১৮।
[৪] পাঠান্তর "ঘনে বলে হরি"। [৫] ঐ "মন্থর"। [৬] ঐ "গদাধর-মুখ"। [৭] ঐ "গৌরীদাস"।
[৮] ঐ "গাওত সময় বুঝিয়া"। [৯] ঐ "ধরি গদাধর-হাত"। [১০] ঐ "ঘনে ঘনে"। [১১] ঐ "হৃদি দোলত"। [১২] ঐ "সুঘড় সহচর রঙ্গিয়া"। [১৩] ঐ "মঞ্জীর রাজত"। [১৪] ঐ "গতিগোবিন্দ চিত"।
[১৫] বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত। HBL পৃ ২১৪-২১৫ দ্রষ্টব্য। [১৬] HBL পৃ ১৫৬।
[১৭] ঐ পৃ ১৫৮।

শ্রীবল্লভের উল্লেখ আছে[১] তিনিও পদকর্তা ছিলেন। রাধাবল্লভ দাস ছন্দের প্রয়োজনে "বল্লভ দাস" ভনিতা দিয়া থাকিবেন। সুতরাং এ নাম অনেক কবি ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একজন শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য, একজন রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য, আর একজন নরোত্তমের শিষ্য। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য বল্লভ দাস যে শ্রীনিবাস রামচন্দ্র নরোত্তম ও গোবিন্দদাস কালগত হইবার পরেও জীবিত ছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত পদ হইতে অনুমান করা যায়।[২] বহুকাল পরে বিদেশ (বৃন্দাবন?) হইতে আসিয়া কবি ইঁহাদের দেখিতে পান নাই বলিয়া মনে হয়।

> গোরাগুণে আছিলা ঠাকুর শ্রীনিবাস
> নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দদাস।
> একুকালে কোথা গেল দেখিতে না পাই
> থাকুক দেখিবার কথা শুনিতে না পাই।
> যে করিল জগজনে করুণা প্রচুর
> হেন প্রভু কোথা গেল আচার্য ঠাকুর।
> রাধাকৃষ্ণলীলাগুণ যে কৈল প্রচার
> কোথা গেল শ্রীআচার্য ঠাকুর আমার।
> হৃদয়মাঝারে মোর রহি গেল শেল
> জীতে আর প্রভু সঙ্গে দরশ না ভেল।
> এ ছার জীবনে মোর নাহি আর আশ
> সঙ্গে করি লেহ প্রভু এ বল্লভদাস।

রাধাবল্লভ দাস সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস এই চার গোস্বামীর বন্দনা পদ লিখিয়াছিলেন।[৩] এগুলি "শোচক" (বিলাপ) পদাবলী-নামে চিহ্নিত।

যদুনন্দন নামে অন্তত তিনজন পদকর্তা ছিলেন। যদুনাথ নামেও একজন ছিলেন। চারজনেই কখনও কখনও "যদু" ভনিতা ব্যবহার করিয়াছেন।[৪] সুতরাং কোন্‌টি কাহার রচনা তাহা আভ্যন্তরীণ প্রমাণাভাবে বোঝা শক্ত। যদুনন্দন চক্রবর্তী নিত্যানন্দ-অনুচর গদাধরদাসের শিষ্য। পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত (২১৮২) গৌর-গদাধর বন্দনা পদটি ইঁহারই রচনা হওয়া সম্ভব। ইঁহার রচিত বলিয়া একটি ভনিতাহীন পদ ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত আছে। বৈদ্য যদুনন্দন দাস শ্রীনিবাসের শিষ্য, পরে শ্রীনিবাস-কন্যা হেমলতা দেবীর অনুচর হইয়াছিলেন। ইঁহার কথা পরে আলোচ্য।

---

১ গীতচন্দ্রোদয় পৃ ২৭০, ২৮৬। ২ প-ক-ত ২৯৮১।
৩ প-ক-ত ২৩৬১-৬২, ২৫৬৮, ২৩৭০। ৪ HBL পৃ ৫৪।

১৫

নরোত্তম-শিষ্যদের মধ্যে পদকর্তা হিসাবে সর্বাগ্রগণ্য বসন্ত রায়। ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। গোবিন্দদাস কবিরাজের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ইনি।[১] "দাস বসন্ত" ভনিতায় যে নরোত্তম-বন্দনা পদটি ভক্তিরত্নাকরের প্রথম তরঙ্গে উদ্ধৃত আছে তাহা ইহারই রচনা বলিয়া মনে করি। বসন্ত রায়ের পদগুলি সমসাময়িক অধিকাংশ পদকর্তাদের রচনার তুলনায় অনেক ভালো। ইহার একটি পদ আগে উদ্ধৃত করিয়াছি। এখন আর একটি উদ্ধৃত করিতেছি।[২]

সখি হে শুন বাঁশী কিবা বোলে

আনন্দ-আধার কিয়ে সে নাগর আইলা কদম্বতলে।
বাঁশরী-নিসান শুনিতে পরাণ নিকাশ হইতে চায়
শিথিল সকল ভেল কলেবর মন মূরছই তায়।
নাম বেঢ়া-জাল খেয়াতি জগতে সহজে বিষম বাঁশি।
কানু-উপদেশে কেবল কঠিন কামিনীমোরন ফাঁসি।
কি দোষ কি গুণ একই না গণে না বুঝে সময় কাজ
রায় বসন্তের পহু বিনোদিয়া তাহে কি লোকের লাজ।

গোবিন্দদাস কবিরাজের আর এক বন্ধু ছিলেন রায় চম্পতি। দুই একটি পদে কবি ও কবিবন্ধুর যুক্ত ভনিতা দেখা যায়।[৩] "চম্পতি" "চমূপতি"র বিকৃত রূপ হওয়া সম্ভব। রাধামোহন ঠাকুরের মতে চম্পতি উড়িষ্যা-রাজ প্রতাপরুদ্রের কর্মচারী ছিলেন।[৪]

পদকল্পতরুতে "দুর্জয়-মান" শীর্ষকে যে সাতটি পদ আছে তাহাতে "চম্পতি" অথবা "ভূপতি" ভনিতা দেখা যায়।[৫] চম্পতি-ভনিতায় অনেকগুলি পদ আছে, "ভূপতি", "ভূপতিনাথ" ও "সিংহ ভূপতি" ভনিতায়ও কয়েকটি পদ আছে।[৬] "রায় চম্পতি" ও "সিংহ ভূপতি" মিথিলার অথবা মোরঙ্গের কোন রাজা হইতে পারেন? দ্বিতীয় ভনিতাটি শ্রীনিবাস-শিষ্য রাজা নরসিংহের হইতে পারে।

চম্পতি-ভূপতির দুর্জয়-মান বিষয়ক পদাবলী লক্ষ্য করিয়াই গোবিন্দদাস লিখিয়াছিলেন, "রায় চম্পতি বচন মানহ"।[৭]

ভক্তিরত্নাকর অনুসারে শিবরাম-দাস নরোত্তমের শিষ্য। পদকল্পতরুতে ইহার অনেকগুলি ব্রজবুলি পদ আছে, তাহার মধ্যে চারটিতে হিন্দী শব্দের মিশ্রণ দেখা যায়। সম্ভবত ইনি ব্রজবাস করিয়াছিলেন॥

---

[১] আগে দ্রষ্টব্য। [২] প-ক-ত ২৯১৬।

[৩] প-ক-ত ৫৩১, ৫৩৮। শেষ পদে ভনিতায় "রায় চম্পতি"র পাঠান্তর পাওয়া যায়, "প্রাত আদিত"। [৪] HBL পৃ ১৫৫। [৫] ঐ পৃ ১৫২। [৬] ঐ পৃ ১৫১-৪২। [৭] প-ক-ত ৫৩১।

১৬

গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যদের মধ্যে তিনচারজন উল্লেখযোগ্য পদকর্তা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান যিনি, নয়নানন্দ মিশ্র তিনি গদাধরের শিষ্য এবং ভ্রাতুষ্পুত্র।[১] ইঁহার চৈতন্য-বন্দনা পদ সুলিখিত। উদাহরণ আগে দিয়াছি।

অনন্ত নামক পদকর্তার কথা আগে বলিয়াছি। "অনন্ত", "অনন্তদাস", "রায় অনন্ত"—এই ভনিতার পদগুলি একই পদকর্তার রচনা হওয়া সম্ভব নয়। অনন্ত ও অনন্তদাস এক ব্যক্তি হইতে পারেন। অনন্ত রায় অন্য ব্যক্তি। তবে "অনন্ত" ইঁহারও ভনিতা হইতে পারে। অদ্বৈত আচার্যের শাখায় অনন্ত দাসের নাম আছে। অদ্বৈতের আর এক শিষ্য ছিলেন অনন্ত আচার্য নামে।[২] ইঁহার লেখা একটি পদ পাওয়া গিয়াছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এটি প্রথম পর্যায় পদাবলীর অন্তর্গত।

জয় শচীনন্দন জগজীবন সার
জীবনে মরণে গোরা ঠাকুর আমার। ধ্রু।
আসিয়া গোলোকনাথ পারিষদগণ সাথ
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈয়া
স্থাপিয়া যুগের কর্ম নিজ-সংকীর্তন ধর্ম
বুঝাইলা নাচিয়া গাইয়া।
ধরি রূপ হেমগৌর পরিলা কৌপীন ডোর
অরুণকিরণ বহির্বাস
করে কমণ্ডলু দণ্ড ধরিলা গৌরাঙ্গচন্দ্র
ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া অভিলাষ।
অখিলের গুরু হরি ভারতীরে গুরু করি
মন্ত্র দিয়া করিল গ্রহণ
নিন্দুক পাষণ্ড ছিল বহু নিন্দা পূর্বে কৈল
ভজিল বলিয়া নারায়ণ।
যাইয়া উৎকল দেশে নাম কৈল উপদেশে
ষড়ভুজ দেখাঞা প্রকাশ
অনন্ত আচার্যে কয় সঙ্গে সব মহাশয়
লৈয়া কৈল নীলাচলে বাস।

---

[১] পূর্বে দ্রষ্টব্য।

[২] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভনিতায় বড়ু চণ্ডীদাসের সঙ্গে যে "অনন্ত (আনন্ত)" পাওয়া যায় তাহা হয়ত অদ্বৈত-শিষ্য পদকর্তা অনন্ত-আচার্য (অথবা অনন্ত দাস) নির্দেশ করে। অদ্বৈত আচার্য দানখণ্ডের গান পছন্দ করিতেন। অনন্ত দাসের দানখণ্ড পদ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিশিষ্টতম অংশ 'রাধা-বিরহ' স্বতন্ত্র রচনা। ইহা মনে রাখিতে হইবে।

নিম্নে উদ্ধৃত রাধা-রূপ বর্ণনা পদের ছন্দ ব্রজবুলি পদাবলীতে অত্যন্ত দুর্লভ।[১]

ধনী কনক কেশর কাঁতি
বনি বদন বিধুর ভাঁতি।
জিনি নীলনলিন বাস
কিয়ে অমিয়া মধুর হাস
কিবা চিকণ কবরীভার
হিয়ে লম্বিত মণিহার।
কুচ কনক-দাড়িম শোহে
মন- মোহন মন মোহে।
ভুজ হেম-মৃণাল জিনি
তাহে নীল বলয়া-মণি[২]।
নখ শরদ পুনিম চাঁদ
তল[৩] হেরি অরুণ ফাঁদ।
কটি কেশরী জিনি ক্ষীণ
তিন রেখ ত্রিবলি ভীন।
থল- পঙ্কজ পদতল
মণি- মঞ্জীর ঝলমল।
হেরি তাহি অনন্তদাস
করু সেবন অভিলাষ॥

"রায় অনন্ত" এর দুইটি পদ পাওয়া গিয়াছে। দুইটিই বাঙ্গালায় লেখা ও চৈতন্য-নিত্যানন্দ বন্দনা। একটি উদ্ধৃত করিতেছি।[৪]

নিতাই চৈতন্য দুই দয়ার অবধি
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম যাচে নিরবধি।
চারিবেদ অন্বেষয়ে যে প্রেম পাইতে
হেন প্রেম দুটি ভাই যাচে অবিরতে।
পতিত দুর্গত পাপী কলিতে যাহারা
নিতাই চৈতন্য বলি নাচে গায় তারা।
ভুবনমঙ্গল ভেল সংকীর্তন রসে
রায় অনন্ত কাঁদে[৫] না পাইয়া লেশে॥

---

[১] গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৮৯-৯০। [২] অর্থাৎ মণিবলয়। [৩] অর্থাৎ হস্ততল।
[৪] অর্থাৎ গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৩৪, প-ক-ত ২৩৩৭। [৫] পাঠান্তর "কহে"।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চণ্ডীমঙ্গল পাঞ্চালী

১

মনসামঙ্গলের আলোচনার গোড়ায় গ্রামদেবীর প্রসঙ্গে মনসা ও চণ্ডীর কথা কিছু বলিয়াছি। চণ্ডীমঙ্গল পাঞ্চালীতে যে দেবীর মহিমা গীত তিনি আসলে রুদ্রাণী চণ্ডী[১] ছিলেন না, যদিও তিনি চণ্ডীমঙ্গল-রচনার বহুশত বৎসর আগেই শিবভার্যার সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছেন। শিবগৃহিণীদ্বয় সতী ও পার্বতী পুরাণপ্রথিত। তাঁহারা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শুধু প্রস্তাবনা অংশে দেখা দিয়াছেন। মূল আখ্যায়িকা যিনি অধিকার করিয়া আছেন তিনি অভয়া দুর্গা[২], তবে কাহিনীর উপসংহারে তাঁহারই প্রকাশভেদ, জলদেবী কমলা-মনসা কিছুক্ষণের জন্য রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়াছেন।

চণ্ডীমঙ্গলের অধিদেবতা দুর্গা বিন্ধ্যবাসিনী, তবে তিনি চণ্ডমুণ্ডমহিষাসুর-বিনাশিনী নহেন, তিনি অভয়া। তাই প্রাচীন মনসামঙ্গল-রচয়িতারা তাঁহাদের কাব্যকে বেশির ভাগ 'অভয়ামঙ্গল'ই বলিয়াছেন। ইহাই এই পাঞ্চালী-কাব্যের আসল নাম।

অভয়া বনদেবী। পরস্পর হিংসা না করিলে তাঁহার আশ্রম ও বনভাণ্ডার সকলের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। বন্দনীয়রূপে এই বনদেবতা বৈদিক সাহিত্যের শেষ কালে দেখা দিয়াছেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের শেষের দিকে (সূক্ত ১৪৬) তাঁহার একটি স্তব আছে। সেখানে তাঁহার নাম অরণ্যানী। ঋগ্বেদের সূক্তটি ভালো করিয়া পড়িলে কোনই সন্দেহ থাকে না যে এই অরণ্যানীই বহু শত শতাব্দের ইতিহাস বাহিয়া নানা কবিকল্পনার রঙে ডুবিয়া ও বিচিত্র লোকভাবনার

---

১ মহাভারতের আগে চণ্ডীকে শিবপত্নীরূপে পাই না। চণ্ড শব্দের স্ত্রীলিঙ্গরূপে প্রথম পাওয়া যায় রামায়ণে। অথর্ববেদে অপদেবতা চণ্ড-কন্যাদের উল্লেখ আছে (২. ১৪. ১)। এই অর্থ পরবর্তী কালেও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। রোগজনক অপদেবতা বলিয়া 'চণ্ডী' নাম হরিবংশে আছে।

২ অর্থ, যিনি দুর্গমস্থানের—অরণ্যের মরুদেশের পর্বতের—অধিষ্ঠাত্রী, যাঁহার অভয় পাইয়া প্রাণী সে দুর্গম স্থানে আশ্রয় পায় ও দুর্গতি হইতে উদ্ধার লাভ করে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (দেবী) দুর্গার নাম প্রথমে পাওয়া গেল (১০. ২. ৩)। সেখানে নামটি দুর্গি রূপেও রহিয়াছে (১০. ১. ৭)।

পাকে জড়াইয়া পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গলের অধিদেবী মঙ্গলচণ্ডী রূপে দেখা দিয়াছিলেন। প্রমাণ রূপে শেষ শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি।

ন বা অরণ্যানির্হন্ত্যন্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায় যথাকামং নিপদ্যতে।

'অরণ্যানী কখনই হিংসা করেন না, যদি পরস্পর হিংসা না করে। (তাঁহার অধিকারে যে কেহ) স্বাদু ফল ভক্ষণ করিয়া যথা ইচ্ছা বিশ্রাম করিতে পারে।'

আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নামকৃষীবলাম্।
প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যানিমশংসিষম্।

'কৃষিকর্ম ব্যতিরেকেও যাঁহার ভাণ্ডার সুগন্ধ সুরভিগন্ধি অন্নে (পূর্ণ) সেই পশুমাতা অরণ্যানীকে আমি প্রকৃষ্টভাবে স্তব করিতেছি।'

কালকেতু-আখ্যানে দেবীর প্রথম আবির্ভাব। সেখানে মুখ্যভাবে তিনি পশুমাতা। তাঁহার অভয় রাজ্যে পশুরা পরস্পর দ্রোহ করে না।[১]

দুর্গ শব্দের মানে বদলাইবার ফলে দেবী দুর্গার দুই রূপভেদ দেখা গেল। এক, পর্বত-দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী যোদ্ধ্রী। দুই, মরুকান্তারবাসিনী পালয়িত্রী। প্রথম দুর্গা মহিষাসুর ধূম্রলোচন ও শুম্ভনিশুম্ভ-বধ কাহিনী আশ্রয় করিয়া মার্কণ্ডেয়পুরাণে ও অন্যত্র কীর্তিত হইয়াছেন। স্থাপত্যেও দেখা দিয়াছেন, প্রথমে অষ্টাদশভুজারূপে, পরে দশভুজা, অষ্টভুজা, চতুর্ভুজা ও দ্বিভুজা রূপে। তাঁহার বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র, তাহার মধ্যে অস্ত্র এবং বাহন রূপে গোধাও আছে।[২] ঊর্ধ্বহস্তে ধৃত গোধা পরবর্তী কালের প্রস্তর চিত্রে দেবীর পায়ের তলায় গিয়াছে, বোধ করি জলদেবী গঙ্গার মকরবাহনের ও যমুনার কূর্মবাহনের নজিরে।[৩] (গঙ্গাদেবীর মকর বাহন চণ্ডীর গোধা বাহনের প্রভাবেও হইতে পারে। অথবা এক মূল দেবীর জলাধিদেবতা ও স্থলাধিদেবতা এই দুইরূপে বাহন যথাক্রমে মকর-কূর্ম ও গোধা হইয়াছে।) দ্বিতীয় দুর্গা বিন্ধ্যবাসিনীরূপে পূজা পাইয়াছিলেন। মধ্য-ভারতে একদা তিনি বৈদিক বহ্বরা অরণ্যানীর নব

---

[১] "পশুগণে সদয় হইলা ভগবতী···
নিরাতঙ্ক আশীর্বাদ কৈল সভাকারে।
বাঘে না খাইবে মৃগ কেশরী বারণে" (মুকুন্দরাম।)

[২] মধ্যপ্রদেশে গোয়ালিয়র জেলায় ভিলসার (প্রাচীন বিদিশা) অদূরে উদয়গিরিতে গুহাগাত্রে অষ্টাদশভুজা দুর্গার মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। এই গুহাকর্ম সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক (পঞ্চম শতাব্দী)। ইহাই দুর্গার প্রাচীনতম মূর্তি। দেবী ঊর্ধ্ব দুই হস্তে গোধা ধরিয়া আছেন। গোধা বিন্ধ্য ভূভাগের কোন বিশেষ জাতির টোটেম হওয়া অসম্ভব নয়।

[৩] গোধাবাহনা দেবীর মূর্তিচিত্র পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

সংস্করণ পিষ্টপুত্রীরূপে পূজিত হইয়াছিলেন।[১] (আধুনিককালের অন্নপূর্ণা বোধ করি ইহারই নবতম কলেবর।)

দুইরূপ দুর্গারই নামান্তর ছিল চণ্ডী। প্রথম দুর্গার বেলায় চণ্ডবিনাশিনী বলিয়া চণ্ডী নাম খুবই সার্থক। দ্বিতীয় দুর্গা অভয়া ও জীবধাত্রী বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল মঙ্গলচণ্ডী বা অভয়া দুর্গা। চণ্ডীমঙ্গল-পাঞ্চালীতে ইহাই দেবীর বিশিষ্ট নাম। নামটির তাৎপর্য লোপ পাইলে পর তবেই মঙ্গলদৈত্যবধ কল্পনা করিয়া নূতন কাহিনী ফাঁদা হইয়াছিল। কিন্তু এ কাহিনী জমে নাই।

প্রথম দুর্গা-চণ্ডীর পূজা শিক্ষিত ব্রাহ্মণের স্বীকৃতি পাইয়া মুসলমান অধিকারের অনেক আগেই স্মার্তবিধিতে স্থান পাইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের মহাধর্মাধিকরণিক হলায়ুধ তাঁহার 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব'এ চণ্ডীপূজা ব্রাহ্মণের নিত্যকৃত্যের মধ্যে ধরিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাসের সাক্ষ্য অনুসারে পঞ্চদশ শতাব্দের শেষের দিকেও অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপ থাকিত এবং ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব হইত।

দ্বিতীয় দুর্গা-অভয়ার পূজা খানিকটা দুর্গা-চণ্ডীর পূজার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল[২] তবে বনদেবীরূপে তাঁহার পূজা মেয়েদের ব্রতকথারূপেও প্রচলিত ছিল। দুর্গা-অভয়ার এই দ্বৈধ রূপের প্রকাশ ও পূজা চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীতেই রহিয়াছে। কলিঙ্গের রাজা যে মূর্তি-স্থাপনা করিয়াছিলেন এবং যে মূর্তিতে দেবী পশুদের অভয় ও কালকেতুকে বর দান করিয়াছিলেন তাহা—দশভুজা বলিয়া উল্লিখিত হইলেও—দ্বিভুজা অভয়া মূর্তি। আর খুল্লনা ছাগল হারাইয়া বনে যে দেবীর ব্রত-আরাধনা করিয়াছিল তিনিও বনদেবী, নারীপূজিত। তাঁহার প্রতীক মঙ্গলঘট, পূজার উপচার মাঙ্গল্য ধানদূর্বা।[৩] এই দেবীর দয়াতেই খুল্লনা প্রথমে হারানো ছাগল পরে নিরুদ্দিষ্ট পতিপুত্র ফিরিয়া পাইয়াছিল।

খুল্লনার পতি ও পুত্র সমুদ্রে বাণিজ্যযাত্রা-পথে কালিদহে যে কমলে-কামিনী দেবীকে দেখিয়াছিল তিনি দুর্গা-চণ্ডী-অভয়া নহেন। তিনি দেবীর প্রাচীনতর

---

[১] এই দেবীর দেউলের পূজা চালাইবার জন্য ও মন্দিরের ভাঙ্গা-ফুটা সারাইবার জন্য মহারাজ সংক্ষোভ (ষষ্ঠ শতাব্দের প্রথম ভাগ) কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই দানের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার, *Select Inscriptions* পৃ ৩৭৫ দ্রষ্টব্য।

[২] অনেক প্রাচীন পরিবারে বরাভয়দানরত দ্বিভুজ অভয়া দুর্গামূর্তির পূজা এখনও চলিত আছে। এই মূর্তির একটি প্রাচীন নিদর্শন পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

[৩] ইনিও অভয়া চণ্ডী। বনে খুল্লনার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী ব্রাহ্মণীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন খুল্লনার মন পরীক্ষার জন্য।

"ব্রাহ্মণী বলেন কেন পূজহ অভয়া
এই ত কাননে চণ্ডী বড়ই নিদয়া।" (মুকুন্দরাম)

রূপভেদ কেতকা-মনসা-কমলারই বেশান্তর। সাগর মধ্যে কালিদহ, অর্থাৎ ঘূর্ণাবর্ত। তাহাতে প্রস্ফুটিত চৌষট্টিদল পদ্ম, তাহার উপরে ষোড়শী কন্যা বসিয়া আছে। তাহার হাতে একটি (বা দুইটি) হাতি, একবার গিলিতেছে আবার উদ্গার করিয়া দিতেছে।—এই দৃশ্য ধনপতি (এবং পরে তাহার পুত্র) দেখিয়া সত্য বলিয়া মনে করে এবং রাজাকে তাহা দেখাইতে না পারিয়া দণ্ডিত হয়। সুতরাং এ দৃশ্যটি দুই বণিকের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক হইয়াছিল। একদা মনে করিয়াছিলাম, যে হাতি কমলাকে (অর্থাৎ গজলক্ষ্মীকে) পূর্ণ ঘটে অভিষেক করে সেই হাতিকে দেবী গিলিতেছেন, অতএব ইহা এখনকার গণেশ-উলটানোর মতোই কুবের-সগোত্র বণিক-জাতির অশুভসূচক। এখন মনে হইতেছে, আরও কিছু রহস্য আছে। হয়ত আসলে এখানে "নাগ" ছিল এবং সে নাগ হাতি নয়, সাপ। মনসা-কমলার মুখ হইতে সাপ বাহির হওয়া ও পুনরায় মুখের ভিতর চলিয়া যাওয়া অসম্ভব বা অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার নয়। রূপকথার পাতালবাসিনী শঙ্খিনী রাজকন্যার গল্পে এ ঘটনা পাইয়াছি। এখানে বণিক পিতা-পুত্রকে দেবীর ছলনা তাঁহার স্বভাবসঙ্গত হইয়াছে। তিনি পূজা চাহেন নাই, এবং দুর্গা-অভয়ার সঙ্গে তাহার বিরোধও নাই। আসলে এটুকু কোন রূপকথার অংশ। কাহিনীকে ঘোরালো করিবার জন্য এবং প্রাচীনতর পাঞ্চালী-কাব্য মনসামঙ্গলের ধনপতির দুর্গতির সঙ্গে তাল রাখিবার জন্য সংযোজিত হইয়াছিল।[১]

হাতির সঙ্গে অভয়াচণ্ডীর যোগাযোগ গজলক্ষ্মীতে। লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে নির্মিত চণ্ডীমূর্তির উপরে দুইটি হাতি জল ঢালিতেছে, আঁকা আছে ॥[২]

২

চণ্ডীমঙ্গলে প্রধানত দুইটি কাহিনী "খণ্ড", আখেটিক ("অক্ষটি") খণ্ড ও বণিক খণ্ড। দুই খণ্ডে দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী। কাহিনী দুইটির মধ্যে কোনই প্রাসঙ্গিক যোগসূত্র নাই। প্রথম কাহিনীটি প্রাচীনতর। তাই অর্বাচীন চণ্ডীমঙ্গলে প্রথম কাহিনীটি দ্বিতীয় কাহিনীতে চণ্ডীপূজার প্রকরণের অন্তর্গত ব্রতকথারূপে সম্পুটিত দেখা যায়। কাহিনীদ্বয়ের নায়ক-নায়িকারা শাপভ্রষ্ট দেবদম্পতী, দেবীপূজা প্রচারের জন্যই নরলোকে জন্মগ্রহণ। প্রথম কাহিনীতে দেবী অরণ্যে

---

[১] চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি কাহিনীর কমলে-কামিনী পরে এক স্বতন্ত্র দেবীমূর্তিরূপে পূজা পাইতেছেন কোন কোন স্থানের ব্যবসাদার-আড়তদার মহলে। বর্ধমান শহরে নূতনগঞ্জে মহাসমারোহে কমলে-কামিনীর বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। [২] পরিশিষ্টে চিত্র দ্রষ্টব্য।

পশুমাতা। ব্যাধের অত্যাচার হইতে পশুদের রক্ষা করিবার জন্যই দেবী ব্যাধকে প্রচুর ধন দিয়া বন কাটাইয়া রাজ্যস্থাপন করাইয়াছিলেন। এই কাহিনীর মধ্যে বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের আরণ্য অঞ্চলে মনুষ্যবাসের ও রাজ্যস্থাপনের প্রাগিতিহাস-কল্পনা কিছু আছে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় কাহিনীতে দেবী আরণ্যপালিকা। দুর্গত নায়িকাকে অনুকম্পা করিয়া তাহার পূজা লইয়া হারানো পশু ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং তাহার পরবর্তী জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। এ কাহিনী কতকটা মনসামঙ্গল-কাহিনীর ছাঁচে গড়া। গৃহিণীকে নবদেবতার পূজায় রত দেখিয়া শিবভক্ত গৃহপতি তাহা বরদাস্ত করিল না। দেবীর ক্রোধে বিদেশে তাহার কারাবাস হইল। দীর্ঘকাল পরে পুত্র দেবীর সাহায্যে পিতাকে উদ্ধার করিয়া এবং রাজকন্যা বিবাহ করিয়া ধনসম্পত্তি সহ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে কাহিনীদ্বয়ের সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হইতেছে।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দুইটি ১১০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে, লোক-কথা রূপেই হোক বা দেবীমাহাত্ম্যকথা রূপেই হোক, অজানা ছিল না বলিয়া মনে করি। এ অনুমানের প্রধান হেতু "ফুল্লরা" ও "খুল্লনা" এই নাম দুইটি। নাম দুইটি প্রাচীন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই অবহট্ট বা "লৌকিক" (প্রাক্-বাঙ্গালা) রূপেই রহিয়াছে। কিন্তু অর্বাচীন কাব্যগুলিতে আধুনিক ভাষার উপযুক্ত রূপ পাইয়াছে—"ফুলরা", "খুলনা"। পঞ্চদশ শতাব্দে হোক ষোড়শ শতাব্দে হোক যিনি চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী সমসাময়িক ভাষায় প্রথমে লিখিয়াছিলেন তিনি বোধ হয় সরাসরি অবহট্ট হইতে অথবা অবহট্ট হইতে অনূদিত কোন সংস্কৃত রচনা হইতে বস্তু আহরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দে সংকলিত সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী একেবারে উপেক্ষিত হয় নাই। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'এ[১] একটি শ্লোকে দেবী মঙ্গলচণ্ডীর দুইটি কাহিনীরই ইঙ্গিত আছে।

> ত্বং কালকেতুবরদা ছলগোধিকাসি।
> যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা॥
> শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজঃ সসূনো
> রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী॥

'তুমি কালকেতুকে বর দিবার জন্য গোধিকারূপ লইয়াছিলে। এই তুমিই শ্রীশালবাহন রাজার কবল হইতে সপুত্র বণিককে রক্ষা করিতে পদ্মাসনে (বসিয়া) হাতিগুলি গ্রাস ও বমন করিতে করিতে শুভ মঙ্গলচণ্ডী হইয়াছ।'

১ উত্তরখণ্ড ষোড়শ অধ্যায় (বঙ্গবাসী সংস্করণ পৃ ২১০)। পাঠে কিছু ভুল আছে। যথামতি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল।

ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী যদি বিদ্যাপতির রচনা হয় তবে মঙ্গলচণ্ডীর গান পঞ্চদশ শতাব্দে মিথিলায়ও প্রচলিত ছিল। কালকেতু-ধনপতির কাহিনী এই গানের বিষয়বস্তু ছিল না, এমন অনুমান যুক্তিসঙ্গত হইবে না।[১] তবে চণ্ডীর অপৌরাণিক উপাখ্যান আরও কিছু কিছু বাঙ্গালা দেশে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দে প্রচলিত ছিল। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে এমন একটি কাহিনীর ইঙ্গিত করিয়াছেন যাহাতে দেবী বিপদে পড়িয়া বিষ্ণুর সাহায্যে উদ্ধার পাইয়াছিলেন।

কোন কালে পার্বতীরে ডাকিনীর গণে
বেঢ়িয়া খাইতে কৈল তোমার স্মরণে।
স্মরণ প্রভাবে তুমি আবির্ভূত হইঞা
করিলা সভার শাস্তি বৈষ্ণবী তারিয়া।[২]

৩

ধর্মমঙ্গল কাব্যের রামাই পণ্ডিতের মতো, মানিক দত্ত হইতেছেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের জনশ্রুতিমূলক আদি-কবি। মুকুন্দরামের কাব্যের একটি পুরানো পুথিতেও মানিক-দত্ত চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর আদি-কবি বলিয়া বন্দিত।

আদ্য কবি বন্দিলাম মহামুনি ব্যাস
মানিক-দত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়
বিনয় করিয়া কবিকঙ্কণে কয়।[৩]

কিন্তু মানিক-দত্তের পাঞ্চালী বলিয়া যে পুথি পাওয়া যায় তাহা চণ্ডীমঙ্গলের কোন "আদি-কবি" মানিক-দত্তের নয়। কেন না কাব্যের পুথিতে এক পূর্বতর মানিক দত্তের উল্লেখ রহিয়াছে।[৪] ঠিক এই ব্যাপার ধর্মঠাকুরের আদি পুরোহিত-পুরাণকার রামাই পণ্ডিতকে লইয়াও ঘটিয়াছে। মানিক-দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দু' একটি পুথি পাওয়া গিয়াছে[৫], কিন্তু সে পুথি সবই অর্বাচীন (অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর) এবং যিনি রচয়িতা তিনি নিশ্চয়ই চৈতন্যের পরবর্তী

---

১ "বিষহরী-মঙ্গলচণ্ডিকা-গীতাদয়শ্চ। তে চ প্রসিদ্ধা লোকবাদা যথা…"। পূর্বে পৃ ২১১-২১২ দ্রষ্টব্য।

২ ২. ১০। ৩ স ৩২ (পৃ ৪ ক)।

৪ যেমন, "অভয়াপ্রসন্নে মানিক-দত্তে গায়, রচিল মানিক-দত্ত ভবানী সহায়।"

৫ ক ৬১৮৫ (খণ্ডিত), স ২০৮ (খণ্ডিত)। মানিক-দত্তের কাব্যের পুথি লইয়া সর্বপ্রথম আলোচনা করিয়াছিলেন রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও হরিদাস পালিত (সা-প-প ১১ পৃ ৩৩-৩৬; ১৭, পৃ ২৪৭-৫৬)। আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হইতেছে ভবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী লিখিত 'মানিক দত্তের মণ্ডলচণ্ডী' (প্রতিভা অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০, পৃ ২৯০-৯৬)।

যেহেতু চৈতন্যের বন্দনা ও উল্লেখ ইহাতে আছে। প্রাপ্ত পুথির "মানিক দত্ত" অষ্টাদশ শতাব্দের আগেকার লোক না হওয়াই সম্ভব। তিনি হয়ত খানিকটা পুরানো মালমশলা ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সম্ভাব্য মালমশলা পূর্বতন কোন "মানিক দত্ত"এর কাছে নেওয়া কিনা এবং নেওয়া হইলে কতটুকু নেওয়া তাহা বলিবার উপায় নাই। আগেই বলিয়াছি পুথি বেশি পুরানো নয়। জনসাধারণের জন্য লেখা বলিয়া রচনাটি ছড়া-বহুল। সুতরাং ভাষায় প্রাচীনতা থাকিবার কথা নয়, এবং নাইও। তবে মুকুন্দরামের রচনার প্রচুর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও কাব্যটিতে প্রাচীনতর পদ্ধতির কিছু অনুসরণ থাকিতে পারে। উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের মতো এখানেও ধর্মঠাকুরের শাস্ত্র-অনুযায়ী সৃষ্টিপত্তন কাহিনী দিয়া বস্তুর আরম্ভ।

এই কারণেই পরবর্তীকালের রচনা হইলেও সর্বাগ্রে এই গ্রন্থের আলোচনা করিতেছি। প্রথমেই মানিক দত্তের কাহিনী। এটি একেবারে অভিনব। মানিক দত্তকে দিয়া দেবী কি প্রকারে মর্ত্যলোকে নিজের পূজা ও মাহাত্ম্যকাহিনী প্রচার করাইয়াছিলেন তাহা মানিক দত্ত ভনিতায় কাব্যের আরম্ভে যে-ভাবে আছে তাহা বলিতেছি।

একদিন দেবী পার্বতী তাঁহার জ্যোতির্বিদ সখী পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মর্ত্যে আমার পূজা প্রচার হইতেছে না কেন গুনিয়া বল দেখি।

এ বোল শুনিয়া পদ্মা উশ্চারিল[১] পোথা[২]
ধূম্রের ভয়ে মর্ত্যপুরে না যায় দেবতা।
ধূম্র নামে অসুর-গোটা বৈসে মর্ত্যবাসে
দেব দানব আদি না যায় তরাসে।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে (চণ্ডী-সপ্তশতীতে) উক্ত প্রকারে দুর্গা যুদ্ধ করিয়া ধূম্রলোচন-মহিষাসুরকে বধ করিলে পর দেবতারা তাঁহার পূজা করিতে ব্যগ্র হইলেন। মণ্ডপ গড়িতে হনুমানকে আদেশ দেওয়া হইল। হনুমান দিব্য-সরোবরের তীরে বিচিত্র-দেউল নির্মাণ করিয়া জানাইলে দেবী আসিয়া মণ্ডপে "ভক্ত না দেখিয়া মনদুঃখী হইল"। দেবী নারদকে বলিলেন

নৃত্যগীতে কর আমার পূজার সৃজন।
অন্য দেবতার পূজা মাসে ছয়-মাসে
হেন ব্রত কর পূজা দিবসে দিবসে।

নারদ বলিলেন, তাহা হইলে "মানিক-দত্তকে পোথা দিয়া ব্রতকথা ব্যক্ত কর

১ অর্থাৎ উচ্চারণ করিল, পড়িল, দেখিল। ২ অর্থাৎ জ্যোতিষের পুথি।

তুমি"। তখন পদ্মাকে লইয়া "জগতের আই" দেবী পার্বতী চলিলেন মহীমণ্ডলের মানিক-দত্তের কাছে ব্রতকথা জানাইতে।

পার্বতী মায়া কৈল অঘোর[1]-বৃদ্ধা হইল
লাঠি ধরিয়া দেবী নড়ে
যেখানে মানিক-দত্ত শুইয়া নিদ্রা যায়
ভগবতী বসিল শিয়রে।
চিয়াও মানিক-দত্ত শুন দুর্গার ব্রত
মুঞি দেবী জগতের মাতা
রঘু রাঘব তোখে দুই পুত্র দিব
বেক্ত করহ ব্রতকথা।

এই বলিয়া

পদ্মহস্ত দেবী মানিক-দত্তের গায়ে দিল
কায়ের বালা কালা খোড়া তার সব দূরে গেল।

তার শিয়রে ব্রতকথা-পোথা রাখিয়া দেবী অন্তর্ধান করিলে পর

রজনী প্রভাত হৈল মানিক-দত্ত জাগি পাইল
শিয়রের উপরে পোথাখানি
এহি পোথাখানি ভাবনা করিল [তবে]
দুই পুত্র দিলেন ভবানী।

মানিক-দত্তের বিদ্যাবুদ্ধি কিছু ছিল না। পোথার মর্ম বুঝিবার জন্য তাহাকে শ্রীকান্ত পণ্ডিতের দ্বারস্থ হইতে হইল। সংস্কৃত পোথার ভাব অনুসারে মানিক-দত্ত তিনশত ষাট নাচাড়ী (অর্থাৎ পদ) লিখিয়া ব্রতকথা সম্পূর্ণ করিল। তাহার পর সে গায়নের দল খুলিল।

শ্রীকান্ত পণ্ডিত বহি[2] পড়ায়
বিভেদ করিঞা পোথা দত্তকে বুঝায়।
তিন শয় ষাট নাচাড়ি করিয়া প্রবন্ধ
এহিমতে করিল পোথার নিবন্ধ।
মানিক-দত্ত গায়েন হইল রঘু রাঘব পাইল[3]
শ্রীকান্ত পণ্ডিত হইল মৃদঙ্গ বাজাইবার।

মানিক-দত্ত তাহার দল লইয়া কলিঙ্গে গান করিতে গেল।

চারি জনে যুক্তি করে লড়ে কলিঙ্গ-দ্বারে
নাট-গীত গায় প্রতি ঘরে ঘরে।

নূতন ছাঁদের নাট-গীত শুনিয়া আনন্দিত হইয়া লোকে ঘরে ঘরে দেবীর মঙ্গলবার-ব্রত অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। ঘরে ঘরে নাটগান শঙ্খঘণ্টার কলরোল।

[1] অর্থাৎ অত্যন্ত। [2] পাঠ "রহি"। [3] অর্থাৎ পালি, দোহার।

খবর রাজার কানে গেল। ব্যাপার জানিবার জন্ত রাজা এক পাত্রকে চর করিয়া পাঠাইল। চরও নাটগান দেখিয়া শুনিয়া আপন কাজ ভুলিয়া গেল। দুই-চারদিন কাটিয়া গেল, চর ফিরিতেছে না দেখিয়া রাজার মনে সন্দেহ জাগিল, রাজা বিশ্বস্ত দূত পাঠাইয়া তাঁহার নাটগীতভ্রষ্টচিত্ত পাত্রকে ডাকাইয়া আনিল।

রাজা বলে শুন পাত্র আমার বচন
রাজকর্ম ধর্ম ছাড়হ কি কারণ।
ভয় পায়া পাত্র বোলে বিনয়ে বচন
কলিঙ্গে আইল গায়েন পঞ্চজন।
অদ্ভুত বহু মঙ্গল গায় প্রতি ঘরে ঘরে
তাহাতে মজিল চিত কহিল তোমারে।
শুনিঞা রাজা তবে আনন্দিত হৈল
দূত দিয়া মানিক-দত্তকে ডাকিয়া আনিল।

মানিক-দত্ত আসিয়া দেবীর অনুগ্রহ-কাহিনী বিবৃত করিল।

নিদ্রায় আছিল শুইয়া আইল দেবী মহামায়া আইল দেবী হেমন্তনন্দিনী…
পৃষ্ঠে পাটের খোপা তাথে লাগাইল গজমুকুতা সিথের সিন্দূর কাজলের সুন্দর
ননিআ[১] পাতলি[২] দেবী পবনে হালিয়া পড়ে দুই স্তন পর্বত শম্ভুর[৩]।
মঙ্গলবার রাত্রিতে দুর্গা আইলা মোর ঘরে চুঞা-শব্দে[৪] কথা কয়
সিংহের অঙ্গেতে তনু জলে যেন শশী ভানু দেবীর রূপে শিবের মনময়[৫]।

নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে দেবী-প্রসাদলাভ স্পর্ধা মনে করিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল

তুঞি সে পবিত্র নর তোথে দুর্গা দিল বর অথ[৬] কেহ না পূজে দেবতা
ধুলিয়া-কাঠারে[৭] তোথে বন্দি করি থুইব কালি প্রভাতে লইব জিজ্ঞাসা।

কুবুদ্ধি রাজার পাকে মানিক-দত্ত বন্দী হইয়া মনের দুঃখে ভাবিতে লাগিল।

গোরাচান্দ বিনে কার শরণ লইমো। ধ্রু।
রাজাকে কুবুদ্ধি পাইল মানিক-দত্তকে বন্দী কেনে কৈল ধুলিয়া-কাঠারে
সঙ্কতে[৮] পড়িয়া দত্ত অন্তরে দুখিত হইল ভাবিল সর্বমঙ্গলা।
সত্য দেবী নারায়ণী কি মন্ত্র দিলে তুমি কথাতে রহিল ঘরবাড়ি…
ইহ বার উদ্ধার পাইলে দেবমন্ত্র না জপিমো করিব রাজ-ঢাঙ্গার[৯]।

ব্যাপার দেখিয়া নারদ দেবীকে বলিল, "খণ্ডব্রত হইল তোমার",

যাথে দিলে গীতের পোথা তার বৈরি হইল রাজা বন্দী হৈল ধুলিআ-কাঠারে।
শুনিঞা ব্রতের বাণী কোপে জলে নারায়ণী পূজায়ে নাহিক মোর সাদ
ছাড়িয়া কৈলাস [গিরি] যাইব কলিঙ্গ [পুরী] আই[১০] রাজার সহিত মোর বাদ।
বিকট দশন লয়া নাম্বে দেবী মহামায়া বসিল দেবী রাজার শিয়রে

---

[১] অর্থাৎ কোমল দেহ। [২] অর্থাৎ ছিপছিপে দেখিতে। [৩] এখানে মূলে বোধ হয় "আকার শম্ভুর" অথবা "পর্বত শিখর" এইরকম কিছু ছিল। [৪] ইঁদুরের কিচিমিচিতে। [৫] অর্থাৎ মোহে, মোহন করে। [৬] অর্থাৎ অত? [৭] অর্থাৎ ধূলিময় কোষ্ঠাগারে। [৮] অর্থাৎ সঙ্কটে অথবা সন্দেহে। [৯] অর্থাৎ রাজার জল্লাদগিরি। [১০] অর্থাৎ অই।

উঠ রাজা নরপতি তোখে কেন লাগে বিধি দন্তেকে বান্ধিলে কার বোলে।···
বিকট দশন হৈল রাজার বুকে পদ দিল কন্ধ ছিড়িল বাহুবলে।
তুলিয়া মারিছে পাক তুলে পাড়ে শেল গাছ পড়িতে ধরিছে বাম করে
ফুরিয়া[1] ভূমিতে থুইল কিবা মন্ত্র জিওাইল দেখ রাজা অবতার মোরে।

সকালে উঠিয়া রাজা স্বপ্নবৃত্তান্ত পাত্রমিত্রকে বলিল।

ভাল শুভক্ষণে তথে দন্তেক বান্ধিআছিলেঁ। জীবন সফল হইল জানি
দন্তকে আনিয়া দেহ নেতের বসন [লহ] চল গিয়া পূজিব নারায়ণী।

মানিক-দন্তকে লইয়া রাজা দেউলে ষোড়শোপচারে দেবীপূজা করিতে চলিল। তুষ্ট হইয়া পূজা গ্রহণ করিয়া দেবী বর দিতে চাহিলে রাজা বলিল, কি বর চাহিব, আমার কিছুরই অভাব নাই। প্রসন্ন হইয়া "তবে দেবী বর দিল নবধা লক্ষণ লইল ভাল জ্ঞান পাইল চূড়ামণি"।[2] তাহার পর মাথা তুলিয়া দেবীর দর্শন পাইলে হাত জোড় করিয়া ধীরে ধীরে রাজা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা আবাস পুরী কোথা তোমার ঘরগারি[3] কোন স্থানে থাক নিরন্তরে"? দেবী বলিলেন, "শুন রাজা-চূড়ামণি,"

কৈলাসে মিরাস[4] যথা একখানি ঘর তথা
ঘর মোর শ্রীকোলা নগর[5]।
লঙ্কা-ভুবন যথা একখানি ঘর তথা
আর ঘর সেতু-রামেশ্বর
কিরীটকোনা[6] যথা একখানি ঘর তথা
আর ঘর দৈবোট (?) নগর।
কামরূপী স্থান যথা একখানি ঘর তথা
আর ঘর বড় বর্ধমান।
সংসার ব্যাপন যথা একখানি ঘর তথা
[আর] ঘর বড় সোনারগ্রাম।
উদয়-অস্ত-গিরি যথা একখানি ঘর তথা
আর ঘর উড়ন্তা নগর
নির্ণয় কহিতে নারি [আর] কোথা ঘর বাড়ী
নিজ ঘর ভক্ত-বরাবর।

দেবীর এই উক্তির মধ্যেও চৈতন্য-ধর্মের ভাব উদ্দীপ্ত রহিয়াছে

মন্ত্র তন্ত্র যত দেখ অকারণে সব লেখ
গুহ্য কথা কহিব তোমারে
যে জন ভকত হয় সাদরে সেবিয়া লয়
ভাবিলে [সে] পায় অন্তরে।

অতঃপর মঙ্গলচণ্ডীর পূজা মর্ত্যলোকে প্রচলিত হইল।

---

[1] অর্থাৎ ছুঁড়িয়া। [2] অর্থাৎ দেবীর আশীর্বাদে রাজা নবধা ভক্তির অধিকারী হইল।
[3] =ঘর গৃহস্থালি। [4] =নিবাস। [5] অর্থাৎ গোলাহাট? [6] উত্তর রাঢ়ে।

তাহার পর প্রথম কাহিনীর আরম্ভ। ইন্দ্র-পুত্র নীলাম্বর শিব-দুর্গা উভয়েরই প্রিয়। ইহাকে লইয়া দেবদম্পতীর মধ্যে কলহ বাধিল। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় নীলাম্বরের অভিশাপপ্রাপ্তি ঘটিল। নারদ আসিয়া পার্বতীকে লাগাইল

শুনিঞাছ ভগবতী আজুকার কথা
পুষ্প আনি নীলাম্বর শিবের করে পুজা।

শুনিয়া দেবী শিবের কাছে অনুযোগ করিলেন।

কত্র সমুত্র তুমি তুমি ত্রিভুবনের নাথ
বৃন্দাবনে[১] পাঠাইলে আমার নীলাক।
এহি দুখে শিব ছাড়িমো তোমার ঘর
মুক্তি যাইমো বাপুর বাড়ি আপন নাইহর।

দেবী তখনি বাপের বাড়ির দিকে পা বাড়াইলেন, শিবও ত্রিশূল লইয়া অনুসরণ করিলেন। নারদ বাধা দিতে গেলে

ডাহিনে বামে চাহিল দেবী কি না দেখিল
হাতের কঙ্কণ দেবী টানিঞা খসাইল।
চক্র ধরিয়া দেবী দিল এক টান
চক্র হৈতে আনল বাহির হৈল দশখান।
সেহি ত আনলের তাপে শঙ্কর ঘামিল
শিবের ললাটে ঘাম ভূমিতে পড়িল।
ধবলকেতু সবলকেতু দুইটা ক্ষেত্রি হৈল
এক ভাইয়ে মুষল নিল আর ভাইয়ে মুদ্গর।

দুই ভাই শিবের কাছে গিয়া বলিল

কহ বাপু জর্ম দিলে বিষয় দেহ মোরে

শিব বলিলেন

পার্বতী নারদ যায় তাথে বধ কর।

ত্রিশূল লইয়া দুই ভাই দেবীকে তাড়া করিল। মুশকিলে পড়িয়া দেবী জোড়-হাত করিয়া অসুরদের বুঝাইতে লাগিলেন।

দেবী বোলে শুন ক্ষেত্রি আমার মুখের বাণী
শিবের ললাটে জর্ম মুক্তি তোমার জননী।
পুত্র হয়া না চিনিল তোমার মাতা পিতা
জর্মে জর্মে থাকুক তোর অন্নদুখের চিন্তা।
সংসার বেড়িয়া করিহ উপার্জন
এথা চিন্তা পাইবে অন্নের কারণ।
মৃগ বধি অন্ন খাইয় ফিরিহ কাননে
নিত্য চিন্তা পাইবে তুমি অন্নের কারণে।

---

[১] অর্থাৎ ঘোর বনে। ইহাই "বৃন্দাবন" কথাটির আদি অর্থ।

ই বোল বলিয়া দেবী ডাহিন বামে চাহিল
উড়না রূপসী দুই কন্যা জন্মিল।
দেবী বোলে আইস পুত্র তোখে দিলো বর
এই দুইটা নারী লয়্যা সুখে কর ঘর।

দুই ভাই শিবের কাছে ফিরিয়া গিয়া শাপবৃত্তান্ত কহিল। শিব বলিলেন, জননী হৈয়া শাপ দিলে তাহার কোন কাটান নাই। সুতরাং আমি কিছু করিতে পারিব না।

চামের দড়ি লেহ জয়ঘণ্টা আর
মৃগ বধি অন্ন খাইবে কতকাল।
কালকেতু নামে বীর জন্মিব তোর ঘরে
তাহার বিভার কালে আসিবে স্বর্গপুরে।
ই বোল শুনিঞা তারা বন পথে ধাইল
খঞ্জন বিজ-বনে তারা প্রবেশ করিল।
সারি-ঘাই বুঝিআ পাতিল জালদড়া
নেউল ঘোঙ্গটি পড়ে মহিষ আর গাড়া।
সুক্ষা চর্ম্মদড়ি ফেলায় বনে বনে
মৃগ বধি অন্ন খায় প্রতি দিনে দিনে।
অভয়াপ্রসন্নে গীত মানিক-দত্ত ভুনে।

সবলকেতু-ধবলকেতুর বংশধর কালকেতুর এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাই

কালকেতু শয়তানের ঘোড়া[১]
বিহানে খায় বেজি পোড়া।...
দাড়ি নাই দুইটা গোপ সারা[২]
মুড়া গণ্ডিপ[৩] মধ্যে দেয় চাড়া।

ফুল্লরার বেসাতি-চাতুর্যে তাহার সদাই সন্দেহ।

মাও নিদয়া মোর বাপ আহিড়ী[৪]
জন্ম ভরিআ দেখা নাহি পঞ্চাশ কাহন কড়ি।
মাংস হৈতে এত অর্থ হয় নাঞি যৌবন বিকায়াছ তুমি
উলহ[৫] পসার করিব বিচার নারী বড় দুচারিণী।

ফুল্লরার "বারমাসিয়া দুঃখের কথা" এইরূপ

ফুল্লরা বোলে শুন দেবী মোর দুঃখের কথা
ব্যাধ জাতি করি কেনে সৃজিলা বিধাতা।
প্রথম জ্যৈষ্ঠ মাসে উথলিল বন
হাতে গণ্ডিপ করি ভ্রমিছে কানন।

---

[১] "গোড়া"? [২] অর্থাৎ উপরে তোলা। [৩] অর্থাৎ গাণ্ডীব, ধনু।
[৪] অর্থাৎ ব্যাধ, আখেটিক। [৫] অর্থাৎ নামাও।

মৃগ পায়্যা প্রভু মোর হরিষে আইসে ঘরে
মাথায় চোপাড়ি করি যাও মাংস বেচিবারে।…
কার্তিক মাসে ত মাও সমুদ্র ভাইটাইল
ডাঙ্গা ছাড়িয়া পশু পুলিনে নাম্বিল।
হাতে গণ্ডিপ করি বীর সেহি বনে যায়
না পায়া মৃগ প্রভু অদৃষ্ট ধিয়ায়।…

কাহিনীর তলায় তলায় শিব-দুর্গার—দাম্পত্যঘটিত নয়, নিজ নিজ পূজাঘটিত —দ্বন্দ্বের একটি প্রচ্ছন্ন প্রবাহ আছে। নীলাম্বরের সম্পর্কে তাহা দেখিয়াছি। ভাঁড়ু-দত্তের বেলায়ও তাহাই পাইতেছি। ভাঁড়ু-দত্ত শিবের উপাসক, তাই দুর্গা তাহার উপর বিরূপ। কলিঙ্গে বন্যার বর্ণনায় এই বিরূপতার একটু ইঙ্গিত আছে। মানিক-দত্তের কাব্যে ভাঁড়ু-দত্ত শক্তিমান্ পুরুষ, একেবারে ভাঁড় নয়।

বারুণী বৈলী[১] তুমি গঙ্গা বড় ভাগ্যবান্
কলিঙ্গে তুলিয়া দেহ বান।
বাদ সাধিয়া দেহ মোরে
ভাড়ু বেটা কার্য নষ্ট করে।

ইহার পরের অংশটি "ডাক"[২] নামে চিহ্নিত।

কার বাড়িত ঝাটিঝুটি কার বাড়িত তড়
ভাড়ু-দত্তের বাড়ী হৈল নদীর সাগর।
ক্রোধে জ্বলিল তবে ভাড়ুয়া নাবড়
ব্যর্থ সেবা করিলো মুঞি ভোলা মহেশ্বর।
কি করিতে পারে দুর্গা সর্বমঙ্গলা
আদাড়ের বাঁশ কাটি উথাড় বান্ধিল।
ধীরে ধীরে বন্যা ভাড়ু-দত্তের বাড়ীতে আইল
মালসাট দিয়া বাহিরায় ভাড়ুয়া নাবড়।
শিব জপিয়া খট্টা পাড়িল পিড়ার উপর
ধীরে ধীরে বন্যা পিড়ার উপর গেল।
পিড়া ছাড়িয়া ভাড়ু ঘরে সামাইল
শিবমন্ত্র জপিয়া কপাট লাগাইল।

তখন দুর্গা চিন্তিত হইয়া গণেশের ইন্দুরকে স্মরণ করিলেন।

গণেশের বাহন বাছা নৈপাল[৩] ইন্দুর[৪]
সুবর্ণর মোড়া দন্ত রূপার চারি খুর।

[১] অর্থাৎ বারুণী বলিল। এইটুকু ছন্দে অতিরিক্ত।
[২] গানের বা আবৃত্তির প্রকারভেদ বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত প্রথম দুটি ছত্রই "ডাক"।
[৩] অর্থাৎ নদীপালক (নদীর কন্‌ট্রোলার)?
[৪] পাঠ "এন্দুর"। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

দেওয়াল কাটিয়া বাছা দেও মোর তরে
আষাঢ়িয়া জোয়ার পড়ুক গিয়া ঘরে।
ই বোল শুনিঞা নৈপাল দেওয়াল কাটিল
ডাক ডেউর[১] দুই ভাই ঘরে প্রবেশিল।

ভাঁড়ু তখন

স্ত্রীর কাপড় চিরিয়া সিপি লাগাইল,
ডাক ডেউর দুই ভাই ঘরে বন্দী হইল।

তখন আবার নৈপালের ডাক পড়িল। নৈপাল সিপি কাটিয়া দিলে

ডাক ডেউর দুই ভাই ঘরের বাহির হইল
আষাঢ়িয়া জোয়ারিয়া বড় ক্রোধ হৈল।

হড়হড় করিয়া ঘরে বান ঢুকিল। তখন "গোষ্ঠী ছাওয়াল ভাড়ু উথাড়ে[২] তুলিল"। উথাড়েও জল উঠিলে "টুই ফাড়ি দিয়া ভাড়ু চালেত চড়িল"। যে দিকে চায় সেই দিকেই জল থইথই করিতেছে দেখিয়া ভাড়ু ফাঁফর হইয়া অগত্যা সর্বমঙ্গলার শরণ লইল। পদ্মাও দুর্গার কাছে তাহার পক্ষ সমর্থন করিল।

ঠগ চামন[৩] হৈতে অনেক কর্ম হয়
ভাড়ুয়া মরিলে তোমার ব্রত হইবার নয়।

পদ্মার অব্যর্থ যুক্তিতে দুর্গা টলিলেন।

এ বোল শুনিয়া দুর্গা হুঙ্কার ছাড়িল
দুই চারি কলার গাছ আসিঞা মিলিল।

কলা গাছ পাইয়া ভেলা বাঁধিয়া ভাঁড়ু সপরিবারে তাহাতে চড়িল এবং বানভাসি প্রজাদের কাছে গিয়া পৌছিল।

হাক্কি-ফাক্কি করিয়া বৈসে তা-সভার কাছে
ভাগ্যে আইলাঙ ভাই ভাগ্যে প্রাণ বাঁচে।...
বন্যা শুখায়া গেল বায়ু সুলক্ষণ
বায়ু বসায়েন দুর্গা মঙ্গলচণ্ডীগণ।
অভয়াপ্রসন্নে মানিক-দত্তে গায়
রচিল মানিক-দত্ত ভবানী-সহায়।[৪]

গুজরাট-নগরপত্তন অতি সংক্ষেপে সারা হইয়াছে।

মোসোলমান বসিয়া গেল মাথার পাগে রাজা
তার পাছে বসিয়া গেল আশি হাজার খোজা।

---

[১] পূর্বে দ্রষ্টব্য।

[২] ঘরের ভিতরে চালের নীচে মাচায়। [৩] পাঠ "টামন"। [৪] ভনিতায় দুইবার নাম থাকায় বোঝায় যে আসল রচয়িতা কাহিনীর মানিক-দত্ত নহেন।

সেখজাদা সৈয়দ বসিল ঘরে ঘরে
আকল ফিরিঙ্গী[১] সব বসিল একস্তরে।
ডেনকোড় (?) বসিয়া তারা গেল ঘরে ঘরে

কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনীতে চার দিনের ব্রতকথার সমাপ্তি, বাকি চার দিন ধনপতি-ফুল্লরার কাহিনীতে। আলোচ্য কাব্যে এই কাহিনীর উপক্রম এইরূপ

[২]দেবী বোলে শুন নারদ তপোধন
চারিদিনের ব্রতকথা হইল কেমন।
মুনি বোলে দেবী তুমি বুদ্ধি কেনে হর
আমার বচনে তুমি মোহিনীবেশ ধর।
ধনকুবিরের পুত্র নামে কর্ণমুনি[৩]
তাহাকে ছলিয়া গিআ ব্রত কর তুমি।
পাশায়ে প্রবর করি বসাইব তারে
ঘাটি-বাড়ি[৪] বুঝিব নারদ মুনিবরে।

ধনপতির বাণিজ্য-যাত্রার পথের বর্ণনা এইরূপ

প্রথমে গোঙ্গাড়িয়া[৫] ঘাট পাছ করিল
ভ্রমরার গঙ্গায়ে গিয়া সাধু উত্তরিল।
মেলিল মোরতলা সে মোর[৬] পাছ করিয়া
শিবনদী[৭] সদাগর উত্তরিল গিয়া।
অজয়-গঙ্গা সাধু পাছ করিয়া
জাহ্নবী প্রবেশ কৈল ত্রিমোহানি[৮] দিয়া।
শঙ্খনীর ঘাটে সাধু উত্তরিল গিয়া
ইন্দ্রাণীর ঘাট সাধু পাছ করিআ।
নদীয়া নগরে সাধু উত্তরিল গিয়া।

তাহার পর "ভুলকার ঘাট", মান্দরপুর, সপ্তগ্রাম, "সমুদ্রনিশ্বাস", মগরা।[৯] অন্যত্র নদীয়ার পর—ভলকাঘাটা, মঙ্গরপুর, নলিকাটা, কলিকিটা (বা কালকিটা), "ধুবাই চুবাইপুর", চাম্পকলা, সপ্তগ্রাম[১০]।

ধনপতির বহিত্রের নাম,—যাত্রাসিদ্ধি, চন্দ্রখোল, হরিণকালি, সাসিআ, ধুমডিঙ্গা, মধুকরা, মধুকর।

বৃদ্ধা-বেশিনী দেবীর এই হেঁয়ালি-বিজড়িত উক্তির মধ্যে সেকালের লৌকিক ছড়ার নমুনা পাই।

---

[১] ফিরিঙ্গীর উল্লেখ খুব প্রাচীনত্বসূচক নয়।
[২] "পাচালি। ধানশ্রীরাগেণ গীয়তে।" [৩] অর্থাৎ মণিকর্ণ। [৪] অর্থাৎ ফলাফল।
[৫] পাঠান্তর "গোকুড়িয়া"। =গাঙ্গুড়িয়া। [৬] =আধুনিক ময়ূরাক্ষী? [৭] =শিবাই (বিপ্রদাস দ্রষ্টব্য)। [৮] পাঠ "এ মহানি"। [৯] ক ৬১৮৫ (পৃ ১২৬ ঘ)। [১০] ঐ পৃ ১৫৪ খ।

আমারে বোল ডান রে বুড়িয়ে বোল ডান
কার খাইনু ভাতার-পুত কার করিনু হান।
ডান নই রে ডান নই হইএ মুখদোষী
ঘারে বসে খাইনু মুঞি চৌদ্দ ঘর পড়শী।
ডাইন বলিঞা মোরে বোলে বার বার
ঘরে বসে খাইনু মুঞি বুঢ়া পোদ্দার।
উত্তরদেশে গেনু খাইঞা আইনু কাঙ্গাল
দুয়ারে বসিয়া খাইনু তিন লক্ষ বাঙ্গাল।
ডাইন বোলিঞা মোরে বোলে বার বার
আজিকা হইনু ডান তোমা খাইবার।

আলোচ্য কাব্যের পুথির ভনিতায় প্রায়ই কবির নামের পরিবর্তে "দুর্গার দাস", "দেবীর দাস", "ভবানীর দাস" পাওয়া যায়। কাব্যের নাম পাই "ভবানীর মঙ্গল", "দুর্গার মঙ্গল" ইত্যাদি।

পুথিতে[১] যে চৈতন্যবন্দনা "চৌতিশা" পদ আছে সেটির রচয়িতা হইতেছে জগন্নাথ "সূত্র"—অর্থাৎ সূত্রধর (অথবা শূদ্র)।

ক্ষেণেক কৃষ্ণের পদে অভিলাষ হয়
ক্ষয় যায় সর্বপাপ জগন্নাথ সুত্রে কয়।

এ পদটি প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে। তবে চৈতন্যের উল্লেখ কাব্যের মধ্যে আরও আছে। যেমন কাঁচলি-নির্মাণে

চৈতন্য-অবতার লিখে সন্ন্যাসীর গণ
ছয়-গোসাঞি লিখিয়া লইল ততক্ষণ।[২]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ছাপ যথেষ্টই আছে। আলোচ্য কাব্যের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দের শেষভাগের আগে কিছুতেই নয়। তবে প্রাচীনতর মাল-মশলার ব্যবহার কিছু থাকা সম্ভব।

কাব্যের পুথি উত্তরবঙ্গের। উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করিয়া মালদহ অঞ্চলে, এই পাঁচালী গান এখনও চলিত আছে। চণ্ডীমঙ্গল যে এককালে দুর্গাপূজা-অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল তাহারও প্রমাণ আছে। ধর্মের গাজনে যেমন আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মমঙ্গল গান এবং "পাতা" নৃত্য[৩] হইত দুর্গাপূজায়ও তেমনি চণ্ডীমঙ্গল পাঠ ও "পাতা" নৃত্য হইত। সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিতেছি।[৪]

---

[১] ঐ পৃ ৬০ খ ৬২ খ। [২] পৃ ৪৮ খ। [৩] অর্থাৎ বেশ করিয়া অথবা মুখোস পরিয়া নৃত্য অথবা অভিনয়।

[৪] ১৩২০ সালের কার্তিক মাসে মালদহ সাহিত্য সম্মেলনের কলিগ্রাম অধিবেশনে পঠিত ভবেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরীর প্রবন্ধ হইতে।

মালদহের অধীন শিরশী নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় সপ্তমী হইতে আরম্ভ করিয়া দিবস চতুষ্টয় পূজার আসরে মঙ্গলচণ্ডীর গান গীত হইয়া থাকে। ষষ্ঠীর দিন যে কিছু না হয় তা নয়। সেদিনও গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর এবং গুরু পূজনীয় ব্যক্তির বন্দনাদির পর মঙ্গলচণ্ডীর গানের পূর্বাভাস দেওয়া হয়। তাহাতে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা অর্থাৎ প্রথমে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিরূপ ছিল, ক্রমে কিরূপে তাহাতে স্থলের সৃষ্টি হইল, পরে কি প্রকারে দেবমানবের সৃষ্টি ও বসবাস হইল, ইত্যাদি পৌরাণিক বিষয়ের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হয়। সপ্তমী হইতে মূল পালা আরম্ভ করিয়া দশমীর সন্ধ্যায় 'বহিত' তুলিয়া তাহা শেষ করা হয়। 'বহিত' তোলা ব্যাপারটা বড় কৌতুকপ্রদ। আসরের একপার্শ্বে একটী ছোট পুষ্করিণী কাটিয়া তাহার চারিটী ঘাট করা হয়। পুষ্করিণীর চারি কোণে চারিটী কদলীশাখা প্রোথিত করিয়া আলিপনাদির দ্বারা উহার চতুর্দিক চিত্রিত করা হয়। পরে পুষ্করিণীটী জলপূর্ণ করিয়া ও চারি ঘাটে চারিটী গোটা পান ও সুপারি স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি সহযোগে তথায় গঙ্গাপূজা করান হয়। এদিকে কাষ্ঠনির্মিত ক্ষুদ্র নৌকা একখানি আলিপনাদির দ্বারা বিচিত্র করিয়া তদুপরি স্বর্ণ, রৌপ্য, কড়ি ও চামর রক্ষা করা হয়; একখানি কুলায় পাঁচ সের ধান্য ঢালিয়া হরিদ্রা রঙের বস্ত্রখণ্ড দিয়া আবৃত রাখা হয়। বৃন্ত সহিত একটী কুষ্মাণ্ড ও এক গাড়ু জলও প্রস্তুত রাখা আবশ্যক। গঙ্গাপূজা শেষ হইলে নায়কদের মধ্য হইতে অর্থাৎ যাঁহাদের অর্থসাহায্যে ও উদ্যোগে পূজা হইতেছে—দুইজন বালক বা অবিবাহিত যুবককে ডাকিয়া সজ্জিত নৌকাখানি পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া এঘাট ওঘাট করিয়া চারিঘাটে চারিবার লাগানর পর হুলুধ্বনি সহকারে একজনের মাথায় তুলিয়া দেওয়া হয়। ধান্যপূর্ণ কুলাখানি অপরের মাথায় দেওয়া হয়। পুষ্করিণী হইতে পূজার ঘর পর্যন্ত একখণ্ড নূতন বস্ত্র পাতিত করিয়া তাহার উপর দিয়া সর্বাগ্রে একজন জলের গাড়ু লইয়া ধীরে ধীরে জল ঢালিয়া চলিবেন, তৎপশ্চাতে একজন বৃন্ত সাহায্যে কুষ্মাণ্ডটী গড়াইয়া লইয়া যাইবেন, তৎপশ্চাতে ধান্যপূর্ণ কুলা ও সর্বশেষে নৌকা যাইবে।...নবমীর রাত্রিশেষে আর একটি কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ পাটনের মশানে উপস্থিত করিয়া শ্রীমন্তের প্রাণদণ্ডের জন্য যখন কোটাল শাণিত খড়্গ উত্তোলন করে, তখন তাহার উদ্ধারার্থ চণ্ডীদেবী পক্ককেশা বৃদ্ধারূপে মশানে অবতীর্ণা হন, আসরে গায়কদের একজন বুড়ীর মুখোষ মুখে দিয়া ঐ অংশ অভিনয় করে। তৎপরে ভৈরবী বেশে দুর্গার আগমন, সর্বশেষে চামুণ্ডারূপে দেবী মশানে অবতীর্ণা হইয়া রাজার সৈন্যসামন্ত সংহার করিতে পারিলে শ্রীমন্তের মুক্তি হয়।...এই চামুণ্ডা নামা অংশটী নিম্ব কাষ্ঠে নির্মিত চামুণ্ডার মুখোষ মুখে দিয়া গায়েনদের একজন অভিনয় করিয়া থাকে। এই অভিনয় ও ঐ মুখোষখানি তাহারই চিরন্তন সম্পত্তি। তাহার পিতৃ-পিতামহও ঐ চামুণ্ডা নাচিত, সেও নাচে, তাহার পুত্রপৌত্রও নাচিবে, এইরূপই প্রথা।...কোটালের মুখোষ আছে, ভৈরবীর কেবল 'কপালী' অর্থাৎ সোলার মুকুট, মুখোষ নাই। ইহা ব্যতীত গানের মধ্যে মধ্যে হাস্যোদ্দীপক সংও অনেক দেওয়া হয়। দশমীর প্রত্যূষে চামুণ্ডা নাচার পরই গান সাঙ্গ করিয়া আবার বৈকালে আরম্ভ হয় ও সন্ধ্যায় 'বহিত' তুলিয়া একেবারে পালা শেষ করা হয়।

চণ্ডীমঙ্গল মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি পাঞ্চালীতে কাব্যের উপাখ্যানের ক্লাইমাক্স্ থাকে উপসংহারের ঠিক আগের কাহিনীতে। কাব্যের পক্ষে এটি সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। এই অংশটি সারারাত ধরিয়া গাওয়া হইত বলিয়া এই পালার নাম "জাগরণ"। শ্রীমন্তের মশান-কাহিনী হইতেছে চণ্ডীমঙ্গলের জাগরণ-পালা। উপরের বর্ণনায় এই পালাটির নাটগীত-অভিনয় মূল্য বোঝা গেল। পালাটির এই প্রাধান্যের জন্যই চাটিগাঁ প্রভৃতি অঞ্চলে চণ্ডীমঙ্গলের নামান্তর 'জাগরণ' ॥

৪

"দ্বিজ" মাধবের (বা মাধবানন্দের) চণ্ডীমঙ্গল[১] জোড়াতালি রচনা, অন্তত পক্ষে গ্রন্থটি যেভাবে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ইহাই মনে হয়। কবির পরিচয় কোন কোন পুথিতে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে সংশয়ের বিশেষ অবকাশ আছে। প্রথম সংশয় আকবর বাদশার প্রশংসা করিয়া পঞ্চ গৌড়ের উল্লেখে।

পঞ্চ গৌড় নামে স্থান[২] পৃথিবীর সার
একাব্বর বাশ্চা[৩] অর্জুন অবতার।
প্রতাপে সকল জিনে[৪] বুদ্ধে বৃহস্পতি
কলি যুগে রাম তুল্য প্রজা পালে[৫] খিতি।

তাহার পর কোন কোন পুথিতে এই কথা আছে

সেই পঞ্চ গৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম[৬] স্থল
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল।
সেই মহানদীতটবাসী পরাশর
যাগ যজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর।
মর্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু
আচার বিচারে বুদ্ধ্যে সম সুরগুরু।
তাহার তনুজ[৭] আমি মাধব আচার্য
ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য।

দ্বিতীয় ছত্রের পরের দুই ছত্র কোন পুথিতে নাই। কোন কোন পুথিতে দ্বিতীয় ছত্রের পরে শুধু আছে

সপ্তদ্বীপ মাঝারে নদিয়া এক স্থান
ব্রহ্ম ক্ষেত্রি বৈশ্য শূদ্র অনেক প্রধান।

তাহার পর আবার কোন কোন পুথিতে পাই

পরাশর-সুত হয় মাধব তার নাম
কলিযুগে ব্যাস তুল্য গুণে অনুপাম।

প্রত্যেক ছত্রেরই অল্পবিস্তর পাঠান্তর আছে।

---

[১] 'জাগরণ' নামে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী কর্তৃক পুথির আকারে প্রথমে (?) প্রকাশিত (দ্বি-স ১৯০৫)। 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' নামে শ্রীযুক্ত সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৫২)।

প্রাচীনতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ পুথি (ক ১১১৫) ১৬৯৯ শকাব্দে (= ১৭৭৭) নকল করা। তাহার পর উল্লেখযোগ্য ক ২৩১৮ (১১৬৬ সাল, সম্ভবত মঘী) ও ক ৬১১৭ (১১৫৭ মঘী)। সব পুথিই চাটিগাঁ-নোয়াখালি অঞ্চলের। অন্যত্র মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের নামগন্ধও মিলে নাই।

[২] পাঠান্তর "গ্রাম"। [৩] = বাদ্‌শা + পাতশা। পাঠান্তর "রাজা"। [৪] পাঠান্তর "তপন সম"। [৫] ঐ "তার তুল্য রাজা নাই"। [৬] পাঠান্তর "সপ্তদ্বীপ"। [৭] ঐ "অনুজ"।

অতঃপর রচনা-কাল আছে। তাহা কোন কোন পুথিতে আবার সর্ব শেষেও আছে, কোন কোন পুথিতে শুধু শেষে আছে, আবার কোন কোন পুথিতে একেবারেই নাই।

> ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা[1] শক[2] নিয়োজিত
> দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত।

এখন কবি লইয়া সমস্যা হইতেছে এইগুলি,—(১) বাসস্থান সপ্তগ্রাম, না নবদ্বীপ, না গঙ্গাতীরে বা কাছাকাছি কোন গ্রাম? (২) পরাশর কে? কবির পিতা না, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা? (৩) "আচার্য" পদবী তাঁহার ছিল, কি ছিল না?

প্রথম সমস্যা উঠিত না যদি মাধবের পুথি সবই নোয়াখালি-চাটিগাঁ হইতে পাওয়া না যাইত। প্রচলিত ধারণা অনুসারে কবি পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাতীরের লোক, পরে চাটিগাঁ অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যত্র একটিও পুরানো পুথি পাওয়া গেল না কেন? পরমেশ্বর দাসের পাণ্ডববিজয় চাটিগাঁয়ে লেখা, কিন্তু একআধটি পুথি তো উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গেও মিলিয়াছে। যদি বলা হয় মুকুন্দরামের কাব্যের প্রসারের ফলে মাধবের কাব্য দূরীভূত হইয়াছে, তাহার উত্তরে বলা যায়, মুকুন্দরামের কাব্যের সঙ্গে মাধবের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। কাহিনীতে যেটুকু মিল আছে তাহাতে একজনকে অপরের কাছে ঋণী বলা চলে না। মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ব্রতকথা অবলম্বন করিয়াছেন। এ ব্রতকথায় দেবী মঙ্গলকারিণী বলিয়া মঙ্গলচণ্ডী। মঙ্গল-দৈত্য বধ করিয়া নয়। মাধব মঙ্গলদৈত্য-বধ কাহিনী যোগ করিয়া মঙ্গলচণ্ডী নামের সার্থকতা দেখাইয়াছেন।

পুথি সবই অর্বাচীন ও চাটিগাঁ অঞ্চলের, সুতরাং আভ্যন্তরীণ প্রমাণ কিছুই দিবার মতো নাই।[3]

দ্বিতীয় সমস্যার সম্পর্ক নির্ণয় অপেক্ষা পরাশর নামের প্রশ্ন গুরুতর। পরাশর গোত্রনাম। ব্যক্তিনাম হইতে বাধা নাই, কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলাম, পুরানো সাহিত্যে এ নাম পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

তৃতীয় সমস্যার সমাধান সহজ। উপরে উদ্ধৃত আত্মপরিচয় অংশে ছাড়া আর কোথাও কবি নিজেকে মাধব-আচার্য বলেন নাই। উদ্ধৃত ছত্রও সব

---

[1] শ্রেষ্ঠ পুথিতে পাঠ "দাতা"। [2] ঐ "সব"।

[3] মাধবের রচনা উপভাষার প্রভাবে আদ্যন্ত জর্জরিত। ভট্টাচার্য সংস্করণ হইতে কিছু উদাহরণ দিতেছি। "খড়" (পৃ ৩৮, = কড়), "ছোলায়ে" (পৃ ৫৮, = ছোড়ায়ে), "কাস্ত" (পৃ ৬৫ = কায়স্থ), ইত্যাদি।

পুথিতে নাই। তা ছাড়া ছন্দেও মিলে না (যেমন, "মাহাত্ম্য : আচার্য")। সুতরাং এ ছত্র দুইটিতে প্রক্ষেপ আছে অথবা পুরাপুরি প্রক্ষিপ্ত।

এখন আসল সমস্যা হইতেছে রচনাকাল লইয়া। (সে কালের বাঙালী কবিরা খুব শিক্ষিত না হইলে শকাব্দের ধার ধারিতেন না, তাঁহারা অনেকেই সাল অর্থে শক লিখিতেন।) ইন্দু-বিন্দু-বেদ-ধাতা সোজাসুজি লইলে ১০৫১ সাল (মঘী কি ?)। বাম দিক হইতে পড়িলে ১৫০১। এই শকাব্দে আকবর দিল্লীর তক্তে আসীন। সুতরাং ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল বলিয়া সহজেই নেওয়া যায়। কিন্তু যা সহজ ভাবা যায় তা সর্বদা সহজ না হইতে পারে। তারিখ-ছত্রের পাঠে সংশয় না করিলে, শকাঙ্ক শব্দের ব্যাখ্যায় সন্দেহ না রাখিলে কোন গোলই হয় না। এখানে তারিখ শকাঙ্কে। সংশয়-সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট আছে।

প্রথমত "ধাতা" শব্দ। এটি শকাঙ্করূপে কোথাও পাই নাই। "ধাতামুখ" পাইয়াছি, চার অর্থে। তবে এখানে কি মূলে "ধাতা শক" স্থানে "ধাতা-মুখ" ছিল ? দ্বিতীয়ত প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ পুথিতে পাঠ ধাতা-স্থানে "দাতা" আর শক-স্থানে "সব"। "দাতা" যদি ধাতার ঔপভাষিক বিকৃতি না হয় তাহা হইলে "দাতা"ই আসল পাঠ, মানে "দুই"।[১] "সব" ভ্রান্ত পাঠ, আসল পাঠ "সন" হইতে পারে, "শক" হইতে পারে। সন হইলে তো কথাই নাই, শক হইলেও এখানে বামা গতি ধরিব কেন ? শক শব্দটি "সন" বা "সাল" বুঝাইতেও যথেষ্ট ব্যবহার হইত। সুতরাং ইন্দু-বিন্দু-বাণ-ধাতামুখ = ১০৫৪, ইন্দু-বিন্দু-বাণ-ধাতা = ১০৫১, অথবা ইন্দু-বিন্দু-বাণ-দাতা = ১০৫২। অর্থাৎ ১৬৪১ অথবা ১৬৪৪ অথবা ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দ।

কিন্তু তাহা হইলে আকবর বাদশা যান কোথায় ? উত্তরে বলিব "অঙ্কস্য বামা গতি" ধরিলেও আকবরের ঠিক নাগাল পাই না। বাঙ্গালা-বিজয় শেষ করিবার পর বেশ কিছুকাল না কাটিলে কোন পুরানো বাঙ্গালী কবির কানে আকবর বাদশার যশ পৌঁছিবার কথা নয় এবং আকবরকে তারিফ করিতে "রাম রাজা" এবং "অর্জুন অবতার" বলিয়া রামায়ণ-মহাভারত লইয়া টানাটানি করিবারও কথা নয়। মাধব কর্তৃক আকবরের উল্লেখ যদি খাঁটি খবর হয় তবে মাধব যখন আকবরের রামরাজত্ব কল্পনা করিতেছিলেন তখন সম্ভবত দিল্লীর

[১] পৌরাণিক সাহিত্যে দাতা বলিতে প্রধানত দুইজন—বলি ও কর্ণ।

সিংহাসনে বাদশার পৌত্র রাজত্ব করিতেছিলেন। আকবরের নাম করার জন্যই ১৫০১ শক পাঠ গ্রহণ করা চলে না। স্থায়-আঁকড়িয়া তর্ক করিলে অন্য কথা।

মাধব কোন ভনিতায় তাঁহার কাব্যের নাম চণ্ডীমঙ্গল বলেন নাই, মাঝে মাঝে বলিয়াছেন 'সারদাচরিত'। সুতরাং এইটিই তাঁহার পাঞ্চালীর বিশিষ্ট নাম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

নবদ্বীপবাসী মাধব আচার্য ষোড়শ শতাব্দে কৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই আত্মপরিচয়ের অংশ মাধবের কাব্যে ঢুকিয়া পড়া বিচিত্র নয়।

মাধবের কাব্যের প্রায় সব পুথিতেই মঙ্গলদৈত্য-বধ কাহিনীর পরে আবার গণেশ-বন্দনা করিয়া রীতিমতো কাব্যারম্ভ হইয়াছে। তবে কি মঙ্গলবধ আখ্যান পরেকার সংযোজন?

মাধবের কাব্যের আকার সংক্ষিপ্ত। সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা ধর্মঠাকুরের পুরাণের অনুযায়ী।

> না আছিল রবি শশী সন্ন্যাসী তপস্বী ঋষি
> না আছিল সুমেরু মন্দার
> না আছিল সুরাসুর রাক্ষস কিন্নর নর
> কেবল আছিল শূন্যাকার।...

শিব-বরদৃপ্ত মঙ্গলদৈত্যের অত্যাচার হইতে দেবগণকে রক্ষা করিলে পর দেবীর নাম হইল মঙ্গলচণ্ডী। এই উপাখ্যানে মঙ্গলবারের পালা সমাপ্ত। (শিবায়ন অংশ একেবারেই নাই।) মঙ্গলদৈত্যকে নিধন করিয়া দেবী স্বর্গে পূজা পাইলেন। ইন্দ্রের পূজা পাইয়া তাহাকে গৌতমের শাপ হইতে মুক্ত করিলেন। তাহার পর মর্ত্যে নিত্যপূজা পাইতে ইচ্ছা করিলেন এবং পদ্মাবতীর উপদেশে বিশ্বম্ভর অর্থাৎ বিশ্বকর্মাকে দিয়া কলিঙ্গ দেশে দেউল নির্মাণ করাইয়া রাজাকে স্বপ্ন দিলেন। রাজা সাধারণ বিধিমতে দেবীপূজা করিল। (পশুদের দেবীপূজার উল্লেখ পর্যন্ত নাই।) তাহার পর নীলাম্বরের শাপগ্রাস। সিংহ মারিতে গিয়া ধর্মকেতুর নিধন হইলে পুত্র কালকেতু ক্রোধে পশুদের ধ্বংস করিতে লাগিল। পশুরা ভয়ে দেবীর শরণ লইল। দেবী তাঁহাদের অভয় দিয়া বলিলেন

> কালকেতুর তরে তোরা না ভাবিহ ডর
> মহাবীরের তরে আমি দিতে যাই বর।

মৃগ না পাইয়া কালকেতু সেই গোধিকা লইয়া ঘরের দিকে ফিরিল। ফুল্লরা মাংস বেচিয়া বাড়ি ফিরিয়া স্বামীর কথায় সখীর বাড়ি গেল গোধিকার মাংস বানাইবার জন্য বঁটি চাহিয়া আনিতে। সেখান হইতে ঘরে আসিয়া সে

ঐশ্বর্যময়ী দেবীকে দেখিল। অতঃপর দেবীকে উপদেশদান ও নিজের বারমাসিয়া দুঃখের ব্যাখ্যান। দেবী তবুও নির্বাক। তখন ফুল্লরা দেবীকে ভর্ৎসনা করিয়া কালকেতুকে ডাকিয়া আনিতে গেল। পথে স্বামী-স্ত্রীর বিতর্ক। ঘরে আসিয়া কালকেতু দেবীকে মারিতে গেল। পদ্মার পরামর্শে দেবী তাহাকে আত্মপরিচয় দিলেন। কালকেতু যথামতে স্তুতি করিল। দেবী তাহাকে বর দিয়া অঙ্গুরী দান করিলেন। সোম দত্ত বণিকের কাছে অঙ্গুরী-বিক্রয় বর্ণনা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। তাহার পর কালকেতুর পুরী নির্মাণ ও গুজরাট স্থাপন। প্রজা-স্থাপন বর্ণনাও খুব সংক্ষিপ্ত। বন্যার কোনও উল্লেখ নাই। প্রজাদের দল দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া জোট বাঁধিয়া কালকেতুর রাজ্যে চলিয়া আসিয়াছিল। ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র বর্ণনা বেশ ফলাও-রকমের। মাধব ভাঁড়ু দত্তকে একেবারে ভাঁড় করিয়া ছাড়িয়াছেন। কালকেতুর ও ফুল্লরার চরিত্র-অঙ্কনে দক্ষতার বিশেষ পরিচয় নাই, তবে আতিশয্য নাই এবং স্বাভাবিকতার হানিও নাই। কালকেতু স্ত্রীর আঁচল-ধরা ভীরু বাঙ্গালী "যাত্রার বীর" নয়। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে রণে জয়লাভ করিয়া অস্ত্রহীন কালকেতু যখন বাড়ী ফিরিতেছিল তখনই সে ধরা পড়ে, ধানের গোলায় লুকাইয়া থাকিয়া নয়।

কালকেতুর বিরুদ্ধে রাজাকে উত্তেজিত করিতে ভাঁড়ু ভেট লইয়া চলিয়াছে।[১]

পশুগণ বিদায় দিয়া জগতের মায়
ত্রিপন্থ জুড়িয়া রৈল স্বর্ণগোধিকায়।
দেওয়ানেতে যায় ভাড়ু মনে নাহি হেলা
চুরি করি আনিলেক কুল কাঁচকলা।
(ভেট সজ্জা লয়ে ভাড়ু করি পরিপাটি,
বাড়ির বাথুয়া শাক তুলি বান্ধিলেক আটি।)[১]
বীরের খাসিটা লৈয়া দেওয়ানেতে যায়
তারাপুর সিংহাপুর ত্বরাএ এড়ায়।
বিনোদপুর ছাড়াইয়া পাইল চণ্ডীর হাট
উপনীত হইল গিয়া যথা রাজপাট।
ভেট সজ্জা থুইয়া ভাড়ু যায় এক ভাগে
দণ্ডবৎ প্রণাম করে নৃপতির আগে।
নিবেদিহু ধরাধীশ কর অবধান
রাজ্যের বসতি করে ব্যাধ বলবান।
গোপনে সৃজিল পুরী গুজরাট নগরে
ব্যাধের নন্দন হৈয়া ছত্র শিরে ধরে।…

---

[১] অতিরিক্ত পাঠ।

কালকেতু-রূপী নীলাম্বর শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইল। শিব তুষ্ট হইয়া তাহাকে এই "অমরশিক্ষা" দান করিলেন

হৃদিপদ্মে বসি হংস করে নানা কেলি, কর্মযোগে জানি করে পিণ্ড চলাচলি[১]।...
শুন শুন কহি তত্ত্ব ওহে নীলাম্বর, আপনা শরীর চিন্ত হইয়া অমর।
সুষুম্না প্রধান নাড়ী শরীরেতে বৈসে, ইঙ্গলা পিঙ্গলা তার বৈসে দুই পাশে।
জোয়ার-ভাটি বহে তাতে অতি খরশান, ভাটি বন্দি করিয়া জোয়ারে দিবে টান।
জোয়ারে ঠেলিয়া হংস হইবে সুস্থির, মায়া সঙ্গে হৈবে দেখা নিশ্চল শরীর।
শিরে সহস্রদল পদ্ম কহি তার তত্ত্ব, অধোমুখী হয়া কমল বরিষে অমৃত।
সেই অমৃত প্রধান-পুরুষের স্থান, নহি টলিবেক পিণ্ড সুস্থির পরাণ।
মেরুদণ্ডে ভর করি করিবে চিন্তন, নবদ্বার বন্দি কৈলে জিনিবা শমন।
হরের বচন[২] দ্বিজ মাধবে গায়, কমলে ভ্রমর মধু অবিরত খায়।[৩]

ধনপতি-খুল্লনা উপাখ্যানের আরম্ভ হইয়াছে হর-গৌরীর পাশা খেলা লইয়া। ইন্দ্র-পুত্র মণিকর্ণকে বিবাদে মধ্যস্থ মানা হইলে সে শিবের ইঙ্গিত পাইয়া মত দিল যে দুইপক্ষ হারজিতে সমান। দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মর্ত্যাবতরণ শাপ দিলেন। মণিকর্ণের স্ত্রী চন্দ্ররেখা হইল লহনা, আর অপ্সরা রূপবতী হইল খুল্লনা।

মাধবের কাব্যে কয়েকটি ভালো ধুয়া গান ও পদ আছে। একটিতে কবীরের ভনিতা।[৪] বৈষ্ণবগীতিকবি অনন্ত-রায়েরও একটি পদ আছে।[৫] ধুয়া ও পদগুলি যদি মূল রচনার অন্তর্গত হয় তবে বইটিকে কিছুতেই ষোড়শ শতাব্দের বলা চলে না। দ্বিজ মাধবের নিজের রচিত গানও একটি আছে ॥[৬]

৫

'গঙ্গামঙ্গল'[৭] কাব্য-রচয়িতা দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতার অথবা কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতার সহিত অভিন্ন কিনা বলা দুরূহ। ভনিতা বিচার করিলে কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতার পক্ষেই রায় দিতে হয়। গঙ্গামঙ্গলের ভনিতায়ও চৈতন্যের উল্লেখ পাই।

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র-চরণকমল
দ্বিজ মাধব কহে গঙ্গামঙ্গল।

---

[১] পাঠান্তর "বলাবলি"। [২] ঐ "চরণ"। [৩] ঐ "পায়"।
[৪] ভট্টাচার্য সংস্করণ পৃ ২২৭। [৫] ঐ পৃ ২৩৪। [৬] ঐ পৃ ৪৮।
[৭] চাটিগাঁয়ের একটি খণ্ডিত পুথি অবলম্বনে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩২৩)। আর কোন পুথি, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে, পাওয়া না যাওয়া বিস্ময়ের কথা।

কিন্তু এ ভনিতা যে কৃষ্ণমঙ্গল হইতে পরিগৃহীত নয় তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। রচনায় মধ্যে মধ্যে ব্রজবুলির ব্যবহার আছে। বহু রাগরাগিনীর নাম আছে। এত বিচিত্র রাগতালের উল্লেখ প্রায় দেখা যায় না। ইহা কাব্যটির আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব নির্দেশ করে।

গঙ্গামঙ্গলের বিষয় পরিচিত পৌরাণিক কাহিনী।

এক মাধব আচার্যের লেখা দক্ষিণরায়ের পাঁচালীর উল্লেখ করিয়াছেন সপ্তদশ শতাব্দের শেষার্ধের কবি কৃষ্ণরাম দাস। এই কাব্যের কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই ॥

৬

"কবিকঙ্কণ" মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্য চণ্ডীমঙ্গল-পাঞ্চালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীনতম (জ্ঞাত) রচনা তো বটেই, আধুনিকপূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে—কিছু বৈষ্ণব কবিতা এবং চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত বাদ দিলে—সবচেয়ে মূল্যবান্ রচনা। উনবিংশ শতাব্দের শেষার্ধের আগে পর্যন্ত যা কিছু লেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে সাহিত্যের ও শিল্পের বিচারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যদি কোন একটিমাত্র রচনা নাম করিতে হয় তবে তাহা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল।[১]

---

[১] রামজয় বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় বইটি প্রথম ছাপা হইয়াছিল শোভাবাজার বিশ্বনাথ দেবের যন্ত্রে ১৭৪৫ শকাব্দে (=১৮২৩)। তাহার পর অনেক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। যেমন, মদনমোহন তর্কবাগীশের সংস্করণ (রামধন ভকতের ক্ষীরোদ-সাগর যন্ত্রে, ১৮৪৩), ঈশ্বরচন্দ্র তর্কচূড়ামণির সংস্করণ (১৮৫১), অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সংস্করণ (চুঁচুড়া ১৮৭৮), বঙ্গবাসী কার্যালয় সংস্করণ (দ্বি-স ১৩৩২) ইত্যাদি।

পুথির মধ্যে বিশেষভাবে মূল্যবান্—স ৭, ২০, ৩০, ৩২ (বেশ পুরানো তবে খণ্ডিত), ৪২৭, ৪৪৯, ৪৬০; ক ১০৮৬ (লিপিকাল ১১২৪ সাল ১৬৩৮ শক = ১৭১৬), ৬১৩৯, ৬১৪১ (লিপিকাল ১১৯১ সাল = ১৭৮৪)।

মুকুন্দরামের পৈতৃক বাসভূমি দামিন্যায় তাঁহার জ্ঞাতিদের (?) ঘরে যে পুথি আছে তাহা অনেকে কবিকঙ্কণের লেখা মূল পুথি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন (হয়ত কেহ কেহ এখনও করেন)। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া বসন্তরঞ্জন রায় ও হৃষীকেশ বসুর সাহায্যে দীনেশচন্দ্র সেন এই পুথির পাঠ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৯২২)। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে দামিন্যায় গিয়া আমি বহু প্রযত্নে এই পুথিটি দেখিতে ও পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। পুথি তেরেট পাতায় লেখা। মাঝে মাঝে লাল খালিতে লেখা আছে, বোধ করি মাহাত্ম্য-অর্পণের উদ্দেশ্যে। লেখার ছাঁদ আধুনিক। চামড়ার পাটা। পুথির বয়স ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের উর্ধ্বে যাইবে না। অনুমান করি শেষের পাতায় লিপিকাল ছিল বলিয়াই সেটি নষ্ট হইয়াছে। মনে হয় ইচ্ছা করিয়া, কেননা তাহার পরে অনেকগুলি শাদা পাতা আছে।

মুকুন্দরামের আলোচনায় অম্বিকাচরণ গুপ্তের প্রবন্ধ 'কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডীকাব্য' (প্রদীপ অগ্রহায়ণ ১৩১২ পৃ ২৯১-৩০২) অত্যন্ত মূল্যবান্।

বইটির মধ্যে মহাকাব্যের (epic) গুণ কিছু কিছু আছে। কাব্যের আকারও বড়। কবিতাসংখ্যা প্রায় চার শত, ছত্রসংখ্যা আনুমানিক বিশ হাজার।

মুকুন্দরামের কাব্যের আসল নাম বলিতে 'অভয়ামঙ্গল'। কবি ভনিতায় এই নামই বেশি ব্যবহার করিয়াছেন। এবং কাব্যের অধিদেবতা মঙ্গলচণ্ডীও অভয়া-দুর্গা। তবে চণ্ডীমঙ্গল নামই চলিয়া গিয়াছে। কোন কোন ভনিতায় 'চণ্ডীমঙ্গল' অর্থে 'শ্রীকবিকঙ্কণ' পাই। সেই অনুসারে কেহ কেহ রচনাটিকে 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'ও বলিয়াছেন (সম্ভবত 'মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী'র বিপরীতে)। 'কবিকঙ্কণ' মানে কঙ্কণ দানে পুরস্কৃত কবি। মুকুন্দরাম কখন এবং কি উপলক্ষ্যে এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন জানি না।

প্রাচীন কবিদের মধ্যে মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম গ্রন্থরচনা উপলক্ষ্য করিয়া আপনার পরিচয় একটু বিস্তৃতভাবে দিয়াছেন। বিষয়-গৌরবের দিকে যদি একটু কম নজর দেওয়া হইত তাহা হইলে এখানে হয়ত আমরা ষোড়শ শতাব্দের সাধারণ শিক্ষিত ভূমি-উপজীবী ব্রাহ্মণসংসারের পরিপূর্ণ চিত্র পাইতাম। মুকুন্দরাম যেটুকু বলিয়াছেন তাহাতে নিজের কথা প্রায় নাই, সংসারের কথা সামান্যই, দেশের ও সমাজের চিত্রই (বিক্ষিপ্ত হইলেও) সমধিক পরিস্ফুট। পরবর্তী কালে পশ্চিম বঙ্গে প্রায় সব পাঞ্চালী কাব্যের কবি মুকুন্দরামকে অনুসরণ করিয়া আত্মকথামণ্ডিত গ্রন্থোৎপত্তি-বিবরণ দিয়াছেন।

মুকুন্দরামের গ্রন্থে দুইটি "কবিত্বের-বিবরণ" অর্থাৎ আত্মকথা ও কাব্যরচনার হেতু পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে যেটি সমধিক পরিচিত তাহা সকল মুদ্রিত গ্রন্থে এবং অধিকাংশ পুথিতে মিলিয়াছে। দ্বিতীয় বিবরণটি অল্প কয়েকটি পুথিতেই শুধু মিলে। (এই আলোচনায় পরিচয় দুইটিতে যথাক্রমে "পরিচিত" ও "অ-পরিচিত" বলিব।)

অ-পরিচিত বিবরণে মুকুন্দরামের যে আত্মকথাটুকু আছে তাহা স্বল্প, তাহাতে আছে দীর্ঘ বংশপরিচয় এবং স্বগ্রামের প্রশংসা। চণ্ডীমঙ্গল রচনার ইতিহাস তো দূরের কথা চণ্ডীমঙ্গল নামই এই বিবরণে নাই। (এই বংশপরিচয় দুই একটি পুরানো পুথিতেই মিলিয়াছে। দামিন্যার পুথিতে এইটিই আছে অন্যটি নাই। আমার দেখা প্রাচীনতম পুথিতে[২] দুইটিই আছে।) পরিচিত বিবরণে কবির দেশত্যাগের কাহিনী, চণ্ডীকর্তৃক পাঞ্চালী রচনার নির্দেশ, বিদেশে বাসস্থাপন, সেখানে রাজ-আতিথ্য লাভ ও কাব্য রচনা ও গান—এই ইতিহাস

[১] দামিন্যার পুথি হইতে এই পরিচয়-অংশ অম্বিকাচরণ গুপ্ত সর্বপ্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

[২] স ৩২।

আছে। অধিকাংশ পুথিতে এবং সব ছাপা সংস্করণে এইটিই একমাত্র বিবরণ গ্রন্থারম্ভ রূপে দেওয়া আছে। (চণ্ডীমঙ্গলের যত পুথি দেখিয়াছি তাহার মধ্যে একটিতে এই আত্মকাহিনী গোড়ায় এবং শেষে দুইবার আছে।[১]) মনে হয় পরিচিত বিবরণটি গ্রন্থরচনার শেষে এবং রঘুনাথ রায়ের উদ্যোগে প্রথমবার গীত হইবার পরে রচিত ও সংযোজিত হইয়াছিল। মূল রচনা হয়ত কবিরই, তবে ইহাতে শিক্ষিত গায়নের ও লিপিকরের প্রসাধন পুনঃপুন এবং যথেষ্ট ঘটিয়াছে।

অ-পরিচিত বিবরণটি সংক্ষেপে এই।

রত্না নদের কূলে দামুন্তা (দামিন্তা) গ্রামে শঙ্কর চক্রাদিত্য নাম ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়া সেই স্থানকে তীর্থ ও কলিকালকে ধন্য করিয়াছেন। দেবতার মাহাত্ম্য বুঝিয়া ধুস দত্ত দেউল তুলিয়া দিয়াছিল। সেই মন্দিরে শিব কতদিন বিহার করিয়াছিলেন। দেবতার মায়া কে বুঝিবে? দেউল ছাড়িয়া দেবতা অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় আশ্রয় লইলেন।[২] ভাগ্যবান্ হরি নন্দী শিবসেবার জন্য ভূমিদান করিয়াছিল। ধর্মাধিকরণিক মাধব ওঝা তত্ত্বাবধায়ক ছিল। দামুন্তার লোক সকলেই শিবভক্ত। স্থানটি যেন দ্বিতীয় কৈলাস। নিজের শিবগীতি-রচনার কৃতিত্বকে কবি শিবসেবার ফল বলিতেছেন।

গঙ্গাসম নিরমল তোমার চরণজল
পান কৈল শিশুকাল হৈতে
সেইত পুণ্যের ফলে কবি হৈয়া শিশুকালে
রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে।

তাহার পর দামুন্তাতে দত্ত ও নাগ বংশের এবং দুই ব্রাহ্মণ বংশের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন, সুধন্য দক্ষিণরাঢ়ার মধ্যেও দামুন্তা অগ্রগণ্য যেহেতু সেখানে কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য সকলেই স্ব-বৃত্তিনিষ্ঠ।

নিজ বৃত্তি অনুপদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য
দামুন্তাতে বৈসে কবিরাজ
কুলে শীলে গুণে বাড়া সুধন্য দক্ষিণ রাঢ়া
সুপণ্ডিত সুকবি সমাজ।

তাহার পর নিজ পূর্বপুরুষের নাম,—তপন ওঝা, তাহার পুত্র উমাপতি, তাহার পুত্র "শ্রুতকর্মা সুকৃতি মাধবশর্মা", তাহার একমাত্র পত্নীর গর্ভে নয় পুত্র হইয়াছিল।[৩] তাহাদের মধ্যে একজন জগন্নাথ মহামিশ্র, তাহার পুত্র গুণরাজ

[১] ক ৬১৪১। [২] "চলদলে করিলা সঞ্চার"।

[৩] স ৪৪৯ পৃ ১৩৫ ক খ। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগৃহীত পুথি (সোনামুখীতে লেখা ১২২৩ সালপৃ) ৫০ খ, ৫১ ক।

(পাঠান্তরে 'গুণিরাজ') মিশ্র, তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র কবিচন্দ্র, তাহার ছোট ভাই মুকুন্দ শর্মা।

একটি পুথির[১] এক স্থানে দীর্ঘ ভনিতায় মাধব ওঝা সম্বন্ধে আরও বেশি খাঁটি খবর মিলিতেছে। দুঃখের বিষয় এ অংশটি খণ্ডিত এবং দুইএক স্থানে পাঠ ভ্রান্ত। তবুও উদ্ধৃতির যোগ্য। (মুকুন্দরাম তাঁহার রচনায় ভনিতার মধ্যে মধ্যে আত্মকথা ছড়াইয়া দিয়াছেন। সে সব কথা দুটি বিবরণের কোনটিতে নাই। —নিম্নের উদ্ধৃতির প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।)

কৃত রাজপ্রিয়া-সত্র বেদগর্ভ আদি গোত্র
শঙ্কর তরণ উমাপতি
বিখ্যাত মাধব ওঝা সাবর্ণ গোত্রের রাজা
কর্ণপুরে যাহার বসতি।
সদ্‌গুণে মধুমত্ত বীর-দিগর দত্ত
আনাইল দামিন্তা নগরী
চিন্তিয়া আপন হিত কৈলা নিজ পুরোহিত
করিলা দেশের অধিকারী।

কোন্ রাজপ্রিয়ার সত্রে রঘুপতি পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন ? মাধব ওঝার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কই বা কি ছিল ? মাধব ওঝার আদি নিবাস কর্ণপুর কোথায় ? বংশপরিচয়ে মাধব ওঝাকে ধর্মাধিকরণিক বলা হইয়াছে। তবে তিনি কি চক্রাদিত্য ঠাকুরের "ধামাৎকনি" ছিলেন ? বোঝা গেল মাধব ওঝাকে বীরদিগর দত্ত দামিন্তায় বসাইয়াছিলেন। বংশপরিচয়ে বীরদিগর দত্তের নাম নাই, তবে এক পাঠান্তরে দত্ত-বংশের উল্লেখ আছে।[২]

দ্বিতীয় বর্ণনার বংশপরিচয়ে ভূমিদাতা যে হরি নন্দীর উল্লেখ আছে তিনি বোধ হয় মুকুন্দরামের সুহৃৎ জমিদার গোপীনাথ নন্দীর পূর্বপুরুষ। কবি বলিয়াছেন তাঁহারা পাঁচ-সাত পুরুষ ধরিয়া দামিন্তায় কৃষি-আজীব ছিলেন।

মুকুন্দরাম প্রায়ই ভনিতায় পিতামহ পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম করিয়াছেন। ভনিতা হইতে জানি যে গুণরাজ মিশ্রের আসল নাম হৃদয়।

---

[১] পাঠ "তাহার তনয় সহোদর" অথবা "তাহার ত নয় সহোদর"। প্রথম পাঠই লইয়াছি। তাহা হইলে দামুন্যায় মুকুন্দরামের বাস পাঁচ পুরুষ সিদ্ধ হয়।

[২] "নামদা বিখ্যাত স্থান দত্তবংশ সত্যবান কল্পতরু নাম উমাপতি"। পাঠান্তরে "পাষণ্ডকুলের অরি যশোমন্ত (পাঠান্তর "প্রিয়মন্ত") অধিকারী কল্পতরু নাগ উমাপতি"।

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।

কোন কোন পুথিতে চৈতন্যবন্দনার ভনিতায় এবং অন্যত্র জগন্নাথ সম্বন্ধে এই কথা আছে যে তিনি গোপালের উপাসক ছিলেন এবং বহুকাল ধরিয়া মৎস্য-মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়া দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র জপ করিতেন। গোপাল মুকুন্দরামের পৈতৃক গৃহদেবতা। সুতরাং মুকুন্দরামেরা বৈষ্ণব ছিলেন।

কয়ড়ি অনুজজাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পূজিল গোপাল
বিনয়ে মাগিয়া বর জপি মন্ত্র দশাক্ষর
মীনমাংস ত্যজি বহুকাল।

জগন্নাথ কি চৈতন্য-পন্থী ছিলেন? অথবা মাধবেন্দ্র পুরীর মতো কোন বৈষ্ণব মহাজনের সম্পর্কে আসিয়াছিলেন?

কোন কোন পুথিতে দৈবাৎ ভনিতায় কবিনামের পরিবর্তে "দৈবকীনন্দন" পাওয়া যায়। এ ভনিতা খাঁটি হইলে বুঝিব মুকুন্দরামের মায়ের নাম ছিল দৈবকী।

সুপরিচিত আত্মকথায়[১] কবি আসরের শ্রোতাদের সম্বোধন করিয়া শুনিতে বলিতেছেন, "এই গীত হইল যেমতে"। অর্থাৎ মায়ের বেশে চণ্ডী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া পাঞ্চালী রচনা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই মুখবন্ধটুকু করিয়া কবি নিজের কথা বলিয়াছেন।

সেলিমাবাজ (সেলিমাবাদ) সহরে[২] গোপীনাথ নন্দী "নিয়োগী"[৩] বাস করিতেন। দামিন্যা ইহারই তালুক। সে তালুকে মুকুন্দরাম পূর্বপুরুষক্রমে ভূমি ভোগ করিতেন।[৪] ইতিমধ্যে "প্রজার পাপের ফলে" অধর্মী রাজার অধিকার হইল, এবং কর্তা[৫] হইল মামুদ সরিফ। তাহার দুর্বল শাসনে প্রজার দুরবস্থার

[১] এ আত্মকথা, অন্তত সবটা, মুকুন্দরামের রচনা না হওয়া সম্ভব। ইহার মধ্যে যেটুকু তাঁহার নিজস্ব তা রচনায় যুক্ত হইয়াছিল প্রথম গীত হইবার পরে, এই রকম ধারণা হইতেছে। কবি-আত্মকথায় গায়কদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ খুবই দেখা যায় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দে।

[২] আধুনিক বর্ধমান জেলায় দামোদরের পূর্বতীরে জামালপুর থানার অন্তর্গত গ্রাম। আগে থানার নামও সেলিমাবাদ ছিল। [৩] পূর্বতন রাজকর্মচারীর উপাধি। [৪] "দামুন্যায় করি কৃষি"। [৫] পাঠ "হৈল রাজা", "ডিহিদার"। প্রথম ছত্রে পাঠান্তরে "সে মানসিংহের কালে", "রাজা মানসিংহ গেলে"। গৌহাটী পুথির পাঠ "রাজা মানসিংহ মৈলে প্রজার পাপের ফলে রাজা হৈল মামুদ সরিফ।"

সীমা রহিল না।

উজীর হৈল রায়জাদা বেপারি ক্ষত্রিয় খেদা[১]
ব্রাহ্মণবৈষ্ণবে হৈল বৈরি[২]
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া[৩]
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।
সরখেল[৪] হৈল কাল খিল ভূমে লিখে লাল[৫]
বিনি উপকারে খায় ধুতি[৬]
পোতদার[৭] হৈল যম তঙ্কায় আড়াই আনা[৮] কম
পাই লভ্য লয় তঙ্কা প্রতি।

দেশের আর্থিক অবস্থা বিপর্যস্ত। রোজ দিলেও মুনিষ মিলে না। "ধান্য গোরু কেহ নাহি কিনে।" খাজনার চাপ পড়িল। রাজা সুবিচার করে না। প্রজারা দেশ ছাড়িবার যুক্তি করিতে লাগিল। প্রজাদের পলাতক ভাব বুঝিয়া গ্রামের চারিদিকে চৌকিদার টহল দিতে লাগিল। প্রজারা ব্যাকুল হইয়া ঘরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেচিতে যায়, কিন্তু একটাকা দরের দ্রব্যের দশ আনার বেশি দাম উঠে না। প্রভু গোপীনাথ নন্দী বন্দী হইয়া আছেন। খালাস পাইবার কোন হেতুই নাই।[৯]

ভূমিহীন মুকুন্দরামের দেশত্যাগ করা ছাড়া উপায় রহিল না। প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শ চাহিলে কেহ কেহ ভিটা ছাড়িতে নিষেধ করিল। কবির বিশেষ সহায়তা করিতেন চণ্ডীবাটীর (তালুকদার?) শ্রীমন্ত খাঁ। তিনি গম্ভীর

[১] গৌ. পাঠ "বেপারিয়া বহে গাধা" অর্থাৎ ব্যাপারীরা বলদের বদলে গাধার পিঠে মাল চাপাইয়া গমনাগমন করিত। বলদ মুসলমানেরা ধরিয়া লইত। এই পাঠ উৎকৃষ্টতর।

[২] গৌ. পাঠ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৈষ্ণবের বিরোধ জাগিল।

[৩] = বিঘা। [৪] = গোমস্তা; পাঠান্তর "সরকার"। [৫] = পতিত জমিকে চষা বলিয়া রেকর্ড করে। [৬] = উপরি পাওনা; পাঠান্তরে "খতি"। [৭] = যাহারা টাকাকড়ি গুনিয়া লয় বা খাজাঞ্চি। [৮] = "পুরা টাকা করে কম"। গৌ. পাঠ।

[৯] ডিহিদার অবোধ খোজ টাকা দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কিনে
ইন্‌ছাফ না করে রাজা মিলিয়া সকল প্রজা
পলাইতে যুক্তি কৈল মনে।
প্রজাগণ পলাইবার খোজ পায় চৌকিদার
গ্রামের চৌপাশে দিল থানা
প্রজা হৈল ব্যাকুলি বেচে দাও কদালি
টাকাকের দ্রব্য দশ আনা।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইল বন্দি
কোন হেতু নহে পরিত্রাণে [গৌ. পাঠ]

খাঁ-এর (পাঠান্তরে গরিব খাঁ-এর) সঙ্গে পরামর্শ করা হইল। তদনুসারে মুকুন্দরাম পত্নী শিশুপুত্র, ভাই[১] ও একজন অনুচর[২] সঙ্গে করিয়া ও যাহা কিছু টাকাকড়ি সম্বল ছিল লইয়া ভিটা ও গ্রাম ছাড়িয়া দক্ষিণমুখে যাত্রা করিলেন।

গ্রাম ছাড়িয়া ক্রোশ দেড়েক দূরে ভালিঞা (অধুনা ভেলিয়া, ভেলো) গ্রাম। সেখানে[৩] রূপ রায় তাঁহাদের সম্বল অপহরণ করিয়া লইল।[৪] মুকুন্দরাম আশ্রয় পাইলেন যদু কুণ্ড তেলির বাড়িতে। যদু কুণ্ড

দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা।

(এখানে, গৌহাটী পুথি অনুসারে, যদুকুণ্ডের নামই নাই, রূপ রায়ই আশ্রয় দিয়া "জাতিকুল" সেই রক্ষা করিয়াছিল।) তিন দিন সেখানে অথবা রূপ রায়ের বাড়িতে কাটাইয়া মুকুন্দরাম আবার বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে মুড়াই (অধুনা মুণ্ডেশ্বরী) নদী পড়িল। নদী পার হইয়া কিছু দূর গিয়া ভেঙুটিয়া গ্রাম পাওয়া গেল। সে গ্রাম ছাড়িয়া দ্বারিকেশ্বর পার হইয়া মুকুন্দরাম পাতুল গ্রামে[৫] পৌছিলেন। সেখানে গঙ্গাদাস খুব সাহায্য করিয়াছিল। সেস্থান ছাড়িয়া দামোদর বামে রাখিয়া[৬] পরাশর[৭] পার হইয়া অনেক দূর গিয়া গোচড়িয়া (অধুনা গুচুড়ে) গ্রাম[৮] পাওয়া গেল। সেখানে যখন পৌছিলেন তখন মুকুন্দরামেরা নিঃস্বতা-দুর্দশার চরমে পৌছিয়াছেন। তাঁহারা আশ্রয় লইলেন পথপার্শ্বে এক পুকুরের পাড়ে। সেইখানেই খানিকক্ষণের জন্য ডেরা পড়িল। তৈল নাই, কবি রুখু স্নান করিলেন। সঙ্গে গৃহদেবতা-বিগ্রহ ছিল। ফোটা শালুক ফুল দিয়া পূজা করিলেন। নৈবেদ্য হইল শালুকের কচি নাল। পূজা অন্তে কবি পুকুরের জল খাইয়া উদর পূরণ করিলেন। শিশুকে দিলেন ঠাকুর-পূজার নৈবেদ্য, "শালুক-নাড়া"। ক্ষুধার্ত শিশু তাহাতে ভুলিবে কেন। সে ভাতের

[১] নাম রমানাথ অথবা রমানন্দ অথবা রামনিধি। [২] নাম ডামাল নন্দী বা দামোদর নন্দী।

[৩] এই গ্রামের সংলগ্ন বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে সত্তর আশি বছর আগেও ডাকাতের উপদ্রব ছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পত্নী সারদা দেবী একবার এই 'তেলো-ভেলো" মাঠেই ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলেন। [৪] রূপ রায় "জান্‌দার" হইতেও পারে। "রূপরায় দিল চিত্ত" পাঠও আছে।

[৫] "পাতালপুরী"। পাঠান্তরে "পাতালপুরী", "মাতুলপুরী", "বাতনগিরি" (গৌ.)। "মাতুলপুরী আসল পাঠ হইলে দ্বারিকেশ্বর পারে পাতুলে অথবা নিকটবর্তী কোন গ্রামে কবির মাতুলালয় ছিল।

[৬] পাঠ ঠিক হইলে রূপনারায়ণের পূর্বতন খাত। পাঠান্তর "না বাহে"।

[৭] "না বাহে" পরাশর নদী সম্ভবত নৌকায় পার হইয়াছিলেন।

[৮] এই গ্রাম এখন মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত।

অন্ন কান্না জুড়িল। ভয়ে ক্ষুধায় পরিশ্রমে অবসন্ন মুকুন্দরাম সেইখানেই শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। স্বপ্ন দেখিলেন, দেবী চণ্ডী মায়ের মূর্তি ধরিয়া আসিয়া[১] শিয়রে বসিলেন এবং তাঁহার কানে মন্ত্র দিয়া নিজের হাতে কলম লইয়া সেই খানেই কাগজ কলম কালি লইয়া কবিতা লিখিতে বসিলেন।

পার হৈল পরাশর এড়াইল দামোদর
উপনীত গোচড়্যা নগরে ‑
তৈল বিনা কৈল স্নান করিনু উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে।
আশ্রম পুখুরি আড়া[২] নৈবেদ্য শালুক-নাড়া[৩]
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।
মা কৈলে পরম দয়া দিল চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে কবিত্ব
হাতে লইয়া পত্র মসী আপনে কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখিলা সঙ্গীত।
পড়িয়াছি নানা তন্ত্র তথা নাহি সেই মন্ত্র
আজ্ঞা দিলা জপিবারে নিত্য

এই স্বপ্নকে কবি দেবী-আজ্ঞা বলিয়া শিরোধার্য করিলেন।

তাহার পর শিলাই নদী পার হইয়া ব্রাহ্মণভূমির রাজা বীর-বাঁকুড়া রায়ের সভায় আড়রা (বা আরড়া) গ্রামে[৪] আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্লোক পড়িয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিলে রাজা খুশি হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। তখনি পাঁচ আড়া[৫] ধান মাপিয়া দিবার হুকুম হইল। কবি রাজপুত্রের

---

[১] আত্মকাহিনীর আগেই বলা আছে,

"ধরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র দেশে চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে।" এখানে মায়ের উল্লেখ নাই। পূর্বোক্ত অংশ প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে। তাহা হইলে চণ্ডী নিজরূপেই দেখা দিয়াছিলেন।

[২] পাঠান্তর "আড়"। [৩] পাঠান্তর 'শালুকদাঁড়া'।

[৪] আড়রা এখন আড়রা-গড়, শালবনি রেলস্টেশন হইতে চারিপাঁচ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে। রঘুনাথের বংশধরেরা এখন সেনাপত্যা গ্রামে বাস করেন। এই গ্রাম আড়রা হইতে পাঁচ মাইল পূর্বে। জয়চণ্ডীদেবীর প্রাচীন মন্দির আড়রা গ্রামের উত্তরপূর্বে প্রায় এক মাইল তফাতে জয়পুর গ্রামে আছে। কামেশ্বরের প্রাচীন মন্দির কোয়াঞ্জি (আধুনিক কুয়াই) গ্রামে অবস্থিত। এসব সংবাদ শ্রীযুক্ত বোামকেশ চক্রবর্তীর সৌজন্যে পাইয়াছি।

[৫] পাঠান্তর "দশ"। এ অঞ্চলে এখন "আড়া"র পরিমাণ সাড়ে পাঁচ মণ। গড়বেতার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস ২৮ জানুয়ারি ১৯৬০ তারিখে পত্র লিখিয়া আমাকে জানাইয়াছিলেন, "আমি ব্রাহ্মণভূম পরগণার জনৈক অধিবাসী এবং আরড়া গড় আমার বাড়ী হইতে ৬ মাইল মধ্যে। ব্রাহ্মণভূমে ও আরডায় এক আড়া ধান্যের ওজন ৮০ তোলার সেরের মাপে ৬ মণ।" অম্বিকাচরণ গুপ্ত লিখিয়াছিলেন ১০ আড়া=২০ মণ।

শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। রাজপুত্র রঘুনাথ তাঁহাকে সাদরে গুরু বলিয়া বরণ করিল।

> স্থধন্য বাঁকুড়া রায় আঙ্গিল[1] সকল দায়
> স্থত-পাঠে কৈল নিয়োজিত।
> তাঁর স্থত রঘুনাথ রাজকুলে অবদাত
> গুরু বলি করিল পুজিত।

দুঃখে স্থখে কবির কাল কাটিতে লাগিল। বীর-বাঁকুড়া রায়ের পর রঘুনাথ রায় রাজা হইলেন। কবিরও সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িল। স্বপ্নের কথা আর বড় মনে পড়ে না, যদিও সঙ্গী ডামাল নন্দী, যে স্বপ্নের ব্যাপার জানিত, প্রায়ই গীতরচনার জন্য তাগাদা দিত (অথবা গীতরচনায় সর্বদা সাহায্য করিত)। অবশেষে রাজা রঘুনাথ চণ্ডীমঙ্গল গান করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গায়ক[2]—যাহার নাম প্রসাদ দে, আমরা শেষের ভণিতা হইতে জানিয়াছি—অপূর্ব উদ্দীপনায় গান করিয়াছিলেন। প্রসাদ দেবের গান শুনিয়া শ্রোতারা সকলে ধন্য ধন্য করিয়া ছিল। যেমন তাঁহার কণ্ঠ তেমনি তালমানে অভিজ্ঞতা, তেমনি বুদ্ধিমত্তা ও বিনয়।

> সঙ্গে দামোদর নন্দী যে জানে স্বপ্নের সন্ধি
> অনুদিন করিল যতন
> নৃত্যো[3] দিল অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
> গায়নের দিলেন ভূষণ।
> বিক্রম দেবের স্থত গান করে অদ্ভুত
> বাখান করয়ে সর্বজন
> তালমানে বিজ্ঞ দড় বিনয় স্থন্দর বড়
> মতিমান মধুর বচন।

রচনাটি গান করাইবার প্রসঙ্গ হইতে জানিতে পারি যে কাব্য রচনার পরে, এমন কি প্রথম গান-অনুষ্ঠানের পরে এই ছত্রগুলি রচিত ও সংযোজিত হইয়াছিল।

বীর-বাঁকুড়ার সম্বন্ধে কিছু অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য কাব্যমধ্যে ভনিতায় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তাহাতে জানিতে পারি যে ইহারা ব্রাহ্মণ, পালধি গাঁই। পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণভূমের রাজা। পিতার নাম বীর-মাধব। ইহারা গোপালের ও কামেশ্বর শিবের সেবক ছিলেন। স্থানীয় অধিদেবী জয়চণ্ডী। রঘুনাথের মায়ের নাম দনা দেবী, মাতামহের নাম দুলাল সিংহ।

---

[1] "খণ্ডাল্য" গৌ. পুথি। [2] গৌ. পুথিতেই এই খবরটুকু আছে। [3] পাঠ "নিত্যে", "নিত্য"। নৃত্য এখানে 'নাট' অর্থে প্রযুক্ত।

ছলাল সিংহের সুতা দনা দেবী পাট-মাতা
কুলে শীলে গুণে অবদাত
তার সুত নৃপরত্ন করিল বহুত যত্ন
বৈরিশল্য দেব রঘুনাথ।
আড়রা তরিয়া ভূমি পুরুষে পুরুষে স্বামী
সেবেন গোপাল কামেশ্বর
নূতন কবিত্ব রসে নৃপতির অভিলাষে
গাইল মুকুন্দ কবিবর।

কামেশ্বরের মন্দিরেই মুকুন্দরামের পাঞ্চালী প্রথম গান করা হইয়াছিল। মূল গায়েন ছিল প্রসাদ। গ্রন্থ-শেষের ভনিতায় এই সংবাদ পাই। এ ভনিতাটি পরে যোগ করা হইয়াছিল, যেমন দ্বিতীয় আত্মপরিচয় অংশ।

অষ্টমঙ্গলা সায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
শ্রীকামেশ্বরের মন্দিরে[১]
চারি প্রহর রাতি জালিয়া ঘৃতের বাতি
গায়ন প্রসাদের আদরে।[২]

প্রাচীন কালের কবিরা রাজসভায় পুরস্কার লাভ করিতেন। কামেশ্বরের মন্দিরে কাব্যটি গীত হইবার সময় মুকুন্দরামও পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। গায়েন প্রসাদও বঞ্চিত হন নাই। এই পুরস্কারের বিবরণ প্রাচীনতম (খণ্ডিত) পুথিতে আত্মজীবনীর শেষ অংশে পাওয়া গিয়াছে।[৩]

হাতে সোনা করে বালা গলে দিল কণ্ঠমালা
করাঙ্গুলি রতন-ভূষণ
শিরে পাগ পরিতে জোড়া দিল চড়নের ঘোড়া
গায়নেরে দিলেন ভূষণ।

মুকুন্দরামের কাব্যের খানিকটা অংশ যে দামিন্যায় থাকিতেই লেখা হইয়াছিল তাহার কিছু প্রমাণ আছে। মুকুন্দরামের বড় ভাইয়ের নাম অথবা উপাধি কবিচন্দ্র, ইহাও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

বংশপরিচয়ে মুকুন্দরাম বলিয়াছেন যে চক্রাদিত্যের সেবার ফলে তিনি অল্প-বয়সেই শিবের বিষয়ে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। (কাব্যের মধ্যে ভনিতায়ও চক্রাদিত্যের উল্লেখ আছে।) এই "তোমার সঙ্গীত" চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম অংশ

---

১ পাঠ "শ্রীঅমরসোমের মন্দিরে", "অমর সাগর মুনিবরে"।

২ "চারি চৌপর রাতি জালিঞা ঘৃতের বাতি অমরসামর মন্দিরে
অষ্টমঙ্গলা সাঅ শ্রীকবিকঙ্কণ গাঅ প্রসাদ গাঁএনে আদরে।"
চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত (১২২৩ সালের) পুথি।

৩ স ৩২।

("দেব খণ্ড") বলিয়া মনে করি। এই অংশে শুধু শিবের তুই সংসারের কথাই আছে। আরও প্রমাণ আছে। একটি ভালো পুথিতে[১] এমন একটি ভনিতা আছে যাহাতে বুঝি যে গোপীনাথ নন্দী তখনও দামিন্যার জমিদার। অতএব এ কবিতাটি অবশ্যই দেশত্যাগের আগে লেখা।

দামিন্যা নগরে চক্রাদিত্য সুর
সেবিলে জড়িমা করয়ে দূর।
নন্দী গোপীনাথ যাহে ঠাকুর
কৌতুকে রচিল মুকুন্দ পুর।

এখন মুকুন্দরামের কাব্যরচনার কাল নির্ধারণ করিতে হয়। মুকুন্দরাম বার বার ভনিতায় বলিয়াছেন যে দেবী চণ্ডীর আদেশে তিনি চণ্ডীমঙ্গল ("সঙ্গীত") রচনা করিতেছেন। গ্রন্থোৎপত্তি-বিবরণে দেবীর আদেশপ্রাপ্তির কথা আছে। সুতরাং আড়রায় যাইবার আগে তিনি চণ্ডীমঙ্গল রচনায় হাত দেন-নাই। আগেকার রচনা যে কিছু ছিল সে সব তিনি চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন। কাব্যরচনা কালে যে রঘুনাথ রাজা তাহাতে সন্দেহ নাই। রঘুনাথের রাজ্যকাল ১৫৭৩ হইতে ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দ।[২] রঘুনাথ রাজা হইবার কিছু কাল পরে তবে মুকুন্দরাম কাব্য সমাপ্ত অথবা পরিবর্ধিত করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সংসার বাড়িয়াছে। মাঝে মাঝে ভনিতায় শিবরাম, মহেশ, চিত্ররেখা ও যশোদা এই চারটি নাম পাই।[৩] শিবরামের উল্লেখ বেশি পাই, সুতরাং তিনি কবির পুত্র ছিলেন।[৪] বাকি তিনজনের মধ্যে মহেশ পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং /অথবা জামাতা আর চিত্ররেখা ও যশোদা কন্যা এবং/ অথবা পুত্রবধূ হইতে পারে। রঘুনাথের পুত্র চক্রধর ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দে রাজা হন। চণ্ডীমঙ্গলের কোন ভনিতায় রঘুনাথের পুত্রের বা কন্যার উল্লেখ নাই। সুতরাং কাব্যরচনা-কালে রঘুনাথের কোন সন্তান জন্মে নাই। চক্রধর কত বয়সে রাজা হইয়াছিলেন জানি না, তবে বিশ বছর ধরিলে অন্যায় হইবে না। তাহা হইলে কাব্যসমাপ্তিকাল মোটামুটি ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দ। ইহার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে,

---

[১] স ৪৪৯ পৃ ১৪১ ক খ।

[২] রামগতি ন্যায়রত্ন সেনাপতা গ্রামে গিয়া রঘুনাথের বংশধরদের কাছে এই তারিখ পাইয়াছিলেন। 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' প্রথমভাগ (প্রথম সংস্করণ ১৮৭৩) দ্রষ্টব্য।

[৩] "উর গো করিব কামে কৃপা কর শিবরামে চিত্ররেখা যশোদা মহেশে।"

[৪] "শিবরামে কর দেবী দয়া।" "কর গো করুণাময়ী শিবরামে দয়া।"

গ্রন্থোৎপত্তি-বিবরণে মানসিংহের উল্লেখ আছে।[১] মানসিংহ ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দে প্রায় কবিকঙ্কণের যাত্রাপথ ধরিয়াই উড়িষ্যায় অভিযান করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা-উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন ১৫৯৪ হইতে ১৬০৫ (ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত। মানসিংহের উড়িষ্যা-অভিযানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিতে গেলে কাব্যসমাপ্তিকাল ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দের আগে হইতে পারে না, বাঙ্গালা-উড়িষ্যায় সুবেদারির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিলে ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে নয়। কিন্তু আসল কথা হইতেছে যে, মানসিংহের উল্লেখ প্রক্ষিপ্ত অর্থাৎ গ্রন্থরচনার পরে লেখা। সম্ভবত মানসিংহ বাঙ্গালা হইতে চলিয়া গেলে তাঁহার যশ—যাহা উড়িষ্যা-সীমান্তে দীর্ঘতর কাল অম্লান ছিল—স্মরণ করিয়া মুকুন্দরাম অথবা কোন লিপিকর-গায়ন এই প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুতরাং মানসিংহকে বাদ দিয়া কাল নির্ণয় করিতে হইবে।

এদিকে ১৮২৩ সালে রামজয় বিদ্যাসাগরের সংস্করণে শেষে এই দুই ছত্রে এক কাল-নির্দেশ আছে। ('রস' বলিতে 'ছয়')।[২]

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা
কত[৩] দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।

'রস রস বেদ শশাঙ্ক অর্থাৎ ১৪৬৬ শকাব্দে (= ১৫৪৪), (তাহার) কিছুকাল পরে চণ্ডী গান (রচনার আদেশ) দিলেন।'

কোন পুথিতে এই ছত্র পাওয়া যায় নাই এবং এই কালের সঙ্গে মানসিংহের কালের যোগ কিছুতেই টানা যায় না। এই উভয় কারণে এ ছত্র দুইটিকে অনেকেই প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়াছেন।[৪] একটি পুথিতে আমি এই ছত্র পাইয়াছি। যদিও সে পুথির লিপিকাল ১৮৪৮, অর্থাৎ রামজয় বিদ্যাসাগরের বই বাহির হইবার (১৮২৩) পঁচিশ বছর পরেকার, তবুও উপেক্ষা করিবার নয়, কেন না পুথিটি রামজয় সংস্করণের অনুলিপি নয়, ইহার পাঠে প্রচুর স্বতন্ত্রতা আছে। সুতরাং পুথিতে নিশ্চয়ই অন্য কোন প্রাচীনতর আদর্শ অনুসৃত। কেহ কেহ "রস" বলিতে "নয়" ধরিয়া ১৪৯৯ শকাব্দ (= ১৫৭৭) বলেন। কিন্তু ইহাতেও গোল বাধে। প্রথমত শকাঙ্কে 'নয়' অর্থে 'রস' শব্দের ব্যবহার সে সময়ে কেন, কখনই ছিল না। দ্বিতীয়ত ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দে রঘুনাথ আড়রায় রাজা। কবি তাহার

---

১ "ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপাদাম্বুজ ভৃঙ্গ…সে মানসিংহের কালে"। পাঠান্তরে "গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ"; "গৌড়বঙ্গ উৎকল সমীপে"; "গৌড়বঙ্গ উৎকল মহিম"। (মহিম মানে যুদ্ধযাত্রা।)

২ 'আট' অর্থে রস শব্দের প্রয়োগ সপ্তদশ শতাব্দের আগে নাই, পরেও নাই। ৩ "কত" শব্দের এই অর্থ মুকুন্দরামের কাব্যে অন্যত্রও আছে। ৪ প্রক্ষিপ্ত যদিও বা হয় তবে তা ১৭২৫ খ্রীস্টাব্দের পরে নয়। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৩ পৃ ২৫৩ দ্রষ্টব্য।

অনেক কাল আগে পুকুরের পাড়ে স্বপ্ন দেখিয়া দেবীর আদেশ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি যখন আড়রায় হাজির হইলেন তখন বীর-বাঁকুড়া রায় রাজা, রঘুনাথ শিশু না হইলেও নিশ্চয়ই বালক। কেন না কবি তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৫৪৪ খ্রীস্টাব্দের কিছুকাল পরে ("কত দিনে") মুকুন্দরামের দেশত্যাগ ঘটনা ধরিলে কোনই অসঙ্গতি হয় না। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য ॥[১]

৭

মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যকে বার বার বলিয়াছেন "নৌতন মঙ্গল" অর্থাৎ নূতন পাঞ্চালী কাব্য। ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে।—এক, প্রথম রচিত চণ্ডীমঙ্গল, দুই, নূতন ধরণের চণ্ডীমঙ্গল। মুকুন্দরামই যে চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণিবার জন্ম সর্বপ্রথম কালকেতু-ধনপতির কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন এমন কথা বলি না। কোন কোন দিগ্‌বন্দনা অংশে পাই

মানিক-দত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ

'মানিক-দত্ত কর্তৃক বিধিবদ্ধ (দেবীমাহাত্ম্য-কাহিনী) প্রকাশ করা হইতেছে।'

সম্ভবত ইহা গায়নের প্রক্ষেপ। যদি মুকুন্দরামেরই হয় তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর আদিকবি রূপে মানিক-দত্তের নাম তাঁহার শ্রুতিগোচর ছিল। (যেমন ছিল রূপরাম চক্রবর্তীর কাছে ময়ূরভট্টের নাম।) মানিক-দত্তের কোন শ্লোক অথবা পাঞ্চালী ছিল কি না এবং সে শ্লোক-পাঞ্চালী মুকুন্দরামের জানা ছিল কি না—সে জিজ্ঞাসার কোন উত্তর নাই। মানিক-দত্তের পাঞ্চালী বলিয়া যে পুথি আমরা পাইয়াছি তাহা যে মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক হইতে পারে না তাহা আগে দেখাইয়াছি। সুতরাং আপাতত মুকুন্দরামের কাব্যকে দুই অর্থেই "নৌতন মঙ্গল" বলিতে হয়।

মুকুন্দরামের কাব্যের তিনটি ভাগ ("খণ্ড")। যে দেবী মহিমময় নারীশক্তি রূপে আপনাকে প্রকট করিয়াছেন সেই দেবীর সর্বোৎকর্ষ বর্ণনার তলায় তলায় দেবী ও মানবী নারীর ত্রিবিধ চিত্র এই তিন ভাগে আঁকা হইয়াছে। প্রথম ভাগে দরিদ্র সংসারের গৃহিণীর পিতৃগৃহে অনাদর ও পতিগৃহে অসচ্ছলতা, দ্বিতীয় ভাগে স্বামীস্ত্রীর দরিদ্র সংসারে সপত্নীর সম্ভাবনা, তৃতীয় ভাগে ধনী

[১] বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৩ পৃ ২৫৩-২৫৪ দ্রষ্টব্য।

সংসারে সপত্নীর সমস্যা এবং পুত্রবতীর বেদনা। নারী প্রথম ভাগে দেবলোকে নব-বিবাহিতা স্ত্রী, দ্বিতীয় ভাগে দরিদ্র-সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী, তৃতীয়ভাগে ধনী-সংসারে সুভগা গৃহিণী।

প্রথমে বন্দনা ও সৃষ্টিকাহিনী,—উপক্রমণিকা। তাহার পর "দেব খণ্ড"—দক্ষকন্যা সতীর ও হেমন্তনন্দিনী পার্বতীর কাহিনী। মঙ্গলবারের দিবা ও নিশা এবং বুধবারের দিবা—এই তিন দফায় (পালায়) এই অংশ গাওয়া হইত। দ্বিতীয় "আখেটিক (আক্ষটি) খণ্ড"—দেবীর পশুপালন ও ব্যাধদম্পতী কালকেতু-ফুল্লরা কাহিনী, বুধবারের নিশা হইতে শুক্রবারের দিবা পর্যন্ত চার পালায় গীত। তৃতীয় "বণিক খণ্ড"—ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীপতির কাহিনী। শুক্রবারের নিশা, শনিবারের দিবা ও নিশা, রবিবারের দিবা ও নিশা, সোমবারের দিবা ও নিশা (সারা রাত্রি) ও মঙ্গলবারের দিবা—নয় পালায় গীত। এই আট দিনে ষোল পালায়—(অর্থাৎ অধিবেশনে) সুমঙ্গল রচনাটি গাওয়া হইত। এই ভাবে গীতপদ্ধতি অনুসারে চণ্ডীমঙ্গল "অষ্টমঙ্গলা" এবং "ষোলপালা" গান।[১]

বন্দনার পর সৃষ্টিপত্তন। তাহার পর প্রথম দৃশ্য। ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রদের যজ্ঞের সভায় দেবতারা সমবেত হইয়াছেন। এমন সময় দক্ষ প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব ছাড়া সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রণাম করিল। শিব দক্ষের জামাতা। তাঁহাকে "অনীত" দেখিয়া দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া মন্দ কথা বলিতে লাগিল।

> ভূষণ হাড়ের মালা মশানে যাহার খেলা
> হেন ছার আমার জামাতা…
> হেন অমঙ্গলধাম কেবা থুইলা শিব নাম
> দেবমধ্যে কে করে গণন…
> নারদেরে বলিব কি আনলে ফেলিলা ঘি
> সভামাঝে লাজে হেঠ-মাথা…
> শ্বশুর যেমন তাত তারে না জুড়িল হাথ
> সভামাঝে কৈল অপমান
> নহে লোকে অনুরাগ ঘুচুক যজ্ঞের ভাগ
> বেদ পথে নহে অবধান।

দক্ষের অনুজ্ঞায় শিবের যজ্ঞভাগপ্রাপ্তি নিষিদ্ধ হইল। শিব অবিচলিত রহিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুচর দক্ষকে শাপ দিল।

---

১ মনসামঙ্গলেও এইরকম গীতপদ্ধতি।

মহাদেবে দক্ষ হেন বৈলে কুবচন
অচিরাতে হবে তোর ছাগলবদন।

তাহার পর ব্রহ্মা তাঁহার পুত্রদের মধ্যে দক্ষকে প্রধান রূপে বরণ করিলেন।

কত কালে ব্রহ্মা কৈলা দক্ষের সম্মান
সকল পুত্রের মধ্যে করিলা প্রধান।
ব্রাহ্মণের রাজা করি ধরাইল ছাতা
প্রসাদ করিলা তারে কনক-পইতা।

(এই উপলক্ষ্যে মুকুন্দরাম আশ্রয়দাতা বীর-বাঁকুড়া ও রঘুনাথের কুলপ্রশস্তি দিয়াছেন। ইহাদের গাঁই "পালধি"।)

ব্রাহ্মণ পালিতে তারে বুদ্ধি দিল বিধি
সেই হৈতে কুলশ্রেষ্ঠ হইল পালধি।

দক্ষ যজ্ঞারম্ভ করিল। শিব ছাড়া দেবতারা সবাই নিমন্ত্রিত হইলেন। সতীর কানে গেল পিতা বিরাট যজ্ঞ করিতেছেন। শুনিয়া তিনি শিবের কাছে গেলেন বাপের বাড়ি যাইবার অনুমতি চাহিতে। শিব বলিলেন

বিনি নিমন্ত্রণে যাবে এই মাথা-কাটা
আমার প্রসঙ্গে তুমি বড় পাবে খোঁটা।

সতী খেদ করিতে লাগিলেন।

পর্বত-কাননে বসি নাহি পাটপড়শী
সীমন্তে সিন্দূর দিতে সখী।
সুমঙ্গল সূত্র-করে আইলাম তোমার ঘরে
পূর্ণ হইল বৎসর সাত
দূর করহ বিবাদ পূরহ মনের সাধ
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত।
পিতা মোর পুণ্যবান করিবেন অনেক মান
কন্যাগণে দিবে ব্যবহার
বসন ভূষণ আদি পাব রত্ন নানাবিধি
ভেদবুদ্ধি নাহিক বাপার।

শিব শুধু এই উত্তর দিলেন,

বাপা ঘরে যদি চল তবে না হইবে ভাল
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন।

স্বামীর অনুমতি না পাইয়া সতী রাগ করিয়া একাই পিতৃগৃহে চলিলেন। শিবের ইঙ্গিতে নন্দী ভূতপ্রেত অনুচর লইয়া পিছনে পিছনে চলিল। বাপের বাড়ি পৌঁছিয়া সতী প্রথমেই মায়ের কাছে গেলেন। ভগিনীরা খুশি হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিল।

জননী ভগিনী সঙ্গে ক্ষণেক থাকিয়া রঙ্গে
যান দেবী যজ্ঞের সদন
অভয়াচরণে চিত রচিল নৌতন গীত
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।

তাহার পর দক্ষ-যজ্ঞভঙ্গের পরিচিত কাহিনী।

অতঃপর হিমালয়ের ঘরে গৌরীর জন্ম ও বৃদ্ধি। বিবাহের জন্ম হিমালয়ের চিন্তা। নারদ সম্বন্ধ আনিয়া দিল। এমন সময় দৈবক্রমে নারদের নির্বাচিত বর শিব গঙ্গার ধারে হিমালয়ের বনে তপস্তা করিতে আসিয়াছেন। হেমন্ত (অর্থাৎ হিমালয়) শিবের কাছে গিয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, আপনার আগমনে আমার আশ্রম পুণ্যশালী হইল।

আমার আশ্রম আজি করহ সফল
মোর কন্তা নিত্য দিব ফল-পুষ্প-জল।

শিব রাজি হইলেন। তখন

নানা উপহারে গৌরী পুজেন শঙ্করে

তাহার পর কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুসরণ। তারকাসুর বধের জন্ম কুমার-জন্ম আবশ্যক। শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে হইবে। মদনকে পাঠানো হইল।

ধেয়ানে আছেন শিব সুস্থির আসনে
ঝারি হাতে পার্বতী আছেন সন্নিধানে।
সম্মোহন-বাণ তবে পুরিল সত্বর
ঈষৎ চঞ্চল শিব হইলা সত্বর।
ধ্যানভঙ্গ হইলা শিব চারি পাশে চান
সম্মুখে দেখিল চাপধারী পঞ্চবাণ।
কোপ দৃষ্টো মহেশ্বর বরিষে দহন
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন।
তপোভঙ্গ হইলা শিব গেলা অন্তস্থান
পর্বতনন্দিনী গেলা পিতৃসন্নিধান।

তাহার পর রতিবিলাপ ও গৌরীর তপস্তা। শিব তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, যেমন কুমারসম্ভবে। শিব বলিলেন

শুন গো চন্দ্রমুখী তোমারে আমি দেখি
রূপেতে ভুবনমোহিনী
কতেক আছে বর ভুবনে মনোহর
ইচ্ছিলে বুড়াবর কেনি।…

ভিক্ষার অনুসারে ফিরেন ঘরে ঘরে
করিয়া ডম্বুর বাজনা
দারুণ কর্মগতি ইচ্ছিলে হেন পতি
তোমারে বিধি বিড়ম্বনা।
দ্বিজের শুনি কথা বলেন গিরিসুতা
তপস্বী কর অবধান
যে যারে মানে ভায় সে নারী ভজে তায়[১]
মুকুন্দ এই গীত গান।

হর-গৌরীর বিবাহ হইয়া গেল। দম্পতী হিমালয়ের ঘরেই বাস করিতে লাগিলেন। গণেশ ও কার্তিক জন্মগ্রহণ করিল। যেমন হইয়া থাকে, ঘরজামাই বেশিদিন পোষা চলিল না। গৌরীর মা মেনকা মেয়ের দোষ ধরিতে শুরু করিল। গৌরী সর্বদা সখীসঙ্গে পাশাখেলায় মাতিয়া থাকে, ঘরের কাজকর্ম কিছুমাত্র দেখে না, জামাইও রোজগারের চেষ্টা করে না,—এই অনুযোগ একদিন মেয়ের কাছে মুখ ফুটিয়া কহিল।

তোমা ঝি হইতে মজিল গারিয়াল[২]
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কত কাল।
ভিখারির মাগু[৩] হয়্যা পাশায় প্রবল
কি খেলা খেলিতা যদি থাকিত সম্বল।...
মিছা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাষবাস
অন্নবস্ত্র কতেক যোগাইব বারো মাস।...
নিরন্তর আমি কত সহিব উৎপাত
রান্ধো বাড়্যো দিতে মোর কাঁখে হৈল বাত।
দুগ্ধ উথলিলে তুমি নাহি দেও পানি
পাশা খেলাইয়া গোঁয়াও দিবস রজনী।

পার্বতীও উত্তর দিল বাঙ্গালী মেয়ের মতো,—তোমার খাই না পরি ?

জামাতারে বাপ মোর দিল ভূমিদান
তথি ফলে মসুর কাপাস মাষ ধান।
রান্ধো বাড়্যো দেও বল্যো কত দেও খোঁটা
তব ঘরে আসিতে দুয়ারে দিও কাঁটা।
মৈনাক তনয় লৈয়া সুখে কর ঘর
কত বা সহিব নিন্দা যাব স্থানান্তর।

রাগ করিয়া বাপের বাড়ী ছাড়া যায় কিন্তু মায়া তো কাটে না। তাই

এত বলি যান দেবী ছাড়ি মায়ামোহ
ঝলকে ঝলকে পড়ে লোচনের লোহ।

---

[১] তুলনীয় "মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্" (কুমারসম্ভব পঞ্চম সর্গ)।
[২] =গৃহস্থালি। [৩] =পত্নী।

কৈলাসে গিয়া দেবীর দুঃখ বাড়িল বই কমিল না। ভিখারির সংসারে সদাই অন্নচিন্তা। ধনিকন্যা গৌরীর ক্রমশ অসহ হইল। তিনি নিজের পূজার যোগাড়ে মন দিলেন। দেবী প্রথমে কলিঙ্গ-রাজার ও পশুদের পূজা লইলেন। তখন মর্ত্যলোকে ভব্যসমাজে শিবপূজা সর্বত্র প্রচলিত ছিল।

অবনীমণ্ডলে পূজে ধর্মশীল নর
জীবন্ন্যাস করি পূজে মৃত্তিকা-শঙ্কর।
পুরীমধ্যে দেয় কেহ শিবের মন্দির
বর প্যায়্যা নরলোক রণে হয়ে স্থির।
চৈত্র মাসে শিব পূজে নানা উপচারে
ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে।
জিহ্বা ফোড়ে জিহ্বা কাটে করয়ে চড়ক
অভিমত স্বর্গে যায় না যায় নরক।...
পিশাচ দানব শিবে পূজে প্রতিদিন
যে জন শঙ্কর পূজে নহে ধনহীন।

সুতরাং এখানেও দেবী স্বামীর কাছে জিতিতে পারিলেন না। তখন শিবকেই ধরিয়া বসিলেন। দেবীর অনুরোধে শিব ভক্ত নীলাম্বরকে শাপ দিয়া দেবীমাহাত্ম্যপ্রচারের হেতুরূপে মর্ত্যলোকে পাঠাইলেন। নীলাম্বর কালকেতু হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। কালকেতু যৌবনপ্রাপ্ত হইলে পিতা ধর্মকেতু ফুল্লরার সহিত তাহার বিবাহ দিল। ধর্মকেতু ও নিদয়া পুত্র-পুত্রবধূর হস্তে সংসারের ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্তে শুইয়া বসিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। নিতান্ত দরিদ্র কিন্তু সুখী সংসার।

নিদয়া বিহরে খাটে মাংস লয়্যা গোলাহাটে
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা
শাশুড়ী যেমন ভনে সেইমত বেচে কিনে
শিরে কাঁখে মাংসের পশরা।
মাংস বেচি লয় কড়ি চালু লয় দাল বড়ি
তৈল লোন কিনয়ে বেসাতি
শাক বাইগন মূলা আঁট্যা-থোড় কাঁচ-কলা
সকলে পূরিয়া লয় পাতি।
ফুল্লরা আইসে ঘরে নিদয়া জিজ্ঞাসে তারে
কহে রামা হাট-বিবরণ
নিদয়ার আজ্ঞা ধরি ফুল্লরা রন্ধন করি
আগে ধর্মকেতুর ভোজন।

তনয়ে বাগুরা-জাল সমর্পিয়া বহুকাল
ভুঞ্জে সুখ কিরাত-নন্দন
খাওয়ায় ফুল্লরা বধূ ক্ষীর খণ্ড দধি মধু
নিদয়ার সফল জীবন।

অবশেষে সুবৃদ্ধবয়সে দম্পতী "ভাবিয়া মুক্তির হেতু বারাণসী করিল পয়ান"।

কলিঙ্গের বনে দেবীর অভয় পাইয়া পশুরা নির্বিবাদে বাস করিতেছিল। এখন কালকেতুর শিকারে পশুবংশ নির্মূল হইতে চলিল। উপায় না দেখিয়া পশুরা কংস-নদীর তীরে দেবীর দেউলে একজোটে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল।

কান্দে সিংহ আদি পশু স্মঙরি অভয়া, অপরাধ বিনা মাতা দূর কৈলা দয়া।
ভালে টীকা দিলে মাতা করি মৃগরাজ, করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ।
সুখে রাজ্য করিতে আক্ষটি হৈল কাল, কেন হেন দিলে মাতা বিষম জঞ্জাল।
প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক, উদরের জ্বালা তাহে সোদরের শোক।
হাতে পায়ে দড়ি বীর দেয় গলে তোক, গড়াগড়ি দিয়া কান্দে রায়বার কোক।...
উই চারা খাই বনে জাতিতে ভালুক, নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।...
ধূলায় ধূসর হয়্যা কান্দয়ে হস্তিনী, মিথ্যা বর দিয়া কেন বধ কর প্রাণী।
শ্যামল-সুন্দর তনু কমললোচন ভুরু কামধনু রূপ মদনমোহন।
কানন করয়ে আলো কপালের চান্দে, তার রূপ স্মরিতে আমার প্রাণ কান্দে।
বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর, লুকাইতে স্থান নাই বীরের গোচর।
পলাইয়া কোথা যাই কোথা গেলে তরি আপনার দন্ত দুটা আপনার অরি।...
হুক হুক করি কান্দে বানর মর্কট, জীবনে নাহিক কার্য বীর-সনে হট।
বৃদ্ধ-পিতামহ ছিল রাম-সেনাপতি, সাগর তরিতে হৈল গগনে পদাতি।
কি মোর দারুণ বিধি লিখিল কপালে, সাত পুত্র ধরি বীর বান্ধে ফান্দ জালে।
বারশিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকান, ধরণী লোটায়্যা কান্দে করি অভিমান
কেন হেন জন্ম বিধি কৈল পাপবংশে,- জগৎ হইল বৈরী আপনার মাংসে।
আক্ষটী করিয়া কান্দে সাজারু শশারু, দুঃখ না ঘুচিল মোর সেবি কল্পতরু।...

দেবী আবির্ভূত হইলেন। পশুগণকে অভয় দিয়া তিনি "সেইখানে সুবর্ণ-গোধিকারূপ হৈলা"। কালকেতু শিকারে যাইবার পথে এই অমঙ্গল দেখিল। সেদিন তাহার কোন শিকারই মিলিল না। ফিরিবার পথেও সেই সুবর্ণ-গোধিকা।

হাথে করি ধনুশরে যায় বীর ধীরে ধীরে
সুবর্ণ-গোধিকা পুন দেখে
তর্জন গর্জন করে বান্ধে বীর গোধিকারে
ধনুকের হুলে বান্ধি রাখে।
যাত্রাকালে তোমা দেখি বনে ফিরি হৈয়া দুখী
নকুল বদলে তোমা খাইব
পড়িলা আমার হাতে এড়াবে কেমন-মতে
জীয়ন্ত লইয়া পোড়াইব।

দেবী সঙ্কটে পড়িলেন। ভাবিলেন

গোধিকা হইয়া করিলাম কোন কাজ
দুঃখের উপরে দুঃখ পাই বড় লাজ।

ঘরে গোধিকাকে বাঁধিয়া রাখিয়া কালকেতু পত্নীর উদ্দেশে গোলাহাটে চলিল। সেদিন হাটে বাসি মাংসের খরিদ্দার না থাকায় ফুল্লরা পসার করিতে পারে নাই। স্বামীকেও শূন্যহস্ত দেখিয়া ফুল্লরা বলিল, "আজি মহাবীর বল সম্বল উপায়"। কালকেতু বলিল

আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা
লইয়া সাজারু ভেট যাহ তুমি তথা।
খুদ কিছু ধার লহ সখীর ভবনে
কাঁচড়া খুদের জাউ রান্ধিও যতনে।
রান্ধিও নালিতা শাক হাঁড়ী দুই তিন
লবণের তরে চারি কড়া কর ঋণ।
সখীর উপরে দেহ তণ্ডুলের ভার
তোমার বদলে আমি করিব পসার।
গোধিকা বাধ্যাছি বান্ধি দিয়া জাল-দড়া
ছাল উতারিয়া প্রিয়ে কর শিক-পোড়া।

"সখীগৃহে খুদ সের করিয়া উধার" ফুল্লরা ঘরে আসিল।

বাম বাহু স্পন্দে তার স্পন্দে বাম আঁখি
কুঁড়ার দুয়ারে দেখে রাকা চন্দ্রমুখী।

ফুল্লরা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে দেবী বলিলেন

ইলাবৃত দেশে ঘর জাতিতে ব্রাহ্মণী
শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী।
বন্দ্যাবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল
সতা সাথ গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল।
তুমি গো ফুল্লরা যদি দেহ অনুমতি
এই স্থানে কথ দিন করিব বসতি।
হেন বাক্য হৈল যদি অভয়ার তুণ্ডে
পর্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে
হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল রন্ধনের ত্বরা।

ফুল্লরা দেবীকে অনেক বুঝাইল, পতিগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে। দেবী দারুণ কথা বলিয়া দিলেন।

আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে
আনিল তোমার স্বামী বাঁধি নিজগুণে।

তখন দেবীকে ভাগাইবার জন্য ফুল্লরা নিজের বারমাসিয়া দুঃখকাহিনী নিবেদন করিতে লাগিল। দেবী তাহাতেও অটল। বলিলেন, "আজি হৈতে দূর হইল সকল দুর্গতি"। ফুল্লরা তখন নারীর ব্রহ্মাস্ত্রসন্ধান করিয়া স্বামীর উদ্দেশে গোলাহাটে ছুটিল। পথে তাহার "নয়নের জলেতে মলিন মুখশশী" দেখিয়া কালকেতু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল

> শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা
> কার সনে দ্বন্দ্ব কর‍্যা চক্ষু কৈলা রাতা।

ফুল্লরা উত্তর করিল

> সতা সতীন নাহি প্রভু তুমি মোর সতা
> ফুল্লরারে এবে হৈল বিমুখ বিধাতা।...
> পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে
> কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।
> শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড়ই দুর্বার
> তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার।

কালকেতু কিছুই না বুঝিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল

> সুব্যক্ত করিয়া রামা কহ সত্যভাষা
> মিথ্যা কৈলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা।

ফুল্লরা বলিল

> সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম সাক্ষী
> তিন দিবসের চন্দ্র দ্বারে বন্ধা দেখি।

উভয়ে ঘরে ফিরিয়া দেখে, "ভাঙ্গা কুঁড়্যা ঘরখানি করে ঝলমল"।

দেবীর অনুগ্রহে ধনী হইয়া কালকেতু ব্যাধবৃত্তি ছাড়িয়া দিল। বনের পশুরাও নিশ্চিন্ত হইল। বন কাটাইয়া কালকেতু গুজরাট নগর পত্তন করিল। এই নগরপত্তন-বর্ণনায় সেকালের টাউন-প্ল্যানিঙের একটা আদর্শ পাই। নূতন স্থানে প্রজারা প্রথমে বসতি করিতে চাহে নাই। তখন দেবী কলিঙ্গে বান ডাকাইলেন। বানভাসি প্রজারা বসতি করিল। গুজরাট জমিয়া উঠিল। গুজরাট নগরের বসতি-বর্ণনায় মুকুন্দরাম তাঁহার জ্ঞানের, অভিজ্ঞতার, বাস্তবদৃষ্টির ও রসজ্ঞতার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে আর কোথাও পাই না। ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-অন্ত্যজ, হিন্দু-মুসলমান, বৈষ্ণব-ফকির, তস্কর-ভণ্ড—সব রকমের লোকের চেহারা সামান্য রেখাঙ্কনেই সমুজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। মাঝে মাঝে ঈষৎ বক্রদৃষ্টি থাকায় পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে সব চেয়ে দুর্লভ রস যে হিউমার তাহার প্রস্ফুটন হইয়াছে। যেমন

উঠিয়া প্রভাতকালে উর্দ্ধ ফোটা করি ভালে
বসন-মণ্ডিত করি শিরে
পরিয়া উজ্জ্বল ধুতি কাখে করি নানা পুথি
গুজরাটে বৈদ্যজন ফিরে
কার দেখে সাধ্য রোগ ঔষধ করয়ে যোগ
বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়
অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ
নানা ছলে করয়ে বিদায়।
কর্পূর পাচন করি তবে জীয়াইতে পারি
কর্পূরের করহ সন্ধান
রোগী সবিনয় বলে কর্পূর আনিতে চলে
সেই পথে বৈদ্যের পয়ান।

কায়স্থদের প্রতি মুকুন্দরামের বেশ একটু প্রসন্নতা ছিল বলিয়া মনে হয়।

দোষহীন কায়স্থের সভা
প্রসন্ন সভার বাণী লেখাপড়া সবে জানি
ভব্যজন নগরের শোভা।

ভদ্র মুসলমানের প্রতিও কবির বেশ শ্রদ্ধা ছিল। চণ্ডীর মাহাত্ম্য-গ্রন্থ, লিখিতেছেন নিষ্ঠাবান্ দেবসেবক ব্রাহ্মণ। কিন্তু ছোটবড় মুসলমান-সমাজের আদ্যন্ত পরিচয় দিতে তিনি কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই। চণ্ডীর মাহাত্ম্য উপলক্ষ্যে তাঁহার দেশের কথাও বলিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং কোন সমাজ বা লোক-গোষ্ঠী তিনি উপেক্ষা করেন নাই। সম্ভ্রান্ত, ভদ্র ও নিষ্ঠাবান্ মুসলমানের কথায় মুকুন্দরামের কবিজনোচিত সহৃদয়তার প্রকাশ অকুণ্ঠ। গুজরাটের পশ্চিম অংশের নাম হাসনহাটী। সেখানে মুসলমানের বাস। কবি তাঁহাদের দিনকৃত্য বর্ণন করিতেছেন।

ফজর সময়ে উঠি বিছায়্যা লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ
সোলেমানি মালা ধরে জপে পীর পেগম্বরে
পীরের মোকামে দেই সাঁজ।
দশ বিশ বিরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুক্ষণ পড়য়ে কোরান
সাঁজে ডালা দেই হাটে পীরের শিরিনি বাঁটে
সাঁজে বাজে দগড় নিশান।
বড়ই দানিশমন্দ কারেহ না করে ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি
ধরয়ে কম্বুজ বেশ শিরে নাহি রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।...

আটনা বেটনা নিঞা বসিল সকল মিঞা
ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে হাত
হুরানি লহানি পানী কিতানি বটুনি হনি
পাঠান বসিল নানা জাত।
বসিল অনেক মিঞা আপন টবর নিঞা
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া
মোল্লা পড়াইঞা নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলমা পড়িয়া।

পূজারী ব্রাহ্মণকে মুকুন্দরাম ছাড়িয়া দেন নাই। এ বর্ণনায় কবি বোধ করি সব চেয়ে অপ্রিয়ভাষী হইয়াছেন।

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখয়ে পূজার অনুষ্ঠান
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে
চাউলের পুটলি বাঁধে টান।
ময়রাঘরে পায় খণ্ড গোপঘরে দধিভাণ্ড
তেলিঘরে তৈল কূপী ভরি
কোথাহ মাসরা কড়ি কেহ দেয় দালি বড়ি
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতরি।

মুকুন্দরামের লোক-জ্ঞান যে কতটা ব্যাপক ও গভীর ছিল তা জানিতে পারি বিবিধ জাতির বর্ণনায়। সমসাময়িক কোন ইতিহাস-গ্রন্থেও এমন খবর মিলে না। আরও কিছু উদাহরণ দিই।

মৎস্য বেচে চষে চাষ বৈসে দুই জাতি দাস
কলু নগরে পীড়ে ঘানি
বাইতি নিবসে পুরে নানা জাতি বাদ্য করে
ফিরয়ে মান্দুরি বিচি কিনি।...
নগর করিয়া শোভা নিবসে অনেক ধোবা
দড়ায় শুখায় নানা বাসে
দরজী কাপড় সিঁঞে বেতন করিয়া জীয়ে
গুজরাটে বৈসে এক পাশে।
সিউলী নিবসে পুরে খাজুর কাটিয়া ফিরে
গুড় করে বিবিধ বিধানে
ছুতার নগর মাঝে চিড়া কুটে খই ভাজে
কেহ গড়ে শকট বিমানে[১]।
চৌহলি চুনারি মাঝি বৈসে করে নানা বাজি[২]
মাল বৈসে পুরের বাহিরে
চণ্ডাল নিবসে পুরে লবণ বিক্রয় করে
পানীফল কেসুর পসারে।

---

[১] উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর "কেহ করে চিত্র নির্মাণে"। [২] ঐ "কোরাঙ্গা ভরদ্বাজা"।

গোহাল্যা[১] গাইয়া গীত কোয়ালি ফিরয়ে নিত
এক ভিতে বসিল মারাঠা
ফিরে তারা গুজরাটে সুলঙ্গে পিলুই[২] কাটে
ছানি ফোড়ে দিয়া চক্কাটা।
পুরান্তে নিবসে কোল হাটেতে বাজায় ঢোল
জায়াজীবী বৈসে এক ভিতে
বিয়নি চালুনি ঝাঁটা ডোম গড়ে টোকা[৩] ছাতা
কির্তি করে হরষিত চিতে।
লম্পট পুরুষ আশে বারবধূগণ বৈসে
এক ভিতে তার অধিষ্ঠান…

কায়স্থদের মধ্যে একজন ঠকও আসিয়াছিল। সে ভাঁড়ু দত্ত।

গুজরাটের নবাগত অধিবাসীদের মধ্যে ভাঁড়ু দত্তেরই সুস্পষ্ট এবং কাহিনীর পক্ষে আবশ্যিক ভূমিকা। মুকুন্দরামের লেখনীতে ভাঁড়ু দত্ত অমরত্ব লাভ করিয়াছে। পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন উজ্জ্বল জীবন্ত পাষণ্ড চরিত্র আর নাই।

কালকেতুর সভায় আসিয়া ভাঁড়ু আপন গৌরব জাহির করিতেছে। আর প্রজাদের মুখ্য বুলান মণ্ডলের নামে লাগাইতেছে।

সঘনে নাড়িয়া শিরে প্রবন্ধে কহিছে ধীরে
ভাঁড়ু দত্ত কহে কান-কথা
যেই-হেতু প্রজা বৈসে কহি আমি সবিশেষে
একে একে প্রজার বারতা।
তাড়-বালা দিব মান করজ বলদ-ধান
উচিত বলিতে কিবা ভয়
জিনিতে প্রজার মায়া পত্র নিবা এক-ছেয়া
বন্দে বন্দে প্রজা যেন রয়।
যখন পাকিবে খন্দ পাতিবা বিষম ফন্দ
দরিদ্রের ধানে নিবে নাগা
খাইয়া তোমার ধন না পালায় কোন জন
অবশেষে নাহি পাও দাগা।…
পরিত পুরানো কাচা ভানিত আমার ভাচা
চাষা বেটা হবে দেশমুখ
রাখালের হাতে খাণ্ডা বহুড়ী জনের ভাণ্ড
পরিণামে দেয় বড় দুখ।

[১] গোহারি বা ঠেট হিন্দী ভাষায় গান? [২] —প্লীহা।
[৩] টোকা পোর্তুগীস শব্দ।

প্রথমে কালকেতু ভাঁড়ু দত্তকে বিশ্বাস করিয়াছিল। কিন্তু প্রজাদের উপর অত্যাচার করায় তাহাকে সভায় অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। সে কলিঙ্গরাজের কাছে গিয়া তাহাকে কালকেতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিল। কলিঙ্গরাজ গুজরাট আক্রমণ করিল। কালকেতু পত্নীর নির্বুদ্ধিতার ও ভাঁড়ুর শঠতার ফলে ধরা পড়িয়া বন্দী হইল। তবে দেবীর কৃপায় শীঘ্রই সে উদ্ধার পাইল এবং যথারীতি কাল পূর্ণ হইলে দম্পতী স্বর্গে চলিয়া গেল।

আখটি খণ্ডে দেবী পুরুষের পূজা লইয়াছেন, বণিক্ খণ্ডে নারীর। এইজন্য ইন্দ্রের নর্তকী রত্নমালাকে শাপ দিয়া পৃথিবীতে পাঠানো হইল খুল্লনারূপে। এই কাহিনীর গঠন অনেকটাই মনসামঙ্গলের অনুরূপ। বণিক্ শিবের উপাসক, দেবী-পূজা সে করিবে না। দেবী বাণিজ্যযাত্রায় তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন, শেষে পুত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া বশে আনিয়া পূর্ব-সমৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

পায়রা উড়াইতে গিয়া খুল্লনাকে দেখিয়া ধনপতি তাঁহাকে বিবাহ করিতে ব্যগ্র। খুল্লনা ধনপতির পত্নী লহনার খুল্লতাত-ভগিনী। তাহাকে বিবাহ করিতে উৎসুক হইয়া ধনপতি পত্নী লহনাকে বুঝাইতে গিয়া দ্বিতীয় বিবাহের সাফাই সংসারাভিজ্ঞ বিদগ্ধ ব্যক্তির মতই দিতেছে।

> রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে
> চিন্তামণি নাশ কৈল কাঁচের বদলে।
> স্নান করি আসি শিরে না দেও চিরনী
> রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিন্ধে পানি।...
> মাসী পিসী মাতুলানী ভগিনী সতিনী
> কেহ নাহি রহে ঘরে হইয়া রান্ধনী।
> যুক্তি যদি লয় মনে কহিবা প্রকাশি
> রন্ধনের তরে তব করা্যা দিব দাসী।
> বরিষা-বাদলেতে উনানে পোড় বুক
> কর্পূর তাম্বুল বিনা রসহীন মুখ।...

প্রথম পত্নী বর্তমানে দোজবরের হাতে কন্যা দেওয়া হইতেছে বলিয়া খুল্লনার মা রম্ভাবতী কন্যার বিবাহের সময়ে জামাই-বশ করিবার জন্য তুকতাকের আয়োজন করিয়াছিল। এই বর্ণনায় সেকালের মেয়েলি ক্রিয়াকাণ্ড ব্যাপারে মুকুন্দরামের গভীর অধিকারের প্রমাণ মিলে। যেমন

> কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি
> দুর্গা-প্রদীপ পুত্যা রাখিয়াছে চেড়ী।

সাধুর কপালে যবে দিব পুনর্বসু[1]
খুল্লনার হবে সাধু নাকবিন্ধা পশু।…
কাপাসের খেত হৈতে আনিল গোমুণ্ড
হাণ্ডাইয়া সাধু তায় রব দুই দণ্ড।
খুল্লনা করিব যদি সাধুর অপমান
মৌনে রহিব সাধু গোমুণ্ড সমান।…

বিবাহ করিয়াই ধনপতিকে বিদেশযাত্রা করিতে হইল। বিক্রমকেশরী রাজা একজোড়া শারী-শুক পাইয়াছেন। তাহাদের জন্য সোনার খাঁচা চাই। মন্ত্রী লজ্জিত হইয়া নিবেদন করিল, এখানে এমন কারিগর নাই যে সোনার খাঁচা গড়িতে পারে। এমন খাঁচা প্রস্তুত হয় গৌড় পাটনে। ধনপতি বংশানুক্রমে রাজার যোগানদার বেনিয়া অর্থাৎ অর্ডার-সাপ্লায়ার। নববিবাহিত খুল্লনাকে সতীনের হাতে সমর্পণ করিয়া ধনপতিকে গৌড়ে যাইতে হইল।

শারী-শুকের প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম কয়েকটি প্রহেলিকা দিয়াছেন। অপভ্রংশ-অবহট্টের কাল হইতে প্রহেলিকা-বিলাস লৌকিক আখ্যায়িকা কাব্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। প্রাচীন গুজরাটী-রাজস্থানী কাব্যেও এমনি প্রহেলিকা দেখি। মুকুন্দরাম শুকের মুখে যে হেঁয়ালি ছড়াগুলি দিয়াছেন তাহার মধ্যে কয়েকটি বেশ পুরানো। এগুলি আনন্দধরের 'মাধবানল-কথা'য়[2] এবং কুশললাভের 'মাধবানলকামকন্দলা-চউপঈ'এও[3] আছে। দুইটি উদাহরণ দিই।

১. মুকুন্দরাম

বেগে ধায় রথ নাহি চলে এক পা
নাচয়ে সারথি তাথে পসারিয়া গা।
হেঁয়ালিপ্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি
অন্তরীক্ষে চলে রথ ভূতলে সারথি।[4]

আনন্দধর

পর্বতাগ্রে রথো যাতি ভূমৌ তিষ্ঠতি সারথিঃ
চলতে বায়ুবেগেন পদমেকং ন গচ্ছতি।

কুশললাভ

পর্বতশিখর এক রথ জাঈ
থাংভেত্রী বইসই ভূই ঠাই।
অতি উচ্চকে চালই করি বাউ
এক পগ নবি থাই আঘউ।

---

[1] অর্থাৎ পুনর্বসু নক্ষত্রে দিলে? [2] P. E. Pavolini সম্পাদিত (*Transactions of the Ninth International Congress of Orientalists* প্রথম খণ্ড পৃ ৪৩০-৪৫৩); M. R. Mazumder সম্পাদিত (Baroda Oriental Series ১৯৪২)। [3] M. R. Mazumdar সম্পাদিত (Baroda Ofiental Series ১৯৪২)। [4] উত্তর—ঘুড়ি।

২. মুকুন্দরাম

তরু হয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল
ডাল পল্লব তায় অতি সে বিপুল।
পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ
বনেতে থাকিয়া করে বনের দোষণ।[১]

আনন্দধর

বনমধ্যে স্থিতো বীরো মাংসশোণিতবর্জিতঃ।
করোতি শত্রুবৎ কার্যং ছিত্ত্বা শীর্ষং বনং বসেৎ।

লহনা বোকাসোকা ধরণের ছিল। খুল্লনাকে সে প্রথমে যত্নেই রাখিয়াছিল। দুই সপত্নীর সদ্‌ভাব দুর্বলা দাসীর ভালো লাগে নাই। রামায়ণের মন্থরার মতোই সে। কিন্তু মুকুন্দরামের লেখনীতে দাসী রামায়ণের ভূমিকার মতো অতটা বাস্তববর্জিত চরিত্র নয়। দুর্বলা লহনার প্রতি অতিমাত্রায় অনুরক্ত নয়, বিশুদ্ধ খলস্বভাবও নয়। সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষের মতো। দুর্বলা দেখিল, দুই সতীনে ভাব থাকিলে তাহার খাটুনি বাড়িয়া যাইবে। দুইজনে ঝগড়া বাধিলে সংসারে বিশৃঙ্খলতা আসিবে এবং সে যথেচ্ছ কাজ করিতে-বা না করিতে পারিবে।

লহনা খুল্লনা যদি থাকে এক মেলি
পাটী[২] করি মরিব দুজনে দিবে গালি।
যেই ঘরে দু সতীনে না বাজে কোন্দল
সেই ঘরে রহে দাসী সে বড় পাগল।

সে লহনাকে বলিল, সতীনকে পুষিয়া আপনার সর্বনাশ করিতেছ। সাধু ঘরে ফিরিলে খুল্লনার রূপযৌবনের বশ হইয়া পড়িবে, আর

অধিকারী হইবে তুমি রন্ধনের ধামে
মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে।

দুর্বলচিত্ত লহনার মনে দুর্বলার কথা গাঁথিয়া গেল। তখনি সে দুর্বলাকে তাহার বামুন-সই লীলাবতীর কাছে তত্ত্ব দিয়া ডাকিয়া পাঠাইল। লীলাবতী আসিয়া সকল কথা শুনিয়া স্বামীকে বশ করিবার জন্য নানারকম তুকতাক জড়িবড়ির ব্যবস্থা দিল। লহনার তাহা মনে লাগিল না। সে সখীর কাছে স্বামীর বিগত দিনের ভালোবাসা স্মরণ করিয়া দুঃখ করিতে লাগিল।

পূর্বে জানিতাঙ আমি অধীন আমার স্বামী
স্মরজ্বরে পোহাইব রজনি
দারুণ দৈবের মায়া আসি কোন পথ দিয়া
নারিকেলে সাম্ভাইল পানী।

---

[১] উত্তর—পুকুরের পানা। সংস্কৃত অভিধানে বন মানে জলও হয়। [২] অর্থাৎ গৃহকর্ম।

পূর্বে জানিতাঙ যদি বিপাক পাড়িব বিধি
করিতাঙ প্রকার প্রবন্ধ
শুন গো শুন গো সই লোচনে দংশিল অহি
কোনখানে দিব তাগা বন্ধ।
প্রিয়-বাহু দৃঢ় পাশে বান্ধিয়াছিলাঙ বাসে
তথি হৈল দোয়জ বন্ধন
আমার দিবস মন্দ শিথিল পূর্বের বন্ধ
বান্ধা বোঝা লইল অন্য জন।

তুকতাক জড়িবড়ি এখানে চলিবে না বুঝিয়া লীলাবতী অন্য উপায় ভাবিয়া বাহির করিল। দুইজনে যুক্তি করিয়া এক জালচিঠি রচনা করিল। তাহাতে ধনপতি যেন খুল্লনার সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে লহনাকে লিখিতেছে

খুল্লনার নিহ তুমি অষ্ট আভরণ
নিযুক্ত করিহ তারে ছেলি অপেক্ষণ[১]।
পরিবারে দিহ খুঞা[২] উড়িতে[৩] খোসলা[৪]
শয়ন করিতে তারে দিহ ঢেঁকিশালা।
তোরে বলি প্রিয়ে মোর পালিবে আদেশ
নাহি পালিলে তোর মুণ্ডাইব কেশ।

লীলাবতীর মুন্শিয়ানা ছিল। চিঠি পড়িয়া যাহাতে কেহ সন্দেহ না করে, সেই জন্য প্রথমেই পিঞ্জর গঠনের জন্য কিছু সোনা পাঠাইবার কথা লিখিয়াছিল। চিঠি শেষ করিয়া মুড়িয়া গালামোহর দেওয়া হইল।

যথারীতি চিঠি ডেলিভারি হইল। চিঠি খুলিয়া লহনা খুল্লনাকে পড়িতে দিল। সে লহনার মতো বোকা নয়। অক্ষরের ছাঁদ অন্য রকম দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইল যে চিঠি জাল। হাসিয়া সে লহনাকে বলিল

সাধুর অক্ষর ভিন্নছন্দ
কে লিখিল পাতি কপটবন্ধ।

লহনা উত্তর দিল

শতেক সেবক আছয়ে পাশে
আনিল পাতি তাঁর আদেশে।

খুল্লনা বলিল, শতেক কিঙ্করের মধ্যে কে এ চিঠি আনিয়াছে? লহনা বলিল, পিঞ্জর গড়াইতে সোনা কম পড়িয়াছে, সেই সোনা লইতে তিন জন লোক আসিয়াছিল, তাহারা চলিয়া গিয়াছে। খুল্লনাকে আর তর্ক করিতে অবকাশ

[১] =ছাগল চরাইতে। [২] =মোটা ছালের সুতার কাপড়। [৩] =ওড়না (উপরের বস্ত্র) রূপে ব্যবহার করিতে। [৪] =পাতলা চট।

না দিয়া লহনা তাহাকে পত্র অনুযায়ী কার্য করিতে বলিল। বিবাদে পরাজিত হইয়া খুল্লনা খুঞাখোসলা পরিয়া ছাগল চরাইতে স্বীকার করিল। তখনি তাহার গায়ের গহনা জোর করিয়া খুলিয়া লওয়া হইল। খুল্লনা দুর্বলার পায়ে পড়িয়া অনুরোধ করিল, আমার বাপের বাড়ি খবর দাও গিয়া। লহনা খুল্লনার এমন লাঞ্ছনা করিবে তাহা দুর্বলা ভাবে নাই। সে খুল্লনাকে বলিল

সর্বাংশে দুহেত হও সাধুর গৃহিণী
ভিন্ন পর নহ তুমি খুড়তা ভগিনী।
কোন দোষে তোমার করিলা অপমান ...

তবে আমি এখনি তোমার বাপঘর যাইতে পারিতেছি না। তুমি দুইতিন দিন ছাগল চরাইয়া দেখ।

আন ছলে গিয়া আমি কহিব বারতা
যত্ন করিয়া যেন লয়ে যায় পিতা।

খুল্লনার বাপের বাড়ি গিয়া দুর্বলা একটু অন্যরকম কথা বলিল। তাহাতে দুই দিকই রক্ষা পাইল, লহনার মুখ রহিল এবং ছাগরক্ষার জন্য তাহার দুর্নামও হইল না।

খুল্লনারে সাধু বিয়া কৈল পাপক্ষণে
বিবাহের কালে কেতু আছিল লগনে।
গণিঞা গণক তারে কহিল বিচার
খুল্লনা ছাগল রাখে তার প্রতিকার।
ছাগল রক্ষণে যদি তুমি কর বাদ
তোমার জামাতা লয়্যা পড়িব প্রমাদ।

মা রম্ভাবতী কন্যার দুর্দশার কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ছাগল চরাইয়া ঘরে ফিরিলে খুল্লনাকে লহনা কদর্য অন্নব্যঞ্জন খাইতে দিল। কচুপাতায় ভাত, মাটির সরায় করিয়া ডাল। ভাতের মধ্যে প্রায় সবটাই পুরানো ক্ষুদের জাউ। একটু শাকের সড়সড়ি, তাহাতে নুন নাই। ভাঙ্গা কলায়ের খুদ বাঁটিয়া বড়া করিয়াছে।

বাইগণের থারা[১] লাউ কুমুড়ার বাকলা[২]
গড়ুই মাছের পোটা মুড়া করিয়াছে মেলা।
খলোর[৩] বেসারি[৪] দিয়া জাল দিয়াছে দঢ়
তৈল লোন নাহি তায় সান্তলন[৫] বড়।

১ —বেগুনের বোঁটা। ২ —খোলা। ৩ —খ'লের। ৪ —বাটনা। ৫ —সাঁতলানো।

এ অন্ন খুল্লনা মুখে তুলিতে পারে না, চোখ দিয়া জল পড়ে। দেখিয়া লহনা চোখ পাকাইয়া বলে

এতেক ব্যঞ্জন দিলুঁ ভাত নাহি চলে।

শেষ কালে বড় সরায় করিয়া কাঁজি আনিয়া দিল।

কিছু খায় কিছু ফেলে খুল্লনা সুন্দরী
তৃণের শয্যায় তার গেল বিভাবরী।

এক দিন একটা ছাগল হারাইয়া গেল। তাহাতে খুল্লনার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার আকুলিবিকুলিতে দেবীর দয়া হইল। তিনি অষ্ট বিদ্যাধরীকে পাঠাইয়া বনে খুল্লনাকে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা শিখাইয়া দিলেন। পূজার আয়োজন যৎসামান্য। ভরা ঘট, আটটি ধান, ও আটগাছি দূর্বা। মঙ্গলবারে পূজা করিতে হয়। খুল্লনা পূজা করিলে দেবী আবির্ভূত হইয়া তাহাকে পুত্রবতী হইবার আশীর্বাদ দিলেন ও হারা ছাগল মিলাইলেন। তাহার পর দেবী গিয়া লহনাকে স্বপ্নে ভয় দেখাইলেন।

ধরিস বাঁঝের চিহ্ন সতীনে করিস ভিন্ন
যাহা হৈতে কুলের প্রকাশ
অধর্মে হইলি বাঁঝ দিনে ভুঞ্জ তিন সাঁঝ
সতীনের না কর তলাস।
নিশ্চিন্ত আছহ ঘরে সতীন কাননে ফেরে
জাতিনাশে নাহি তোর ভয়...
আমার বচন শুন নাহি তোর রূপগুণ
আপনি রাখহ নিজ মান
সাধু জিজ্ঞাসিলে তোরে কি বল্যা ভাণ্ডিবে তারে
মোর আগে কর সমাধান।
তোর সই পাপমতি কপটে লিখিল পাতি
অধোগতি যাউক লীলাবতী
সদাগর আইলে দেশে ঘুচিবেক লাসবেশে
ইহার উচিত দিব শাতি।

তাহার পরে চরম কথাটি বলিয়া দিলেন,

করি নানা পরিবন্ধ লেপহ কুসুমগন্ধ
নাহি নেউটিবেক যৌবন।

জাগিয়া উঠিয়া লহনা কাঁদিতে লাগিল। অতঃপর দুই সতীনের মধ্যে সদ্ভাব ফিরিয়া আসিল। ধনপতিও অনতিবিলম্বে আসিয়া পৌছিল।

ধনপতি ভালো করিয়া ভোজন করিবে। দুর্বলাকে হাট করিতে পাঠানো

হইল। বড়লোকের বাড়ির ঝি, হাত দোলাইতে দোলাইতে বাজারে চলিয়াছে। তাহার বেশভূষা,

কপালে চন্দন চুয়া হাতে পান মুখে গুয়া
পরিধান তসরের শাড়ি।

বাজার করিয়া আনিয়া সে হিসাব দিতেছে।

হাটের কড়ির লেখা একে একে দিব বাপা
চোর নহে দুর্বলার প্রাণ
লেখাপড়া নাহি জানি কহিব হৃদয়ে গণি
এক দণ্ড কর অবধান।
হাটমাঝে পরবেশি আসি হরি মহাজোষী[১]
ডাকে মীন রাশ্যের কল্যাণ
আসিয়া আমারে গঞ্জি শ্রবণ করাইল পঞ্জী
তারে দিল কাহনেক দান।
কান্ধেতে কুশের বোঝা নগরে কুশারি ওঝা
বেদ পড়ি করয়ে আশিষ
ইছিয়া তোমার যশ দিনু তারে পণ দশ
দক্ষিণাও ধারি বহু দিস।
বাজারে কর্পূর নাই চাহি বুলি ঠাঁই ঠাঁই
যতনে পাইলুঁ পাঁচ তোলা
পাঁচ কাহনের দর পঁচিশ কাহন কর
চারি কাহনের লৈনু কলা।
আলু কচু শাকপাত- আদি নানা বস্তুজাত
নিল চারি কাহন আষ্ট পণে
তৈল ঘি লবণ ছেনা পাঁচ কাহনের কেনা
খাসি নিল আট কাহনে।
প্রবেশ করিতে হাট আসি মিলে রাজ-ভাট
কায়বার পড়ে উভহাত
ইছিয়া তোমার যশ তারে দিল পণ দশ
কানা পড়িল পণ সাত।
হাটে ভ্রমে অনুদিন শেখ ফকীর উদাসীন
ব্যয় তথি সপ্তদশ বুড়ি
সঙ্গে ভারি দশ জন তারে দিল দশ পণ
আমি খাই চারি পণ কড়ি।

ধনপতি পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিবে। দিকে দিকে জ্ঞাতি কুটুম্ব স্বজাতীয়দের আমন্ত্রণ পাঠাইয়াছে। একে একে সবাই আসিয়া জুটিল।

[১] পাঠ "মহাজসি"। =মহাজ্যোতিষী।

বর্ধমান হৈতে বান্ধা আসে ধুস দত্ত
সর্বজন গায় যার কুলের মহত্ত।
কর্জনার হরি না আইল নীলাম্বর
নয় ভাই নয় ঘোড়া অনেক লস্কর।...
কানু না আইলা যার বাড়ি দশঘরা
সেয়াথালার বান্ধা আইল শ্রীধর হাজরা।
রাম দত্ত আইল যার বাড়ি নাড়ুগাঁ
পাঁচড়ার বান্ধা আইল চণ্ডীদাস খাঁ।
আইল বাসু না যার বাড়ি খাঁড়ঘোষ
কুলশীলব্যবহারে নাহি যার দোষ।...
গোতানের ধুস দত্ত আইল পাঁচ ভাই
যাদব মাধব হরি শ্রীধর বলাই।...

সকলকে লাল কম্বলের উপরে বসানো হইল। কর্পূর তাম্বূল দিয়া অভ্যর্থনা করা হইল।

বিবাদ বাধিল মালাচন্দনের বেলায়। সমাগত বেনে অতিথিদের মধ্যে যিনি সব দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ মালাচন্দন সর্বাগ্রে তাঁহারই প্রাপ্য। বিবেচনা করিয়া ধনপতি চাঁদো সদাগরকে আগে মালাচন্দন দিল। এই লইয়া তখনই ঘোঁট বাঁধিল।

শঙ্খ দত্ত বলিল, বণিক্-সভায় আগে আমার সম্মান। ধুস দত্ত যখন বাপের শ্রাদ্ধ করিয়াছিল তখন ষোল শ বেনের মধ্যে আমিই সর্বাগ্রে মালাচন্দন পাইয়াছিলাম। উত্তরে ধনপতি বলিল, তখন চাদো সওদাগর জন্মে নাই। তা ছাড়া

ধনে মানে কুলে শীলে চাঁদো নহে রাঁকা[১]
বাহির মহলে যার সাত মরাই টাকা।

শুনিয়া নীলাম্বর দাস বলিয়া উঠিল,

ছয় বধূ যার ঘরে নিবসয়ে রাঁড়
ধন হৈতে চান্দো হৈল সভামাঝে দাঁড়।

চাঁদো চটিয়া গিয়া উত্তর দিল, আমি তোমার বাপের কথা জানি।

হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আঙলা
যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা।
নিরন্তর হাথাহাথি বারবধূ সনে
নাহি স্নান করি বেটা বসিত ভোজনে।

---

১ =হীন।

নীলাম্বর দাসের শ্বশুর রাম রায় ধনপতিকে লইয়া পড়িল।

জাতিবাদ নহে ভাই যদি হয় রঙ্ক[১]
বনে জায়া ছেলি রাখে এ বড় কলঙ্ক।

এই কথায় কেহ কেহ সায় দিল, কেহ দিল না। ইতিমধ্যে হরিবংশ পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। তাহা শেষ হইলে রামায়ণ। সীতার অগ্নিপরীক্ষা শুনিয়া নিমন্ত্রিতদের মন ভারি হইল। সমবেত বেনেদের মধ্যে দুর্মুখ ছিল অলঙ্কার কুণ্ড। সে বলিল, ধনপতি কি রামের অপেক্ষা বড় হইয়াছে?

খুল্লনা পরীক্ষা লউক যদি বটে সতী
তবে নিমন্ত্রণে সবে দিব অনুমতি।

বেনেরা সবাই একথায় সায় দিল। কেবল ধনপতির শ্বশুর লক্ষপতি দত্ত দেশের রাজার দোহাই দিয়া বলিল, নারী বনে একলা ভ্রমণ করিলে কোন দোষ নাই। কিন্তু অপরে তা মানিল না। লজ্জিত হইয়া ধনপতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া লহনাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

দেবীর অভয় পাইয়া খুল্লনা পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইল। প্রথমে জল পরীক্ষা। খুল্লনা দুইটি অশ্বত্থ পাতায় ধর্মকে বন্দনা করিয়া ধর্মের মন্ত্র লিখিল। দুইজন পথের লোককে ধরিয়া আনিয়া তাহাদের মাথায় পাতা দুইটি দিয়া পুকুরে ডুব দেওয়ানো হইল। তাহারা উঠিলে দেখা গেল যে পাতায় খুল্লনার হস্তাক্ষর মুছিয়া যায় নাই। তাহার পর সর্পপরীক্ষা। এক কলসীতে মহাকালসর্প রাখা হইল। তাহার পর ধনপতি তাহার আংটি তাহাতে সাতবার ফেলিয়া দিল। খুল্লনা কলসীতে হাত ভরিয়া সেই আংটি সাতবার তুলিয়া বাহির করিল। সাপে তাহার কিছুই করিতে পারিল না। তাহার পর শাবল-পরীক্ষা। লোহার শাবল গরম করিয়া গনগনে লাল হইলে খুল্লনা তাহা দুই হাতে করিয়া ধরিল, তাহার হাত পুড়িল না। তাহার পর তপ্তঘৃত-পরীক্ষা। ফুটন্ত ঘিয়ে খুল্লনা হাত ডুবাইল, তাহাতেও কিছু হইল না। ইহাতেও বেনেরা সম্পূর্ণ খুশি হইল না। তখন জতুগৃহ পরীক্ষার ব্যবস্থা হইল। জতুগৃহে খুল্লনাকে প্রবেশ করাইয়া আগুন দেওয়া হইলে পর গালার ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। দেখা গেল, খুল্লনার একগাছি চুলও পুড়ে নাই। এতক্ষণে বণিক-সভা শান্ত হইল। সকলে পান ভোজন করিয়া যথাযোগ্য মান্য-উপহার লইয়া নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া গেল।

---

[১] অর্থাৎ দরিদ্র হইলেই জাতিদোষ হয় না।

এবারেও ধনপতির দীর্ঘকাল স্বদেশে গৃহবাস ঘটিল না। ভাণ্ডারে চন্দন যোগাইবার জন্ত তাহাকে রাজার আদেশ হইল সিংহল পাটনে যাইতে হইবে। খুল্লনা তখন পাঁচমাস গর্ভবতী। বাণিজ্যে যাইবার সময় ধনপতি একটি খুব অন্যায় কাজ করিল। খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা করিতে দেখিয়া সে দেবীর ঘট ফেলিয়া দিয়া তাহাকে ভৎ´সনা করিতে লাগিল।

কেমন দেবতা এই পূজিস ঘটবারি
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি।

সাত ডিঙ্গা লইয়া ধনপতি সিংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। দেবীর কোপ তাহার পাছু লইল। (পথের বর্ণনা যথাসম্ভব মনসাবিজয়ের অনুরূপ।) পথে দেবী ধনপতিকে জব্দ করিতে পারেন নাই। শেষে সিংহল উপকূলের অনতিদূরে কালিদহে আসিলে সে অবকাশ মিলিল।

পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া
ধনপতি ছলিবারে পাতিলেন মায়া।
আপনি করিল মায়া হরের বনিতা
চৌষট্টি যোগিনী হৈল কমলের পাতা।
অমল কমল হৈল পদ্মা করিবর
ভাসিতে লাগিল শতদলের উপর।
পুষ্পের ধনুকে মাতা পূরিল সন্ধান
ধনপতি-হৃদয়ে মারিল পঞ্চবাণ।
মোহ গেল ধনপতি নায়ের উপর
চেতন করাল্য তারে গাঠের গাবর।
রাজ-পদ্মিনী দেখি কমলের বনে
কন্যারে ধরিয়া আনি রাখে কোন জনে।…

নাবিকদের ডাকিয়া ধনপতি এই দৃশ্য দেখিতে বলিল।

অপরূপ হের আর দেখ ভায়া কর্ণধার
কামিনী কমলে অবতার
ধরিয়া বাম করে উগারয়ে করিবরে
পুনরপি করয়ে সংহার।…

কিন্তু তাহারা কিছুই দেখিতে পাইল না।

সিংহলে পৌঁছিয়া ধনপতির সওদা ভালোই হইল। তবে দুর্বুদ্ধির বশে সে রাজাকে কমলে-কামিনীর কথা বলিয়া ফেলিল। রাজা বিশ্বাস করিল না। ধনপতি দেখাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত দেখাইতে না পারায় রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার আজীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিল।

বছরের পর বছর যায়। খুল্লনার পুত্র শ্রীপতি (বা শ্রীমন্ত) বড় হইয়াছে, লেখাপড়াতেও অগ্রসর হইয়াছে। একদিন গুরু জনার্দন শর্মার সহিত শাস্ত্র-বিচারে সে তর্ক তুলিল। রামায়ণ ও ভাগবতের কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীপতি সংশয় প্রকাশ করিয়া গুরুর কাছে সমাধান চাহিলে গুরু হাসিয়া বলিলেন

কৃষ্ণ-ইচ্ছা বিনু কিছু নাহি সমাধান।

এ উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীপতি বলিল

টীকার বিচার গুরু না কর ঘটিত
কেন বা প্রভুর ইচ্ছা হবে অনুচিত।

এইভাবে কথাকাটাকাটি হইতে হইতে শ্রীপতি বলিয়া ফেলিল

গোত্রে দুর্বাসা কুলে দত্ত বানিঞা
ব্রাহ্মণের মত নহি বল্লালসেনিঞা।

আর যায় কোথায়। জনার্দন ক্ষিপ্ত হইয়া উত্তর দিল

পিতা দীর্ঘ পরবাসে তোমার জনম
নাহি জান আপনার জাতির ধরম।
মর্‌য়া গেল ধনপতি শুনি বহু দিস
মায়ের আয়তি হাতে ভোজন আমিষ।

শ্রীপতি বাড়ি আসিয়া অশান্ত অভিমানে উপবাস করিয়া রহিল। শেষে পিতার অন্বেষণে যাইবার অনুমতি পাইয়া তবে সুস্থির হইল। রাজার কাছে আজ্ঞা লইয়া শ্রীপতি ডিঙ্গা সাজাইয়া সিংহল পাটনের উদ্দেশে চলিল। পথের অভিজ্ঞতা ঠিক বাপের মতো। সেও কমলে-কামিনী দেখিল, এবং রাজার কাছে বলিয়া বিপদে পড়িল। তাহাকে রাজা এবারে বধদণ্ড দিল। তাহাকে বধ করিবার জন্য মশানে লইয়া গেলে দেবী ব্রাহ্মণীরূপে আসিয়া কোটালের কাছে নাতির প্রাণভিক্ষা করিলেন। কোটাল রাজি হইল না। দেবীর সহিত তাহার যুদ্ধ হইল। রাজাও সসৈন্যে আসিয়া যোগ দিল। কিন্তু শেষে দেবীর ভূত-প্রেত-পিশাচ সৈন্যের কাছে রাজসৈন্যের পরাজয় ঘটিল। কাতর রাজা দেবীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলে দেবী প্রসন্ন হইলেন। দেবী শ্রীপতিকে সিংহলে একবৎসর থাকিতে বলিলেন। শ্রীপতি পিতার সন্ধানে উদ্বিগ্ন। শেষে অন্ধকারায় গিয়া পিতার সন্ধান পাইল। পিতাপুত্রে কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। সুতরাং মুখামুখি হইয়াও পরস্পর চিনিতে পারিল না। শ্রীপতি মায়ের কাছে বাপের চেহারার যে বর্ণনা শুনিয়াছে তাহার সহিত কিছুই মিলিল না। পিতার কাছে পুত্র অপ্রত্যাশিত।

জননী বল্যাছে মোর জনক কনক-গৌর
বাম-নাসা উপরে আঁচিল
দীর্ঘ যেন তাল-শাখী বিকচ-কমল আঁখি
হৃদয়ে আছয়ে সাত তিল।
শিব-পূজা প্রতিদিন কপালে প্রণাম-চিন
বাম দন্ত ঈষৎ উজ্জ্বল…

আর মৃতকল্প বন্দীর চেহারা,

অতি লম্ব দাড়ি আচ্ছাদয়ে নাভিদেশ
বিঘত-প্রমাণ নখ জটাভার কেশ।
তৈলবিবর্জিত তার গায়ে উড়ে খড়ি
সদাগর আচ্ছাদন না ছাড়ে ধুকড়ি।
তিন চারি ডাকে দেয় একটি উত্তর…

ছাড়া পাইয়া বন্দী ধনপতি উদ্ধারকর্তার নিকট অতি দীনভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল।

তুমি শিশু আমি বৃদ্ধ ধিক শূদ্র-জাতি
এই হেতু রায় তোমা না কৈনু প্রণতি।
নিশ্চিন্তে করহ রাজ্য দীর্ঘ পরমাই
মাতা পিতা সুখে থাকু হও সাত ভাই।…
দেহ একখানি ধুতি পথের সম্বল
মহাদেব-পূজা করি চিন্তিব মঙ্গল।…
তোমা হৈতে দূর হৈল মনের বিষাদ
শিবপূজা করিয়া করিব আশীর্বাদ।

ধনপতির এই ট্রাজিক মূর্তিতে তাহার নিষ্পিষ্ট মনুষ্যত্বের মহিমা সমস্ত দীনতাকে ছাপাইয়া জাগিয়াছে।

পিতা-পুত্রের মিলন হইল। রাজা ধনপতির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া শ্রীপতির হাতে কন্যা সুশীলাকে সমর্পণ করিল। কিছুকাল পরে পিতা পুত্র ও পুত্রবধূ বাণিজ্য ও যৌতুক সম্ভার লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। তখন আবার একটু নূতন ঝঞ্ঝাট বাধিল। বিক্রমকেশরী রাজাকে কমলে-কামিনীর কথা বলায় রাজা তাহা দেখিতে নির্বন্ধ করিল। দেখাইতে না পারিলে শ্রীপতির প্রাণদণ্ড হইবে। প্রাণদণ্ডের পূর্বক্ষণে দেবী মশানে আবির্ভূত হইয়া কমলে-কামিনী রূপ স্থলেই দেখাইলেন। রাজা খুসি হইয়া শ্রীপতির সঙ্গে কন্যা জয়াবতীর বিবাহ দিলেন। হর ও গৌরী অভেদ জানিয়া ধনপতি নিশ্চিন্ত হইল। তাহার পর যথারীতি উপসংহার ও "অষ্টমঙ্গলা"॥

৮

মুকুন্দরাম পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ও অলঙ্কারে তাঁহার ব্যুৎপত্তির পরিচয় কাব্যমধ্যে যত্রতত্র লভ্য। সেই সঙ্গে দেশি-বিদ্যায়, অর্থাৎ লোক-ব্যবহার, ছেলেভুলানো, ছেলেখেলা, মেয়েলি ক্রিয়াকাণ্ড, ঘরকন্নার ব্যবস্থা, রাঁধাবাড়া ইত্যাদি বিভিন্ন অনপেক্ষিত সামাজিক ও সাংসারিক ব্যাপারেও তিনি বিস্ময়কর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণ নরনারীর মনে সাংসারিক ঘটনা-দুর্ঘটনায় যে স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত তাহা তিনি সুনিপুণ অথচ অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে প্রতিফলিত করিয়াছেন। শুধু আপনার বা প্রতিবেশীর ঘরের কথায় নয়, নিজের বা আশেপাশের সমাজের কথায়ও নয়, দেশের যেখানে যতটুকু তাঁহার গোচরে আসিয়াছিল তাহার সব-কিছুতেই তাঁহার কৌতূহল ছিল। সে কৌতূহল তাঁহার রচনায় স্থানে স্থানে প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহার শিল্পকে সমসাময়িক মানে উর্ধ্বে তুলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দের শেষ ভাগের আগে বাঙ্গালা ভাষায় যদি এমন কোন একটি গ্রন্থের নাম করিতে হয় যাহাতে আধুনিক কালের সাহিত্যবস্তুর—উপন্যাসের—রস কিছু পরিমাণেও পাওয়া যাইতে পারে তবে সে বই কী তাহা সহৃদয় যিনি মানে বুঝিয়া মুকুন্দরামের রচনা পড়িয়াছেন তিনিই বুঝিবেন। নিপুণ পর্যবেক্ষণ, সহৃদয়তা, জীবনে আস্থা, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যেসব গুণ ভালো উপন্যাস-লেখকের রচনায় প্রত্যাশিত সে সব গুণ, সেকালের পক্ষে যথোচিত পরিমাণে, মুকুন্দরামের কাব্যেই পাই।

বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালী মানুষের এমন পরিপূর্ণ চিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের আর কোথাও মিলে কিনা সন্দেহ। কবি শুদ্ধাচারী বামুন-পণ্ডিতঘরের ছেলে, আজন্ম দেববিগ্রহ-সেবক। কিন্তু তাঁহার সহানুভূতি হইতে কেহই বঞ্চিত হয় নাই—না বনের তুচ্ছতম পশু, না গ্রামের দুর্গততম মানুষ। যাহাকে আমরা এখন বৈষ্ণব বলি মুকুন্দরাম হয়ত ঠিক তাহা ছিলেন না। তবে তাঁহার মনের ভাব পাকা বৈষ্ণবের মতোই। এই বৈষ্ণব ভাব তাঁহার কাব্যে একটু বিশেষ রসের সঞ্চার করিয়াছে। সে রস হইল স্নিগ্ধ কারুণ্য, ভালোবাসা। মুকুন্দরামকে অনেক কষ্ট পাইয়া সাতপুরুষের ভিটা ছাড়িয়া, সাতপুরুষের আরাধিত এবং নিজের আবাল্য-সেবিত দেবতা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু দেশের প্রতি তাঁহার ভালোবাসায় একটুও ভাটা পড়ে নাই। দেশের ঠাকুরের জন্য তাঁহার চিত্ত মাঝে মাঝে

ছেলেমানুষের মতোই ব্যাকুল হইত। সে ব্যাকুলতার প্রকাশ দৈবাৎ ভনিতায় স্ফুরিত হইয়াছে। যেমন

দামুন্যা নগরে প্রভু রামচন্দ্রাদিত্য
শিশুকাল হৈতে যার সেবা কৈল নিত্য।
সে প্রভু-চরণ মনে ভাবি অনুক্ষণ
চণ্ডিকামঙ্গল রচে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

অথচ যেখানে তিনি রহিয়াছেন সেস্থানের প্রতিও তাঁহার প্রীতি কিছু কম নয়,

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
সুখে থাকি আড়রা নগরে ॥

বৈষ্ণব সাহিত্যের বাহিরে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দের সব উল্লেখযোগ্য কাব্যকর্তা মুকুন্দরামের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হইয়াছেন ॥

নির্ঘন্ট

নির্ঘণ্ট

[' ' চিহ্ন মধ্যে গ্রন্থনাম, " " চিহ্ন মধ্যে বিষয়নাম, নিশ্চিহ্ন ব্যক্তিনাম]

ইংরেজী

চিত্রাবলী

১

মল্লসারুল অনুশাসনের মুদ্রায়
ধর্ম-সূর্য মূর্তি

পাহাড়পুর মন্দিরচিত্রে কৃষ্ণলীলা (যমলার্জুনভঙ্গ)

৩

পাহাড়পুর মন্দিরচিত্রে মত্ত শবরী-নৃত্য

৪

পাহাড়পুর মন্দিরচিত্রে সেকশুভোদয়ার গল্প

পাহাড়পুর মন্দিরচিত্রে পঞ্চতন্ত্রের গল্প (কীলোৎপাটী বানর)

পাহাড়পুর মন্দিরচিত্রে পঞ্চতন্ত্রের গল্প (সিংহনিপাতকারী শশ)

চর্যাগীতিকোষের দুই পৃষ্ঠা

শ্রীচৈতন্য
(কুঞ্জঘাটায় রক্ষিত প্রাচীন চিত্র হইতে)

পুরীতে চৈতন্যসভায় ভাগবত-পাঠ
(কুঞ্জঘাটায় রক্ষিত প্রাচীন চিত্র)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির ৩ক পৃষ্ঠা (এক নম্বর হাতের লেখা)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির ৭৩খ পৃষ্ঠা (দুই নম্বর হাতের লেখা)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির ১৭৬খ পৃষ্ঠা (তিন নম্বর হাতের লেখা)

সনাতন-রূপ-জীবের পরিচয়-পাতড়া প্রথম পৃষ্ঠা

সনাতন-রূপ-জীবের পরিচয়-পাতড়া দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

तथाहि॥ हरिपूर्णः त्तमः पूर्णात्तरः पूर्णा इति त्रिधा पुक्तासिताखिल
गुणाः स्मृत पूर्णात्तम स्तुधैः। अशर्वव्यंजकः पूर्णात्तरः पूर्णो अल्पद
शकः कृष्णस्य पूर्णत्तमता वोक्तं त्वदेकं गो कुलांतरे इति॥ पूर्णात
पूर्णात्तरत्ता द्वारका मथुरादिसः इत्यादि॥ २९ कृष्ण व्रजे पूर्णात्तमः भ
गवान॥ आरसव स्वरूप पूर्णात्तर पूर्ण नाम॥ ३० इसंक्षेपे कहिलुं
[illegible] स्वरूप विलास। अनंत कहिते नारे इहार विस्तार॥ अनंत स्वरूप
कृष्णेर नाहि कहान न॥ सारवा चंद्रन्याय कैल दिगदरसन॥ इह
येई पढ़े सुने येई भाग्यवान॥ श्रीकृष्णस्वरूप तत्वेर किछु हय ज्ञा
न॥ श्रीरूप रघुनाथ पदे जार आस॥ चैतन्यचरितामृत कहे कृष्ण
दास॥ इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखंडे संबंध तत्व निरूपणं श्रीभा
गवत भेद विचारो नाम विंसति परीच्छेदः॥ २०॥ अगत्यैकगतिं नत्वा
हिना थीदिक साधनं। श्रीचैतन्यं लिख्याम्यस्य माधुर्यकस्प-
शीखरं॥ जयजय श्रीचैतन्य जय श्रीनित्यानंद॥ जयाद्वैतचंद्र जय

নাগরী অক্ষরে লেখা চৈতন্যচরিতামৃতের পুরানো পুথির একটি পৃষ্ঠা

জ্ঞানদাস-পদাবলীর প্রাচীন পুথির একটি পৃষ্ঠা

লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীমূর্তি

গোধা-লাঞ্ছন অভয়া চণ্ডীমূর্তি

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রাচীনতম পুথির একটি পৃষ্ঠা